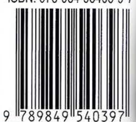
মিরাজ

রবিন জামান খান





https://www.facebook.com/anyadhara অন্যধারা



মিরাজ



রবিন জামান খান



মোঘল সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দিল্লির মসনদ দখলের লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তার তিন ছেলে। নিজের দুই ভাইয়ের কাছে যুদ্ধে হেরে পলায়নরত সম্রাট শাহ সুজা আরাকান রাজের আশ্রয়ে অতিথি হলে, লোভী আরাকান রাজ রাতের আঁধারে হামলা চালায় তার বাসভবনে। কিন্তু সম্রাট সুজার সঙ্গে থাকা মোঘল সম্পদের বিরাট ভাণ্ডার দখলের আগেই সম্রাট সুজার একান্ত কাছের মানুষ সেটা নিয়ে রওনা দেয় বাঙাল মুল্লুকের উদ্দেশ্যে। তাকে ধাওয়া করতে আরাকান রাজের নির্দেশে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের নিয়ে গঠন করা হয় বিরাট বাহিনী। বিপরীতে চট্টগ্রাম থেকে এই বিরাট বাহিনী প্রতিহত করার দায়িত্ব নিতে বাধ্য করা হয় মোঘল নৌবাহিনীর প্রাক্তন কাপ্তান তালেব কিরানকে।

অন্যদিকে বর্তমান সময়ে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা রোডে অ্যাক্সিডেন্টে মারা পড়ে এক ব্যক্তি। মানুষটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেশে-বিদেশে সক্রিয় হয়ে ওঠে একাধিক মহল। ঘোলাটে পরিস্থিতি সামাল দিতে চট্টগ্রাম পাঠানো হয় পিবিআইয়ের স্পেশাল ফিল্ড এজেন্ট শারিয়ারকে। চট্টগ্রামে পৌঁছে পরিস্থিতি সামলানো তো দূরে থাক বরং একের পর এক আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে সে। বাধ্য হয়ে অথরিটির বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে কাজে নামতে হয় নিজের টিম নিয়ে। ঘটনার পরিক্রমায় সে জানতে পারে ইতিহাসের এমন এক অধ্যায়ের সংযোগ আছে এই ঘটনার যা আজ বিস্তৃতপ্রায়। শারিয়ার আর তার দল কি পারবে ইতিহাসের অতল থেকে খুঁড়ে বের করতে হারানো সেই অধ্যায়...?

জবাব জানতে পড়ুন '২৫শে মার্চ', 'সপ্তরিপু', ব্ল্যাক বুদ্ধা'র মতো ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস ও শব্দজালের মতো সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার দিয়ে বাংলাদেশ ও কোলকাতায় পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করা লেখক রবিন জামান খানের উপন্যাস 'মগরাজ'—যেখানে ইতিহাসের হারানো অংশ থেকে তুলে আনা হয়েছে বিস্তৃত এক অধ্যায়।

প্রচ্ছদ : আশরাফ ফয়াদ

মগরাজ

মিরাজ

রবিন জামান খান

অন্যধারা
অন্যধারা

প্রকাশক
মো. মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১২৩১৬৬, ০১৭১২৮০৭৯০১, ০১৯২০২১৬৯৬৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০২১
প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০২১
প্রচ্ছদ
আশরাফ ফুয়াদ

কম্পোজ
অন্যধারা কম্পিউটার্স
৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ
একাত্তর প্রিন্টার্স
৪১/৪২, রূপচাঁন দাস লেন, ঢাকা-১১০০
মূল্য
৭০০.০০ টাকা মাত্র

Mograj By Robin Zaman Khan
Published by Md. Monir Hossain Pintu, Anyadhara
38/2-Ka , Banglabazar, Dhaka 1100
Price Tk. 700.00 Only US $ 50.00

ISBN 978-984-95403-9-7 বইঘর.কম

উৎসর্গ

কিছু মানুষ থাকে যাদের সঙ্গে পরিচয় এবং যাদের সঙ্গ এক মানবজন্মের জন্যে পরম পাওয়া। তেমনি একজন মানুষ...

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই-বন্ধু এবং সহকর্মী
সৈয়দ হাবিব আনোয়ার পাশা স্যারকে।

ভূমিকা

সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমি থ্রিলারের মানুষ। ফিকশন, নন-ফিকশন থেকে শুরু করে সিনেমা-টিভি সিরিজে সবসময়ই আমার পছন্দ থ্রিলার। সাহিত্যের ছাত্র ও একজন পাঠক হিসেবে প্রায় সব ধরনের লেখা নিয়মিত পড়লেও একেবারে স্কুল লেভেল থেকে থ্রিলারই ছিল আমার প্রথম পছন্দ। তাই প্রথম যখন মৌলিক থ্রিলার উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করছিলাম সে-সময়ে ভেতরে-ভেতরে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করছিল নিজের দেশের ইতিহাস, নিজের দেশের নানা মিথ-লেজেন্ড নিয়ে খাঁটি বঙ্গদেশীয় ইতিহাসআশ্রিত থ্রিলার উপন্যাস লেখার। রিসোর্স সংগ্রহ থেকে শুরু কওে প্রতিটি ধাপেই চ্যালেঞ্জ ছিল অনেক কিন্তু আমার প্রথম উপন্যাস '২৫শে মার্চ' প্রকাশিত হবার পর পাঠকের ভালোসায় সিক্ত হয় বইটি। সেইসঙ্গে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইতিহাসআশ্রিত থ্রিলারের নতুন এক দ্বার উন্মোচিত হয়। এরপর একে একে 'সপ্তরিপু' ও 'ব্ল্যাক বুদ্ধা' প্রকাশিত হবার পর সেই সাফ্যলের মুকুটে যুক্ত হয় পাঠকের ভালোবাসার নতুন পালক। ব্রিটিশশাসিত ভারতের প্রেক্ষাপটে ঠগি নামক ভয়ংকর খুনে গোত্রের গল্প নিয়ে যখন সপ্তরিপু বইটা লিখি তখন একটা ইচ্ছে ছিল আমি তিনটি চরিত্রের সৃষ্টি করব এবং এই চরিত্রগুলো নিয়ে একেবারে দেশীয় প্রেক্ষপটে তিনটি ইতিহাসআশ্রিত থ্রিলার উপন্যাস লিখব বেশ বড় পরিসরে। কিন্তু এই ট্রিলজির দ্বিতীয় বই 'ব্ল্যাক বুদ্ধা' লেখার সময়েই এই আইডিয়া আরো বিস্তৃত হয় এবং সে-থেকে সিদ্ধান্ত নেই, ট্রিলজি নয় বরং ইতিহাসের একেকটা অধ্যায় নিয়ে আমি একটা পরিপূর্ণ সিরিজই লিখব। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের তৃতীয় বই 'মগরাজ' প্রকাশিত হলো।

মগরাজ উপন্যাসটি আমার দীর্ঘদিনের প্রজেক্ট। এই উপন্যাসের প্রস্তুতির জন্যে বলতে গেলে এক বছর লেখালেখি থেকে দূরে ছিলাম। একেক লেখক একেকভাবে লেখে, প্রত্যেকের ধরন আলাদা। আমার লেখার পদ্ধতি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং দীর্ঘ, যেটা অনেক সময়ই পাঠক ও প্রকাশকের বিরক্তির কারণে হয়ে দাঁড়ায়। কারণ আমি প্রথমে আইডিয়া ডেভলপ করি, তারপর বিস্তারিত প্রস্তুতি নেই, এরপর দীর্ঘ সময় নিয়ে আউটলাইন করি, এরপর যেসব সেটিংয়ে গল্পগুলো লেখা হবে সম্ভব হলে সেগুলো ঘুরে দেখে এসে লিখতে বসি। তাই আমার একেকটা লেখা আসলে শুধু লেখা নয় একেকটা গল্প, গল্পের চরিত্র আমার নিজের অস্তিত্বের এক একটি অংশে পরিণত হয়। মগরাজ এমনই একটি প্রজেক্ট। কতটা সফল প্রজেক্ট সে-বিবেচনা পাঠকের।

মগরাজ নিয়ে যদি দু-একটা কথা বলতে চাই তবে প্রথমেই বলব মগরাজ গল্পটা চট্টগ্রামের সেটিংয়ে লেখা। তাই প্রথমে চরিত্রগুলোর সংলাপে চট্টগ্রামের স্থানীয় ভাষার প্রভাব রেখেই আমি লিখেছিলাম কিন্তু পরে দেখা গেল এতে সার্বজনীন পাঠকের কথোপকথন বুঝতে সমস্যা হবে। যে-কারণে পরবর্তীতে চরিত্রের কথোপকথনে চট্টগ্রামের ভাষার প্রভাব পরিবর্তন কওে ডায়লগগুলো সাধারণ আঞ্চলিক বাংলায় লেখা হয়। মগরাজের আরেকটি ব্যাপার হলো, এটি ইতিহাসের এমন এক অধ্যায় নিয়ে লেখা যে-সময়ের অনেক কিছুই অস্পষ্ট। ঘটনাগুলো নথিভুক্ত তো নয়ই বরং একেকটা ঘটনার আবার লোকমুখে প্রচলিত একেক রকমফের রয়েছে। আর তাই উপন্যাসের কিছু কিছু বাস্তব চরিত্রের কর্মকাণ্ড কিংবা পরিণতি ইতিহাসের ধ্রুব সত্য বলে ধরে নেয়ার কোনো কারণ নেই, আবার পুরোপুরি ঐতিহাসিক মিথ্যা বলেও ভাবার কারণ নেই। আমি ইতিহাসের নথিভুক্ত সত্য এবং লোকমুখে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা এবং চরিত্রের পরিণতির সার্বিক এবং কাল্পনিক একটা প্রেক্ষাপটকে ভিত্তি ধরে আমার নিজের মতো একটি গল্প বলার চেষ্টা করেছি। তবে মগ-ফিরিঙ্গি জলদস্যু থেকে শুরু করে দক্ষিণ অঞ্চলের স্থানীয় রাজনীতি এবং মোঘলদের অভ্যন্তরীণ কলহ এবং দক্ষিণ অঞ্চলের জনমানুষের জীবনের যে দুর্বীষহ চিত্র উপন্যাসে রচনা করা হয়েছে তা ধ্রুব এবং প্রতিষ্ঠিত সত্য।

তবে সত্য-মিথ্যা, বাস্তব-কল্পনা যাই হোক না কেন, এত ভেবে লাভ কি, আমি একটি গল্প বলতে চেয়েছি, পাঠকরা যদি সেই গল্পের গভীরে ডুব দিয়ে বাস্তব জীবনের দাবদাহ থেকে খানিক সময়ের জন্যে ইতিহাসের অতলে ডুব দিয়ে জলদস্যু, পালতোলা জাহাজ, পুরনো দুর্গ আর দক্ষিণ সাগরের নোনা পানিতে হারিয়ে যেতে পারে, তবেই আমি মনে করব আমার গল্প বলা সার্থক হয়েছে। একজন গল্পকথক হিসেবে পাঠকরাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা, পাঠকদের জন্যেই আমার সব ভালোবাসা, আর সেই পাঠকদের হাতেই আমার সব সাফল্য ও ব্যর্থতা নিহিত। সবাই ভালো থাকবেন।

রবিন জামান খান

স্টিলওয়াটার,

ওকলাহোমা,

যুক্তরাষ্ট্র

পূর্বকথা

সময়: ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দ

তুলপাধলা গ্রাম, ত্রিপুরা রাজ্য

পশ্চিম দিগন্তে হেলতে থাকা সূর্যের তীর্যক আলোতে সোনালি কার্পেটের মতো ঝকঝক করছে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত গমখেত। আর কিছুটা সময় পার হলেই পাহাড়ের আড়ালে ঝপ করে মুখ লুকাবে পড়ন্ত সূর্যটা। গোধূলি আর বিকেলের দড়ি টানাটানি শেষ না হতেই হুট করে নেমে আসবে পাহাড়ি সন্ধ্যা। আর ঠিক সে-সময়েরই অপেক্ষা করছে ত্রিপুরা রাজ্যের ছোট্ট গ্রাম তুলপাধলার বাসিন্দারা।

তুলপাধলা গ্রামটা ত্রিপুরা রাজ্যের একেবারে শেষ কিনারায় ধলার পাহাড় নামে সাদাটে ধূসর এক বিরাট পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বয়ে যাওয়া তুলপা নদীর ঠিক কূলেই অবস্থিত। কবি-সাহিত্যিকদের ভাষায় বলতে গেলে ধূসর পাহাড় আর স্বচ্ছ নদীর পানির ঠিক মিলনস্থলেই অবস্থিত গ্রামটা। এ কারণেই কিনা কে জানে, পাহাড় আর নদীর নাম মিলিয়েই গ্রামের নাম হয়েছে তুলপাধলা। এই নামের উৎপত্তি সঠিকভাবে না জানলেও গ্রামের বাসিন্দারা এটা মানে যে, তুলাপধলা গ্রাম দেবতাদের সরাসরি আশীর্বাদপ্রাপ্ত। কারণ পুরো ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বদা পানির যে প্রকট সমস্যা লেগে থাকে তার ছিটেফোঁটাও নেই এই গ্রামে। পানির সমস্যা না থাকার কারণেই বিগত কয়েক শতক ধরে তুলপা নদীসংলগ্ন বিস্তৃত এলাকায় গড়ে উঠেছে এই এলাকার সবচেয়ে বড়ো গম আর যব চাষের ক্ষেত্র।

তুলপাধলার আশপাশের এলাকাতে ফলানো গম আর যবের চাহিদা ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত ত্রিপুরা ও মনিপুর রাজ্যজুড়ে। এমনকি এই এলাকার যবের চাহিদা ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়িয়ে বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করেছে সেই সুদূর হিন্দুস্তান পর্যন্ত। হিন্দুস্তানের বহু এলাকাতেই যবের ছাতুর একমাত্র উৎস ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদিত যব। এ কারণেই তুলপাধলাকে বলা হয়ে থাকে সরাসরি স্রষ্টার আশীর্বাদপ্রাপ্ত। এমনকি ত্রিপুরা রাজ্যের রাজাও এমনটাই মনে করেন। যে কারণে রাজার বিশেষ বিবেচনার অধীনে থাকে এই এলাকা। ত্রিপুরার অন্যান্য এলাকা যেখানে স্থানীয় শাসকের অধীনে শাসিত হয়ে থাকে সেখানে তুলপাধলা শাসিত হয় সরাসরি রাজার অধীনে। এমনকি প্রতি বছরের নির্দিষ্ট একটা সময় রাজা নিজে একবারের জন্য

হলেও সশরীরে ভ্রমণ করতে আসেন বৃহত্তর তুলপাধলা রাজ্যে। ধলার পাহাড়সংলগ্ন নদীর পাড়ে রাজার থাকার জন্য বিরাট রাজবাড়ি নির্মাণ করা আছে। রাজার সান্নিধ্য পেয়ে তুলপাধলার লোকেরাও অত্যন্ত সুখী। বছরের যেই সময়টায় রাজা বেড়াতে আসেন সেই সময়টাতে তুলপাধলা এলাকাতে উৎসব-আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। এছাড়া বছরের বাকি সময়টা তুলপা নদীর নিস্তরঙ্গ জলের মতোই শান্তভাবে প্রবাহিত হতে থাকে তুলপাধলা এলাকার মানুষের জীবন। তবে নিস্তরঙ্গ এই জীবনে মাঝে মাঝে আলোড়ন বয়ে যায় ছোটো-বড়ো নানা ঘটনায়। ঠিক সে-রকমই একটা ঘটনা বেশ কিছুদিন ধরে ঘটে চলেছে তুলপাধলা গ্রামে।

ভালোর সঙ্গে যেমন মন্দ, আলোর সঙ্গে যেমন অন্ধকার, ঠিক তেমনি আশীর্বাদের সঙ্গে যোগ হয় ছোট-খাটো কিছু অভিশাপ। সমৃদ্ধির সঙ্গে তুলপাধলা গ্রামের প্রবহমান জীবনেরও এরকম একটা ছোট্ট অভিশাপ আছে। আর সেটা হলো তাদের বিনোদন ব্যবস্থার অভাব। বছরের ছয়টি ঋতুর ভেতরে তিনটের সময় ফসলের কাজে তারা সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকে। ফসল ফলানো থেকে শুরু করে ফসল রপ্তানির জন্য গুদামজাত করা পর্যন্ত সময়াটাতে উদয়াস্ত অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় তাদের। ঘরের নারী-পুরুষ থেকে শুরু করে কখনো কখনো ছোটো বাচ্চা এমনকি বৃদ্ধদেরও কাজে লেগে যেতে হয় বাধ্য হয়ে। একেবারে অথর্ব না হলে এ-সময়টাতে পরিশ্রম করতে সমর্থ এমন প্রত্যেকটা মানুষকেই কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।

কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় অন্য তিন ঋতুতে, মানে বছরের বাকি সময়টাতে। এই সময়টাতে বলতে গেলে তাদের কোনো কাজই থাকে না। একেবারে আলসে হয়ে শুয়ে-বসে সময় কাটাতে কাটাতে জীবন একঘেয়ে আর পানসে হয়ে যায় তাদের।

তবে গত কয়েকমাস ধরে তাদের এই পানসে জীবনেই দেখা দিয়েছে ভিন্ন এক উত্তেজনা। এমন এক উত্তেজনা, এমন এক ভিন্ন বিনোদন যার খোঁজ এর আগে কখনো পায়নি তুলপাধলা গ্রামের লোকেরা। উত্তেজনার কারণ আর কিছুই না তাদের এলাকায় আগত এক সন্ত, যাকে দরবেশও বলা চলে। এই সন্তকে তারা নাম দিয়েছে গল্প বলিয়ে সন্ত। গল্প বলার প্রথা তাদের পাশের মনিপুর রাজ্য আর বাঙ্গাল মুল্লুকে খুবই পরিচিত আর বিনোদনের অন্যতম প্রধান এক মাধ্যম হলেও তাদের ত্রিপুরা এলাকায় এটার প্রচলন খুবই কম, বলতে গেলে নেই-ই। একারণেই গল্প বলিয়ে সন্তের তুলপাধলাতে আগমনের ব্যাপারটা খুবই আকর্ষণীয়, অন্তত গ্রামের লোকজনের কাছে তো বটেই।

সময়টা তখন সবে শীতকাল শেষ হয়েছে। শীতের ঠাণ্ডা বাতাস ধীরে ধীরে পাহাড়ি টানে বদলে গিয়ে স্ব-আনন্দে ঘোষণা করছে বসন্তের আগমন ধ্বনি। এ-সময়টা গ্রামীণ জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সময়। কারণ শীতের সঙ্গে শেষ হয়ে যায় ফসলের কাজ। একবার ফসল গোলাঘরে তোলার পর অফুরন্ত সময় তাদের হাতে। এই সময়টাতে ফসল রপ্তানি আর গুদামজাত করার পর একদিকে হাতে থাকে অর্থ, অন্যদিকে অফুরন্ত সময়। এর সঙ্গে যোগ হয় বসন্তের বার্ষিক উৎসবের সময়। সবমিলিয়ে এই সময়টা এমন এক সময়, যখন জীবন সবচেয়ে বেশি সুন্দর হয়ে ওঠে তুলপা গ্রামের মানুষের কাছে। কিন্তু এই বছর ব্যতিক্রম দেখা দেয় সবকিছুতে।

এর পেছনে কারণ হলো রাজার অনুপস্থিতি। বছরের যেই সময়টার জন্য সবচেয়ে বেশি অপেক্ষা করে থাকে রাজ্যের প্রজারা এ বছর সেই সময়টাতেই দেখা দিয়েছে রাজার সমস্যা। প্রকৃতপক্ষে রাজার সমস্যা বা ব্যস্ততা যা-ই হোক না কেন সেটা আসলে দেখা দিয়েছে আরো অনেক আগেই। কিন্তু ব্যস্ততার জের ধরে অবশেষে রাজা ফরমান পাঠায়, এ বছর সে তুলপাধলার উৎসবে যোগ দিতে পারবে না। এর পেছনের কারণটাও অজানা ছিল না তুলাপাবাসীর। যদিও তারা নিজেদের গ্রাম ফসল আর এলাকার বাইরের খুব একটা খবর রাখে না তবুও খুব ভাসা-ভাসাভাবে তারা জানত দিল্লির সালতানাতে মোঘল বাদশাদের উত্থান-পতনের ধাক্কা সুদূর দিল্লি থেকে এসে লেগেছে এই ত্রিপুরা পর্যন্ত। আর সেই ধাক্কার জের ধরেই ত্রিপুরার রাজা ঝামেলার কারণে যোগ দিতে পারেনি তাদের বার্ষিক উৎসবে।

রাজার অনুপস্থিতিতে মনে কষ্ট থাকলেও সময় তো আর বসে থাকে না। তাই রাজাবিহীন উৎসবই পালন করতে হয়েছে এবার। তবে উৎসবের সময়টা খারাপ কাটেনি তুলপাবাসীর। কিন্তু উৎসব শেষ হবার পর তারা যখন ভাবছে ফসলের কাজ শুরু হতে তাদের অপেক্ষা করতে হবে আরো দীর্ঘ কয়টা মাস, এমন সময় তাদের তুলপা গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে দেখা দেয় নতুন এক উত্তেজনা।

যেদিন ঘটনাটা ঘটেছিল সেদিনটাও পরিষ্কার মনে আছে তুলপাবাসীর। আর দশটা দিনের মতোই সেদিনও খুব স্বাভাবিকভাবে শুরু হয়েছিল তাদের দিন। মহিলারা ঘরকন্না করছিল, শিশুরা খেলছিল, আর পুরুষরা বটতলার আলসে ছায়ায় বসে হুকোর গড়গড়া হাতে নিয়ে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করতে করতে গবেষণা করছিল একে অপরের হাঁড়ির খবর নিয়ে। এমন সময় তুলপা এলাকায় প্রবেশ পথের দূরের রাস্তায় ধুলো উড়তে দেখে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। মহিলারা গোল করে পাকাতে থাকা গোবরের কাঁদি থেকে মুখ তুলে ফিরে তাকায় সেদিকে, পুরুষরা উদ্‌গিরণ করতে থাকা ধোঁয়া মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে সরিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দূরের পথে।

ভৌগোলিক কারণেই তুলপা গ্রামটার অবস্থান এমন যে এলাকায় প্রবেশ করতে হলে লম্বা যে-পথটা পাড়ি দিয়ে আসতে হবে সেটা গ্রামের অবস্থান থেকে অনেক দূর থেকেই চোখে পড়ে। একে তো সেদিন হাটবার নয় তার ওপরে ওই পথে কেউ আসছে মানেই সে বহুদূরের যাত্রী। সবাই উৎসুক হয়ে অচেনা আগন্তুকের আগমনের প্রতীক্ষা করতে করতে একসময় দেখতে পায়, একজন নয় দুজন অচেনা ঘোড়সওয়ার প্রবল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে। গ্রামে প্রবেশ করেই তারা জানতে চায় রাজার বাসভবনের দায়িত্বে কে নিয়োজিত আছে।

সঙ্গেসঙ্গে খোঁজ পড়ে যায় মোহন তরফদারের। মোহন তরফদার হলো তুলপাধলাতে রাজার বিশেষ বাসভবন কাম রাজমহালের দায়িত্বে নিয়োজিত দারোয়ান কাম মালি কাম পরিচ্ছন্নকর্মী কাম রাখওয়ালা। মোহনের পূর্বপুরুষদের মনিপুরে আখচাষের ব্যবসা ছিল। পাহাড়ি ঢালে নদীর ভাঙনে নিজেদের চাষের জমিজমাসহ সব হারিয়ে তার পরিবার ত্রিপুরা রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছিল। মোহনের পরদাদার বাপ ত্রিপুরার রাজার বিশেষ সেবক হিসেবে নিয়োজিত থেকে রাজার অনুগ্রহ লাভের পর থেকে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তুলপাধলা গ্রামে রাজার বাসভবনের সেবক হিসেবে। সেই থেকে তারা রাজার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র।

তো ঘোড়সওয়ারি আগন্তুক যখন গ্রামে প্রবেশ করে মোহন তখন সকালের জলখাবার সেরে হুঁকোতে তামুক সাজাচ্ছিল। তার খোঁজ পড়তেই তামুক হুঁকো সব ফেলে সে রাজার দূতের কাছে দৌড়ে যায়। এরপর আগন্তুকদের নিয়ে রাজার বাসভবনে সেই যে প্রবেশ করে আর তাঁদের খবর নেই। রাজার একজন দূত সেদিন বিকেলেই গ্রাম থেকে প্রস্থান করে। কিন্তু গ্রামবাসীরা কিছুতেই জানতে পারেনা, হঠাৎ তাদের আগমনের হেতু কী। দূত প্রস্থান করার পরও মোহনের কোনো খবর পাওয়া যায় না। একে তো রাজামশাই এই বছর উৎসবে যোগ দেননি তার ওপরে আবার কথা নেই বার্তা নেই, কোনো আগাম খবর নেই, হঠাৎ গ্রামে রাজার দূতের আগমন, গ্রামবাসীদের নিস্তরঙ্গ জীবনে এর চেয়ে মুখরোচক বিষয় আর কী হতে পারে। চলতে থাকে নানা জল্পনা-কল্পনা।

কিন্তু কোনোটাই ফলপ্রসূ হয়না।

গ্রামবাসীদের মুখে মুখে কল্পনার পাখা চড়তে থাকে। কিন্তু সে-সময় তারা জানত না যে, গল্প তখনো শুরুই হয়নি।

রাজার দুই দূতের একজন বিদায় নিয়েছে যখন তখন তিনদিন পার হয়ে গেছে। এই তিন দিনে রাজার অপর বিশেষ দূতকে নিয়ে মোহন ঘুরে বেড়ায় তুলপাগ্রামের এখানে-ওখানে। অবশেষে সে বাকি দুইদিন কাটাল রাজার বসবাসের

বাড়ি মানে রাজমহলা আর গ্রাম থেকে বেশ অনেকটা তফাতে একেবারে ধলার পাহাড় আর নদীর কূলঘেঁষে থাকা চমৎকার নিরিবিলি আর শান্ত এক টুকরো জমি পরিদর্শন করে। বেশ কিছু মাপজোখ করে বেড়াল সে কয়েকদিন। কয়েকদিন জমি পরিদর্শনের পর প্রস্থান করল রাজার দুই দূতের দ্বিতীয়জন।

এর কিছুদিন পরেই হঠাৎ গ্রামের পাশে তেপান্তরের পথে আবারও দেখা দেয় ধুলো। প্রথমে একটা, তারপর দুটো, তারপর বেশ অনেকগুলো। মানে বিরাট কোনো যাত্রীবাহিনী আসছে। উৎসুক গ্রামবাসীদের ভিড় জমে উঠতে সময় লাগে না। কিন্তু তাদের ভিড় ভেদ করে তীরের মতো সামনে এগিয়ে যায় মোহন। সে তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বরণ করে নিয়ে আসে বিশেষ বাহিনীকে। মোহনের সঙ্গে গ্রামে প্রবেশ করা বিশেষ বাহিনীকে দেখে চোখ কপালে ওঠে গ্রামবাসীর। বাহিনীই বটে তবে কোনো মানুষের বাহিনী নয় জিনিসপত্রের বিরাট বহর প্রবেশ করে গ্রামের প্রবেশপথ দিয়ে। একে একে আটটা বড়ো-বড়ো ঘোড়ায় টানা মালবাহী গাড়ি গ্রামে প্রবেশ করে গিয়ে থামে যেখানে রাজার দূতেরা মাপ জোখ করেছে সেই জায়গার কাছাকাছি। প্রায় সারাদিন লেগে যায় তাদের জিনিসপত্র নামিয়ে অস্থায়ী ছাউনি নির্মাণ করে সেগুলোকে জায়গামতো রাখতে। রাতে বিশ্রাম নিয়ে পরদিন গ্রামবাসী জেগে ওঠার আগেই প্রস্থান করে তারা। এরপরের দিন গ্রামে প্রবেশ করে একদল নির্মাণশ্রমিক। জোরেসোরে কাজ শুরু হয় সেই জমিতে।

এবার গ্রামবাসীদের মনের কল্পনা শুধু পাখনাই মেলে না, বরং পাখনার সঙ্গে তারা একে একে জুড়ে দিতে থাকে ছোটোছোটো পাখি থেকে শুরু করে হাতি ঘোড়া, এমনকি ড্রাগন পর্যন্ত। কেউ বলে ওখানে বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে তুলপা নদীর পানির স্রোত ঠেকানোর জন্য, কেউ বলে ওখানে দুর্গ নির্মাণ করা হবে। কেউ আবার বলে ওখান দিয়ে আসলে পরিখা খোঁড়া হচ্ছে পাশের রাজ্য আক্রমণের জন্য। কিন্তু এত জল্পনা-কল্পনার কেন্দ্রে যে-মানুষটা, যে সব জানে সেই মোহন কিন্তু একেবারে চুপ। পেটে বোমা মেরেও তার মুখ দিয়ে একটা কথাও কেউ বের করতে পারেনি। তাকে প্রশ্ন করলে স্রেফ একটাই জবাব পাওয়া যায়, 'অপেক্ষা করো সব জানতে পারবে।' গ্রামবাসীরা প্রথমে অধৈর্য হয়, তারপর অপেক্ষা করে! তারপর আবারও অধৈর্য হয়ে যখন অস্থির হয়ে ওঠার দ্বারপ্রান্তে তখন একদিন গ্রামের মোড়ল গ্রামবাসীদের সবাইকে ডেকে নিয়ে বসে বটতলায়।

আগে বলা হয়নি, তুলপা গ্রামের যে-প্রান্তে রাজমহলা তার বিপরীত দিকে ধলার পাহাড় আর তুলপা নদীসংলগ্ন গ্রামের কৌণিক প্রান্তে একটা বিরাট বট গাছ আছে। সেটা কত পুরনো কেউই জানে না। এই বটগাছের নিচে বসেই তুলপা

গ্রামের সমস্ত আয়োজন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের সমাবেশ পর্যন্ত সব করা হয়ে থাকে। তো গ্রামের মোড়ল গ্রামের সবাইকে ডেকে রীতিমতো ঘোষণার সুরেই জানায় যে, রাজার কাছ থেকে বিশেষ ফরমান এসেছে, তার একজন অতিথি আসছেন যিনি এখন থেকে তুলপাধলা গ্রামেই বসবাস করবেন, তার জন্যই ওই জমিতে নির্মাণ করা হচ্ছে এক বিশেষ বাড়ি। এবার গ্রামবাসীদের জল্পনা নতুন পথে মোড় নেয়। শুরু হয় রাজার এই বিশেষ অতিথিকে নিয়ে আলোচনা। কেউ বলে রাজার অতিথি নাকি বিরাট জাদুকর, কেউ বলে বিরাট দরবেশ। এমনকি ধর্মপ্রচারক-বৈদ্য কোনোটাই বাদ যায় না। আবার এমন আলোচনাও চলে যে, রাজার অতিথি আসলে ভয়ংকর কোনো রোগে আক্রান্ত এ-কারণেই এই অখ্যাত গ্রামের এক প্রান্তে এসে বসবাস করতে চাইছে সে।

গ্রামবাসীদের আলোচনা চলতে চলতেই শেষ হয়ে আসতে থাকে পাহাড়ের কোলে নির্মাণাধীন বাড়ির কাজ। বাড়ির কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর গ্রামবাসীরা একটু হতাশই হয়। রাজার বিশেষ অতিথির বাড়ি শুনে তারা ভেবেছিল না জানি কী বাড়ি বানানো হবে, কিন্তু বাড়ি নির্মাণ হওয়ার পর দেখা গেল খুবই সাধারণ একটা বাড়ি বানানো হয়েছে। গ্রামবাসীরা যেমন বাড়িতে থাকে হয়তো তার চেয়ে অনেক ভালো, তবে আহামরি কিছুই নয়। বাড়ির কাজ সমাপ্ত হওয়ার কয়েকদিনের ভেতরেই গ্রামে পা রাখে রাজার বিশেষ অতিথি।

এবার গ্রামবাসীদের একেবারে হতাশ হতে হয়না। রাজার অতিথি রাজার মতোই। লম্বা-চওড়া বিরাট আকৃতির সুদর্শন দাড়িওয়ালা মানুষটা গ্রামে পা রাখে, বলতে গেলে একাই। তাকে বহন করেও নিয়ে আসে একটা মাত্র গাড়ি। সঙ্গে কয়েকজন কাজের লোক ছাড়া তেমন কেউ নেই। এমনকি নেই তেমন কোনো পাহারাদার। রাজার অতিথি গ্রামে পা রেখে সরাসরি চলে যায় তার জন্য নির্মাণাধীন বাড়িতে। ওখানেই বসবাস করতে শুরু করে সে।

ধীরে ধীরে গ্রামবাসীদের জল্পনা-কল্পনার মাত্রা কমে আসতে থাকে। কারণ রাজার অতিথি একেবারেই নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করতে থাকে নিজের বাড়িতে। তার কিংবা তার সঙ্গের লোকজনের কোনো উচ্চবাচ্য নেই। গ্রাম থেকেই তার লোকের খাবার সংগ্রহ করে। কিছুদিন পার হয়ে যাওয়ার পরও অতিথিকে নিজের বাড়ি কিংবা এর আশপাশে ছাড়া কেউই বাইরে বের হতে দেখেনি। তবে তার কাজের লোকেরা খাবারসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে করতে ধীরে ধীরে মিশে যেতে থাকে গ্রামের লোকজনের সঙ্গে। আর অতিথির কাজের লোকদের থেকেই গ্রামবাসীরা অতিথির সত্যিকারের পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারে। রাজার অতিথি আসলে একজন দরবেশ যাকে স্থানীয় ভাষায় সন্ত বলা হয়ে থাকে।

গ্রামের লোকজন রাজার অতিথির উপস্থিতি মেনে নিয়েই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায়। রাজার অতিথি আর তার লোকেরাও নিজেদের উপস্থিতির তেমন কোনো জানান না দিয়েই নিস্তরঙ্গভাবে জীবন যাপন করতে থাকে। প্রথম কিছুদিন নিজের বাড়ির অভ্যন্তরে কাটালেও রাজার অতিথি ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হতে শুরু করে। কখনও খুব ভোরে আবার কখনো সে নিজের মতোই অলস বিকেলে একা একা হেঁটে বেড়ায় ধলার পাহাড়ের পাদদেশে, আবার কখনো তুলপা নদীর তীরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীর পানির দিকে তাকিয়ে থাকে। কখনো তাকে দেখা যেতে থাকে নদীর তীরে বসে নিজের মতো নানা ধরনের দস্তাবেজ নিয়ে পড়ে থাকতে।

তুলপা নদীর পানির মতো নিস্তরঙ্গ বয়ে যেতে থাকে গ্রামবাসীদের জীবন। রাজার অতিথিকে নিয়ে কিছুদিন সময় ভালোই কেটেছে তাদের। এখন আবার ফসলের কাজ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত লম্বা সময় কাটানোর অপেক্ষা। এমন সময় একদিনের ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা আবারও উত্তেজনার সঞ্চার করে তাদের স্বাভাবিক জীবনে। কিন্তু এবারের উত্তেজনার কারণটা বেশ খুশির। হঠাৎই গ্রামের মোড়ল ঘোষণা দিয়ে জানায়, রাজার অতিথি, যাকে তারা এত দিনে সন্ত বলে ডাকতে শুরু করেছে সে নাকি গ্রামবাসীদের সামনে পুথি পাঠ করে শোনাবে। পুথি ব্যাপারটা বাঙ্গাল মুল্লুকসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকাতে বেশ জনপ্রিয় হলেও ত্রিপুরায় অতটা জনপ্রিয় নয়। তাই মোড়লের ঘোষণা শুনে সবাই বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বহু জল্পনা-কল্পনার পর অবশেষে আসে সেই দিন যেদিন সন্ত তাদের পুথির গল্প শোনাবে। কোনো এক সুন্দর চাঁদনি রাতে সন্ধ্যের খাওয়া শেষ করে মোড়লের নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রামবাসীরা একত্রিত হয় তুলপা নদীর তীরের সেই বটতলায়।

গ্রামবাসীরা একত্রিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই রাজার অতিথি নিজের একান্ত কাছের দুজন মানুষকে নিয়ে হাজির হয় বটতলায়। এই প্রথমবারের মতো গ্রামবাসীরা সন্তকে সামনাসামনি দেখতে পায়। মানুষটার চেহারা অবশ্য দেখার মতো। বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ, ফরসা গায়ের রং। মুখে লম্বা দাড়ি আর মাথার লম্বা কোঁকড়ানো চুল ঝুঁটি করে পেছনে বাঁধা। মাথায় আরব দেশীয়দের মতো কাল টুপি। বটতলায় পৌঁছে সে খুব একটা ভনিতা না করে বসে যায় স্বীয় পুথির দস্তাবেজ সাজিয়ে। সবার অনুমতি নিয়ে সুললিত কণ্ঠে পড়তে শুরু করে সে।

প্রায় ঘণ্টাখানেকের মতো সময় একটানা সে পড়ে যেতে থাকে এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধার কাহিনি। আফগান আর চৈনিক বংশোদ্ভূত সাহসী যোদ্ধা কীভাবে উত্তর থেকে এসে নিজের বাহিনী নিয়ে দখল করে নিতে থাকে একের পর এক রাজ্য সেই গল্প। যোদ্ধার সাহসিকতা, হিংস্রতার মোড়কের ভেতরে তার সংবেদনশীল দুঃখী জীবনসহ সবই উঠে আসতে থাকে সন্তের গল্পে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যেতে থাকে গ্রামবাসীরা। সন্ত যেদিন গল্প পড়তে শুরু করে সেদিনই গ্রামবাসীরা অনুধাবন করতে পারল তাদের জীবনে বড়ো একটা পরিবর্তন সূচিত হতে চলেছে। কিছু একটা যেন বদলে যেতে বসেছে। সামনে তারই আভাস যেন তারা দেখতে পায় সেদিন।

আর বাস্তবেও যেন তেমনটাই ঘটে। পরবর্তী কয়েক মাসে তারা প্রথমে উপভোগ করতে থাকে সন্তের গল্প, তারপর আচ্ছন্ন হতে শুরু করে তার গল্পের আবহে। তারপর ধীরে ধীরে নেশার মতো আক্রান্ত হয়ে যায় সন্তের গল্পর মোহে। সপ্তাহের নির্দিষ্ট একটি দিন সন্ত সেই বটতলায় বসে নিজের সুললিত কণ্ঠে পড়ে যেতে থাকে অসাধারণ সব গল্প। ঠাণ্ডা থাক, গরম থাক, ঝড় থাক আর বাদল থাক-নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে গ্রামবাসীরা সবাই উপস্থিত হয়ে যায় গল্প শোনার জন্য।

সন্তের গল্প বলার ধরন থেকে শুরু করে তার গল্পের বিষয়বস্তুতেও যেন রকম ফেরের কোনো অভাব নেই। যদিও তার প্রায় সব গল্পই আবর্তিত হতে থাকে রাজা, রাজপরিবার আর রাজ্যের বড়োবড়ো বিষয় নিয়ে। ব্যতিক্রম কেবল সেখানে নয়। ব্যতিক্রম তার গল্পের বিষয়বস্তুতে। কখনো তার গল্পের বিষয়বস্তু যুদ্ধ, কখনও তার গল্প একজন ক্ষমতাবান পিতার অসহায়ত্বের, যে-পিতা নিজের সন্তানকে সুস্থ করে তুলতে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। আবার কখনো তার গল্পের বিষয়বস্তু পাগলাটে এক সম্রাট যে কিনা সব হারিয়েও আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সব হাসিল করতে সমর্থ হয় কিন্তু পরাজিত হয় পাঠাগারের সিঁড়ির কাছে। এমন ধারায় একের পর এক বলে যেতে থাকে সব রাজরাজা আর তাদের জীবনের অদেখা সব কাহিনি।

তুলপাধলার মানুষেরা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। এসব মানুষ দুনিয়ার কোনো খবর রাখে না। দুনিয়ার খবর রাখার চাইতে নিজেদের ফসলের খবর রাখতেই তারা বেশি পছন্দ করে কিন্তু এই সন্তের গল্প যেন তাদের জীবনে ভিন্ন এক মাত্রা নিয়ে এসেছে। নিয়ে এসেছে ভিন্ন এক আনন্দ, যে আনন্দের খোঁজ তারা এর আগে

কখনো পায়নি। রাজা আর রাজ্য বলতে তাদের চিন্তাভাবনা সীমাবদ্ধ ছিল একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে। রাজা বলতে তারা আজ অবধি দেখে এসেছে শুধু ত্রিপুরার রাজাকে।

সন্তের গল্পের মাধ্যমে তাদের সামনে খুলে গেছে এমন এক ভুবন যে ভুবনে প্রতিফলিত হতে দেখছে একেবারেই ভিন্ন এক রাজা-রাণি আর তাদের রাজকীয় জীবন। যে-জীবনেও সাধারণ দশজন মানুষের মতোই সমস্যা আছে। তাঁদেরও রয়েছে হাসি আনন্দ, দুঃখ-বেদনা আর আর দশজন পিতা-মাতা কিংবা সন্তানের মতোই আহাজারি। পার্থক্য শুধু, তাদের এসব কিছুই মোড়ানো থাকে রাজকীয় আদলে। রাজপরিবারের মানুষরাও যে আর দশজন মানুষের মতোই এটা তারা কখনো তুলপাবাসীরা ভেবেও দেখেনি। আর এ কারণেই তারা আরো বেশি করে ভালোবেসে ফেলতে থাকে সন্ত আর তার গল্পগুলোকে।

শুরু থেকেই তারা সন্তের গল্প বিমুগ্ধ হয়ে শুনে আসছে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে সে যে গল্প বলে চলছে সেটা যেন গ্রামের মানুষের মনের ভেতরে এক ভিন্ন মাত্রায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এটাও এক রাজার গল্প। তবে আগেরগুলোর মতো যেন নয়। এ যেন ভিন্ন এক যুবরাজের গল্প। যে যুবরাজ নিজের রাজ্য না পেয়ে জীবন উৎসর্গ করেছে দূরের এক রাজ্যের মানুষদের জন্য। আর এ কারণে যুবরাজের প্রজা না হয়েও প্রজার চেয়ে বেশি ভালোবেসে ফেলেছে তারা যুবরাজকে। যুবরাজের জীবন ভালোই কাটছিল। সব সুখ আর শান্তি তো আর চিরস্থায়ী নয় তাই এই যুবরাজের জীবনেও ঘটনার প্রবাহ নিয়ে এলো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মোড়, যে মোড় বদলে দিল তাকে। আর এই বদলে যাওয়াই সর্বনাশের সূচনা করল তার জীবনে।

হঠাৎই রাজ্যের রাজা মানে যুবরাজের পিতা অসুস্থ হয়ে পড়ে। নিজের বাকি ভাইদের মতো সেও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তবে নিজের বাবার সুস্থতা নিয়ে নয় বরং কীভাবে রাজ্য দখল করবে সেই চিন্তায়। সুস্থ-স্বাভাবিক প্রজা অন্তঃপ্রাণ একজন মানুষ ক্ষমতার লোভে পরিণত হয় এক ক্ষমতালোভী পিশাচে। আর এখানেই ঘটে তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো অধঃপতন। আর এই অধঃপতনের মূল্যই তাকে চুকাতে হয়। প্রজাঅন্তঃপ্রাণ যুবরাজ রাজ্য আর রাজ্যের প্রজাদের কথা ভুলে গিয়ে ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত হয় ভাইদের সঙ্গে। তারপর একে একে সব যুদ্ধে পরাজিত হতে শুরু করে সে। পরাজিত হতে হতে এমন অবস্থা দেখা দেয় যে, তাকে পরিবার-পরিজন নিয়ে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হয় ভিন্ন এক রাজার দেশে।

এমনিতেই সন্তের গল্প গ্রামবাসীদের কাছে নেশার মতো। তার ওপরে সন্ত এমন দরদ দিয়ে যুবরাজের গল্প বর্ণনা করেছিল যে, পরাজিত যুবরাজের পলায়নের কথা গ্রামবাসীরা তন্ময় হয়ে শুনছিল। কিন্তু গল্পের এই পর্যায়ে এসে হঠাৎ থেমে গেল সে। চোখ তুলে তাকাল গ্রামবাসীদের দিকে।

সবাই উদগ্রীব হয়ে রইল, পরাজিত রাজার কী হলো সেটা জানতে কিন্তু কেউ কোনো প্রশ্ন করল না। বরং সবাই নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে রইল সন্তের দিকে। শীতের রাতে বটগাছের নিচে জ্বালানো হয়েছে বিরাট অগ্নিকুণ্ড। সেই আগুনের লালচে আলোয় গ্রামবাসীরা দেখল তাদের সন্ত গল্প বলতে বলতে এতটাই ডুবে গেছে গল্পের ভেতরে যে তারও চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। ভেজা চোখেই সুললিত কণ্ঠে আবারও সে বলতে শুরু করল পরাজিত যুবরাজ মানে রাজার গল্প।

কিন্তু এবার আর পুথিতে চোখ নেই তার। দৃষ্টি চলে গেছে বিরাট অগ্নিকুণ্ডের দিকে। আগুনের আলোয় যেন গল্পের মতোই প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে তার চোখ জোড়া।

প্রথম অংশ: অশ্রুপতন

অধ্যায় এক

সময়: ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ

আরাকানের রাজধানী ম্রোহঙের কাছেই এক জঙ্গলে

দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন প্রতিফলিত হচ্ছে মোঘল যুবরাজ শাহ সুজার পিঙ্গল চোখের মণিতে। বাস্তবের আগুনের চেয়ে শত-সহস্র গুন বেশি উত্তাপ ছড়াচ্ছে যেন যুবরাজের চোখের আগুন।

দেখতে দেখতে তার চোখের সামনেই ধসে পড়ল তার অস্থায়ী বাসস্থানের একাংশ। হোক না অস্থায়ী বাসস্থান। কিন্তু গত কয়েকমাস ধরে পরিবার-পরিজন নিয়ে আশ্রয় নেওয়া বাসস্থানটা এভাবে নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়াতে বুকের গহিনে একটু হলেও কষ্ট হচ্ছে যুবরাজের। কিন্তু তার অন্য কষ্টের তুলনায় এই কষ্ট কিছুই না।

আহত-রক্তাক্ত-নিঃস্ব যুবরাজ ফিরে তাকাল তার অবশিষ্ট লোকদের দিকে। প্রায় অন্ধকার জঙ্গলের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকলেও আগুনের আলোয় প্রত্যেকের চেহারা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে । সংখ্যায় তারা সব মিলিয়ে শখানেক হবে। মগ রাজার বিরাট বাহিনীর তুলনায় যেটা কিছুই নয়। আগুন থেকে চোখ সরিয়ে মোঘল যুবরাজ শাহ সুজা তার বাহিনীর অগ্রভাগে অবস্থানরত কয়েকজনের চেহারায় চোখ বুলাল। পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করে সব হারানো রক্তাক্ত-আহত-বীভৎস চেহারাগুলো দেখলেই বোঝা যায় এরা হেরে গেছে। প্রত্যেকের চেহারায় দিশাহারা ভাবের সঙ্গে যোগ হয়েছে মৃত্যুভয়।

জীবনে অসংখ্য ছোট-বড়ো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুবাদে যুবরাজ শাহ সুজা খুব ভালো করেই জানে এরকম মানুষদের নিয়ে পলায়ন সম্ভব কিন্তু যুদ্ধ জয় সম্ভব নয়।

যুদ্ধ জয় যে প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নয় এটা তারাও জানে। স্রেফ কিছুক্ষণের প্রতিরোধে নিজেদের জীবনটাকে আরেকটু প্রলম্বিত করার জন্যই তারা আশ্রয় নিয়েছে এই জঙ্গলে। আসলে তারা কিছুটা সম্মানের সঙ্গে মরতে চাইছে, এটাই উদ্দেশ্য। শাহ সুজার লোকেরাও জানে না, তারা যে আসলে কী করতে চাইছে। কিন্তু সুজা ঠিকই জানে সে কীসের জন্য অপেক্ষা করছে। সে আসলে অপেক্ষা

করছে নিজের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানুষটার পৌছানোর জন্য। শাহ সুজার নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন থেকে যে-কটা বড়ো শিক্ষা পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো, নিজের বিশ্বস্ত লোকদের ওপর ভরসা করা। মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো সেটাই করতে চাইছে সে। তবে মনের গহিন কোণে সে এটাও জানে, তার বিশ্বস্ত সুবাদার যতই তেলেসমাতিসম্পন্ন লোক হোকনা কেন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আসলে সে-ও খুব বেশি কিছু করতে পারবে না।

সুবাহ বাংলার মোঘল ভাইসরয় মহাপরাক্রমশালী মোঘল সম্রাট শাহজাহান ও মমতাজমহলের দ্বিতীয় পুত্রসন্তান শাহ সুজার সর্বনাশের সূচনা হয়েছিল আসলে ১৬৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে, যখন সে অকস্মাৎই পিতা সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতা কাম তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে অস্থির হয়ে উঠেছিল। গত চারটা বছর ধরে সেই অস্থিরতারই মাশুল দিতে হচ্ছে তাকে। সেই অস্থিরতার মাশুল দিতে হয়েছে তার পরিবার-পরিজনকে। সেই অস্থিরতার ক্রমধারায় সে আজ এই আরাকান রাজের রাজধানী ম্রোহঙের কাছে, নাফ নদের ক্ষীণধারার পাশে নিজের শেষ লোকলস্কর আর সম্পদ নিয়ে মৃত্যুর ক্ষণ গুনছে। নিজের শেষ লোক-লস্করের দিকে তাকিয়ে কেন জানি শাহ সুজার আজ থেকে বিশ বছর আগের সেই দিনটার কথা মনে পড়ে গেল, যেদিন সে বাঙাল মুল্লুকে পা রেখেছিল সুবাদার হিসেবে।

বাঙ্গাল মুল্লুকে পা দেওয়ার আগে এই এলাকা সম্পর্কে খুব একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল না শাহ সুজার। তাদের নিজেদের জাসুস আর খবরিদের মুখে সে বাঙ্গাল মুল্লুক সম্পর্কে যতটুকু শুনেছিল তাতে তার মনে হয়েছিল বাঙ্গাল মুল্লুক হলো সম্পদে পরিপূর্ণ একটা এলাকা, সেই সঙ্গে বিদ্রোহীদের আস্তানা। এর পেছনে কারণও ছিল। নানাজনের মুখে চিরকাল শুধু বাঙ্গাল মুল্লুকের সবুজ ফসল, দামি মসলিনের গল্প আর নানা বিদ্রোহের কাহিনিই শুধু শোনা যেত।

দিল্লি থেকে বেশ অনেকটা দূরে অবস্থিত হওয়াতে সুবাহ বাংলাতে প্রায়ই দেখা যেত দিল্লির শাসন অমান্য করে ছোট-খাটো রাজা থেকে শুরু করে জমিদাররা বিদ্রোহ ঘোষণা করত। বিশেষ করে বারো ভূঁইয়াদের ব্যাপক প্রভাবের কারণে এতে আরো বেশি অগ্নি স্ফুলন ঘটত। বারো ভূঁইয়াদের প্রধান সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে তো বিরাট যুদ্ধই হয়ে গেছে মোঘলদের। যাই হোক সেটার শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়ার পরও তার প্রভাবে প্রায়ই বিদ্রোহের ঘটনা ঘটত। যে কারণে শাহ সুজা যখন প্রথমবারের মতো এখানে এলো তখন নিজের লোকলস্কর নিয়ে বেশ প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিল।

তবে বাঙ্গাল মুল্লুকে পৌছানোর পর তার ধারণা একেবারেই বদলে যায়। প্রথমেই এখানকার সবুজে ঘেরা প্রকৃতি মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে ফেলে সুবাদার

সুজাকে। এরপরে স্থানীয় মানুষের আচার-ব্যবহার থেকে শুরু করে তাদের অতিথিপরায়ণতা শুধু তার মুগ্ধতার মুকুটে একটার পর একটা পালকই যুক্ত করে যেতে থাকে। এরপর একে একে কেটে যায় বিশটি বছর।

মাঝে দুবার বাবা সম্রাট শাহজাহানের সঙ্গে দুটো অভিযানে যাওয়া ছাড়া এই দীর্ঘ সময়ের প্রায় পুরোটা সময়ই সুজা কাটিয়েছে এই সবুজে ঘেরা বাংলার বুকে। ভালোবাসার এই এলাকার জন্য সে উজাড় করে দিয়েছে নিজেকে। বাঙ্গাল মুল্লুকে শাহ সুজার মতো ভাইসরয়, কিংবা শাসক, অথবা সুবাদার, যাই বলা হোক না কেন, এর আগে কখনোই আসেনি। সম্রাটের পুত্র হওয়ার পরও স্থাপনা নির্মাণ থেকে শুরু করে এমন কিছু নেই সে করার চেষ্টা করেনি এই মুল্লুকের মানুষদের জন্য। স্থানীয় লোকেরাও বিনিময়ে নিজেদের ভালোবাসার পাত্র কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছে যুবরাজ সুবাদারের জন্য।

যদিও ভালোবাসা, সম্মান আর সফলতম শাসনের এই মুকুটে দু-একটা শুষ্ক পালকও রয়েছে। যেমন, তার শাসন আমলে মগ আর ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের উৎপাত সে সামলাতে পারেনি। তবে সেখানেও সে নিজের চেষ্টার কমতি রাখেনি। পর্তুগিজরা যাতে জলদস্যুতা ছেড়ে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যাবসা করতে পারে সেজন্য পর্তুগিজদের বিশেষ অনুমতিপত্র 'এক নিশান' প্রদান করেছিল সে। এরপরও সে চট্টগ্রামকে আরাকান শাসন থেকে মুক্ত করতে পারেনি। তবে তার শাসন আমলেই সে পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা আর মনিপুর রাজ্যের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। নিজের শাসন আর স্থানীয় মানুষদের ভালোবাসায় মোঘল যুবরাজ তার পরিবার-পরিজন নিয়ে বেশ চমৎকারভাবেই জীবন স্রোতের তোড়ে প্রবাহিত করছিল নিজের সময়। এমন সময় ঘটে বিশেষ এক ঘটনা। মোঘল সম্রাট শাহ জাহান অসুস্থ হয়ে পড়েন দিল্লিতে।

দিনটা ছিল ১৬৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখ। যেদিন সম্রাটের অসুস্থতার খবর তার কাছে এসে পৌঁছায় সেদিনটার কথা পরিষ্কার মনে আছে শাহ সুজার। আর দশটা স্বাভাবিক দিনের মতোই প্রাত্যহিক কাজ সেরে সে দরবারে বসেছিল রোজকার বিষয়গুলো সমাধান করতে, এমন সময় দিল্লিতে নিযুক্ত বিশেষ দূত এসে জানায় সেখানে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই পুরো দরবারের সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। সম্রাটের অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়া মানে দিল্লির মসনদের ভিত কেঁপে ওঠা। আর দিল্লির মসনদের ভিত কেঁপে ওঠা মানে পুরো মোঘল সালতানাত, মানে পুরো ভারতবর্ষের ভিত কেঁপে উঠেছে। সিংহাসনে বসা সম্রাটের লৌকিক কিংবা পরলৌকিক প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম প্রশ্ন যেটা মাথায় আসে সেটা হলো, কে হতে যাচ্ছে পরবর্তী সম্রাট। নিজের লোকদের

নিয়ে আলোচনায় বসে যুবরাজ শাহ সুজা। দিল্লির সিংহাসনের প্রতি তার লোভ কোনোকালেই খুব বেশি ছিল না। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় তো ঠিক করতে হবে।

নিজের লোকদেরকে নিয়ে আলোচনায় বসে করণীয় ঠিক করার আগেই খবর এসে পৌঁছায় সম্রাট শাহজাহান আসলে মারা গেছেন, কিন্তু তার বড়ো পুত্র দারাশিকো নিজের ক্ষমতায় আরোহণ নিশ্চিত করতে পিতার মৃত্যুর খবর চেপে রেখে অসুস্থতার গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যাতে সম্রাট হিসেবে নিজের অবস্থান ঠিক করে আগেভাগেই সব গুছিয়ে নিতে পারে। কোনটা সঠিক খবর আর কোনটা যে গুজব সেটা পরখ করার কোনো উপায় ছিল না। সিংহাসনের প্রতি খুব বেশি লোভ না থাকলেও সাম্রাজ্য আর নিজের লোকদের প্রতি এক ধরনের দায়িত্ববোধ ছিল শাহ সুজার। এবার পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার আগেই খবর এসে পৌঁছায়-যুবরাজ দারা শিকো আসলে নিজের অসুস্থ পিতাকে বন্দি করে সিংহাসন দখলের পাঁয়তারা করছে। অন্যদিকে এ-ও জানা যায় যে, আরেক যুবরাজ আওরঙ্গজেব নিজের বাহিনী নিয়ে দিল্লি অভিমুখে রওয়ানা দেওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে।

এবার আর শাহ সুজা নিজেকে সামলাতে পারলনা। একদিকে খবর আর গুজবের ভিড়ে সঠিকভাবে কোনোকিছু জানা যাচ্ছে না, অন্যদিকে সালতানাত আর নিজের মানুষদের প্রতি দায়িত্ববোধের ক্ষীণ ধারাটা কাছের লোকেদের পরামর্শে তখন ক্ষমতা দখলের পরাকাষ্ঠা আর দিল্লির সিংহাসন দখলের লোভাতুর দানবে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় সে নিজের প্রধান সুবাদার তালেব তৈমূরের পরামর্শ চান। তালেব তৈমূর স্বাধীন একজন ব্যবসায়ী, সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম এলাকার বণিক সম্প্রদায়ের হর্তাকর্তা ও শাহ সুজার অন্যতম সুবাদারদের একজন। এর আগেও ফিরিঙ্গি ও ডাচ বণিকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ঝানু ব্যবসায়ী ও নৌবিদ্যায় পারদর্শী তালেব তৈমূরই ছিল সুজার সবচয়ে বড়ো পরামর্শক।

শাহ সুজা যখন নিজের লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করতে উদ্যোগী হয়েছিল তখন দুঃখজনকভাবে তৈমূর ছিল ব্যবসার কাজে বাইরে। তাকে জরুরি তলব করা হয় কিন্তু সে আসতে আসতে শাহ সুজার দরবারের লোকেরা যুবরাজকে আত্মস্থ করিয়ে ফেলে যে, এই মুহূর্তে তার দিল্লি অভিমুখে রওয়ানা দেওয়া উচিত। কাছের মানুষদের পরামর্শে সে গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত হয়। কিন্তু যুবরাজের আসলে খুব বেশি ভাববার অবকাশছিল না। কারণ মনের গোপন বাসনাগুলো সবসময়ই বড়োবড়ো তাড়নার দারাই তাড়িত হয়। সেটা রাজা হোক আর ফকির হোক, সবার ক্ষেত্রেই এক। শাহ সুজার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তৈমূর এসে পৌঁছানোর আগেই সে তার যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলে। একান্ত উপদেষ্টা ও বন্ধু তৈমূর যেদিন এসে রাজমহলে পৌঁছায় সেদিন ছিল শাহ

সুজার নিজেকে রাজা ঘোষণা করার দিন। বহু বছরের কর্মতৎপরতা সততা আর নিষ্ঠাকে এক বাক্যে জলাঞ্জলি দিয়ে শাহ সুজা সেদিন রাজমহলে নিজেকে আসলে রাজা ঘোষনা করেনি, বরং সে সেদিন নিজেসহ তার পরিবারের ধ্বংসযজ্ঞ ঘোষণা করেছিল। যাই হোক, তৈমূর যখন রাজ মহলে এসে পৌঁছায় শাহ সুজা ততক্ষণে নিজেকে মোঘল সালতানাতের সম্রাট ঘোষণা করে নিজের সভাসদদের উপস্থিতিতে নিজেই রাজমুকুট পরিধান করে ফেলেছে। তৈমূর দূর থেকেই সুজার বরণ অনুষ্ঠান অবলোকন করে। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর তৈমূর ফুসরত পায় শাহ সুজার সঙ্গে মোলাকাত করার।

নিজেকে রাজা ঘোষণা করার আনন্দে শাহ সুজা তখন বিভোর, আর তার লোকেরা আবেশে আচ্ছন্ন। উৎসবমুখর পরিববেশেই তৈমূর সুযোগ বুঝে একবার শাহ সুজাকে সাবধান করার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো কাজ হয়না। একই ঘটনা ঘটে স্বঘোষিত রাজা যখন গঙ্গা নদীতে নিজের নৌবহর সাজাতে শুরু করে। তৈমূর নিজে যোদ্ধা না হলেও নৌপথের ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে পানির যুদ্ধের বিষয়ে তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল। স্বঘোষিত সম্রাট শাহ সুজাকে সাবধান করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেও যুদ্ধে গমনরত নিজের বন্ধু সুজাকে সে হতাশ করেনি। শাহ সুজার বাহিনীকে সজ্জিত করতে নিজের সাধ্যমতো সাহায্য করে সে। বিপুল প্রস্তুতিসহ গঙ্গা নদীতে বিরাট বাহিনী নিয়ে রওয়ানা দেয় সম্রাট শাহ সুজা।

তার যাত্রা দিল্লি অভিমুখে হলেও নৌবাহিনী ঠিকই জানত দিল্লি পর্যন্ত তারা পৌঁছাতে পারবে না। এর আগেই যুদ্ধ অনিবার্য। কারণ গঙ্গার নদীপথে তার বাহিনীর দিল্লি অভিমুখে রওয়ানা দেওয়ার খবর তো আর চাপা থাকবে না। বাস্তবে হলোও তাই। গঙ্গা নদী বেয়ে রওয়ানা করা বিরাট বাহিনী বাহাদুরপুরের কাছেই সম্মুখীন হলো সুজার বড় ভাই দারা শিকোর বাহিনীর সঙ্গে। বাহাদুরপুরে দুই বাহিনীর ভেতরে যা ঘটল সেটাকে যুদ্ধ না বলে বলা উচিত পলায়ন করে প্রাণরক্ষা। দারার বাহিনীর সামনে শাহ সুজার বাহিনী দাঁড়াতেই পারল না। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে শাহ সুজার বাহিনী ফিরে এলো রাজমহলে। শাহ সুজা ছিল বাংলার সবচেয়ে সফল সুবাদারদের একজন। বাংলার পথে পথে মানুষ তার করিৎকর্মতা ও শাসক হিসেবে তার সফলতার গুণগান করে চলে, সেখানে সে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শাসনের গন্ধ পেতেই এমনভাবে ছুটে গেল যেন পাগল হয়ে গেছে।

বাহাদুরপুরের যুদ্ধে হেরে গিয়ে শাহ সুজা রাজমহলে ফিরে এলো ঠিকই কিন্তু আগের সেই ঠাণ্ডা মাথার সুশাসক শাহ সুজা ফিরে আসেনি। এবার ফিরে এসেছে যুদ্ধে পরাজিত হিংস্র আর ক্ষমতার লোভে অন্ধ একজন মানুষ। রাজমহলে ফিরেই সে আবারও দিল্লি অভিমুখে অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। তার কাছের লোকেরাও তাকে উৎসাহের সঙ্গে উসকানি দিয়ে যেতে লাগল সম্রাটের

চোখে ভালো হওয়ার জন্য। শাহ সুজার একান্ত মিত্র তৈমূর বহুবার চেষ্টা করেও তাকে কোনোকিছুই বোঝাতে সমর্থ হলো না। শাহ সুজা তোড়জোরের সঙ্গে আবারও দিল্লি অভিমুখে অভিযান চালানোর প্রস্তুতি চালিয়ে গেল।

এদিকে শাহ সুজা যখন পুনরায় দিল্লি অভিমুখে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে তখন দিল্লিতে ঘটে চলেছে আরেক নাটক। শাহ সুজা আর তার বড়ো বড়ো ভাই দারা শিকো তখন একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। এমন সময় তাদের আরেক ভাই আওরঙ্গজেব ঠিকই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজের বাহিনী গোছাতে শুরু করেছে। বাহাদুরপুরের যুদ্ধে শাহ সুজা পরাজিত হলেও দারার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতিও একেবারে কম হয়নি। বাহাদুরপুরের যুদ্ধের ধাক্কা দারা তখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এমন সময় আওরঙ্গজেব আক্রমণ চালাল দিল্লিতে। পরপর দুবার, একবার ধর্মাতের যুদ্ধে, আরেকবার সামগড়ের যুদ্ধে দারা শিকোকে পরাজিত করে আওরঙ্গজেব দখল করে নিল দিল্লির সিংহাসন। সিংহাসন দখল করে সে নিজের অসুস্থ বাপ শাহজাহানকে বন্দি করে রাখল আগ্রার দুর্গে। আগ্রার দুর্গে বন্দি শাহজাহান দুর্গের বুরুজের বন্দিখানা থেকে তাকিয়ে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর স্থাপত্য তার নিজের নির্মাণ তাজমহলের দিকে। এমনি একদিন তার বন্দিখানার দরজা খুলে গেল। সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজের পিতার জন্য বিশেষ উপহার পাঠিয়েছেন। উপহারের সঙ্গে বিশেষ বার্তা। ছোট্ট চিরকুটে সম্রাটের নিজের হাতে লেখা ছোট্ট বার্তাটি পড়ে শাহজাহান খুশিতে আন্দোলিত হয়ে উঠল। কারণ চিরকুটে ছোটো করে লেখা 'সম্রাট আওরঙ্গজেব তার পিতাকে ভুলে যায়নি, আর তাই নিজের পিতার জন্য এই ছোট্ট উপহার।' চিরকুটটা পড়ে সম্রাট খুশির সঙ্গে উপহারের ডালার ওপর থেকে আচ্ছাদন সরিয়ে সেখানে নিজের আদরের সন্তান দারা শিকোর কর্তিত মুণ্ডু দেখে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

দিল্লির তখতের এই বীভৎস খবর সুজার রাজমহলে গিয়ে পৌঁছাতে খুব বেশি সময় লাগল না। বড়ো ভাইয়ের এই বীভৎস মৃত্যু আর পিতার সঙ্গে ছোটো ভাই ও বর্তমান সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুর আচরণের খবর শুনে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠল শাহ সুজা।

অপ্রস্তুত-অর্ধপ্রস্তুত নিজের বাহিনী নিয়ে আবারও সে রওয়ানা দিল রাজধানী অভিমুখে অভিযান চালানোর জন্য। এবার তার অভিযান সদ্য নিজেকে সম্রাট ঘোষণাকারী নিজেরই ছোটো ভাই সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে।

এবার শাহ সুজার বাহিনী আওরঙ্গজেবের বাহিনীর মুখোমুখি হলো খাজোয়াতে। শাহ সুজার বাহিনী এর আগে দারার তুলনামূলক দুর্বল বাহিনীর সামনেই যেখানে দাঁড়াতে পারেনি সেখানে আওরঙ্গজেবের দুর্দান্ত শক্তিশালী বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে টিকতে পারার প্রশ্নই ছিল না। আওরঙ্গজেবের বাহিনীর

কাছে খাজোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাহ সুজা যখন অনুধাবন করতে পারল, আসলে তার বিরাট ভুল হয়ে গেছে, কিন্তু ততক্ষণে আর কিছুই করার ছিল না। একে তো যুদ্ধে তার পরাজয় হয়েছে তার ওপরে তার পশ্চাৎপদ বাহিনীর পেছনে আওরঙ্গজেব লেলিয়ে দিয়েছে তার সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাপতিদের একজন মির জুমলাকে।

একদিকে ছোটো ভাই ও সদ্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের বাহিনীর কাছে মার খেয়ে রীতিমতো কুকুরের মতো লেজ তুলে পলায়নরত, তার ওপরে আবার মির জুমলার বাহিনীর কাছে তাড়া খাওয়া শাহ সুজার বাহিনীর অবস্থা হলো ঢিল খাওয়া মৌমাছির চাকের মতো। সৈনিক থেকে শুরু করে ছোট-খাটো সেনাপ্রধান তো বটেই, এমনকি তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতিরাও তাকে ফেলে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে যেতে শুরু করল। এতদিন যারা তাকে দিনের পর দিন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য, দিল্লি অভিমুখে আক্রমণ চালাতে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছিল চূড়ান্ত পরাজয়ের সময়ে তারাই প্রথমে একে একে তাকে ছেড়ে সরে পড়তে শুরু করল।

এমন অবস্থায় কোনোমতে নিজের অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে শাহ সুজা তাণ্ডায় পৌঁছাল। ইচ্ছে খানিকটা বিশ্রাম নেওয়া, সেই সঙ্গে সম্ভব হলে যতটা সম্ভব নিজের বাহিনীকে কিছুটা গুছিয়ে নেওয়া। কিন্তু তাণ্ডায় পৌঁছে নিজের একান্ত মিত্র তৈমূরকে নিয়ে আলোচনায় বসে শাহ সুজা ও তার পরিষদবর্গ। সমস্ত হিসেব-নিকেশ সম্পন্ন করে যা বুঝতে পারল তা হলো আওরঙ্গজেব তো দূরে থাক তার পাঠানো সেনাপতি মির জুমলাকে মোকাবেলা করার মতো সামর্থ্যও তাদের নেই। যদিও তাণ্ডায় পৌঁছাতে গিয়ে ছোট-খাটো যুদ্ধে মির জুমলার বাহিনীর সঙ্গে তাদের বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ হয়ে গেছে। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে যা বোঝা যাচ্ছে তাতে এটা পরিষ্কারই মনে হচ্ছে যে, মির জুমলার সঙ্গে সরাসরি মোলাকাত হলে তাদের সবাইকে কচুকাটা হতে হবে। আর মির জুমলার তাড়া করার ধরন দেখে এটা সুস্পষ্ট যে,এটাই তার উদ্দেশ্য। আওরঙ্গজেবের নিদের্শে শাহ সুজা আর তার বাহিনীকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতেই যেন সে বদ্ধপরিকর।

এমতাবস্থায় শাহ সুজার একান্ত মিত্র তৈমূর তাকে বাঙ্গাল মুলুকের দক্ষিণ দিকে সরে যেতে পরামর্শ দিল। চট্টগ্রাম যেহেতু সরাসরি আরাকানের অধীনে সেখানে তার নিজের কিছুটা হলেও প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, সেদিক এগোলে সে কিছুটা হলেও শাহ সুজাকে সাহায্য করতে পারবে সে। কিন্তু তৈমুরের পরামর্শ না মেনে শাহ সুজা ঘোষণা করে বসল এসব যুদ্ধযুদ্ধ অনেক হয়েছে এসবের ভেতরে সে আর নেই। বিতশ্রদ্ধ সম্রাট চিরকালের মতো নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে মক্কা চলে যেতে চায়। অনেকেই বোঝালো, অনেকেই অনুনয় করল কিন্তু স্বঘোষিত সম্রাট নিজের ভাবনায় অবিচল। কেউই তার মত টলাতে পারল না। যেমন ভাবা তেমনই কাজ।

তাণ্ডা থেকে নিজের বাহিনী নিয়ে শাহ সুজারওয়ানা করল আরাকান অধিষ্ঠিত চট্টগ্রামের দিকে। তার দুদিন আগে তালেব তৈমূরর রওয়ানা দিল চট্টগ্রামে। ইচ্ছে,ওখানে গিয়ে সম্রাটের যাত্রার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখা।

শাহ সুজা নিজের বাহিনী থেকে শুরু করে পরিবার-পরিজন তো বটেই, নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে যখন চট্টগ্রামে পৌঁছালে সেখানে আরাকানরাজের প্রতিনিধি ও তৈমূর তাকে গ্রহণ করে নিল। কিন্তু সেখানে পৌঁছে সম্রাট যা শুনলো তাতে বেশ দমে গেল সে। প্রাকৃতিক অবস্থা মক্কা রওয়ানা দেয়ার জন্য ঠিক সঙ্গীন নয়। তৈমূর সম্রাটকে পরামর্শ দিল, মাস দুয়েক কিংবা যতটা সময় লাগে এখানেই অপেক্ষা করতে। সিদ্ধান্তহীনতার দোলাচালে দুলতে থাকা সম্রাট স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই খবর এলো, পিছু ধাওয়া করে আসতে থাকা মির জুমলার বাহিনী বাংলার রাজধানী ঢাকায় পৌঁছে গেছে। এবার শাহ সুজা কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই বুঝতে পারল, বাঙ্গাল মুল্লুকের মাটি তার জন্য অনেক বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। নিজের লোকদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, চট্টগ্রাম থেকে তারা আরাকানে চলে যাবে। যত দিন পর্যন্ত মক্কা রওয়ানা করার মতো অনুকূল আবহাওয়া না পাওয়া যাচ্ছে তত দিন আরাকান রাজের অতিথি হিসেবেই সে-সময়টা পার করবে সে। নিজের পরিজনদের নিরাপত্তার কথা ভেবে যে সিদ্ধান্ত সে নিচ্ছে সে সিদ্ধান্তই যে তার পরিজনসহ নিজের জন্য প্রাণঘাতী হয়ে উঠবে সম্রাট তো আর তা জানত না।

শাহ সুজা নিজের লোকলস্করসহ বিরাট বাহিনী নিয়ে আরাকান রাজের রাজধানী ম্রোহঙের কাছে পৌঁছাতেই স্বয়ং সম্রাটের দূত এসে তাদেরকে নিয়ে গেল সম্রাটের দরবারে। তবে তার দরবারের নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রাজধানীতে প্রবেশ করতে হলো সমস্ত অস্ত্র জমা দিয়ে। যদিও শাহ সুজার সঙ্গের অনেকেরই এতে আপত্তি ছিল কিন্তু এছাড়া তাদের আর কোনো উপায়ও ছিল না। যাই হোক, আরাকান রাজের দরবারে সম্রাট থানডা থুরামার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎটা হলো চমৎকার। সম্রাট তাদের প্রতিশ্রুতি দিল যেহেতু সম্রাটের নির্দেশে তারা নিজেদের সকল অস্ত্র জমা দিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করেছে সেহেতু অতিথি হিসেবে তাদের বরণ করে নিতে তার কোনো আপত্তি নেই। সেই মোতাবেক শাহ সুজাসহ সব অতিথিদের রাজধানীসংলগ্ন চমৎকার এটি বাড়ি দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে সম্রাট এটাও প্রতিশ্রুতি দিল, আবহাওয়া অনুকূল হলে সে নিজে তাদের মক্কা রওয়ানা করার জাহাজের ব্যবস্থা করে দেবে। শাহ সুজা সরল মনে সব মেনে নিয়ে সম্রাটের আতিথ্য গ্রহণ করল।

কিন্তু ভুলেও সে ভাবতে পারেনি আরাকান সম্রাটের নিয়ত ছিল একেবারেই ভিন্ন। দুশ্চরিত্র ও লোভী আরাকান সম্রাট জানত শাহ সুজার সঙ্গে ছিল ছাব্বিশটা ঘোড়ায় বহন করে নিয়ে আসা বিরাট সম্পদের পাহাড়। প্রথম দিন থেকেই

আরাকান সম্রাটের নজর ছিল সেগুলোর ওপরে। সেই সঙ্গে দুশ্চরিত্র সম্রাটের নজর পড়েছিল শাহ সুজার সুন্দরী কন্যা গুলরুখ বানুর ওপরে। কিন্তু শাহ সুজা কিংবা তার লোকেদের কেউ ঘুণাক্ষরেও আরাকান সম্রাটের কূট উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি।

রাজধানীসংলগ্ন বাড়িতে তারা বেশ নির্বিঘ্নেই বাস করতে শুরু করে। আরাকানের রাজদরবার থেকেই শাহ সুজার সঙ্গে পরিচয় মুসলিম কবি আলাওলের। শাহ সুজা নিজেও শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী। সেই হিসেবে কবি আলাওলের সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে উঠতে খুব বেশি সময় লাগেনি। কবি আলাওলকে একসময় আরাকান সম্রাটের লোকেরা দাস হিসেবে ধরে আনলেও এখন সে আরাকানের রাজদরবারে থিতু হয়ে কাব্যচর্চা করে চলেছে। সবমিলিয়ে শাহ সুজার সময়টা ম্রোহঙে একেবারে খারাপ কাটছিল না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল আরাকান সম্রাটের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কেমন জানি শুকনো ধারার মতো শুষ্ক হয়ে যাচ্ছিল। সম্রাট থুরামা আর তার লোকজনের আচরণে কোথায় যেন একটা ভিন্নতা কাজ করছিল। এমন সময় আরাকানে এসে হাজির হয় শাহ সুজার একান্ত মিত্র তৈমূর। সে এসেই আগে বাঙ্গাল মুল্লুকের খবর জানায়। যদিও মির জুমলা এখনো ঢাকায় অবস্থান করছে তবে তার জাসুসেরা ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। এমনকি তৈমূর এ-ও জানায় মোঘল জাসুসেরা আরাকানেও আছে। কারণ শাহ সুজার আরাকানে অবস্থানের যাবতীয় খবর বাঙ্গাল মুল্লুক হয়ে ঠিকই গিয়ে পৌঁছেছে মোঘল দরবারে। ওদিকের অবস্থা শুনে, শাহ সুজা তৈমূরকে এখানকার পরিস্থিতি জানায়। সব শুনে তৈমূর জানায়, হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। কারণ যত দিন মক্কা যাওয়ার মতো জলপথ খুলে না যাচ্ছে, সেই সঙ্গে জাহাজ প্রস্তুত না হচ্ছে ততোদিন তারা এখানে একরকম বন্দি। তবে সে নিজের লোক থেকে জাসুস নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা চালাবে যাতে আরাকানের দরবারের ভেতরের খবর বের করে আনতে পারে।

সেদিন বিকেল থেকে শাহ সুজার বাসস্থানে কবিতা পাঠের আসর বসেছিল। আলাওল তো বটেই এমনকি খোদ সম্রাট শাহ সুজা পর্যন্ত কবিতা পাঠ করেন সে আসরে। আরাকান সম্রাটকে নিমন্ত্রণ জানালেও প্রথমে সে বলেছিল আসবে না, কিন্তু শাহ সুজার ছোটকন্যা গুলরুখের নৃত্য-গীত পরিবেশনের সময়ে ঠিকই সে এসে হাজির হয়। যদিও সে খুব বেশি সময় অবস্থান করেনি তবুও গুলরুখের গীত পরিবেশনের ভূয়সী প্রশংসা করে বিদায় নেয় সে। কাব্যচর্চার আসর শেষে ব্যাপক খানাপিনা আর মদ্যপানের পর বহুদিন পর শাহ সুজা সেদিন খুব ফুরফুরে মন নিয়ে নিদ্রায় যান।

সেদিন রাতেই শাহ সুজার নিরস্ত্র লোকজনের ওপরে আক্রমণ করে বসে আরাকান সম্রাটের বাহিনী। রাত তখন সবেমাত্র পূর্বভাগ থেকে গভীর রাতের দিকে বয়ে চলেছে। এমন সময় আরাকানরাজের বাহিনী পূর্ণ প্রস্তুতির সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে

শাহ সুজার মহলে। শাহ সুজার লোকেরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই কচুকাটা হতে শুরু করে আরাকানরাজের বাহিনীর হাতে। বুঝে উঠতেই অনেকেই মারা গেছে। বন্দি হয়েছে পরিবারের লোকেরা। মেয়েদেরকে গণহারে ধর্ষণ করতে শুরু করেছে আরাকান রাজের বাহিনী।

এমন বীভৎস খুনোখুনি দেখে, বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞথাকা সত্ত্বেও শাহ সুজা কেমন যেন ঘোরের ভেতরে পড়ে যায়। যখন তার হুঁশ ফেরে তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করে তৈমূরের নিয়ন্ত্রণে।

শাহ সুজা যখন আরাকানে আসে তখন নিজের ব্যাবসা আর পারিবারিক কারণে তৈমূর তার সঙ্গে আসেনি। তাছাড়া মির জুমলার বাহিনীর খবরাখবর নেওয়ার জন্য হলেও বাঙ্গাল মুল্লুকে কারো না কারো থাকার প্রয়োজন ছিল। তৈমূর তার নিজের কিছু লোকলস্কর নিয়ে আরাকানে এসে পৌঁছেছে মাত্র অল্প কদিন আগে। এরইমধ্যে আক্রমণ হয় শাহ সুজার লোকদের ওপরে।

তৈমূর যদিও সামরিক বাহিনীর লোক নয় আর তার তেমন কোনো যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও নেই তারপরও যৌবনে সম্রাট শাহজাহানের সেনাবাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা তার ছিল। আর ওরকম বিক্ষিপ্ত সময়ে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নয় বরং ঠাণ্ডা মাথার একজন মানুষের প্রয়োজন ছিল। আগের দিনের কাব্যচর্চার অনুষ্ঠানের পর সবাই মদ খেয়ে প্রায় চুর হয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। এটা তার সৌভাগ্য নাকি দুর্ভাগ্য সে নিজেও জানে না কারণ সে জেগে ছিল ওই সময়। এমনিতেও তৈমূর খুব বেশি মদ্যপান করেনা, আর সেদিন একেবারেই করেনি। একে তো আয়োজনের পরেই কবি আলাওলের সঙ্গে তার জরুরি কিছু আলোচনা ছিল। অন্যদিকে আরাকানের রাজসভার ভেতর থেকে একজনের খবর নিয়ে আসার কথা ছিল। এ কারণে সে অপেক্ষায় ছিল।

আক্রমণের সময়ে সে ছিল বাড়ির পেছন দিকে। আলাওলের দেখা করার কথা ছিল সেখানে, আর তার লোকেরও। কিন্তু দুজনার কেউই আসেনি সময়মতো। আপেক্ষা করতে করতে সে যখন অস্থির সেই সময় বাড়ির সামনের অংশ থেকে ভেসে আসে মরণপণ চিৎকার। নিরস্ত্র অবস্থাতেই সে রওয়ানা দেয় বাড়ির সামনের দিকে। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে প্যেছাতে আরাকান রাজের বাহিনীর বীভৎস খুনোখুনি শুরু হয়ে গেছে। মুহূর্তের ভেতরে পরিস্থিতি বিবেচনা করে সে বুঝতে পারে যা ঘটতে শুরু করেছে সেটা ঠেকানোর মতো অবস্থায় নেই তারা। প্রথমেই সে সাবধান করে দেয় তার নিজের একান্ত কয়েকজনকে। তাদেরকে বিশেষ কিছু নির্দেশনা দিয়ে সে রওনা দেয় শাহ সুজার বসবাসের কামরার দিকে। সেখানে পৌঁছানোর আগেই বুঝতে পারে শাহ সুজা আর তার পরিবারই ছিল আরাকানিদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। সেই সঙ্গে সুজার সম্পদ। সুজার পরিবারকে ইতোমধ্যে

আরাকানিরা বন্দি করে ফেললেও আড়াল থেকে সে দেখে তাদের মাঝে শাহ সুজা নেই। সুজাকে সে খুঁজে পায় নিজের অবশিষ্ট লোকদের সঙ্গে বাড়ির শেষ ভাগে। সেখানেই সে সুজাসহ তাদের বাহিনীর বাকি কয়েকজনকে নিয়ে সে গড়ে তোলে প্রতিরোধ। প্রথমেই সুজাকে তার বিশ্বস্ত লোকজনসহ পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে বাড়িসংলগ্ন জঙ্গলে। এরপর বাকিদের নিয়ে সে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। যদিও এতে সুজার ভীষণ আপত্তি ছিল। কারণ তাতে তার নিজের লোকদেরও ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু তৈমূর তো জানে তার লোকেরা আর খুব বেশি জীবিত নেই। সেই সঙ্গে তৈমূর এটাও বুঝতে পারে বাড়িতে আগুন না লাগালে বাকিদেরকেও বাঁচানো যাবে না। তাই সুজা পাশের জঙ্গলে আশ্রয় নিতেই সে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

জঙ্গলের কিনারায় পৌঁছামাত্র শাহ সুজা দেখতে পেল তার বাসভবনে দাউ-দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে, সে বুঝতে পারল তৈমূর তার নিষেধাজ্ঞা শোনেনি। সে ঠিকই আগুন ধরিয়ে দিয়েছ বাড়িতে। সঙ্গে-সঙ্গে সে ফিরে তাকাল নিজের অবশিষ্ট লোকদের দিকে। পা কাঁপছে তার, মনে হচ্ছে যেকোনো সময়ে টলে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু তীব্র রাগ-ক্ষোভ আর অসহায়ত্বের চোটে নিজেকে একটা তোপ মনে হচ্ছে। স্রেফ সেই শক্তিতেই দাঁড়িয়ে আছে সে। নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল সে। প্রত্যেকের চেহারা বিধ্বস্ত, সেই সঙ্গে প্রিয়জনসহ সব হারানোর বেদনায় সিক্ত। শাহ সুজা নিজের হাতের তরবারির দিকে তাকাল। কোনো এক আরাকানি সৈন্যের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল সে। তার লোকদেরও অনেকের হাতে একরকম কেড়ে নেওয়া অস্ত্র অথবা লাঠিসোটা। যে যা পেয়েছে তাই উঠিয়ে নিয়েছে।

'হুজুর, আমাদের জঙ্গলের আরো ভেতরের দিকে সরে যাওয়া প্রয়োজন,' সুজার দ্বিতীয় প্রধান সেনাপতি ভাঙা গলায় কোনোমতে বলে উঠল। গলার কাছে বিরাট ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে লোকটার। এরকম ক্ষত নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে কীভাবে কে জানে।

'না আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব,' সুজার গলায় ছোট বাচ্চাদের মতো জেদ। 'এভাবে...' সুজা তার বক্তব্য শেষ করার আগেই জঙ্গলের ভেতরে কোথাও থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এলো। মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল সবাই সচকিত হয়ে উল্টো ঘুরে তাকাল সেদিকে। যার যা আছে তাই নিয়ে সম্ভাব্য শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু জঙ্গল ফুঁড়ে অন্ধকারের ভেতর থেকে উদয় হলো যে দুজন ঘোড়সওয়ার তাদের দেখে একটু শিথিল হলো তাদের সতর্ক ভাব।

দুজন সৈনিক ওদের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে সম্মানভরে সম্রাটকে কুর্নিশ করল। 'তোমরা এখানে...?'

'আমি পাঠিয়েছি ওদেরকে,' ওদের পেছনের দিক থেকে একাধিক মানুষের পায়ের আওয়াজের সঙ্গে পরিচিত বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শুনে সুজা ফিরে তাকাল সেদিকে। রক্ত-ঘাম আর কালিঝুলিতে মাখামাখি তৈমূর আর তার সঙ্গের কয়েকজনকে দেখে মানুষ বলে চেনার উপায় নেই। তবে তৈমুরের সঙ্গে নিজের প্রধান তল্পিবাহক ছইরুদ্দি আর কবি আলাওলকে দেখতে পেয়ে তাদের দিকে প্রায় ছুটে গেল শাহ সুজা।

'গুলরুখ, ওরা মা আর আদ্দিন, ওদের কী অবস্থা?' শাহ সুজার গলায় সম্রাটের সুর নয় বরং একজন সব হারানো পিতার ব্যাকুলতা।

তল্পিবাহক ছইরুদ্দি কিছু বলার আগে দুবার মাথা নাড়ল। 'সবাই সবাই শেষ... আরাকানিরা যারে পাইছে তারেই শেষ কইরা দিচ্ছে খালি... খালি এই কথাটা বলার আগে সে থেমে গিয়ে একবার তৈমূরের দিকে দেখে নিল। তৈমূরের কালিঝুলি মাখা রক্তাক্ত চেহারা পাথরের চেয়েও কঠিন। 'খালি শাহাজাদি গুলরুখ বাইচা আছে। কিন্তুক না থাকলেই ভালা আছিল। হেরে আরাকানিরা নিয়া গেছে সম্রাটের প্রাসাদে,' বলেই ছইরুদ্দি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না। কান্নায় ভেঙে পড়ল।

শাহ্ সুজা শেষ কথাটা শুনে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল তারপর প্রাণপণে চেচিয়ে উঠল। সমস্ত রাগ ক্ষোভ অসহায়ত্ব আর যন্ত্রণা আর্তনাদ হয়ে বেরিয়ে এলো তার গলা চিড়ে। চিৎকার করেই সে হাতে ধরা অস্ত্রটা তুলে ধরে সামনে এগোতে যাচ্ছিল তৈমূর এগিয়ে এসে শক্ত হাতে ধরে ফেলল তাকে। 'সম্রাট, সাবধান। আবেগের বশে আর বোকামি করার সুযোগ নেই আমাদের,' সে এক হাতে সম্রাটের অস্ত্র ধরা হাতটা ধরে আছে। অন্য হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে সম্রাটকে। এমনকি এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও সম্রাটকে অন্য কেউ স্পর্শ করার অধিকার বা সাহস কোনটাই রাখে না। 'খবরদার সম্রাট, যারা বেঁচে আছি তারাও মারা পড়ব।'

'তুমি কি বলছো তৈমূর? ওরা ওরা আমার পরিবারের সবাইকে...'

তৈমূর শক্ত হাতে সম্রাটাকে ধরে এমন এক কাজ করল যা মোঘল সালাতানাতে কেউ ভাবতেও পারে না। সে অস্থির হয়ে ওঠা সম্রাটকে শক্ত দুই হাতে ধরে প্রায় শূন্যে তুলে দুবার ঝাঁকি মারল তারপর তাকে ঠেসে ধরল একটা গাছের সঙ্গে। 'সম্রাট, আমি আগেই বলেছি আমাদের আবেগী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমি আপনাকে বহুবার বহুভাবে সাবধান করেছি, আপনি আমার কথা শোনেননি। একের পর এক ভুল করেই গেছেন আবেগের বশে। আপনার পরিবারের মৃত্যুর জন্যও আপনি নিজেই দায়ী। কিন্তু অবশিষ্ট যা আছে সেটা আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে।'

সম্রাট শাহ সুজা স্থির হয়ে ফিরে তাকাল তার দিকে। 'অবশিষ্ট আর আছে কি। আমার পরিবার শেষ, আমার সাম্রাজ্য শেষ আর রইল কী?' বলেই সে আবারও ভেঙে পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু তৈমূর শক্ত হাতে তাকে ধরে রাখল।

'আছে সম্রাট, এমনি কিছু আছে যা আপনার পূর্বপুরুষরা তিলতিল করে গড়ে তুলেছে আর আপনি সেটাকে সারাজীবন ধরে আকড়ে রেখেছিলেন যাতে একসময় সেটা আপনার মানুষের কাজে লাগে। সেটা এখনো ধ্বংস হয়ে যায়নি। আপনি জানেন। বরং সেটা শত্রুর হাতে পড়লে আরো বড় বিপদ হবে,' তৈমূর আর সম্রাটের ভেতরে চোখে চোখে কথা হচ্ছে।

'ওই আগুন,' বলে সম্রাট জ্বলন্ত বাড়িঘরের দিকে দেখাল। 'ওই আগুন সব গিলে খেয়েছে। আমার সব...'

'না সম্রাট,' তৈমূর একবার ওদেও আশপাশের সবাইকে দেখে নিয়ে বলে উঠল। 'আমি আপনার পরিবারকে বাঁচাতে পারিনি। কিন্তু আমি অন্য কিছু রক্ষা করতে পেরেছি। বাড়িসংলগ্ন গোলাঘরে লুকিয়ে রাখা বাক্সপ্যাটরাসহ সব আমি এমনভাবে রেখেছিলাম যাতে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে পারি। আক্রমণ টের পেতেই ঘোড়ায় চড়িয়ে আমার লোকেরা সেগুলো আগেই জঙ্গলের ভেতরে সরিয়ে ফেলেছে। ওই লোকদুজন,' বলে সে জঙ্গলের ভেতর থেকে আসা দুই ঘোড়সওয়ারকে দেখাল। 'ওরা সেখান থেকেই এসেছে।'

এবার সম্রাট শক্ত করে তৈমুরের জামা ধরে ফেলল। 'তুমি আমার পরিবারকে না বাঁচিয়ে...'

তৈমূরও স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সম্রাটের চোখে। 'আপনি আমাকে অনেককিছুই করতে দেননি সম্রাট। অনেক সিদ্ধান্ত আমার হাতে ছিল না, তবুও আমি চেষ্টা করতাম কিন্তু তার আগেই... সম্রাট আমাদের হাতে সময় নেই। আমার ধারণা যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে আমরা এই জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছি এটা আরাকানিরা ইতোমধ্যেই টের পেয়ে গেছে। এবার আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি কী চান। আমি আগেই বলে রাখছি, আমি সব রক্ষা করতে পারব না। হয় আমি আপনাকে বাঁচাতে পারব আর না হয়...' এরকম মৃত্যুমুখী অবস্থায় দাঁড়িয়েও তৈমূর অনুভব করল সম্রাট আসলে সম্রাটই। এমনকি বন্ধু হলেও তাকে সরাসরি সব কথা বলা যায় না। তবুও নিজেকে সে শক্ত করল। একমাত্র তারই সম্রাটকে এ কথা বলার অধিকার আছে, একমাত্র সে-ই বলতে পারবে, আর তাকে বলতে হবে।

'আপনাকে আপনার সত্তা আকাঙ্ক্ষা আর দায়িত্বের মধ্যে থেকে বেছে নিতে হবে সম্রাট। একটাকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে অন্যটার বলিদান দিতে হবে। এখন আপনাকে বেছে নিতে হবে কোনটাকে আপনি রক্ষা করতে চান। হয় আপনি বাঁচবেন আর না হয়...'

'আমার অস্তিত্বের আর কোনো দাম নেই,' বলে সে চারপাশে একবার দেখে নিয়ে ভেজা চোখের দৃষ্টি স্থির করল ধরাধামের অবশিষ্ট একমাত্র মানুষটির ওপরে, যাকে সে বন্ধু মনে করে। 'কাজেই আমার সত্তার আর কোনো দাম নেই। আমার আকাঙ্ক্ষা আর দায়িত্বটাই বেঁচে থাক, যাতে সেটা আমার মানুষদের কাজে লাগে।'

এক মুহূর্তেও জন্য তৈমূর কোনো কথা বলল না, এরকম ভয়ংকর মুহূর্তের বন্ধুসম সম্রাটের শেষ ইচ্ছেটাকে বিবেচনা করে দেখছে সে। নিজের পরবর্তী শব্দগুলো খুব সাবধানে নির্বাচন করল তৈমূর। 'সম্রাট আপনি যা বলছেন বুঝে বলছেন তো?' তৈমুরের দৃষ্টি পর্বতের মতো স্থির আর শান্ত। 'আপনি যা বলছেন সেটার ওপরেই কিন্তু আপনার জীবন...'

তৈমূর কথা শেষ করতে পারল না তার আগেই সম্রাট পুতুলের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে প্রাণপনে সামলে নিয়ে হাতের তলোয়ার ফেলে দিয়ে এগিয়ে এসে তৈমূরকে ধরে ফেলল। 'আমার সব শেষ বন্ধু, শেষ ইচ্ছেটা অন্তত শেষ হতে দিও না।'

সম্রাট আবেগে ভেসে গেলেও তৈমূর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। পাহাড়ি চিতার মতো হিংস্র আর বরফাচ্ছন্ন শৈলশিলার মতো স্থির দৃষ্টিতেই সে এখনো তাকিয়ে আছে সম্রাটের দিকে। হঠাৎই নিজের লোকদেরকে ইশারা করে প্রস্তুত হতে বলল। 'সেক্ষেত্রে সম্রাট আপনাকে আমার কথা শুনতে হবে। একমাত্র তবেই সম্ভব হবে আপনার শেষ ইচ্ছে পূরণ করা। তবে এর জন্য মূল্য দিতে হবে। অনেক অনেক চড়া মূল্য...হয়তোবা আপনার প্রাণও...' শেষবারের মতো সম্রাটের অনমুতি পেতেই সে একবার সম্রাটকে দেখে নিয়ে আরেকবার তার ছেলেকে দেখল। শেষবারের মতো সম্রাটের হাতটা তুলে ধরে হাতের মোঘল নিশানি আংটিটাতে চুমু খেল সে।

এরপর দুই হাত তুলে আবারও নিজের লোকদের দিকে ইশারা করে সবাইকে শেষবারের মতো সাবধান করে সে তার বাহিনী নিয়ে নিজের কাজ শুরু করে দিল।

***

আরাকানের রাজা থানডা থুরামার রাজ্যে তার সেনাপ্রধানই হলো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অনেকে এমনও বলে থাকে যে, রাজা স্রেফ বালক সত্যিকার অর্থে চালক হলো তার সেনাপতি। তবে বাস্তবে এই কথার কোনো ভিত্তি কখনওই পাওয়া যায়নি। তবে এটা সত্য যে রাজা থানডা আর তার সেনাপতি ম্রি অঙ দুজনের কেউই কারো চেয়ে কম না। বিশেষ করে লোভ, ক্ষমতার অপব্যবহার, নিষ্ঠুরতা আর অত্যাচারের দিক থেকে একজন অপরজনকে সহজেই পাল্লা দিতে পারে।

তবে রাজা থানডার রাজত্বে যে তার সেনাপতি ম্রি অঙের একটা দারুণ প্রভাব আছে সে ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই রাজার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে তার সেনাপতি। আর সেই সেনাপতির চাচাতো ভাই হিসেবে যথেচ্ছই ক্ষমতার প্রয়োগ আর অপব্যবহার করে থেই সেন। যেমন আজ রাতে তার ওপরে বিশেষ একটা দায়িত্ব পড়েছে। আর সেটা নিয়ে সে বেশ অস্বস্তিতে আছে এই মুহূর্তে।

গত কয়েক বছর ধরেই দিল্লির সালতানাত আর তার উত্থান-পতনের খবর এসে পৌঁছাচ্ছিল আরাকান রাজ্যে। কিন্তু এর প্রভাবে যে ভাগ্য বিড়ম্বিত স্বঘোষিত সম্রাট শাহ সুজা আরাকানে এসে পৌঁছাবে সেটা কেউই ভাবতে পারেনি। শাহ সুজা আরাকানে এসে পৌঁছানোর আগেই রাজা থানডা আর তার সেনাপতি মিলে সিদ্ধান্ত নেয় তারা শাহ সুজাকে আশ্রয় দেবে। কিন্তু এ-নিয়ে একটা বাজি খেলবে তারা। আশ্রয়ের বিনিময়ে হয় শাহ সুজা তাদের অনেক অর্থ-সম্পদ উপঢৌকন হিসেবে দেবে আর না হয় তাকে দিল্লির সম্রাট তারই ভাই আওরঙ্গজেবের হাতে তুলে দেওয়ার বিনিময়ে দিল্লি থেকে তারা অর্থ সম্পদ আদায় করবে। কিন্তু এই দুটোই যে তারা একসঙ্গে হাসিল করতে পারবে এটা কল্পনাতেও ভাবতে পারেনি।

শাহ সুজা আরাকানে আশ্রয় নেওয়ার সময় তারা দেখল শাহ সুজার সঙ্গে প্রায় ছাব্বিশটা হাতি-ঘোড়া বোঝাই করা সম্পদ আছে। সঙ্গেসঙ্গে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এগুলো তাদের দখল করতেই হবে। এছাড়াও চরিত্রহীন সম্রাটের নজর পড়ে শাহ সুজার সুন্দরী কন্যা গুলরুখ বানুর ওপরে। আর তাই সেভাবেই পরিকল্পনা চলতে থাকে যাতে সে সম্পদ আর শাহ সুজার কন্যা দুটোকেই দখল করতে পারে। কিন্তু এরই মাঝে দিল্লির প্রতিনিধির মাধ্যমে খবর এসে পৌঁছায়,দিল্লির সম্রাট জানিয়েছে শাহ সুজাকে নিকেশ করার বিনিময়ে আরাকান রাজ অনেক পুরস্কার তো পাবেই, সেইসঙ্গে ওদের সঙ্গে থাকা সবকিছুও তারা দখল করতে পারবে। তবে শাহ সুজার সঙ্গে একটা বিশেষ জিনিস থাকার কথা যেটা দিল্লি সম্রাটের চাই। বিশেষ জিনিসটা বাদে বাকি সব সম্পদ তারা রাখতে পারবে, তবে শাহ সুজাকে হত্যা করা যাবে না বরং তাকে তুলে দিতে হবে তাদের হাতে।

আরাকানরাজ খুশিতে বাগবাকুম হয়ে শাহ সুজাকে সপরিবারে নিকেশ করার পরিকল্পনা পাকা করে ফেলে। কবি আলাওলের আসর শেষে রাজার সেনাপতি ম্রি অঙের খুনে বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপরে। তার বাহিনীর ওপরে কড়া নির্দেশ ছিল সবাইকে নিকেশ করো, কিন্তু দুজনকে কিছুই করা যাবে না। প্রথমজন হলো খোদ সম্রাট শাহ সুজা। কারণ তাকে দিল্লির লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হবে অর্থের বিনিময়ে। আর দ্বিতীয় জন হলো, তার কুমারী কন্যা গুলরুখ। শাহ সুজাকে দিল্লি পাঠাতে হবে, না হলে দিল্লি থেকে একটা পয়সাও পাওয়া যাবে না।

আর গুলরুখকে চাই সম্রাট থানডার। সব নির্দেশ মেনে সেভাবেই নিজের লোকদের নির্দেশ দিয়েছে সেনাপতি ম্রি অঙ। সুজা বা রাজকুমারীর কিছু হলে সম্রাট তাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। মাঝরাতের ব্যাপক খুনোখুনির পর প্রথমেই থেই সেনের বাহিনীর লোকেরাসঙ্গে গুলরুখকে পাকড়াও করতেই সেনাপতি ম্রি অঙ নিজে তাকে নিয়ে রওয়ানা করে প্রাসাদের দিকে।

অন্যদিকে থেই সেনের ওপরে দায়িত্ব পড়ে শাহ সুজার বহন করে নিয়ে আসা সম্পদ হস্তগত করার। আজকের রাতটার ওপরে বিশেষ নজর ছিল থেই সেনের। কারণ সেনাপতির ভাই হলেও সেনাপতি থেকে সে অনেকটাই ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। সেনাপতি নিষ্ঠুরতা দেখায় প্রয়োজনে। কিন্তু থেই সেনের ব্যাপারটা ভিন্ন। সে প্রকৃতিগতভাবেই একটা নিষ্ঠুর দানব। মানুষের ওপরে অত্যাচার করে, মানুষকে কষ্ট দিয়ে সে বিশেষ মজা পায়। সে ভেবেছিল আজ রাতে যথেচ্ছ খুনোখুনি করতে পারবে। কিন্তু খোদ সেনাপতি যখন তাকে ভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দিল একটু বিরক্তই লাগছিল তার। কারণ শাহ সুজার বাসস্থান থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার করুণ আর্তনাদ ভেসে আসছিল। আর মনে-মনে সে অস্থির হয়ে উঠছিল।

তবে যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন সে বোকা নয়। এটা ঠিকই জানে আজ রাতে কেন তাকে এই বিশেষ কাজের দায়িত্ব দি ছে তার ভাই ম্রি অঙ। কারণ অর্থ সম্পদ নিয়ে বেশি লোককে সে বিশ্বাস করেনা। আর এ-কারণেই এই দায়িত্ব তার ওপরে এসে বর্তেছে। সেনাপতি নিজের লোক দিয়ে গুলরুখকে খুঁজতে যেতেই নিজের প্রায় ত্রিশজনের দলটাকে সজ্জিত করে ফেলল থেই সেন। তাদের তথ্য মতে শাহ সুজা তার সম্পদের বেশিরভাগটাই অস্তাবলে লুকিয়ে রেখেছে। নিজের লোকদেরকে নিয়ে সেদিকেই রওনা দিল সে। কিন্তু মাঝপথে যেতেই দেখতে পেল প্রাসাদে আগুন ধরে গেছে। কোনোমতে আস্তবল পর্যন্ত পৌছাতেই দেখল পুরো আস্তবলে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আক্ষেপের চোটে মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করবে নাকি নিজের হাত নিজেই চিবিয়ে খাবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই তার একান্ত লোক এসে খবর দিল আগুন লাগিয়েছে শাহ সুজার একান্ত সচিব তৈমূরের লোকেরা, তবে আগুন লাগানোর আগে বাক্সপেটরাসমেত সবকিছু তারা সরিয়ে নিয়েছে ম্রোহঙের কাছেই এক জঙ্গলে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের তরবারি বের করে লোকদের অস্ত্রসহ প্রস্তুত হতে বলল। সেই সঙ্গে নির্দেশ দিল ঘোড়সওয়ারি ও তোপবাহিনীকে খবর দিতে। আর নিজের লোকদের নিয়ে সে রওনাদিল ম্রোহঙের পাশেই জঙ্গল পথে। পথিমধ্যে একবার সেনাপতিকে সে খবরটা জানিয়ে এলো। সেনাপতি তাকে বলল পেছনের পথসহ পুরো জঙ্গল ঘিরে ফেলতে। তবে সুজার তরফ থেকে আক্রমণ না হলে সে যেন কিছু না করে।

আরো আধঘণ্টার ভেতরেই থেই সেন আর তার ঘোড়সওয়ারি ও তোপবাহিনী নিয়ে ছোট্ট জঙ্গলটাকে ঘিরে ফেলল। ঘেরা সম্পন্ন হতেই থেই সেন নেমে এলো ঘোড়া থেকে। উত্তেজনার চোটে চক চক করছে তার নিষ্ঠুর দুই চোখ।

জঙ্গলটা বেশি বড়ো না। প্রাসাদ এলাকা সংলগ্ন হয়ে গিয়ে মিশেছে নাফ নদমুখী একটা জলধারার সঙ্গে। বাঙ্গাল মুল্লুকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বড়ো রাস্তার কোণে গিয়ে মিশেছে এর অংশ। থেই সেন নেমে এসেই প্রথমে খোঁজ নিল জঙ্গল থেকে বেরুনো স্থল ও জলপথ বন্ধ করা হয়েছে কিনা। তার সৈন্যবাহিনীর প্রধান প্রতিউত্তরে জানাল পুরো জঙ্গল একেবারে নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ করে ফেলা হয়েছে। ওদের জঙ্গলটা ঘিরে ফেলতে দেখে শাহ সুজার লোকেরা আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলের ভেতরের অংশে।

মুখে নিষ্ঠুর হাসি নিয়ে থেই সেন এসে দাঁড়াল তার তোপবাহিনীর কাছে। প্রত্যেকেই নিজেদের তলোয়ার, গাদা বন্দুক আর তোপ প্রস্তুত করে টানটান হয়ে আছে। শুধু তার নির্দেশের অপেক্ষা। আর সে অপেক্ষা করছে তার বড়ো ভাই সেনাপতির। কিন্তু এই অপেক্ষা বড়োই কষ্টদায়ক। কারণ সামনেই অসহায় বন্দি, অন্যদিকে অস্ত্র প্রস্তুত। চাইলেই সে একদল মানুষকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারে। ওদের রক্ত-মাংস কীভাবে তোপের আঘাতে থেঁতলে গিয়ে মিশে যাচ্ছে মাটিতে ভাবতেই সে রীতিমতো যৌন উত্তেজনা বোধ করল। কিন্তু চাইলেও কিছু করার নেই। কারণ সেনাপতির কড়া নির্দেশ, ওপার থেকে আক্রমণ না হলে কিছুই করা যাবে না।

জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কিছু একটা উড়ে আসতে দেখল সে। তাদেরই একটা বর্শা। তার বাহিনীর কারো ক্ষতি না করে সেটা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে অন্যপাশে পড়ল। কিন্তু থেই সেনের মুখে ফুটে উঠল হাসি। এবার আক্রমণের রাস্তা খুলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের লোকদের আক্রমণ চালাতে বলল। প্রথমেই তীরন্দাজ বাহিনী এগিয়ে এলো সামনের দিকে। কিন্তু তাদের পরাস্ত থাকতে বলে সে তোপ দাগাতে বলল। প্রায় সঙ্গেসঙ্গে গর্জে উঠল পাঁচটা তোপ।

আবারও... আবারও... আবারও।

তোপের আক্রমণের শব্দ শুনে সেনাপতি ম্রি অঙ যখন জঙ্গলের কিনারায় পৌঁছাল তখনো থেই সেনের বাহিনী তোপ দেগেই চলেছে ছোট্ট জঙ্গলটাতে। আর তোপের প্রতিটি গোলা বর্ষণের সঙ্গেসঙ্গে উন্মাদের মতো হাসছে থেই সেন। নিজের ঘোড়া থেকে নেমে এক হাতে থেই সেনকে ধরে অন্য হাতে কামাঞ্চিদেরকে থামার নির্দেশ দিল সে। সপাটে দুটো চড় লাগাল সে থেই সেনকে। বড়ো ভাইয়ের চড় খেয়ে একেবারে চুপসে গেল থেই সেন।

'আমি তোকে বলেছিলাম কি!' শক্তিশালী সেনাপতির জোর ঝাঁকুনির চোটে থেই সেন বাঁশপাতার মতো কাঁপছে। 'এই সবাই চলো আমার পিছু,' বলে সে নিজের লোকদের ভেতরে মশালধারীকে সামনে রেখে পুরো দলটাকে নেতৃত্ব দিয়ে এগোতে বলল।

থেই সেনের বাহিনীর আক্রমণে জঙ্গলের একটা অংশ একেবারে ধসে পড়েছে। বড়োবড়ো অনেক গাছ পর্যন্ত টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে। জঙ্গলের আরেকটু ভেতরে প্রবেশ করতেই তারা দেখতে পেল শুরু হয়েছে রক্তের দাগ। আরেকটু এগোতেই এমনকি নিষ্ঠুর আরাকানি সেনাদের পর্যন্ত গা গুলিয়ে উঠল বীভৎস দৃশ্য দেখে। মানুষ আর মানুষ নেই। টুকরো টুকরো হাত-পা আর শরীরের টুকরো অংশের যেন মেলা বসেছে চারপাশে। থেতলানো শরীর আর নাড়িভুঁড়ি এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যেন কোনো খেয়ালি চিত্রশিল্পী ইচ্ছেমতো রং গুলিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে চারপাশে।

একহাতে অস্ত্র বাগিয়ে রক্তাক্ত বীভৎস সব লাশ ছড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সেনাপতি। একটা বিশেষ জিনিস খুঁজছে সে। আরেকটু এগোতেই তার দলের একজন চেঁচিয়ে উঠল। কাছে গিয়ে সেনাপতি দেখল লোকটা লাশের স্তূপের ভেতর থেকে একটা হাত ধরে বসে আছে। হাতটাকে আরেকটু টেনে বার করতেই দেখা গেল ছিন্নভিন্ন মুণ্ডুসহ শরীরের একটা অংশ, হারানো লাশটার হাতে একটা বিশেষ আংটি।

জিনিসটা লাশের হাত থেকে খুলে নিতে নিতে আনমনেই সেনাপতি বলে উঠল, 'শাহ সুজা,' বলেই সে ঝট করে ফিরে তাকাল নিজের ভাই থেই সেনের দিকে। 'এটা তোর ক্রিয়াকর্ম, এর ধাক্কাও তোকেই সামলাতে হবে। আমার ওপরে নির্দেশ ছিল সুজাকে জীবিত ধরার।' সেনপতির কথা শুনে থেই সেন কুঁকড়ে মুকড়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'এই সবাই ছড়িয়ে পড়, ঘোড়া আর পিপেগুলো খুঁজে বার কর। আর বাক্সগুলোও।'

বলেই তারা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। জঙ্গলের ভেতরের দিকে আরেকটু এগোতেই দেখতে পেল ঘোড়া বাহিনীর মৃত স্তূপ। মানুষের চেয়ে প্রাণীগুলোর পরিণতি হয়েছে আরো খারাপ। ক্রমাগত টানা তোপের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে সব। কিন্তু কোনো হাতির দেহাবশেষ দেখা গেল না। সেনাপতি অনুমান করল গতি কম হওয়ার কারণে ওগুলোকে সম্ভবত আস্তবল থেকে আনা হয়নি। আগুন লাগা আস্তাবলেই পুড়ে মরেছে ওগুলো। হাতি-ঘোড়া নিয়ে বেশি চিন্তা না করে সামনে এগোলো সে।

এক জায়গাতে ভেঙে পড়া বেশ কিছু কাঠের বাক্স দেখে উত্তেজনার সঙ্গে এগিয়ে গেল সে। কিন্তু ওগুলোর ভেতরে শাহ সুজার নিজের চেহারা খোদাই করে

বসানো রাশি রাশি রৌপ্যমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই নেই। এমনকি একটি স্বর্ণমুদ্রার ঢেলাও পাওয়া গেল না, বিশেষ যে জিনিসটার কথা বলা হয়েছিল সেটা তো অনেক দূরে, আর কোনো সম্পদও নেই।

কিন্তু এগুলো ছাড়া মৃত ঘোড়াগুলোর আশপাশে আর কিছু নাই। বেশ অবাক হয়েই সে নিজের লোকদেরে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে সিন্দুক, বাক্স আর পিপের খোঁজ করতে বলল। কিন্তু চারপাশের পুরো জঙ্গল চষে ফেলেও বাক্সপেটরা তো দূরে থাক শাহ সুজার নিজের বানানো রৌপ্য মুদ্রা ছাড়া মোঘলদের বিরাট ধনরাশির একটা আধলাও পাওয়া গেল না।

কিছুই না পেয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সেনাপতি ম্রি অঙ সামনে থাকা এক সৈন্যের কল্লা নামিয়ে দিল তরবারির কোপে। থেই সেন থেকে শুরু করে ভয়ে সবাই কাঁপছে সেনাপতির পাশে দাঁড়িয়ে। কল্লা নামিয়ে দিয়েও শান্তি হলো না সেনাপতির। ক্ষোভ, হতাশা, উন্মত্ত ক্রোধ চিৎকার হয়ে বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে।

***

সেনাপতি ম্রি অঙ যখন ম্রোহঙের পাশের জঙ্গলে রাগের সঙ্গে চিৎকার করে চলেছে। তখন খুব ধীর লয়ে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে জঙ্গলের সংলগ্ন জলধারা বেয়ে মূল নাফ নদের দিকে বয়ে চলেছে বেশ বড়ো আকারের একাধিক সাম্পান নৌকা। খুব খেয়াল করে দেখলে ওগুলো যেদিকে এগিয়ে চলেছে সেদিকে দূরের রাশি রাশি উত্তাল নোনা জল পাড়ি দিয়ে অন্ধকারের ভেতরে যে অস্পষ্ট আকৃতি আবছাভাবে চোখে পড়ে যেগুলোকে দিনের আলোতে দেখলে আপনি কিংবা আমি হয়তো জাহাজ বলতাম।

অধ্যায় দুই
বর্তমান সময়
পতেঙ্গা রোড এলাকা, চট্টগ্রাম

যে যাই বলুক না কেন, প্রচলিত একটা ধারণা হলো পুরুষের জন্য নারী দেহের চেয়ে বড়ো নেশা নাকি এই ধরাধামে আর নেই। কথাটা এই মুহূর্তে খুব গভীরভাবে অনুভব করতে পারছে আবীর। আড়চোখে একবার পাশে বসা মেয়েটার দিকে তাকিয়েই আবার চোখ ফিরিয়ে নিল বাইরের দিকে। চলন্ত গাড়ির জানালার কাচটা একবার নামিয়ে দিল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার জন্য।

মালিহা মেয়েটাকে মাঝে মাঝে বুঝতে পারে না আবীর। যে মেয়ে প্রায় সর্বক্ষণই কোনো না কোনো ড্রাগ সেবন করেই চলেছে সেই মেয়ের সিগারেটের ধোঁয়ায় সমস্যা হয় কীভাবে! ভাবতে ভাবতেই আবীর জানালার কাচটা একটু নামিয়ে ধোঁয়া ছাড়ার সঙ্গেসঙ্গে ছাইটাও ফেলে দিল। যদিও কাজটা বেশ দ্রুত সেরেই সে আবার জানালার কাচ উঠিয়ে দিল কিন্তু এরই মধ্যে বৃষ্টির ছিটে জানালার ফাঁক গলে ঢুকে পড়েছে ভেতরে।

আবীর ভেবেছিল বৃষ্টির ছিটে ভেতরে এসে লাগাতে মালিহা বিরক্ত হবে। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না বরং বৃষ্টির ছিটে ভেতরে এসে লাগতেই মালিহা খিলখিল করে হেসে উঠে ফিরে তাকাল আবীরের দিকে। নিশ্চয় একটু আগে সেবন করা জিনিসের প্রভাব। তবে আবীরের কাছে সেরকম কিছু মনে হলো না। বরং তার মনে হলো, মালিহার হাসির সঙ্গেসঙ্গে বাইরে তুমুল বৃষ্টি হলেও গাড়ির ভেতরটায় যেন ঝলমলিয়ে উঠল সকালের মিষ্টি রোদে। মালিহা হেসে উঠে কিছু বলতে গিয়েও কেন জানি থেমে গেল। তার দৃষ্টি চলে গেল গাড়ির ভিউ মিররে। মালিহার দৃষ্টি অনুসরণ করে আবীরও ফিরে তাকাল সেদিকে।

যদিও বাইরে ঝুমবৃষ্টি কিন্তু সেই বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই শব্দটা ভেসে আসছিল ওদের গাড়ির পেছনের সিট থেকে। আর যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এই শব্দটা বুঝতে পারবে। একটা মাত্র মাধ্যমেই এই শব্দটা সৃষ্টি হতে পারে। দুজন মানুষের চুম্বন। পেছনের সিটে বসা আবীর আর মালিহার বন্ধু শাবাব

আর জিতু নামের মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরেই মেতে উঠেছে আদিম লীলায়। অবশ্য তাদের বর্তমান অবস্থাটাকে ঠিক পুরোপুরি আদিম লীলা বলা যায় কিনা সেটা একটা আলোচনার বিষয় হতে পারে।

দুনিয়ার আর কোনোদিকে শাবাবের খেয়াল নেই। জাগতিক নেশা আর নারীদেহের স্বাদ তাকে পাগল করে তুলেছে। কিন্তু জিতু এখনো মনে হয় খানিকটা হুঁশে আছে। যে কারণে ওদের দুজনকেই ভিউ মিররে পেছনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে একটু অস্বস্তির সঙ্গে নড়ে উঠল। নিজের ঠোঁট দুটো শাবাবের কবল থেকে খানিকটা মুক্ত করেই সে এমনভাবে হেসে উঠল, লেখকদের ভাষায় যে হাসিকে বলা হয় অপ্রকৃতস্থ হাসি। হাসতে হাসতেই সে গাড়ির মেঝে থেকে নিজের পার্সটা তুলে নিয়ে ছুড়ে মারল ওদের দিকে। তারপর আবার ব্যস্ত হয়ে গেল নিজের কাজে।

জিতু ব্যাগটা ছুড়ে দিতেই উচ্চস্বরে হেসে উঠেছে মালিহা। ব্যাগটা ওদের দিকে ছুটে না এসে গাড়ির ড্যাসবোর্ডে বাড়ি খেয়ে হারিয়ে গেল মালিহার পায়ের কাছে, আর সে ফিরে তাকাল আবীরের দিকে। আবীরও মৃদু হাসছে। দুজনেই তাকিয়ে আছে দুজনার দিকে। আবীরের দিকে তাকিয়ে মালিহা এবার যে হাসিটা দিল সেটার মাত্রা আগের চেয়ে অনেক ছোটো কিন্তু এই হাসিটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো রহস্য হিসেবে উল্লেখ করা সম্ভব। মালিহার রহস্যময় হাসির জবাবে আবীরেরও সম্ভবত একইরকম একটা প্রতিউত্তর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে সে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিল রাস্তার সামনের দিকে। পৃথিবীতে কিছু সৌন্দর্য আছে যেগুলোকে সহ্য করা যায় না। মালিহার হাসিটাও অনেকটা সেরকম।

বৃষ্টির চোটে মনে হচ্ছে আকাশ ভেঙে নামবে। এরকম শীতের রাতে এমন বৃষ্টি হওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক, তবে এই বৃষ্টিই আজকে ওদের অভিযানে নতুন একটা মাত্রা যোগ করেছে। তুমুল বৃষ্টির ভেতরে ততোধিক তুমুল বেগে ছুটে চলা গাড়িটার ঘোলা কাচের ভেতর দিয়ে নিজের দৃষ্টি আর কল্পনা দুটোই পাখা মেলে ছুটতে দিল নেশায় বুদ আবীর। জীবনটাকে অনেক বেশি সুখের মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে। যদিও এই মুহূর্তে তাকে দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সত্যি কথা হলো আবীরের জীবনটা এই মুহূর্তের মতো চরম সুখী না হলেও কখনোই দুঃখী ছিল না। অন্তত টাকা-পয়সার দিক থেকে তো একেবারেই নয়। বিরাট শিল্পপতি বাবার দ্বিতীয় সন্তান সে। অঢেল টাকা-পয়সা তার বাবার। আসলে এই গাড়িতে উপস্থিত চারজনই তাই। আবীর, মালিহা. জিতু আর শাবাব চারজনেই ধনীর দুলাল ও দুলালি। অভাব কাকে বলে এরা কখনো দেখেনি জীবনে। টাকা-পয়সার চিন্তা এদের কাউকেই কখনো করতে হয়নি। বরং প্রাচুর্যকে কীভাবে আরো বেশি কাজে লাগিয়ে জীবনটাকে আরেকটু উপভোগ্য করা যায় সেটাই এদের প্রত্যেকের জীবনের প্রাত্যহিক দুঃশ্চিন্তার বিষয়।

তবে আবীর নিজেকে অনেক বেশি ভাগ্যবান মনে করে। কারণ শুধু তারা বিত্তশালী নয়, তার পরিবার বেশ সুখীও বটে। অন্য ধনীদের মতো তার বাবা পরিবারকে কখনো বেখেয়ালিভাবে ছেড়ে দেননি। বরং সবসময় ব্যবসার পাশাপাশি তার প্রাধান্য পরিবার।

কিন্তু অতি অর্থের মধ্যে আপনা থেকেই একটা অনর্থ ব্যাপার চলে আসে। যেখানে অনেক বেশি অর্থের ছড়াছড়ি সেখানে খানিকটা অনর্থ ঘটবেই। ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছে আবীরের ক্ষেত্রে। ছোটোবেলা থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থের ভেতরে বড়ো হলেও এইচএসসি পর্যন্ত আবীরের গন্তব্য ছিল স্কুল-বাসা আর বড়োজোর অত্মীয়স্বজনের বাড়ি পর্যন্ত। এছাড়া বছরে একবার পরিবারসহ তারা ঘুরতে যেত নানা জায়গায়। আবীরের জগৎটা যেমন ছিল ছোটো, তেমনি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল কম। কিন্তু একটা সময় পরে এই চিত্রটা বদলে যায়। এইচএসসি পাস করার পর আবীরের বাবা-মায়ের ইচ্ছে ছিল ছেলেকে ভর্তি করাবেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্র হিসেবে আবীর খারাপ ছিল না, কিন্তু চান্স পায়নি সে। আর তাই বাধ্য হয়েই সে ভর্তি হয় চট্টগ্রামেরই এক নামকরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর আবীরের খারাপ হওয়ার গল্পটাও শুরু হয় সেখান থেকেই।

বাংলাদেশে এখনো অনেক মানুষই মনে করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মানেই বড়োলোকের বখে যাওয়া পোলাপাইনের হ্যাংআউটের জায়গা। কিন্তু বাস্তবতার প্রেক্ষাপট এখন অনেক ভিন্ন। প্রচুর মধ্যবিত্ত তো বটেই এমনকি অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরাও এখন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। শুধু পড়েই না, অনেকেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই এমনকি বিদেশি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা টেনে বেশ ভালোভাবেই গড়ে নিচ্ছে নিজের ক্যারিয়ার। তো যাই হোক, ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর আবীরও তেমনই ছিল কিন্তু নিজের পারিবারিক অর্থের প্রকোপ থেকে সে পালাবে কোথায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রথম বছরের মাথায় তার জুটে যায় একদল বড়োলোকের দুলাল আর দুলালিদের ফ্রেন্ডসার্কেল। তাদের সঙ্গেসঙ্গেই স্রোতের মতো তার জীবনে ভেসে আসতে থাকে মাদক আর যৌনতার প্লাবন। আর ছোটোবেলা থেকে খুবই সীমিত পরিসরে বিচরণ করা আবীর মাদক আর যৌনতার মাঝে খুঁজে পায় এক ভিন্ন জীবন। আরো এক বছর পর তার পরিচয় হয় মালিহার সঙ্গে। আবীরের ভেসে যাওয়ার প্লাবনে যোগ হয় এক নতুন স্রোত।

মালিহা মেয়েটা পুরোপুরি বড়োলোকের বখে যাওয়া মেয়ে হলেও ওর মধ্যে অন্যরকম একটা ব্যাপার খুঁজে পায় আবীর। একসঙ্গে তারা অনেক জায়গায় ঘুরেছে। প্রচুর নেশা করেছে কিন্তু এর বাইরে কখনো কিছু হয়নি। যে কারণে এই

মেয়েটার প্রতি তার অন্যরকম একটা ভালোলাগা তৈরি হয়েছে। পতেঙ্গার কাছেই মালিহার বাবার একটা বাংলোবাড়ি আছে। মাঝে মধ্যেই তারা বন্ধুবান্ধব মিলে সেখানে গিয়ে বারবিকিউ পার্টি করে। আর সঙ্গে নেশা তো আছেই। ওদের সার্কেলে এই মুহূর্তে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো ইয়াবা। যদিও বাংলাদেশে এই জিনিসটা বাবা নামে বেশি পরিচিত কিন্তু ওদের ক্লোজ সার্কেলে ওরা এটাকে গাড্ডু নামে ডাকে। এই নামের উৎস কী, বা কারণ কী, কেউই জানে না। কিন্তু ওরা এটাকে এই নামেই ডাকে।

ইয়াবা সেবনের প্রক্রিয়াটা খুব গ্ল্যামারাস মনে হয় আবীরের কাছে। আয়োজন করে জিহ্বার নিচে কয়েন দিয়ে এটা সেটা করে সেবন করতে বেশ মজা। কিন্তু এক অদ্ভুত কারণে এই জিনিসটার যে নেশা হয়, খাস বাংলায় বলতে গেলে যে পিনিক হয় সেটা আবীরের ভালো লাগে না। তার কাছে সব নেশার বড়ো হলো গাঁজা। গাঁজার প্রতি তার মোহ-ভালোলাগা আর ভালোবাসা সবই অন্য রকম। আর এ কারণে ফ্রেন্ড সার্কেলে তাকে মাঝে মাঝে পচানিও খেতে হয়। কিন্তু সে পরোয়া করে না। পৃথিবীর আদিমতম এই জিনিসটার প্রতি তার মায়া অন্যরকম।

ভাবতে ভাবতেই পকেট থেকে একটা জয়েন্ট বের করে আগুন লাগাল সে। বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিয়ে আবারও কাচ একটু নামিয়ে বাইরে ছেড়ে দিল সেটা। অন্যদিনের মতো আজও তারা সন্ধ্যে হতেই মালিহার বাবার বাংলোর ছাদে দল বেঁধে গিয়ে মাল টেনেছে প্রথমে। তারপরে বাকিরা ইচ্ছেমতো গাড্ডু সেবন করলেও সে করেনি। আজ তার পরিকল্পনা ছিল একটু ভিন্ন। আজ সে মালিহাকে পেতে চায়। আর তাই তার ইচ্ছে ছিল সেবনের পর মালিহার সঙ্গে একান্তে আলাদা হয়ে যাবে। কিন্তু তার পরিকল্পনায় বাধ সাধে এই বালের বৃষ্টি। সন্ধের নামতেই ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। আর মালিহাও প্রস্তাব দেয় সে লং ড্রাইভে যেতে চায়। সঙ্গেসঙ্গে বাকিরাও হই হই করে ওঠে নেশার ঘোরে। কিন্তু বের হওয়ার সময়ে দেখা যায় শুধু আবীরই তার সঙ্গী। আবীর অবশ্য এতে খুশিই ছিল। গাড়ি বের করার ঠিক আগমুহূর্তে কোথা থেকে এসে জুটে যায় জিতু আর শাবাব। হুট করে গাড়ির পেছনে উঠে বসেই শুরু করে চুম্মাচাটি।

সময়ের সঙ্গেসঙ্গে বৃষ্টির বেগ যেন বাড়ছে আর সেই সঙ্গে বাড়ছে মালিহার ড্রাইভ করার স্পিড। জয়েন্ট টানতে টানতেই আবীর একবার ভাবল মেয়েটাকে গাড়ির স্পিড কমাতে বলবে কিনা। কিন্তু মালিহার দিকে তাকিয়ে সে চুপ মেরে গেল। মেয়েটা মুখে অদ্ভুত এক হাসি লটকে রেখে দুই হাতে প্রাণপণে হুইল ধরে আছে যেন রোলার কোস্টার রাইডে উঠেছে। 'উহ্হু,' বলে সে খুশিতে চিৎকার করে উঠেই আবীরকে দেখল, সেই সঙ্গে তার হাতে ধরা জয়েন্টটাও। 'আবীর, তুমি কি যে মজা পাও এই বালের জিনিসটা টেনে...' বলে সে জোরে জোরে হেসে উঠল।

আবীর কড়া কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল, আজ শান্ত থাকতে হবে তাকে। তবে জবাব দেওয়ার দরকার ছিল না। মালিহা হঠাৎই নিজের মুখটা বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। 'দাও তো দেখি একটা টান দিই...'

আবীর বেশ অবাক হয়েই জয়েন্টটা বাড়িয়ে দিল মালিহার দিকে। মালিহা এক হাতে হুইল চেপে ধরে জয়েন্টে থেকে ধোঁয়া টেনে নিল নিজের ফুসফুসে। মুখভর্তি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মৃদু কাশি দিয়ে সে বলল, 'নট ব্যাড,' তার দৃষ্টি এখন আবীরের দিকে। 'আবীর, আজকে আমার স্পেশাল পরিকল্পনা আছে,' সে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে সামনে। মেয়েটার কথা শুনে আবীর একটু চমকে উঠল।

ওর মতো কি মেয়েটারও তবে একই ইচ্ছে নাকি!

'তাই নাকি?' কোনোমতো বলল সে। মুখ চেপে আবারও জয়েন্ট থেকে ধোঁয়া টেনে নিয়ে জানালার কাচ গলে ওটাকে ফেলে দিল বাইরে।

'ইয়েস, স্পেশাল প্ল্যান ফর স্পেশাল ম্যান,' অতিরিক্ত নেশা করায় মালিহার গলায় কোনো ব্যালেন্স নেই, এই ফিসফিসে হয়ে যাচ্ছে কথা আবার আওয়াজ বেড়ে যাচ্ছে।

মালিহার শেষ কথাটা শুনে আবীরের বুক ধুকপুক করতে শুরু করেছে। তবে এবারও সে কিছু বলার আগেই মালিহা গাড়ির ড্যাশবোর্ডের দিকে ইশারা করল। 'ওখানে দেখো একটা মার্লবোরো অ্যাডভান্সের প্যাকেট আছে।'

'তুমি সিগারেট খাবে?' আবীরের নিখাদ বিস্ময় কারণ সিগারেট মেয়েটার দু চোখের বিষ।

'আরে বোকা ওটা আগে বের করে ওটার ভেতরে দেখো একটা জিনিস আছে,' মালিহার কথামতোই আবীর ড্যাশবোর্ড হাতড়ে প্যাকেটটা বের করে ওটার মুখ খুলেই দেখতে পেল ভেতরে হোমিওপ্যাথির শিশির মতো ছোটো একটা শিশি। ভেতরে সাদা গুঁড়ো। আবীরের হাতে জিনিসটা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল মালিহা।

'বলেছিলাম স্পেশাল জিনিস ফর স্পেশাল ম্যান। আমার কাজিন থাইল্যান্ড থেকে এনেছে জিনিসটা,' বলে গাড়ি চলাতে চালাতে মালিহা একটু সরে এলো আবীরের দিকে। 'দে কল ইট কোক,' বলেই সে আবারও সরে গিয়ে রীতিমতো চিৎকার করে উঠল, 'দ্য ফাকিং কোক।'

কোক? মনে মনে শব্দটা উচ্চারণ করেই আবীরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার মনে পড়ে গেছে জিনিসটা আসলে কী। 'কোকেন?'

'ইয়েস ফাকিং কোকেন,' বলে সে এক হাতে হুইল ধরে অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল ওর দিকে, 'হাতের উল্টোপিঠে একটু ঢেলে দাও,' আবীর তাই করতেই মেয়েটা বলে উঠল, 'এবার টেনে নাও নাক দিয়ে।' এটা না বললেও চলত-কখনো

কোকেন সেবন না করলেও হলিউডি সিনেমাতে সে বহুবার দেখেছে কীভাবে কোকেন টানতে হয়। ঠিক সিনেমার স্টাইলেই টেনে নিল সে জিনিসটা। সঙ্গেসঙ্গে মাথার ভেতরে একটা ঝটকা টের পেল সে। বড়োবড়ো করে দুবার দম নিতেই তার মনে হতে লাগল তার চারপাশে সব হঠাৎ বদলে যেতে শুরু করেছে। হঠাৎ করেই যেন সবকিছু অনেক বেশি পরিষ্কার লাগছে। মালিহার দিকে তাকিয়ে দেখল মেয়েটা গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। গাড়ির ব্যাকসিটে চুম্মাচাটির শব্দ এতক্ষণে হুটোপুটির শব্দে রূপ নিয়েছে। ওদের গাড়ি পতেঙ্গা রোড ধরে তুমুল বৃষ্টির ভেতরে ততোধিক তুমুল বেগে ধেয়ে চলেছে সামনের দিকে।

মালিহা একটা হাত বাড়িয়ে দিল আবীরের দিকে। 'আবার দাও, এবার আমি নেব।'

'নাহ,' বলেই আবীর হেসে উঠল। 'তুমি এবার আমার হাত থেকে নেবে,' বলে সে নিজের হাতের উল্টোপিঠে কোকেন ঢেলে সেটা বাড়িয়ে দিল মালিহার দিকে। মালিহা সামনে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আবীরের হাতের দিকে নিয়ে আসছে নিজের মুখটা হঠাৎই পেছনের সিট থেকে শাবাব মুখ তুলে বলে উঠল, 'এই কি করছ তোমরা?' মালিহা জিনিসটা টেনে নিয়ে পেছনে তাকাল আবীরের চোখে যেন সামনে থেকে আলোর একটা ঝটকা এসে লাগল। সেই আলোতে সে পলকের জন্য দেখতে পেল রাস্তার ওপরে একজন মানুষ। 'মালিহা,' প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল সে। মালিহাও ঝট করে সামনে তাকিয়ে লোকটাকে দেখে প্রাণপণে ব্রেক চাপল। কিন্তু একটু আগে পেছন থেকে ছুড়ে দেওয়া হ্যান্ডব্যাগটায় চাপ লেগে আটকে গেছে ব্রেকটা।

ওদের গাড়িটা প্রায় শত মাইল বেগে সেকেন্ডেরও ভগ্নাবশেষের মধ্যে গিয়ে বাড়ি মারল রাস্তার ওপরে থাকা মানুষটাকে। মানুষটার হাতে ধরা টর্চটা ছিটকে পড়ল, সেই সঙ্গে তীব্র বেগে বাম্পারের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে সে উড়ে এলো উইন্ডশিল্ডের দিকে। সঙ্গেসঙ্গে শত টুকরো হয়ে গেল সেটা। লোকটা ছিটকে পড়ল রাস্তায় আর গাড়িটা উল্টাতে উল্টাতে কোনোমতে স্কিড করে থেমে গেল রাস্তার উল্টো পাশে।

গাড়িতে অবস্থানরত তিনটে প্রাণীর ভেতরে আবীরই প্রথম নিজেকে সামলে নিল। বড়োবড়ো নিঃশ্বাস পড়ছে ওর, গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করার সঙ্গেসঙ্গে ওর শরীরটা একপাশে গিয়ে তীব্র বেগে ধাক্কা খায় সামনের ড্যাশবোর্ডের সঙ্গে। পাঁজরের একপাশে তীব্র ব্যথা টের পেলেও শরীরে হাত বুলিয়ে মনে হলো না কিছু ভেঙেছে। পাঁজরের একপাশ চেপে ধরে গাড়ির দরজায় হাত রাখতেই ওটা খুলে আবীরের শরীরের অর্ধেকটা গড়িয়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপরে। কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তার ওপরে নেমে এলো সে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির ভেতরেই গাড়ির হেড লাইটের আলোয় সে অবছাভাবে দেখতে পেল রাস্তার অন্যপাশে পড়ে আছে একটু আগে অ্যাক্সিডেন্ট করা মানুষটা।

উঠে বসার চেষ্টা করতেই বুকের একপাশের পাঁজরে খচ করে উঠল। বুকের একপাশ চেপে ধরে কোনোমতে উঠে দাঁড়াল সে। একটু এগিয়ে দেখল অ্যাক্সিডেন্ট করা মানুষটা রাস্তার একপাশে উল্টে পড়ে আছে। একটু দূরেই পড়ে আছে তার হাতের টর্চটা। কাচ ফেটে ওটা থেকে খুবই অদ্ভুত এক আলো বেরিয়ে আসছে। বুকের একপাশ চেপে ধরেই খানিকটা ঝুঁকে মানুষটাকে ডাকল। 'এই যে, এই যে,' আর কি বলবে ভেবে পেল না সে।

'লোকটা... লোকটা কি বেঁচে আছে?' পেছন থেকে ভাঙা গলা শুনতেই একটু চমকে উঠে পেছনে ফিরে সে দেখল মালিহা বেরিয়ে এসেছে গাড়ি থেকে। খুব একটা আহত না হলেও ভ্রুর ওপরে বেশ ভালোই কেটে গেছে তার। বৃষ্টির পানির সঙ্গে ক্ষত থেকে গড়িয়ে পড়া রক্তে মুখের একপাশ লালচে দেখাচ্ছে তার। 'বুঝতে পারছি না,' বলে আবীর খানিকটা ঝুঁকে মানুষটাকে সোজা করে দিল একহাতে।

বয়স্ক একজন পুরুষ মানুষ। তীব্র বৃষ্টির ভেতরে মানুষটার নাক-মুখ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। 'বেঁচে আছে? বেঁচে আছে মানুষটা?' মালিহার গলায় তীব্র আতঙ্ক। আবীর কিছু না বলে আরেকটু ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল। মানুষটার ঘাড় ও মেরুসন্ধি এমনভাবে বেঁকে আছে যেন ধনুকের ছিলা টান টান করে ধরা হয়েছে। এভাবে ঘাড় বেঁকে যাওয়ার পরও কারো পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। 'আ...আমার মনে হয়...'

আবীর তার কথা শেষ করার আগেই পেছন থেকে আতঙ্কিত গলা ভেসে এলো। 'ওহ মাই গড, এখানে কীভাবে...। ওহ শিট,' শাবাবের গলায় ভয় আর আতঙ্কের স্রোত। আবীর পেছন ফিরে দেখল শাবাব আর জিতু বেরিয়ে এসেছে গাড়ি থেকে। পেছনের সিটে থাকায় তেমন কোনো গুরুতর আঘাত পায়নি তারা।

'মালিহা ইউ বিচ, ইউ কিলড হিম,' শাবাবের পাশ থেকে জিতু বলে উঠল। কথাটা শোনার সঙ্গেসঙ্গে মালিহা ঝট করে পেছন ফিরল তার দিকে। 'আমি আমি তাকে খুন করতে যাব কেন...ইট ওয়াজ জাস্ট এন অ্যাক্সিডেন্ট। আই ডোন্ট ইভেন নো হু দ্য ফাক দ্যাট ইজ।'

'সব দোষ তোর। ওহ গড,' শাবাবকে দেখে মনে হচ্ছে তার প্যানিক অ্যাটাক হয়ে যাবে। 'এভাবে বৃষ্টির ভেতরে আজ না বেরোলেই তো... ড্যাম বিচ মালিহা, এইসব দায়িত্ব তোর।'

মালিহা অসহায়ের মতো ফিরে তাকাল আবীরের দিকে। আবীর একটা হাত তুলে তাকে শান্ত থাকতে বলল। শাবাব আর জিতু তড়বড়িয়ে আবারও কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই আবীর ধমকে উঠল। 'চুপ করো দুজনেই। যা হয়েছে হয়েছে। একা মালিহাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই,' তীব্র শব্দে বাজ পড়াতে থেমে গেল সে। 'যা

ঘটেছে আমাদের সবাইকে মিলেই সেটার মোকাবেলা করতে হবে,' ভেতরে ভেতরে তীব্র আতঙ্ক থাকলেও হঠাৎ কেন জানি আবীরের মাথাটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কে জানে কোকেনের প্রভাব কিনা। 'এখানে এক সেকেন্ডও থাকা উচিত না আমাদের। এক্ষুণি সরে পড়া উচিত। বৃষ্টির কারণে লোকজন কম হলেও এটা একটা ব্যস্ত রাস্তা। যেকোনো সময় কোনো গাড়ি চলে এলেই আমরা ফেঁসে যাব।'

'একদম ঠিক... লেটস,' জিতুর কথা শেষ হওয়ার আগেই মালিহা বলে উঠল। 'এটাকে সরাতে হবে,' তাকে কেমন জানি অপ্রকৃতস্থ মনে হচ্ছে। 'এই লোকটাকে রাস্তায় রেখে সরে পড়া ঠিক হবে না।'

'মালিহা তুই কি পাগল নাকি?' শাবাব বলে উঠল।

'না...' জিতু কিছু বলতে যাচ্ছিল আবারও মালিহা কথা বলে উঠল।

'দেখে মনে হচ্ছে লোকটা বেঁচে নেই। কিন্তু এভাবে রাস্তার ওপরে তাকে রেখে গেলে আবারও কোনো গাড়ি পিষে দেবে। বা ধাক্কা খেয়ে থেমে যাবে। এতে আমাদের পালাবার সময় কমে যাবে...

'ও ঠিকই বলেছে,' আবীর মালিহাকে সমর্থন দিল। মালিহা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল তার দিকে। 'সবাই হাত লাগাও। মানুষটাকে রাস্তার পাশের খাদে ফেলে দিলেই হবে। কেউ তাকে খুঁজে পেতে পেতে আমরা...' আবীর এগিয়ে গিয়ে মানুষটার দুটো হাত ধরেছে। কিন্তু অন্যরা সবাই যার যার জায়গায় স্থির। সে মানুষটার দুই হাত ধরে ধমকে উঠল, 'কী হলো সবার?'

আবীরের ধমকে কাজ হলো। সবাই এগিয়ে এসে হাত লাগাল। মালিহা ধরল লোকটার এক পা জিতু আরেকটা। পাশ থেকে শাবাব কোমরের কাছটায় ধরতেই আবীর এক...দুই... তিন,' গুনলো। সঙ্গেসঙ্গে সবাই মিলে উঁচু করে ধরল দেহটা। কিন্তু এক পা নড়ার আগেই নতুন একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

তীব্র হেডলাইটের আলোয় ভেসে গেল মৃতদেহটাকে আলগে রাখা সবাই। সাদা রঙের একটা গাড়ি এগিয়ে আসতে আসতে থেমে গেল ওদের থেকে গজ দশেক দূরে। সবাই জমে আছে যার যার জায়গায়। সাদা গাড়িটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো লম্বা রেইনকোট পরা একটা অবয়ব। এক টর্চ ধরা হাতের ঠিক নিচেই একটা কাল নল হেডলাইটের আলোয় চকচক করে উঠল। বৃষ্টির তীব্র নিনাদ ভেদ করে কর্কশ একটা গলা ভেসে এলো। 'পুলিশ, সবাই হাত তুলে...'

শেষ শব্দটা তীব্র বাজ পড়ার শব্দে হারিয়ে গেল। মালিহার আতঙ্কে বড়ো-বড়ো হয়ে যাওয়া চোখের দিকে তাকিয়ে আবীর ফিসফিসে গলায় বলে উঠল। 'সর্বনাশ! আমরা শেষ।'

অধ্যায় তিন

সময়ঃ ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

রামু, চট্টগ্রাম

সবকিছু শেষ হতে চলেছে আজ। কে জানে, হয়তো ভালোভাবে অথবা খারাপভাবে। শেষবারের মতো একবার ঘোলাটে তরলে নিজের প্রতিকৃতিটা দেখে নিল তালেব কিরান। মনে মনে মৃদু হেসে উঠল সে। সকল সর্বনাশের চূড়ান্ত হতে চলেছে আজ। কিংবা... পরবর্তী ভাবনাটা ভেবে শেষ করার আগেই পিঠে তীব্র শব্দে চাপড় খেয়ে একটু চমকে উঠল।

'হুমম হুমম,' বলে বিশালাকায় মানুষটা আবারও একটা চাপড় বসিয়ে দিল কিরানের পিঠে। নিজের বিচিত্র ভাষায় সে বোঝাতে চাইছে, এত চিন্তার কিছু নেই। 'সব ঠিক হয়ে যাবে,' বিশালাকায় ফিরিঙ্গি গোমেজ নিজের বিচিত্র ভাষায় যা বোঝাতে চাইছে সেটা কিরানই বলে উঠল। বলে উঠতেই বিশালাকায় ফিরিঙ্গি কিরানের পিঠে আরো দুটো চাপড় বসিয়ে দিল। তারপর শিশুর মতো সরল হেসে থলিটা দেখিয়ে ঢোক দেওয়ার ভঙ্গি করল, সে নিজে এক ঢোক পান করতে চাইছে।

কিরান মাত্র আরকের ছোটো থলিটা মুখের সামনে তুলে ধরতে যাচ্ছিল ফিরিঙ্গি গোমেজের থাবড় খেয়ে ওটা থেকে খানিকটা তরল ছলকে পড়ল ওর কাপড়ের ওপরে। আর খানিকটা গড়িয়ে পড়ল নিচে। রাগের সঙ্গে গোমেজের দিকে ফিরে তাকাল কিরান। 'বাল ঠিক হবে,' বলে ঢকঢক করে অনেকটা আরক গলায় ঢেলে দিতেই প্রথমে মুখ আরা গলার পেশি সেটাকে অগ্রাহ্য করে ঠেলে দিতে চাইল ওপরের দিকে, তারপর কড়া তরল সেই অগ্রাহ্যতাকে বেমালুম অস্বীকার করে দাবানলের মতো নেমে গেল নিচের দিকে। আনমনেই একটা ঢোক গিলল কিরান। ফিরিঙ্গি গোমেজের দিকে থলিটা বাড়িয়ে দিয়ে আবারও বলে উঠল, 'নে তুইও খা এই বালের মদ।'

ফিরিঙ্গি গোমেজ কড়াচোখে কিরানের দিকে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর নিজের বিশাল দেহ নাড়িয়ে এমনভাবে খলখলিয়ে হেসে উঠল যেন কিরান খুব মজার কিছু বলেছে। তারপর গলায় আরক ঢেলে দিয়ে তার নিজের ভাষায় কিছু

একটা বলে উঠল। বাংলা আর পর্তুগিজ মিশ্রণে নিজের জড়ানো জিহ্বার টানে সে যা বলল সেটা খুব অদ্ভুত শোনায়। কিরান কিছুটা বুঝতে পারলেও অন্য কারো সাধ্য নেই সেই ভাষা বোঝার। কারণ একে তো সে আসলে আধা বোবা তার ওপরে তার বাংলার ভেতরে কঠিন পর্তুগিজ টান। আর একারণেই কথার শুরুতে শব্দগুলো অদ্ভুতভাবে বেঁকে যায়। শুনতেও শোনায় খুব অদ্ভুত, যেমন 'গালি' হয়ে যায় 'গেলি', 'নয়' হয়ে যায় 'নেয়'। গলায় আরক ঢেলে দিয়ে খুশি হয়ে সে আবারও শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগল। কড়া আরকের নেশা যে তাকে বেশ ভালোভাবেই পেয়ে বসেছে কোনো সন্দেহ নেই।

আরকের থলিটা গোমেজের হাত থেকে কেড়ে নিল কিরান। পাগল আরেকটু মাতাল হলে একে সামলাবে কে। এমনিতেই এই মুহূর্তে সে জীবন-মরণ এক প্রশ্নের সম্মুখীন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তবুও একটা পুরনো স্মৃতি কেমন যেন ভাবাতুর করে তুলল কিরানকে। স্মৃতির পটে ঝাপসা ঝলকের মতো চোখের সামনে ফুটে উঠল লাল-সাদা পোশাক পরা বাড়ি থেকে পালানো ছিপছিপে এক তরুণের অবয়ব, গর্বিত ভঙ্গিতে একটা পা তুলে দিয়েছে জাহাজের পাটাতনের ওপরে, উঁচু গ্রীবা আর গর্বিত মস্তক, জাহাজের সামনে রাখা নিশান ছাড়িয়ে দৃষ্টি চলে গেছে দিগন্তের দিকে। চোখে মুখে অস্বাভাবিক দুঃসাহস আর মনের ভেতরে বয়ে চলেছে দুর্দান্ত এক ঝংকার, পৃথিবীকে নিজের পদতলে নিয়ে আসার এক কল্পিত বাসনা।

'হুজুর, সব তৈয়ার আছে,' পর্দার মতো করে দেওয়া চটের আবরণ সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা এক আর্দালি বলে উঠল। 'সকলেই আপনাদের জন্য অপেক্ষা কইরছে।'

চোখের সামনে ফুটে ওঠা সেই চিত্রটা আর্দালির কথায় এক লহমায় হারিয়ে গেল। বুকের ভেতর জমা হয়ে ওঠা দীর্ঘ নিঃশ্বাসটাকে আরেকটু চেপে ধরে কিরান একবার ছেলেটার উদ্দেশে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল সে যাচ্ছে। ছেলেটা বিদায় নিতেই গোমেজের হাত থেকে আরকের থলিটা একরকম কেড়ে নিল সে। তারপর অবশিষ্ট তরল গলায় ঢেলে থলিটা আবারও গুঁজে রাখল নিজের ঢোলা পায়জামায় বসানো কোমর বন্ধনির একপাশে।

আরকের নেশায় গোমেজ তার পর্তুগিজ ভাষায় কী কী জানি সব বকবক করছে সেগুলো না শুনে সে এসে দাঁড়াল কাঠের চিলেকোঠার সামনের অংশে। এখান থেকে কর্ণফুলির শাখা নদী বান্দু আর নাফ নদের মোহনাস্থলটা বেশ পরিষ্কার চোখে পড়ে। আর দুই নদীর কৌণিক মিলনস্থলে বিরাট খালি জায়গাটার পাশেই বিরাট এই খণ্ডলার মাঠ। খণ্ডলার মাঠের এক কিনারায় অবস্থিত এই অস্থায়ী কাঠের বাড়িটার চিলেকোঠার সামনে দাঁড়িয়ে পুরো মাঠটাতে একবার চোখ বুলাতে বুলাতে অভ্যাসবসত ডান হাতের তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি মুখের কাছে উঠে এলো কিরানের।

ঠোঁটের কিনারায় উঠে আসতে আসতেই বিশেষ একটা ভঙ্গিতে ভাঁজ হয়ে গেল আঙুল দুটো, বিশেষ ধরনের তেল দিয়ে পালিশ করা চোখা গোঁফের কিনারাটা বহুবারের মতো আরেকবার ঘসে দিল দুই আঙুল দিয়ে। জীবন থেকে অনেক কিছু হারিয়ে গেলেও কিরান আজও নিজের প্রিয় গোঁফ জোড়াকে ধরে রেখেছে পরমযত্নের সঙ্গে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে আনমনেই সামান্য হেসে উঠল কিরান। জীবন থেকে সবই যদি হারিয়ে যায় তবে আর বেঁচে থেকে লাভ কী। যদিও এই মুহূর্তে সেটাই সবচেয়ে কঠিন মনে হচ্ছে তার কাছে। গোঁফে তা দিতে দিতে আরেকবার পুরো খণ্ডলার মাঠে চোখ বুলিয়ে নিল কিরান। খণ্ডলার বিরাট মাঠটাকে আজকে তার স্বাভাবিক আকৃতির চাইতে একটু ছোটো মনে হচ্ছে। কারণ মাঠের দুই পাশে বসানো হয়েছে বেশ কিছু অস্থায়ী স্থাপনা। সাদা চামড়ার বাবুদের ভাষায় যাকে বলা হয় 'টেন্ট' আর ফিরিঙ্গিরা এটাকে ডাকে তাবু বলে। কাপড়ের এই বড়োবড়ো অস্থায়ী স্থাপনার ভেতরে কোনোটাতে অবস্থান করছে দূর-দূরান্ত থেকে আসা মানুষেরা আর কোনোটাতে অবস্থান করছে বিশেষ এক প্রাণী যাদের নিয়ে আজকের এই আয়োজন। আর এই পুরো আয়োজনটাই পরিচালিত হচ্ছে কিরানের নেতৃত্বে। মাঠের দিকে তাকাতেই কিরানের দৃষ্টি চলে গেল একটা বিশেষ তাঁবুর দিকে। ওটাতেই রাখা আছে তার জীবন-মরণের সবচেয়ে বড়ো বাজি, যেটা আজ তাকে হয় সব দায় থেকে মুক্ত করবে আর না হয় ধ্বংস হবে সে। তবে আজ যা-ই ঘটুক না কেন সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত আছে সে। আসলেই কী?

'গোমেজ, চল আমাদেরকে যেতে হবে,' গোঁফে তা দিতে দিতে কিরান গোমেজের রক্তলাল চোখের দিকে তাকিয়ে আনমনেই বলে উঠল।

আরকের নেশা গোমেজকে ভালোই ধরে বসেছে। অবশ্য ধরে বসেছে বললে ভুলই হবে। সে এরকমই থাকে সবসময়। কিরানের নির্দেশের জবাবে সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল যাওয়ার জন্য। এমন বিরাটাকায় একজন মানুষ এরকম শিশুর মতো হতে পারে, না দেখলে ভাবাই যায় না। আর তারচেয়ে বড়ো কথা একজন পর্তুগিজ এক বাঙালির কথা এভাবে মেনে নিয়ে সর্বক্ষণ তার কথামতো চলবে, এটা আরো অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। কিরান তার দিকে এগোতেই সে কিরানের কোমর থেকে নিয়ে আবারও আরকের থলিটা মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল কিরান টান দিয়ে সেটা ছিনিয়ে নিল তার হাত থেকে। থলির মুখটা বেঁধে নিজের কোমরবন্ধনীতে আটকে দিয়ে গোমজকে টান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

প্রায় ছয় ফিট দীর্ঘ কিরানের চাইতেই আরো প্রায় আধ ফুটখানের বেশি উঁচু গোমেজ। কিরানের উরুর মতো মোটামোটা একেকটা হাত, সেই সঙ্গে বিশাল চিতানো বুক আর আধভাঙা মুখ মিলিয়ে যেকোনো নতুন মানুষের জন্য গোমেজ

এক দানববিশেষ ছাড়া আর কিছু না। তবে তার চোখ দুটো একেবারে শিশুর মতো সরল। গোমেজকে টান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজের কোমর থেকে একটা কিরিচ খাপসহ বের করে গোমেজের কোমরে গুঁজে দিল কিরান। 'গোমেজ, আমরা নিচে যাব, কথা বলব। তুই একদম শান্ত থাকবি, মনে থাকবে?' কিরান নিজের দুই হাতে গোমেজের কালচে চুলগুলো ঠিকঠাক করে দিতে দিতে বলতে লাগল। একে একে সব হারিয়ে এই আধাপাগল গোমেজই তো আছে ওর। কিন্তু আজকের আলোচনায় গোমেজের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। সে কারণেই গোমেজকে শান্ত রাখা দরকার। কিরানের কথার জবাবে গোমেজ সামান্য হেসে মাথা নাড়ল। তার দৃষ্টি কিরানের কোমরে রাখা আরকের থলের দিকে।

নিজের তর্জনী তুলে এপাশ-ওপাশ করে মানা করতেই জিভ কেটে হেসে ফেলল গোমেজ। তার সঙ্গে হেসে উঠল কিরান। হেসে উঠে একবার তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে কাঠের দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা প্রায় সাড়ে ছয় ফিট লম্বা লাঠিটা তুলে নিয়ে হাতে ধরিয়ে দিল গোমেজের। লাঠিটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'তবে সময় হলে আমি যখন ইশারা করব তখন এটা দিয়ে...' কথাটা শেষ না করে সে গোমেজকে ইশারায় বুঝিয়ে দিল কী করতে হবে। কারণ এই কাজ এর আগেও বহুবার করেছে তারা।

গোমেজকে ঠিকঠাক করে নিজের পরিধেয় টেনে ঠিক করে নিল কিরান। তারপর মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে পরে নিল টুপিটা। গোঁফে তা দিতে দিতে গোমেজকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। কাঠের ঘর থেকে বেরিয়ে মই বেয়ে নেমে এলো নিচে। ঘরটার নিচেই খোলা বারান্দার মতো জায়গা। সেখানে ইতোমধ্যেই বেশ ভিড় জমে উঠেছে। ভিড়ের একেবারে মধ্যমণি হয়ে বসে আছে কয়েকজন মানুষ। নিজেদের ভেতরে কথা বলছিল তারা, কিরানকে দেখে চুপ হয়ে গেল সবাই। কিরান এগিয়ে যেতেই কেউ একজন একটা কাঠের কেদারা এগিয়ে দিল তার দিকে। ওটাকে টেনে নিয়ে বুক টানটান আর শিরদাঁড়া সোজা করে বসে পড়ল সে। তার কেদারার ঠিক পাশেই লাঠি হাতে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল গোমেজ।

কিরান চোখেমুখে ফুটিয়ে তুলেছে এক ধরনের অবজ্ঞার হাসি, সেই সঙ্গে যেন খানিকটা কৌতুককর ভঙ্গি। কিরানের বাবা বলত, যখন সহায় হিসেবে তোমার কিছুই নেই তখন তোমার পোশাক আর শারীরিক ভঙ্গিই হলো সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। সেটাকে ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে স্রেফ শারীরিক ভঙ্গি দিয়েই বিশ্ব জয় করা সম্ভব। কথাটা মনে আসতেই বাবার স্মৃতি পলকের জন্য বাতাসের ঝাপটার মতো বয়ে গেল ওর মাথার ভেতরে। আহা, কতদিন বাবার সঙ্গে দেখা হয় না।

'তালেব কিরান?' কিরান কেদারায় গিয়ে বসতেই সবাই চুপ হয়ে গেছিল। কারণ সবাই আশা করেছিল কিরান কিছু একটা বলবে। কিন্তু সেও চুপ থাকাতে

ওদের সামনে কেদারায় উপবিষ্টদের ভেতরে কেউ একজন সামান্য বিরক্ত হয়েই কথা বলে উঠেছে, 'উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তোমার বক্তব্য কী?'

কথাটা শুনে নিজের মাথাটাকে সামান্য ঘুরিয়ে মুখ তুলে মানুষটার দিকে তাকাল কিরান। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি মানুষটার পরনে। মাথায় বিরাট একটা পাগড়ি আর গলার সোনার মালা চকচক করছে। বিশালাকায় মানুষটার হাতে লোহা কাঠের লাঠি আর মুখে লটকানো তাচ্ছিল্যের হাসি। তার হাসিটা সত্যিকারের তাচ্ছিল্যের, কিরানের হাসির মতো আলগা নয়। চাটগাঁও এলাকার সবচেয়ে বড়ো কুঠিবাড়িগুলোর একটার মালিক সরদার পাতিল শেঠ। সাদা চামড়া থেকে শুরু করে দেশীয় সবাই তার কুঠিবাড়ির একচ্ছত্র ও নিয়মিত গ্রাহক। ইদানীং পাশ ব্যবসা হিসেবে ষাঁড়ের লড়াইয়ে টাকা খাটাতে শুরু করেছে সে। আর সেটার শুরুতেই বিবাদ লেগেছে কিরানের সঙ্গে। কিন্তু এত দিনে একবারও সে সুবিধে করে উঠতে পারেনি। এবার প্রথমবারের মতো সে মওকা পেয়েছে কিরানের চোদ্দটা বাজানোর। আর সেটা করতে যে লোকটা কোনো কসুর করবে না তা তার গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে।

সরদার পাতিল শেঠের দিকে তাকিয়ে কিরান একটা হাসি দিয়ে বলে উঠল, 'কিয়ের পরিস্থিতি আর কিয়ের করণীয়? ঠিক বুঝলাম না,' বলে সে কেদারায় উপবিষ্টদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। কিন্তু সবার চেহারায় যেরকম অভিব্যক্তি আশা করেছিল সেরকমটা না দেখে বরং কেমন জানি শত্রুভাবাপন্ন অভিব্যক্তিই বেশি চোখে পড়ল। শুধু সন্দ্বীপের লবণের কারবারি মেহরার চোখেই যেন খানিকটা ভরসা খুঁজে পেল সে। 'আজ এই এলাকায় সবচায়া বড়ো উৎসবের দিন। আমার তো বেশ আনন্দই লাগতাছে,' বলে সে হেসে ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু সামনের সবার অভিব্যক্তি দেখে হাসি বন্ধ হয়ে গেল তার।

'কিরান, ফাজলামো কইরো না,' সরদার পাতিল শেঠের পাশ থেকে আরেকজন বলে উঠল। 'আমাদেরকে বইলো না, যে পরিস্থিতি কি তুমি জানো না,' বলে একটু থেমে মানুষটা হাতের চেটো থেকে কিছু একটা তুলে মুখে পুরে যোগ করল, 'তোমার মতো চালাক মানুষ যে কিনা রাজা আর ফকির সবার বাড়ির হাঁড়ির খবরও জানে, ফিরিঙ্গি আর ইংরেজ দুই জাতশত্রুকে এক চৌপায়ায় বসিয়ে মদ পান করে, সে এত বড়ো খবর জানে না এটা খণ্ডলার হাটের ঘেঁয়ো কুত্তাও বিশ্বাস করবে না।'

কিরান মুখ তুলে তাকাল অসম্ভব শুকনো মানুষটার দিকে। শরীর তো নয় যেন কঙ্কাল। কিন্তু পরনের পরিচ্ছদ বেশ দামি। আর হবেই না বা কেন। বাঙ্গাল মুল্লুকের সেরা মসলিনের কারবারিদের একজন এই ব্রাহ্মণ পুরুত ঠাকুর। স্রেফ

লাভের মুখ দেখেই সে জাত-পাতের বারোটা বাজিয়ে লুকিয়ে এই খণ্ডলার হাটের ষাঁড়ের লড়াইয়ে নাম লিখিয়েছে। এত দিন অন্য লোক দিয়ে কাজ চালালেও আজ বিশেষ পরিস্থিতিতে জাত হারানোর ভয় থাকা সত্ত্বেও ঠিক নিজেই হাজির হয়েছে বিশেষ আলোচনায়। টাকা-পয়সার সামনে জাত-পাত অনেকটাই অসহায় হয়ে পড়ে।

মানুষটার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে কোনোমতে একটু হাসি জোগাড় করে কিরান কথা বলে উঠল। উপস্থিত সুধীতে সবাই হলো একেকটা হায়না। খণ্ডলার হাটে আজ লড়াই বন্ধ হলে এদের কিছুই আসবে-যাবে না। কারণ এদের অর্থের সীমা নেই। কিন্তু আজ লড়াই না হলে কিরানকে পথে বসতে হবে। তাই তাকে খেলতেও হবে খুব সাবধানে।

'তাই নাকি, ধীরেন শেঠ? তাইলে এত কথা না বলে আমি যা বলি সেটা শুনেন,' বলে সে সবার দিকে আরেক বার নজর বুলিয়ে নিল। একটাও বন্ধুভাবাপন্ন মুখ পড়ছে না। শুধু মেহরার চোখে কোনো ভাব নেই। তার দিকে তাকিয়ে একটু আশার আশ্রয় খুঁজলে কিরান। তারপর বলতে শুরু করল, 'হ্যাঁ, আমি অস্বীকার করব না যে, পরিস্থিতির ব্যাপারে আমি জানি। বরং যা হইছে সেটা সবার আগে আমার কানেই আসছে। আরাকানরাজ যে খণ্ডলার মাঠের মেলা আর ষাঁড়ের লড়াই দুইটাই স্থগিত করছে সেইটা আমি কেন এহন সবাই জানে। তবে আপনাদের কাছে আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। খণ্ডলার মাঠের এই লড়াইয়ের আয়োজন মেলার শেষ দিনে কেন আমরা করি? কেন একটা বছর ধইরা এর লগে সংশ্লিষ্ট সবাই মিইলা এত অর্থ ঢাইলা আমরা এতগুলা প্রাণের অপচয় করি?'

কিরানের কথার কোনো জবাব নেই। সবাই চুপচাপ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। একেকজনের চেহারায় একেক ভাব, তবে সবার চোহারায় সেই পুরনো দোদুল্যমানতা। সবারই মনে একই ভাবনা; অর্থের অপচয়, নাকি প্রাণ ক্ষয়? কোনটা মুখ্য? কারণ এই বৃহত্তর চাঁটগাঁ শাসিত আরাকানরাজের নির্দেশের বরখেলাপ মানে সব হারানো তো বটেই এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

'কারণ আমরা যা করি,' আগের কথার জের ধরে কিরান বলে চলল। 'সেইটা আদতে প্রাণক্ষয় না, বরং সাধারণ মানুষের মনে প্রাণের জোয়ার আইনা দেয়। সারাটা বছর ধইরা মানুষ অপেক্ষা করে এই লড়াইয়ের। আর স্রেফ রাজদরবারের গুজব শুইনা আমরা সারাটা বছরের বিনিয়োগ আর মানুষের আনন্দ উপেক্ষা কইরা সব বন্ধ কইরা কেন বাড়ি চইলাযাব?' এখনো সবাই চুপ। বাতাসে ভারী হয়ে ঝুলে আছে দ্বিধা আর সিদ্ধান্তহীনতার দোদুল্যমানতা।

'আমরা ব্যবসায়ী, নিজেগো রক্ত আর ঘামের ফসল আমরা এমনে নষ্ট হইতে দেব? আপনারা সবাই বলতাছেন আরাকানরাজ খণ্ডলার মেলা আর ষাঁড়ের লড়াই দুইটাই স্থগিত করেছে। এইটা এহনও স্রেফ শোনা কথা। নাকি কোনো দাপ্তরিক ঘোষণা আসছে? কই সেই ফরমান? কোথায় সেই ঘোষণাপত্র? কেউ দেখছেন আপনারা?'

কিরানের শেষ কথাটা উচ্চারিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জটলার পেছন থেকে উড়ে এলো গোল করে মোড়ানো কিছু একটা। জিনিসটা উড়ে এসে পড়ল কিরানের একেবারে সামনে। উপস্থিত জনতার প্রায় সবার দৃষ্টি ঘুরে গেল জিনিসটা উড়ে আসার উৎসের দিকে। কাঠের চালাটার প্রবেশপথের কাছে একাধিক লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা-চওড়া দাড়িওয়ালা একর্জন সুপুরুষ। আসকানের পোশাক পরনে মানুষটার। লম্বা পোশাকের প্রান্ত যেখানে হাঁটু ছুঁয়েছে তার নিচ থেকে বেরিয়ে আছে সিল্কের পায়জামার ঝুল। এক হাতে পালিশ করা কাল কাঠের লাঠি আর অন্য হাতটা এখনো শূন্যে ধরে রাখা। ওই হাতেই যে সে ক্ষণকাল আগে জিনিসটা ছুঁড়েছে যে দেখলেই বোঝা যায়।

গোল করে মোড়ানো জিনিসটা উড়ে এসে পড়তেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার বসে ওটা তোলার জন্য হাত বাড়িয়েছিল কিরান। কিন্তু উপস্থিত মানুষটাকে দেখে একটু চমকে উঠল সে। আশপাশের মানুষদের ফিসফিসে গুঞ্জন শুনে বুঝতে পারল শুধু সে না, প্রায় সবাই চমকে উঠেছে উপস্থিত ব্যক্তিকে দেখে।

'সুবাদার চাচা আপনে?' কিরানের মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে গেল। সুবাদার আকরাম বেগ চাঁটগা এলাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী সুবাদারদের একজন। তবে কিরানের জন্য এটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়, সুবাদার আকরাম বেগ তারা বাবার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। উপস্থিত জনতার ভেতরে শুধু কিরান নয়, সবারই অবাক হওয়ার পেছনে অন্যতম একটা কারণ হলো এই খণ্ডলার হাটে এই এলাকার সবচেয়ে বড়ো ষাঁড়ের লড়াইয়ে সুবাদার আকরাম বেগের ষাঁড় লড়াইয়ে নামানো হয়- এরকম একটা গুজব ভেসে বেড়ালেও সেটার সত্যতা যাচাইয়ের সাহস কারো হয়নি। কিন্তু সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এরকম একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সুবাদার নিজে হাজির হয়ে যাবেন খণ্ডলার মাঠে, এটা কেউ ভাবতে পারেনি।

'তোলো ওইটা,' সুবাদার আকরাম বেগ এগিয়ে আসতে আসতে কিরানের দিকে তাকিয়ে লাঠি উঁচিয়ে জিনিসটা ওঠানোর নির্দেশ দিল। সে এগিয়ে আসতেই একাধিক লোক নিজেদের তেপায়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এগিয়ে এসে একটা তেপায়া টেনে বসে পড়ল আকরাম বেগ।

কিরান তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জিনিসটা তুলে নিল নিজের হাতে। সামান্য ঝাড়া দিয়ে গোল করে মোড়ানো জিনিসটার এক প্রান্তে বাঁধা সুতোটা ধরে টান

দিতেই খুলে গেল ওটা। স্রেফ একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই কিরান বুঝতে পারল জিনিসটা আরাকান রাজের দাপ্তরিক ফরমানের একটা লিপিকৃত রূপ। কিরানের জন্য ওটা আসলে দাপ্তরিক ফরমান নয়, ওর ধ্বংসলিপি।

জিনিসটা অন্যদেরও চোখে পড়েছে, সঙ্গেসঙ্গে শুরু হয়ে গেছে ফিসফিসানি। কিরান বহুকষ্টে নিজেকে সামলালো। চোখ তুলেই দেখতে পেল আকরাম বেগ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'বলো ছোকরা, কি এইটা?'

'খণ্ডলার মেলা আর ষাঁড়ের লড়াই বন্ধের লাইগা আরাকানরাজের দাপ্তরিক ফরমান,' কিরানের এক নিঃশ্বাসে বলা কথাটা যেন বোমার মতো বিস্ফোরিত হলো ওর চারপাশের মানুষদের ভেতরে। জিনিসটা কী জানা মাত্রই সবার ভেতরে ফিসফিস শুরু হয়ে গেছে। এর কারণও অজানা নয়। হয়তো এই ফরমানের ফলে কিরান পথে বসবে, তবে অন্যদের ভেতরে অনেকে পথে না বসলেও অর্থের অঙ্কে ক্ষতির মাত্রাটা তাদের জন্যও একেবারে কম হবে না। তাই বাতাসে হতাশার ফিসফিসানি।

'সবাই চুপ,' আকরাম বেগ নিজের লাঠিটা সামান্য উঁচিয়ে ধমকে উঠতেই সবাই চুপ হয়ে গেল। 'বলো ছোকরা, কথা বলো। সবাই বলে তালেব কিরান নাকি এই এলাকার সবচেয়ে চালাক লোক, দেখি এই পরিস্থিতিতে কী সমাধান দেয় সে,' আকরাম বেগ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিরানের দিকে।

কিরানও তাকিয়ে ছিল আকরাম বেগের দিকে। তার প্রশ্নটা শুনে আপনাতেই ওর দৃষ্টি নেমে গেল নিচের দিকে। দুবার মুখ খুলল সে, কথা বলার জন্য কিন্তু কোনো আওয়াজ বেরুলো না। কিরানের মনে পড়ে গেল আজ থেকে তিন বছর আগে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যখন সে বাড়ি ছেড়েছিল আকরাম বেগ নিজ থেকেই ওকে ডেকে নিজের নৌ-ব্যবসার হাল ধরতে বলেছিল। জল-জীবনে বিপর্যস্ত কিরান তখন আকরাম বেগের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেছিল বেশ রূঢ়ভাবেই। আর আজ কিনা আবারও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই আকরাম বেগেরই মুখোমুখি হতে হয়েছে ওকে। হে খোদা! এ তোমার কেমন বিচার? ধর্মে অবিশ্বাসী কিরান আনমনেই ভেতরে ভেতরে বলে উঠল কথাটা। দুনিয়াবি কর্মপন্থা যখন শূন্যে অসার, স্রষ্টাই তখন আশ্রয়ের আধার।

'শূন্য থেইকা আসে মানুষ, শূন্যে মিলাই যায়,শূন্য থেইকা ঘুইরা দাঁড়ায়, শূন্যতেই জীবন সাজায়,' ফিসফিস করে বলা আকরাম বেগের কথাগুলো শুধু কিরানেরই কানে পৌঁছাল, সঙ্গেসঙ্গে ঝট করে মুখ তুলল সে। কিন্তু তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আকরাম বেগ আবার কথা বলে উঠল, 'দেখা যায় এলাকার সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষটার জবান বন্ধ হইয়া গেছে,' তার কথা শুনে এরকম বাজে

পরিস্থিতিতেও হেসে উঠল অনেকে। অতি চালাক কিরানকে অপদস্ত হতে দেখে মজা পাচ্ছে অনেকে। আকরাম বেগ হাত তুলতেই আবারও সবাই থেমে গেল। 'আমি আপনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কারণ এখন আর স্বীকার করতে দ্বিধা নাই যে, আমিও এই হাটের লড়াইয়ে টাকা খাটাইতাম। আপনাদের যেমন সব ডুবছে আমারও তাই। তবে এখনো শেষ রক্ষা করার একটা উপায় আছে আমার কাছে।'

সবাই আশায় ফিরে তাকাল তার দিকে। কিন্তু আকরাম বেগ কারো কথা না শুনে বলে চলেছে। 'আপনারা কি কেউ জানেন কী কারণে হঠাৎ আরাকানরাজ এই খণ্ডলার হাটের লড়াই বন্ধ করার ফরমান জারি করল?' সবাই চুপ। হয় কেউ জানে না, আর না হয় সুবাদারের সামনে ভুলভাল খবর বলে ঝাড়ি খেতে চাইছে না। 'এই ছোকরা তুমি জান?'

কিরান মাথা নাড়ল। যদিও গতকাল রাতেই ওর কাছে খবর এসে পৌঁছেছে যে, আরাকানরাজ লড়াই বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে কিন্তু কেন, সেই কারণ সন্ধান করার মতো সময় পায়নি কিরান।

'সম্রাট শাহ সুজা আরাকানরাজের হাতে নিহত হইছে, সপরিবারে,' আকরাম বেগের কথাটা যেন বোমার মতোই বিস্ফোরিত হলো সবার মাঝে। গুঞ্জন করে উঠল সবাই। একেক জন নানা প্রশ্নে জর্জরিত করতে চাইল সুবাদারকে।

'নিজের অতিথিরে এইভাবে...?

'আহা সম্রাট কদিন আগেই এদিক দিয়া গেলেন, উনার...'

'সবাই কি মারা গেছে?'

'সুবাদার সাহেব আপনি কি...' পাতিল শেঠ কিংবা লবণের কারবারি কারো প্রশ্নেরই জবাব দিল না সুবাদার আকরাম বেগ। বরং নিজের লাঠি জোরে ঠুকে দিল মাটিতে। 'কি হইছে, কেন হইছে, কিছুই জানা যায়নি এহনও। তবে এইটা নিশ্চিত যে সম্রাট মৃত্যুবরণ করছেন। নিজের অতিথিরে নিজের আয়ত্তের ভেতরে খুন করছে আরাকানরাজ,' শেষ কটা কথা আকরাম বেগের মুখ দিয়ে তীব্র ঘৃণার সঙ্গে বেরিয়ে এলেও সে অসম্মানজনক কিছু বলল না, কিংবা কোনো গালি দিল না।

'তাহলে সম্রাট আওরঙ্গজেব কি...'

'এইমুহূর্তে কিছুই বলা সম্ভব না। হয়তো মোঘলগরলগে আরাকানরাজের সংঘাত আসন্ন। হয়তো ফিরিঙ্গিরা কিংবা মগরা মিলা কিছু একটা করব। আসলে কী হবে কেউই জানে না। তবে আমি এইটা বলতে পারি, এই অবস্থায় খণ্ডালের মাঠের মেলা কিংবা লড়াইয়ের ওপরে আরাকান রাজের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকব না। যে কারণে আরাকান রাজ এটা বন্ধের ঘোষণাপত্র পাঠাইছে। তবে,' বলে সে একটা আঙুলতুলল। 'এখানেই আমি শেষ বারের মতো একটা ঝুঁকি নিতে চাইছি।

আরাকানরাজের যে অবস্থা তাতে ফরমান জারি করলেও হাটের ওপরে নিয়ন্ত্রণ করার মতো অবস্থা বা পরিস্থিতিতে ওরা নাও থাকতে পারে। আর এ কারণেই আমরা লড়াই জারি রাখব।'

সবাই তাকিয়ে আছে সুবাদারের দিকে। সে কী বলতে চাইছে বোঝার চেষ্টা করছে। 'তবে সেইটা সীমিত পরিসরে। যেইখানে সূর্য মাথার ওপরে উঠলে লড়াই হতো সেইখানে এহনই আমরা লড়াই শুরু করব। শুধু বিশেষ বিশেষ ষাড়গুলোর ভেতরেই লড়াই হইবে। আর বেলা পড়তির আগেই লড়াই শেষ কইরা আমরা মেলার পাততাড়ি গুটায়ে ফেলব, যাতে আরাকানরাজের বন্ধের ফরমানের বাস্তবিক প্রয়োগের আগেই অন্তত সমস্ত লগ্নি করা অর্থ উইঠা আসে। মানুষও বিনোদন পায়। আর সেই সঙ্গে আপনারাও সব হারানোর হাত থেইকা বাঁচেন,' শেষ কথাটা সে বলেছে কিরানের দিকে তাকিয়ে।

কিরান মনের গহিনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আকরাম বেগের পরের কথাটা শুনে চমকে উঠল সে। 'কিন্তু এইখানে একটা ব্যাপার নিশ্চিত করতে হইবে। কোনো প্রাণহানি হওয়া চলবে না। আর এই দায়িত্ব নিতে হইবে কিরানরে,' বলে সে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে যোগ করল 'কিরানরে লড়াইয়ের মাঠে থাকতে হইবে, ওরে দস্তকের ভূমিকা পালন করতে হবে,' আকরাম বেগের কথা শেষ হতেই কোনো এক অদ্ভুত কারণে হেসে উঠল কিরানের পছনে দাঁড়ানো গোমেজ। মাটিতে দুবার লাঠি ঠুকে সে নিজের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটাল।

আর কিরান অনুভব করল তার শুকনো গলাটা আরো শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেছে। এখন মনে হচ্ছে যা ঘটতে চলেছে তার চেয়ে আর্থিক ধ্বংসই ভালো ছিল। তাতে অন্তত প্রাণটা বাঁচত, এবার তো ধনে-প্রাণে দুটোতেই মরতে হবে।

অধ্যায় চার

বর্তমান সময়

আফতাব নগর, রামপুরা, ঢাকা

'যদি প্রাণে বাঁচে চাস সত্যি কথা বল, তুই না বলেছিলি আগের জায়গাতেই হচ্ছে?' প্রশ্নটা সামনের দিকে তাকিয়ে করলেও নিজের আর-সেভেন রেসিং হোন্ডা বাইকটা সামলে নিয়ে বাইকের সাইড মিররের পেছনের আরোহীর চোখের দিকে তাকাল শারিয়ার। যদিও পেছনের সিটে বসা আরোহী তার দিকে তাকিয়ে নেই, বরং সে আতিপাতি করে খোঁজার চেষ্টা করছে একটা জটলা, যাতে নিজের কথার যথাযথ প্রমাণ রাখতে পারে সে শারিয়ারের কাছে। কিন্তু মানুষ তো দূরে থাক আফতাব নগর আর মেরাদিয়ার কোণে অবস্থিত নির্জন মাঠের মতো আধা-অন্ধকার জায়গাটায় একটা কুকুর পর্যন্ত নেই।

'কি হলো, কথা বলিস না কেন? এখানে তো একটা কুত্তা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না,' যদিও জায়গাটা বেশ অন্ধকার তবুও ওর রেসিং বাইকের শক্তিশালী আলোয় শারিয়ার মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ব্যাক সিটে বসা আরোহীর প্রকৃত মনোভাবটা আসলে কি।

বাইকের পেছনে বসা আরোহী আশপাশে কিছুই খুঁজে না পেয়ে নিজের লাল রং করা মাথার চুলগুলো চুলকাতে চুলকাতে আনমনে বলে উঠল, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না...' সে দ্বিধার সঙ্গে আরো কিছু যোগ করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই বাইকটাকে এক পা স্ট্যান্ডের ওপরে দাঁড় করিয়ে ফেলে ঝটকা দিয়ে নেমে পড়ল শারিয়ার। ওকে এভাবে লাফিয়ে নামতে দেখে আগেই বাইকের পেছন সিট থেকে নেমে পড়া মুম নামের ছেলেটা চট করে দুই পা পিছিয়ে গেল ভয় পেয়ে। প্রায় মাফ চাওয়ার মতো করে দুই হাত সামনে জড়ো করে সে কাতর সুরে বলে উঠল, 'ভাই বিশ্বাস করো, আমি গেল সপ্তাহেও এইখানেই এক্স মিল্টন আর ওর গ্যাঙরে একদল পোলামাইয়া লইয়া শোডাউন দিতে দেখছি,' বলে সে ট্যাটু করা হাতটা তুলে রাস্তার পাশের ফাঁকা মাঠের একপাশটা দেখিয়ে বলে উঠল, 'ওইহানেই ওরা আমারে আর অ্যাঞ্জেলরে বাইক নিয়া 'কুইকি' দিতে কইছিল,' বলেই সে মাথা নিচু করে ফেলল। 'তারপরে কী হয়ে তা তো তোমারে বলছিই...'

মুমের কথা শেষ হওয়ার আগেই রাগের একটা ঝটকা বয়ে গেল শারিয়ারের শিড়দাঁড়া বেয়ে। 'এত বড়ো সাহস,' বলেই সে মাটিতে লাথি মারল। 'শালা ঘোঁয়ো কুত্তার পাছা, মাদারটোস্ট মিল্টন। ওর এত বড়ো সাহস হয় কি করে?' রাগে শারিয়ারের শরীর চিড়বিড় করছে। রাগ সামলাতে ও নিজের কোমরে আটকানো লেদারের পাউচটা খুলে সিগারেটের কেইস বের করে একটা ডানহিল ঠোঁটে লাগাল। কয়েক দফা ধোঁয়া দমকে-দমকে নিজের ভেতরে টেনে নিতেই ভেতরে রাগ আর ধোঁয়ার যুদ্ধে রাগ খানিকটা প্রশমিত হয়ে আসতেই মুমের দিকে তাকিয়ে গ্লাভস পরা হাতের একটা আঙুল তুলে তাকে শাসিয়ে বলে উঠল, 'মুম, খুব সাবধান। তুই যা কইছস তা যদি সত্যি হয় তবে এক্স মিল্টনের এ টু জেড আমি বাইর করব। কিন্তু,' বলে ও আবারও সিগারেটে কষে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যোগ করল, 'আর যদি তুই বিন্দুমাত্র মিথ্যে বলে থাকোস তবে তরে আমি...'

'না ভাই না, বিশ্বাস করো আমি একটা কথাও...'

মুম কথা শেষ করার আগেই ধমকে উঠল শারিয়ার। 'চুপ।'

'ভাই তুমি...'

'বললাম না চুপ করতে...শশশ...'এবার ব্যাপারটা ধরতে পারল মুম। তাকে ধমক দিচ্ছে না শারিয়ার বরং অন্য কোনো কারণে চুপ হতে বলছে। মুখ তুলে সে দেখল চোখের নাইট গ্লাসটা খুলে মুখ তুলে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে শারিয়ার। গ্লাভস পরা হাতের একটা আঙুল ঠোঁটের ওপরে।

'ভাই তুমি কি...' মুম কথা শেষ করার আগেই শারিয়ার ঝট করে নড়ে উঠল। প্রায় লাফিয়ে এসে উঠে বসল বাইকের ওপরে। 'মুম, উঠে বস আমি বুঝতে পেরেছি ওরা কোথায়,' মুম চট করে এগিয়ে এসে বাইকের পেছনে বসতে বসতেই বাইকটা স্টার্টদিয়ে ফেলল শারিয়ার। উপযুক্ত চালকের হাতে পড়তেই রীতিমতো গর্জন করে উঠল শক্তিশালী গতিদানব। শারিয়ার বাইক স্টার্ট দিয়ে কয়েক দফা অ্যাক্সেলেটরে চাপ দিতেই বাইকটা এমনভাবে বুমবুম করে উঠল যেন ওদের শরীরের নিচে কোনো চিতাবাঘ ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে প্রস্তুত হচ্ছে লাফ দেওয়ার জন্য। অ্যাক্সেলেটরে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিতেই অনেকটা চিতার মতোই লাফ দিয়ে আগে বাড়ল হোন্ডা কোম্পানির স্পেশাল এডিশন রেসিং বাইক আর-সেভেন।

বাইকটাকে চালু করেই ফাঁকা মাঠ থেকে একটানে মূল রাস্তার ওপরে তুলে নিয়ে এলো শারিয়ার। তীব্র গতির কারণে বাইকটা বলতে গেলে একেবারেই চোখের পলকের ভেতরে পেরিয়ে এলো আধমাইলের মতো জায়গা। জায়গামতো এসেই শারিয়ার বাইকটাকে আবারও নামিয়ে দিল ফাঁকা মাঠের ভেতরে। গতি কমলেও সেটা এই মাঠে বাইক চালানের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়।

'ভাই সাবধানে...' মুমের কথা শেষ হওয়ার আগেই আবারও শূন্যে লাফিয়ে উঠল বাইক। প্রায় ফিট তিনেক জায়গা লাফিয়ে পেরিয়ে এলো অন্ধের মতো।

'শারিয়ার ভাই, করো কী...!'

'চুপ,' ধমকে উঠল শারিয়ার। নাইট গ্লাসের ভেতর থেকে ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মাঠের অসমান উপরিতলের ওপরে। এখান থেকে সিকি মাইলের মতো এগোতেই শারিয়ার রাস্তার অন্য পাড় থেকে যে-শব্দটা শোনার চেষ্টা করছিল সেটা এবার স্পষ্ট হয়ে কানে বাজতে লাগল দুজনেরই।

'শুনতে পাচ্ছিস?' নিজের অনুমান মিলে যাওয়াতে খুশি হয়ে উঠেছে শারিয়ার। এত দিন পরে হওয়াতে অনুমানটা ঠিক মেলাতে পারছিল না নিজেই। কিন্তু শব্দের উৎস অনুসন্ধানে খানিকটা গড়মিল হলেও শেষ পর্যন্ত মিলে যাওয়াতে খুশি হয়ে উঠেছে ও। 'বলেছিলাম না,' বলে ও গতি আরেকটু বাড়িয়ে দিল উঁচু-নিচু মাঠের ওপর দিয়ে।

'শব্দ তো শুনতাছি কিন্তু...' নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত মুম শেষ শব্দ দুটো উচ্চারণ করল মনের ভেতরে। 'মানুষ কই?'

আরো মিনিট দুয়েক এগোতেই শব্দটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। একদল মানুষের হইহল্লা করার আওয়াজ, সেই সঙ্গে উচ্চস্বরে মিউজিকের শব্দ। শারিয়ার বাইক টান দিয়ে একটা বিশেষ জায়গাতে এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

'আজিব কাহিনি, শব্দ আছে, আলো আছে। মানুষ কই?' মুম অবাক হয়ে জানতে চাইল।

ওর প্রশ্ন শুনে হেসে উঠল শারিয়ার। 'আছে এখানেই। আজ থেকে তিন বছর আগে শুরু হয়েছিল এলাকায় রেসিঙের এই কাহিনি,' বলে সে সামনের দিকে আঙুল তুলে ইশারা করল। কিন্তু মুম কিছুই দেখতে পেল না। 'কই?'

'দেখবি একটু পরেই,' বলে শারিয়ার আবারও পাউচ থেকে একটা ডানহিল বের করে ঠোঁটে লাগিয়ে জিপ্পো দিয়ে আগুন লাগাল। ওর কাছে মনে হচ্ছে বহুদিন পরে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে। যেই বাড়ি বহু আগেই বেদখল হয়ে গেছে অন্যের হাতে।

আজ থেকে বছর তিনেক আগে আর্মি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর শারিয়ার সারাদিন বাইক নিয়ে এদিকে-ওদিকে চক্কর মেরে বেড়াত নিজের বখাটে গ্যাঙ নিয়ে। সেই সময়ে ঢাকা শহরে উঠতি বাইকারদের মধ্যে নানা ধরনের রেস হতো। সেটা হতো ঢাকার বাইরে বিভিন্ন হাইওয়েতে। শারিয়ার আর ওর গ্যাঙই প্রথম আফতাবনগরের ভেতরে এই নির্জন জায়গাটা খুঁজে বের করে। আফতাব নগরের ভেতরে একেবারে নির্জন এই জায়গাটা ইস্টার্ন হাউজিংয়ের প্রজেক্ট পার হয়ে অনেক ভেতরের দিকে একটা খালের মতো আছে। সেটার অন্য পাড়ের আরো বেশ ভেতর থেকে শুরু হয়েছে গ্রামীণ এলাকা। এদিকে দিনের বেলা কন্সট্রাকশনের

শ্রমিক, আর রাতের বেলা নেশাখোর আর ভাসমান পতিতা ছাড়া আর তেমন কেউই আসেনা। আর এ কারণেই শারিয়াররা এখানে বাইকের রেসিং শুরু করার কিছুদিনের ভেতরেই জায়গাটা রেসারদের জন্য স্বর্গ হয়ে ওঠে রীতিমতো।

তবে এখানে রেসিং করার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। কারণ মূল রাস্তাটা বেশি লম্বা না হওয়ায় এখানে শর্ট রেস হতো বেশি। আর তার সঙ্গে চলত বড়ো বড়ো বাজি। তবে ওরা এখানে রেসিং শুরু করার কিছুদিনের ভেতরে শর্ট রেসের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বাইকের স্টান্টবাজি। বাইকের এসব স্টান্ডবাজিগুলোর দুর্দান্ত সব নাম রয়েছে। এগুলোর ভেতরে ওদের এখানে উইলি, স্টপি, ক্রশ, রোলিং স্টপি, বার্ন আউট ধরনের স্টান্ড হয়ে ওঠে মারাত্মক জনপ্রিয়। জনপ্রিয় হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে মূল ভূমি থেকে বেশ খানিকটা নিচে শুকনো খালপাড়ের ভেতরে প্রায় হাজার খানেক গজের মতো জায়গা ওরা পাকা করে নেয় স্ট্যান্ট করার জন্যে।

শারিয়ার সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বাইকের হ্যান্ডেল চেপে ধরে শক্ত করল। 'শক্ত হয়ে বস,' বলে বাইকের ব্রেক চেপে ধরে অ্যাক্সেলেটর চেপে ধরে বুমবুম করে প্রেসার দেওয়া শুরু করল। সামনের চাকা ব্রেকের কারণে চেপে বসে রইল ঘাসের মাটির ওপরে। আর অন্যদিকে পেছনের চাকা মাটিতে ঘর্ষণ করা শুরু হতেই টায়ার আর মাটির স্পর্শে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করল।

'ভাই সাবধা...' মুম কথা শেষ করার আগেই শারিয়ার ব্রেক ছেড়ে দিতেই বাইক লাফ দিয়ে আগে বাড়ল। গজ পনেরোর মতো সামনে এগোতেই শূন্যে লাফ দিল আর সেভেনের সামনের চাকা।

'ভাই, ভাই...' মুমের মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই ফিট বিশেকে শূন্যে লাফ দিয়ে গর্জনরত আর সেভেন লাফিয়ে নামল শুকনো খাল পাড়ের শান বাঁধানো জায়গাটার ওপরে। বুমবুম করে মুহূর্তের জন্যভয়ংকর গর্জন ছেড়ে এক গাদা ধোঁয়া উড়িয়ে বাইকটা তীব্র বেগে এগিয়ে গেল বেশ খানিকটা সামনে দিকে।

নিচের শানবাঁধানো লম্বা জায়গাটার দুইপ্রান্তে বড়ো-বড়ো কয়েকটা লোহার ড্রামের ভেতরে আগুন জ্বালানো হয়েছে। সেগুলোর আলোতে আলোকিত বেশ অনেকটা জায়গা। একপাশে বড়ো বড়ো স্পিকারে উচ্চস্বরে মিউজিক বাজছে। আর ড্রাম দুটাকে দুই পাশে রেখে প্রায় গোলমতো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ছেলেমেয়েদের মিশ্রিত একটা ভিড়। উপস্থিত জনতার বেশিরভাগই টিনেজার কিংবা ভার্সিটির ফার্স্ট বা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ুয়া বড়োলোক বাবার বখে যাওয়া পোলাপান। কিন্তু ত্রিশোর্ধ্ব বা মধ্যবয়স্ক লোক সংখ্যায় কম হলেও একেবারে, নেই তা বলা যাবে না। ভিড়ের কেন্দ্রস্থলে দুজন বাইকার পরস্পরকে কেন্দ্র করে বিশেষ ভঙ্গিতে বৃত্তকারে ঘুরছিল, বাইকারদের ভাষায় এটাকে বলা হয় 'ক্রশ'। প্রতিটি ঘূর্ণনের সঙ্গেসঙ্গে বৃদ্ধি করছে নিজেদের গতি। আর উত্তেজিত জনতা পাগলের মতো উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছিল

নিজেদের প্রিয় বাইকারকে। বিশদভাবে বলা চলে নিজেদের বাজি ধরা বাইকারকে।

খেলাটা এভাবেই চলতে থাকত যতক্ষণ পর্যন্ত না দুই বাইকারদের অন্তত একজন ঘূর্ণনের গতি বৃদ্ধি করতে করতে একপাশে ছিটকে না পড়ত। কিন্তু ব্যাপারটা যেভাবে শেষ হবে বলে সবাই ভেবেছিল শারিয়ারের বিশেষ স্টান্টবাজির কারণে সেভাবে শেষ হলো না। ঘোরা পথে স্বাভাবিকভাবে নিচে না নেমে আর-সেভেন বাইক নিয়ে শারিয়ার পূর্ণ বেগে লাফিয়ে নেমে এলো শানবাঁধানো জায়গাটার একপাশে। শারিয়ারের বাইকটাকে নেমে আসতে দেখে লাফিয়ে সরে গেল ওখানে অবস্থানরত কয়েকজন নারী-পুরুষ। সেটা মাটিতে ল্যান্ড করে দুইদফা গর্জন করে তীব্র বেগে ছুটে গেল ঘূর্ণনরত দুই বাইকারের মধ্যে দিয়ে।

সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য তিন বাইকের মধ্যে সংঘর্ষ হলো না। শারিয়ারের বাইকটা দুই বাইকারের মধ্য দিয়ে সোজা ছুটে গেল রাস্তাটার শেষ প্রান্তে। বাইকের তীব্র গতির কারণে মুহূর্তের জন্য মনে হলো আগুন জ্বলা ড্রামের সঙ্গে নিশ্চিত ধাক্কা লাগতে যাচ্ছে ওটার। কিন্তু তীব্র বেগে এগোতে এগোতে আগুনে ড্রামের কাছাকাছি গিয়ে সামনের চাকা ড্রাম থেকে কিছুটা দূরে থাকতেই বাইকের পেছনের চাকা বেশ খানিকটা ওপরে উঠে গেল। তীব্র গতির কারণে সামনের ব্রেক চাপতেই বাইকের পেছনটা শূন্যে উঠে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে গেল বেশ অনেকটা। বৃত্তের ঘূর্ণনটা অর্ধসমাপ্ত রেখে নিখুঁতভাবে ওটা ল্যান্ড করল আগুনে ড্রাম থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে।

বাইকটা স্থির হতেই শারিয়ারের পেছনে বসা মুম লাফিয়ে নেমে এলো। ভয়ের চোটে একেবারে সাদাটে দেখাচ্ছে তার চেহারা। বাইকটাকে সামলে নিয়ে শারিয়ার আলগোছে একটা হাত ঢুকিয়ে দিল কোমরের সঙ্গে আটকানো পাউচের ভেতরে। যখন সে হাতটা বের করে আনল ওটার সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটা রিভলভার। হাতটাকে বের করেই সোজা গুলি করল ও দুমদুম করে ড্রাম পিটতে থাকা একটা স্পিকারে।

গুলির শব্দের সঙ্গে চিৎকার করে উঠল অনেকে। উত্তেজিত জনতার কোলাহল আগেই স্থবির হয়ে গিয়েছিল, গুলি করতেই স্পিকারটা চুপ হয়ে যেতেই পিনপতন নিরবতা নেমে এলো জায়গাটাতে। আর-সেভেন থেকে নেমে এলো শারিয়ার। পিস্তলটাকে আবারও পাউচে রেখে সোজা হেঁটে এলো ভিড়ের সামনে।

'এলাকায় নাকি নতুন মাস্তান এসেছে?' প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল শারিয়ার। 'মাস্তানের চেহারাটা একটু দেখতে চাই। কার এত সাহস দেখি আমার জায়গা থেকে আমার ছেলেদেরেকে মারধর করে বের করে দেয়!' কথাগুলো বলতে বলতে শারিয়ার ভিড়ের ভেতরে চোখ বুলাচ্ছিল। ওর দৃষ্টি হন্যে হয়ে ভিড়ের

ভেতরে মিল্টনকে খুঁজছে। হঠাৎ লালচুলো একটা ছেলের পেছন থেকে কেউ যেন সরে গেল। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল শারিয়ার। লালচুলোকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিতেই দেখল পেছন থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করছে লেদার জ্যাকেট আর ব্যাগি প্যান্ট পরিহিত ন্যাড়া মাথার এক লোক।

যদিও অনেকদিন পর দেখা তবুও মিল্টনকে চিনতে এক সেকেন্ডও লাগল না শারিয়ারের। শারিয়ারের সামনে না পড়ার জন্য পেছন থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করেছিল মিল্টন। কিন্তু একেবারে আচমকা সামনে পড়ে যাওয়াতে সে নিচু থেকে সোজা হয়ে গেল। শারিয়ারকে দেখে যেন খুব অবাক হয়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে হেসে উঠল। হাত নেড়ে বলল, 'আরে বস, কতদিন পর...' বলে সে হেসে উঠতে যাচ্ছিল তার আগেই শারিয়ার ঝড়ের বেগে এগিয়ে গেল।

মুহূর্তের জন্য নাটক করতে গিয়েও নিজেকে আর সামলাতে পারল না মিল্টন। 'আরে আরে...' সরে পড়তে গিয়েও সে পুরোপুরি সফল হলো না। শারিয়ার সামনে এগিয়ে খপ করে ধরে ফেলল তার লেদার জ্যাকেট। পেছন থেকে জ্যাকেটের কলার চেপে ধরে সোজা করে ফেলতে গিয়েও হাত থেকে পিছলে গেল মোটকুটার জ্যাকেট। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবারও সরে পড়তে যাচ্ছিল তার আগেই মিল্টনের ব্যাগি প্যান্টের কোমরের কাছে ঝালর টেনে ধরল ও। টান খেয়ে মিল্টন ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে আরেকটু হলে তার প্যান্টটাই খুলে যাচ্ছিল।

'মাদারটোস্ট!...তুই ভাবছিলি...'

'আরে ভাই ভাই ভাই... আমার কথাটা শুনো,' শারিয়ার তার কোমরের কাছটায় ধরে একরকম ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেল ভিড়ের মাঝখানে। রাস্তাটার ওপরে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল একপাশে।

'শালা টোস্ট, আমি ছয় মাসের লাইগা দেশের বাইরে গেছিলাম আর তুই ভাবছিলি তুই রাজত্ব পায়া গেছস,' শারিয়ার রাগের সঙ্গে একটা লাথি মারল মিল্টনের পাছায়।

'ভাই, আমার কথা তো শুনো...' পাছায় লাথি খেয়েও মিল্টনের কোনো বিকার নেই। সে মাটিতে আধবসা হয়ে হাত জোর করে অনুরোধ করার চেষ্টা করছে শারিয়ারকে। 'আমি কিছু...'

'হারামজাদা কুত্তার পাছা,' শারিয়ার আবারও পা তুলতেই মিল্টন মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে পাটা ধরে ফেলল। 'তোরে রাস্তা থাইক্কা তুইলা আনছিলাম আমি আর আকরাম। আমগোর আগে-পিছে ঘুরতি শালা মান্দারের পো। তোরে নিজের টকায় বাইক কিন্না দিছিল আকরাম। আর তুই দুই বছর না ঘুরতেই আমাগো লগে বেঈমানি করার চেষ্টা করছ!' নিজের পাটা ছাড়িয়ে নিয়ে দুই পা পিছিয়ে এলো

শারিয়ার। এত রাগ উঠে গেছে কোনোমতে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে ও। ওর ভয় হচ্ছে রাগের চোটে না কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে।

'ভাই শুনো...'

'এই মান্দার পো, তুই আমারে ভাই ডাকবি না। নতুন বাপ পাইয়া ভাবছস সব জয় কইরা ফালাইছোস। তুই আর তোর নতুন বাপের কত্তো বড়ো সাহস, ওরে,' বলে একটা হাত তুলে কাঁপতে থাকা মুমের দিকে দেখাল ও। 'মুম আর অ্যাঞ্জেলরে তুই এইখান থাইক্কা মাইরা বাইর কইরা দেস। আমি ছয় মাসের জন্য বিদেশ গেছি আর ভাবসোছ যা মন চায় তাই করবি,' বলে ও আবারও পা তুলতে যাচ্ছিল। 'কই, তোর নতুন বাপ কই, ইন্দুরের মতো গর্তে গিয়া লুকাইছে ক্যান। সামনে আইতে ক,' বলে পাটা নামিয়ে নিয়ে এক ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল মিল্টনকে।

'শারিয়ার আমি এইখানে,' নতুন কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকাল শারিয়ার। 'মিল্টন এখানে কিছুই না। যা বলতে চাও আমাকে বলতে পার।'

আগুন জ্বলতে থাকা ড্রামটার সামনে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত দিয়ে। অন্ধকারের ভেতরে জ্বলন্ত ড্রামের সামনে দাঁড়ানো মানুষটার ন্যাড়া মাথায় আগুনের আলো প্রতিফলিত হয়ে চকচক করে উঠল। মিল্টনের দিকে পেছন ফিরে লোকটাকে ভালোভাবে দেখল শারিয়ার। এত শান্ত কণ্ঠস্বর আশা করেনি ও। ঘুরে দাঁড়িয়ে ন্যাড়া মাথা আর স্পোর্টস জ্যাকেট পরা মানুষটাকে ভালোভাবে দেখে একটু চমকে উঠল ও। লোকটাকে চিনতে না পারলেও খানিকটা চেনাচেনা লাগল ওর। ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে এগুতে এগুতে সে কথা বলে উঠল।

'শুনেছিলাম এই এলাকায় নতুন বাপ এসেছে,' বলে শারিয়ার মিল্টনের দিকে ফিরে মৃদু হেসে বলে উঠল, 'মিল্টনও নাকি নতুন একটা বাপ পেয়েছে,' মুমকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় ওর কাঁধে মৃদু চাপড় মারল ও।

'শারিয়ার ভাই চলো। এখানে থাকাটা আর নিরাপদ...'

'আরে চুপ,' মুমকে চুপ করিয়ে দিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। 'তাহলে তুমিই মিল্টনের সেই নতুন বাপ। যার আশ্রয় পেয়ে মিল্টন আমার ছেলেদের এখান থেকে মেরে...' কথা বলতে বলতেই লোকটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল শারিয়ার। লোকটাকে কাছ থেকে দেখে খানিকটা চমকে উঠল শারিয়ার। এতক্ষণে মানুষটাকে চিনতে পেরেছে ও। এই দেশে বাইকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিন্তু এই মানুষটাকে চেনে না এমন কেউই নেই। ভিন ডিজেলের ভক্ত এবং তার আদলে মাথা ন্যাড়া করে রাখা বিডি বাইক মাস্টার নামে পরিচিত মানুষটাকে এই দেশের বাইকিং জগতের লিজেন্ড বলে ডাকা হয়ে থাকে। তবে যুবকল্যাণ মন্ত্রীর আপন ছোটো ভাই এই বাইক মাস্টারের নামের সঙ্গে দুর্নামও কম নয়।

'তুমি দেখি আমাকে ঠিকই চিনতে পেরেছো,' বলে লোকটাও এগিয়ে এলো ওর দিকে। ন্যাড়া মাথা মানুষটা সরাসরি শারিয়ারের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে উঠল। 'শারিয়ার তাই না? আফতাবনগর সংশ্লিষ্ট বাইক গ্যাঙের প্রতিষ্ঠাতা লিডার। তুমি যে এখানে এসে হম্বিতম্বি করছ...'

লোকটার এই অতি শান্ত ভঙ্গি শারিয়ারের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। আবার খানিকটা ভিন্ন অনুভূতিও কাজ করছে। 'হ্যাঁ, বাইক মাস্টার তোমাকে চিনেছি আমি। আর চিনেছি বলেই যে ছেড়ে কথা বলব সেটা ভেবো না,' শারিয়ার লোকটার দিকে এক আঙুল তুলে কথা বলছে, সেই সঙ্গে অন্য হাতটা আলগোছে রেখে দিয়েছে কোমরে আটকানো পাউচের ওপরে। ওটার ভেতরেই নিজের পিস্তলটা রাখা আছে ওর। 'তুমি মাস্টার হও আর যাই হও। আমি দেশে নেই এই সুযোগে চোরের মতো আমার এলাকায় প্রবেশ করে আমার লোকদেরকে মেরে বের করে দেবে, আর আমি সেটা সহ্য করব। ভাবলে কি করে? দেখো...'

শারিয়ারকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আনমনে হেসে উঠল লোকটা। 'তুমি কি ভেবেছ তোমার ওই পাউচের ভেতরে রাখা পিস্তল বের করলেই আমি মিল্টনের মতো ভয় পেয়ে যাব?' বলেই সে মাটিতে দুই বার বুটের ডগা ঠুকল। সঙ্গেসঙ্গে তার পেছনে অন্ধকারের ভেতর থেকে উদয় হলো দুজন। দুজনেরই হাত কোমরে রাখা। আর কোমরে যে ঝুনঝুনি রাখা নেই সেই ব্যাপারে নিশ্চিত শারিয়ার।

'বাহ, নাচানেওয়ালা নর্তকী সঙ্গেই নিয়েই এসেছে দেখি,' বলে পেছন ফিরে মুমের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল শারিয়ার। মুমের চেহারা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। মুমের দিক থেকে শরীরটাকে ঘোরানোর সঙ্গেসঙ্গে বিদ্যুৎ বেগে নিজের অস্ত্রটা বের করে আনল ও। ঘুরে যেতেই এক হাতে বের করে আনা অস্ত্রটা চেপে ধরল টাকলুর মুখের সামনে। টাকলুর দুই সঙ্গি শারিয়ারকে নড়ে উঠতে দেখেই বের করে এনেছে নিজেদের অস্ত্র। একসঙ্গে তিনটে অস্ত্রের লোড করার শব্দে উপস্থিত জনতার মধ্যে শিহরণ বয়ে গেল। লোকজন অস্থির হয়ে উঠতেই টাকলু নিজের হাতে বের করে আনা পিস্তলটা তুলে আকাশে গুলি ছুড়লো। সেই সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠল, 'সব চুপ। কেউ নড়বে না,' সাবধানে সে শারিয়ারের অস্ত্র ধরা হাতটা অবজার্ব করছে। শারিয়ারও সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রাখছে তিনজনের ওপরে। যদিও ভেতরে ভেতরে জানে, অসম্ভব একটা বাজি হয়ে গেছে। তিনজন অস্ত্রধারীকে সামলানো ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। টাকলু ওর থেকে অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে আছে।

'জামশেদ,' শারিয়ার টাকলুর নাম ধরে ডেকে উঠল। ওর যতটুক মনে পড়ে এটাই ওর নাম। 'কি চাও তুমি? আমার এলাকার দখল আমি ছাড়ব না। বিশেষ করে এখানে যদি আমার ছেলেদেরকে অপমান করা হয়।'

'তোমার এলাকার প্রতি কোনো লোভ আমারও নেই।'

'তাহলে এত ঝামেলা কিসের?'

'তুমি কি জানো যাদের পক্ষ নিয়ে তুমি এখানে ঝামেলা করতে এসেছো তারা আসলে কি করেছে?' টাকলু জামশেদ অস্ত্র নামিয়ে নিল। সে অস্ত্র নামাতেই তার পেছনের দুজনও তাই করল। শারিয়ার এখনো অস্ত্র ধরেই আছে। জামশেদ এগিয়ে এসে ওর পিস্তলের নলে একটা টোকা মারল।

'ওরা,' টাকলু জামশেদ মুমকে দেখাল। 'তুমি বিদেশ যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই তোমার মুম আর অ্যাঞ্জেল আমার গ্যাঙের লোকদের কাছ থেকে এক রকম জোর করেই ইয়াবা ধার করে এনে এখানে বিক্রি করতে শুরু করে। আমরা দুবার মানা করেছি। শোনেনি। এরপর আমরা বাধ্য হয়ে মিল্টনকে হাত করে গ্যাঙের দখল নিয়ে ওদেরকে মেরে বের করেছি। এখন বলো?'

'মিথ্যে কথা,' শারিয়ার অস্ত্র নামিয়ে নিতে নিতে বলে উঠল। মুম আর অ্যাঞ্জেল যা বলেছে তা থেকে এখন একেবারেই ব্যতিক্রম কাহিনি শুনছে শারিয়ার।

'মোটেও মিথ্যে নয়,' বলে জামশেদ একটা হাত তুলল মুমের দিকে। 'ওকে জিজ্ঞেস করো।'

শারিয়ার একবার মুমকে দেখল, ওর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে জামশেদ ঠিকই বলেছে। 'এসব কথা...'

'ধীরে বন্ধু। বন্দুকের গুলি, মুখের কথা আর গ্যাঙের রাজত্ব একবার ফসকে গেলে আর ফেরত নেয়া যায় না,' টাকলু জামশেদ শারিয়ারের মুখের কাছে এসে নিজের ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি স্থির করে তাকিয়ে আছে শারিয়ারের দিকে। এখানে আসার আগে নিজের ছেলেদের কথা ভেরিফাই না করে এসে সে যে একটা বেকায়দায় পড়ে গেছে এটা বেশ বুঝতে পারছে সে। 'নিজের জায়গা ফেরত পেতে তোমাকে লড়াই করতে হবে।'

'কেন...' বলেই শারিয়ার বুঝতে পারল কেন করতে হবে। কারণ ওর পেছনে আরো দুজন এসে দাঁড়িয়েছে। 'কি করতে হবে?' অনেকটা বাধ্য হয়েই শারিয়ার বিড়বিড় করে বলে উঠল।

'অনেকে বলে তুমি নাকি অসাধারণ বাইকার। আবার কেউ কেউ বলে আমি নাকি এ-দেশের সেরা,' কথা বলতে বলতে বাইক মাস্টার জামশেদ উপস্থিত জনতার সামনে চলে গেছে। 'আজ সেটা প্রমাণ হয়ে যাক, কি বলো?' শেষ কথাটা সে জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে। কেউ কোনো জবাব দিল না। 'কি হলো?' সে আবারও ধমকে উঠতেই উপস্থিত জনতা গুঞ্জন করে উঠল। 'কি সবাই কি আজ বাইকের খেলা দেখতে চাও?' এবার হর্ষধ্বনি করে উঠল উপস্থিত জনতা।

'হাই জাম্প ট্রিপল ক্রশ স্টপি,' চার অস্ত্রধারীর মাঝখানে দাঁড়ানো শারিয়ারের দিকে ফিরে বলে উঠল বাইক মাস্টার। 'কী বলো?' সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল, অনেকে হাততালি দিয়ে উঠল। শারিয়ার মুমের দিকে তাকিয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে ফিরে তাকাল বাইক মাস্টারের দিকে। 'আমার কি মানা করার কোনো উপায় আছে?'

বাইক মাস্টার হেসে উঠে মাথা নাড়ল। 'আজ প্রমাণ হয়ে যাবে কে সেরা বাইকার?' তার কণ্ঠে সুললিত উল্লাস।

বাইক মাস্টারের উচ্চকিত কণ্ঠস্বর শুনে আনমনেই মাথা নাড়ল শারিয়ার, না চাইতেও একটা ভয়াবহ অবস্থার ভেতরে পড়ে গেছে ও।

অধ্যায় পাঁচ

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

খণ্ডলার মাঠ, রামু, চট্টগ্রাম

এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি, ভাবছে তালেব কিরান।

নিজের ধূর্ত মস্তিষ্ক থেকে কোন জবাব না পেয়ে সরাসরি মাথার ওপর থেকে উত্তাপ ছড়াতে থাকা গনগনে সূর্যটার দিকে আনমনেই একবার চোখ তুলে তাকাল সে। মাত্র দিনের শুরু হতেই সূর্যটা এভাবে শক্রুর মতো উত্তাপ ছড়াতে শুরু করবে কে জানত। তবে যতটা না সূর্যকে তার শত্রু মনে হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি শত্রু মনে হচ্ছে ছাউনির নিচে বসে থাকা লোকগুলোর ভেতরে আবছাভাবে চোখে পড়া সুবাদার আকরাম শেঠকে। এই লোকটা না থাকলে সে এভাবে মাঠের মধ্যে গনগনে সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে দস্তকের কাজ না করে ছাউনির নিচে বসে আরাম করে আরকের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে লড়াই পরখ করতে পারত। তবে এটাও ঠিক যে, এই লোকটা না থাকলে লড়াই উপভোগ তো দূরে থাক, কোনো লড়াই হতোই না আজ এখানে। বিশেষ করে আরাকানরাজের বিশেষ নিষেধাজ্ঞার পর তো প্রশ্নই ওঠে না।

লড়াইয়ের ফাঁকে বিরতির সময়ে মাঠের যেখানে লড়াই হচ্ছে তার এক কোনায় দাঁড়িয়ে কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই কিরান আনমনেই এবার ঠোঁট চাটল। পিপাসার চোটে মনে হচ্ছে যেন ছাতি ফেটে যাবে, ইতোমধ্যেই পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে ঠোঁট। আশপাশে তাকিয়ে একবার দেখল মাঠের একপাশে ভিড়ের ভেতরে সবার মাথা ছাড়িয়ে গোমেজ দাঁড়িয়ে আছে দুই হাতে বিরাট দুটো বল্লম নিয়ে। গোমেজকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছে ও ই। কারণ মুখে মুখে যতই বাহাদুরি করুক না কেন নিজের শারীরিক শক্তি আর সামর্থ নিয়ে আসলে ও নিজেই নিশ্চিত নয়। বছরের পর বছর ধরে অনিয়মিত আর অনিশ্চিত জীবন যাপন তার শরীরকে দুর্বল করেছে। এক বাক্যে বলতে গেলে ওর নিজের ভেতরে আগের সেই কিরানের কতটুকু অবশিষ্ট আছে সে নিজেই জানে না।

পুরনো দিনের কথা মনে হতেই কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো কিরানের বুকের ভেতর থেকে। ইদানীং এই ব্যাপারটা প্রায়ই হয়, পুরনো দিনের

কথা মনে হলেই বুকটা কেমন জানি খালি খালি মনে হয় ওর। নিজেকে মনে হয় অতীতে বসবাস করা একজন মানুষ। সমুদ্রের বুকে ঘটা সেদিনের সেই দুর্ঘটনার পর থেকে যেন ওর জীবন থেমে আছে ওখানেই। ভবিষ্যৎ তো নে-ই, বর্তমান জীবনটাও প্রতিমুহূর্তে কেমন জানি ফিকে হয়ে চলেছে ওর কাছে।

টুপ করে একটা ঘামের ফোঁটা ভ্রু থেকে গড়িয়ে পড়ে চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিতেই এক হাতে কপালের ঘাম মুছে ফিরে তাকাল মাঠের কিনারার দিকে। ব্যাপার কি, এত সময় লাগছে কেন? ডান হাতে ধরে থাকা বিরাট লাঠিটার এক প্রান্ত জোরে মাটিতে ঠেলে দিতেই একটা পাশ গেঁথে গেল ওখানে। লাঠিটাকে নামিয়ে রেখে মাথা থেকে তিনকোনা দস্তগিরের টুপিটা খুলে নিয়ে মাথার ঘামে ভেজা চুলগুলোকে একটু পাট করে আবারও টুপিটা পরে নিল ও। কিরানের পায়ে চামড়ার খোলের জুতো, তার ওপরে ঢোলা পাজামা আর গায়ে বাহারি কাফতান। কোমরে কোমর বন্ধনীটা কষে বেঁধে নিতে নিতে নিজের বাহারি পোশাকের কারণে নিজেকেই গালাগালি করল ও। কে জানত এভাবে মাঠে নামতে হবে। একটা সময় দস্তক হিসেবে মাঠে নামাটা ওর জন্য সবচেয়ে আনন্দের কাজ। আর এখন লড়াইয়ের ময়দানে উতরানোর চেয়ে কঠিন কাজ আর কিছুই মনে হয় না।

সময়ের সঙ্গেসঙ্গে ফাটল ধরেছে মনের গহিন কোণে। আর সেই ফাটলের প্রতিফলন ঘটতে শুরু করেছে শরীরে। পলকা জোয়ালের মতো পাতলা কোমর ভারী হয়েছে, আর চওড়া শক্তিশালী দুকাঁধ যেন জীবনের বোঝা বহন করতে গিয়ে নুয়ে চলেছে নিচের দিকে।

'হউপ,' করে একটা চিৎকারে সঙ্গেসঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল কিরান। যাক অবশেষে আবারও খেলা শুরু হতে চলেছে। লাঠিটাকে আবারও হাতে তুলে নিল কিরান। চোখ কুঁচকে তাকাল মাঠের অপর প্রান্তে থাকা অন্য দস্তকের দিকে। ওকে তাকাতে দেখে অন্যপ্রান্তে থাকা দস্তক লাঠি নেড়ে ইশারায় বোঝাল, সে প্রস্তুত। হাতে ধরা বিরাট লাঠিটাকে মাথার ওপরে দুইপাক ঘুরিয়ে এনে জোরে সামনের মাটিতে বাড়ি মারল কিরান। এই ইশারাতেই ও বুঝিয়ে দিল ময়দান প্রস্তুত। এবার লড়াই শুরু হতে পারে।

লাঠি বাগিয়ে লড়াই শুরুর ঘোষণা দিয়ে আনমনেই একবার গোমেজকে দেখে নিয়ে কিরান আড়চোখে ফিরে তাকাল ছাউনির নিচে বসে থাকা বাজিকরদের দিকে। বিশেষ করে আপনাতেই ওর দৃষ্টি চলে গেল ময়দানের সবচেয়ে বড়ো বাজিকর আমজাদ শেঠের ওপর। লোকটা মাঠের দিকে তাকিয়ে নেই। সে তাকিয়ে আছে সোজা কিরানের দিকে। এমনকি কিরান ফিরে তাকানোর পরও সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল না। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যাচাই করছে কিরানের প্রতিটি নড়াচড়া।

আমজাদ শেঠের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কিরান ফিরে তাকাল মাঠের দিকে। ময়দান প্রস্তুতের ঘোষণার সঙ্গেসঙ্গে ময়দানের কেন্দ্র থেকে একটা পতাকা নড়ে উঠল। ময়দানের দুপ্রান্তে দেখা দিল দুটো বিরাট আকারের ষাঁড়। দুটোকেই একদল লোক দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। এত দূর থেকেও ষাঁড় দুটোর খুরের আঘাতে সৃষ্টি হওয়া কম্পন পরিষ্কার টের পেল কিরান। বুকের ভেতরটা কেন জানি কেঁপে উঠল ওর। উচ্ছ্বসিত জনতার হর্ষধ্বনিতে কেঁপে উঠল চারপাশ।

গ্রামবাংলার প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা ষাঁড়ের লড়াই যে অন্তত একবার জীবনে না দেখেছে সে কল্পনাও করতে পারবে না এর উত্তেজনার মাত্রা। বিশেষ করে বছরের যে-সময়টাতে ফসল তোলা হয় এরপরে সেই ফসলের মাঠে ষাঁড়ের লড়াই বাংলার বহু পুরনো খেলাগুলোর একটি। এই খেলাটা আবার বৃহত্তর চাটগাঁ এলাকায় উদ্‌যাপন করা হয় বিশেষভাবে।

ফসল ওঠানোর পর বছরের এই সময়টাতে আরাকানরাজ শাসিত চট্টগ্রামের এই এলাকাটাতে আয়োজন করা হয় হপ্তাব্যাপী মেলার। আর মেলার শেষদিনে হয় এই বিরাট ষাঁড়ের লড়াইয়ের আয়োজন। যে আয়োজনে এলাকার বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সবাই যেমন বছরের সবচেয়ে বড়ো বাজি ধরে অন্যদিকে আবার সারা বছর ধরে প্রস্তুতি নেওয়া বাজিকরেরা অত্র এলাকার সবচেয়ে বড়ো আর শক্তিশালী ষাঁড়গুলোকে লড়াইয়ে নামায়। সারাদিনে একটার পর একটা লড়াই চলতে থাকে। সবচেয়ে বড়ো লড়াইটা হয় সবার শেষে। সবচেয়ে বড়ো বাজিটাও হয় সেই লড়াইতেই। তবে নিয়ম হলো, সেই লড়াইয়ে যে ষাঁড় হেরে যাবে সেটাকে জবাই করে বিরাট আকারে ভোজ দেওয়া হবে। আর সেই ভোজের সঙ্গেই এক বছরের জন্য সমাপ্ত হয় এই বিরাট আয়োজন।

গত তিন বছর ধরেই এই লড়াইয়ে সবচেয়ে বড়ো বাজিগুলোর একটা থাকে কিরানের। কিন্তু এবারের মতো এতটা বাজে অবস্থা ছিল না এর আগে। কারণ গেল বছর আরাকানরাজ আর মোঘল লড়াইয়ে সব হারিয়ে নিজের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সেগুলোকে এক করে, সেই সঙ্গে এক বস্তা অর্থ ঋণ করে এবারের সবচেয়ে বড়ো বাজিটা কিরান ধরেছে এবারের সবচেয়ে বড়ো ষাঁড় সুলতানের ওপরে। সুলতানকে মাঠেও নামাচ্ছে সে নিজে। সবশেষ লড়াইটা হবে কিরানের নামানো ষাঁড় সুলতান আর আরেক ব্যবসায়ীর ষাঁড় কালাচাঁদের ভেতরে। কিন্তু কিরানের এখন সন্দেহ কালাচাঁদের আসল মালিক সম্ভবত আমজাদ শেঠ। কিন্তু এই ব্যাটা ওকে দস্তক হিসেবে মাঠে নামতে বলল কেন বুঝতে পারছে না ও। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে অবশ্যই।

ভাবতে ভাবতেই মাঠের কেন্দ্রের দিকে ফিরে তাকাল কিরান। ওর থেকে গজ পঞ্চাশেক সামনে শুরু হতে যাচ্ছে দিনের পঞ্চম লড়াই। এর আগে চারটা লড়াই

হয়ে গেছে। কোনোটাতেই খুব বেশি বাজে কিছু হয়নি। ষাঁড়ের লড়াইয়ের একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো; এই খেলায় মাঠে উপস্থিত থাকে ষাঁড়ের দুই মালিক। আর দুজন দস্তক। দস্তকদের ভূমিকা লড়াইয়ের মাঠে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লড়াইয়ের মাঠে দস্তকরাই পুরো লড়াই নিয়ন্ত্রণ করে। তবে দস্তকদের আরেকটা বড়ো ভূমিকা থাকে। সেটা হলো পরাজিত ষাঁড় যখন হেরে গিয়ে দিগবিদিক পালাতে শুরু করে এই ষাঁড়টাকে সামলাতে হয় মূলত দস্তকদেরই। তা-না হলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। কারণ ষাড়ের লড়াইয়ের মাঠে কোনো কিনারা বা বাউন্ডারি থাকে না। মানুষজন গোল হয়ে দাঁড়িয়েই এই বাউন্ডারি তৈরি করে। পরাজিত ষাঁড় যখন ছুটতে শুরু করে তখন সে অন্ধের মতো ছুটে যায় এই মনুষ্য দেয়ালের দিকে। দস্তক যদি পরাজিত ষাঁড়কে থামাতে না পারে তবে এক বা একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটবেই ঘটবে।

খটাস করে কাঠের সঙ্গে কাঠের সংঘর্ষের শব্দের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল দুই ষাড়ের লড়াই। ষাঁড়ের লড়াই অন্যান্য প্রাণীর লড়াইয়ের মতো নয়। অন্যান্য প্রাণী লড়াই করে সমস্ত শরীর দিয়ে। বঙ্গদেশীয় ষাঁড় লড়াই করে শুধু মাথা আর শিং দিয়ে। লড়াই শুরু হতেই দুই ষাঁড় পরস্পরের দিকে শিং বাগিয়ে তেড়ে গেল। মাথার সঙ্গে মাথার সংঘর্ষ অনেকটা কাঠের সঙ্গে কাঠের সংঘর্ষের মতোই। দুই ষাঁড় এক হতেই উচ্ছ্বসিত জনতার হর্ষধ্বনিতে কেঁপে উঠল খণ্ডালের ময়দান। লাঠি হাতে খুব সাবধানে নজর রেখে চলল কিরান। কিন্তু অযাচিত কিছু হলো না। কারণ লড়াইটা অনেকটা একপেশেই হয়ে চলল। ত্রিপুরার ষাঁড়ের সঙ্গে দক্ষিণবাংলার ষাঁড় বেশিক্ষণ যুঝতে পারল না। মাথায় মাথায় লড়াই যখন তুঙ্গে ত্রিপুরার ষাঁড় আচমকা একপাশ থেকে বঙ্গদেশীয় ষাঁড়ের গলার পাশে শিং বসিয়ে দিতেই বঙ্গদেশীয় ষাড় হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল মাটিতে।

সঙ্গেসঙ্গে দুইপাশ থেকে ঝড়ের বেগে এগিয়ে গেল দুই দস্তক। লম্বা বাঁশের লাঠি দিয়ে টেনে আলাদা করে ফেলা হলো দুই ষাঁড়কে। মালিক আর তার লোকেরা এসে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল দুই ষাঁড়কে। দুই ষাঁড়েই শরীর-স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা হবে। এখন যদি সব ঠিক থাকে তবে ভালো না হলে অসুস্থ পরাজিত ষাঁড়কে উপযুক্ত টাকা দিয়ে ভোজের জন্য কিনে নেবে লড়াই কর্তৃপক্ষ।

ময়দান খালি হতেই জোর আওয়াজের সঙ্গে বেজে উঠল তীক্ষ্ণ একটা বাঁশির আওয়াজের মতো আওয়াজ। ময়দানের সবচেয়ে বড়ো লড়াইয়ের ঘোষণা। কিরান ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দেখল গোমেজ নেই কোথাও। আনমনেই মাথা নাড়ল সে। যেহেতু সে দস্তকের ভূমিকা পালন করছে কাজেই তার হয়ে তার কাছের একজন লড়াইয়ের ষাঁড়কে ময়দানে নামাবে। কিরান ফিরে তাকিয়ে দেখল ছাউনির নিচে বড়োরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। এর ভেতরে আমজাদ শেঠকেও দেখল ও। তার মনিপুরি ষাঁড় কালাচাঁদ আর কিরানের উত্তর ভারতীয় সাদা ষাঁড় সুলতানের মধ্যে বছরের সেরা লড়াইটা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

জনতার হর্ষধ্বনির সঙ্গে কিরান দেখতে পেল ময়দানের একদিক থেকে কালাচাঁদকে টানতে টানতে মাঠে নিয়ে ঢুকল চারজন। প্রজ্জ্বলিত সূর্যের আলোয় চকচক করতে থাকা পাহাড়ের মতো আকৃতির কালাচাঁদকে দেখে কিরানের বুকের ভেতরটা আবারও কেঁপে উঠল। সুলতান পারবে তো এই পাহাড়ের সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠতে। কারণ সুলতানের ওপরেই নির্ভর করছে ওর পুরো জীবন। নিজের সর্বস্ব বাজি ধরেছে ও সুলতানের ওপরে। দেখতে দেখতেই বিশালদেহী গোমেজ সঙ্গে আরো দুজনকে নিয়ে টানতে টানতে ধবধবে সাদা ষাঁড় সুলতানকে নিয়ে ময়দানে প্রাবেশ করল। উত্তেজিত জনতা আবারও হর্ষধ্বনি করে উঠল। দুই ষাঁড়কে মুখোমুখি করতেই ময়দানে প্রবেশ করল তৃতীয় আরেক দস্তক। তৃতীয় দস্তকের ভূমিকা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত কিরান। সে নিজে যেহেতু একদিকে দস্তক তার ওপর ষাঁড়েরও বাজিকর তাই এই তৃতীয় দস্তকের কাজ হলো খেলায় সমতা বজায় রাখা। যাতে করে কিরান বাজিকর হিসেবে খেলায় একপেশে কিছু করতে না পারে।

ময়দানের মাঝখানে দুই ষাঁড়কে কেন্দ্র করে একশ গজ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তিন দস্তক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই তৃতীয় দস্তক মাথার ওপরে লাঠি তুলে সেটাকে সশব্দে নামিয়ে আনল মাটিতে। লাঠিটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুই ষাঁড়কে আলগা করে দিল দুই পক্ষের লোকজন। সঙ্গে সঙ্গেই দুই দানব ছুটে গেল পরস্পরের দিকে। সাধারণত ষাঁড়ের লড়াই শুরু হয় মাথায় মাথায় কিন্তু দুই দানব পরস্পরের দিকে এগিয়ে যেতেই দৌড়রত অবস্থায় কালাচাঁদকে একপাশ থেকে মাথা দিয়ে বাড়ি মারল সুলতান।

একদিকে তীব্র বেগে দৌড়, তার ওপরে প্রচণ্ড বাড়ির ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেল কালাচাঁদ। তীব্র ধাক্কায় একপাশে সরে গেল সে। কিরান উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল। এখন যদি সুলতান পাশ থেকে একটা শিং খালি বসিয়ে দিতে পারে...

কিন্তু ওর চিন্তা মনেই রয়ে গেল। মুহূর্তের ভেতরে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কালাচাঁদ। মাথা নিচু করে তেড়ে গেল সুলতানের দিকে। দুই ষাঁড়ের মাথায় মাথায় সংঘর্ষে যেন পাথরের সঙ্গে পাথর ঠোকাঠুকির মতো শব্দ হলো। দুই ষাঁড়ের একত্রিত হওয়ার চেয়ে জনতার উচ্ছ্বাসধ্বনি যেন পাগল করে ফেলছে পুরো খণ্ডলার ময়দান। পরবর্তী বেশ কিছুক্ষণ দুই ষাঁড়ই পরস্পরের সঙ্গে আক্ষরিক অর্থেই বুনো জন্তুর মতোই লড়ে চলল। দুই দানবের কেউই কাউকে ন্যূনতম ছাড়ও দিচ্ছে না, আবার কাউকে এতটুকু হটাতেও পারছে না। খুরের সঙ্গে খুরের আঘাতে বালুমাটি উড়ে চলেছে। শিঙের সঙ্গে শিঙে আর চামড়ার সংঘর্ষে টুকরো চামড়া আর রক্ত ছিটকে পড়ছে কিন্তু কেউ কাউকেই কাবু করতে পারছে না।

এর মধ্যে দুই বার ষাঁড় দুটোকে আলগা করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়বারের মতো দুটোই পরস্পরের দিকে এগিয়ে যেতেই সুলতানের বাড়ি খেয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ভূপতিত হলো কালাচাঁদা। খুশিতে চিৎকার করে উঠল কিরান। উত্তেজিত জনতা যেন পাগল হয়ে যাচ্ছে। কিরানের চোখ চিকচিক করে উঠছে খুশিতে। কারণ পরিস্থিতির বিবেচনায় ও দিব্যদৃষ্টিতে সুলতানের বিজয় দেখতে পাচ্ছে। ও ফিরে তাকাল মাঠের একদিকে, একটু আগে যেখানে গোমেজকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। নিজের বিশাল বুকের ওপরে ভিম দুই বাহু ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকা গোমেজের বত্রিশটা দাঁত পরিষ্কার দেখতে পেল কিরান। গোমেজ থেকে ওর দৃষ্টি চলে গেল ছাউনির দিকে যেখানে সব বাজিকরেরা অপেক্ষা করছে। ছাউনির দিকে পুরোপুরি ফিরে তাকানোর আগেই জনতার বিস্ময়ধ্বনি শুনে আপনাতেই কিরানের দৃষ্টি ফিরে এলো মাঠের দিকে।

মাঠের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল লড়াইয়ের যবনিকাপাত হতে চলেছে। কারণ কালচাঁদ নিজের বিশাল দেহ নিয়ে সুলতানের ধাক্কায় যে পতিত হয়েছে আর উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই তার। আধবসা অবস্থাতেই সে নিজের মাথা আর শিং উঁচু করে সুলতানকে বুঝতে চেষ্টা করছে কিন্তু খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারছে না। কালাচাঁদকে শেষবারের মতো এক ধাক্কা দিয়ে অনেকটা পিছিয়ে এলো সুলতান। কিরান অনুমান করল এটাই লড়াইয়ের চূড়ান্ত পরিণতি হতে যাচ্ছে। জনতার উচ্ছ্বসিত চিৎকার শোনা গেল। খানিকটা পিছিয়ে এসে খুরের আঘাতে ধুলো উড়িয়ে ঝড়ের বেগে কালাচাঁদের দিকে ছুটে গেল সুলতান। শেষবারের মতো নিজের শিঙের আঘাতে চূড়ান্ত পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেবে প্রতিদ্বন্দ্বীকে।

সুলতান প্রায় কালাচাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, হঠাৎ নিজের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কালাচাঁদ। সুলতানও প্রায় পৌঁছে গেছে, কালাচাঁদও উঠে দাঁড়িয়েছে ফলে সুলতানের হিসেবে গড়মিল হয়ে গেল। যেখানে আঘাত করতে চেয়েছিল সেখানে না লেগে উল্টো কালাচাঁদের শিঙের আঘাতে তার মাথার একপাশ বেঁকে গেল। কালাচাঁদের একটা শিং সুলতানের খুলিতে লেগে পিছলে গিয়ে আঘাত করল সুলতানের এক চোখে। সুলতানের তীব্র আর্তনাদে কেঁপে উঠল খণ্ডলার ময়দান।

'ইয়া খোদা,' আপনাতেই বেরিয়ে গেল কিরানের মুখ দিয়ে। উত্তেজনার চোটে দুই পা সামনে এগিয়ে গেল ও।

রক্তাক্ত চোখ নিয়ে পাগলের মতো পিছিয়ে গেছে সুলতান। প্রতিদ্বন্দ্বীকে খানিকটা কাবু দেখে সর্বশক্তিতে এগিয়ে এসে নিজের মাথার একপাশ দিয়ে বাড়ি মারল কালাচাঁদ। একদিকে রক্তাক্ত চোখ তার ওপরে শক্তিশালী আঘাতে দিকবিদিক হারিয়ে পাগলের মতো উল্টো ছুটতে শুরু করল সুলতান।

পরাজয় চূড়ান্ত হয়েছে সুলতানের। জিততে জিততেও হেরে গেছে সে। কারণ হাজার বছরের পুরনো নিয়ম, লড়াইয়ের মাঠে একবার যে ষাঁড় উল্টো ছুটতে শুরু করে সেই ষাঁড় হয়তো আর কখনোই লড়াইয়ের ময়দানে ফিরতে পারে না। সুলতান তো পরাজিত হয়নি, পরাজিত হয়েছে কিরান।

সব হারানোর বেদনায় কিরানের মনে হলো মাটিতে বসে পড়ে কিন্তু তা হওয়ার উপায় নেই। কারণ পরাজিত আহত সুলতান ছুটে আসছে ওর দিকেই। যদি সরাসরি ওর দিকে নাও ছুটে আসে তবুও মানব দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ভিড়ের দিকে ছুটে যাবে উন্মত্ত সুলতান। দস্তক হিসেবে সেটা কিছুতেই হতে দিতে পারে না কিরান।

বুক ভরে দম নিয়ে পা স্থির করে লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়াল কিরান। জীবনে এই কাজ বহুবার করেছে ও, জানে কি করতে হবে। কিন্তু বহুবছরের অনভ্যস্ততায় হাত মৃদু কাঁপছে ওর। কিন্তু ভুল করল না ও। সুলতান গজ পঞ্চাশের মতো দূরে থাকতেই লাঠি উঁচিয়ে সর্বশক্তিতে মাটিতে বাড়ি মারল কিরান। পলায়নরত পাগলা ষাঁড়কে নিয়ন্ত্রণে আনার এটা একটা কার্যকরী উপায়। মাটিতে বাড়ি মারলে ষাঁড় বিভ্রান্ত হয়ে যায়, ফলে গতি কমে আসে তার। এই সময়ের ভেতরে সব দস্তকেরা মিলে চারপাশ থেকে মাটিতে একের পর এক বাড়ি দিয়ে আরো বেশি বিভ্রান্ত করে তোলে উন্মত্ত ষাঁড়কে। এই সুযোগে বাকিরা এসে দড়ি পরিয়ে দেয়।

সুলতান ছুটে আসতেই মাটিতে বাড়ি মারল কিরান। প্রথম বাড়িটা বেশি জোরে হলো না। কিন্তু আবারও বাড়ি মারল ও। খুব স্বাভাবিকভাবে মাটিতে কম্পন টের পাওয়ামাত্র ষাঁড়ের গতি কমে আসার কথা। কিন্তু নিজের একটা চোখ হারিয়ে পুরোপুরি উন্মত্ত হয়ে গেছে সুলতান। তার মধ্যে থামার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। মাটিতে বাড়ি দিয়ে কাজ না হওয়াতে কিরান দেখল ছুটে আসছে উন্মত্ত দানব, আড়চোখে অবলোকন করল অন্য দস্তকেরা ছুটে আসছে কিন্তু তারা বহুদূরে। তারা পৌঁছাতে পৌঁছাতে ও কিছু না করলে হয় ও মরবে, আর না হয় দানব ছুটে যাবে জনতার দিকে।

একহাতে কোমর থেকে কোমরবন্ধনীটা টেনে বের করে অন্যহাতে লাঠি বাগিয়ে ধরল কিরান। ছুটন্ত সুলতানের প্রথম আঘাতটা লাঠির ওপর দিয়ে যেতেই ওটা চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে ছিটকে পড়ল একপাশে। সুলতান প্রায় চলে এসেছে কিরানের কাছে, কোমরবন্ধনীর কাপড়টা খুলে ছুড়ে মারল ও সুলতানের চোখে। কিন্তু দুই চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও থামল না উন্মত্ত দানব। প্রায় চলে আসা সুলতানকে একপাশে রেখে খানিকটা সরে এলো কিরান। তারপর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শেষ চেষ্টা হিসেবে লাফিয়ে সুলতানের একটা শিং চেপে ধরে নিজেকে তুলে ফেলল সুলতানের পিঠে। জনতার ক্ষতি না করে সুলতানকে থামানোর শেষ চেষ্টা এটা।

ছুটন্ত ষাঁড়ের পিঠে চড়া যেকোনো উন্মত্ত ঢেউয়ের পিঠে চড়ার চেয়েও ভয়ংকর। বিশেষ করে সে ষাঁড় যদি আপনাকে ফেলে দিতে চায়। সুলতানের পিঠে গ্যাট হয়ে বসে কিরান শক্ত হাতে ধরে আছে তার শিং। একটু এদিক সেদিক হলেই মরতে হবে। চোখ তুলে দেখল দিকবিদিক ছুটতে থাকা মানুষের ভিড়টা আর বড়োজোর শখানেক গজ দূরে হবে। এরইমধ্যে এই দানবকে থামাতে না পারলে ও তো যাবেই সঙ্গে আরো কজন মরবে কে জানে।

কিরান নিজেকে একটু স্থির করেই আরো শক্ত করে দুইহাতে চেপে ধরল সুলতানের শিং। কিন্তু দানবের ভেতরে এতটুকু প্রতিক্রিয়া নেই। নিজের শরীরের নিচে শক্তিশালী দানবটার দুর্দান্ত শক্তি টের পাচ্ছে কিরান। আবারও শিং চেপে ধরে একপাশে ঠেলে দিল ও। না থামলেও শিঙের ওপরে চাপ খেয়ে একপাশে খানিকটা ঘুরে গেল সুলতান। এবার সোজা ছুটতে শুরু করল সেই ছাউনির দিকে। আতঙ্কের সঙ্গে চিৎকার করে পালাচ্ছে লোকজন। আর বিশ গজ যেতে পারলেই পিষ্ট হবে মানুষ। হঠাৎ ধাপ করে কিছু একটা এসে লাগল সুলতানের একেবারে ঘাড়ের কাছে। সঙ্গেসঙ্গে যেন দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে গতি খানিকটা কমে এলো দানবের। হঠাৎ থেমে যাওয়াতে সুলতানের মাথা ছাড়িয়ে সামনের মাটিতে ছিটকে পড়ল কিরান।

মাটিতে পড়ে মনে হলো মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে ওর। কিন্তু জানের ভয় বড়ো ভয়। ব্যথা অগ্রাহ্য করে একলাফে উঠে দাঁড়াল ও। সুলতান যেন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেছে। অনেকটা মাতালের মতোই টলছে সে। ঘাড়ের একপাশে বিঁধে আছে লম্বা একটা বল্লম। আবারও ধাপ করে শব্দ হতেই দেখল আরেকটা বল্লম গিয়ে লাগল সুলতানের মাথায়। এবার একেবারে থেমে গিয়ে মাটিতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ষাঁড়টা।

বল্লমের উৎসের দিকে তাকাতেই কিরান দেখল গোমেজ। মনে মনে ও ভাবল তাইতো বলি এত শক্তি কার যার বল্লমের আঘাতে এরকম দানব থেমে যায়। স্বস্তির সঙ্গে আবারও মাটিতে শুয়ে পড়ল কিরান। শরীরের ব্যথা আর মনের ব্যথা এক করে হিসেব করার চেষ্টা করছে কতটা ক্ষতি হয়েছে ওর।

কিরানের ওপরে একজন মানুষের ছায়া এসে পড়ল। কেউ একজন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওকে ওঠানোর জন্য। হাতটা ধরে উঠে দাঁড়িয়ে রোদ আড়াল করে তাকাতেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ও। রাজপোশাক পরা আরাকান সেনাকে চিনতে না পারার কোনো কারণ নেই। হাত বাড়িয়ে দেওয়া লোকটার পেছনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদল সৈনিক। কিরান অনুমান করল সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়েছে।

ওর সামনে উপবিষ্ট আরাকান সেনা তড়বড় করে কিছু বলছে। যেগুলোর অর্থ করলে দাঁড়ায় রাজার নির্দেশ অমান্য করে ষাঁড়ের খেলা চালানো ও বাজি ধরার

অপরাধে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে ওকে। এসব কথা কানে যাচ্ছে না ওর। কেউ একজন দড়ি দিয়ে বাঁধতে শুরু করেছে ওর হাত। কিরান ফিরে তাকাল ছাউনির দিকে। একেবারে খালি ওটা। ছাউনির পাশে আরেকদল সৈনিকের মাঝে বন্দি গোমেজকে দেখতে পেল ও। কিন্তু চারপাশের গ্রেপ্তার আর গণ্ডগোলের ভেতরে ও খেয়াল করে দেখলো ছাউনিতে উপবিষ্ট বাজিকরেরা কেউই নেই আশপাশে।

এরকম বাজে পরিস্থিতিতেও কিসের যেন ঠিক হিসেব মিলছে না কিরানের। হাতে আর কোমরে দড়ি বাঁধা শেষ হতেই কেউ একজন টানতে শুরু করতেই কিরানের আবারও মনে হলো, টাকা-পয়সা-নিজের কেনা ষাঁড় সব তো গেছেই, মান-সম্মানটা বাকি ছিল, এবার আরাকানরাজের বন্দি হিসেবে ওটারও দফা-রফা হবে ।

সব হারানোর চাপা বেদনা আপনাতেই ওর বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে এলো দীর্ঘ নিঃশ্বাস হয়ে।

অধ্যায় ছয়

বর্তমান সময়

আফতাব নগর, রামপুরা

নিঃশ্বাসের সাথে যেন ধোঁয়া উড়ছে ঠান্ডায়।

খোলা মাঠের তীব্র ঠাণ্ডার ভেতরে নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা গরম নিশ্বাস ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। উত্তপ্ত নিশ্বাস আর ঠাণ্ডা বাতাসের এই চিরন্তন খেলার দিকে তাকিয়ে কেন জানি প্রচণ্ড বিরক্ত লাগছে শারিয়ারের। বিরক্তিটা কি নিজের ওপর নাকি অন্য কারো ওপর ঠিক ধরতে পারছে না সে।

বাইকের একপাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ও। ওভাবে দাঁড়িয়েই কোমরের পাউচ থেকে একটা সিগারেট বের করে মুখে লাগাল। কষে দুটান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিজেকে খানিকটা উষ্ণ মনে হলো ওর। সিগারেট টানতে টানতেই ফিরে তাকাল সামনের বিরাট কর্মযজ্ঞের দিকে। ওখানে বাইক মাস্টার আর ওর ভেতরে রেসের আয়োজন চলছে। একটু আগে বাইক মাস্টার ওকে চ্যালেঞ্জ করার পর থেকেই শুরু হয়েছে এই কর্মযজ্ঞ।

অবশ্য কর্মযজ্ঞটাকে ঠিক বিশাল বলা যায় কিনা সেটা একটা ব্যাপার। তবে যা ঘটছে সেটাও কম নয়। রেস ট্র্যাকের মাঝখানের রাস্তাটাকে কেন্দ্র করে দাঁড়ানো ভিড়টাকে আরো বেশ খানিকটা দূরে সরানো হয়েছে। মাঝখানের ট্র্যাকটাকে ঠিক রেখে রাস্তাটাকে রাউন্ড করে স্প্রে পেইন্ট দিয়ে গোল করে দাগ দেওয়া হয়েছে দুই রাউন্ড। সেই দাগের একটা প্রান্ত এসে শেষ হয়েছে রাস্তাটার ঠিক মাঝখানে। যেখানে দাগটা শেষ হয়েছে সেখান থেকে রাস্তা বরাবর সোজা এগোতে হবে। সোজা বেশ অনেকটা এগিয়েই বসানো হয়েছে দুটো কাঠবোর্ডের মতো জিনিস। রেসিঙের ভাষায় ওগুলোকে বলে 'জাম্পার'। জাম্প করার জন্য ব্যবহৃত হয় বলেই মনে হয় এই নাম । ছোটো পরিসরের রেসে এগুলো দিয়েই আসলে বাইক জাম্পের আয়োজন করা হয়। জাম্পার দুটো ক্রস করে রাস্তাটা আরো এগিয়ে গেছে আশি গজের মতো। ওটার শেষ মাথায় দুটো আগুনে ড্রাম বসানো হচ্ছে।

শারিয়ার আর বাইক মাস্টারের রেসের প্যাটার্নটা অনেকটা এমন হবে; ও আর বাইক মাস্টার রেস শুরু করবে রাস্তার এক প্রান্ত থেকে। তারা দুজনে দুই বার পুরো

রাস্তাটা চক্কর খাবে। তারপর রাস্তাটা রাউন্ড শেষ করে রাস্তার মাঝ বরাবর এগোবে। বাইকটাকে জাম্প করিয়ে খুবই ছোটো পরিসরের ভেতরে ড্রামের আগে থামিয়ে ফেলতে হবে একটা বিশেষ কায়দায়। কায়দাটা হলো; বাইকের সামনের চাকা মাটিতে থাকবে আর পেছনের চাকা শূন্যে উঠে পাক খেয়ে বাইক থেমে যাবে। বাইক থামানোর এই কায়দাকেই বলা হয় 'স্টপি'। কিন্তু ওদের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ ওটা নয়। বাইকটাকে থামানোরর আগে সামনের চাকার ওপরে ভর করে বাইকটাকে পুরো দু চক্কর ঘোরাতে হবে। বাইকাররা এটাকে বলে 'রোলিং স্টপি'। এই রেসে চ্যালেঞ্জ তিনটে; প্রথমত, কে প্রথম হয়। দ্বিতীয়ত, জাম্পারে জাম্প করে স্বল্প দূরত্বে বাইকটাকে নিয়ন্ত্রণ করে থামানো। সেই সঙ্গে তৃতীয় এবং সবচেয়ে ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ হলো, বাইকটাকে থামানোর আগে সামনের চাকার ওপরে তিনটে চক্কর খাওয়ানো। যদি শেষটায় এতটুকু গড়বড় হয় তবে বাইক সোজা গিয়ে বাড়ি খাবে আগুনে ড্রামে। অ্যাক্সিডেন্ট-ইনজুরি তো হবেই এমনকি মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়।

পুরো রেসটা মনের ভেতরে একবার ঝালিয়ে নিয়ে সামনের দিকে ফিরে তাকাল শারিয়ার। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে একটু দূরেই নিজের সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে কথা বলছে বাইক মাস্টার। পেছনেই তার বিরাট রেসিং বাইকটা। বাইকটা দেখেও ঠিক চিনতে পারল না শারিয়ার। পেশাগত কারণে গত ছয় মাস দেশের বাইরে থাকার কারণে এই জগৎ থেকে খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে ও। হয়তো এরই মধ্যে রেসিং বাইকের কোনো নতুন রেভ্যুলুশন হয়েছে। যে-কারণে বাইকটা চিনতে পারছে না। তবে চিনতে না পারলেও এই ব্যাপারে ও নিশ্চিত যে ওটা একেবারেই আধুনিক আর লেটেস্ট মডেলের কিছু হবে।

রেসিং বা বাইকিং নিয়ে শারিয়ারের মনে কোনো দ্বিধা নেই। কারণ রেসিং ওর রক্তের ভেতরে আছে। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে ভুগছে ও। প্রথমত ওর অস্ত্র নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই একরকম বলতে গেলে ওদের হাতে ও এই মুহূর্তে জিম্মি। এভাবে অন্যের হাতের পুতুল হওয়া ওর পছন্দ নয়। তার ওপরে যে কাজে এসেছিল সেটা তো হয়নি, উল্টো প্রমাণ হয়েছে ওর নিজের লোকের ভেতরেই ঘাপলা ছিল। এসব গ্যাঙবাজিতে এই এক সমস্যা; কে কখন কার সঙ্গে বেইমানি করবে কোনো ঠিক নেই। এখন মনে হচ্ছে এভাবে বোকার মতো পুরনো এই জগতে ফিরে না এলেই ভালো হতো। কারণ এখানে ওর কোনো স্বার্থ নেই। আর এই জগৎ ওর জন্য এখন অতীত। ও এখন ভিন্ন জগতের মানুষ। বরং এক অর্থে বলতে গেলে ওর বর্তমান জগৎ আর এই জগতের মধ্যে আকাশ আর পাতালের পার্থক্য।

'ভাই, সব রেডি হয়া গেছে,' নিজের ভাবনার জগতে এমনভাবে হারিয়ে গেছিল কখন মুম ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পায়নি শারিয়ার। মুম মাথা নিচু করে কথা বলছে ওর সঙ্গে, চোখেচোখ মেলানোর সাহস নেই। শারিয়ারের ইচ্ছে হলো সপাটে একটা চড় মারে হারামজাদার গালে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁতে কড়মড় করে মুমের দিকে একটা আঙুল উঁচিয়ে বলে উঠল, 'হারামজাদা তোর কারণে এইসব ঘটছে। তোরে আমি ধরব। রেসটা শেষ হোক আগে...' শারিয়ার কথা শেষ করার আগেই অন্যপাশ থেকে উত্তেজিত জনতার গুঞ্জন শুনে ফিরে তাকাল সামনের দিকে। বাইক মাস্টার চড়ে বসেছে তার রেসিং বাইকে। আর সে বাইকে চড়ে বসতেই সবাই চেঁচিয়ে উঠেছে খুশিতে। শারিয়ার নিজের হাত নামিয়ে বাইকে গিয়ে বসতেই পাশ থেকে শিস দিয়ে উঠল একজন। ফিরে দেখল একটা হেলমেট হাতে ওর থেকে খানিকটা তফাতে এসে দাঁড়িয়েছে মিল্টন। 'বস,' বলে মৃদু ডাক দিয়ে সে হেলমেটটা ছুড়ে দিল শারিয়ারের দিকে। একটু আগের অসহায় ভাব পুরোপরি উবে গেছে তার মুখ থেকে। তার বদলে কেমন জানি একটা তাচ্ছিল্যের ভাব তার চোখে মুখে। মনে মনে এর নামটাও টুকে রাখল শারিয়ার। সবার আগে এই ব্যাটাকে ধরতে হবে।

'বেস্ট অব লাক, বস,' বলে মিল্টন হাত তুলে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাল। পাত্তা না দিয়ে হেলমেটটা পরে নিয়ে বুম বুম করে নিজের বাইকটা স্টার্ট দিয়ে এক টানে চলে এলো ও বাইক মাস্টারের পাশে। শেষবারের মতো পরীক্ষা করে নিচ্ছে বাইক থেকে শুরু করে সবকিছু। পরীক্ষা শেষ করে বাইক মাস্টারের দিকে তাকিয়ে দেখল হেলমেটের ওপাশ থেকে কুঁতকুঁতে চোখ জোড়া দিয়ে ওকে দেখছে। ওকে দেখে নিয়েই সামনের দিকে ফিরে তাকাল লোকটা। শারিয়ারও বুমবুম করে বাইকটাকে রেসিং পজিশনে নিয়ে এলো।

মিল্টনের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো আর বাইক মাস্টারের চাহনির মধ্যে কী একটা গড়মিল খুঁজে পাচ্ছে শারিয়ার। এর আগে বহুদিন রেসিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে ও জানে, এসব রেসে বহু ধরনের ধোঁকাবাজি হয়ে থাকে। তার ওপরে বাইক মাস্টারও রেস করতে যাচ্ছে, তারমানে অবশ্যই ভিড়ের ভেতরে উঁচু দরে বাজির খেলা চলবে আজ। শারিয়ার আবারও বাইক মাস্টারের দিকে ফিরে তাকাতে যাচ্ছিল তার আগেই জিন্স আর টি-শার্ট পরা একটা মেয়েকে সামনের দিকে হেঁটে যেতে দেখল ও। মনে মনে হেসে উঠল শারিয়ার। ব্যাটারা হলিউডি সিনেমা গুলে খেয়ে ফেলেছে, যা দেখে নির্লজ্জভাবে তাই কপি করার চেষ্টা করে।

মেয়েটা ওদের দুজনকে ছাড়িয়ে আরো খানিকটা সামনে এগিয়ে গেল। তারপর হাতে একটা রুমাল তুলে ধরে ওদের দুজনার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'রেডি বয়েজ?' দুজনেই মাথা নাড়তেই উত্তেজিত জনতা গুনতে শুরু করল। 'এক'

'দুই'। দুই বাইকারই নিজেদের বাইক পূর্ণ ফোর্সে নিয়ে এসেছে। 'তিন' উচ্চারিত হতেই মেয়েটা হাতের রুমালটা ছেড়ে দিল। কিন্তু ওটা মাটিতে পড়ার আগেই দুই পাশ থেকে দুটো পূর্ণ বেগে লাফ দেওয়া বাইকের বাতাসের ধাক্কায় উড়ে গেল ওটা।

মানবজাতির ইতিহাসে কখনো কোনো মানুষের ডানা ছিল কিনা তানভীরের জানা নেই। তবে এখন পর্যন্ত যতবার বাইক রেসে নেমেছে ও প্রতিবারই বাইক চলতে শুরু করার পর মনে হয়েছে যেন ওর পিঠে দুটো ডানা গজিয়েছে আর সেই ডানায় ভর করে যেন উড়তে শুরু করে ও। যদিও এবারের রেসটা অনেকটাই ব্যতিক্রম কিন্তু তবুও বাইক স্টার্ট করতেই যেন পুরনো সেই অনুভূতিটা আবারও ফিরে এলো। বাইকটা পূর্ণ বেগে চলতে শুরু করার সঙ্গেসঙ্গে উত্তেজনার চোটে আপনাতেই চিৎকার বেরিয়ে এলো তানভীরের গলা দিয়ে।

বাইক মাস্টারে বাইকটা স্টার্ট হতেই একটানে তানভীরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছিল অনেকটা। কিন্তু প্রথম বাঁকের কাছে পৌঁছে ডানে মোড় ঘোরানোর সময়েই বাইক মাস্টারকে ধরে ফেলল তানভীর। মোড় ঘুরতে ঘুরতেই এক ধাপ এগিয়ে গেল ও। কিন্তু নিজের উন্নত বাইকের সুবিধে নিয়ে আবারও তাকে ছাড়িয়ে বেশ অনেকটা এগিয়ে গেল বাইক মাস্টার। এক্সেলেটরে চাপ বাড়িয়ে দিল তানভীর। মরিয়া হয়ে উঠেছে ও। কিন্তু চালানোর দক্ষতা আর বাইকের শক্তি দুদিক থেকেই তানভীরের চেয়ে দক্ষ সে। বরং তানভীর দুবার তাকে ধরার চেষ্টা করলেও বরং উল্টো ওকে ছাড়িয়ে আরো বেশ অনেকটা এগিয়ে গেল বাইক মাস্টার। প্রথম রাউন্ড এভাবেই শেষ হলো, বাইক মাস্টার সামনে আর তার থেকে কয়েক ধাপ পেছনে তানভীর।

যদিও গতির তীব্রতা আর রেসের উত্তেজনায় তানভীরের মাথায় আর কিছুই আসছে না তবুও হেলমেটের ভেতর থেকে পরিষ্কার শুনতে পেল ওদের দুজনকে কেন্দ্র করে চারপাশে জনতা উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। মুহূর্তের জন্য তানভীরের মনোযোগ হটেছিল তাতে আরো কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে গেল বাইক মাস্টার। প্রথম রাউন্ড শেষ করে আবারো প্রথম বাঁকটা বাইক মাস্টার পেরিয়ে গেল। তানভীর প্রায় কয়েক ফিট পেছনে পড়ে গেছে। চোখের কোণে দেখল খোলা লম্বা জায়গার সুযোগে বাইক মাস্টার তার বাইক নিয়ে আরো বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। জাম্প করার আগে আর মাত্র দুটো বাঁক আছে। মুহূর্তের ভেতরে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল তানভীর।

আর মাত্র একটা বাঁক অবশিষ্ট। মনের চোখে তানভীর পরিষ্কার দেখতে পেল বাইক মাস্টারের ঠোঁটের কোণে ফুঁটে উঠেছে বিজয়ের হাসি। আচমকা তানভীর তীব্র ব্রেক চেপে প্রায় দাঁড়িয়ে গেল। তীক্ষ্ণ কিচ-কিচ শব্দ করে বাইকটা প্রায়

দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এমন সময় এক্সেলেটরের পূর্ণ চাপে মনে হলো ওর বাইকের ইঞ্জিনটা যেন বাঘের মতো গর্জন করে উঠল, সেই সঙ্গে এগজস্ট পাইপ এমনভাবে ধোঁয়া উগড়ে দিল যেন বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। সঙ্গেসঙ্গে বাইকটা প্রায় পূর্ণ বেগে লাফ দিয়ে আগে বাড়ল। তীব্র বেগের আতিশয্যে ওটার সামনের চাকা শূন্যে উঠে গেছে। স্বাভাবিকের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ বেগে ওর বাইকটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশের ভেতরে বাইক মাস্টারকে টপকে সামনে এগিয়ে গেল ওর বাইক।

যদিও নিজের বাইকের নিয়ন্ত্রণ আর গতি নিয়ে ব্যস্ত তানভীর তবুও বাইক মাস্টারের দিকে তাকালে পরিষ্কার দেখতে পেত ওর ভয়ংকর ঝুঁকিপূর্ণ স্টান্টে হা হয়ে গেছে বাইক মাস্টারের মুখটা।

তানভীরের বাইকটা সামনের চাকা শূন্যে থাকতেই ওটাকে আর মাটিতে নামিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেল না ও। তার আগেই তীব্র বেগে ধেয়ে এলো সামনের জাম্পিং স্লাইড। এক চাকার ওপরে ভর করেই ওর বাইকটা জাম্পিং স্লাইড বেয়ে লাফিয়ে শূন্যে উঠে পড়ল প্রায় ত্রিশ ফিটের মতো।

বাইক মাস্টারকে পেছনে ফেলতে পারলেও এখনো চ্যালেঞ্জ শেষ হয়নি। বরং সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জটা বাকি। বাইকটাকে নিরাপদে ল্যান্ড করিয়ে আগুনে ড্রামের আগে ট্রিপল রাউন্ড স্টপির মাধ্যমে শেষ করতে হবে রেস। তবেই বিজয় সম্ভব। শেষ মুহূর্তে অতিরিক্ত গতির কারণে বাইকটা নিয়ন্ত্রণের চেয়ে অনেক বেশি শূন্যে উঠে গেছে ফলে ওটাকে ল্যান্ড করিয়ে যতটুকু জায়গাটায় শেষ স্ট্যান্টটা কীভাবে সম্পন্ন করবে সেটা ভেবে ঠিক করার আগেই তানভীরের আর সেভেন বাইকের সামনের চাকা মাটি স্পর্শ করল তীব্র ঝাঁকুনির সঙ্গে। একবারের জন্য তানভীরের মনে হলো বাইকের হ্যান্ডেল বুঝি ছুটেই গেল ওর হাত থেকে। কোনোমতে সামলে নিয়ে সামনের ব্রেক চেপে ধরল ও প্রাণপণে। কারণ আগুনের ড্রামটা প্রায় চলেই এসেছে।

সামনের ব্রেক চেপে ধরতেই ওর বাইকটা থামতে থামতে পেছনের চাকা শূন্যে উঠে পড়ল। ব্রেকের তীব্র চাপে বাইকের পেছনটা ঘুরতে শুরু করল শূন্যের ওপরে। ড্রামটায় বাড়ি লাগতে লাগতে আপনাতেই তানভীরের চোখ বুজে এলো কিন্তু বাইকের শেষ প্রান্তটা ড্রামের সঙ্গে না লেগে দুবার চক্কর খেয়ে নেমে এলো মাটিতে।

বাইক মাটিতে নামতেই শক্ত ধাক্কা লাগার সঙ্গেসঙ্গে আর ধরে রাখতে পারল না ও বাইকের হ্যান্ডেল। একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেল ওটা। কোনোমতো লাফিয়ে সরে এলেও শরীরের ব্যালেন্স রাখতে পারল না শারিয়ার। ট্র্যাক থেকে ছিটকে পড়ল ঘেসো মাটিতে।

ঘাসের ওপরে পড়লেও হেলমেট পরা মাথাটা জোরে বাড়ি খেল মাটিতে। কোনোমতে হেলমেটটা খুলে বড়োবড়ো করে দম নিতে লাগল ও মাটিতে শুয়ে। ওপরে খোলা আকাশ দেখা যাচ্ছে। কানে আসছে উত্তেজনায় চিৎকার করতে থাকা জনতার উল্লাস। কিন্তু ওর মন ছেয়ে গেছে পরাজয়ের গ্লানিতে। জিততে পারেনি ও। স্টপিতে তিনবার রাউন্ড দেওয়ার কথা ছিল বাইকটাতে। দুই বার দিয়েই পড়ে গেছে ও মাটিতে।

ওর পাশে একটা বাইক এসে থেমে গেল। মাটি থেকে মাথা তুলে সোজা হলো শারিয়ার। গ্লাভ পরা একটা হাত দেখতে পেল চোখের সামনে। ওটা ধরতেই শক্ত হতে কেউ টেনে দাঁড় করিয়ে দিল ওকে। হাঁপাতে হাঁপাতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল বাইকে উপবিষ্ট মানুষটা বাইক মাস্টার। ওকে সোজা হতে সময় দিয়ে নিজের হেলমেটটা খুলে হাতে নিয়েনিল সে। নিজের ন্যাড়া মাথায় একবার গ্লাভস পরা আঙুল চালিয়ে দিয়ে। মৃদু হেসে বলে উঠল, 'আমি শুনেছিলাম 'বাইকার ম্যাড কিং' নাকি সত্যিকারের একটা পাগল বাইকার,' বাইক গ্যাঙে তানভীরের ডাকনাম হলো 'ম্যাড কিং'। 'আজ নিজ চোখে দেখলাম তার পাগলামি,' বলে সে মৃদু হেসে উঠল। তানভীর তার হাসিতে যোগ না দিয়ে মৃদু মাথা নাড়ল। আড়চোখে দেখল একটু দূরেই ভিড়ের ভেতরে টাকা চালাচালি হচ্ছে। নিশ্চয়ই বাজির হার-জিতের হিসেব হচ্ছে ওদের ভেতরে। আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল তানভীর। 'কিন্তু আমি তো জিততে পারলাম না,' ওর কণ্ঠে হতাশা।

তানভীরের কথা শুনে জোরে হেসে উঠল বাইক মাস্টার। 'কে বলেছে? তোমাকে ওভাবে বাইকের চাকা শূন্যে তুলে লাফ দিতে দেখেই আমি থেমে গেছিলাম। মাই গড। এরকম কোনো ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটেছে, না দেখলে আমি,' বাইক মাস্টার থেমে এগিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'তুমি আসলে মানুষ তো? এরকম একেবারেই জীবনের পরোয়া না করে কোনো মানুষ রেস দিতে পারে, স্টান্ট করতে পারে না দেখলে আমি... আমি সেরা বাইকার হতে পারি। কিন্তু তুমি আসলেই ম্যাড কিং,' বলে সে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাল। 'পারফেক্ট নাম, এখন বলো...' সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই পুলিশের সাইরেন শোনা গেল। কাছেই থাকা পুলিশের কোনো টহল জিপ মনে হয় অতিরিক্ত চিল্লাচিল্লিতে খবর পেয়ে গেছে।

পুলিশের সাইরেনের শব্দ শোনামাত্রই ভিড়ের ভেতরে উত্তেজনা দেখা দিল, যে যেদিকে পারল ছুটতে শুরু করেছে। মুহূর্তের ভেতরে নিজের কথা শেষ না করে বাইক মাস্টার দক্ষ হাতে নিজের বাইকটাকে ঘুরিয়ে ফেলল। একবার ওর উদ্দেশে হাত নেড়ে বাইক ছোটাল। যদিও তার কানেকশন অনেক, তবুও সবাই ঝামেলা এড়াতে চায়।

শারিয়ার কোনো তাড়াহুড়ো করল না। ও মাটিয়ে পড়ে থাকা নিজের হেলমেটটা তুলে পরে নিল। তারপর বাইকের কাছে হেঁটে এসে ওটাকে সোজা করে চড়ে বসল। আশপাশে তাকিয়ে মুম কিংবা অন্য কারো ছায়াও দেখতে পেল না। মুম আর অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে ওর হিসেবটা পরে পরিষ্কার করতে হবে। বাইক স্টার্ট দিয়ে মুহূর্তের জন্য পুলিশের সাইরেনটা মনোযোগ দিয়ে শুনে বোঝার চেষ্টা করল ওটা কোনোদিক থেকে আসছে। হিসেব করে নিয়ে উল্টোদিকে বাইকের মুখ ঘুরিয়ে উঠে এলো রোডে। সঙ্গেসঙ্গে ব্রেক কষে থেমে গেল। আরেকটু হলেই রোডে দাঁড়ানো হেডলাইট অফ করা দুটো জিপের সঙ্গে বাড়ি খেতে যাচ্ছিল ওর বাইক।

যদিও জিপ দুটোর হেডলাইট অফ করা। কিন্তু ওর নিজের বাইকের আলোয় দেখল জিপের সামনে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে অন্তত চারজন পুলিশ। 'হ্যান্ডস আপ।' শারিয়ার কিছু না বলে ধীরে ধীরে বাইকের হ্যান্ডেল থেকে নিজের হাত সরিয়ে ওপরে তুলে ধরল।

'হোন্ডা থেকে নেমে একপাশে সরে দাঁড়ান,' নির্দেশ ভেসে এলো।

শারিয়ার এক পা দিয়ে বাইকটাকে স্ট্যান্ডের ওপরে দাঁড় করিয়ে সরে এসে বলে উঠল, 'এক মিনিট এখানে একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। আমি-' এটুকু বলতেই চড়চড় শব্দ তুলে কিছু একটা ছুটে এসে লাগল ওর বুকে । সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র কারেন্টের ধাক্কায় মাটিতে শুয়ে পড়ল ও। শরীরে এখনো কারেন্ট বয়েই যাচ্ছে। ঝটকা দিয়ে থেমে গেল ইলেকট্রিসিটি।

'টিজার শালারা টিজার মেরেছে,' আনমনেই শারিয়ারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল । *বাংলাদেশ পুলিশ কবে থেকে টিজার ব্যবহার করতে শুরু করেছে!* মাথাটাকে সামান্য তুলে দেখল পুলিশ না বরং সিভিল পোশাক পরা কেউ একজন এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

'দেখুন আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার শারহান...' ও কথা শেষ করার আগেই লোকটা ওর দিকে ঝুঁকে এসে মুখের ওপরে সিগারেটের গন্ধওয়ালা নিঃশ্বাস ফেলে হেসে উঠল। 'আমরা জানি তুমি কে। সেজন্যই তো এই ব্যবস্থা ,' বলেই লোকটা হেসে উঠে আবারও টিজারে চাপ দিল।

তীব্র কারেন্টের ধাক্কায় জ্ঞান হারানোর আগে শারিয়ারের মনে হলো বিরাট কোনো গড়মিল হয়ে গেছে ওর হিসেবে।

অধ্যায় সাত

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

রামু, চট্টগ্রাম

হিসেবের ভেতরে গড়মিল হয়নি বরং পুরা হিসেবটাই কেঁচিয়ে গেছে কিরানের।

আরক রাখার চামড়ার থলিটা নিজের দুই ঠোঁটের ওপরে একেবারে উপুড় করে ধরল তালেব কিরান। মনের ভেতরে দুরাশা, যদি খানিকটা তরল রয়ে গিয়ে থাকে থলিটার একেবারে তলায়। ওর যে-অবস্থা তাতে কয়েক ফোঁটাও যদি মুখে পড়ে তবে সেটাও লাভ। কিন্তু পরিস্থিতি বিচার করে মনে হচ্ছে না কোনো লাভ হবে। থলিটাকে মুখের ওপরে ধরে তলা থেকে দু-আঙ্গুলে চাপ দিয়ে টান দিতেই তলির একেবারে তলায় লুকিয়ে থাকা কয়েক ফোঁটা বিশেষ তরল গড়িয়ে পড়ল কিরানের শুষ্ক জিহ্বার ওপরে।

শেষ ফোঁটা কটা জিহ্বায় পড়তেই ছ্যাঁত করে যেন আগুন ধরে গেল শুষ্ক জিহ্বায়। পিপাসার্ত মুখে আরকের ফোঁটা কটা যেন পিপাসা বাড়িয়ে দিল আরো বহুগুনে। জিহ্বা দিয়ে শুকনো ঠোঁট চেটে নিয়ে থলিটা হাতে মুড়িয়ে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে লোহার শিক লাগানো গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল সে।

নিজের এই বিচিত্র জীবনে বহুকিছু করার অভিজ্ঞতা থাকলেও এর আগে কখনো জেল খাটা হয়নি ওর। এমনকি মোঘল সামরিক বাহিনীতে কাজ করার সময়ে একধিকবার প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ারও অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর। কিন্তু এর আগে কখনো গরাদের ভেতরে বন্দি থাকেনি ও। তাই লোহার খাঁচার মতো গরাদের ভেতরে শুয়ে কারাগারের ভেতরে থাকার অভিজ্ঞতাটা কেমন বোঝার চেষ্টা করছে ও। কিন্তু অন্য সময়ের থেকে আলাদা কোনো অনুভূতি হলো না ওর। বরং মনের ভেতরে কেমন জানি একটা স্বস্তির অনুভূতি কাজ করছে।

কথাটা মনে আসতেই মৃদু হেসে উঠল কিরান। কারণ এই মুহূর্তে আরাকান রাজার বন্দি না হলে পাওনাদাররা ওকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। কারাগারের ভেতরে থাকায় অন্তত পাওনাদারদের থেকে তো রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে। এই মুহূর্তে এটাই বা কম কী।

নাহ, এভাবে শুয়ে থাকলে চলবে না। অন্তত গোমেজের খবর নেওয়া উচিত। কথাটা ভাবামাত্রই শুকনো খড়ের ওপর থেকে উঠে বসল কিরান। শরীরটাকে টান-টান করে বসা অবস্থাতেই আড়মোড়া ভাঙার চেষ্টা করল সে। তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঠুকে গেল অমসৃণ তারের জালের সঙ্গে।

মাথার তালু ডলতে ডলতে এগিয়ে গেল লোহার মোটা গারদের সামনের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ওর পাশের একই রকম আরেকটা গারদে গোমেজ কী অবস্থায় আছে।

খণ্ডালের মাঠে ওর সঙ্গেই আরাকানরাজের সৈন্যরা গ্রেপ্তার করেছিল গোমেজকেও। কিরানের দৃঢ় বিশ্বাস গোমেজ চাইলে খুব সহজেই খণ্ডলার মাঠ থেকে অন্যদের সঙ্গে পালাতে পারত। কারণ ছাউনির নিচে থাকা বাজিকরেরা কেউই গ্রেপ্তার হয়নি। তার মানে ওদেরকে কেউ আগেই খবর দিয়ে দিয়েছিল, যাতে ওরা পালাতে পারে। অথবা এরকম কিছু একটা হতে যাচ্ছে এটা বুঝতে পেরে, ওরা আগেই টের পেয়ে পালিয়ে গেছে। ধরা পড়েছে শুধু এলেবেলে কিছু লোকজন। কিছু ব্যাপারি আর মাঠে অবস্থানরত দস্তকদের ভেতরে রয়েছে একমাত্র ও আর গোমেজ। কিরান জানে গোমেজ আসলে চাইলেই পালাতে পারত কিন্তু সে কিরানকে ফেলে পালায়নি।

খণ্ডলার মাঠ থেকে ওদেরকে গ্রেপ্তার করে পায়ে হাঁটিয়ে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় রামু দুর্গে। সেখানে তাদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির কারণ থেকে শুরু করে সব অপরাধ পড়ে শোনানো হয়। সেখানই দুপুর পর্যন্ত কাটানোর পর আরাকানরাজের বিশেষ বাহিনীর সঙ্গে ওদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই বন্দিশালায়। এখানে আনার পর প্রথমে ওদেরকে যাচ্ছেতাইভাবে কতক্ষণ পেটানো হয়েছে, তারপর গরুর মতো টানতে টানতে নিয়ে আসা হয় বন্দিশালার একপাশে একটা লাগোয়া কারাগারে।

আসলে জায়গাটাকে কারাগার না বলে ছোটো ছোটো একগুচ্ছ গরাদের সারিও বলা যেতে পারে। গরাদগুলোকে আবার গরাদ না বলে খাঁচা বলাটাই শ্রেয়। কিরানের শরীরের এখানে-ওখানে নানা ধরনের ব্যথার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কারণ একে তো বহুদিন পর সুলতানের মতো ওরকম একটা দানবের মুখোমুখি হওয়া, তারপর আবার এতদূরের পথ হেঁটে আসাটা ওকে একেবারে কাহিল করে দিয়েছে। তার ওপরে উল্টোপাল্টা মারও পড়েছে আবার। তবে ও ভেবেছিল কারাগারে প্রবেশ করতেই কপালে লোহা পুড়িয়ে অপরাধীর ছাপ দিয়ে দেবে, সেটা এখনো দেয়নি দেখে অনেকটাই স্বস্তি পাচ্ছে ও।

স্বস্তি শব্দটা মনে আসতেই আবারও আনমনে হেসে উঠল কিরান।

আর স্বস্তি!

পরিবার ছেড়েছে বহু আগেই। তারপর হারিয়েছে নিজের জাহাজ থেকে শুরু করে সব। ছেড়েছে নৌবাহিনী, এরপর গেছে ব্যবসা। শেষ ভরসা হিসেবে নিজের যা কিছু ছিল সেটা নিয়েই বাজি ধরেছিল, সেটাও ডুবেছে। এখন শুধু প্রাণটাই বাকি আছে। আর হ্যাঁ, রয়ে গেছে নিজের একান্ত বিশ্বস্ত সাথি গোমেজ।

'গোমেজ, গোমেজ,' গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বের করে গোমেজ যে গরাদের ভেতরে আছে সেটার লোহার আবরণের ওপরে মৃদু শব্দ করার চেষ্টা করল ও। গোমেজ ছিল পর্তুগিজ ব্যবসায়ী। কিরান যখন নৌবাহিনীতে কাজ করে তখন এক জলদস্যুর আক্রমণে পরিবারসহ সব হারিয়ে সে যখন পাগলপ্রায় তখন কিরানই তাকে পানি থেকে তুলে আশ্রয় দিয়েছিল নিজের জাহাজে। পরিবার থেকে শুরু করে নিজের সব হারিয়ে গোমেজ তখন পাগলপ্রায়। সেখান থেকেই কেন জানি সে রয়ে যায় কিরানের দলের সঙ্গেই। কখনো ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেনি নিজের জ্ঞাতি ভাইদের মাঝে। পর্তুগিজ আর বাঙালির মাঝে এরকম মেলবন্ধন চাটগাঁও এলাকা তো দূরে থাক পুরো দক্ষিণে কেউ দেখেনি।

ব্যাপার কী, ব্যাটা অবার অসুস্থ-টসুস্থ হয়ে পড়ল নাকি! 'এই গোমেজ?' এবার আরেকটু জোরে ডাকার চেষ্টা করল সে। বেশি জোরে ডাকার সাহস পাচ্ছে না। একে তো আশপাশে নানা ধরনের বন্দি আছে, তার ওপরে কিছুক্ষণ পরপর বন্দিশালার পাহারাদার টহল দিয়ে যাচ্ছে।

কিরানের কাছে সবসময় মনে হয় আরাকান রাজের লোক মানেই একেককটা দানব। মানবিকতাবিহীন পশুর মতো এরা। আর তাই অন্যদের সঙ্গে আচরণটাও করে পশুর মতোই। কথায় কথায় চাবুক চালানো এদের স্বভাব। বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে এরা স্রেফ চাবুক মেরেই মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। আরাকানি পাহারাদারেরা যদি একবার টের পায় এখানে বন্দিদের মধ্যে কেউ একজন সমস্যা করছে, স্রেফ চাবকেই মেরে ফেলবে। আজকে বন্দিদের দলে সঙ্গে প্রবেশ করার সময়ে কিরানের বুকটা একবার কেঁপে উঠেছিল, কারণ কথিত আছে এখান থেকে মানুষ নাকি বের হয় মৃত অবস্থায় আর না হয় হাত-পা-চোখ-নাক কিছু একটা হারিয়ে পঙ্গু হয়ে। ওদের কপালে কী আছে, কে জানে। 'এই গোমেজ?' গোমেজের জন্য কিরানের বেশি চিন্তা হচ্ছে, কারণ এলোপাতাড়ি চাবুক চালানোর সময়ে গোমেজ বেশ মার খেয়েছে। যে-প্রহরী চাবুক মারছিল বিশালাকায় গোমেজের ভাগ্যে যথেষ্ট পরিমাণ মার বরাদ্দ করতে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি সে।

খাঁচার ফাঁক দিয়ে মুখ বেঁকিয়ে গোমেজের অবস্থা দেখার চেষ্টা করছিল কিরান, হঠাৎ সামনে থেকে মৃদু শিসের শব্দে চমকে উঠল ও। ওর সামনের আরেকটা গরাদের ভেতর থেকে কেউ একজন শিস দিয়ে উঠেছে। অন্ধকারের ভেতরে প্রথমে

একটা আবছা ছায়া ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। ভালোভাবে চোখ কুঁচকে তাকাতেই চুল-দাঁড়িওয়ালা একটা অবয়ব দেখা গেল। ব্যাপার কী, এই ব্যাটা শিস দিচ্ছে কেন।

'আপনে হুজুর তালেব না?' সামনের লোকটা প্রশ্ন শুনে হঠাৎ একটু চমকে উঠল কিরান। *ব্যাপার কী?* এই গজব পড়া কারাগারে কে ওর নাম ধরে ডাকে। 'কে তুমি?' প্রশ্নটা করতে চায়নি। কিন্তু কৌতূহলের কাছে বাস্তবতা পরাজয় লাভ করতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে কথাটা।

'হুজুর আমি হেকমত বৈঠা,' বলে লোকটা যেন মৃদু হেসে উঠল।

'কে?' প্রশ্নটা উচ্চারণ করতেই হঠাৎ লোকটার কথা মনে পড়ে গেল কিরানের। মনে পড়ার পেছনে প্রথম কারণ হলো লোকটার অদ্ভুত নাম। কর্ণফুলির তীরের নৌ-নির্মাণকারী গ্রামের ছেলে হেকমত বৈঠা হলো তাদের গ্রামের বৈঠা নির্মাণকারীদের ভেতরে সেরা কারিগর। এই লোকটা সম্ভবত একটা সময় তার বিশেষ বাহিনীর ভেতরেও সেরা কারিগর ছিল। অবশ্য কিরান যে-সময়ের কথা ভাবছে সেটা আজ থেকে বহু বছর আগের কথা। এখন নিশ্চয়ই সে আর আগের সেই বৈঠা নেই। তা না হলে এখানে থাকত না সে।

'বৈঠা তুই এইখানে? ক্যামনে?' কিরান এরকম বিধ্বস্ত অবস্থাতেও এই লোককে এখানে দেখে বেশ অবাক হয়েছে। কারণ ওর যতটুকু মনে পড়ে ওর বাহিনী ভেঙে যাওয়ার পর বৈঠা তার কারিগরদের দল নিয়ে অন্য বাহিনীতে চলে গেছিল।

'আরে ওস্তাদ, তুমি এইখানে?' বৈঠাকে দেখে মনে হচ্ছে, কিরানকে দেখে সে যারপরনাই খুশি। 'তুমারে দেইখা কি যে ভাল্লাগতাছে, কি কমু, এই ওঠ,' বলেই বৈঠা পা দিয়ে তার পাশেই খাঁচার ভেতরে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকা একজনকে লাথি মারল। 'এই উঠ, দেখ আমার ওস্তাদ,' বলেই সে কিরানের দিকে চোখ তুলে বলে উঠল, 'ওস্তাদ, তুমি তো জানো না, তুমার কথা কত গপ্পো করছি ওগো লগে,' বৈঠার পাশ থেকে ছোট্ট একটা ছেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। কাঁচা ঘুমভাঙা চোখে জুলজুল করে কিরানকে দেখছে। 'ওস্তাদ, এইডা আমার পোলা, আমরা একলগে বাজারে চুরি করি। হারামির পো, সেলাম দে,' বলেই সে সদ্য ঘুম ভেঙে ওটা ছেলেটাকে কনুই দিয়ে গুতো মারল। ছেলেটা কীবুঝল কে জানে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে রাখল সালামের ভঙ্গিতে।

এভাবে এই বন্দি কারাগারের খাঁচার ভেতরে পূর্ব জীবনের মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতে কিরান একটু অস্বস্তি বোধ করছে। 'ইয়ে বৈঠা তুই এইহানে ক্যামনে?' ওর পাশের খাঁচাতে গোমেজের বাঘের মতো গর্জনের মতো নাক ডাকার শব্দ শুনে খানিকটা স্বস্তি বোধ করছে কিরান।

'আর কইয়ো না ওস্তাদ,' বৈঠা আধা দাঁড়ানো থেকে আবারও খাঁচার গায়ে হেলান দিয়ে বসল। এক হাতে মমতার সঙ্গে হাত বুলাতে শুরু করল তার ছেলেটার গায়ে। 'তুমি তো দল ভাইঙ্গা দিলা। এরপরে অন্য দলে গেলাম, টিকতে পারলাম না। সব হারাইয়া বাড়ি ফিরলাম। হেরা টেকা-পয়সা যা দিছিল সব শ্যাষ কইরা কিছু আছিল, হেইগুলা...'

'নিশ্চিত গঞ্জের বাজারে জুয়ায় হারছিলি?' কিরানের মনে পড়ে গেল বৈঠা মারাত্মক জুয়াড়ি ছিল।

এমন অবস্থাতেও খানিকটা লজ্জিত হাসি দিল বৈঠা। 'ঠিকয় ধরছো ওস্তাদ। তুমরা অহনো মনে আছে আমার জুয়ার কতা... হায়রে তুমি যহন কাপ্তেন আছিলা জাহাজের পাটাতনের তলে কত জুয়া খেলছি তুমারে পলায়া। একবার তুমি যে-মাইরডা দিসিলা।'

কিরানও মৃদু হাসল সামরিক জাহাজে জুয়া খেলা নিষেধ। তবুও লুকিয়ে নাবিকরা মাঝেমাঝেই জুয়া খেলে। কাপ্তান হিসেবে কিরান বুঝতে পারলেও সে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই ছাড় দিত। সব কাপ্তানই তাই করে। কিন্তু ধরা পড়লে ভিন্ন কথা।

'তারপর কী করলি?'

'ও,' বৈঠা মনে হয় কিরানকে দেখে পুরনো স্মৃতিতে হারিয়ে গেছিল। 'আসলে গঞ্জের বাজারো জুয়া খেলছিলাম শুধু নেশায় না। ওই ঘটনার পরে মাথাডা আউলায়া গেছিল। জুয়ায় সব হারায়া গেরামে ফিরা দেহি কিছুই নাই।'

'কিছুই নাই মানে?' কিরান অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'পুরা গেরাম, মানুষ, বাড়িঘর সবকিছু, সবকিছু ফিরিঙ্গিরা জ্বালায়া দিছে। আমগো জাহাজের লগে ওই ঘটনার পরে ওরা পুরা এলাকায় কুনো গেরাম ছাড়ে নাই। কুনো শহর ছাড়ে নাই। সব জ্বালায়া লুট কইরা সাফা কইরা দিছে। সমর্থ পুলা-মাইয়াগোরে সব ধইরা লইয়া গেছে আরাকানের হাটে বেচতে। আর বাচ্চা বুড়াগরে যাগো পাইছে মাইরালাইছে বাকিগরে ফালায়া গেছে মরবার লাইগা।'

'এটা কে? তোর ছেলে?' বৈঠার পাশে বাচ্চাটা আবার শুয়ে পড়েছে।

'নাহ, আমার ভাইয়ে পুলা, ওহন নিজের পুলাই মনে করি,' বৈঠা আবারও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'গেরামে যহন গেলাম তহন সব তো শ্যাষ। আমার বউ-বাচ্চা, সব শ্যাষ। আমার বাচ্চাডারে ফিরিঙ্গিরা পুরায়া মারছে বেগতের লগে। বউডারে ধইরা লইয়া গেছে গা। গেরামে বাইচ্চা থাহার মধ্যে একমাত্র এই ভাতিজাডারে পাইছি। তহন দুই বছর বয়স জঙ্গলের মধ্যে কান্তাছিল। হাসা কথা অইলো ওই ঘটনার পরে এর লাইগাই বাইচা রইছি। নাইলে মইরাই যাইতাম।'

'এখানে, মানে এই জেলে আসলি কীভাবে?'

বৈঠার কাহিনি একটু বিরক্ত লাগছে কিরানের। পুরনো সব দুঃসহ স্মৃতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে নিজের ভেতরে। বর্তমান জীবনের দায়ভারেই কিরানের অবস্থা কাহিল। তার ওপরে যদি পুরনো বাজে স্মৃতি এখন মাথার ভেতরে হামলা চালায় তবে মরতে হবে ওকে।

'ওস্তাদ ওইহান থেইকা আইসা কিছুদিন রাউজানের জাহাজে কাম করছি। বাল্লাগেনা। এরপরে একটা বাইদ্দা দলের লগে কিছু দিন ঘুরছি। হেগোর লগে এখন বাজিকরের খেলা দেহাই বাজারে বাজারে।'

'বাজিকরের খেলা দেখানো তো আর কোনো অপরাধ নয়। এখানে এসেছিস কীভাবে?'

'হে হে,' বৈঠার মুখে লাজুক হাসি। 'মানে খেলা দেহানির ফাঁকে ফাঁকে সইন্ধাবেলা সুবিধামতোন চুরিও করি, আবার সুযোগ পাইলে ডাহাতিও করি।'

'সর্বনাশ কি বলিস?' কিরানের যতটুকু মনে পড়ে বৈঠা একটা ভালো মানুষ ছিল। তার এই বাজে অধঃপতনে মনের ভেতরে একটু দুঃখই লাগল ওর। মানুষটার এই পতনের পেছনে কি ওরও খানিকটা ভূমিকা আছে? মনের ভেতরে প্রশ্নটা উদয় হতেই কেমন জানি চমকে উঠল কিরান। 'ধরা পড়লি কীভাবে?' কিরান যতটুকু জানে এসব বেদে ডাকাতরা খুব চতুর আর সতর্ক হয়ে থাকে।

'আর কইয়ো না আইজ দুই বছর এইগুলা করি, জীবনেও কিছু অই নাই। এইবার কপাল খারাপ। কাইল সইন্ধার পরে একটা দলরে লুট কইরা মাত্র সারছি বান দেওয়াও শেষ অয়নাই, রাস্তার ওপরে আরাকানিগর বাহিনী কইত্তে আইলো খুদা জানে। ধরা পইড়া গেলাম,' বৈঠার গলায় চরম আফসোস। 'আমারে তো ফাঁসি দিবোই খারাপ লাগতাছে আমার বাইচ্চাডারেও মাইরালাবো।'

কিরানের খুবই খারাপ লাগল বৈঠার জন্য। ভালো হোক, মন্দ হোক বেচারা সব হারিয়ে একটা জীবন তো বেছে নিয়েছিল। ও নিজে তো সেটাও পারেনি। এখন অকালে সেই জীবনের অবসান হতে চলেছে বেচারার। ও যতটুক জানে এ-ধরনের চোরদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দেওয়া হয়। 'দেখ বৈঠা...' কিরান তাকে মিথ্যে কোনো আশ্বাসবাণী শোনাতে যাচ্ছিল তার আগেই ওর পাশের খাঁচার ভেতরে গোমেজ হঠাৎ ধাম করে সোজা হয়ে বসল ঘুমের ভেতরেই।

একে তো ছোট্ট খাঁচা তার ওপরে একটার সঙ্গে আরেকটা খাঁচা লেগে আছে গায়ে গায়ে। বিশালাকায় গোমেজ সোজা হয়ে বসতেই ভীষণ জোরে তার মাথা ঠুকে গেল খাঁচার ওপরে। 'হুফফ, হুফফফ, হুফফফ,' মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে উঠল সে। একে তো খাঁচায় খাঁচায় ঠোকাঠুকি তার ওপরে আবার মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করাতে আশপাশের অনেক খাঁচাতেই কারো কারও ঘুম ভেঙে গেল। রাগত গলায় ধমকে উঠল কেউ কেউ।

'গোমেজ কি হইছে?' কিরান একটু অবাক হয়েই জানতে চাইল।

'হুমম হুমম,' বলেই গোমেজ তার ডান হাতের তর্জনি চেপে ধরল ঠোঁটের ওপরে। 'কী ব্যাপার?'

ঘটাং করে খুলে গেল কারাগারের লোহার দরজা। খাঁচার শব্দ আর ঠোকাঠুকিতে বিরক্ত প্রহরী চলে এসেছে। 'এই বান্দির পুতেরা, মাইঝরাতে কি অইছে তগো?'

গোমেজ মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করেই চলেছে। 'এই গোমেজ চুপ কর, মরতে চাস নাকি?'

ওদিকে প্রহরী হাতের আলো তাক করেছে গোমেজ আর কিরানের দিকে। 'এই, ওইটার কী হইছে?' বলে সে হাতের লম্বা চুক্কির মতো লোহার চোখা জিনিসটা এগিয়ে আনতে লাগল গোমেজের দিকে। মনে মনে আঁতকে উঠল কিরান। গণ্ডগোল একটা লাগতে যাচ্ছে। 'গোমজে, চুপচাপ শুয়ে পড়,' মৃদু স্বরে বলে উঠল সে। কী করা যায় ভাবার চেষ্টা করছে সে দ্রুত। প্রহরীর চোখা জিনিসিটা প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে এমন সময় গোমেজ আবারও ঠোঁটের ওপরে তর্জনী চেপে ধরে চুপ থাকবার ইশরা করল। কিরান একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে আছে গোমেজের দিকে। ব্যাপারকী?

প্রায় সঙ্গেসঙ্গে বজ্রপাতের মতো তীব্র শব্দে ভেঙে পড়ল কারাগারের একপাশের দেয়াল, শক্তিশালী আঘাতে কারাগারের কয়েকটা খাঁচাসহ দরজা আর দেয়ালের অনেকটা অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

অধ্যায় আট

বর্তমান সময়

স্পেশাল ব্রাঞ্চ, টেম্পোরারি সেল, ঢাকা

শারিয়ারের কাছে মায়ের স্মৃতি মানেই এলোমেলো আর ছিন্নভিন্ন এক অনুভূতি।

'মা' শব্দটা শারিয়ারের কাছে খুবই অদ্ভুত একটা শব্দ। এর পেছনে কারণ হলো, প্রতিটি মানুষের চিন্তাভাবনার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংযোজিত থাকে যে-ব্যাপারটা সেটা হলো, সেই ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত একটি শব্দ। কারণ মানুষকে ভাবতে হলে তাকে সেই ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত শব্দটা চিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত করে ভাবতে হয়। একজন মানুষ যে শব্দটার সঙ্গে পরিচিত নয়, সেই শব্দটা নিয়ে চাইলেও সে সহজে ভাবতে পারবে না।

আর ঠিক এ কারণে যখনই মা শব্দটার কথা মনে হয়, তানভীরের কাছে ব্যাপারটা কেমন জানি স্বপ্নের লাগে। কারণ মায়ের সঙ্গে তার সমস্ত যোগাযোগ একমাত্র স্বপ্নেই বিদ্যমান। মায়ের সঙ্গে তানভীরের কোনো স্মৃতি নেই। কারণ সে খুব ছোটো থাকতেই তার মা মারা যায়। তার কাছে মা বলতে শুধুই অ্যালবামে থাকা কয়েকটা ছবি। তবে মা মাঝে মাঝে ওর স্মৃতিতে হানা দেয়, ঘুমের মাঝে স্বপ্নের ভেতরে। মাকে সে প্রথম স্বপ্নে দেখতে পায় স্কুলে থাকতে, প্রথম যেদিন মাতাল হয় সে।

তানভীরের কাছে মা-বাবা দুজনেই সুদূর পরাহত। আর তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব একমাত্র চাচার ওপরে ন্যস্ত। আর তানভীরের প্রতি তার চাচার ভালোবাসা কোনো বাঁধ মানে না। কিন্তু ব্যবসায়ীক কাজে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকার কারণে ভদ্রলোক কোনোদিনই ঠিকমতো তানভীরের স্কুলের প্রোগ্রামে যেতে পারত না। কিন্তু নিজে যেতে না পারলেও সে এক বস্তা করে টাকা পাঠিয়ে দিত তানভীরের জন্য। যাতে সে নিজের পছন্দমতো এটা-সেটা কিনতে পারে। বোর্ডিং স্কুলের কঠিন জীবন থেকে যখনই মুক্তি পেত ইচ্ছেমতো সে সদ্ব্যবহার করত সেই টাকার। আর এসব ক্ষেত্রে যা হয় এরকম ছেলেদের সঙ্গে জুটে যায় একদল দুধের মাছি। আর তানভীরের সঙ্গেও এরকম একদল দুধের মাছি সবসময় ছোঁক ছোঁক করত।

স্কুলের কোনো এক ছুটিতে এরকমই যখন সে একদল দুধের মাছির সঙ্গে মাতাল হয়ে এক বন্ধুর বাসার ছাদে পড়েছিল এমন সময় হঠাৎ সে দেখতে পায় তার মাথার কাছে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে অসম্ভব মমতাময়ী একজোড়া বাদামি চোখ। ঘুমের মাঝে দেখা মানুষের স্বপ্ন নাকি কখনো রঙিন হয়না। কিন্তু তানভীর ঘুমের মাঝে যতদিন নিজের মাকে দেখেছে এক জোড়া বাদামি চোখ সে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে। ওইদিনের পর থেকে মাকে সে মাঝে মাঝেই স্বপ্নে দেখতে পায়। বেশিরভাগ সময়ই স্বপ্নটা একইরকম হয়; কোনো একটা কুল-কুল করে বয়ে যাওয়া জলধারার পাশে ঘাসের ওপরে শুয়ে থাকে সে। তার মাথার পাশে বসে পরম মমতায় চুলে হাত বুলিয়ে দেয় মা। আর যখন এই স্বপ্নটা দেখে সে সবসময় মনে হয় কোনো অবস্থাতেই যেন ঘুম না ভাঙে তার। তবে মাঝে মাঝে এই স্বপ্নের ব্যতিক্রমও হয়। কখনো-কখনো মা তাকে ভীষণ কটু কথা বলে শাসনও করে স্বপ্নের মাঝে। ঠিক যেমনটা সে করতে যাচ্ছে আজকে।

যেদিন মা ওকে শাসন করে মায়ের চেহারা দেখেই তানভীর বুঝতে পারে আজ মা তার ওপরে অখুশি। আর এমনটা সেদিনই ঘটে যেদিন সে দেখতে পায় মায়ের বাদামি চোখ জোড়ায় অশ্রু টলটল করছে। সেদিন দুঃখে কষ্টে তানভীরের মরে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয় চিৎকার করে বলে আর কোনো অবস্থাতেই সে দুষ্টুমি করবে না, সবসময় শান্ত-সুবোধ ছেলের মতো ভালো হয়ে চলবে। ভীষণ কষ্ট হয় তখন, মনে হয় তার পৃথিবীটা চারিপাশ থেকে ভেঙে পড়ছে। তীব্র জোরে চিৎকার করতে ইচ্ছে করে তখন।

ঘুমের মাঝেই ভীষণ একটা চিৎকার করে ধর-মর করে উঠে বসল সে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে মনে হলো, সে বুঝতেই পারছে না কোথায় আছে। তীব্র লাইটের আলোটা হাত দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, বুকের ঠিক মাঝখানটায় ভীষণ একটা জ্বালাধরা অনুভূতি। লাইটের তীব্র আলোটা এক হাতে আড়াল করে অন্য হাতে বুক ডলতে ডলতে উঠে বসার চেষ্টা করল শারিয়ার। বেশ অনেকটা সময় লাগল তার চোখের দৃষ্টিটাকে আলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে। আর সেটা করতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সে অনুধাবন করতে পারল কোথায় আছে এবং কী ঘটেছিল।

এই মুহূর্তে একটা আট বাই দশ সাইজের সেলের ভেতরে আছে সে। ধূসর রঙের সেলটার তিন দিকে দেয়াল, একদিকে লোহার শিক দেয়া। শিকগুলোও ধূসর রঙের। ছোট্ট রুমটার একপাশে একটা ছোট কিউবিকলের মতো। প্রাকৃতিক কর্ম সারার ব্যবস্থা। আর দেয়ালের সঙ্গে জোড়া লাগানো দুটো লোহার কটের মতো বিছানা। দুটোর একটা থেকে সম্ভবত সে গড়িয়ে পড়ে গেছে নিচে। অন্যটাতে বসে তার দিক অত্যন্ত ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছুঁচোর মতো দেখতে এক লোক।

বুক ডলতে ডলতে লোহার কটটাতে উঠে বসল শারিয়ার। আপনাতেই হাত চলে গেল পকেটে। দুই পকেটের কোনটার ভেতরে মোবাইল কিংবা মানিব্যাগ কিছু তো নেই-ই এমনকি জ্যাকেটের পকেটগুলোও ফাঁকা।

বড় করে একবার দম নিয়ে সোজা হয়ে বসল শারিয়ার। হঠাৎ মাথার ভেতরটা ফাঁকা লাগছে। কারণ ওর মনে পড়ে গেছে বাইক রেসের ওখান থেকে তাকে ধরে আনা হয়েছে। কথাটা মনে হতে একইসঙ্গে মুখে সামান্য হাসি ফুটে উঠল, আবার মনের ভেতরে খানিকটা দুঃখবোধও হতে লাগল। দুঃখের কারণ হলো, মাত্র ছয়মাস হলো সে দেশের বাইরে ছিল এরইমধ্যে হারামজাদাগুলো তার রেসের ময়দান দখল করে ফেলেছে। ওর নিজের লোকদের মেরে-ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। তবে দুঃখের ব্যাপার ওর নিজের লোকেরাও ওর অনুপস্থিতির সুযোগে কিছু খারাপ কাজ করেছে। দুঃখ লাগছে ওর নিজের লোকদেরকেই আরেকটু টাইট দেয়ার দরকার ছিল। সেটা করার আগেই এরা তাকে ধরে আনল। কথাটা ভাবতেই শারিয়ারের মুখে ফুটে উঠল কারণ কারা তাকে ধরে এনেছে এটা মোটামুটি সে ধরতে পেরেছে।

বুকের যেখানে জ্বলছে আনমনেই সেখানে সামান্য ডলা দিল সে। এ দেশে কাদের কাছে টিজার আছে ভালোভাবেই জানে শারিয়ার। তবে তার হাসার কারণ সেটা নয় বরং এই রেস আর এভাবে ধরা পড়া নিয়ে তাকে যে বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে...'

'ওই, সিগারেট আছে সিগারেট?' হঠাৎ মুখের কাছে খসখসে একটা কণ্ঠ বলে উঠল।

শারিয়ার তাকিয়ে দেখল ময়লা কাপড়-আর ততোধিক ময়লা চেহারা নিয়ে তার দিকে খুব কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দ্বিতীয় কটে বসা সেই লোকটা। শারিয়ার একবার মুখ তুলে তার দিকে দেখে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। তাতে লোকটা খানিকটা অপমান বোধ করল কিনা কে জানে। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো শারিয়ারের দিকে।

'এই ব্যাটা, তরে একটা কথা জিগাইসি না?' লোকটা বেশ অনেকটাই এগিয়ে এসেছে শারিয়ারের দিকে। ও আবারো মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখল। নির্দ্বিধায় বলতে পারে, নেশাখোর। সম্ভবত নেশার আখড়া থেকে ধরে এনেছে এটাকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে একে স্পেশাল সেলে কেন রেখেছে।

'সিগারেট আছে তোর কাছে?' একইরকম খসখসে গলা।

'হট,' শারিয়ার ধমকে উঠে ওটাকে দূরে সরার জন্যে ইশারা করল।

কিন্তু লোকটার মধ্যে কোনো বিকার দেখা গেল না। সে শারিয়ারের একেবারে কাছে এসে উঁবু হয়ে তার দিকে তাকিয়ে নোংরা হলুদ দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

'বড়লোকের পোলা, ধইরা আনছে না?' সে দাঁত কেলিয়ে বলতে লাগল। 'কই গেছিলি? মাগি লাগাইতে?' বলে সে কুৎসিত ভঙ্গিতে হেসে উঠল। 'তোরে আর তর বাপেরে তো এহন খসাইবো,' বলে সে উঁবু অবস্থা থেকেই একটা হাত তুলে আঙুল দিয়ে দেখাল, 'কমসে কম দশের নিচে ছাড়ব না। আমারে কিছু দিলে ওস্তাদগোর লগে সেটিং কইরা কমে ব্যবস্থা কইরা দিমু। বুচ্ছোস?'

শারিয়ার মুখ তুলে তাকাল তেলাপোকার মতো লোকটার দিকে। ডান হাতটা তুলে সপাটে চড় মারল লোকটার মুখে। ওর শক্ত চড় খেয়ে হালকা শরীর নিয়ে প্রায় ছিটকে গিয়ে পড়ল সেলে শিকের ওপরে, শিকে বাড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

শারিয়ার আনমনেই মাথা নাড়ল। সবখানেই দুই নম্বরি। শালার ঘুস খাওয়ার মধ্যেও দুই নম্বরি করে এরা। এই স্পেশাল সেলে থাকা নোংরা লোকটার ভূমিকা ঠিক ধরতে পারছিল না ও। এখন বুঝতে পারছে। এই লোক একদিকে যেমন নেশাখোর, একইসঙ্গে আবার সে পুলিশের ইনফর্মার। তবে এই সেলে লোকটাকে এনে রাখা হয়েছে বিশেষ একটা কারণে। এরা বড়লোকের পোলাপানদের ইয়াবার আখড়া অথবা সেক্স জয়েন্ট থেকে ধরে এনে বাবা-মায়ের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে। এ-ধরনের বড়লোকের ছেলেপেলেরা, যারা পরিবারের তৈরি অর্থনৈতিক আর পারিবারিক নিরাপত্তা বলয়ের ভেতরে থেকে নিজেদের খুব কুল মনে করে, এরাই পুলিশ বা স্পেশাল সংস্থার লোকদের হাতে ধরা পড়ার পর একেবারেই মুরগি হয়ে যায়। আর যদি দুটো ডলা দেয় তবে তো কথাই নেই। কেঁদে-কেটে মাম্মি-পাপাকে ডাকতে শুরু করে।

এসব মুরগিদের ধরে নরম করার পর যখন এইসব সেলে রাখা হয় তখন ডাক পড়ে এইসব লোকদের। আইনের লোকজন সওদা করার জন্যে সরাসরি কথা না বলে অনেক সময় এদের ব্যবহার করে মধ্যম মানুষ হিসেবে। আইনের লোকদের হয়ে এরাই নেগোশিয়েশনটা করে দেয়। চমৎকার ব্যবস্থা। কারো কোনো লস নেই, সবাই জয়ী এই ব্যবস্থায়।

শারিয়ার মুখ তুলে তাকাল তেলাপোকাটার দিকে। নেশা করতে করতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই এর ভেতরে। লোকটাকে মেরে একটু খারাপ লাগছে কিন্তু এটুকু না করলে ব্যাটা যন্ত্রণা দিত।

সেলের ফ্লোর থেকে কোনোমতে উঠে বসে শিকের সঙ্গেই হেলান দিয়ে বসে ভয়ের দৃষ্টিতে ওকে দেখছে লোকটা। ঠোঁটের কোণে রক্ত লেগে আছে।

'আর চাইবি সিগারেট?' শারিয়ারের একটু খারাপই লাগছে লোকটাকে মারাতে। এসব মানুষ হলো বোধবুদ্ধিবিহীন তৃতীয় শ্রেণির প্রাণীর মতো। এদেরকে

যারা ব্যবহার করে তারা হলো আসল অপরাধী। কিন্তু যে-সমাজে দুর্নীতি হলো সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ব্যবস্থা, সেই সমাজে এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

লোকটা ভয়ের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার নোংরা জ্যাকের ভেতরের পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে ফ্লোরে রেখে ঠেলে দিল ওর দিকে। শারিয়ার খুব অবাক হয়ে দেখল একেবারে আনকোরা একটা বেনসন লাইটের প্যাকেট, সঙ্গে বিকের একটা সাদা লাইটার। শারিয়ার প্যাকেটটা তুলে নিয়ে খুলতে খুলতে ওর দিকে তাকিয়ে ধন্যবাদসুলভ একটা হাসি দিল। এই সিগারেটের মালিক এই লোক নয়। সম্ভবত এই লোককে দেয়া হয়েছে এই সিগারেট যাতে সে মুরগিদেরকে পটানোর সময়ে সিগারেট অফার করে তাদেরকে মানসিকভাবে একটু সাপোর্ট দিয়ে আরেকটু বেশি টাকা আদায় করতে পারে।

শারিয়ারকে সিগারেট ধরিয়ে মৃদু হাসতে দেখে লোকটা খুব খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিলো কিন্তু ওকে চোখ গরম করে তাকাতে দেখে আবারো বসে পড়ল সে। 'ওস্তাদ আপনে কেডা?' গালে হাত বুলাতে বুলাতে জানতে চাইল সে। এতদিনের অভিজ্ঞতায় সে এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছে পুলিশ সেলে বসে এভাবে যে চড় মারতে পারে, সে আর যাই হোক সাধারণ কেউ নয়। হয় সে অনেক বড় ক্রিমিনাল আর না হয় উল্টো।

শারিয়ার সিগারেটে আরেকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সুন্দর একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল তার আগেই সেলের বাইরে কারো পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। শারিয়ার মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল আফতাবনগরে দেখা তিন কালো কোটের একজন এগিয়ে এসেছে সেলের দিকে। লম্বা-চওড়া লোকটা সেলের বাইরে এসে দাঁড়াতেই শারিয়ারের মুখে ফুটে উঠল মৃদু এক টুকরো হাসি।

'দুই ভাইয়ে দেখি ভালোই খাতির হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই,' লোকটা হেসে উঠে একবার ওই লোকটাকে দেখাল, কালো কোটকে দেখে সে শিকের ওখান থেকে আবারো সরে গেছে দেয়ালের দিকে। লোকটাকে দেখে নিয়ে সে ইঙ্গিত করল শারিয়ারের দিকে। 'অবশ্য, মিল হবারই কথা। দুটোই একই পদের।'

কিন্তু তার কথার জবাবে বিন্দুমাত্র অপমানবোধ না করে শারিয়ার হেসে উঠে ঠোঁট আর জিহ্বা দিয়ে মৃদু চুক-চুক শব্দ করতে লাগল। 'আহারে বেচারা,' বলে সে জোরেই হেসে উঠল। 'কতো শখ ছিলছেলে ইংল্যান্ডে যাবে সরকারি ট্রেনিংয়ে, বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে। আর বেচারা ইংল্যান্ডে যেতে না পেরে ডিপার্টমেন্টই বদলে ফেললো।'

সঙ্গেসঙ্গে কালো কোটের চেহারার রং বদলে গেল। 'আর তুই কী করলি বিদেশ থেকে ট্রেনিং করে এসে?' বলে সে রাগের সঙ্গে সেলের শিকে একটা থাবা মারল। 'যার যা কাজ। পাশা স্যার একটা গাধা লোক,' এই পর্যন্ত বলতেই শারিয়ার রাগের সঙ্গে ঝটকা দিয়ে উঠে বসল।

'স্যারকে নিয়ে উল্টো-পাল্টা কথা বলবি না। খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।'

শারিয়ারের কথার জবাবে জোরে হেসে উঠল কালো কোট। 'আমি উল্টা-পাল্টা বললে দোষ। আর তুই যে স্যারের নাম ডোবাচ্ছিস। দেশের বাইরে থেকে ট্রেনিং করে এসে এই তোর ঠিকানা?' বলে সে সেলটা দেখাল। 'চোদ্দ শিকের ভেতরেই যদি পৌছাবে তাহলে আরেকজনের সিট কেন নষ্ট করলি?'

শারিয়ার খুব শক্ত একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। এক হিসেবে যাবের ভুল বলেনি। ও একটা হাত তুলে যাবেরকে থামতে ইশারা করল। 'শোন এসব কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছিস, বল?'

যাবের ওর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। 'সেটা তোর বসকেই জিজ্ঞেস করিস,' বলে এবার সে নিজের মুখ দিয়ে চুক-চুক জাতীয় শব্দ করে উঠল। 'বেচারা যাদের সঙ্গে এত লড়াই করে তোকে আর তানভীরকে বাইরে পাঠাল, সেই তোকে আওতায় আনার জন্যে আবার তাদের কাছেই সাহায্য চাইতে হলো। আহারে শারিয়ার, তুই এভাবে তোদের প্রিয় পাশা স্যারের মান-ইজ্জত ডোবালি। ভাবতেই খুব খারাপ লাগছে রে,' বলেই সে জোরে হেসে উঠল।

শারিয়ারের মুখটা আপনাতেই নিচু হয়ে গেল। যাবেরের কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। সে যা করেছে করেছে কিন্তু এভাবে পাশা স্যারকে নিচু করাটা ওর একেবারেই উচিত হয়নি। এখন মনে হচ্ছে ইংল্যান্ড থেকে ট্রেনিং করে অফিসের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ না করে মাথা গরম করে রেসের মাঠে যাওয়ার কোনো দরকার ছিল না। 'দেখ যাবের যা হয়েছে হয়েছে, এখন লক-আপ খোল।'

যাবেরের মধ্যে কোনো বিকার দেখা গেল না। সে হাসতে হাসতেই বলতে লাগল। 'বিশ্বাস কর শারিয়ার, তোদের অফিস থেকে আমাদের এখানে যখন অনুরোধ এলো আজ রাতে একটা ছোট ইনবাউন্ড মিশনে আফতাবনগরে যেতে হবে, খুব বিরক্ত লাগছিল। পরে যখন শুনলাম, ওখানে গিয়ে তোকে ধরে আনতে হবে,' বলে সে মুখ দিয়ে তৃপ্তিসুলভ শব্দ করল। 'তোকে ধরার জন্যে যখন টিজারটা মারলাম না-' সে কথা শেষ করার আগেই শারিয়ার বসা থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র বেগে এগিয়ে গেল সেলের শিকগুলোর দিকে। যাবের সতর্ক হবার আগেই শিকের ফাঁক দিয়ে হাত বের করে খপ করে ধরে ফেললো যাবেরের কোটের কলার। জোরে একটা টান মারল যাবেরকে। কাঁচের বাল্বের গায়ে লাঠি

দিয়ে বাড়ি মারলে যেমন শব্দ হয় অনেকটা তেমনি ফট জাতীয় একটা শব্দ করে যাবেরের নকটা ভেঙে গেল শিকের সঙ্গে লেগে, শারিয়ার গায়ের জোরে আরেকটা বাড়ি মেরে হয়তো তার মাথাটাই ভেঙে ফেলতো কিন্তু তার আগেই পেছন থেকে ভারি একটা গলা ধমকে উঠল তাকে।

'শারিয়ার ছাড়ো ওকে, বিহেইভ ইওরসেল্ফ।'

জেলে থাক আর যেখানেই থাক একবার যেহেতু শিকার হাতের মুঠোয় এসেছে তাকে ছাড়ার বান্দা শারিয়ার নয়। কিন্তু ধমকটা খাবার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই তাকে ছেড়ে দিল শারিয়ার। কারণ দুনিয়ার একমাত্র মানুষ যাকে সে কেয়ার করে এবং বলতে গেলে খানিকটা ভয়ও পায়, ধমকটা উচ্চারিত হয়েছে তার মুখ থেকে।

যাবেরকে ছেড়ে দিয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল শারিয়ার। সেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দুজন মানুষ। একজনের গায়ে ঠিক যাবেরের মতোই কালো কোট। অপরজনের পরনে সাধারণ লাইট ফরমাল ট্রাউজার, তাতে যত্নের সঙ্গে টাক্ট ইন করা ঘিয়ে রঙের পলো টি-শার্ট, মাথায় ক্যাপ, পায়ে পুমার স্নিকার্স। মানুষটাকে দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র সে গলফ খেলার মাঠ থেকে সোজা চলে এসেছে এখানে। মানুষটা আর কেউই নয়, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের স্পেশাল উইংয়ের প্রধান সৈয়দ হাবিব আনোয়ার পাশা।

যদিও যাবেরকে ছেড়ে দিয়েছে শারিয়ার তবুও সেলের সামনে এসে আরেকবার ধমকে উঠল সে, 'উই ইনসেন ব্র্যাট, এভাবে কেউ ফেলো অফিসারের গায়ে হাত তোলে! তাও,' সে চট করে একেবার দেখে নিল সেলে অপর প্রান্তে প্রায় গুটিশুঁটি মেরে বসে থাকা লোকটার দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে যাবেরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আর উই অলরাইট?' যাবের কোন কথা না বলে স্রেফ মাথা নেড়ে জবাব দিল, সে ঠিক আছে। যদিও রুমাল চেপে ধরে সে নাকের রক্ত বন্ধ করতে ব্যস্ত।

আনোয়ার পাশা তার সঙ্গে আসা দ্বিতীয় কালো কোটকে নির্দেশ দিতেই সে এগিয়ে এসে সেলের দরজা খুলে দিয়ে ভেতরে একটা ছোট টুল রেখে দিল শারিয়ারের কটটার ঠিক বিপরীতে। তারপর সেই লোকটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বন্ধ করে দিল সেলের দরজাটা।

ওরা যাওয়া পর্যন্ত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে শারিয়ারের দিকে। পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই রাগের সঙ্গে একবার হাত নেড়ে সে বরে উঠল, 'শারিয়ার, আর উই ইনসেন?' তার গলায় রাগ-ক্ষোভ-হতাশা আর বিরক্তি একসঙ্গে যেন ফেঁপে উঠছে।

'স্যার, যাবের আপনাকে নিয়ে বাজে কথা বলছিল? ও বলছিল-'

'আমি ফাকিং কেয়ার করি না যাবের কী বলছিল। আই কেয়ার অ্যাবাউট হোয়াট দ্য ফাক ইউ আর ডুয়িং,' বলে সে ট্রাউজারে পকেট থেকে স্টিল কালারের

চকচকে সিগার কেইস বের করল। 'যাবের যা খুশি তাই বলুক তুমি তার ওপরে চড়াও হয়ে যাবে। আর আমি যাবেরের সঙ্গে তোমার মারামারির কথা বলছি না-' বলে সে কেস থেকে সরু একটা সিগার বের করে ঠোঁটে লাগিয়ে কেসের সঙ্গে অ্যাটাচ লাইটার দিয়ে ওটাতে আগুন দিল। 'ট্রেনিং শেষ করে দেশে এসে তুমি অফিসে রিপোর্ট করোনি কেন?'

অস্বস্তির সঙ্গে মাথা নাড়ল শারিয়ার। এসব অফিসিয়াল প্রসিজারে তার চূড়ান্ত বিরক্তি। 'স্যার, সময় পাইনি। আসলে আমি যেতাম কিন্তু...'

'তুমি ট্রেনিং থেকে ফিরে অফিসে যাবার সময় পাওনি, আর রেসের মাঠে গিয়ে কুকুর-বিড়ালের মতো মারামারি করার সময় সুযোগ ঠিকই হয়ে গেছে তোমার?'

শারিয়ার আবারো অস্বস্তির সঙ্গে মাথা নাড়ল। চূড়ান্ত একটা ঝাড়ি খেতে যাচ্ছে সে। এসব ঝাড়ি-ফারির কেয়ার সে করে না। কিন্তু যে-মানুষটা তাকে ঝাড়ি দিতে যাচ্ছে তাকে সে কেয়ার করে। আর সে জানে পাশা স্যার এমন ধীরে ধীরে এমনভাবে প্যাঁচিয়ে ধরবে চাইলেও সে ছুটতে পারবে না। আর তাই অস্বস্তিটা সময়ের সঙ্গে আরো বাড়তে লাগল।

'স্যার...'

'কোনো কথা বলবে না তুমি। একটাও না,' শক্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে সিগারটা তার দিকে পিস্তলের মতো তাক করে বলে উঠল পাশা স্যার। 'একটার পর একটা ফাউল করেছো তুমি। স্কটল্যান্ডের ট্রেনিং সর্বোচ্চ মার্কস পেয়েছো তুমি তোমার টিমে। এরপর কী করলে। যেদিন ফাইনাল সিরিমনি সেদিন তোমাকে ড্রাংক অবস্থায় উদ্ধার করা হয় লোকাল পাব থেকে, তাও তোমাদের টিমের ম্যানেজার মেয়েটার সঙ্গে। এরপর কী করলে? দেশে এসে তিন দিন হয়ে গেছে। ফাকিং তিনদিন হয়েছে, তুমি অফিসে যাওনি। তোমাকে অন্তত আধ ডজনবার ফোন করেছে মৌসুমি, সেগুলোতো ধরোও নি এরপর তোমাকে আমার অন্য ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করে আমার উঠিয়ে আনতে হয়েছে এখানে,' বলে সে হাতের সিগার নেড়ে সেলটা দেখাল,' প্রতিটি শব্দের সঙ্গে তার রাগের হালকা বয়ে যাচ্ছে।

'স্যার, আপনি আমাকে ডাকতেন?'

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে ফোন করতাম, না পেলে তোমার বাসায় গিয়ে তোমাকে অনুরোধ করতাম। স্যার আপনার রেস্ট হয়ে থাকলে এবার অফিসে আসবেন প্লিজ...' পাশা স্যারের চিকন গলায় টিটকিরি মেরে বলা কথাগুলো শুনে শারিয়ারের চূড়ান্ত হাসি পেতেই সে মাথা নিচু করে ফেলল। এরকম অবস্থায় তাকে হাসতে দেখলে হেস্তনেস্ত করে ফেলবে পাশা স্যার।

শারিয়ারকে মাথা নিচু করতে দেখে পাশা স্যার ভাবলো সে লজ্জিত তাই গলাটাকে একটু নরম করে সে বলে উঠল। 'শারিয়ার, তুমি আমার সেটা এবং

সবচেয়ে ব্রাইট অফিসারদের একজন। তুমি, তানভীর তোমাদেরকে নিয়ে আমি কতস্বপ্ন দেখছি। আর তুমি কিনা-' পাশা স্যার কথা না বলে সিগারে জোরে-জোরে টান দিতে লাগল।

তানভীরের কথা শুনে কোনোমতে হাসি সামলে মুখ তুলল শারিয়ার। 'স্যার, তানভীরের কী অবস্থা? ও নাকি আহত হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, আহত হলেও ও অপারেশটাকে খুব সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। যদিও প্রথমবার মাঠে নামার কারণে কিছু ভুলচুক করেছে কিন্তু ও যা করে দেখিয়েছে তা এক কথায় ফেবুলাস,' বলে সে একটু থেমে যোগ করল। 'শোন শারিয়ার। আমি নতুন ডিপার্টমেন্ট বানাতে যাচ্ছি। আর সেজন্যই দুনিয়ার সবাইকে বাদ দিয়ে তোমাকে আর তানভীরকে ইউরোপে পাঠিয়েছিলাম। তানভীরকে নিয়ে আমি একটা বিরাট বাজি ধরেছিলাম সিলেটের কেসটাতে এবং সেই বাজি আমি জিতে গেছি। যার কারণে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে খুব দ্রুতই তোমাদের স্পেশাল টিমের প্রস্তাব পাঠাবো আমি। আর এ কারণেই,' বলে সে আবারও সিগারটাকে সোজা তাক করল শারিয়ারের দিকে। 'আমি চাই তুমি চট্টগ্রাম যাও। ওখানে একটা ভীষণ ঝামেলার ঘটনা ঘটে গেছে। প্রাথমিকভাবে কেসটা পুলিশের হাতে থাকলেও কেসটা নিয়ে কিছু ঝামেলা বেঁধেছে আর তাতেই আমি চাই তুমি কেসটা হ্যান্ডেল করো। সিবিআই কেসটা প্রায় নিয়েই নিয়েছিল কিন্তু আমি সেটা হতে দিইনি। এর পেছনে কিছু কারণ আছে,' আনোয়ার পাশা চিন্তিত মুখে বলে উঠল।

'স্যার, ব্যাপারটা কী?' শারিয়ার ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বোধ করতে শুরু করেছে। দীর্ঘদিনের ট্রেনিংয়ে শরীর আর মাথায় জং ধরে গেছে। আর তাই প্রকৃত কেসের গন্ধে ভেতরটা চনমন করে উঠছে ওর।

'চট্টগ্রামের পতেঙ্গা রোডে একজন লোক অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। তাকে নিয়েই তৈরি হয়েছে জটিলতা,' এইটুকু বলে সে হাত নাড়ল। 'আমি বিশদ বলব না তোমাকে,' বলে সে টিটকিরির হাসি হাসল। 'পুলিশ সেলে অফিসার ব্রিফ করে অভ্যস্ত নই আমি,' শারিয়ার আবারও মাথা নিচু করে ফেলল।

'কাল সকালের ট্রেনে তুমি চট্টগ্রাম যাচ্ছ। সকালে মৌসুমি টিকিটসহ ফাস্টপ্যাক নিয়ে তোমাকে বাসা থেক পিক করবে। ও তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে দিতে ব্রিফ করবে ইন ডিটেইল,' বলেই সে উঠে দাঁড়াল।

'শারিয়ার, তানভীরকে নিয়ে আমি একটা বাজি ধরেছিলাম। ও তাতে আমাকে সাফল্য এনে দিয়েছে,' বলে সে চোখ নাড়ল। 'তোমার ওপরে আমি আরো বড়ো বাজি ধরছি। এটাতেও আমার সাফল্য চাই। মনে রেখো, কোনো ধরনের ভুলচুক আমাদের জন্য সাংঘাতিক প্রাণঘাতী হতে পারে। বেস্ট অব লাক...'

পেছন থেকে শারিয়ার জানতে চাইল, 'স্যার, আমি কি...'

'নাহ তুমি এখানেই থাকবে আরো কয়েক ঘণ্টা, এরপর আমি ফরহাদকে কল করে দেব, ও ড্রাইভার পাঠালে চলে যাবে। তোমার বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে,' বলে সে মুখ বাঁকিয়ে সামান্য হাসল। 'আর এই কয় ঘণ্টা এখানে কাটানোটা হলো তোমার বেয়াদবির শাস্তি,' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে যাওয়ারজন্য। কী মনে কওে আবারও ফিরে তাকাল শারিয়ারের দিকে। 'শারিয়ার, তুমি আমার সবচেয়ে সেরা অফিসার বলে কথাটা বলছিনা। বলছি তুমি আমার বন্ধুর ছেলে ব'লে,' পাশা স্যার সাধারণত এরকম ইমোশনাল কথা কিংবা ব্যক্তিগত কথা কখনোই বলে না, তাই একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শারিয়ার।

সিগারটাকে শেষ একটা টান দিয়ে পাশা স্যার বলে উঠল, 'এভাবে নিজেকে অপচয় করো না। সময় খুব খারাপ জিনিস, একবার যা হারাবে তা আর ফিরে পাবে না।' বলে সে একবারও পেছনে না ফিরে সোজা বেরিয়ে গেল।

একটা বড়ো নিঃশ্বাস ছেড়ে শারিয়ার মুখ ভেংচে পুনরাবৃত্তি করল পাশা স্যারের শেষ কথাগুলো। হাবিব আনোয়ার পাশা বেরিয়ে যেতেই কটের নিচে হাত ঢুকাল তেলাপোকাটার রেখে যাওয়া সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার নেওয়ার জন্য। কিন্তু জিনিস দুটো নেই ওখানে।

শালার তেলাপোকা বের হওয়ার আগে ঠিকই সরিয়ে ফেলেছে ও দুটো। 'মাদারটোস্ট,' আফসোসের সঙ্গে গালি বকল শারিয়ার।

অধ্যায় নয়
সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ
রামু, চট্টগ্রাম

হঠাৎ তীব্র আঘাতে আনমনেই গালি বকে উঠলো কিরান।

গোলার আঘাতে কারাগারের একটা অংশ তো ভেঙে পড়লই সেই সঙ্গে কয়েদিদের রাখার কয়েকটা খাঁচাও উল্টেপাল্টে গেল।

বিস্ফোরণের ঠিক আগে কিরান একটু হলেও সাবধান হয়ে গেছিল, কিন্তু খুব একটা লাভ হলো না। কারণ গোলার আঘাতে উড়ে আসা একটা খাঁচা সোজা বাড়ি খেল ওর খাঁচার সঙ্গে। আর তাতে ওর খাচাটা খুলে না গিয়ে বরং কাত হয়ে গেল একদিকে। আর যেদিক দিয়ে বের হওয়ার খোপ সেদিকটা বন্ধ হয়ে গেল অন্য খাঁচার বাড়ি লেগে। কিরান ছিটকে পড়ল খাঁচার একপাশে।

খাঁচার একদিকে ছিটকে পড়াতে প্রথম কয়েক সেকেন্ড কিরান বুঝতেই পারল না চারপাশে কী হচ্ছে। মাথায় শক্ত বাড়ি খেয়ে কিছুক্ষণ ধুমার মতো বসে রইল ও। তারপর চট করে উঠে বসার চেষ্টা করতেই মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল ওর। মাথার একপাশে হাত দিয়ে দেখল চটচটে রক্ত লেগে আছে। জোরে ঝাড়া দিয়ে মাথাটাকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। চারপাশে তুমুল হট্টগোল চলছে, যে যেভাবে যেদিকে পারছে ছুটোছুটি করছে। দেয়াল আর খাঁচা ভেঙে পড়ায় কয়েদিদের একটা বড়ো অংশ চেষ্টা করছে পালানোর। এমন সুযোগ এ জীবনে আর পাওয়া যাবে না।

কিরান উঠে বসে প্রথমে শিকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে অন্য খাঁচাটাকে সরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সুবিধে করে উঠতে পারল না। হাত দিয়ে কিছু করতে না পারলেও একটা ব্যাপার অনুধাবন করতে পারল খাঁচাটার মুখ আটকে রাখা কজাটা ভেঙে গেছে। তাই অন্য পথ ধরল ও। খাঁচার মধ্যে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু এতেও তেমন সুবিধে হলো না। খাঁচাগুলোর আকৃতি এমন যে, এগুলোকে না পুরোপুরি সোজা দাঁড়ানো যায়না আবার পুরো শরীর মেলে দিয়ে শুয়েও পড়া যায়। ইচ্ছে করেই এগুলো এমনভাবে বানানো যাতে বন্দিরা আরামে শুতে কিংবা দাঁড়াতে না পারে। আর এ কারণেই এই খাঁচাগুলোতে খুব লম্বা সময় ধরে বন্দি থাকা মানুষেরা ধীরে ধীরে পঙ্গু হতে শুরু করে।

কিরান যতটা সম্ভব লম্বা হয়ে শুয়ে খাঁচার মুখটাতে লাথি মারতে শুরু করল। একবার, দুবার, তিনবার লাথি মেরে খানিকটা হাঁপাতে লাগল সে। ক্লান্তিও লাগছে আবার পায়ে ব্যথাও লাগছে। কিন্তু থামলে চলবে না, এই গণ্ডগোলের সুযোগে বেরুতে না পারলে এই জীবনে আর বেরুতে পারবে না। আবারও লাথি মারতে যাবে তার আগেই টের পেল ওর পাশের খাঁচাটা ধীরে ধীরে নড়ে উঠছে।

কিরানের খাঁচাটা যেমন একদিকে বাঁকা হয়ে গিয়েছিল ঠিক একইভাবে ওর খাঁচার ধাক্কায় পাশে গোমেজের খাঁচাটাও বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। তবে ওরটার মুখ বন্ধ হলেও গোমেজেরটা তা হয়নি। কিরান সেদিকে ফিরে দেখল বাঁকা হয়ে যাওয়া খাঁচাটার একদিক দিয়ে একটা হাত বের করে কিরান খাঁচার কবজাটা ধরে ফেলল, তারপর অমানুষিক শক্তিতে মুচড়িয়ে স্রেফ ভেঙে ফেলল ওটাকে। কবজা ভেঙে যেতেই খাঁচার মুখটা আলগা হয়ে গেল, আর সেদিক দিয়ে শরীর মুচড়ে বেরিয়ে এলো সে।

'গোমেজ, এই দিক দিয়ে,' কিরান ওর খাঁচার সঙ্গে লেগে থাকা খাঁচাটাকে দেখিয়ে দিল। গোমেজ এগিয়ে এসে নিজের ঢেকির মতো মোটা একটা পা তুলে স্রেফ লাথি মারল খাঁচার মুখ বন্ধ করে রাখা খাঁচাটাকে। দুবার লাথি মারতেই কিরানের খাঁচা থেকে আলগা হয়ে একপাশে খানিকটা সরে গেল ওটা। কিন্তু খাঁচাটা সরলেও কিরানের খাঁচার মুখের কবজাটা বাঁকা হয়ে আটকে গেছে। যে কারণে গোমেজ কয়েকবার চেষ্টা করেও ওটাকে খুলতে পারল না। এদিকে মানুষজনের হট্টগোল বেড়েই চলেছে। কিরান একবার বাইরের দিকে দেখল।

'জলদি কর গোমেজ,' কী হয়েছে, কেন হয়েছে কিছুই জানে না কিরান, কিন্তু এটা জানে প্রাণে বাঁচতে হলে পালাতে হবে। সেটা যারা বন্দি করে রেখেছিল তাদের হাত থেকেই হোক, বাজিতে হেরে যাওয়া ওর পাওনাদারদের হাত থেকেই হোক, আর যারা আক্রমণ করতে এসেছে তাদের হাত থেকেই হোক।

গোমেজ কয়েকবার চেষ্টা করেও সুবিধে করতে না পেরে রেগে গেল। রীতিমতো হুংকার ছেড়ে সে ফিরে গেল নিজের খালি খাঁচাটার কাছে। কিরান অবাক হয়ে দেখল গোমেজ নিজের বিশাল দুই বাহু দিয়ে খাঁচাটাকে দুইপাশ থেকে ধরে ফেলল। তারপর অপরিসীম শক্তিতে টেনে শূন্যে তুলে ফেলতে লাগল ওটাকে। গোমেজ কী করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আপনাতেই চোখ বন্ধ করে নিজের দুই হাতে মাথা আর কাঁধ আড়াল করে ফেলল ও। ভূমিকম্পের মতো শব্দ হয়ে খাঁচাটা আছড়ে পড়ল ওর খাঁচার ওপরে। তীব্র আঘাতে কবজা আর খোপ তো বটেই খাঁচাটারই একপাশ আলগা হয়ে গেল। আঘাতের চোটে কেঁপে ওঠে পড়ে গেলেও কোনো আঘাত পায়নি কিরান। খাঁচাটা আলগা হতেই সেদিক দিয়ে বেরিয়ে এলো সে।

একহাতে সে গোমেজকে ধরে দরজা পর্যন্ত প্রায় এগিয়ে গেছে। এমন সময় পেছন থেকে ডাক শুনে ফিরে তাকাল। নিজের খাঁচার ফাঁক দিয়ে হাত বের করে করুণ সুরে ওকে ডাকছে বৈঠা। ওর ঠিক পাশ দিয়েই আরেকটা ছোটো হাত বেরিয়ে রয়েছে, ওর ছেলের। মুহূর্তেও জন্য দ্বিধা করল কিরান। এখানে এখন এক মুহূর্ত থাকাটাও জীবনের ঝুঁকি। তার ওপরে বৈঠা তার কেউ হয় না। কিন্তু একসময় লোকটা তার অধীনে কাজ করেছে। চাইলেও সে লোকটাকে আর তার ছোটো ছেলেকে এভাবে ফেলে যেতে পারে না।

দরজার কাছেই হুঁশ হারিয়ে মাটিতে পড়ে আছে সেই প্রহরী। তার পাশেই পড়ে আছে লোকটার লম্বা ফালাটা। এক লাথিতে মাটি থেকে ওটা তুলে হাতে নিয়ে নিল কিরান। গোমেজকে দরজা পাহারা দিতে বলে ছুটে গেল বৈঠাকে বন্দি করে রাখা খাঁচাটার কাছে। বর্শার মতো দেখতে ফালাটাকে কায়দা করে ঢুকিয়ে দিল কব্জার ভেতরে। তারপর জোরে একটা মোচড় মারতেই খোপ থেকে ছুটে গেল কবজাটা। সঙ্গেসঙ্গে দুই হাতে ধরে নিজের ছেলেকে আগে খোপের ভেতর দিয়ে গলিয়ে দিল সে। ছেলেটাকে টেনে বার করতেই নিজেও বেরিয়ে এলো সে। বেরিয়ে এসেই পড়ে গেল মাটিতে।

কিরান ভেবেছিল দীর্ঘ সময় ছোটো খাঁচার ভেতরে থেকে সে জড়তার কারণে পড়ে গেছে মাটিতে। কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে অনুধাবন করল বৈঠা তার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করেছে, কৃতজ্ঞতার কান্না। চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে সে মাটি থেকে টেনে তুলে শক্ত ধমক লাগাল, 'বৈঠা সোজা হ, এখন পালাতে হবে,' বলে সে বৈঠার ছেলেকে দেখাল গোমেজকে। গোমেজ ছেলেটাকে কোলে তুলে নিতেই বৈঠাকে একহাতে ধরে টেনে নিয়ে চলল দরজার দিকে। ওরা দরজা দিয়ে বাইরে আসতেই দেখল দুজন দৌড়ে চলেছে বাইরের গলির দিকে।

'হইছে কী?' তাদের পিছু পিছু দৌড়াতে দৌড়াতে কিরান জানতে চাইল।

'হার্মাদ হার্মাদ,' বলে লোক দুজন আরো জোরে দৌড়াতে লাগল।

লোক দুজনার মুখে হার্মাদ শব্দটা শোনামাত্রই মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শিরশিরে অনুভূতি নেমে গেল কিরানের। পর্তুগিজ জলদস্যুদের স্থানীয়রা হার্মাদ বলে ডাকে। স্প্যানিশ নৌবহরের প্রকৃত শব্দ 'আর্মাদা' থেকে বিকৃত হয়ে এই হার্মাদ শব্দের উৎপত্তি। তবে উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক না কেন হার্মাদ শব্দটা এখন দক্ষিণ বঙ্গের উপকূলে আতঙ্কের প্রতিনিধি। একবার হার্মাদদের হাতে পড়লে আর রক্ষে নেই। কারণ হার্মাদরা কাউকেই ছাড়ে না। নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ-শিশু সবাইকে ওরা এক কাতারে বিবেচনা করে। জিনিসপত্র তো লুট করেই সেই সঙ্গে বৃদ্ধ আর শিশুদেরকে হত্যা করে সমর্থদের দাস হিসেবে বন্দি করে বিক্রি করে দেয়

আরাকান কিংবা হুগলির বাজারে। গ্রামকে গ্রাম আর শহরের পর শহর উজাড় করে দেয় এই হার্মাদরা। কিন্তু এর আগে এভাবে সরাসরি আরাকানি বন্দিশালায় তাদের হামলার কথা কখনো শোনেনি কিরান।

মুহূর্তের ভেতরে অনেক ভাবনা খেলে গেল কিরানের মনে। লোকদুটোর পেছন পেছন দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ দিক পরিবর্তন করল কিরান। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আরেকটু হলেই টহলদার প্রহরীদের একটা দলের সামনে পড়ে যাচ্ছিল ওরা। সৈন্যদের দলটাকে আসতে দেখে বৈঠাকে নিয়ে একটা নিচু দেয়ালের আড়ালে বসে গেল। মুখে আঙুল দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে বলল সবাইকে।

মনে মনে তহশিলদারের এই বন্দিখানার নকশাটা মনে করার চেষ্টা করল সে। এখানে আগে বহুবার এসেছে। পুরো জায়গাটা একটা জলা ঝিলের পাড়ে অবস্থিত। চারকোনা কাটাতারের বাউন্ডারি আছে বাইরে। গোল একটা মাঠের মতো আঙিনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে পুরো বন্দিশালাটা। ওরা এখন যেখানে আছে সেটা ধরে সামনের দিকে এগোলে মাঠের মতো জায়গাটা পার হয়ে বন্দিশালাটার প্রবেশ পথের দিকে যেতে পারবে। কিন্তু কিরান মনে মনে হিসেব করে বের করে ফেলল। যদি হার্মাদরা আক্রমণ করে থাকে তবে অবশ্যই সেটা সামনের দিক দিয়ে হবে। তাই সৈন্য দলটাকে পার হতে দেখেই সবাইকে হাতের ইশারায় ওর পিছু নিতে বলল।

কোমর বাঁকা করে নিচু হয়ে দৌড়ে ওরা পেরিয়ে এলো মাঠটা। পুরো জায়গাটাতে আলো জ্বলে উঠেছে। মানুষজনের হাঁক-ডাক আর হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। এর মাঝেই বাকিদের নিয়ে মোটামুটি সহজেই ঘর দুটো পার হয়ে এলো কিরান। কারণ সবাই যার যার প্রাণ বাঁচানো নিয়ে ব্যস্ত। ওদের দিকে মনোযোগ দেয়ার মতো সময়-সুযোগ কারো নেই। ঘর দুটো পার হয়ে আসতেই সামনে কাঁটাতারের বেড়া দেখা গেল। বেড়ার অন্য পাশেই পানির জলা।

জলাটা চোখে পড়তেই খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। এই দিকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিরান একবার ভেবেছিল হার্মাদরা হয়তো সামনে থেকে আক্রমণ না করে পেছন থেকে জলা দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু সেটা করেনি দেখে একটু হলেও স্বস্তি বোধ করল ও। বেড়াটা দেখা যেতেই সঙ্গেসঙ্গে নিজের গায়ের জামাটা খুলে ফেলল সে। ওটাকে একটানে ছিঁড়ে দুই হাতে পেঁচিয়ে নিল তারপর ওকে অনুসরণ করতে বলে নিজে লাফিয়ে ধরে ফেলল তারের একাংশ। ওটা বেয়ে লাফিয়ে নেমে এলো অন্যদিকে।

এপাশে এসেই গোমেজকে ইশারা করল সে। এই আধো অন্ধকারের ভেতরেও কিরান দেখতে পেল গোমেজের মুখে ফুঁটে উঠল এক টুকরো হাসি। সে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে বৈঠার ছেলেকে শূন্যে ছুড়ে দিল। ওপাড় থেকে ছেলেটাকে ধরে

ফেলল কিরান। কিন্তু ধাক্কা সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে। ও উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বৈঠা আর গোমেজ দুজনেই এপাড়ে চলে এলো। কিরানকে পড়ে যেতে দেখে টিটকিরির ভঙ্গিতে অদ্ভুত এক শব্দ করে উঠল গোমেজ।

'ঠিক আছে,' অনেকটা আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে বলে উঠল কিরান।

উঠে দাঁড়িয়েই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। কয়েক দফা হাত-পা নাড়তেই পার হয়ে এলো সরু জলাটা। বলতে গেলে এপাড়ে কেউ নেই । জলার এপাড়ের বালুমাটিতে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বন্দিশালার দিকে ফিরে তাকাল কিরান। ওর বুদ্ধি কাজে দিয়েছে। হার্মাদের আক্রমণের কথা শুনে সবাই সামনের দিকে গেছে বের হবার জন্য। পেছন দিয়ে যে পালানোর উপায় আছে সেটা কারো মাথাতেই আসেনি। ওরও হয়তো মাথাতে আসত না। কিন্তু এই জায়গাটা আগে থেকে চেনাতে সে বুদ্ধিটা বের করতে পেরেছে।

যদিও এখনো অনেকদূর যেতে হবে তবুও বহুদিন পরে আবারও পুরনো দিনের মতো উত্তেজনা বোধ করছে সে। মুখে আবারও সেই অস্ফুট হাসিটা ফুটে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই পেছনে একটা শব্দ শুনে চট করে পেছন ফিরল সে। শব্দটা শোনামাত্রই সতর্ক হয়ে উঠেছে ওর প্রতিটা ইন্দ্রিয়।

'ওস্তাদ,' বৈঠা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল কিরান।

'আমি কিছু একটা শুনছি...' কিরান সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে অন্ধকারে।

'খরগুশ বেজি অইবো...'

আবারও বৈঠাকে থামিয়ে দিল কিরান। গোমেজও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

'ওইরম কিছু না, এইডা বালু মাটিত লাঠির বাড়ির শব্দ। আমরা...' কিরানের কথা শেষ হওয়ার আগেই অন্ধকারের ভেতর থেকে ওদের সামনে উদয় হলো চার-পাঁচজন লাঠিয়াল। চট করে পেছাতে গিয়ে ধুম করে উল্টে পড়ল কিরান। আর সে বৈঠার হাত ধরে থাকায় সেও তার সঙ্গেই গড়িয়ে পড়ে গেল ও। দুই দফা উল্টানি খেয়ে সে সোজা হয়েই ঝিলের দিকে লাফ দেওয়ার পরিকল্পনায় ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল সেদিকেও দাঁড়িয়ে আছে তিনজন লাঠিয়াল। অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বৈঠাকে শান্ত থাকতে বলে সে ঘুরে দাঁড়াল।

কিরান অসহায় বোধ করলেও গোমেজ তো আর অসহায় বোধ করার মতো মানুষ নয়। সে বৈঠার ছেলেকে মাটিয়ে নামিয়েই সোজা ছুটে গেল লাঠিয়ালদের দিকে। ভীম বেগে ছুটে যাওয়া গোমেজের কাঁধের ধাক্কায় স্রেফ উড়ে গেল দুই লাঠিয়াল। দুজনকে ফেলে দিয়ে ওদের একজনের লাঠি তুলে নিয়ে শূন্যে দুবার পাক খায়িয়ে সে বাকিদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে তার আগেই মাথার কাছে প্রবাৎ শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিরান।

একেবারে খুলির পাশে একটা একনলা বন্দুক চেপে ধরে মুখ বাঁধা একজন আবছাভাবে বলে উঠল, 'কিরান ওরে থামতে ক, নাইলে খুল্লি উড়ায়া দিবো।'

সঙ্গেসঙ্গে কিরান মুখ দিয়ে শিস বাজাতেই থেমে গেল গোমেজ। মুখ বাঁধা একজনকে কিরানের মাথায় বন্দুক চেপে ধরে রাখতে দেখে সে রাগের সঙ্গে লাঠিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। চরম হতাশার সঙ্গে এক দলা থুতু ফেলল মাটিতে। সেই সঙ্গে রাগতদৃষ্টিতে তাকাল কিরানের দিকে। নিজের দুই হাত তুলে কিরান অসহায় একটা ভাব দেখাল। সঙ্গেসঙ্গে তিন দিক থেকে পাঁচজন লাঠিয়ার লাঠি দিয়ে একটা খোপের মতো বানিয়ে ফেলল গোমোজের মাথার চারপাশে দ্রুত বেগে খোপের বৃত্তটাকে ছোটো করে এনে চাপ দিতেই মাটিতে শুয়ে পড়ল গোমেজ।

কিরান চোখ ফিরিয়ে বন্দুকওয়ালার দিকে ফিরে দেখতে পেল বন্দুকের নলটা সরে গেছে ওর খুলির পাশ থেকে। তার বদলে ওটার বাটটাকে তীব্র বেগে এগিয়ে আসতে দেখলওর দিকে, এরপর সব অন্ধকার।

***

জ্ঞান ফিরে আসতে প্রথমেই চোখ পড়ল আবছা হলদে একটা আবরণের ওপরে। মুহূর্তের জন্য কিরানের মনে হলো সে নিজের ভারসাম্য হারাবে। দম বন্ধ হওয়ার একটা অনুভূতির সঙ্গে মনে হলো সমস্ত পৃথিবীটা চেপে বসছে তার ওপরে। পুরো শরীরটাকে দুবার ঝাঁকি দিয়ে মুক্ত করার চেষ্টা করল কিন্তু বাঁধা হাত পায়ের কারণে সেটা তো করতে পারলই না, উল্টো নিজের মুখটা আবরণের সঙ্গে ঘসা খেতেই কেমন জানি বিদঘুটে একটা অনুভূতির সঙ্গে তার মনে হলো নাকের ভেতরে কিছু একটা ঢুকে গেল। সঙ্গেসঙ্গে পর পর দুইবার তীব্র হাঁচির সঙ্গে বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা।

যদিও মুখের ওপরে সেই হলদে জিনিসটার আবরণ তবুও হাঁচি দিয়ে নিজেকে অনেকটা নির্ভার মনে হলো। শরীরটা একটু স্থির হতেই মাথাটাকে দুবার ঝাঁকি দিয়ে আবরণটা সরানোর চেষ্টা করল সে, সেই সঙ্গে খুব সাবধানে টেনে পরখ করেনিল হাত-পায়ের বাঁধন। নাহ, ছাড়াবার কোনো পথই নেই। বিপদে পড়ার অনুভূতি কিরানের জন্য নতুন নয়। বরং বলা চলে, এই জীবনে সবচেয়ে বেশি সময় সে বিপদের মধ্যেই কাটিয়েছে। আর তাই সে জানে বৃথা টানাটানি কওে কোনো লাভ নেই। বরং যে জিনিসটা মুক্ত আছে সেটাকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করল সে, নিজের মস্তিষ্ক। কিছু ব্যাপার চিন্তা করে হেসে উঠল। যেন নিজেকে শোনাচ্ছে অনেকটা ভাবে বলে উঠল, 'এবার খুলে দিতে বলুন, পরীক্ষা তো হয়েই গেছে। নাকি ভুল বললাম চাচা?'

খুব কাছেই কারো পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে কিরানের মাথার ওপর থেকে হলুদ আবরণের মতো জিনিসটা সরে গেল। খুব যে আলোর বন্যায় ভেসে গেল তা নয়, কিন্তু আধো অন্ধকার জায়গাটাতে লণ্ঠনের আলোটাই অনেক বেশি চোখে লাগল।

'বুজলা ক্যামনে আমি তোমারে ধইরা আনছি?' চোখের দৃষ্টিটা একটু পরিষ্কার হয়ে আসতেই কিরান দেখল সুবাদার আকরাম বেগ একটা কেদারার ওপরে হেলান দিয়ে বসে হাতের তালুতে তামাক পাতা গোল করতে ব্যস্ত। 'তোমগো তো মনে করার কথা হার্মাদেরা ধরছে,' তার পরনে এখনো সকালের পোশাক। মুখমণ্ডলে অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ কিন্তু চোখ দুটো ঝকঝকে পরিষ্কার।

তার কথা শুনে মৃদু হেসে উঠল কিরান। 'বন্দিশালাতে থাকতেই হার্মাদদের আক্রমণটা ঠিক হজম হইতেছিল না আমার। তবে ঝুঁকি নেওয়াটা অনেক বেশি হইয়া যায়। তাই পেছন দিয়া পালানোর চেষ্টা করছিলাম। আর ওইখানে যখন আপনার লাঠিয়ালরা আমগো ধরতে আইলো, এরপরে বুঝতে না পারার তেমন কারণ ছিল না,' বলতে বলতে কিরান কামরাটার চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখল গোমেজ, বৈঠা আর ওর ছেলেকেও ঠিক ওর মতোই বেঁধে রাখা হয়েছে এককোণে। 'ওই লাঠিয়াল বাহিনী এই এলাকায় কার আছে সেটা বুঝতে না পারার মতোন বোকা আমি না।'

'আমি যে এখানে আছি বুঝলে কীভাবে?' সুবাদার আকরাম বেগের মুখে কৌতুক। গোল করে পাকানো তামাকের ডলাটা বসিয়ে দিয়ে সে গড়গড়ায় আগুন দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল।

'ওই ওটা,' বলে কিরানও মৃদু হেসে উঠল। 'ওই সুগন্ধি তামাকের গন্ধ দুই মাইল দূর থাইকাও টের পাওয়া যায়। আর ওই জিনিস টানার ক্ষমতা এই এলাকাতে খুব বেশি লোকের নাই,' কিরান মাথা উঁচু করে নিজের মুখ বাঁকা করে হাত-পায়ের বাঁধন দেখিয়ে তেজের সঙ্গে বলে উঠল, 'এইরকম বাইন্ধা রাইখাই কথা বলবেন?'

'তুমার বুদ্ধিশুদ্ধি এক্কেরে যে যায় নাই এইটা দেইখা ভালো লাগল,' আকরাম বেগ ধোঁয়া টানতে টানতেই তার প্রধান লাঠিয়াল চাপদাঁড়ির দিকে ইশারা করল। লোকটা দম দেওয়া কলের পুতুলের মতো এসে কিরানের বাঁধন খুলে দিল। 'ওগোরও,' বলে নিজের লোকদেরকে দেখাল। তারপর আকরাম বেগের দিকে ফিরে রাগের সঙ্গে বলে উঠল, 'কথা বলার দরকার লাগলে সোজা কইলেই হইতো। ডাকলে কি আমি আসতাম না। প্রথমে সকালের নাটক, তারপরে আইজ সন্ধ্যার নাটক, তারপরে এমনে বাইন্ধা রাখার দরকার আছিল?'

আকরাম বেগকে দেখে মনে হলো না সে কিরানের কথায় কোনো পাত্তা দিল। 'কিরান, তুমার হইছে কি ঠিক কইরা কও দেহি। তুমি তো বুদ্ধিমান পোলা আছিলা। তুমি আমার বন্ধুর পোলা দেইখা বইতাছি না,' বলে সে গড়গড়ার নলের মুখটা কিরানের দিকে তাক করে বলল, 'তুমি আসলেই বুদ্ধিমান পোলা আছিলা। বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, সাহসী আর শক্তিশালীও,' শেষ শব্দটা সে অনেক জোর দিয়ে উচ্চারণ করল। তারপর গড়গড়ার নলের মুখটা ওর দিকে তাক করে ওকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'সেই পোলার আইজ এই পরিণতি!' আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল সে। 'যেই পোলারে নিয়া আমার বন্ধু স্বপ্ন দেখত একদিন এই ছেলে অনেক বড়ো হইবে। তার বিরাট সাম্রাজ্য তার চাইতেও বড়ো করব, সেই পোলার আইজ এই পরিণতি,' আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল সুবাদার'আকরাম খান।

'চাচা, আমি আপনারে সম্মান করি। তাই বলে যা খুশি তাই কইলে...'

'কি করবা তুমি?' আকরাম খানের গলায় কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। এইটুকু বলে সে নিজের একটা একগাদা আংটি পরা ডান হাতটা ওপরে তুলল। 'গত চাইরটা বছর তুমি কোনো কাম ঠিকমতো করো নাই, ব্যবসায় তোমার কোনো মনোযোগ নাই। বেশিরভাগ সময় নেশা করো, উল্টাপাল্টা বাজি ধরো, উল্টাপাল্টা কাম করো,' আকরাম খানের গলার উত্তপ ধীরে-ধীরে বাড়ছে। 'ভুল কইলে ঠিক কইরা দিবা। গেল বছর থেইকা খণ্ডালের মাঠের বাজিতে সবচেয়ে বেশি টাহা তুমি হারছো। বুড়িগঙ্গার কাপড়ের ব্যবসায়ীগর লগে ঝামেলা করছ। ইজারার পাহাড় জমা পড়ছে তুমার ওপরে। বাজারে তুমার এত বেশি দেনা যে আইজকা সকালের বাজি হারনের পর তুমি রাউজান কিংবা রামু কিংবা খণ্ডালের মাঠ যেকোনো এলাকাতে গেলেই তুমারে ধইরা খুনও কইরা ফালাইতে পারে ব্যবসায়ীরা,' বলে সে একটু থেমে যোগ করল। 'কও ভুল কইছি? কথা কও পোলা?' শেষ কথাগুলো বলার সময়ে রাগের হলকায় মনে হলো পুরো কামরা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

কিরানের মাথা নিচু হয়ে গেছে। আকরাম বেগ তার ব্যাপারে খুব ভালোভাবে খোঁজখবর করে তারপরেই ধরে এনেছে তাকে। কিন্তু এতে এই মানুষটার স্বার্থকী বেশি ভাবতে হলো না তাকে। এর পরের কথাতেই জবাব পেয়ে গেল সে।

'তুমি হয়তো ভাবতাছ কথা নাই-বার্তা নাই হঠাৎ তুমারে নিয়া আমার এত মাথা ব্যথা অইলো ক্যান?' বলে সে তামাকের গড়াগড়ায় জোরে টান দিয়ে একটা পা তুলে বসল চেয়ারে। 'কারণ আর কিছুই না। তুমার বাপ যে কিনা আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুও,' আকরাম বেগ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিরানের দিকে। বাপের নাম শুনে তার ভেতরে কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটা বোঝার জন্য।

কিরান সত্যি সত্যি তার বাপের কথা শুনে চোখ তুলে তাকাল আকরাম বেগের দিকে। 'হঠাৎ...'

আকরাম বেগের গলায় উদাসীন্য। 'তুমি তো দেশ-দুনিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়া ভালোই ওকাবিহাল আছ। আমগোর এই মাটি আর দক্ষিণের পানি যে চাপের মধ্যে আছ তুমি তো জানোই। ওই দিকে ত্রিপুরা-আসাম, দক্ষিণে আরাকান, উত্তর পুবের মোঘলরা সবাই এই ভূমির ফায়দা নিতে চায়। এইহানের মাটিতে ফসল, পানিতে মাছ, মানুষের হাতে মসলিনের জাদু। তাই এই মাটির দাম এহন সবচেয়ে বেশি। তার ওপরে যোগ হইছে সাদা কুত্তারা,' ফিরিঙ্গিদের নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে তার মুখ রাগে বিকৃত হয়ে উঠল। 'ফিরিঙ্গি কুত্তারা আগে মানুষ মারত, লুটতরাজ চাইলাইতো, এহন হেরা আর আরাকানের শুয়োরের বাচ্চারা মিল্লা মানুষ লুট করা শুরু করছে। বুড়া বাচ্চা সব মাইরা গ্রামকে গ্রাম মানুষ ধইরা লয়া যাইতাছে। দক্ষিণের কূল খালি হইয়া যাইতাছে হারামীগর অত্যাচারে,' বলে সে আবারও গড়াগড়ার ধোঁয়া টেনে নিল। 'তার যতদিন শাহ সুজা সুবা বাংলার সুবাদার আছিল এরচেয়ে সুখি সময় এই বাংলায় আর আসে নাই।'

'সে তো তার ভাই আওরঙ্গজেবের লগে হাইরা এহন আরাকানে...'

'আরাকাররাজ তারে পরিবারসহ হত্যা করছে...' আকরাম বেগের কথা শুনে আফসোসের সাথে মাথা নাড়লো, 'এত বড়ো ধোঁকা! নিজের অতিথির বুকে ছুরি চালাইল ওরা,' কিরান বুঝতে পারছে শাহ সুজার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার পরিণতি সবাইকে ভুগতে হবে। 'দিল্লি তো তাইলে...'

'দিল্লি কী করব হেইডা এখন আমাগের জন্য বড়ো কিছু না,' আকরাম বেগের গলায় সতর্কতা। 'নিজেগো পাছা এহন আমগো নিজেগো বাঁচাইতে অইবো। আর হেই জন্য আমি তুমারে ডাইক্কা পাডাইছি,' আকরাম বেগ তার গড়াগড়ার নলটা আাবারো ওর দিকে তাক করল। 'তুমি টেসকাইয়া গেলেও বুদ্ধিশুদ্ধি এহনো তুমার খারাপ নাই, এইডা আমি বুঝতে পারছি। তয় তুমার বুদ্ধি তো বটেই, তুমার শক্তিও আমার দরকার। কইতে পার আমাগো দরকার।'

'মানে, চাচা বুঝলাম না,' কিরানের গলায় সতর্কতা। আকরাম বেগকে ধোঁয়া টানতে দেখে তার মদ আর ধোঁয়া দুটোরই পিপাসা পেয়ে বসেছে। আর শেষ কখন খেয়েছিল সেটা মনেও নেই। শরীর খারাপ লাগত কিন্তু সেটা হচ্ছে না কারণ আকরাম বেগের কথা শুনে ওর মাথা ঘুরে উঠেছে। ও এটা বুঝতে পারছে এই এলাকার ক্ষমতার খেলা চিরকালের মতোই বদলে যাচ্ছে, শুধু এই এলাকার নয় পুরো ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাঙাল মল্লুকের রাজনীতির পট বদলে যেতে বসেছে। কিন্তু ও বুঝতে পারছে না, এতে ওর ভূমিকাটা কী।

'শোনো, গুজব আছে আরাকান রাজের ওখানে শাহ সুজা পরিবারসহ নিহত

হলেও মোঘলদের যে বিরাট সম্পদ সে আরাকানে নিয়ে গেছিল সেটার টিকিও ধরতে পারেনি আরাকানরাজের লোকেরা। শোনা যাচ্ছে, শাহ সুজার খুব কাছের কিছু মানুষ ওই সম্পদের প্রায় পুরাটাই লয়া পলাইছে ম্রোহং থেইকা।'

কিরান বেশ কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকরাম বেগের দিকে। 'আর আপনারা এই আজব গুজবে বিশ্বাস করছেন?'

'তুমি পোলা কথা বেশি কও,' আকরাম বেগ জোরে ধমক দিল কিরানকে।'আগে পুরাডা শোন,' বলে সে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলতে লাগল। 'কে কার সম্পদ লয়া পলাইছে এইডা আমার কিংবা আমাগো মাথা ব্যথা না,' গড়গড়ায় ধোঁয়া ছাড়ল আকরাম বেগ। আমি এবং আমার পিছে যারা আছে হেগো মাথা ব্যথা অন্য জায়গায়। 'প্রথম কথা, শাহ সুজার ওইখান থেকে যারাই পলাইতে পারছে হেরা আমাগো কাছের মানুষ। হেগো নিরাপত্তা আমাগো লাইগা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় কথা, এই লোকগুলারে ধাওয়া করতে আরাকানরাজ পর্তুগিজ থেইক্কা শুরু কইরা নিজেগো লোকসহ বেশ বড়ো একটা বাহিনী বানাইছে। আর এই বাহিনীর ব্যাপারেই আমগো সব আগ্রহ।'

'কারণ কী?' কিরান এবার ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে।

'তুমি তো জানোই গত কয়টা মাসের মোঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনে আমগো এই মুল্লুকের দশা খাড়াইছে না ঘরকা না ঘাটকা। আমরা সুবাদার ব্যবসায়ী, যারা বৃহত্তর চাঁটগাওয়ে ব্যবসা করি হেগোর অবস্থা কাহিল হয়া গেছে নানা কারণে। যতদিন শাহ সুজা বাঙাল মুল্লুকের সুবাদার আছিল আমরা পরম শান্তিতে একরকম কইতে গেলে ঘুমাইতে ঘুমাইতে ব্যবসা করছি। হে যাওয়ার পর এহন মোঘল একরকম কইতে গেলে আমগো শত্রু। তার ওপরে স্থানীয় রাজারা বিদ্রোহ করতাছে। তার ওপরে আবার উপকূল আর নদীপথ যেইটা আমাগো ব্যবসার মূল মাধ্যম, হেইটাতে পর্তুগিজ আর হার্মাদগো যন্ত্রণায় ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম,' টানা কথা বলে আকরাম বেগ একটু থামল। 'অবস্থা এহন খুবই কাহিল। এতদিন ওরা লুটতরাজ করত, এহন মানুষ শুদ্ধা ধইরা লইয়া যাইতাছে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া যাইতাছে। এমন চলতে থাকলে আমরা চাঁটগায়ের ব্যবসায়ীরা তো বটেই এমনকি দক্ষিণ এলাকার মানুষেরাই নাই হয়া যাব। তার উপ্রে এহন যোগ অইছে আরাকানীরা।'

'সম্রাটের মৃত্যুর লগে এর সম্পর্ক কী?' কিরান এখনো ধরতে পারছে না ব্যাপারটা।

'আছে। আমগো উপকূল এলাকায় যে অত্যাচার শুরু করছে দস্যুরা এর একটা প্রতিকার আমগোরই করতে অইবো। আর এর একটা সুযোগও দেহা দিসে। আমগো উপকূল এলাকায় যে কয়টা দস্যু দল উৎপাত চালাইতাছে এগোর মূলে

আছে একজন মানুষ। আর এইবার হেরেই নিয়োগ দিছে আরাকানরাজ,' বলে আকরাম বেগ একটু থামল।

কিরান আনমনেই একটা ঢোক গিলল বড়ো করে। 'গঞ্জালেস ডি সিলভেরা,' চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল কিরান।

আকরাম বেগ কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিরানের দিকে। 'একদম ঠিক। এই শালার অত্যাচারেই অতিষ্ট আমরা। আর হেরে দমন করার এই একটাই সুযোগ আমাগো হাতে আইসা পড়ছে। হেয় কহন কই থাকে এইটা ঠিকমতো জানা অসম্ভব একটা ব্যাপার। কিন্তু এইবার আমরা জানি হে কোনদিকে যাইতাছে। আর আমরা এও জানি কে তারে নিয়োগ দিছে, হেয় কার পিছে লাগছে। আর তার পিছেই আমরা আমাগো লোক লাগামু, যে ওরে আর ওর বাহিনীরে নিকেশ কইরা আমাগো মানুষটারে উদ্ধার কইরা আনতে পারব। আর এইখানেই দেখা দিছে তুমার ভূমিকা।'

কিরান প্রায় উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আকরাম বেগের দিকে। তার স্মৃতি চলে গেছিল অনেক দূরে। কিন্তু আকরাম বেগের কথা এই পর্যন্ত শুনে সে প্রথমে মৃদু হেসে উঠল। তারপর প্রায় জোরে জোরে হাসতে লাগল। নিজের কম্পনরত ডান হাতটা চোখের সামনে একবার তুলে ধরে সে বলে উঠল, 'চাচা, আমি আপনেরে আমার বাপের পরে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ মনে করতাম আর সেই আপনে কিনা আমারে খুইজ্জা বাইর করছেন সিলভেরারে ধরার লাইগা,' এইটুকু বলে সে আবারও জোরে হেসে উঠল। কিরানের হাসিটা শেষ হলো কাশি দিয়ে। হাসতে হাসতে কাশতে শুরু করল সে, তারপর কাশতেই লাগল। কাশতে কাশতে বাঁকা হয়ে গেল। কাশির বেগ কমে এলে এক হাতে অপর হাত চেপে ধরল সে। তার কম্পনরত হাত দুটোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকরাম বেগ। কিরানও খেয়াল করল ব্যাপারটা। কিন্তু ওর কিছু করার নেই। সিলভেরার নাম শুনলেই তার এরকম হয়। ব্যাপারটা নতুন নয়, এর আগেও ঘটেছে। কিরান ঘাড় বাঁকিয়ে একবার গোমেজে দিকে দেখে নিল। সিলভেরার নাম শুনে গোমেজও কান খাড়া করে ফেলেছে।

'তুমি ঠিক আছ ভাতিজা?' আকরাম বেগ স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি নরম গলায় জানতে চাইল। 'এই, ওরে পানি দে।'

আকরাম বেগের লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান চাপদাঁড়ি লোকটা একটা পাত্রে পানি ঢেলে এগিয়ে দিল কিরানের দিকে। পানি খেয়ে নিয়ে খানিকটা স্বাভাবিক হলেও হাতের কম্পন পুরোপুরি থামল না। কিরান অনুভব করল তার পিঠের দিকে কোমরের নিচের অংশে অদ্ভুত একটা ব্যথা পাক খেয়ে উঠছে। কম্পনরত হাতটাকে সে চোখের সামনে তুলে ধরে আকরাম বেগের দিকে ইশারা করল। 'দেখছেন চাচা,

যেই লোকের নাম শুনলে আমার এই অবস্থা হয় সেই লোকের পেছনে আপনেরা আমারে লাগাইতে চান। যারে কিনা মোঘল বাহিনী পর্যন্ত কাইত করতে পারে নাই,' বলে সে আপনাতেই একবার মাথা নাড়ল। 'বোকা কি আপনে না আমি?'

আকরাম বেগের মধ্যে কোনো বিকার দেখা গেল না। 'কিরান তুমি বোকা না, আর তুমিও এইটা ভালাই জানো। আমি বা আমার পিছে যারা আছে হেরাও বোকা না,' বলে সে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল গড়গড়া থেকে। 'তোমারে একটা সত্যি কথা কই। শাহ সুজার মৃত্যুর লগে লগে যহন এইরকম এটা পরিকল্পনা হয় এবং এর পেছনে তুমারে লাগানোর কথা উঠে। আমিই ওই ব্যাপারটাতে ভেটো দিসিলাম সবার প্রথম। কিন্তু একজন অত্যন্ত শক্তিশালী মানুষ তোমার ওপরে ভরসা রাখতে চায়। তারপরেও আমি হ্যাঁ-না কিছুই কই নাই। কারণ আমি নিজে তোমারে পরখ কইরা দেখবার চাইছিলাম। আর এই কারণেই আইজ সকালের আয়োজনে তোমারে ষাঁড়ের লড়াইয়ে মাঠে নামাইছিলাম আমি। স্রেফ দেখবার লাইগ্গা তুমার ভেতরে আগের কিরান আছে কি নাই? বিশ্বাস করো, আমি মনে করি এহনো তোমার ভেতরে সেই কিরান বাইচা আছে,' একটানা বলে সে থেমে গেল।

'আরেকটা কথা, তুমি নিজের কথা কইলা। এইবার আমি আমাগো কথা কই। সিলভেরার জ্বালায় পুরা চাঁটগাওয়ের ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ। আরাকান, হুগলি, বোম্বে, জাভা এই পুরা চলাচলের পথটারে জ্বালায়া খাইতাছে এই হারামজাদা। ওরে মারার লাইগ্গা আর আরাকানরে এট্টু সাইজ করনের লাইগ্গা বহু ক্ষমতাশালী লোক বহুকিছু বিসর্জন দিতে রাজি আছে,' বলে সে নিজের একটা হাত তুলল। 'তুমি যদি রাজি হও কাইলের ভেতরে তোমারে তিনটা জাহাজ আর দরকারি জিনিস দেওয়া অইবো, যত অস্ত্রপাতি লাগে, এমুনকি তোমার যত ধারদেনা আছে সব ব্যবসায়ীগো পক্ষ থেইকা শোধ করা অইবো। তুমার ব্যবসায়ের অনুমতি ফিরায়া দেওয়া অইবো। আর যাতে তুমি নতুন ব্যবসা শুরু করতে পার সেই ব্যবস্থা আমি নিজে করব। আমি নিজে তোমারে পুঁজি দিব। এহন বলো তুমার যে অবস্থা তাতে নতুন কইরা জীবন শুরু করার লাইগা এর চাইতে

'চাচা, আমি পারব না,' কিরানের দৃষ্টি শূন্যের দিকে। তার মনের কোণে ভেসে উঠেছে দৈত্যের মতো একজন মানুষের অবয়ব। যার মাথার পেছন থেকে ইটের ভাটার মতো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সেই মানুষটা তার শক্তিশালী দুহাতে শূন্যে ধরে রেখেছে তাকে। রক্তবর্ণ চোখদুটোয় তার হত্যার উল্লাস। এর পরবর্তী দৃশ্যটার কথা মনে করে কিরানের মুখ আপনাতেই নিচের দিকে নেমে গেল। আবারও সে অনুভব করল জোড়া লাগা মেরুদণ্ডটা থেকে অদ্ভুত এক ব্যথা পাক খেয়ে উঠছে। 'আমার দ্বারা হবে না চাচা। একবার আমি বাইচা গেছি। আমার জাহাজ ধ্বংস হইছে। তাও এইগুলা আমি সহ্য করতে পারি। কিন্তু আমার মানুষেরা যারা আমার

কারণে...' গলা ধরে আসছে কিরানের। 'যাগো আমার কারণে, আমার বোকামির কারণে, আমার ব্যর্থতার কারণে মরতে হইছে তাগো মৃত্যুর দায়ভার আমি সহ্য করি কীভাবে, আপনার কোনো ধারণা আছে?' কিরান তাকিয়ে আছে আকরাম বেগের দিকে। 'যদি নিজের সামর্থের কথা আমি চিন্তা নাও করি, আপনার কি মনে হয় আমি একই ভুল আবারও করব। আবারও কিছু মানুষের জীবন আমি ঝুঁকিতে ফালাব আমার নিজের কারণে,' জিভ টকটক শব্দ করল সে। 'কখনই না, চাচা।'

'ওইদিন ভারত সাগরে যা হইছিল তাতে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি কার হইছিল?' আকরাম বেগের গলায় কোনো বেগ নেই। 'তোমার বাহিনীর না তোমার? ওরা তো মইরা বাইচা গেছে। যারা বাইচা আছে, তারা যে সবাই তোমার মতো জীবন্ত লাশ হইছে সেইটা...'

'মৃত্যুর চেয়ে বড়ো ক্ষতি আর কিছু হয় না চাচা,' উদাস গলায় বলে উঠল কিরান। 'মইরা গেলেই সব শেষ।'

'না কিরান, মইরা গেলেই সব শেষ না,' আকরাম বেগের গলায় সামান্য উত্তেজনা। 'মৃত্যুর চেয়েও খারাপ হইলো মৃত হইয়া বাঁইচা থাকা। তুমি যেভাবে বাঁইচা আছ এভাবে বাঁচা...' আকরাম বেগ একটা হাত তুলল। 'ঠিক আছে, যদি মৃত্যুর কথাই কও তয় তুমি ভাবছ তোমার নিজের মানুষগো আবারও ঝুঁকির মধ্যে ফালাবা। কিন্তু তুমি এইটা ভুইলা যাইতাছ যে, তুমি যদি আইজ এগায়া না আসো তবে স্রেফ এই কারণে কতো কতো নিরীহ মানুষ মারা যাবে?' প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে কিরানের দিকে তাকিয়ে রইল আকরাম বেগ।

'আমি পারব না চাচা,' বলে সে মাফ চাইবার ভঙ্গিতে আকরাম বেগের দিকে দুই হাত জোর করল। তারপর গোমেজ আর বৈঠার দিকে ফিরে ইশারা করল দরজার দিকে এগোবার জন্য।

'ঠিক আছে তোমার ইচ্ছা,' বলে আকরাম বেগ একবার মাথা নাড়ল। 'তোমার বাপের সঙ্গে শেষ কবে কথা হইছে তোমার?'

উঠে যেতে যেতে হঠাৎ সে ফিরে তাকাল আকরাম বেগের দিকে। লোকটা হঠাৎ এই কথা বলল কেন। 'ইয় মানে,' আমতা আমতা করতে করতে বলে উঠল কিরান। 'বাপুর সঙ্গে, অনেকদিন মানে

'তোমার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে কিরান।'

'আকরাম বেগের উচ্চারিত শেষ বাক্যটা শুনে কিরানের বুকটা একবার লাফ দিয়ে উঠল। হঠাৎ ওর মনে হতে লাগল ওর হৃৎপিণ্ডটা ধরে কেউ আগুনে আঁকশি দিয়ে চেপে ধরেছে। 'মানেকী, বাপুর আবার কী হইলো?'

'তুমি কিন্তু একবারও জানতে চাও নাই আরকানরাজের ওইখান থাইকা সম্রাট

শাহ সুজার খুব কাছের যে মানুষটা পালাইতে পারছিল সে কে?' আকরাম বেগ বসা থেকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল কিরানের দিকে। কোনো জবাব না দিয়ে কিরান তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'সেই মানুষটা আর কেউ না, তোমার বাবা- তালেব তৈমূর,' বলে আকরাম বেগ একবার থামল। 'এই ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই যে শাহ সুজার যারা মিত্র তাগো ভেতরে তোমার বাবাই ছিল সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ। আর এটাও ঠিক যে, আরাকানরাজের পাঞ্জার ভেতর থাইকা কেউ যদি পালানোর ক্ষমতা রাখে সেইটাও তোমার বাবা। হইছেও তাই। তোমার বাবাই শাহ সুজার সব গচ্ছিত জিনিস নিয়া ম্রোহং থেইক্কা জাহাজে কইরা সরতে পারছে। আর তার পেছনেই লাগতে যাইতাছে আরাকাররাজের বাহিনী, মগ আর পর্তুগিজ জলদস্যু সাগরের শকুন নামে পরিচিত সিলভেরা। এখন কও, তোমার বাবারে বাঁচানোর জন্য হইলেও তুমি কামড়া করবা কিনা?'

কিরানের চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, চোখে পাথরের দৃষ্টি। সে চলে যাওয়ারজন্যঘুরে দাঁড়িয়েছিল, আকরাম বেগের কথা শুনে আবার বসে পড়ল। 'আমি রাজি আপনার প্রস্তাবে। বলেন কী করতে হবে আমার?'

আকরাম বেগ গড়গড়ায় জোরে শেষ একটা টান দিয়ে সেটা ধরিয়ে দিল চাপ দাঁড়ির হাতে। 'আমি আগেই বলেছি আমরা চাই, তুমি সিলভেরার পিছু নিয়ে তারে নিকেশ করবা, সম্ভব হলে আরাকানরাজের বাহিনীর আর মগ জলদস্যুগর একটা অংশও। আর এই জন্য যা যা রসদ আর খরচ লাগে আমরা দেব। তোমার কাজ হবে একটা দল বানানো এবং এইসব শকুনগোরে শেষ কইরা তোমার বাবারে ফিরায়ে আনা।'

কিছু না বলে আকরাম বেগের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তালেব কিরান। বাপুর বিপদের কথা শোনার পর ওর পক্ষে এখন আর পিছু ফেরা সম্ভব না। বাপুকে সাহায্য করার জন্যে দক্ষিণ সমুদ্র তো অনেক সহজ, লাগলে ও নরকে পর্যন্ত যাবে।

অধ্যায় দশ

বর্তমান সময়

গুলশান অ্যাভিনিউ, ঢাকা

'আমরা যে বাড়িটা কিনব ওটাতে সব ধরনের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা থাকবে,' বলে জর্জ একবার লেনিকে দেখল। লেনি খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার বন্ধু-তার ভাই বিশাল দেহ নিয়ে বেঁচে থাকা ক্ষুদ্র পৃথিবীর একমাত্র অবলম্বন জর্জের দিকে। সে ভেবেছিল প্রতিবারের মতো এবারও 'খারাপ কিছু' করার জন্য জর্জ তাকে বকবে। কিন্তু জর্জ তাকে কিছুই না বলে হঠাৎ এভাবে গল্প শোনাতে শুরু করবে এটা সে এখনোমেনে নিতে পারছে না। এর আগে যতবার সে কিছু না কিছু গুবলেট করেছে প্রতিবারই জর্জ তাকে হয় মেরেছে, না হয় বকেছে। কিন্তু এরকম গল্প বলেনি।

'সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার কী জানিস লেনি,' লেনি যদি বুদ্ধিতে একটু খাটো না হতো তবে সে ঠিকই বুঝতে পারত জর্জ তাকে গল্প বলছে ঠিকই কিন্তু কিছু একটা ঠিক নেই। কারণ এর আগে যতবার গল্প বলেছে, তাদের স্বপ্নের গল্প, তাদের ভবিষ্যতের গল্প, একটা বাড়ি কিনে খামার গড়ার করার গল্প, প্রত্যেকবার জর্জের চোখে অদ্ভুত এক আলোর দ্যুতি ছড়াত। কিন্তু আজ তার চোখে সেই দ্যুতি নেই। আজও তার দৃষ্টি চকচক করছে। কিন্তু সেটা আনন্দে নয়, স্বপ্নের বিভোরতায় নয় বরং চোখের পানিতে।

'আমরা যে বাড়িটা কিনব ওটাতে অনেক অনেক খরগোশ থাকবে। অনেক, তোকে আর মরা ইঁদুর নিয়ে খেলা করতে হবে না...' জর্জের গল্পের সঙ্গেসঙ্গে বাইরে মানুষের শোরগোলের শব্দ বাড়ছে। একাধিক ক্ষিপ্ত উন্মত্ত মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর এগিয়ে আসছে গোলাঘরের দিকে। কথা বলতে বলতে জর্জ প্যান্টের পেছন থেকে বের করল পিস্তলটা। তারপর সেটা তার আদরের বন্ধুর মাথার পাশে ঠেকিয়ে গুলি করে দিল...' '

এই পর্যন্ত পড়েই জন স্টেইনবেকের 'অব মাইস অ্যান্ড ম্যান' বইটা বিছানার পাশে নামিয়ে রাখল শারিয়ার, তারপর ফিরে তাকাল বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটার দিকে। মানুষটার দেহ স্থির হলেও চোখজোড়া সর্বদা চঞ্চল। কিন্তু এই মুহূর্তে তার

চোখজোড়ায় সেই চঞ্চলতায় ভাটা পড়েছে। সেখানে এখন চিকচিক করছে অশ্রু। শারিয়ার সেদিকে ফিরে তাকাতেই মানুষটার চোখের কোনা থেকে পানির ফোঁটাটা গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

'আব্বু, তুমি একটা পাগল,' বলে শারিয়ার বইটা বিছানার পাশে রেখে এগিয়ে গেল তার বাবার দিকে। একগাদা নল আর নানা চিকিৎসার সরঞ্জাম সরিয়ে প্রথমে বাপের চোখের নিচ থেকে অশ্রুর ফোঁটাটা ডান হাতের তালু দিয়ে মুছে দিয়ে বাপের মাথাটা নিয়ে নিল নিজের বুকের ওপরে। ওকে নল আর এটা সেটা সরাতে দেখে ওর বাবার বেডের অন্যপাশে অবস্থানরত নার্স একটু ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু ওসবের পরোয়া না করে গত সাতাশ বছর ধরে এভাবেই বিছানায় অচল পড়ে থাকা বাপের মাথাটা নিজের কোলের ওপরে নিয়ে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল শারিয়ার। 'আব্বু তোমার মতো পাগল আমি আর দেখিনি। এই বইয়ের এই দৃশ্যটা তোমার এত প্রিয় কেন বলো তো!' বলে সে বুকের ওপর থেকে নিজের বাপের মাথাটা তুলে নিয়ে দুইহাতে ধরে যত্ন করে চোখ-মুখে হাত বুলিয়ে মুছে দিল। 'বারবার শুনবে আর প্রতিবার কাঁদবে।'

শারিয়ারের বাবা বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান এক ব্যবসায়ী পরিবারের বড়ো ছেলে। শারিয়ারের বয়স যখন চার তখন ওর মা একটা দুর্ঘটনায় মারা যায় আর ওর মায়ের মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে ওর বাবা এতটাই আঘাত পায় যে, কোমায় চলে যায় সে। গত সাতাশ বছর ধরে কোমাতেই আছে সে। শারিয়ারের নিজের মাকে একেবারেই মনে নেই। কারণ মাকে বুঝে ওঠার মতো বয়স হওয়ার আগেই সে চলে যায়। এরপরে ও যখন বুঝমান হয়েছে তখন থেকেই নিজের বাপকে দেখেছে বিছানায় শোয়া অবস্থায় একগাদা নল আর মেডিকেল ইকুইপন্টের মাঝখানে। বিশেষ মেডিকেল কন্ডিশন আর সার্বক্ষণিক দুজন নার্স তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

মা নেই, বাবা বেঁচে থেকেও নেই। বলতে গেলে একরকম এতিম শারিয়ার তার বিরাট প্রাসাদোপময় বাড়ি আর সম্পদের মাঝেও বড়ো হয়েছে একেবারেই একা। তবে ছোটোবেলা থেকেই ওর লিগ্যাল গার্ডিয়ান ছিল ওর একমাত্র চাচা। ছোটোবেলা থেকেই সে বড়ো হয়ে উঠেছে তার চাচার তত্ত্বাবধানে। শারিয়ারের কাছে এই হলো ওর পরিবার। গুলাশানের মতো এলাকায় কয়েক একর জায়গা নিয়ে বিরাট বাড়ি ওদের। শারিয়ার সবসময় যাকে বলে শূন্যতার তিন একর।

তবে ছোটোবেলা থেকেই শূন্যের মাঝে বেঁচে থাকাটাও শারিয়ারকে ওর বাবার ভালো বন্ধু হওয়া ঠেকাতে পারেনি। যদি শুধু চোখ নাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না মানুষটা,তবুও শারিয়ার আর ওর বাবা অসাধারণ বন্ধু। যখনই বাড়িতে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাপের সামনে বসে থাকে সে। বাপের সঙ্গে গল্প

করে, তাকে বই পড়ে শোনায়। নিজের পছন্দের সব গান শোনায় ওকে। বোর্ডিং স্কুলে থাকার সময়ে বাড়িতে যতদিন থাকত বাপের সঙ্গে গল্প করত ও। তারপর ওর মিলিটারিতে গমন এবং সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে আসা এবং তারপরের জীবনে স্পেশাল ফোর্সে জয়েন করা, ইউরোপে ট্রেনিংয়ে যাওয়া, এর কোনোকিছুই বাপের সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি করতে পারেনি। যখনই বাড়িতে থাকে ও বাপের কাছে চলে আসে। বিশেষ করে নিজের বাপকে বিভিন্ন বই পড়ে শোনানো ওর অত্যন্ত প্রিয় একটা কাজ।

তবে কেন জানি দুঃখের বইগুলো ওর বাবার খুব প্রিয়। বিশেষ করে জন স্টেইবব্যাকের অব মাইস অ্যান্ড ম্যানের বিখ্যাত সেই দৃশ্য যেখানে জর্জ তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, তার ভাইয়ের চেয়ে প্রিয় লেনিকে পৃথিবীর রোষ থেকে বাঁচানোর জন্য নিজ হাতে হত্যা করে, এই দৃশ্যটা বারবার তার বাপকে পড়ে শোনাতে হয়। প্রতিবার এই দৃশ্যটা পড়ে শোনানোর সময়ে তার বাপের চোখে অদ্ভুত এক আকুতি ফুটে ওঠে। শারিয়ার বুঝতে পারে না তার বাপ আসলে কী বোঝাতে চায়। কিংবা সে নিজেই স্বার্থপরের মতো বুঝতে চায় না। আজও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। বাপের মুখটাকে নিজের সামনে নিয়ে আসতেই শারিয়ার দেখতে পেল ওর বাপের চোখে অদ্ভুত এক আকুতি। বাপের চোখে চোখ রাখতে না পেরে ও দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ওই চোখের দৃষ্টি সে বুঝতে পারে না, বুঝতে চায়ও না। সবচেয়ে বেশি কাছের মানুষদের প্রতিই মানুষ সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠুরতা দেখায়। শারিয়ারও নিষ্ঠুরের মতোই ওর দৃষ্টি সরিয়ে নিল নার্সের দিকে।

তার দিকে ফিরে নির্দেশনা দিল, 'সবদিকে ঠিকমতো খেয়াল রাখবেন। আর প্রয়োজনে আরো একজন নার্স নিয়ে নিন। কিন্তু কোনো ধরনের গাফিলতি আমি সহ্য করব না। আর কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে ম্যানেজার হামিদ চাচাকে বলবেন। ঠিক আছে?' বলে ও আবারও যোগ করল। 'প্রয়োজনে ডাক্তার আঙ্কেলের উইকলি শিডিউল আরেক রাউন্ড বাড়িয়ে দিন। আব্বুর ব্যাপারে যাতে কোনো ধরনের খামখেয়ালি বা গাফিলতি না হয়...আবারও বলে দিচ্ছি আমি।'

নার্স মহিলা ওর কথার জবাবে সম্মতি জানাতেই বাপকে ভালোভাবে শুইয়ে রেখে এসে জানালার সামনে দাঁড়াল শারিয়ার। ভোরের আলো সবে ছুঁয়ে যেতে শুরু করেছে দিগন্ত। আর তারই ছটা এসে পড়েছে ওদের সাদা বাড়ির সামনের সবুজ ঘাসে ছাওয়া লনে। সেদিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে উঠল শারিয়ার। এত বড়ো বাড়ি অথচ সবচেয়ে কম যে জিনিসটা আছে সেটা হলো মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে এরকম জনবিরল কোনো বাড়ি আর আছে কি না ওর জানা নেই। মুখের কোণেফুটে ওঠা হাসিটার বিস্তৃতির সঙ্গেসঙ্গে ও আরেকবার উপলব্ধি করল, এই বাড়িটা আসলেই শূন্যতার তিন একর।

একবার ঘড়ি দেখে নিয়ে বাপের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'আব্বু, আমি চট্টগ্রাম যাচ্ছি। একটা মিশনে,' বলে সে একটু থামল বাপের চোখে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। একটু আগের সেই বিমর্ষ চোখে যেন একটু আলোর রেখা ফুঁটে উঠল। 'ইংল্যান্ড থেকে ট্রেনিং শেষ করে আসার পর এটাই আমার প্রথম বড়ো মিশন। দোয়া রেখো আমার জন্য,' একবার ওর ইচ্ছে করল বাপের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেয়। কিন্তু অজানা এক লজ্জা এসে রোধ করে দিল সেই ইচ্ছে। তার পরিবর্তে সে এসে বসে পড়ল বাপের পায়ের কাছে। 'আমি জলদি ফিরে আসব আব্বু। ওই পর্যন্ত একদম লক্ষ্মী ছেলের মতো থাকবে,' বলে একবার বাপের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ও রুম থেকে বাইরের দিকে রওয়ানাদিল।

রুমের পর্দা সরিয়ে বাইরে যেতে গিয়ে আরেকটু হলেই হালকা-পাতলা মধ্যবয়স্ক মানুষটার সঙ্গে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল ও। 'আরে হামিদ চাচা। আপনি এত সকালে।'

হ্যাংলা-পাতলা মানুষটার হাতে একটা ফাইল। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ওদের পারিবারিক ম্যানেজার এবং ওর চাচার ডান হাত এই মানুষটাকে শারিয়ারের জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এই একইরকম দেখছে। মানুষটার বয়স বাড়েও না আবার কমেও না, যেন সময়ের স্রোতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক জায়গায় থেমে আছে তার বয়স।

'আসতে হলো তোমার জন্য,' বলে সে হেসে উঠে জড়িয়ে ধরল শারিয়ারকে। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর মানুষটার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি। ওর আপন চাচা একমাত্র গার্ডিয়ান হলেও ছোটোবেলা থেকে এই মানুষটা ছিল তার খেলার সাথি, বন্ধু ও একমাত্র মানুষ যে ওকে পুরোপুরি বুঝতে পারে। নিজের চাচার সঙ্গে ওর সম্পর্ক যদি হয় লিগ্যাল গার্ডিয়ানের, তবে ওদের ম্যানেজার হামিদ চাচার সঙ্গে ওর সম্পর্ক হলো অভিভাবক কাম বন্ধুর। সেই সঙ্গে এই মানুষটা হলো ওদের বিরাট পারিবারিক সাম্রাজ্যের অন্যতম স্তম্ভ। লোকে দুষ্টুমি করে বলে মাহবুব তালুকদার, মানে ওর চাচা এই সাম্রাজ্যের মহীরুহ হয় যদি তবে ম্যানজার হামিদ হলো সেই সাম্রাজ্যের ভিত।

'কি নাকি গোলমাল পাকিয়েছ আবার?' সে শাসনের ভঙ্গিতে বলে উঠল। 'তোমার জ্বালায় তো এখন মনে হচ্ছে ঘরবাড়ি ছাড়তে হবে। কী হয়েছে, পাশা ভাই তোমার চাচাকে ফোন করে নাকি একগাদা কথা শুনিয়েছে তোমার নামে।'

শারিয়ার একটা হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল, 'গুল্লি মারো উনাদের। এইসব বাল-ছাল মুরব্বিদের কথা শুনলেই আমার আরো এক রাউন্ড পেগ লাগাতে ইচ্ছে করে। তোমার খবর বলো,' বলে সে একটা হাত দিয়ে ম্যানেজার হামিদের হাত ধরে ফেলল, 'চলো তুমি আমার সঙ্গে। তোমার জন্য গিফট এনেছি আমি,' বলে সে রীতিমতো টানতে শুরু করল ম্যানেজার হামিদকে।

'আরে থাম বেটা, থাম,' বলে সে উত্তেজিত শারিয়ারকে থামিয়ে দিল। 'তোর গিফট আমি পরে নেব। আগে তোর চাচার সঙ্গে দেখা করে আয়,' বলে সে ইশারায় নিচের ফ্লোরের লিভিং রুমের দিকে দেখাল। 'নাহলে তোর চাচা তোকে তো বটেই আমাকে শুদ্ধ পুতে ফেলবে,' বলে সে কপট আতঙ্কের একটা ভঙ্গি করল।

শারিয়ারও মুখ ভেঙচে দিল তাকে। 'আচ্ছা শোন, আমি নিচে নামলে আর ওপরে উঠতে পারব না,' বলে সে ঘড়ি অফিসের গাড়ি আসতে খুব বেশি সময় নেই। 'শোন, তুমি আমার রুমে গিয়ে আমার ক্লোদিং কেবিনের নিচে একটা বড়ো লাগেজ আছে, ওটার ভেতরে তোমার জন্য একটা পাকেট ফিলিপের ঘড়ি আছে,' তুমি তো আবার এসব পুরনো আমলের ব্র্যান্ড ছাড়া পরোই না। তাই ওটাই এনেছি,' নিয়ে নিয়ো। আর আমি চট্টগ্রাম যাচ্ছি,' বলে সে আর বেশি কিছু যোগ করল না। ম্যানেজার হামিদও জানতে চাইল না। সে ভালোই বুঝতে পারে শারিয়ার কেন চট্টগ্রাম যাচ্ছে এবং এ নিয়ে যে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না, এই জ্ঞান তার ভালোই আছে। শুধু একবার মাথা নেড়ে সে শুভেচ্ছা জানাতেই শারিয়ার বিদেয় নিয়ে চলে এলো ডায়নিংরুমে। সেখানে টেবিলের ওপরে একটা ছোটো প্যাকেট রাখা আছে। সেটা তুলে নিয়ে প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে নিচের লিভিং রুমে চলে এলো।

সেখানে সোফায় হেলান দিয়ে পত্রিকা পড়ছেন একজন মানুষ। পত্রিকাতে তার চোখমুখ ঢেকে থাকলেও চকচকে জুতো আর ধারালো ছুরির মতো আয়রন করা ট্রাউজার চোখে পড়ল। পাশেই টিপয়ের ওপর রাখা কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। শারিয়ার একবার নিজের ব্লেজারটা টেনে ঠিক করে তার সামনের সোফায় গিয়ে বসে পড়ল। তারপর বেশ অনেকটা উদ্ধত গলায় বলে উঠল, 'হ্যালো, আঙ্কেল।'

ওর কথার জবাবে খুব হুঁট করেই নড়ে উঠল না সামনে উপবিষ্ট মানুষটা। কিংবা চট করে পত্রিকা বন্ধ করে দৃষ্টি মেলাল না। শারিয়ার কথাটা বলে বসে রইল। পত্রিকাটা ধীরে ধীরে ভাঁজ করে মাহবুব তালুকদার পাশ ফিরে টিপয়ের ওপর থেকে কাপটা নিয়ে একবার চুমুক দিল। শারিয়ার খুব অবাক হয়ে দেখল মানুষটা এই ভোর বেলাতেও একেবারে পুরোদস্তুর ফরমাল পোশাক পরে আছে। কড়া পালিশ করা স্যুট-টাই এমনকি বুক পকেটে রাখা নিখুঁত স্কোয়ারটাও চকচক করছে তার। নিজের একমাত্র জীবিত ও কর্মরত অভিভাবক এবং তার রক্তের সম্পর্কের একমাত্র চাচাকে যখনই দেখে শারিয়ার মনে মনে আর যাই হোক তার ড্রেসিং সেন্সের প্রশংসা না করে পারে না। সুদর্শন মানুষটা কেন এবং কীভাবে সারাটা জীবন চিরকুমার হয়ে রইল এটা একটা চরম জিজ্ঞাসা শারিয়ারের মনে।

'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ এই সকালবেলা আমি এই পোশাকে কেন?' বলে মাহবুব তালুকদার চায়ের কাপে একট চুমুক দিয়ে সরাসরি তাকাল শারিয়ারের দিকে।

শারিয়ার কিছু না বলে একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। নিজের চাচার সঙ্গে শারিয়ারের সম্পর্কটা খুবই অদ্ভুত। শারিয়ার মাঝে মাঝে ভাবে, ওর জীবনে স্বাভাবিক কিছুই নেই কেন। চাচার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা অনেকটা স্নেহময় পিতা এবং বিদ্রোহী সন্তানের মতো। ওর চাচা ওকে কতটা ভালোবাসে শারিয়ার খুব ভালো করেই জানে। এমনকি মাঝে মাঝে ওর মনে হয়, ওকে বড়ো করে তোলার জন্যই ওর চাচা কখনো বিয়ে করেনি। কিন্তু সামনাসামনি কখনোই ওর চাচা সেটা প্রকাশ করে না। অন্যদিকে নিজের পরিবারের একমাত্র সক্ষম মানুষটার প্রতি শারিয়ারের নির্ভরতা কতটুকু এটাও জানে। কিন্তু সামনে কখনোই সেটা দেখায় না ও।

আর এ কারণেই দুজনেই যখন সামনাসামনি হয় খুবই অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দুজনই আপ্রাণ সচেষ্টতায় নিজের আবেগের বেগকে সামলে রেখে তীব্র কথার বানে সেটাকে ভাসিয়ে দিতে চায়। আর সে-কারণেই কথোপকথনের ভেতর কটাক্ষ আর তীব্রতার স্রোত বয়ে যেতে থাকে। ঠিক যেমনটা এই মুহূর্তে ঘটে চলেছে।

'তুমি যা ভাবছ,' মাহবুব তালুকদার আগের কথার জের ধরেই বলে চলল। 'একই কথা কিন্তু আমিও ভাবতে পারি,' বলে সে গ্যাবার্ডিন প্যান্ট, জুতো আর ধূসর ব্লেজার পরা পরিপাটি শারিয়ারকে দেখাল। 'কিন্তু আমি সেটা করব না কেন জানো,' বলে সে শারিয়ারের দিকে একটা আঙুলতুলল। 'কারণ আমি জানি তুমি চট্টগ্রাম যাচ্ছ। কিন্তু আমি এটা জানি না ইংল্যান্ড থেকে আসার পর তোমার কেনই বা আমার সঙ্গে দেখা করার কিংবা অফিসের কারো সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হলো না,' তার গলার স্বর ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে। শেষ দিকে তার কথাগুলো প্রায় ধমকের রূপ নিল।

অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে উঠল শারিয়ার। ওর ইচ্ছে ছিল কথোপকথনটা যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে এখান থেকে বিদেয় নেওয়ার। কিন্তু সেটা আর হলো কই। 'আসলে ট্রেনিং থেকে এসে এতটা টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম যে...'

'তোমার টায়ার্ডনেসের নমুনার কথা আমি শুনেছি,' রাগে গলার পারদ প্রায় আকাশে উঠে গেছে মাহবুব তালুকদারের। 'মানুষ বিশ্রাম নিতে বাড়িতে থাকে, না হয় বেড়াতে যায়। আর তুমি গেছ ইল্লিগ্যাল রেসের মাঠে। এই তোমার রেস্ট নেওয়ার নমুনা!'

'চাচা আপনি জানেন না,' শারিয়ার একটা হাত তুলল। 'আপনি যেটা বুঝতে পারেন না...' শারিয়ারের গলাও চড়তে শুরু করেছে।

শারিয়ারের গলা উঁচু হওয়া শুরু করতেই মাহবুব তালুকদার স্রেফ চোখ তুলল তার দিকে, আর এতেই শারিয়ার থেমে গেল। 'শারিয়ার তুমি জানো তুমি আমার ভাতিজা নও, তুমিই আমার সন্তান। আমাদের পরিবার, তোমার বাবা, এরপর আমি, আমরা সবাই মিলে যে বিরাট ব্যাবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছি এর একমাত্র

উত্তরাধিকারী তুমি। আর তুমি যদি নিজেকে এভাবে অপচয় করতে থাকো...' কথার মধ্যে থেমে গিয়ে সে একবার মাথা নাড়ল। এরপর দুঃখী গলায় বলে উঠল, 'ছোটোবেলা থেকেই তোমাকে কঠিন নিয়মের ভেতরে বড়ো করার চেষ্টা করেছি আমি। এরপরে তুমি বড়ো হওয়ার পর যখন যা করতে চেয়েছ সেটাও দিয়েছি আমি। তুমি যখন আর্মিতে যেতে চাইলে আমি মানা করিনি। কিন্তু সেখান থেকে তুমি... এরপরে তুমি ওখানে থেকে ফেরার পর প্রায় নষ্ট হতে ধরলে আমিই তোমাকে স্পেশাল ফোর্সে ঢোকানোর ব্যবস্থা করেছি। কারণ...' মাহবুব তালুকদারের গলার ধার কমে এখন সেখানে আবেগের ঘনঘটা। 'কারণ আমি জানতাম হাহাকারে ভরা এই সম্পদের পাহাড় তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। এরপর তুমি সেখানে গিয়ে এতটাই ভালো করতে শুরু করলে যে গর্ব বোধ করতে শুরু করলাম। এরপর আমি নিজ থেকে পাশার মাধ্যম ওদের সবচেয়ে বড়ো প্রজেক্টের ফাইনেন্সিয়ার হয়েছি। আমাদের কোম্পানি এবং ওরা সবচেয়ে বড়ো ডিলগুলো করতে যাচ্ছে। তোমাকে নিয়ে আর নতুন ওই ছেলেটাকে নিয়ে পাশা যখন নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে আর তুমি কিনা তখন নিজেকে এভাবে অপচয় করার চেষ্টা করছ। কেন শারিয়ার?' মাহবুব তালুকদারের গলায় জবাবদিহিতার চাপ। 'কারণটাও কি আমি জানতে চাইতে পারি না?'

'আপনি ফাইন্যান্স করছেন মানে?' শারিয়ার মনেপ্রাণে চাইছে ওদের কথোপকথন অন্যদিকে মোড় নিক।

'তুমি জানো না, পাশা নতুন ডিপার্টমেন্ট করতে চাইছে। সরকারের সঙ্গে সেই প্রজেক্টের পুরোটাই আমরা ফাইন্যান্স করছি। ভবিষ্যতে ওদের সব ডিল নিয়ে কাজ করার জন্য।' সরকারের বিভিন্ন প্রজেক্টে বাইরের ব্যবসায়ীরা লগ্নি করে এটা শারিয়ার জানত কিন্তু এতে যে তার বা তাদের কোম্পানির বড়ো ভূমিকা আছে এটা সে জানত না।

'শোন শারিয়ার,' মাহবুব তালুকদার উঠে এসে শারিয়ারের পাশে বসে পড়ল। 'তুমি আমার ও আমাদের সবার জন্য সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। এমনকি পাশাও ঠিক এটাই মনে করে। তা না হলে এত বড়ো ব্লান্ডারিং করার পরও ও তোমাকে চট্টগ্রামে পাঠাত না। কাজেই তুমি ওখানে গিয়ে ভালো কাজ করবে এটাই আমার বিশ্বাস,' বলে সে শারিয়ারের কাঁধে হাত রেখে বলে উঠল, 'আমার জন্য না হোক, পাশা কিংবা ডিপার্টমেন্টের জন্য না হোক, তুমি নিজের জন্য হলেও ভালো কাজ করবে আমি আশা করি।'

'আমি চেষ্টা করব,' শারিয়ার বারবার চেষ্টা করছে ওর চাচার কথার জবাবে শক্ত কিছু একটা বলতে যেরকমটা সে সবসময় বলে। কিন্তু আজ কেন জানি কিছুতেই সে শক্ত তো হতে পারছেই না বরং উল্টো নরম হয়ে যাচ্ছে।

'যাও, তোমার জন্য বাইরে অফিসের গাড়ি অপেক্ষা করছে,' বলে সে শারিয়ারের কাঁধে ছোট্ট একটা চাটি দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

শারিয়ারও এই পরিস্থিতি থেকে জলদি পালানোর জন্য হাতের ছোটো প্যাকেটটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ পেছন থেকে ওর চাচা বলে উঠল, 'আজ আমাদের বেশ বড়ো একটা ডিল আছে, আর এ কারণেই আমি এই পোশাকে আছি। এখান থেকে এয়ারপোর্টে যাব ফরেন ডেলিকেটদের রিসিভ করতে। শারিয়ার, মনে রেখো তুমি আজ যাই করছ সেগুলো হলো তোমার পরিবারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া। একদিন এই পরিবারের সব তোমাকেই সামলাতে হবে।'

চাচার কথা শেষ হওয়ার আগেই মৃদু হাসি ফুটে উঠলশারিয়ারের মুখে। মনে মনে সে বলে উঠল, *সেই অপেক্ষাতেই থাকুন, এই জীবনে আর সেটা হচ্ছে না।*

অধ্যায় এগারো

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

রামু, চট্টগ্রাম

জীবনে কোনদিন যেটা করবে না ভেবেছিল সেটাই করতে হচ্ছে কিরানকে, ফিরে আসতে হয়েছে নিজের বাড়িতে, তাও আবার লুকিয়ে চোরের মতো।

সামনের ভিড়টার দিকে খুব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তালেব কিরান। একবার ফিরে তাকাল ওর পাশে নিচু হয়ে বসে থাকা গোমেজের দিকে। গোমেজ নিজের দাঁত বের করে ফোকলা হাসি দিল।

কিরান আর গোমেজ এই মুহূর্তে অবস্থান করছে সমুদ্রের তীরে বিশাল এক বাড়ির সামনে। রামুর মন্দার গ্রামটা একেবারে সমুদ্রের কিনারায় অবস্থিত। আবার গ্রামের একেবারে কিনারায় কিরানদের বাড়ির অবস্থান। শেষ কথাটা মনে হতেই কিরানের মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। এই বাড়িটাকে কি আর নিজের বাড়ি বলা সম্ভব। ও কি আর এই বাড়ির, এই পরিবারের অংশ হিসেবে আছে? নাকি সব বদলে গেছে? সময়ের থাবা খুব খারাপ জিনিস, সবকিছু বদলে দেয়।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো কিরানের বুক চিড়ে। সামনে খোলা প্রাঙ্গণ, তার ঠিক পেছনেই বড় একটা দোচালা বাড়ি। এই বাড়িগুলোকে দোচালা বলা হয় এ-কারণে যে, বাড়িগুলোর একটা চালার ওপরে আবার একটা অতিরিক্ত চিলেকোঠার মতো থাকে।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে কিরানের যেন দৃষ্টি সরাতে ইচ্ছে করছে না। ওর বাবা সুবাদার তালেব তৈমূরের বাবা নাকি নির্মাণ করেছিল এই বিরাট বাড়িটা। যখন এটা বানানো হয়েছিল তখন অত্র এলাকার সবচেয়ে বড়ো বাড়ি ছিল এটা। কিরানের পরিষ্কার মনে না পড়লেও ও শুনেছে এক ব্যবসায়ীক সফর থেকে ফেরার পথে কিরানকে কুড়িয়ে পেয়েছিল তালেব তৈমূর। তখন ওর বয়স ছিল তিন, সেই থেকে এ বাড়িতেই বড়ো হয়েছে সে। এই বাড়ির প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক ছিল ওর, এখনো আছে, চিরকালই থাকবে।

এসব পরিবারের সাধারণত কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের ঠিকানা হয় রান্নাঘর কিংবা আস্তাবলে। অথবা পরিবারের বাকি সবার ফাইটফরমায়েশ খাটার কাজে। কিন্তু

কিরানের ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি। এর পেছনে কারণ ছিল খোদ তালেব তৈমূর। মানুষটার অপরিসীম ভালোবাসা ছিল কিরানের প্রতি। লোকে এমনও বলত যে তার নিজের তিন ছেলে আর দুই মেয়ের চেয়ে সে নাকি অনেক বেশি ভালোবাসত কিরানকে। আর এ কারণেই সে কিরানকে বাড়িতে এনে ঘোষণা করে কিরান তার ছেলে হিসেবে বড়ো হবে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত পরিবারের কর্তা যা ঘোষণা করে পরিবারের কর্ত্রী করে উল্টোটা। কিন্তু কিরানের প্রতি তৈমুরের ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়েছিল তার অর্ধাঙ্গিণীর মাঝেও। যে-কারণে দীনহীন পথ শিশু হলেও তৈমূরের রাজসিক পরিবারে রাজার শিশুর মতোই বড়ো হয়ে উঠতে থাকে কিরান। যতদিন পর্যন্ত না সে বড়ো হওয়ার পর হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয় মোঘল বাহিনীতে যোগ দেবে। তারপরেই বদলে যায় সবকিছু।

বাড়ির দিকে ফিরে তাকানোতে পুরনো স্মৃতির ঝাঁপি খুলে যেতে থাকলেও সেগুলোকে যত্নের সঙ্গে সামলানোর চেষ্টা করে বরং বর্তমানে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করল সে। আকরাম বেগের সঙ্গে কথোপকথনের পর প্রথমেই কিরান সিদ্ধান নেয় বাড়িতে যেতে হবে তাকে। যেকোনোভাবে হোক মায়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আর সে উদ্দেশেই এখানে এসেছিল সে। কিন্তু বাড়ির সামনে অস্বাভাবিক ভিড় দেখে থমকে গেছে। এরকম ভিড় থাকার কথা ছিল না। এখানে ভিড়টা কিসের অনুমান করতে পারে সে। সম্ভবত আরাকান থেকে শাহ সুজার মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছেছে এখানে। আর আকরাম বেগের কথা যদি সত্য হয় তবে এই খবরও এসে পৌঁছেছে যে, শাহ সুজার সঙ্গে তালেব তৈমূরও মারা গেছে। কারণ সে-যে আরাকান থেকে পালাতে পেরেছে এটা তেমন কারো জানার কথা নয়। তৈমুরের মৃত্যুর কারণেই এই মাতমের আয়োজন।

কিন্তু আসলেই কি তাই? ভিড় দেখে তো মনে হচ্ছে না। ভিড় যে কারণেই হোক অপেক্ষা করতে হবে। এটা না কমলে সে যে উদ্দেশে এসেছে সেটা পূরণ হবে না। গোমেজের পাশে বসে সে কোচর থেকে তামাক পাতা বের করে মোড়াতে শুরু করল। তারপর ওটাতে আগুন দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল এক গাদা। গত রাতে আকরাম বেগের সঙ্গে তার কথোপকথন মনে পড়ে গেল।

***

তার বাবার অন্তর্ধানের কথা শুনে প্রথমে চমকে উঠলেও খুব দ্রুতই কিরান আবারও বসে পড়ে আকরাম বেগের সামনের কেদারায়। এরই মধ্যে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কী করতে হবে তাকে। 'আমি আমার বাপের সুসন্তান হইতে পারি নাই ঠিকই কিন্তু বাপের সবচেয়ে বড়ো বিপদের সময়ে আমি পিঠ দেখায়ে পলাবো

এতটাও খারাপ না আমি। আমার সর্বোচ্চ দিয়া চেষ্টা করব। আর সেই জন্য প্রয়োজন হলে এক সিলভেরা না একশ সিলভেরার রগে লড়াই করতেও আমি পিছপা হবো না।'

আকরাম বেগ ইশারায় তার প্রধান লাঠিয়াল চাপদাড়িকে গড়গড়াটা নিয়ে যেতে বলল। তারপর নিজের পাঞ্জাবির কোচর থেকে একটা রেশমি রুমাল বের করে মুখ মুছল। 'কিরান, তুমি কাজটা করবা শুইনা আমার সত্যি ভালো লাগতাছে। যদিও তুমি তোমার বাপের কারণে রাজি অইছো কিন্তু দুইটা কারণে তুমার কাজটা করা দরকার। এই কামডা করতে পারলে নতুন জীবন শুরু করতে পারবা, যেমনডা আমি বলছি। তবে তার চায়া বড়ো কথা তুমি নিজের ভেতরে যেমনে ভাইঙ্গা গেছিলা সেইটা ঠিক করতে পারবা। একজন মানুষের জন্য নিজের কাছে নিজে হাইরা যাওনের চায়া খারাপ কিছু আর অইতে পারে না। আরেকটা কারণ অবশ্য আছে,' আকরাম বেগ কেদারায় নিজের পা তুলে বসল। সম্ভবত অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করছে সে। 'একদিকে তুমি নিজের দেশের মানুষরে সাহায্য তো করতেই আছ। তার চায়া বড়ো কথা তুমি নিজের মানুষগো খুনের বদলা নিতে পারবা। তয় কিরান,' বলে সে থেমে গেল। 'কামডা কিন্তু সহজ অইবো না। অনেক অনেক বিষয় আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা সিলভেরা আর তার বাহিনীরে আইজতক কেউ হারাইতে পারে নাই। এমনকি মোঘলরা পর্যন্ত হের হাতে ঘোল খায়া গেছে। ওরে মোটেও ছোটো কইরা দেইখো না।'

'চাচা, এক ভুল আমি দুইবার করব না,' কিরানের দৃষ্টি আবারও সেই পুরনো সময়ে ফিরে গেছে। 'আর এইবার আমার ভুল মানে বাবার জীবনের ঝুঁকি। কাজেই...' সে বাক্য শেষ না করে মাথা নাড়ল। 'তয় চাচা অনেক কিছু লাগব। বিরাট খরচের ব্যাপার,' শেষ কথাটা বলে সে আকরাম বেগের দিকে তাকিয়ে রইল তার প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য।

আকরাম বেগ মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। 'খরচ কোনো সমস্যা না কিরান। আমি আছি, আমার পেছনে চাঁটগাওয়ের ব্যবসায়ীরা আছে, ঢাকার মসলিনের কারবারিরা আছে। আরো বড়ো একটা হাত আছে আমগো পিছে,' কথা শেষ অংশটা সে খুব রহস্যময়ভাবে বলে উঠল, 'কাজেই ওইগুলা কুনো সমস্যা না। আমার ধারণা সমস্যা অইবো তুমার মানুষ নিয়া। এই কামে অনেক লোক লাগব তুমার। সাধারণ লাঠিয়াল আর লোকবল লাগলে কোনো বিষয় আছিল না। কিন্তু তুমার লাগব বিশেষ কামে পারদর্শী লোক। সেইডাও বড়ো সমস্যা না। বড়ো সমস্যা অইবে সময়। খুব অল্প সময়ে অনেক মানুষ জড়ো করতে হইবে তোমার। তাও যার যার কামে সেরা লোকজন,' আকরাম বেগের গলায় সামান্য অস্থিরতা।

'আমার নিজের আগের দলের মানুষগোরে লাগব,' কিরান মনে মনে হিসেব করতে শুরু করে দিয়েছে। 'সবাইরে হয়তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু সত্যি কথা অইলো অগোর অন্তত কয়েকজনরে না অইলে আমার চলবোই না,' বলতে বলতেই সে চুপ করে আড়মোড়া ভাঙল। 'কারণ এরকম একটা কামে আমার চিনা পরিচিত ছাড়া অন্য মানুষের ওপরে আমি ভরসা করতে পারব না।'

'জাহাজ,' আকরাম বেগ গুনতে শুরু করেছে। 'অস্ত্র, মালসামান এইগুলা কোনো সমস্যা না। রামুর মন্দার হাটের কাছেই পাহাড়ি খাঁড়ির উদ্দেশে তিনটা জাহাজ এরইমধ্যে রওয়ানা দিছে।'

'তাইলে সেগুলাতে অস্ত্র আর মালসামানে ভরতে লাগায়া দেন। আমি মানুষের ব্যবস্থা করতাসি। আমি যাগোরে নিবো তাগোর অনেক অর্থ দিতে হবে। যদি কোনো কারণে তাগো প্রাণের ওপরে ঝুঁকি আসে বা তারা মারা যায়, তাগো পরিবাররে অনেক অর্থ দিতে হবে। এইগুলার ব্যবস্থা আপনের করতে হবে। আমি খোঁজ লাগাইতাছি। তয় তার আগে আমি বাড়ি যাব।'

'বাড়ি ক্যান?' আকরাম বেগের গলায় সাধারণ কৌতূহল।

'আমার আম্মার সঙ্গে দেহা করতে হবে,' কিরান জোর গলায় বলে উঠল। ওর গলার স্বরেই আকরাম বেগ বুঝে গেল ওকে ফেরানো যাবে না।

'ঠিক আছে, আমি তোমারে বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দেব না। কারণ তোমার তো রামুতে যাইতেই হবে। তবে খুব সাবধান দুইটা বিষয়ে। একে, আমাগো এই যাত্রা নিয়া বাইরের কেউ যাতে জানতে না পারে। আর, তুমি কিন্তু চিনা মুখ। বহু মাইনষে তোমারে খুঁজতাছে এহন। কাজেই খুব সাবধান।'

সেদিন রাতেই ওরা ওদের ডেরায় ফিরে গিয়ে বৈঠা, ওর ছেলে আর গোমেজকে নিয়ে ভোরে ভোরে উঠে রওয়ানা দেয় রামুর উদ্দেশে। রামুতে নেমেই বৈঠাকে পাঠিয়ে দেয় কিরান একটা বিশেষ কাজে। এরপরে গোমেজকে নিয়ে নিজের বাড়িতে এসে দেখে এখানে বিশাল যজ্ঞ চলছে। কাহিনিটা কি ঠিক বুঝতে না পেরে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয় ও।

***

অপেক্ষা করতে করতে মাটিতে বসে তামাক টানছিল। হঠাৎ কাঁধে গোমেজের খামচি খেয়ে কাঁধ ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল কিরান। জটলার একপাশে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন মহিলা। এর ভেতর থেকে মাতম করে কাঁদতে থাকা দুজনে মিলে একজন মহিলাকে ধরে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানাদিল। মাঝখানের মহিলাই কিরানের মা সালেহা বানু।

মহিলারা নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিতেই গোমজকে উদ্দেশ্য করে কিরান বলেউঠল, 'গোজু তুই এহানেই থাক,' বলে সে নিজের কাফতানের ওপরে পরে থাকা আলোয়ানের মতো জিনিসটা দিয়ে মাথা আর মুখ ঢেকে ফেলল, তারপর দ্রুত পায়ে রওয়ানা দিল বাড়ির পেছনের অংশের দিকে।

মাঝেমধ্যে টুকরো টুকরো পরিবর্তন হলেও বাড়ির মূল অংশ বলতে গেলে আগের মতোই আছে। আর একারণেই খুব সহজেই কিরান পানির ছোট্ট একটা ইদারার পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির পেছনের অংশে। এখান থেকেও বাড়ির একেবারে অন্দরমহল পর্যন্ত প্রবেশ করাটা খুব একটা সহজ হতো না ওর জন্য। কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটাই সহজ হয়ে এলো বাড়িতে আজ বিশেষ আয়োজনের কারণে।

বাড়ির পেছন দিকে বাড়ির মূল পানির উৎসকে কেন্দ্র করে রান্নাবান্নার আয়োজন চলছে। কিরান দেখেই বুঝল আজ বাইরে থেকে পাকোয়ান এসেছে। বাড়ির পেছনে পুরুষ-মহিলারা মিলে কাজ করছে। কেউ মশলা বাটছে, কেউ সবজি কুটছে, কেউ পেঁয়াজ-মরিচ আবার কেউ মাংস প্রক্রিয়া করতে ব্যস্ত। বাড়ির এই অংশ দেখে মনেই হয় না বাড়িতে সবাই একজন মানুষের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জড়ো হয়েছে। বাড়ির পেছনের এই আয়োজন দেখে কিরানের মনে হলো মত্যু যেমন মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড়ো সত্য, ঠিক তেমনি মৃত্যু সবচেয়ে বড়ো আয়োজনও বটে।

বাড়ির ভেতরে বাইরের মানুষজনের সুযোগ নিয়ে খুব সহজেই বাড়ির মূল পাকোয়ানখানার কাছে চলে এলো সে। সেখানে এসে একটা খালি ঝুড়ি তুলে নিয়ে মাথা-মুখ আড়াল করে এমনভাবে বাড়ির ভেতরের দিকে রওয়ানাদিল যেন কিছু একটা আনতে যাচ্ছে। ঝুড়ি হাতে নিয়ে সোজা বাড়ির জমায়েতখানায় চলে এলো কিরান।

তারপর রওয়ানাদিল ভেতরবাড়ির দিকে। মার শোবার ঘরের সামনে আসতেই ভেতর থেকে দুজন মহিলা বেরিয়ে এলো। মাথা নিচু করে চুপচাপ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল কিরান। মহিলা দুজন দূরে সরে যেতেই শ্লথ পায়ে ভেতরে প্রবেশ করল কিরান। ভেতরে ঢুকে বহু পুরনো একটা পরিচিত গন্ধ পেল সে। এই গন্ধের সঙ্গে কত পরিচিতি ওর। কতদিন পর এই গন্ধের রাজ্যে প্রবেশ করল ও।

ঘরের ঠিক মাঝখানে বিরাট একটা উঁচু পালঙ্কের মতো কাঠের খাট। কিরান ওটার কাছাকাছি যেতেই মাকে শুয়ে থাকতে দেখল। বালিশে মুখ নিচু করে আছে সালেহা বানু। সামান্য ফোঁপানোর শব্দও শুনতে পেল ও। সেই সঙ্গে মায়ের পিঠটা বার-বার ফুলে ফুলে উঠছে। বিছানার কাছাকাছি গিয়ে দুবার অস্বস্তির সঙ্গে হাত এগিয়ে দিয়েও আবার ফিরিয়ে আনল। তৃতীয়বারের চেষ্টায় সফল হলো ও। নিজের

হাতটা মার পিঠের ওপরে রেখে অপরাধীর স্বরে ডেকে উঠল, 'মা।' কিন্তু মায়ের ভেতরে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। বরং সে আগের মতোই ফোঁপাতে লাগল। আবারও কিরান ডেকে উঠল। এবার একটু জোরে।

এক জোড়া লাল চোখ নিয়ে ফিরে তাকাল মা। কিরান তার দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে উঠল। কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল কিরানকে চিনতে। কিন্তু চিনতে পারার সঙ্গেসঙ্গে সে প্রায় চিৎকর করে উঠে বসে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল কিরানকে, 'কিরান, তুই আইছিস,' বলে সে আরো জোরে জোরে কেঁদে উঠল। 'এদ্দিন পর...তোর বাপু... এমন দিনে আইলি... এতদিন পরে মনে পড়ল তোর আমার কথা। তোর বাপু ' মা একের পর এক অসংলগ্ন কথা বলে যাচ্ছে। কিরান কিছুই না বলে মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রইল। ধাতস্থ হওয়ার মতো সময় দিল তাকে।

তারপর খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে আসার পর সে বলে উঠল, 'মা, তুমি ঠাণ্ডা হও। আমি আইছি না।'

'বাবা, তুই আইলি, তোর বাপে কই গেল,' বলে সে বাইরে দেখাল। 'ওরা সব ভাগ করতে চায়। সব জমি-ব্যবসা-বাড়িঘর,' বলে সে আবারও হাউমাউ করে উঠল। 'এই বাড়ি, তোর বাপ-দাদার এই বাড়ি ওরা সবাই ভাগ করে ফেলতে চায়।'

'মা, তুমি শান্ত হও,' কিরান মায়ের চোখের পানি মুছে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আরো বেশ কিছুক্ষণ পর অনেকটাই শান্ত হয়ে এলো মা। কিরানের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে বলে উঠল, 'বাবা তুই কই গেছিলি? এমন দুবলা হয়ে গেলি ক্যামনে?'

মায়ের কথা শুনে কিরান হেসে উঠল। 'মা, তুমি পাগল,' বলে ও একটা মাটির পাত্র থেকে পানি এনে এগিয়ে দিল মায়ের দিকে। মা ছোটো বাচ্চাদের মতো করে পানি খাচ্ছে, কিরান নিজের ভারী হয়ে আসা কোমর দেখিয়ে হেসে উঠল। 'এই আমার দুবলা হওয়ার লক্ষণ!' বলে ও আনমনে মার কপালে হাত বুলিয়ে দিল। 'তুমি বুড়ি হয়া গেছো মা,' দুজনেই হেসে উঠল একসঙ্গে।

'বাবা তোর বাপে...' মা আবারও আগের মতো হয়ে যাচ্ছিল তার আগেই কিরান ত্রস্ত পায়ে গিয়ে কামরায় প্রবেশ করার দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এলো। 'মা, তোমার সাথে কথা আছে,' বলে ও শক্ত করে মায়ের হাত চেপে ধরল। 'মা, তুমরা যা শুনছো সেটা পুরোপুরি ঠিক না,' বলে ও আরেকবার চারপাশে দেখে নিল। 'বাবা আসলে মরে নাই,' কিরান এইটুক বলতেই মা মুখ তুলে তাকাল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'আরাকানে শাহ সুজার লগে সবাই মরে নাই,' বাপুর ব্যাপারে বিস্তারিত সব কথা মাকে বলতে গিয়েও সে থেমে গেল। এসব মাকে বলার প্রয়োজন নেই। 'ওইদিন রাতেই বাবা একটা জাহাজ নিয়া পলাইছে ওইহান থাইক্কা,' সিলভেরা আর মগরা যে বাপুর পিছু নিয়েছে, এই ব্যাপারটাও সে চেপে যাবে সিদ্ধান্ত নিল। 'মা, আমি এহন আর বিস্তারিত কিছু বলব না তুমারে। খালি এট্টুক কই, আমি দ্রুতই রওয়ানা দিতাছি বাবারে ফিরায়া আনার জন্য। তুমি আশীর্বাদ রাইখো,' বলে সে মায়ের পা ছুঁল একবার।

'কিন্তু বাবা তুই কখে জানলি...'

'মা আমি কিছুই তুমারে বলব না। খালি বলছি আমি যাচ্ছি বাবারে ফিরায়া আনতে। তুমি আশীর্বাদ রাইখো। আর শোন এই শকুনগুলারে যেইগুলা জড়ো হইছে বাইরে তুমি ওগোরে খালি একটা কথা বলবা, যেই পর্যন্ত বাপুর মৃত্যুর নিশ্চিত খবর না পাওয়া যাইতাছে অথবা বাবার মরদেহ না পাওয়া যাইতাছে, সব আগের মতোই থাকব? বুঝছো?'

কিরানের প্রশ্নের জবাবে মা স্রেফ মাথা নাড়ল। কিরান অনুমান করল একের পর এক ধাক্কায় মায়ের মাথা কম কাজ করছে।

'আরেকটা কথা, যেটা জানার জন্য আমি এহানে আইছি,' বলে সে মায়ের একেবারে কাছ থেকে জানতে চাইল। 'বাবা কী অরাকান যাওয়ার আগে তোমারে শেষ কথা বইলা গেছিল?' মা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কিরান বুঝল বাবা যদি কিছু বলে গিয়েও থাকে কাজ হবে না, এইমুহূর্তে মা কিছুই বলতে পারবে না।

কিরান আনমনেই একবার মায়ের মাথায় হাত বুলাল, 'মা আশীর্বাদ রাইখো। আমি যাই, আর শোন তোমার যদি কিছু মনে পড়ে তুমি আমারে খবর পাঠায়ো। আইজ রাতে মন্দারহাটের উত্তরের খাঁড়ির ভেতর থনে জাহাজ ছাড়ব আমি। আমি যাই মা,' বলে কিরান ফিরে যেতে নিচ্ছিল হঠাৎ মা পেছন থেকে ডেকে উঠল। 'শুন, কিরান,' পালঙ্ক থেকে নেমে আসতে লাগল।

মা সোজা হেঁটে চলে গেল কাঠের বিরাট দেরাজের কাছে। সেটা খুলে ভেতর থেকে একটা চাবি বের করে কিরানকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল ঘরের কিনারায় রাখা সিন্দুকের কাছে। কিরান একটু অস্থির হয়ে উঠছে, যেকোনো সময় যে কেউ চলে আসতে পারে। বিশেষ করে ওর ভাইদের কেউ যদি ওকে দেখে ফেলে নিশ্চিত মনে করবে ও সম্পত্তির ভাগ নিতে এসেছে। আর তাহলে তুলকালাম ঘটে যাবে। এই মুহূর্তে কোনো অবস্থাতেই নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে চায়না ও।

'মা জলদি করো।'

একটু পরেই মা ফিরে এলো। তার হাতে ছোটো একটা কাপড়ের পোঁটলা। 'তোর বাপে আরাকান যাওয়ার আগে এইটা আমারে দিয়া বলছিল সাবধানে রাখতে। আমি তোরে দিলাম।'

'কিরান পোঁটলাটা খুলে দেখল ভেতরে মোটা একটা রুপার চেইন। আর চেইনের সঙ্গে আটকানো একটা গলায় ঝুলানোর বড়ো দোলক। অদ্ভুত দেখতে দোলকটার গায়ে বিচিত্র আঁকিবুঁকি কাটা। 'কী এইটা?'

মা মাথা নাড়ল। 'জানি না রে বাপ, তোর বাপে বাড়ি থনে বাইর হওয়ার আগে এইটা আমার হাতে দিয়া বলল, 'এইটা সবসময় নিজের কাছে রাখবা। আর মনে রাখবা বুকের বলই সবচেয়ে বড়ো বল',' বলে সে একটু থেমে যোগ করল, 'এইটা তুই রাখ, আমার কাছে থাকলে ওরা নিয়া যাব গা,' বলেই সে আবারও কাঁদতে লাগল।

কিরান জিনিসটা নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে কাফতানের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল তারপর মাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'আরে, আবার কাঁদে,' বলে ও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখল মাকে কিছুক্ষণ । 'মা, আমি অবশ্যই বাবারে ফিরায়া আনব। এহন আমি যাই,' বলে ও মাকে শুইয়ে দিয়ে ও সাবধানে মুখ আড়াল করে বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে। বাইরে এসে দেখল ঝোপের পেছনে ঘাসের ওপরে শুয়ে আরামে নাক ডাকছে গোমেজ। আর গালে হাত দিয়ে নিজের ছেলেকে নিয়ে তার পাশে বসে আছে বৈঠা। ওকে দেখেই উঠে দাঁড়াল বৈঠা।

'কিরে তুই কখন আসলি? আর এটা ঘুমায় ক্যান?' বলে ও নাড়া দিল গোমেজকে।

ওর কথার জবাব না দিয়ে বৈঠা বলে উঠল, 'ওস্তাদ খুব খারাপ একটা খবর নিয়া আসছি আমি।'

'ক্যান তোরে যে কামে পাঠাইছিলাম সেই কাম অয় নাই?' গোমেজকে আবারও নাড়া দিতেই সে উঠে বসল।

'সেইজন্যই তো বলতাসি খারাপ খবর,' বলে সে একটু থেমে যোগ করল। 'তুমি যার খোঁজে আমারে পাঠাইছিলা সে আমগো সাহাইয্য কী করব হে তো কবেই মইরা গেছে।'

বৈঠার কথা শুনে বুকের ভেতরটা লাফ দিয়ে উঠল কিরানের। তার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল কিরান। আনমনেই বলে উঠল, 'হায়-হায়, কেমনে?'

অধ্যায় বারো
বর্তমান সময়
গুলশান, ঢাকা

চাচার সাথে কথা বলার সময় কিভাবে কী হয়ে যায় বুঝতে পারে না কিরান। তাও ভালো আজ অন্তত তর্ক হয়নি। তাই একটু হলেও স্বস্তি বোধ করছে ও।

চাচার কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে বাইরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল শারিয়ার। শীতের সকাল হওয়ার কারণে ভোরের আলোর সঙ্গেসঙ্গে ছটা ছটা উজ্জ্বল রোদ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে পুরো লন জুড়ে। কিন্তু সেই আলোর ছটাকে ম্লান করে দিয়ে আরো অধিক উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে লনের একপাশের রাস্তায় একটা সাদা পুলিশি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার হাসি।

'বাহ, তুই গোঁফ রেখেছিস দেখি,' বলে সে ঠোঁট বাঁকিয়ে বিশেষ একটা ভঙ্গি করল। 'তোকে দেখতে 'টেকিং অব পেলহাম' সিনেমার জন ট্রাভোল্টার মতো লাগছে,' হাসতে হাসতে বলে উঠল সে।

'আরে, মৌসুমি আপা। এতদিন পর দেখা। এটা কী বললে তুমি! আমি কি অতো বুড়ো আর টাকলা নাকি?' বলে তার সামনে গিয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরতে উপক্রম হলো শারিয়ার।

'শোন স্মার্টনেস জিনিসটা বয়স বা মাথার চুল দিয়ে নির্ধারণ হয়না। ওটা ধারণ করার ব্যাপার,' কপট রাগের সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল মানুষটা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'আর শোন, এসব হাগটাগ পরে হবে। আগে বল আমার গিফট কই?' ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইল পুলিশ ব্যুরো অব স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনের অ্যাডমিন অফিসার এবং স্পেশাল উইংয়ের প্রধান সৈয়দ হাবিব আনোয়ার পাশার সেক্রেটারি মৌসুমি সারোয়ার। 'তানভীর কিছুই না এনে শুধু চকলেট দিয়ে কাজ চালিয়েছে। তুই অমনটা করলে কিন্তু আমি মানব না,' শারিয়ার আর তানভীর দুই বন্ধুর জন্য মৌসুমি সারোয়ার হলো ওদের বড়ো বোনের মতো। আসলে বলা চলে বোনের চেয়েও বড়ো।

শারিয়ার তার দিকে ফিরে একটা হাতে কান ধরল, 'সরি, আপা একেবারেই সময় পাইনি, তুমি যেটা বলেছিলে সেটা আনা সম্ভব হয়নি।'

'মানে তুই আনিসনি?' প্রায় রাগের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল মৌসুমি।

'আরে এত অস্থির হলে হয়?' বলে সে হাতে ধরে থাকা প্যাকেটটা মৌসুমির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল। 'এটা এনেছি তোমার জন্য।'

'দেখি, বলে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ওটা খুলে হা হয়ে গেল মৌসুমি। ভেতরে সবুজ পান্না বসানো একটা নেকলেস। জিনিসটা দেখে প্রথমে অবাক হলো মৌসুমি, তারপর একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলে উঠল, 'শারিয়ার, এত দামি জিনিস তুই এনেছিস! এটা, এটা আমি নিতে পারব না,' মৌসুমির গলায় চূড়ান্ত অস্বস্তি।

এবার শারিয়ার ওর দিকে রাগের সঙ্গে ফিরে তাকাল। 'ফালতু কথা বলো না তো,' বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল ও। 'গাড়িতে ওঠো, দুনিয়ার আলাপ আছে। ট্রেন ছাড়তে কত সময় বাকি?' বলে সে গাড়িতে উঠে রাগের সঙ্গে বলে উঠল। 'বুড়ো হারামজাদা নিশ্চয়ই আমাকে ট্রেনে পাঠাচ্ছে নিজের কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য। আমার ওপরে খেপেছে সেটার প্রতিশোধ নিশ্চয়ই।'

'আর তুই মনে হয় কাজটা খুব ভালো করেছিস?' মৌসুমি এখনো পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ হতে পারছে না। 'শারিয়ার, তুই এত পাগলামি করিস ক্যান? তোরই ক্লোজ ফ্রেন্ড তানভীর একেবারে ধীর-স্থির। আর তুই পুরো উল্টো।'

'আচ্ছা, আগে বলো তানভীরের অবস্থা কি এখন? সুস্থ হয়ে উঠেছে?'

'সুস্থ তবে ও দুই হপ্তা ধওে সিলেটেই আছে। ওখানে অনেক কাজ ওর এখন,' মৌসুমি বলে উঠল। 'যদিও বেচারা প্রথম মিশনে অনেক ভুলভাল করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও কাজটা খুব দারুণভাবে সমাপ্ত করতে পেরেছে,' মৌসুমি ব্যাগ রেডি করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

'আচ্ছা, এখন বলো পরিস্থিতি কী?' এতক্ষণ এমনি কথা হচ্ছিল এবার শুরু হতে যাচ্ছে কাজের ব্রিফিং। 'হঠাৎ এত ঢাক গুড়গুড় কেন? হয়েছেটা কি আসলে চট্টগ্রামে?'

'আগে এটা ধর,' বলে সে একটা প্লাস্টিকের ফোল্ডার এগিয়ে দিল শারিয়ারের দিকে। 'আমি তোকে সংক্ষেপে মুখে যা বলব তার সব বিস্তারিত পাবি এই ফাইলে। ট্রেনে যেতে যেতে ফাইলটা খুব ভালোভাবে পড়ে নিবি। সম্ভব হলে স্পটে যেতে যেতে নষ্ট করে ফেলবি এটা পড়ার পর,' শারিয়ার ফাইলটা নিজের হাতে নিয়ে একবার পলক বুলিয়ে নিয়ে পাশে রেখে দিল।

'এটা হলো তোর ফাস্ট প্যাক,' বলে ওর দিকে একটা মোটামুটি ভারী ট্রাভেল ব্যাকপ্যাক এগিয়ে দিল মৌসুমি। শারিয়ার একবার মাথা নেড়ে জিনিসটা নিয়ে নিল। যদিও ওর মন চাচ্ছিল একবার খুলে দেখতে। কিন্তু সেটা না করে ওটার একপাশ খুলে সেই প্লাস্টিকের ফোল্ডারটা রেখে দিল ওটার ভেতরে। ফাস্ট প্যাক জিনিসটা খুবই কাজের একটা জিনিস। ওদের অফিসে প্রতিটা এজেন্টের জন্য

একটা করে এরকম প্যাক রেডি থাকে। প্রতিটি এজেন্টের মাপে দুই সেট কাপড় থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় প্রায় সব উপাদান থাকে এর ভেতরে। একেবারে হাতকড়া থকে শুরু করে অস্ত্র, ওষুধ, পর্যাপ্ত টাকা, টুল কিট, মেডিসিন প্রায় সবই আছে এতে। মানে একজন এজেন্ট দেশের ভেতরে অপারেট করতে গেলে যা যা লাগতে পারে তার সবই এক সেট করে রাখা থাকে এই ব্যাগে। যেকোনো এজেন্ট খুব দ্রুত যেন এটা নিয়ে মুভ করতে পারে তাই এটাকে ফাস্ট প্যাক বলে।

'তোর টিকিট ব্যাগের সামনের পকেটে আছে বলে ও এক মুহূর্ত দেখল শারিয়ারকে। 'তুই তো হালকা ব্লেজার পরে বেরিয়েছিস, আচ্ছা ওতে কাপড় আছে। চট্টগ্রামে ঠাণ্ডা অনেক বেশি। আর তোর মেশিন ঠিক আছে তো?'

'ডিপেন্ড করে তুমি কোনো মেশিনের কথা বলছো সেটার ওপরে,' শারিয়ার হোলস্টারে রাখা পিস্তলটা চেক করতে করতে হেসে উঠল।

মৌসুমি একটা চড় তুলল, 'বড় বোনের সামনে ফাজলামো,' বলে সে যোগ করল, 'শোন, ট্রেনে তোর সঙ্গে একজন মিট করবে তোকে অস্ত্র আর ট্র্যাকার বুঝিয়ে দেবে।'

'বুঝেছি বুঝেছি,' শারিয়ার দাপকে উঠল। 'এখন বলো চট্টগ্রামে আসলে হয়েছেটা কী?'

'যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ একটা অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা,' মৌসুমি খুবই সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল। 'চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের, মানে সোজা কথায় বলতে গেলে বেশ কিছু বড়োলোকের পোলাপান মদ খেয়ে পার্টি করছিল এমন সময় তাদের ভেতরে কেউ একজন প্রস্তাব করে বসে বৃষ্টির ভেতরে ড্রাইভে যাওয়ার। ব্যাস বাইরে বেরিয়ে পড়ে। ওরা যখন পতেঙ্গা রোডে ড্রাইভ করছিল সম্ভবত ড্রাঙ্ক অবস্থায় বৃষ্টির ভেতরে অনেক বেশি গতি থাকায় কন্ট্রোল করতে না পেরে একজন মানুষকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলে।'

'স্পট ডেড?' শারিয়ার স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইল।

'হুমম, সম্ভবত স্পটেই মারা যায় বয়স্ক লোকটা,' বলে মৌসুমি থামল।

শারিয়ার অপেক্ষা করছে পরবর্তী কথা শোনার জন্য কারণ ও জানে এটা কোনো কেস হতে পারে না। 'কিছু বড়োলোকের ছেলেমেয়ে এটা করেছে সেটা যেহেতু জানো তোমরা তারমানে ওরা ধরা পড়েছে, রাইট?'

'রাইট, ওরা ওখানেই ধরা পড়ে। মানুষটাকে চাপা দিয়ে ওরা আসলে কী করবে বুঝতে পারছিল না। এমন সময়ে একেবারে পুলিশের একটা টহল কারের সামনে পড়ে যায়।'

'এখন কি ওদেরকে ইন্টারোগেশনের জন্য স্পেশাল ট্রেনিং অফিসার শারহান শারিয়ারকে পাঠানো হচ্ছে?' শারিয়ার দুষ্টুমি করে বলে উঠল।

'মূল ঘটনা এটা নয় বালক, ঘটনা ঘটতে শুরু করে এরপর,' মৌসুমি ফোড়ন কাটার মতো করে বলে উঠল। 'প্রথম ঘটনা হলো, মানুষটাকে অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে দিয়ে পুলিশ যখন আশপাশে দেখতে শুরু করে প্রথমেই তারা খুব অবাক হয় এটা ভেবে যে, মানুষটা ওখানে এসেছে কোথা থেকে। কারণ আশপাশে বাড়িঘর কম এবং বেশ দূরে দূরে। লোকটা ঘুমানোর পোশাক পরে ছিল। প্রথমেই প্রশ্ন জাগে ঘুমানোর পোশাক পরা একজন মানুষ বৃষ্টির ভেতরে ওখানে আসলে কী করছিল? পুলিশ খুঁজতে শুরু করে মোটামুটি কাছে যে বাড়িটা পায় সেখানে গিয়ে দেখে ওটা চট্টগ্রামের বড়ো একজন ব্যবসায়ীর বাড়ি কিন্তু তারা সপরিবারে বাইরে থাকে, এটা অবশ্য পরে জেনেছি আমরা। কিন্তু সে-বাড়িতে খুঁজতে গিয়ে পুলিশ আবিষ্কার করে মানুষটা ওই বাড়িতেই থাকত এবং বাড়ির বেজমেন্টে থাকত, সম্ভবত ইল্লিগ্যালি। সে সম্ভবত কেয়ারটেকারকে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে থাকত। সেই লোকটার থাকার জায়গা খুঁজতে গিয়ে পুলিশ বেইজমেন্টে গিয়ে দেখতে পায় সেখানে সে বেশ সংসার সাজিয়ে বসবাস করছে এবং সে যে ওখানে বেশ লম্বা সময় ধরে থাকছে সে-ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই। ওই বেজমেন্টে বসে সে কিছু একটা নিয়ে গবেষণা করছিল।'

'তাই নাকি?' শারিয়ার এই প্রথমবারের মতো একটু আগ্রহ পেল, এতক্ষণ তার কাছে ভীষণ বিরক্ত লাগছিল।

'কারণ লোকটা সেই বেইজমেন্টেই তার থাকার জায়গাতে ছোটো একটা স্টাডির মতো বানিয়েছে যেখানে দেয়ালে এত বিস্তারিত গবেষণার মতো দেয়ালচিত্র এবং পোস্টার বানানো হয়েছে যে ওটা দেখে পুলিশের মাথা ঘুরে গেছে। তোর ফাইলে আছে তবুও এটা দেখ,' বলে মৌসুমি তার মোবাইল এগিয়ে দিল শারিয়ারের দিকে।

ছবিটা দেখে আক্ষরিক অর্থেই শারিয়ারের চোখ কপালে উঠে গেল। 'মাই গড, একজন মানুষ এটা করেছে,' ছবিটাতে দেয়ালজোড়া মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর পেইন্টিংয়ের মতো গবেষণাপত্র ছড়ানো। 'এই লোক কোন ফিল্ডের মানুষ?'

'এইখানে আসে দ্বিতীয় মজার ব্যাপার,' বলে মৌসুমি হেসে উঠল। 'একদিকে যখন পুলিশ অবাক হয়ে লোকটার স্টাডি দেখছিল অন্যদিকে একই সময়ে লোকটাকে হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং সেখানে ডিউটি ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। কিন্তু এরপরে সেখান থেকে মানুষটার লাশ চুরির প্রচেষ্টা চালানো হয়।'

'বলো কী? কে এই লোক?' কথাটা আপনাতেই বেরিয়ে গেলশারিয়ারের মুখ দিয়ে।

'পেশায় সে একজন আর্কিওলজিস্ট এবং কনটেম্পেরারি সময়ে উপমহাদেশের সেরা আর্কিওলজিস্টদের একজন। নাম তার প্রফেসর ডক্টর সুলতান। মজার ব্যাপার হলো মানুষটা একই সঙ্গে খুব বিখ্যাত আবার কুখ্যাতও ছিল।'

'কেন?'

'কারণ সে তার কাজের জন্য যেমন বিখ্যাত একই সঙ্গে বারবার সে বাংলাদেশ, ভারতের সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে গণ্ডগোলে জড়িয়েছে। সে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে সরকারের সঙ্গে মতবিরোধে গেছে এবং একপর্যায়ে তার বিরুদ্ধে কিছু প্রজেক্ট নিয়ে সরকারের সঙ্গে বিরোধ হলে বাংলাদেশ সরকার তার আর্কিওলজির লাইসেন্স বাতিল করে দেয়। এরপর থেকে এই লোককে কেউ খুঁজে পায়নি। একরকম বলতে গেলে সে হারিয়ে যায়।'

'মৃত্যুর আগ পর্যন্ত,' শারিয়ার ছবিটার দিকে আরেকবার দেখে নিয়ে মোবাইলটা ফেরত দিল মৌসুমিকে। 'একজন বিখ্যাত প্রফেসর যে কিনা তার লাইনের সেরা লোক সে সরকারের সঙ্গে গণ্ডগোল করে হাইবারনেশনে চলে গেল এবং তিন-চার বছর গায়েব থাকার পর তার লাশ পাওয়া গেল চট্টগ্রামের এক রাস্তায়। এখানে প্রশ্ন হলো দুটো। এক, মানুষটা এই ক'বছর করছিল কী?'

'সে যে বড়ো কিছু একটা করছিলে সেটা তো ছবি দেখেই ধারণা করা যায়,' মৌসুমি বলে উঠল।

'প্রশ্ন নম্বর দুই, সরকারের সঙ্গে তার গণ্ডগোল বেঁধেছিল কী নিয়ে এবং সরকারের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে সে কার কাছে গেল এবং সে কিংবা তারা তাকে কীভাবে সাহায্য করল এবং বিনিময়ে কী চাইল?'

মৌসুমি একটা আঙুল তুলল শারিয়ারের দিকে। 'তুই একটা আস্ত হারামি এবং বেয়াদব। কিন্তু তবুও তোকে আমি পছন্দ করি কেন জানিস। কারণ তুই একেবারে সঠিক সময়ে সঠিক জায়গাটা খুব দ্রুত ধরতে পারিস,' বলে সে হেসে উঠল, সঙ্গে শারিয়ারও। 'এই ব্যাপারটাই বলব এখন। যে-কারণে তোকে ডেকে পাঠানো হলো এই মিশনে এবং পাশা স্যার পুলিশ সিআইডি আর সিবিআইয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে কেসটা আমাদের কাঁধে নিয়ে এলো সেটার পেছনে একটা বড়ো কারণ হলো ওই বেইজমেন্টে এমন কিছু ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে যার সঙ্গে আন্তর্জাতিক বেশ কয়েকটা বড়োবড়ো আর্কিওলজিক্যাল চোরাচালানি সংস্থার সংযোগ পাওয়া গেছে। এর আগেএদের কখনো বাংলাদেশে অপারেট করতে শোনা যায়নি। কিন্তু বেইজমেন্টে পাওয়া ডক্যুমেন্ট থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে প্রফেসর সুলতানের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল।'

'এবার বোঝা গেল কাকু সরকারের সঙ্গে বিফল হয়ে কার কাছে গেছিল,' ওর অনুমান মিলে যাওয়াতে আনমনেই হেসে উঠল শারিয়ার।

'ঠিক, খুব সারফেস লেভেল থেকেই এটা ধারণা করা যাচ্ছে যে, রেলিক এবং নেক্রপোলিস নামক দুটো আন্তর্জাতিক চোরাচালানি সংস্থার দুটো অথবা যেকোনো একটার সঙ্গে অন্তত প্রফেসরের যোগাযোগ ছিল এবং ওদের হয়ে সম্ভবত সে বড়ো কিছু একটার প্ল্যান করছিল। খুব জোর সম্ভাবনা এ রকম যে, ওরাই এই লোকটাকে

সব ধরনের সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছিল এবং মানুষটার মৃত্যুর পর সম্ভবত ওরাই তার লাশ চুরি করতে চেয়েছিল যাতে তার পরিচয় আমরা বের করতে না পারি অথবা অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে,' টানা কথা বলে একটু দম নিল মৌসুমি।

এরপর সে যোগ করল, 'এখন চট্টগ্রামে গিয়ে তোর কাজ হবে এটা বের করা যে, লোকটা আসলে ওখানে কী করছিল? তার যদি আসলেই আন্তর্জাতিক কোনো চোরাচালানি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ থেকে থাকে তবে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা যে ওসব সংস্থাগুলো আসলে আমাদের দেশে কতটা অ্যাকটিভ এবং,' বলে সে একটা হাত তুলল। 'ওইদিন রাতে ওই লোকটা স্রেফ ঘুমানোর পোশাকে ওখান থেকে বেরিয়ে বৃষ্টির ভেতরে হাইওয়েতে আসলে কী করছিল।'

'বুঝতে পেরেছি,' মাথা নাড়ল শারিয়ার।

'না পারিস নি,' বলে মৌসুমি সাবধান করে দিল শারিয়ারকে। 'তুই জানিস না তানভীরকে আমরা যখন সিলেটে পাঠাই ওর মতো অনভিজ্ঞ একজন অপারেটরকে ওখানে পাঠানোর পেছনে কারণ ছিল কেসটা অনেকটাই সাদামাটা মনে হচ্ছিল আমাদের কাছে। কিন্তু তানভীর ওখানে গিয়ে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় সেটা বলার মতো নয়। আরো একটা মজার ব্যাপার হলো প্রফেসর মিতায়ন আহমেদ ওরফে জ্যাক মাস্টার নামে যে কুখ্যাত অপরাধী প্রফেসর সেজে সিলেটে বসে অপারেট করছিল এটা কেউই কল্পনাতেও ভাবতে পারেনি। এই প্রফেসর মিতায়ন আর প্রফেসর সুলতান পরিচিত ছিল। শুধু তাই নয়। প্রফেসর মিতায়ন, যাকে সিলেট থেকে তানভীরের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেও এই রেলিক নামক চোরাচালানি সংগঠনের সাউথ এশিয়া জোনের প্রধান ছিল। এর কয়েকদিন পরেই ময়মনসিংহে একটা ঘটনা ঘটেছেল যেখানে জয়া সরকার নামে এক ভুয়া সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করে লোকাল ইনচার্জ অফিসার আহমেদ বাশার। এই জয়া সরকারেরও ইন্টারপোলের টপ লিস্টেড অ্যান্টিক চোরাচালানি সংগঠনের সঙ্গে যোগোযাগের সম্ভাবনা পাওয়া গেছে। ভেবে দেখ, আমরা যেসব সংগঠনের কথা জানতামও না, ওরা স্রেফ আমাদের নাকের ডগায় বসে এতদিন অপারেট করছিল। ওরা আর কী কী করছে আমাদের হাতে কোনো তথ্য নেই এই ব্যাপারে। আমার ধারণা তোর এই কেসটা যদি সত্যি সত্যি ওদের সঙ্গে কানেকটেড হয়ে থাকে তবে একদিকে তোর কোসটা ভীষণ জটিল হতে যাচ্ছে, অন্যদিকে আবার এই কেসটার মাধ্যমেই আমরা হয়তো একটা ধারণা পাবো ঘুমন্ত অজগর আসলে কতটা বড়ো। বুঝেছিস?'

শারিয়ার মাথা নাড়ল।

'সেই সঙ্গে তোর এই কেসের সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের পাশা স্যার ও তানভীরের বিশেষ টিম তৈরির ব্যাপারটাও। কাজেই শারিয়ার আমার ভাই খুব সাবধান, কোনো ভুল করা চলবে না তোর,' মৌসুমির গলায় আকুতি।

'আরে তুমি দেখি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ,' বলে শারিয়ার হেসে উঠল। 'এখন একটা হাগ দাও, আমি বিদেয় নেই,' বলে শারিয়ার মৌসুমির কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে ওর ফাস্ট প্যাক কাঁধে নিয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে দেখল ট্রেন ছাড়তে আর খুব বেশি বাকি নেই। ও টিকিটের সঙ্গে নম্বর মিলিয়ে চট্টগ্রাম যাওয়ার ট্রেনের সামনে এসে নির্দিষ্ট বগিতে চলে এলো। বিরাট বগিটার ভেতরে ছোটো-বড়ো বিভিন্ন আকারের কেবিন। প্রথম কেবিনটার সঙ্গে নম্বর না মিললেও ওটাতে উঁকি দিয়ে দেখল ওটা চার বার্থের কেবিন। ওটা হওয়ার প্রায় কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ও নিদিষ্ট নম্বর মিলিয়ে তেরো নম্বর কেবিনের সামনে চলে এলো। নম্বরটা দেখে আনমনেই হেসে উঠল। এটা কোনো সতর্কবার্তা নয় তো। কেবিনের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখল এটা দুই বার্থের কেবিন। ভেতরে ঢুকে ও ব্যাগটা রাখতে যাবে এমন সময়ে একটু চমকে উঠে খেয়াল করল নিচের বার্থের এক কোনায় জানালার পাশে একহাতে মুখ ঢেকে একজন মানুষ ঘুমাচ্ছে। শারিয়ার একটু অবাক হয়ে কেবিনের নম্বরটা মেলাল ওর টিকিটের সঙ্গে।

ব্যাপার কী? নম্বর তো ঠিক আছে। দরজার হাতলে হাত রেখে জোরে টান দিল ও খোলার জন্য কিন্তু খুলল না ওটা।

ব্যাপার কী? দরজাটা জ্যাম হয়ে গেল নাকি? এসব ট্রেনের কোনো জিনিসের কোনো আগামাথা নেই। যেকোনো সময় এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। বরং প্রথমবারেই কাজ করলে অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার হতো। শারিয়ার দরজার হাতল ধরে আবারও টান দিল জোরে। মনে মনে ভাবল, এরকম নতুন ট্রেনের দরজা এভাবে আটকে গেল। অবাক করার মতোই ব্যাপার।

'ওইডা খুলত না, বাইরে থাইক্কা লাগায়া দেওয়া অইছে,' পেছন থেকে বয়স্ক একজন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে একটু অবাক হয়েই পেছন ফিরল শারিয়ার। আনমনেই ওর দৃষ্টি চলে গেল সিটের ওপরে রাখা ব্যাকপ্যাকটার দিকে। ওটার ভেতরেই ওর অস্ত্রটা রাখা আছে। জিনিসটাকে হাতের কাছে না রাখার কারণে নিজেকে একটু হলেও অভিশাপ দিল ও মনে মনে। যদিও এখনো ঝুঁকি অনুভব করার মতো কিছু হয়নি তবুও মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনিং আর অভ্যাসবশত সতর্ক হয়ে উঠেছে ও। আড়মোড়া ভাঙতে থাকা মানুষটার দিকে চোখ রেখে আপনাতেই শরীরটাকে খানিকটা বাঁকিয়ে চট করে সিটের দিকে খানিকটা সরে গেল ও। এতে করে দুটো ব্যাপার ঘটবে। একে তো মানুষটা যদি হঠাৎ ওকে আক্রমণ করতে চায় ওর দ্রুত নড়ার কারণে সেটা পারবে না, তার ওপরে শরীরটাকে বাঁকিয়ে ফেলাতে সম্ভাব্য টার্গেট হিসেবে একটু হলেও ছোটো হয়ে যাবে ও, সেই সঙ্গে সিটে রাখা ব্যাকপ্যাকটার দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল। আরেকটু এগোলেই চট করে হাতের নাগালে চলে আসবে ওটা।

শারিয়ার অনেককিছু কল্পনা করে ফেললেও আড়মোড়া ভাঙতে থাকা মানুষটার মধ্যে কোনো ভ্রুক্ষেপ দেখা গেল না। সে আড়মোড়া ভেঙে খুব তরল দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল শারিয়ারের দিকে। 'ভাতিজার রিফ্লেক্স তো বালাই,' বলে সে নিজের শার্টের বুক পকেটের দিকে হাত বাড়াল, সথে সঙ্গে আবারও নড়ে উঠল শারিয়ার।

'আরে আস্তে,' শারিয়ারকে নড়ে উঠতে দেখে আধবুড়ো মানুষটা প্রায় ধমকে উঠল। শারিয়ার অবাক হয়ে দেখল মানুষটা তার বুকপকেট থেকে একটা স্টিলের চকচকে বাক্স বের করে সেটা থেকে একটা পানের খিলি বের করছে। 'কে আপনি? এভাবে...'

'খারাও ভাতিজা,' বলে সে গড়গড় করে একটা পাসকোড বলে গেল। ওটা শুনেই শারিয়ারের শক্ত হয়ে ওঠা স্নায়ু শান্ত হয়ে গেল। 'কি এবার মাথা ঠাণ্ডা অইছে?' বলে সে মৃদু হেসে উঠে শারিয়ারকে বসার জন্য ইশারা করল।

দুই হাত তুলে সারেন্ডারের ভঙ্গি করে হেসে উঠল শারিয়ার। মানুষটার বিপরীত দিকের সিটে বসতে বসতে বলে উঠল, 'সরি, আমি এক মুহূর্তের জন্য চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না,' হঠাৎ ট্রেনের বগিতে এই লোকটার আবির্ভাব এবং খানিকটা উত্তেজনায় শারিয়ার একটু চমকে গেছে। মনে মনে সে ভাবল একজন ট্রেইনড এজেন্ট হিসেবে এই উত্তেজনা তাকে একেবারেই মানায় না। আরো অনেক ঠাণ্ডা মাথায় এবং ফোকাসড হয়ে চিন্তা করতে হবে।

'ভাতিজা যা কইতাছিলাম,' বলে লোকটা তার হাতে ধরা পানের খিলিটা খুলতেই মিষ্টি জর্দার গন্ধে ভরে উঠল ট্রেনের ছোটো কামরাটা। 'তুমার রিফ্লেক্স তো বালাই কিন্তু এত চট কইরা মাথা গরম কইরা ফালাও ক্যান?' পানের খিলিটাকে ভাঁজ করে বেশ আয়েশের সঙ্গে সেটাকে মুখে পুরে দিল মানুষটা।

আর শারিয়ার একটু বিরক্তির সঙ্গে চোখ তুলে তাকাল তার দিকে। কথা নেই বার্তা নেই, আধ বুড়ো পুরনো দিনের অফিসের ক্লার্কের মতো চেহারার লোকটা তখন থেকে ওর প্রশ্নের উত্তর তো দিচ্ছেই না উল্টো মানুষটার হামবড়াই ভাব দেকে গা জ্বলে যাচ্ছে শারিয়ারের। 'আপনি কে আগে বলুন তো, তখন থেকে...'

এবারও মানুষটা কোনো জবাব দিল না, বরং চোখ তুলে তাকাল সে শারিয়ারের দিকে। পানের রসে লাল হয়ে উঠতে থাকা ঠোঁটের সামনে একটা আঙুল তুলে চুপ থাকতে বলল সে শারিয়ারকে। মানুষটার চেহারা যতই মরাধরা হোক কিন্তু চোখের দৃষ্টি আর ব্যক্তিত্ব এমন চট করে চুপ হয়ে গেল শারিয়ার।

'এই তো বালো ছেলে,' বলে সে নিজের ডান হাতে একটা রুমাল বের করে মুখ মুছল তারপর তৃপ্তির সঙ্গে বলে উঠল, 'বুঝলা ভাতিজা পুরান ঢাকার বুইড়া মোক্তারে পানডা যা বানায় না,' বলে সে তৃপ্তির সঙ্গে আরো কয়েক সেকেন্ড পান

চিবুল। তারপর আবারও, যোগ করল, 'নতুন ঢাকার পুলাপানে দুনিয়ার জিনিস দিব পানে কিন্তু পান থাকব লুয়ার মতোন শক্ত। আর মোক্তারের পান মাখনের মতোন নরম...' বলে সে হাসতে হাসতে পাশে রাখা নিজের পুরনো ব্যাগটাতে হাত দিল।

'আমি এটা বুঝতে পেরেছি আপনাকে অফিস থেকে পাঠিয়েছে...'

'তুমার রেকর্ড পড়ছি আমি ভাতিজা। আগে কও মাথা এত গরম কইরা ফালাও ক্যান?' কথাটা বলতেই সিটি বাজিয়ে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ট্রেনটা চলতে শুরু করল। শারিয়ার মানুষটার কথার জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে, কী জবাব দেবে বুঝতে পারছে না ও। কিছু না বলে সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল। ওর কাঁধ ঝাঁকানো দেখে মৃদু হেসে উঠল মানুষটা। তার মান্ধাতার আমলের ব্যাগটার ভেতর থেকে একেবারে চকচকে একটা অ্যাপলের ট্যাব বের করল সে। গলার সঙ্গে কাল চশমার রিবন দিয়ে ঝুলানো গান্ধি চশমটা তুলে দিয়ে নাকের ওপরে লাগাল। তারপর চোখ তুলে ট্যাবে তাকিয়ে বলতে লাগল, 'বাহ, রেকর্ড তো মারাত্মক তোমার ভাতিজা,' বলে সে আবারও হেসে উঠল, 'আর্মি থেইক্কা বহিষ্কার, পুলিশ থেইক্কা পরায় সাসপেন্ড,' আনমনে মাথা নাড়ল সে। 'যা ভাবছিলাম, কেরাতির বিলাক বেল্ট, মার্কম্যানশিপে শতকরা সাতানব্বইভাগ অ্যাকুউরেসি রেইট, বাহ-বাহ,' মানুষটা ওর প্রোফাইলে চোখ বুলিয়ে চলল সেই সঙ্গে মজার মজার মন্তব্য করে চলল, নিজের সিটে হেলান দিল শারিয়ার। ওর একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সেটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না।

এবং অত্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত জীবন,' বলে নিজের বক্তব্য শেষ করে চোখ তুলে তাকালসে শারিয়ারের দিকে। এবার যেন খানিকটা চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

'এভাবে কারো সামনে তার প্রোফাইল পড়াটা কি শোভনীয়?'

শারিয়ারের প্রশ্ন শুনে লোকটা এক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর প্রায় উচ্চ স্বরে হেসে উঠল। 'এই কথা তুমি কইতাছ পোলা? তুমি? সারা জীবন কোনো নিয়মের ধার ধারছ তুমি?' বলে সে হেসেই চলল। 'আমি ভাবতাসি তুমি আর তানভীর বন্ধু অইলা ক্যামতে? দুইজন পুরা উল্টা!'

শারিয়ার একটু অবাক হয়ে ফিরে তাকাল মানুষটার দিকে। 'আপনি তানভীরকে চেনেন নাকি?'

'সিলেট যাওনের আগে তুমার বন্ধুরে আমিই বিরিফ করছিলাম,' বলে সে চোখ থেকে চশমাটা খুলতে খুলতে বলে উঠল। 'ভালো পোলা। ঠাণ্ডা মাথা, নিয়ম মাইন্না চলে,' শেষ কথাগুলো সে একটু বিশেষভাবে উচ্চারণ করল যেন শারিয়ারকে কোনো ইঙ্গিত দিতে চায়।

'বাই দ্য ওয়ে, আমি আলীম পাটোয়ারি, রিসোর্স সেকশন,' বলে সে ব্যাগটা

আবারও টেনে নিয়ে কিছু একটা বের করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর শারিয়ার অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকাল মানুষটার দিকে। আলীম পাটোয়ারি বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ভেতরে প্রায় লেজেন্ডারি পর্যায়ের নাম। টেকনো পুলিশিং এবং অস্ত্রের জগতে তার মতো বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে তো বটেই সারা বিশ্বেই খুব কম আছে। দীর্ঘদিন ইন্টারপোলের টেকনো সেকশনে কাজ করেছে এই লোক। এই কেরানিমার্কা হালকা-পাতলা চেহারা, ছাগুলে দাড়ি আর পান চিবানো মানুষটাই যে লেজেন্ডারি একজন টেকনো এক্সপার্ট কে ভাবতে পারবে সেটা।

'দেহি, তুমার হাতটা দেহি,' বলে সে নিজের ব্যাগ থেকে একটা কাল কেইস বের করে আনল। সেটার ভেতর থেকে একটা সিরিঞ্জের মতো জিনিস বের করে শারিয়ারের হাতের ভেইনে প্রবেশ করে ইনজেকশন দিল সে। তারপর ছোটো একটা ব্যান্ড এইড লাগিয়ে দিল ওখানে। 'লিকুইড ট্র্যাকার, তুমার রক্তের লগে মিশা যাইব কয়েক ঘণ্টার ভেতরে। অ্যাকটিভ থাকব পাঁচ দিন পর্যন্ত। তারপর বাইর হয়া যাব শরীর থাইক্কা। এক্কেরে আধুনিক মাল। তুমি যেখানেই যাও আমরা ট্র্যাক করতে পারব তোমারে,' বলে সে শারিয়ারের বাঁ হাতটা ছেড়ে দিয়ে ডান হাতের দিকে ইশারা করে বলে উঠল, 'দেহি অই হাতডা,' শারিয়ার ওর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে মজা করে বলে উঠল, 'আংটি পরাবেন নাকি?'

মানুষটা কিছু না বলে হাতটাকে আরেকটু টেনে নিল নিজের দিকে, তারপর গরুর বাজারে লোকজন যেভাবে কুরবানির আগে গরু পরীক্ষা করে সেভাবে ভালোভাবে টিপেটুপে দেখতে লাগল।

'পাঁচ ফিট সাড়ে এগারোর তুলনায় তুমার হাতটা এট্টু বেশিই বড়ো, আঙুল গুলা বেশি মোডা। কাজেই বলে সে ভাবতে লাগল, 'খারাও দেহি।'

মানুষটার কথা বুঝতে না পেরে একটু অবাক হয়েই বলে উঠল, 'এক্সকিউজ মি?'

'আরে ব্যাডা খারাও,' বলে সে ওর গায়ে চড়ানো অ্যাশ কালারের ব্লেজারটাও খুলতে বলল। ট্রেনের ঝাঁকুনির সঙ্গে ব্যালেন্স করে শারিয়ার উঠে দাঁড়াল। ব্লেজারটা খুলে ও ছুঁড়ে দিল সিটের দিকে।

'হুম বহো,' বলে সে তার ব্যাগের ভেতর থেকে ছোটো একটা অ্যাটাচি কেসের মতো বের করে আনল। শারিয়ার দেখতে পেল ওটার ভেতরে সারি দেওয়া বেশ কিছু অস্ত্র। 'তুমার হাইট, বডি আর আঙুলের গিরিপ হিসাব কইরা আমি ভাবছিলাম তুমারে ম্যাগনাম দিমু, কিন্তু এহন মনে অইতাছে তুমার লাইগা এইটাই সেরা অইবো,' বলে সে দুহাতে ছোটো কোনো শিশুকে তুলে ধরছে আদর করার জন্য এমনভাবে কাল হ্যান্ডেলের চকচকে লম্বা নলের একটা পিস্তল বের করে আনল। 'জিনিসটা এক্কেরে নতুন, কোল্ট কিং কোবরা। জার্মান পুলিশের নিয়মিত অস্ত্র। বলে

সে অভ্যস্ত হাতে সিলিন্ডার বের করে এনে দেখাল ভেতরে চেম্বারে ছয়টা রাউন্ড ভরা। 'মজার বিষয় অইলো এইডাতে গুলি থাকে ছয়টা। কিন্তু নিচে আমার আবিষ্কার করা এই চেম্বারটা লাগায়া লইলে এই চেম্বারটা থেইক্কা একদিকে লেজার পয়েন্ট করতে পারবা টার্গেটে, লগে এটা তুমার পিস্তলের মেশিনের মতো ফায়ার করতে তো পারবাই আর এই হাতে একটা এক্সট্রা সিলিন্ডার লাগায় রাখলে আগেরডা শেষ অইতেই নিজে থাইকা আরেকটা সিলিন্ডার লোড কইরা দিব। তুমার কাম খালি গুল্লি মারন,' বলে সে নিজের আনমনে হেসে ওঠে জিনিসটা ধরিয়ে দিল শারিয়ারের হাতে।

অস্ত্রটা হাতে নিয়ে শিশুদের মতো খুশি হয়ে উঠল শারিয়ার। সিলিন্ডার লোড-আনলড করে লেজার পয়েন্টার সেট করে দেখে আনমনেই বলে উঠল, 'দারুণ জিনিস, পুরো আগের দিনের ওয়েস্টার্ন কাউবয়দের মতো মনে হচ্ছে।'

'ভুল কও নাই, কহনো কহনো পুরান জিনিসই সেরা জিনিস। এইডা পাইরা লও,' বলে সে একটা সোল্ডার হোলস্টার এগিয়ে দিল ওর দিকে। পিস্তলটাকে ওটাতে ঢুকিয়ে জিনিসটা নিজের শার্টের ওপরে ওপরে পরে নিতে যাচ্ছিল তার আগেই আলী পাটোয়ারি থামতে বলল তাকে। 'খারাও খারাও আগে এইডা পরো,' বলে সে ভেস্টের মতো দেখতে শক্ত একটা জিনিস এগিয়ে দিল তার দিকে। ' যেই কামে যাইতাসো এইডা লাগবই।'

শারিয়ার জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখল একদম হালকা শক্ত একটা জিনিস। এক হাতে ধরে ওটাকে ওজন করে বলে উঠল, 'বুলেট প্রুফ জ্যাকেট এত হালকা?'

'হ, আমিও পরথমে অবাক অইছিলাম। লাইটওয়েট কার্বনের জিনিস। পরো দেহি।'

শারিয়ার পিস্তলসহ হোলস্টারটাকে সিটের ওপরে রেখে পাশ ফিরে জিনিসটাকে যত্নের সঙ্গে পরে নিল শার্টের ওপরে। 'বাহ বেশ ফিটও বটে। কিন্তু এটা ঠিকমতো কাজ করবে তো?' বলে সে পাশ ফিরে পাটোয়ারির দিকে তাকাতে যাচ্ছিল, তার আগেই বুকের একেবারে মাঝখানে শক্ত আঘাতে পিছিয়ে গেল। দেখল সর্বশক্তিতে একটা ছুরি তার বুকে বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেই সেটা ভেস্টে লেগে ছিটকে গেল একপাশে।

'আপনি পাগল নাকি?' অবাক হয়ে গেছে শারিয়ার।

'হা-হা, তুমিই তো জিগাইতাছিলা কাম অইবো কিনা?' বলে খিক খিক করে হাসতে লগলো বুড়ো পাটোয়ারি।

শারিয়ার ভেস্টের ওপরে পিস্তলসহ হোলস্টারটা পরে নিতেই ওর দিকে সুইচ নাইফটা ছুঁড়ে দিল। 'তুমি নাকি ছুরি রাখতে পছন্দ করো হুনলাম, তাই এইডা আনছি। আমেরিকার মাইক্রোটেক কোম্পানির জিনিস, নাম অইলো মাইক্রোটেক

হালো ভি। জন উইক সিনেমায় কিয়ানু রিভিস এই কোম্পানির ছুরিই ব্যবহার করে। ওরডা অবশ্য ভিন্ন মডেল। রিভিস, নামডা কি ভুল কইলাম ভাতিজা? নাকি রিভস?' ভ্রু কুঁচকে কথাটা বলে সে জোরে হেসে উঠল।

শারিয়ার ছুরিটা নিয়ে সেটাকে খাপসহ গোড়ালির ওপরে আটকে নিল। 'পেন্সিল নেই?' মুচকি হাসি দিয়ে জানতে চাইল শারিয়ার। ও ভেবেছিল বুড়ো বুঝতে পারবে না ও কি বলছে কিন্তু বুড়োর হাসি দেখে অনুমান করল সে ঠিকই বুঝেছে ও কি বলেছে। 'দারুন,' এই পাটোয়ারি লোকটাকে তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। ছুরিটা রেখে সোজা হয় সে বলে উঠল। 'আপনাকে দেখে আমার জেমস বন্ডের কিউয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে,' ও আবারও গায়ের ওপরে ব্লেজারটা পরে নিতেই বুড়ো পাটোয়ারি একবার জানালা দিয়ে বাইরে দেখে নিয়ে ওকে তার সামনে বসার ইশারা করল।

'শুনো পোলা, ওইসব আজগুবি জিনিস সিনেমাতেই দেহা যায়,' বলে সে তার স্টিলের বাক্স থেকে আরেকটা পান বের করে মুখে পুরে দিল। 'যা কইতাছি মন দিয়া শুনবা। যেই কামে যাইতাছো কামডা কিন্তু ঝামেলার। সবচেয়ে বড়ো কথা, ওইহানে আসলে কী ঘটছে কেউই ঠিকভাবে জানে না। এই কারণেই পাশা তুমারে পাঠাইতাছে। বিশেষ করে যেই মানুষডা মারা গেছে তার অতীত নিয়া ঘাঁটাঘাঁটি চলতাছে। সেই কাম আমিই করতাসি। তয় ওইহানে দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনগুলার অন্তত দুইডার যুগাযুগ পাওয়া যাইতাছে। কিন্তু কেন আর ক্যামনে হেইডা কিছুই বুজা যাইতাসে না। যেই সংগঠনগুলা দুনিয়া কাঁপাইতাছে হেরা হঠাৎ আমগো গরিব দেশে কী করতাছে হেইডা বোঝার কুনো উপায় এহনো পাওয়া যায় নাই। একদিকে মমিসিঙে জয়া সরকার নামে একজন ধরা পড়ছে, হের লগে এগো সংযোগ পাওয়া যাইতাছে। তার আগে আবার তানভীরের হাতে সিলেট জ্যাক মাস্টার ধরা পড়ছে, যে এই সংগঠনগুলার মাথাগোর একজন। কাজেই আমগো দেশে আসলে ঘটতাসে কি, হেইডা বোঝার একমাত্র উপায় এহন তুমি। যদি মনে কইরা থাহো ময়দান সাফ পাইবা, তয় ভুল করতাছো ভাতিজা। তার ওপরে পাশার এই নতুন বানানি সংগঠন অনেকেরই চক্ষুশূলে পরিণত অইছে ইতোমধ্যেই। কাজেই ঘরের ভেতরে আর বাইরে দুইহানেই খুব সাবধান থাকবা।'

শারিয়ার মৃদু হেসে উঠল, 'আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

ট্রেনের গতি ধীরে ধীরে কমে আসছে দেখে পাটোয়ারি আরেকবার বাইরে দেখে নিল। 'মোটেই না, তুমার ওই গরম মাথার ভেতরে পরিস্থিতির গুরুত্বডা ঢুকানির চেষ্টা করতাসি,' ট্রেনটা স্লো হতে হতে একেবারে থেমে গেছে। সম্ভবত বিমানবন্দর স্টেশন চলে এসেছে। বাইরে লোকজনের হইহল্লা আর হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। পাটোয়ারি তার ব্যাগ গোছাতে গোছাতে উঠে দাঁড়াল।

'বিমানবন্দর আইসা গেছে, আমি যাই,' বলে সে ব্যাগটা আর পুরনো দিনের ছাতাটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর শারিয়ারকে খুব অবাক করে দিয়ে একেবারে শুদ্ধ ভাষায় অত্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে বলে উঠল। 'বালক, আজ পর্যন্ত বহু এজেন্টের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। ভালো-মন্দ-দক্ষ-অদক্ষ কোনো ইয়ত্তা নেই। সফল হতে দেখেছি কাদের জানো?' বলে সে থেমে গেল। শারিয়ার তাকিয়ে আছে তার জবাবের অপেক্ষায়। 'যারা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে তাদেরকে,' বলে সে নিজের ছাতাটা শারিয়ারের দিকে বন্দুকের মতো তাক করল। 'তুমি একটা শক্তিশালী বোমা। কিন্তু মনে রাইখো বোমার শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে যেমন পাহাড় ভেঙে রাস্তা তৈরি করে ফেলতে পারে, আবার সেই বোমাই ধ্বংসযজ্ঞ এনে লাখো প্রাণের হন্তারক হতে পারে। তুমি তোমার শক্তি কীভাবে কাজে লাগাবে সেটা তোমার ব্যাপার। কাউকে বিশ্বাস করবে না, নিজের মস্তিষ্কটাকে ছাড়া। পাসকোড ছাড়া কোনো আলাপ করবে না। তোমার বন্ধু তানভীরকে আমি যা বলেছিলাম সেটাই বলব তোমাকে। বেস্ট অব লাক মাই বয়। ওটাই এখন তোমার সবচেয়ে বেশি দরকার,' বলে সে মৃদু হেসে ছাতা দিয়ে দরজায় টোকা দিতেই ওটা খুলে গেল।

শারিয়ার জানালা দিয়ে দেখল ছোটখাটো মানুষটা ট্রেন থেকে নেমে গুটি গুটি পায়ে প্ল্যাটফর্ম ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। শারিয়ার মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। ট্রেন আবারও চলতে শুরু করেছে ধীর লয়ে। দরজাটা ভেতর থেকে ভালোভাবে আটকে দিয়ে সিটে বসে চোখ মুদল ও।

পাটোয়ারি যাই বলুক না কেন ভেতরে-ভেতরে এসব মোটেও আমলে নিচ্ছে না ও। অনেকদিন পর সত্যিকারের একটা মিশনে চলেছে। উত্তেজনায় রক্তের ভেতরে বান ডাকতে শুরু করেছে ওর। ঠোঁটের দুইপাশ দিয়ে নেমে আসা চোখা গোঁফের কিনারার হাত বোলাতে বোলাতে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ওর মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি।

অধ্যায় তেরো

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

রামু, চট্টগ্রাম

সদাহাস্যোজ্জ্বল মানুষটার মুখের হাসি এভাবে মুছে যাবে কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেনি কিরান।

একটা সময় যথেষ্ট শক্ত মানুষ মনে করত সে নিজেকে। কিন্তু সেই কাল এখন গত হয়েছে। সময়, ব্যর্থতা আর হীনমন্যতার পাশবিক আঘাত তাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে শারীরিক, মানসিক আর অর্থনৈতিক দিক থেকে। তবুও আজও নিজেকে আশপাশের সবার থেকে অনেক বেশি সামর্থবান মনে করে কিরান। আর সেই শক্তির বলে সে জানে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন অশ্রুপাত ঘটানোর মতো মানুষ সে নয়। কিন্তু তরফদারের পোড়া বাড়ি আর ছোট্ট এক টুকরো মাটিতে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা আধভাঙা কবরটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অশ্রুকে সে কিছুতেই সামলাতে পারল না। ভাঙা বেড়া দেওয়া কবরটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল কিরান।

তরফদার, পুরো সুবর্ণগ্রামের সবচেয়ে সেরা তাঁতি ছিল, তার হাতে বোনা মসলিন 'মলমল খাস' আর 'সরকারে আলা' দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সরাসরি চলে যেত দিল্লি-আগ্রা আর হুগলীর বাজারে। সেই মানুষটাই একদিন এক হিন্দু মেয়ের প্রেমে পড়ে পরিবারের বিরাগভাজন হয়ে ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল অজানার পানে। আর সেই অজানা সমুদ্রেই তার সঙ্গে দেখা হয় আরেক ঘরছাড়া বালক কিরানের। বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লাগেনি। একদিকে কিরান ছিল বাঁধন ছাড়া উদ্যমী আর হিংস্র, অন্যদিকে তরফদার ছিল শান্ত-শিষ্ট সর্বক্ষণ দুষ্টুমির হাসিতে ভরপুর একজন মানুষ। সেই হাসিখুশি মানুষটার এই করুণ পরিণতি দেখে অন্তত তালেবের জন্য অশ্রু সংবরণ করা মুশকিল।

কতক্ষণ তরফদারের কবরের সামনে ও হাঁটু গেড়ে বসে দিল খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ কাঁধের ওপরে ভারী একটা হাতের স্পর্শ পেয়ে ভেজা চোখে সে ফিরে তাকাল মানুষটার দিকে। ভাবলেশহীন গোমেজেরও চোখ ভেজা। কিছু বলতে না

পারলেও কিরানের কষ্ট ওকেও ছুঁয়ে গেছে। আর তাছাড়া সেও তরফদারের ভালো বন্ধু ছিল। পরিজনবিহীন এই পৃথিবীতে গোমেজেরও গুটিকয়েক কাছের মানুষদের একজন ছিল তরফদার।

উঠে দাঁড়িয়ে গোমেজের পিঠ দুবার চাপড়ে দিয়ে কিরান ফিরে তাকাল বৈঠার সঙ্গে আসা ছোটখাটো মানুষটার দিকে। ছুঁচোর মতো চেহারার মানুষটার চতুর চোখের দিকে তাকিয়ে কিরান শক্ত সুরে জানতে চাইল, 'হয়েছিল কী?'

ছোটখাটো মানুষটার চোখা চেহারায় যতটা না ধার তার চেয়ে অনেক বেশি ধার তার চোখে। নাফ আর পুলু নদীর মোহনায় অবস্থিত মন্দার হাটের সবচেয়ে ধুরন্ধর মানুষদের একজন এই বিল্লাল। মোঘল সৈন্যবাহিনী থেকে শুরু করে রোসাঙ্গের রাজার লোক, এমনকি পর্তুগিজ জলদস্যু পর্যন্ত সবার কাছেই খবর বিক্রি করা এই লোকের কাজ। লোকে দুই নৌকায় পা দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু এই প্রবাদ বাক্যকে প্রতিনিয়ত ভুল প্রমাণ করে বিল্লাল শুধু দুই নৌকাই নয় কত নৌকায় যে পা দিয়ে বছরের পর বছর ধরে দিব্যি বেঁচে আছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আর সবার মতো কিরানও বহু বছর ধরে এই লোকের মাধ্যমে খবর সংগ্রহ ও পাচার করে। তবে কিরান জানে, এই লোকের এত বছর ধরে টিকে থাকার ভিন্ন কারণ আছে। এর ওপরে বিরাট মাথা আছে। সেই মাথার সন্ধান কখনো বের করতে না পারলেও কিরান এটা জানে, ও যা করতে যাচ্ছে তাতে বিল্লালকে তার দরকার হবে। আর তাই রামুর মাটিতে পা রেখে প্রথমেই সে বৈঠাকে পাঠিয়েছে বিল্লালের খোঁজ করার জন্য। কারণ, এর মাধ্যমেই তাকে পুরনো সঙ্গীদেরকে বের করতে হবে দল গঠনের জন্য।

প্রথমে কিছুক্ষণ উল্টোপাল্টা করলেও কিরানের শক্ত ধমক খেয়ে বিল্লাল সর্দার যখন কথা বলে উঠল কিরান একটু অবাক হলো। কারণ, বিল্লালের মতো ধুরন্ধর আর আবেগহীন একজন মানুষের গলাতেও সামান্য ভেজা সুর, 'ওস্তাদ, সত্যি কথা কইবাম। তরপদার ওই ঘটনার পরে,' সে কিরানের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল হঠাৎ সে ওই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। 'মানে... হেয় যহন ফিরা আইলো...'

'আমি তো জানতাম তরু ভাই ওর পরিবারের কাছে ফিরা গেছে,' তরফদারকে আদর করে কিরান তরু ভাই বলে ডাকত। 'সে এইখানে ক্যামনে?'

'পরথমে তাই গেছিল হ্যায়,' বিল্লাল আবারও বলতে শুরু করেছে। 'কিন্তু পরিবারের লগে টিকতে পারে নাই। হের...হের কি জানি অইছিল,' বিল্লাল সর্দারের গলায় অনিশ্চয়তা। কিরান এই পর্যন্ত শুনে আনমনেই মাথা নাড়ল। বিল্লাল সর্দার না জানলেও ও ঠিকই জানে তরু ভাইয়ের কী হয়েছিল। কারণ একই ব্যাপার ঘটছিল তার সঙ্গেও।

'কামে মন দিতে পারে নাই। পরিবারের লগে বনতো না,' বিল্লাল বলেই চলেছে। 'তারপরে এক সময় এইহানে আইয়া থাকতে শুরু করল। কিছু জমানি টাহা-পয়সা আছিল। হেইডি দিয়া বালাই চলল দুই বছর। তারপরে টাহা শেষ অইতে থাকলে কিছু কিছু কাম করত। শেষ দিকে ধার দেনায় ডুইবা গেছিল। তারপরে বছরখানেক আগে...'

বিল্লাল সর্দারের কথা শুনতে শুনতে খুব খেয়ালিপনা অনুভব হতেলাগল কিরানের। মনের গহিনে একটা অস্থিরতা আর অপরাধবোধের জমাট বাঁধা যন্ত্রণা পাক খেয়ে উঠতে চাইছে। খুব ভালোভাবেই সে অনুভব করতে পারছে কী ঘটেছিল তরু ভাইয়ের সঙ্গে। যখন মানুষটা একাকী দুঃসহ যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করছিল তখন তার উচিত ছিল মানুষটার পাশে থাকা। কিন্তু সেটা সে করেনি। বা করতে পারেনি। একদিকে তরু ভাইয়ের জন্য যন্ত্রণা অন্যদিকে আরেকটা অন্ধকার ভয়ের হাতছানি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। তার দলের বাকি লোকেদের না জানি কী অবস্থা। সবাই যদি এভাবে জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে থাকে তবে...

'তরফদার ভাই, আর সইহ্য করতে পারতাছিল না। একদিন বাজার থেইক্কা দেহা গেল সব দাউদাউ কইরা জ্বলতাছে। কেউ কয় সে আগুন লাইগ্গা মরছে, কেউ কয় নিজেই নাকি পুইড়া আত্মহত্যা...'

বিল্লালকে কথা শেষ করতে দিল না কিরান। তার আগেই সে তার দিকে কোমরে গোঁজা একটা থলি হাতে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। 'এইডা রাখ বিল্লাল। তোর লগে আমার অনেক কাম আছে,' বলে সে বৈঠাকে কাছে ডেকে কানে কানে কিছু নির্দেশনা দিল। 'শোন, আমি একটা বড়ো কামে নামতাছি,' বলে সে একটা আঙুল তুলল বিল্লালের দিকে। 'এই কামে তোর সাহায্য লাগব আমার। তাই এগুলা দিলাম,' বলে সে হাতের থলিটা দেখাল। 'মনে রাহিস আমার কাম গোপন রাখতে অইব তোর। এই জন্যই কামের আগে টাহা দিলাম, দরকারের চায়া অনেক বেশি দিলাম। কাজেই জবান এক্কেরে বন্ধ,' ঠোঁটের সামনে একটা আঙুল তুলে চুপ থাকার ইশারা করল সে। 'বুঝছোস?'

বিল্লাল সর্দার চতুর চোখে তাকিয়ে ছিল কিরানের দিকে। থলির ভেতরের মুদ্রাগুলোর প্রতিটি নড়াচড়ার সঙ্গে তার চেহারায় ভিন্ন ভিন্ন রং খেলা করে যাচ্ছে। কিন্তু কিরানের দিকে যখনই ফিরে তাকাল তার চেহারার বিশেষ কোনো ভাব নেই। কিরান সতর্ক চোখে তাকে দেখছে। সে খুব ভালোভাবেই জানে বিল্লালের মনে কী খেলা করছে। 'কও ওস্তাদ, কী দরকার তুমার?'

'বইদ্যা ওরফে বেদুরে দরকার আমার,' আনমনে বলে উঠল কিরান। 'ওরে খুইজ্জা বাইর কর। আগে ওর খবর আন। তারপরে তোর আরো অনেক কাম আছে। এই, তুই ওর লগে যাবি,' বলে সে বৈঠাকে ইশারা করল।

'ঠিক আছে ওস্তাদ,' বলে বৈঠা সামান্য মাথা নাড়ল। বৈঠা ওর দিকে তাকাতেই কিরান মুখে কিছু না বলে সে বৈঠার দিকে তাকিয়ে চোখের মণি বিশেষ ভঙ্গিতে দুবার দুদিকে নেড়ে একটা ভঙ্গি করল। যে কেউ দেখলে ভাববে কিরান স্রেফ এমনিতেই চোখ পিটপিট করল কিন্তু ও চোখ নাড়াতেই বৈঠার মুখে ফুঁটে ওঠা হাসিটা দেখেই সে বুঝতে পারল ওর পুরনো ইশারা বৈঠা এখনো ভোলেনি।

'তোরা এহন যা, আমার কাম আছে,' বলে সে বৈঠা আর বিল্লাল দুজনার দিকে তাকিয়েই শাসানোর ভঙ্গি করে বলে উঠল আইজ দুই পহরের ভেতরে আমার বেদুর খবর চাই। না অইলে তগো দুইডারই খবর আছে।'

কিরানের নির্দেশ শুনে বৈঠা তড়বড়িয়ে কথা বলে উঠল, 'ওস্তাদ ও তো হাডে হাডে খেলা দেহায়া বেড়ায়। ওরে এত জলদি...' তার কথা না শুনেই কিরান ধমকে উঠল, 'অন্য কথা বুঝি না, অহন কামে নাম। ভালায় ভালায় বেদুরে খুঁইজ্জা বাইর কর। নাইলে তোগো খবর আছে। যা ভাগ অহন,' কিরানের ধমক শুনে দুজনেই পড়িমড়ি করে রওনা হয়ে গেল হাটের পথে। আর কিরান ফিরে তাকাল গোমেজের দিকে, 'চল, আমরা এহন বিশেষ একটা জায়গায় যামু।'

গোমেজ মুখে কিছু না বলে তার হাতের লাঠিটাকে দুবার পাক খাওয়াল শূন্যে, কথা বলতে না পারা গোমেজের এটাই প্রশ্ন। সে জানতে চাইছে, কোথায় যাবে ওরা এখন। কিরান মৃদু হেসে উঠল, 'খণ্ডালের গুহায়।'

গোমেজ খুব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিরানের দিকে। আর সবার মতো সে এটা খুব ভালো করেই জানে, খণ্ডালের গুহা নিয়ে এলাকাতে অনেক ধরনের ভীতিকর গল্প প্রচলিত আছে। নাফ নদ, সমুদ্র আর চিতলখাল যেখানে মিশেছে সেখানে পাহাড়ের কোলেই কোথাও আছে খণ্ডালের গুহা। একসময় জাহাজ নির্মাণ আর মেরামতির কাজ চললেও এক ভূমিকম্পের পর থেকে সেই গুহা বহু বছর ধরে মানবপরিত্যক্ত। এর পেছনে প্রচলিত আছে অনেক গল্প। কিন্তু কোনটা সঠিক সেটা কেউই বলতে পারে না। তবে এটা সবাই জানে প্রাকৃতিকভাবে খানিকটা বিপজ্জনক জায়গায় অবস্থিত এই জায়গা, আবার একে নিয়ে ভীষণসব গল্প প্রচলিত থাকায় ভুলেও কেউ ওদিকে পা মাড়ায় না। গোমেজ তাই চোখে এক দঙ্গল প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে, কিরান কেন ওখানে যেতে চায়।

গোমেজের দিকে তাকিয়ে তার জিজ্ঞাসাগুলো সব পরিষ্কার বুঝতে পারলেও মুখে তেমন কিছু বলল কিরান। বরং গোমেজকে জলদি হাঁটতে ইশারা করল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে তাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'ওইখানে যাইতেসি কারণ আমগো বিশেষ কাম আছে,' বলে সে একটু থেমে যোগ করল, 'ওইখান থেইকাই জাহাজ নামানো হবে।'

কিরানের মুখে জাহাজ শব্দটা শুনে গোমেজের দাড়িভর্তি চওড়া মুখে ফুটে উঠল ততোধিক চওড়া একটা হাসি। হাঁটা বাদ দিয়ে জোরকদমে সে প্রায় দৌড়াতে শুরু করল সে। 'এই আস্তে যা গোমেজ,' বলে কিরানও দৌড়াতে লাগল তার পিছু পিছু।

ওরা ঘণ্টাখানেকের মতো জোরকদমে হেঁটে পার হয়ে এলো ক্রোশখানেকের মতো দূরত্ব। কিরানের নিজের গ্রাম আর মন্দার হাটকে মাঝ বরাবর রেখে সমুদ্রের সঙ্গে সমান্তরালে এগিয়েছে ওরা। আরো আধমাইলের মতো আসতেই সামনে পাহাড়ের সারি দেখতে পেল কিরান। তারমানে এখানে যে কোনোদিকেই থাকতে পারে খণ্ডালের গুহা। যেখানে পাহাড়, সমুদ্র আর নদীর মোহনা কোনাকুনিভাবে মিশেছে সেখানেই হতে হবে গুহাটাকে। কিন্তু কাছাকাছি এসে কিরান একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কারণ বহু বছর আগে আসা জায়গাটাকে সে ঠিক চিনতে পারছে না।

'কি রে গোমেজ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল সে। একটানা রোদের ভেতরে হেঁটে হাঁপিয়ে গেছে সে। কথাটা গোমজেকে উদ্দেশ্য করে বলেই সে গোমেজের সঙ্গে থাকা পানির মশকটা নিজের দিকে টেনে নিল। 'দেখতো কুনদিক অইতে পারে?' বলে সে মশকের মুখের অংশটা আলগা করে মুখ লাগাতে যাবে তার আগেই হুশ করে কিছু একটা চলে গেল একেবারে ওর পাশ দিয়ে। মুহূর্তের জন্য ধরতে পারল না সে আসলে ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটলো।

পাশ ফিরে দেখল মাটিতে কিছু একটা গেঁথে আছে। জিনিসটার লেজের কাছে নড়তে থাকা পালকটা দেখে সঙ্গেসঙ্গে সে বুঝতে পারল ওটা কি। কিন্তু পাশ ফিরে গোমেজকে সাবধান করতে যাওয়ার আগেই ফুঁচ করে সেই জিনিসটাই এসে বিঁধলো তার হাতে ধরা মশকের গায়ে। ধাক্কার চোটে জিনিসটা হাত থেকে ছুটে গেল ওর। একবারের জন্য কিরানের মনে হলো মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কিন্তু সেটা না করে বরং দুই হাত ওপরে তুলে স্থির হয়ে দাঁড়াল। গোমেজ খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। প্রথম তীরটা ওদের কাছাকাছি বিঁধতেই সে হাতের লাঠিটাকে পাক খাইয়ে শূন্যে তুলে ফেলেছিল সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। কিন্তু কিরানকে হাত তুলে দাঁড়াতে দেখে অবাক হয়ে ফিরে তাকাল। সঙ্গেসঙ্গে কিরানের মুখের হাসি দেখে নামিয়ে নিল লাঠিটা। 'সাবধান গোমেজ, বাড়াবাড়ি করিস না।'

গোমেজ সামান্য মাথা নাড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আট-দশজন লাঠিয়াল এসে ঘিরে ফেলল ওদেরকে। লুঙ্গি আর কাল ফতুয়ার মতো পোশাক পরা প্রত্যেক লাঠিয়ালের হাতে তেল চকচকে বাঁশের লাঠি। মাথায় বাঁধা বিশেষ কাপড়। তাদের সর্বাগ্রে দাঁড়ানো লম্বা-চওড়া কাল চাপদাড়ি একজন মানুষ। সবাইকে ছাড়িয়ে তার মাথা যেমন ওপরের দিকে উঠে গেছে ঠিক তেমনি বড়ো তার লাঠিটাও। কঠোর

চেহারার মানুষটা কিরানের দিকে এগিয়ে এসে ততোধিক কঠিন মুখে জানতে চাইল, 'তুমরা যে এয়ানে আইছো, কেউ দেহে নাই তো?'

'তুমার মালিকের কাছ থেইক্কা যে টাহা পাবা সেইটা থেইকা এই জিনিসটার দাম আদায় করব আমি,' মাটিতে পড়ে ফুটো হয়ে থাকা মশকটা দেখাল কিরান। তারপর নিজের হাতটা নামিয়ে আকরাম বেগের প্রধান দেহরক্ষী ও তার লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান তুলারামের দিকে তাকিয়ে। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল তুলারাম। কিরানের মনে হলো এটা সে তার মালিক আকরাম বেগের কাছ থেকে শিখেছে।

'কথার উত্তর দেও। যেমনে আইছো তাতে তো রাখঢাক দেখলাম না, কেউ দেহে নাই তো তুমগো?' সে এখনো আগের মতোই কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

কিরান মানুষটার কাজ আর কথা বলার ধরন খুব স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিল কারণ এ-ধরনের মানুষেরা বেশ কঠিন একটা পৃথিবীতে বাস করে। এদেরকেও বেশ কঠিন হতে হয় আর ঠিক একারণেই সে ধরেই নিয়েছিল মানুষটা স্রেফ নিজের কাজটাকেই অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে করছে। কিন্তু মানুষটার চোখের দিকে তাকিয়ে সে অন্য কিছু দেখতে পেল। মানুষটার চোখে পরিষ্কার জিঘাংসা দেখে সে অনুমান করল হয় এই লোক এখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে আর না হয় ওর ওপরে কোনো-না-কোনো কারণে এই লোকের পূর্ববর্তী রাগ আছে।

কিরান তার চোখ থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই দু-পা এগিয়ে গেল মানুষটার দিকে। 'নিজের কাম করো লাঠাল। আমি কারে নিয়া আইছি, কেমনে আইছি সেইটা তোমার জানার কাম নাই। নিজের কামে মন দেও,' বলে সে মানুষটার পায়ের দিকে ইঙ্গিত করল, 'অন্যের ওপরে খবরদারি করতে গেলে কেডা জানে দুই পায়ের ওপরে খাড়ায়া থাকতে পারবা কিনা,' বলে সে গোমেজের দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'কী কস গোমেজ?' কিরানের কথা শুনেই গোমেজ নিজের এক-পা পা শূন্যে তুলে ধাম করে মাটিতে নামিয়ে আনল, সেই সঙ্গে নিজের হাতে ধরা সাত ফিট লাঠিটা দুবার পাক খাওয়াল মাথার ওপরে।

'এহন কও লাঠাল, কী কইবার চাইতাছিলা?' কিরানের চোখেও আগুন।

তার চোখের দিকে সমান আগুন নিয়েই তাকিয়ে আছে তুলারাম। একবার কিরানের দিকে দেখে নিয়ে সে আরেকবার গোমেজকে দেখল। 'চাচায় আমারে কইছিল, তুমি একটা ফাজিল বেদ্দপ,' বলে সে একবার মাথা ঝাঁকাল। 'আইজকা তুমি বাইচ্চা গেলা জাহাজি,' বলে সে একটা হাত তুলে নিজের লোকদেরকে ইশারা করল। 'বাইচ্চা গেলা তুমার মাথার ওপরে চাচার হাত আছে দেইখা। কিন্তু মনে রাইখো প্রত্যেক দিন কিন্তু তা থাকব না।'

'সেইদিন আমিই নিজ হাতে তুমার মুণ্ডুটা...' কিরান কথা শেষ করতে পারল না। গুহার দিক থেকে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসতে থাকা পদক্ষেপের শব্দে সেদিকে ফিরে তাকাল সে। ভেবেছিল তুলারামের কোনো লোক বুঝি দৌড়ে আসছে। কিন্তু তার বদলে ছোটখাটো আধবুড়ো একজন মানুষকে দৌড়ে এগিয়ে আসতে দেখল সে। কাঁচাপাকা দাঁড়িওয়ালা প্রায় বামুন আকৃতির মানুষটা দৌড়ে তার দিকে এগিয়ে এসে কোমরের কাছটায় ধরে প্রায় শূন্যে তুলে ফেলল ওকে। 'আরে, রহমত চাচা তুমি, এইখানে?' রহমত ছিল ওদের জাহাজের বাবুর্চি। চিরকুমার রহমত কিরানকে নিজের ছেলের চেয়েও বেশি ভালোবাসত। 'কিরান, কত্তোদিন পরে তোরে পাইছি,' সে ঘুরানি থামাচ্ছে না।

'আরে পইরা যাব তো, নামাও,' কোনোমত্তে রহমত চাচার কোল থেকে নেমে আসতেই তাকে প্রায় দম বন্ধ করার মতো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সে। 'কিরান তুই ভালা আছস? কত্তোদিন পরে তোরে দেখলাম,' ছোটখাটো মানুষটা প্রায় ওর কোলের ওপরে চড়ে বসেছে। ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে প্রবল বেগে মুখ ঘসতে দেখে কিরান বুঝল মানুষটা নিজের চোখের পানি মুছছে ওর কাঁধের কাছের কাপড়ে।

'আমি ভালো আছি, রহমত চাচা,' বলে সে মানুষটাকে ছাড়িয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চাইল, 'তুমি এইহানে ক্যামনে? আর...'

'রহমতরে আমি নিয়া আসছি। গুহার মুখের কাছ থেকে ভারী একটা কণ্ঠস্বর শুনে সেদিকে ফিরে তাকিয়ে আরেকবার বিস্ময়ের সঙ্গে চোয়াল প্রায় ঝুলে গেল কিরানের। গুহার মুখের ঝোপঝাড়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা-চওড়া বলশালী একজন মানুষ। মুখভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি একদিকে যেমন তার চেহারায় এনে দিয়ে আভিজাত্য, অন্যদিকে সৌম্য অবয়ব আর প্রশান্ত চেহারায় বেশ প্রজ্ঞার একটা ছায়া। সেই প্রজ্ঞার মাঝখান থেকে কালোপট্টি বাঁধা একটা চোখ যেন চাঁদের বুকে কলঙ্কের মতো।

'কাপ্তান পট্টবর্ধন!' বিস্ময়ের সঙ্গে অনুধাবন করল খুশির একটা জোয়ার যেন তার ভেতর থেকে উদ্বেলিত হয়ে উঠে আসছে, একেবারে ঠিক বুকের ভেতর থেকে। 'কাপ্তান, তুমি এইহানে আইলা ক্যামনে?'

'ভুল প্রশ্ন করলা কিরান,' বলেই সে তার দিকে এগিয়ে যাওয়া কিরানকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'আমি এইহানে শুরু থেইকাই ছিলাম। বলতে পার আমার কারণেই তুমি এইহানে,' কপ্তান পট্টবর্ধন নিজের চওড়া ছাতির সঙ্গে ক্রমাগত পিষে চলেছে কিরানকে।

'মানে ঠিক বুঝলাম না,' কিরান নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কৌতূহলের সঙ্গে জানতে চাইল। 'তুমি শুরু থাইক্কা মানে?' কিরানরা যেই জাহাজের হয়ে মোঘল বাহিনীর জন্য কাজ করত সেই জাহাজের মূল চালক ছিল পট্টবর্ধন।

'চল, ভেতরে যাইতে যাইতে কথা কই। তুলারামের সঙ্গে বেহেজ করলেও সে কথা কিন্তু ভুল কয় নাই,' বলে সে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা তুলারামকে ইশারায় কিছু একটা বলল। তারপর রহমত চাচার সঙ্গে দুষ্টুমি করতে থাকা গোমেজকে ইশারা করল গুহার দিকে এগোতে। কিরান খেয়াল করল তুলারামের লাঠিয়াল বাহিনীর লোকেরা পাহারার উদ্দেশে গুহার চারপাশে লুকিয়ে গেল। এমনকি ওরা ভেতরে প্রবেশ করতেই একটা আলগা ঝোপের চাদোয়া বসিয়ে দেওয়া হলো গুহাটার ছোটো প্রবেশপথের মুখে। এত ঢাক গুড়গুড় কেন ঠিক বুঝতে পারছে না কিরান। *হচ্ছেটা কি এখানে?*

'কাপ্তান, তুমি কিন্তু এহনো আমারে ঠিক কও নাই, ব্যাপারটা কী?' গুহার ভেতরে ঢুকে সরু প্রায় অন্ধকার প্রবেশপথ ধরে পট্টবর্ধনের পিছু পিছু হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে কিরান। আধো অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারছে না, ওরা আসলে এগোচ্ছে কোনদিকে। আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে কিরান জানতে চাইল, 'আমরা যাইতাছি কই?' কিরান দেখল গুহার ভেতরের পথেও পাহারাদার আছে।

কিরান আবারও কিছু একটা জানার জন্য প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই কাপ্তান পট্টবর্ধন ওকে চুপ থাকার ইশারা করল। আরেকটু এগোতেই ওরা গোলমতো একটা জায়গায় এসে পৌঁছাল। জায়গাটা পাহাড়ের ভেতরেই কোথাও হবে। ওপর থেকে পাথরের ফাঁক গলে চিলতে আলো আসছে। ওখানে নানা ধরনের কাঠের বাক্স সাজানো। তুলারামকে সামনে এগোতে ইশারা করে কিরানকে ওখানে গিয়ে বসার ইশারা করল সে, তারপর নিজেও বসে পড়ল একটা কাঠের বাক্সের ওপরে।

কিরান নিজে বসে, ওর পাশের বাক্সে গোমেজ আর রহমত চাচাকে বসার ইশারা করল। 'কেমন আছিস কিরান?' পট্টবর্ধন কিরানদের জাহাজের কাপ্তান ছিল, মোঘল সেনাবাহিনীর জন্য ব্যাপারটা বিরলই বটে। কারণ যেখানে বেশিরভাগ জায়গাতেই মুসলমান সেনাপতি, সেখানে পট্টবর্ধনের মতো একজন নিম্নবর্ণের হিন্দুর জন্য একটা জাহাজের কাপ্তান হওয়াটা কঠিনই ছিল বটে। তবে পট্টবর্ধন আর কিরানদের দলে হিন্দু-মুসলমান, জাতপাত এসব নিয়ে কোনো ঝামেলা ছিল না। কিরান ছিল পট্টবর্ধনের ঠিক ওপরের অবস্থানে আর একারণেই লোকসম্মুখে কিরানকে তুমি ডাকলেও নিজেরা কথা বলার সময়ে তাকে সবসময় তুই বলেই ডাকত সে।

'ভালো আছি,' কিরান হাসিমুখে বলে উঠল। 'তুমি কেমন আছ? এত বছর কই ছিলা তুমি? তার চেয়ে বড়ো কথা তুমি এইহানে কেমনে?'

পট্টবর্ধন হেসে উঠল। 'শরীরটা খানিকটা ঢিলা অইলেও তুই আগের মতোই আছোস। সব বুঝতে অইবো তোর,' বলে কিরানের পিঠ চাপড়ে দিল সে। 'শোন,

চাঁটগাওয়ের ব্যবসায়ীরা পর্তুগিজ দস্যু সিলভেরা আর রোসাঙ্গ রাজের পিছে লাগার পরিকল্পনা অনেক দিন ধইরাই করতাছিল। কারণ অগো অত্যাচার দিন দিন মাত্রা ছাড়ায়া গেছিল। কিন্তু মধ্যিখানে দিল্লির কারণে সম্রাট সুজারে বাঁচাইতে গিয়া রোসাঙ্গের রাজারে কেউ কিছু কয় নাই। কিন্তু এরপরে ওরা যা করল,' বলে সে আনমনেই আরাকানে ঘটে যাওয়া বীভৎস ঘটনাটা মনে করে মাথা নাড়ল একবার। 'এরপরেই সবাই ঠিক করে সিলভেরা আর রোসাঙ্গরে ঠিক করতে অইবো,' বলে সে একটা হাত তুলে দেখাল কিরানকে। 'আর ঠিক এই জায়গাতেই বহু আগেই তোর কথা প্রস্তাব কইরা গেছিল তোর বাপে। আর এরকম কিছু যদি ঘটে তয় আমারে আগে থাইক্কাই সে কয়া গেছিল তোরে কামে লাগাইতে। আর তাই...'

'তারমানে যে খেলা শুরু অইতে যাইতাছে সেই খেলার টাট্টু তুমি আগে থাইকাই ছিলা,' বলে সে আনমনে মাথা নাড়ল। 'রহমত চাচারেও নিশ্চই তুমিই আনছো?'

'হ, ওর রান্না না অ্ইলে চলবে, ক?' বলে সে হেসে উঠে কিরানের পিঠে হাত রাখল। 'কিরান যে খেলা শুরু অইতে যাইতাছে। মনে রাহিস খেলা বড়ো অইতে অইতে অনেক বড়ো অইয়া গেছে। আর সবাই তোর দিকেই এহন তাকায় আছে। চল তোরে অনেক কিছু দেখানির আছে,' বলে সে আবারও কিরানের পিঠ চাপড়ে দিল। 'আমরা অনেক দিন ধইরাই প্রস্তুতি নিতাছিলাম। চল সব দেহাব তোরে। এইগুলা দেখলে আমার বিশ্বাস তুই অনেক বেশি সাহস পাবি।'

কিরান উঠে দাঁড়িয়ে গোমেজ আর রহমতকে ইশারা করে নিজে এগোতে লাগল পট্টবর্ধনের পিছে পিছে। ওরা আধচিলতে জায়গাটা থেকে সরে এসে আরেকটা চিকন পথ ধরে ছোট্ট একটা নালা পার হলো। তারপর বাঁক ঘুরতেই কিরান যা দেখতে পেল তা দেখার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না সে। ওর সামনে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। কিরান যখন শুনেছিল ওরা অনেকদিন থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলো দস্যুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য। কিরান ভেবেছিল বড়োজোর কিছু বড়ো নৌকা আর সাধারণ অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে ওরা। কিন্তু সামনে যা দেখতে পাচ্ছে তা দেখে এই প্রথমবার সে আকরাম বেগ এবং পট্টবর্ধনের বয়ান করা ঘটনার গুরুত্ব পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারল।

'সর্বনাশ! এত দেহি,' বলে সে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

'পছন্দ অইছে তোর?' বলে হেসে উঠল পট্টবর্ধন।

'অইছে মানে,' বলেই সে প্রায় ছোটো বাচ্চাদের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠল।

ওরা এখন যে-জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে দুই পাহাড়ের আড়ালে অবস্থিত পানির সঙ্গে সংযুক্ত একটা খাড়ি বলা যেতে পারে। তবে জায়গাটা খাড়ি হলেও একসময় সেটার পরিব্যাপ্তি বৃদ্ধি করে একটা ছোটোখাটো বন্দরের রূপ দেওয়া হয়েছে। কিরান শুনেছিল একসময় এই জায়গাটায় জাহাজ মেরামতির কাজ

চলতো। কিরান বর্তমান পরিস্থিতি দেখে বুঝল, আগের সেই কাঠামোর ওপরেই নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে বড়ো আকারের ভিত। আর সেখানেই এখন চলছে বিস্তৃত কর্মযজ্ঞ।

কিরান এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে পরপর সারি দিয়ে অর্ধেক পানি আর অর্ধেক মাটিতে মেরামত কাঠামোর ওপরে বসানো আছে তিনটা বিরাট আকারের জাহাজ। তিনটা জাহাজের কাঠামোই পরিষ্কার বলে দেয় গত বেশ কিছুদিন ধরে মেরামতের কাজ করে একেবারে ঝকঝকে করে তোলা হয়েছে জাহাজ তিনটাকে। তিনটের ভেতরে দুটো জালিয়া আর একটা যুদ্ধ জাহাজ। কিরান দেখে অনুমান করলো এককেটা জালিয়া কমপক্ষে ত্রিশ দাঁড়ির কম হবে না। সেই সঙ্গে পাল তো আছেই। আর যুদ্ধ জাহাজটাকে আক্ষরিক দানব বলা চলে। কমপক্ষে আশি বা নব্বই হাতের জাহাজ।

'হায় খোদা, এ তো একেবারে যুদ্ধের আয়োজন,' কিরান আপনাতেই বলে উঠল।

'যুদ্ধ করতে হলে যুদ্ধের আয়োজনই তো দরকার,' বলে পট্টবর্ধন কিরানের পাশে এসে একটা জালিয়ার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলে উঠল, 'পুরোপুরি যুদ্ধের সাজে সাজানি অইছে,' বলে সে কিরানের দিক ফিরে বলে উঠল, 'ত্রিশ দাঁড়ির নৌকা। একবার দাঁড়িরা দাঁড় ফালাইলে আর পালে হাওয়া লাগলে তীরের চায়াও জোরে ছুটবো। আর এইটা,' বলে সে কিরানকে নিয়ে এগিয়ে গেল জাহাজটার দিকে। 'এইটা থাকব সবার সামনে। সব ছিড়াবিড়া ঢুইক্কা যাইব ভিতরে।'

'বুঝতে পারতাসি তুমরা শক্ত অইয়াই নামছ। কিরান হঠাৎ তামাকের তৃষ্ণা অনুভব করতে লাগল। 'সিলভেরার কিরুদ্ধে নামতে অইলে কিন্তু কামান লাগব, বন্দুক লাগব আর লাগব অনেক অনেক গোলাবারুদ,' কিরান তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে পট্টবর্ধনের দিকে। 'তুমগো প্রস্তুতি কেমন?'

পট্টবর্ধন জবাব দেওয়ার আগে পেছন থেকে আবারও তুলারামের গলা শোনা গেল। 'জাহাজিরে আমগো অস্ত্রের কোষাগারডা দেহাও কাপ্তান সায়েব,' বলে সে হেসে উঠল। তার হাসিতে যোগ দিল পট্টবর্ধন।

'তুমি ঠিকই কইছো কিরান, চলো,' বলে সে কিরান আর তুলারামকে নিয়ে চলে এলো খাড়ির মতো জায়গাটার একপাশে। সেখানে পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটা গুহার মতো জায়গাতে দেয়ালে ঝোলানো সারি সারি অস্ত্র। কিরান আরো একবার হা হয়ে গেল অস্ত্রের বাহার আর পরিমাণ দেখে।

'কি, মুখ বন্ধ অয় না ক্যান জাহাজি?' ওর পাশ থেকে স্তম্ভিত কিরানকে দেখে সে বেশ মজা পাচ্ছে। কিরান অস্ত্রাগারের দিকে এগিয়ে দেখতে পেরো একপাশে কয়েকটা কামান সাজানো, সেই সঙ্গে কাঠের বাক্সে অসংখ্য গোলা।

'এইগুলা পাঁচ আঙ্গুইলা কামান এইহানে, আর আরো নয়টা আছে তিন জাহাজে।

'বন্দুক কী পরিমাণ আছে?' কিরান হাঁটতে হাঁটতে পাশ থেকে একটা লম্বা নলের গাদা বন্ধুক তুলে নিল।

'গাদা বন্দুক আছে পঁচিশটা। তীর, ধনুক অসংখ্য। প্রত্যেকের লাইগা দুই নলাও আছে,' স্তূপ করা ছোটো নলের হাতবন্দুক দেখাল। 'আর আছে এইগুলা। মাটিতে স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে অসংখ্য তলোয়ার আর চোখা নলের বর্শা। কিরান সেদিকে এগিয়ে বিশেষ জিনিস তুলে নিল।

পট্টবর্ধনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'এই জিনিসও আনছো?' জিনিসটার চকচকে বাঁশের শরীর প্রায় ছয় ফিট লম্বা কিন্তু ওটার মাথায় সজারুর কাঁটার মতো এক ঝাঁক কাঁটা বসানো। এটাকে ছুঁড়ে শত্রুকে গেঁথে ফেলার জন্য এর চেয়ে ভালো অস্ত্র আর হয় না। স্থানীয় ভাষায় এটাকে বলে কোঁচ।

'মাছ না, এইবার কোঁচ দিয়া দস্যু শিকার অইবো। তোরে আরেকটা জিনিস দেহাই,' বলে পট্টবর্ধন ওকে নিয়ে এলো এককোণে। ওখানে পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালের সঙ্গে দাঁড় করানো সাদা লাঠির মতো বেশ কিছু জিনিস। কিরান ওগুলো দেখে খুশি হয়ে উঠল।

'বাহ বাইদও আছে?' বলে সে সাদা লাঠির মতো জিনিসটা তুলে নিল নিজের হাতে। তারপর দুইবার পাক খাইয়ে এক হাতে ধরে ওজন পরখ করে দেখল জিনিসটার।

'কি কস কিরান?' পট্টবর্ধনের মুখে হাসি। 'পানির দূরপাল্লার যুদ্ধে নামব আর বাইদ থাকব না?' বলে হাসতে লাগল সে। বাইদ জিনিসটা দেখতে একেবারেই নিরীহ, পরিষ্কার সাদা একটা লাঠি। কিন্তু একটু ভালোভাবে খেয়াল করে দেখলে বোঝা যায় ওটার এক মাথা একেবারে সুচের মতো চোখা করা হয়েছে। আর ভারসাম্য রক্ষার জন্য অন্য মাথায় খুব সাবধানে পরানো হয়েছে সাদা ময়ূরের পেখম। বাইদ বানানো হয় সুপারি গাছের কাণ্ড লম্বা করে কেটে ঘসে ঘসে একেবারে সরু করে। সেই সঙ্গে চোখা করা হয় ওটার এক মাথা। বাইদ অস্ত্রটা শক্তিশালী একজন মানুষ ছুঁড়ে মেরে অসম্ভব দূরত্ব পার করতে পারে। যে-কারণে দূরপাল্লার যুদ্ধে এইটা হয়ে ওঠে ভয়ংকর এক অস্ত্র। এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে ওটাকে ছুঁড়ে দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করার রেওয়াজ অনেক পুরনো। বিশেষ করে বাইদ ছুঁড়েই যুদ্ধ শুরুর ঘোষণা দেয়া হয়। কিরান খুশি হয়ে বাইদটা নামিয়ে রাখল।

সে ঘুরে দাঁড়াবে হঠাৎ পট্টবর্ধন এগিয়ে এসে ওর একটা হাত ধরে ফেলল। 'কিরান, এইবার সিলভেরা হারামজাদারে আমরা ছাড়ব না।'

তার অবশিষ্ট চোখটাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আবার একইসঙ্গে ভেজা একটা ভাব। কিরানের মনে পড়ে গেল সিলভেরা একহাতে মানুষটার গলা চেপে ধরে অন্য হাতে ছুরি দিয়ে বের করে এনেছিল পট্টবর্ধনের চোখটা। 'কথা দে আমারে, কিরান ওর খুলির ভেতরে এইবার একটা শিসা তুই ঢুকায়া দিবি, কথা দে।'

কিরান কিছু না বলে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর যখন মুখ খুলল তার চোখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। 'আমি কথা দিলাম।'

'অনেক শান্তি পাইলাম কিরান,' বলে সে চারপাশটাকে হাতের ইশারায় দেখাল। 'তোর কি মনে হয়, প্রস্তুতি ঠিক আছে?'

কিরান আনমনে মাথা নাড়ল। 'সবই ঠিক আছে, তয় জিনিসের কোনো দাম নাই যদি জিনিস ব্যবহার করার লোক না থাহে। আমি বেদুর খবর বাইর করার জন্য লোক লাগাইছি। ওরে আমার লাগব। তার চেয়ে বড়ো কথা গোলন্দাজরে লাগব আমার,' শেষ নামটা সে বেশ সাবধানে উচ্চারণ করল।

তারপরও নামটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে পট্টবর্ধনের চোখটা যেন জ্বলে উঠল।

অধ্যায় চৌদ্দ
বর্তমান সময়
চট্টগ্রাম রেলস্টেশন, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম রেলস্টেশনের বাইরে এসে চোখ-মুখ কুঁচকে তাকাল শারিয়ার। ও ভেবেছিল বেলা থাকতে থাকতেই পৌঁছাতে পারবে কিন্তু সেটা হয়নি। উল্টো বিকেল পার হয়ে সন্ধ্যে নেমে এসেছে আরো আগেই। এতটা দেরি হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু হয়ে গেছে বিশেষ একটা কারণে। কুমিল্লা পার হওয়ার পর এক জায়গায় ওদের সামনের ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়ে পড়াতে ওটা তো আটকেছিলই ওদের ট্রেনও লেট করেছে বেশ কয়েক ঘণ্টা।

ট্রেনে আসার ব্যাপারটা পাশা স্যারের দেওয়া শাস্তি মনে করে প্রথমে মেনে নিলেও এই অযাচিত দেরি হওয়ার ব্যাপারটা কাজ শুরু করা থেকে বেশ অনেকটাই পিছিয়ে দিল ওকে, এই বিষয়টা একেবারেই ভালো লাগছে না ওর। তার ওপরে জার্নিটা একদিকে লম্বা হয়েছে অন্যদিকে ট্রেনের বীভৎস রকম বাজে খাবার একবার খেয়ে দ্বিতীয়বার আর মুখেও তুলতে পারেনি ও, যে কারণে ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে পেটের ভেতরে তীব্র ক্ষুধার একটা ভারি ঝোঁক টের পাচ্ছে ও।

চট্টগ্রাম স্টেশনের মূল ভবনের বাইরের খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে বুক ভরে দম নিল ও। বিকেলের রেশ গড়িয়ে বন্দরনগরীর বুকে সন্ধে নেমে এসেছে আরো অনেক আগেই। শারিয়ার ব্যাকপ্যাকটাকে পিঠে চাপিয়ে ব্লেজারের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে স্টেশন থেকে কেনা বিক লাইটার দিয়ে আগুন ধরাল ওটাতে। লাইটারটা হাতে নিয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠল ও। এই লাইটারটা নিয়ে অনেক স্মৃতি আছে ওর, বিশেষ এই ধরনের লাইটারটা অনেকদিন পর ব্যবহার করছে ও। নাক-মুখ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ও ভাবতে লাগল কতদিন পর এলো চট্টগ্রামে। একজন প্রফেশনাল হিসেবে এই শহরেই ওর জীবন শুরু হয়েছিল। বোর্ডিং স্কুল-কলেজের জীবন শেষ হওয়ার পর যখন আর্মিতে টিকে গেল ও, একজন ট্রেইনি ক্যাডেট হিসেবে এখান থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছিল ওর।

আজও মনে পড়ে, ভীরু ভীরু পায়ে এই স্টেশনের বাইরে অ্যাকাডেমির গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল বিরাট আকারের একটা ব্যাগ নিয়ে। নিজের পিঠে এই মুহূর্তে ঝোলানো ব্যাকপ্যাকটার কথা মনে পড়তেই আরেকবার হাসি ফুঁটে উঠল শারিয়ারের মুখে। হাতের আঙুলের কড়ে গুনে হিসেব করল ও, এতগুলো বছর সেই এক লহমায় পার হয়ে গেছে, মনেই হয় না। সেদিনের সেই বিরাট প্যাক আজ ছোটো হয়ে ফাস্টপ্যাকে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ও নিজে মানুষটা বড়ো হয়ে গেছে অনেক বেশি। সেই সঙ্গে নিজের ভেতরটাও ম্যাচিউর হয়েছে অনেক। কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে আবেগের স্রোতে ভেসে যেতে দিল ও, সেই সঙ্গে নিজেকে মনে করিয়ে দিল খুব বেশি সময়ের জন্য আবেগের স্রোতে ভাসলে চলবে না, কাজে নামতে হবে ওকে।

যাত্রার কারণে যে দেরি হয়ে গেছে সেটা ওকে পুষিয়ে দিতে হবে দ্রুত কাজের স্রোতে অবগাহন করে। তবে ট্রেনে দেরি হওয়াতে একটা ব্যাপার খুব ভালো হয়েছে। যথেষ্ট সময় পাওয়াতে সব কেইস ফাইল ও পড়ে নিয়েছে এবং পুরো কেসটা একেবারে গেঁথে গেছে ওর মাথার ভেতরে। তবে ও স্বীকার করবে যে আলীম পাটোয়ারি কিংবা মৌসুমির কথা একেবারে ঠিক। কারণ, কেসটাতে অনেক আলগা ঘটনা আছে। মাঠে নেমে একটার পর একটা বাস্তব ব্যাপার জোড়া লাগিয়ে এই ফাঁকফোকড়গুলো খুঁজে বের করে জোড়া লাগাতে হবে পুরো ব্যাপারটা।

সিগারেটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও মোবাইলটা বের করে আনল। ট্রেন থেকে নেমেই ওর লোকাল কনট্যাক্টকে কল করেছিল কিন্তু লোকটা ফোন ধরেনি। স্টেশন থেকে বের হতে হতে আরেকবার কল করেছিল। সেবারও ধরেনি। পকেট থেকে মোবাইল বের করে আনতে আনতে ও ভাবল এই লোকটা এবার আর কল রিসিভ না করলে ওকে অফিসে যোগাযোগ করতে হবে। কারণ লোকাল কনট্যাক্ট ছাড়া কিছুতেই ও কাজে নামতে পারবে না। মোবাইল বের কওে কর দিতে যাবে তার আগেই ওর দিকে হাত নাড়ল হালকা পাতলা লম্বা দেখতে এক যুবক। হাসিমুখে ও দিকে এগিয়ে আসতে দেখে শারিয়ার কলটা কেটে দিয়ে নিজেও খানিকটা এগিয়ে গেল মানুষটার দিকে। মানুষটার নাম মনে আছে ওর। 'আপনি ভুবন?' বহু চেষ্টা করেও মানুষটার নামের শেষ অংশটুকু মনে করতে পারল না ও।

এগিয়ে আসতে থাকা মানুষটার মুখে বত্রিশ ভোল্টের হাসি। পরনে নীল জিন্সের প্যান্টের সঙ্গে মানানসই এক জোড়া কেডস জুতো, সেই সঙ্গে সাদা শার্ট আর জ্যাকেট। শারিয়ার অনুমান করল যুবক ওর বয়সের হবে কিংবা ওর থেকে দুয়েক বছরের বড়োও হতে পারে। 'জি, জি আমি ভুবন শর্মা,' মানুষটা খুব হাসিমুখে শারিয়ারকে সম্বোধন জানিয়ে নিজের হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

লোকটার বাংলায় বেশ অদ্ভুত এক টান। শারিয়ার অনুধাবন করল তার লোকাল কনট্যাক্ট স্থানীয় কোনো আদিবাসী গোত্রের মানুষ হবে। আর একারণেই তার নামের শেষ অংশটুকু সে কিছুতেই মনে করতে পারছিল না। শারিয়ার হাত বাড়িয়ে দিতেই ছেলেটা ওর হাত ধরে শক্ত করে একটা ঝাঁকি দিল। ঝাঁকিটা খেয়ে শারিয়ার মানুষটার হ্যাংলা-পাতলা শরীরে শক্তির পরিমাণ অনুধাবন করে একটু তাজ্জব বনে গেল।

মানুষটার হাসিটাই এমন ছোঁয়াচে, যে কেউ তার দিকে তাকালে আপনাতেই হেসে উঠবে। শারিয়ার অনুধাবন করল মানুষটার বাংলাতে যে বিচিত্র টান এই টান বৃহত্তর চট্টগ্রাম এলাকার নয়। সম্ভবত এটা তার গোত্র থেকে পেয়েছে সে। শারিয়ার তাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু লোকটার কথা আর হাসির তোড়ে ভুলে গেল সে।

'স্যার, আপনার আসতে কষ্ট হয়নি তো?' বলে সে আবারও হেসে উঠল। 'আমি অনেক সময় ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি,' মানুষটার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের শুরুতে অদ্ভুত এক চাপ পড়ায় তার বাংলাটা খুব বিচিত্র এক রূপ নেয়।

'নাহ, একটু দেরি হয়ে গেছে ট্রেন লেট হওয়ার কারণে,' বলে সে নিজের প্যাকটা টেনে ঠিক করে নিল পিঠের ওপরে।

'স্যার, ওটা আমাকে দিন,' বলে সে রীতিমতো হা হা করে এগিয়ে এলো শারিয়ারের দিকে।

'না না,' শারিয়ারও প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'তা কি হয় নাকি?' লোকটা যত যাই হোক না কেন একজন অফিসার লেভেলের কর্মকর্তা, তাকে কীভাবে নিজের ব্যাগ দিতে পারে ও।

কিন্তু সেই লোকও নাছোড়বান্দা। 'না না স্যার, এটা আমি কিছুতেই হতে দেবো না। হাজার কাজে এলেও আপনি আমাদের এলাকার মেহমান,' বলে সে একরকম জোর করেই শারিয়ারের হাত থেকে ব্যাকপ্যাকটা টেনে নিয়ে নিল নিজের কাছে। তারপর সামনের দিকে পথ দেখিয়ে বলে উঠল, 'স্যার, এদিক দিয়ে আসুন। বাইরে রাস্তার পাশেই আমার গাড়ি পার্ক করে রাখা আছে।'

'আপনার গাড়ি?' শারিয়ার একটু অবাক হয়েই জানতে চাইল। শারিয়ারের প্রশ্ন শুনে নিজে জিভ কাটল লোকটা। 'সরি স্যার, নিজের গাড়ি বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অফিসের পাঠানো গাড়ি। স্যার সত্যি কথা কি, এইসব গাড়ি এত বেশি আমাকে চালাতে হয় যে ভুলেই গেছি গাড়িটা আসলে অফিসের। স্যার, আমাদের এখানে তো আর কী বলব। যারা কাজ জানে তাদের সবাইকে তো একেবারে... স্যার এদিকে,' ওরা হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের উঁচু অংশ থেকে বেরিয়ে মূল রাস্তার পাশে চলে এসেছে।

'ভুবন আপনি...?' শারিয়ার গাড়িতে ওঠার আগে তাকে কিছু নির্দেশনা দিতে চেয়েছিল কিন্তু এবারও মানুষটার কথার চোটে সেটা রীতিমতো উড়ে গেল।

'স্যার, এইয়ে আমাদের পঙ্খীরাজ,' বলে সে সামনেই রাস্তার ঠিক পাশেই রাখা একটা সাদা বেন্টলি কার দেখাল। গাড়িটা দেখে সত্যিকার অর্থেই শারিয়ার খুশি হয়ে উঠল। কারণ একেবারেই চকচকে নতুন একটা গাড়ি। 'বাহ, বাহ,' শারিয়ার গাড়িটার কাছাকাছি যেতেই ছেলেটা সামনে এগিয়ে ড্রাইভারের পাশের সিটটা টেনে খুলে ওর ব্যাকপ্যাকটা রেখে ধাম করে দরজাটা লাগিয়ে দিল। তারপর প্রায় দৌড়ে এসে ওর জন্য দরজাটা মেলে ধরল। শারিয়ার রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে লোকটার আচরণে। এতটা সুপিরিয়রিটি অনুভব করে অভ্যাস ওর নেই। তবে এদের ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারে ও। ঢাকার ভেতরে বিশেষ পরিবেশে ওরা যেভাবে কাজ করে অভ্যস্ত, ঢাকার বাইরে এরা সে ধরনের পরিবেশে কাজ করে অভ্যস্ত নয়। তাই এখানে ডেকোরাম-সিনিয়রিটি অনেক বড়ো ভূমিকা পালন করে।

শারিয়ারকে দরজা খুলে ভেতরে বসতে দিয়ে ছেলেটা সামনের ড্রাইভারের সিটে বসে গাড়ি ছেড়ে দিল। 'স্যার, আগে বলেন কী খাবেন? নিশ্চই আপনি লম্বা জার্নি করে একেবারে টায়ার্ড। আগে একটা শাহী খানা দিয়ে তারপর আপনার জন্য হোটেল সুইট বুক করে রাখা হয়েছে সেখানে গিয়ে লম্বা ঘুম দেবেন। আপনার জন্য সরকারি বাংলোও ঠিক করে রাখা আছে। আগে বিশ্রাম। তারপর কাল সকাল...'

'ভুবন সাহেব, আপনি আমাকে স্পটে নিয়ে যাবেন,' শারিয়ার বেন্টলির কাচের ফাঁক দিয়ে ওর স্মৃতির সেই পুরনো চট্টগ্রামকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে। কিন্তু স্মৃতি স্মৃতির জায়গাতেই রয়ে যাচ্ছে। পুরনো সেইসব আবেগের সঙ্গে বর্তমান চট্টগ্রামের এই ঝাঁ চকচকে পরিবর্তিত চেহারার কোনো মিলই খুঁজে পাচ্ছে না ও। ওদের গাড়ি ধীরে ধীরে শহর পার হয়ে বাইরের দিকে চলছে। গাড়ি যতটা না জোর গতিতে চলছে তার চেয়ে অনেক বেশি জোর গতিতে চলছে ভুবনের মুখ। ওদের নতুন অফিস, ওদের কাজকর্ম থেকে শুরু করে ও কিছুদিন আগে বিদেশ থেকে যে ট্রেনিং সম্পন্ন করে এসেছে সেটা নিয়ে তার কৌতূহলের কোনো শেষ নেই।

'ভুবন,' শারিয়ার মানুষটার কথার স্রোতের ভেতরে একটু ফাঁক পেতেই সে নিজের কথা বলে উঠল। 'আপনি কোনদিকে যাচ্ছেন আমাকে একটু বলেন তো,' শারিয়ার গ্লাসের ভেতর থেকে দেখে চট্টগ্রামের কোনো অংশে আছে আর কোনদিকে যাচ্ছে সেটা কিছুতেই ধরতে পারছে না।

'স্যার, আপনে কোনো চিন্তা করবেন না আমি,' শারিয়ারের প্রশ্ন ঠিকঠাক শেষ হওয়ার আগেই সে কথা বলে উঠল। 'আমি ঠিক-ঠাক আপনাকে নিয়ে চলে যাব। আমি বলতে চাচ্ছিলাম আগে আমরা আপনার খাওয়া আর বিশ্রামের ব্যাপারটা

ঠিকঠাক করতে। তা-না হলে স্যার আমার নিজের ভেতরে ভীষণ রকমের গিল্টি ফিলিং হচ্ছে। স্যার আমি কি...'

এবার একটু বিরক্ত বোধ করল শারিয়ার। ও মোবাইলটা বের করার জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল কিন্তু তার আগেই থেমে গেল। 'ভুবন, আপনাকে না বললাম আমি আগে স্পটে যাব,' ওর গলার সুরটা একটু বেশিই উঁচু হয়ে গেছে দেখে সেটাকে আবারও আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করল ও। শারিয়ার নিজে সরকারি লোক হলেও তেলবাজি জিনিসটা একেবারেই পারে তো না-ই সবচেয়ে বড়ো কথা সে নিজে এই জিনিসটা ঠিক পছন্দও করে না। ও হলো কাজের মানুষ। ওর নিজের কাজের পন্থা হয়তো সব ঠিক পছন্দনীয় না, কিন্তু তেলবাজি জিনিসটাকে ভীষণ ভীষণ অপছন্দ ওর। 'দেখুন এমনিতেই কাজের বেশ দেরি হয়ে গেছে। কাজেই আমি আগে ওখানে যেতে চাই, পরিস্থিতি বুঝতে চাই। তারপরে খাওয়া-বিশ্রাম সব হবে,' বলে ও একবার বড়ো করে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে উঠল। 'আপনি বরং আমাকে ওখানকার পরিস্থিতি নিয়ে একটু ব্রিফ করুন।'

'অবশ্যই স্যার,' ভিউ মিররে শারিয়ার দেখতে পেল ভুবন লোকটার হাসিতে এক বিন্দু পরিবর্তন আসেনি। সে ঝাড়ি খেয়ে একটুও দমে যায়নি বরং সেই পুরনো বত্রিশ ভোল্টের হাসি ঠিকই ধরে রেখেছে মুখে। মনে মনে লোকটার প্রশংসা না করে পারলা না শারিয়ার। *এলেম আছে ব্যাটার*, মনে মনে বলে উঠল ও। ছোটো একটা ঝাঁকির সঙ্গে শারিয়ার বাইরে ফিরে তাকাল। ওদের গাড়ি শহর ছাড়িয়ে বাইরের দিকে এসে পড়েছে বলে মনে হলো শারিয়ারের কাছে।

'আচ্ছা আমাকে একটা ব্যাপার বলুন তো,' শারিয়ার জানতে চাইল। 'পতেঙ্গা রোডে যে-অ্যাকসিডেন্টের ঘটনাটা ঘটেছে সেটা তো খুবই সাধারণ। আর দশটা অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনার সঙ্গে আমার কাছে তেমন কোনো পার্থক্যের কোনো ব্যাপার মনে হয়নি। তবে এখানে বাইরের দেশের মানুষজন, লাশ চুরি এতসব কাহিনি কীভাবে পেঁচিয়ে গেল বলেন তো?'

'আসলে স্যার...' ভুবন শুরু করার আগেই শারিয়ার তাকে থামিয়ে দিল।

'ভুবন, ফাইলে যা আছে সেগুলো বলে কোনো লাভ নেই। আমি ফাইল খুব বিস্তারিত পড়েছি,' শারিয়ার অনুভব করল ওরা শহর থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে ভুবনের গাড়ির। ভালো, মনে মনে ভাবল ও। লোকটা ওর মুখের গতি নিয়ন্ত্রণ করে গাড়ির গতি বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে, এটা একটা ভালো ব্যাপার। 'বিশেষ করে আপনি তো স্থানীয় ছেলে। আমাকে বলেন তো এই ঘটনার ভেতরে আপনি স্থানীয় কোনো অ্যাঙ্গেল দেখতে পাচ্ছেন কিনা?' শারিয়ার ওর একেবারে প্রথম দিনের ট্রেনিংয়ে একটা কথা শিখেছিল ওর ইন্সট্রাকটরের কাছ

থেকে, কথাটা ওর মনের ভেতরে একেবারে খুব ভালোভাবে গেঁথে গেছে সারা জীবনের জন্য। আর ও যতবারই মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছে প্রতিবারই দেখেছে কথাটার একটা আলাদা মূল্য আছে।

ইন্সট্রাকটর বলেছিল, 'আপনারা যখনই যেকোনো জায়গাতে যেকোনো কেস সমাধান করতে যাবেন কিংবা কাজ করতে যাবেন সবসময় মনে রাখবেন একটা ঘটনা যত বড়োই হোকনা কেন, সেই ঘটনার সঙ্গে যত বড়ো-বড়ো রাঘব বোয়ালরাই জড়িত থাকনা কেন, প্রতিটি ঘটনার একটা ছোটো ক্ষেত্র থাকে এবং স্থানীয় একটা অ্যাঙ্গেল থাকে। ঘটনা বুঝতে হলে সেই স্থানীয় অ্যাঙ্গেলটা বোঝা খুবই জরুরি। শারিয়ারের আজও ইন্সট্রাকটরের গলাটা পরিষ্কার মনে পড়ে, 'মনে রাখবেন রাজারা ঘটনা ঘটাবার নির্দেশ দেয় কিন্তু ঘটনা তারা ঘটায় না। বরং ঘটনা ঘটায় হাট-ঘাট আর মাঠের মানুষেরা। কাজেই সবসময় ঘটনা বুঝতে হলে ঘটনার স্থানীয় অ্যাঙ্গেলটা বোঝা খুবই জরুরি'।

'স্যার, আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি,' বলে ভুবন দাঁতে দাঁত চেপে গাড়ির হুইল ঘোরাল। শারিয়ার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল ওরা শহর থেকে বেশ অনেকটাই দূরে সরে এসেছে। 'স্যার আমি তো ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছি অনেক পরে তাই খুব বিস্তারিত এখনো জানি না। তবে আমি এখন পর্যন্ত যতোটুকু বুঝতে পেরেছি...' ভুবন কথা বলতে বলতে গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিল। 'তাতে আমার মনে হয়েছে...'

ভুবন কথা বলে চলেছে। শারিয়ার খুব একটা মনোযোগ দিয়ে শুনছে না তার কথা, সে বরং বাইরের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়ে বোঝা চেষ্টা করছে ওরা আসলে যাচ্ছে কোনদিকে। একদিকে ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমতে শুরু করেছে শহরের আলো। অন্যদিকে গাড়ি এই মুহূর্তে চলছে প্রায় আশি কিলোমিটারের বেশি স্পিডে। শারিয়ার বাইরে দেখতে দেখতে ভুবনকে বলে উঠল, 'ভুবন আপনি গাড়ির গতিটা...' ও কথা শেষ করার আগেই মোবাইল বাজতে লাগল ওর পকেটে। শারিয়ার নিজেও চমকে উঠল ওর মোবাইলের শব্দে। তবে ও অবাক হয়ে লক্ষ করল ভুবন ওর চেয়েও বেশি অবাক হয়ে পেছন ফিরে দেখছে ওকে। তবে ব্যাপারটা আসলেই ঘটল কিনা নাকি পুরোটাই ওর মনের ভাবনা ঠিক ধরতে পারল না শারিয়ার। পকেট থেকে ফোন বের করতেই দেখতে পেল মৌসুমি আপার কল।

'হ্যালো...'

‘কী ব্যাপার? এতক্ষণ ধরে তোকে একের পর এক ফোন করে যাচ্ছি তোর কোনো খবরই নেই,’ শারিয়ার কল রিসিভ করতেই প্রায় তড়বড় করে কথা বলতে শুরু করল মৌসুমি আপা। এমনকি সে ওর কথা ঠিকমতো শুনছেও না। বলেই চলেছে। কিন্তু তার কথা শুনে শারিয়ারের কান খাড়া হয়ে গেছে।

‘আস্তে আস্তে আপু,’ শারিয়ার মৌসুমির বলা কথাগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করছে। ‘কী বলছো তুমি? আমি কল রিসিভ করব না কেন। আমার মোবাইলে কোনো কল তো আসেইনি।’

‘হ্যাঁ, সে জন্যই তো আমরা আরো অস্থির হয়ে উঠেছি। শেষবার তোর মোবাইলের অবস্থান দেখা গেছে স্টেশনের বাইরে। এরপর থেকে না তোর মোবাইলে আর কল ঢুকছিল না। এদিকে ভুবন ছেলেটা তোকে না পেয়ে একবার তোকে কল করে আরেকবার আমাদের এখানে যোগাযোগ করতে করতে আমাদের পাগল করে ফেলেছে। পুরো ঢাকা আর চট্টগ্রাম গরম হয়ে উঠেছে তোর...’

মৌসুমি বলেই চলেছে। কিন্তু শারিয়ারের কানে কোনো কথাই ঢুকছে না। মৌসুমি আপার শেষ কথাটাই কানে বেজে চলেছে।

‘ভুবন ছেলেটা পাগলের মতো খুঁজছে তোকে।’

ভুবনের সঙ্গে যদি ওর দেখাই না হয়েই থাকে তবে সামনে ড্রাইভারের সিটে বসা এই লোকটা কে?

অধ্যায় পনেরো

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

কাপসের হাট, দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকা, চট্টগ্রাম

কিরানদের নৌকো কাপসের হাটের কাছাকাছি আসতেই দূর থেকে কিরানের চোখে পড়ল বাজারের ঠিক কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা বিরাট বটগাছটার ছড়ানো ডালপালা। যদিও প্রায় মাইলখানেক দূর থেকে বাজারের ভিড় কিংবা বটগাছের নিচে জমে ওঠা মানুষের জমায়েত চোখে পড়ার কথা না। কিন্তু বাজারের সেই পুরনো পরিচিত চেহারা চোখে পড়তেই কিরানের ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল মৃদু হাসি।

বাজার ঘাট আর পানির বুকে বেড়ে ওঠা মানুষ সে। মানুষের মাঝে, মানুষের সান্নিধ্যেই জীবনের প্রকৃত সুখ খুঁজে পায়। কিন্তু গেল কয়েক বছরের পরিবর্তিত জীবনে নিজেকে যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলতে বসেছিল। আকরাম বেগের মাধ্যমে এই কঠিনতম কাজের দায়িত্ব ঘাড়ের ওপরে চেপে বসাতে একদিকে যেমন ভয়-ভীতি আর কাজের বোঝা টের পাচ্ছে নিজের ওপরে, সেই সঙ্গে কোথায় যেন নিজের ভেতরের পুরনো সত্ত্বাকে সে আবিষ্কার করতে পারছে আবারও। নিজেকে নিজের কাছেই আবার সেই পুরনো মানুষ মনে ওর যাকে সে গেল কয়েক বছরের ডামাডোলে পুরোপুরিই হারিয়ে ফেলতে বসেছিল।

'ইয়ানে নৌকা বিড়াইতাম নি?' কিরানের পাশ থেকে বিল্লাল জানতে চাইল। কিরান তার দিকে ফিরে তাকাল, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সে একবার দেখে নিল নৌকার একপাশে চাদর মুড়ি দিয়ে ঝিমোচ্ছে গোমেজ আর তার পাশেই নিজের ছেলের ঘুমন্ত হাত ধরে বসে আছে বৈঠা।

'নৌকা এইখানে ভিড়াইবো নি?' বিল্লালের প্রশ্নটাই সে ছুড়ে দিল বৈঠাকে লক্ষ করে।

নিজের ছেলের হাতটা ছেড়ে দিয়ে বৈঠা নিজের ডান হাতের আঙুলটা ভরে দিল মুখের ভেতরে। তারপর ভেজা আঙুলটা তুলে ধরল মাথার ওপরে। বাতাসের গতি বুঝে নিয়ে সে বিল্লালকে ঘাটের একপাশে নৌকা ভেড়াতেইশারা করল। বিল্লাল সর্দার নৌকোটাকে সেই অনুযায়ী এগিয়ে নিয়ে যাবে পাশ থেকে তার একটা হাত চেপে ধরল কিরান।

'বিল্লু,' সে নজরদারির চোখে পরখ করার চেষ্টা করছে চারপাশ। 'বাজারের পাশ্চিম পাশে একটা খাল আছে না, যেইডা দিয়া ভেতরে ঢুইকা গেলে এক্কেরে সরাসরি বাজারের ভেতরে যাওয়া যায়?' মনে মনে সে কাপসের হাটের নকশাটা মনে করার চেষ্টা করছে।

'আছে,' বলে বিল্লাল হেসে উঠল। 'ওস্তাদে কি নাও বান্দুনের পয়সা বাঁচাইবার লাইগা উতলা অইলা নি?' সে টিটকিরি মেরে জানতে চাইছে ঘাটে নৌকা বেঁধে রাখতে হলে যে আনা পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হয় সেটা বাঁচানোর জন্যকিরান কি এই পন্থা নেওয়ার চেষ্টা করছে নাকি।

বিল্লালের টিটকিরির জবাবে তার দিকে আগুন চোখ করে তাকাল কিরান। সঙ্গেসঙ্গে একটা ঢোক গিলে হাত তুলে কিরান যা বলছে সে তাই করবে বলে সে কিরানকে আশ্বস্ত করল। ওদের দুজনের নীরব কথোপকথন দেখে বৈঠা মুচকি হেসে উঠল পেছন থেকে।

বিল্লাল সর্দারকে আর দ্বিতীয়বার বলতে হলো না। সে নৌকোটাকে সুন্দরমতো ঘুরিয়ে ঘাট পার হয়ে খোলা পানিতে চলে এলো অনেকদূর। তারপর সেটাকে পানির গতি অনুযায়ী সরু খালের মতো একটা পানির ধারা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। সেদিক দিয়ে ঘুরে বাজারের পেছন দিকে চলে এলো ওরা। সেখানে এখানে-ওখানে ভাসমান ময়লার ফাঁক দিয়ে সে দক্ষ হাতে বৈঠা মেরে নৌকোটাকে নিয়ে এলো একেবারে বাজারের পেছন দিকে।

বিল্লাল সাবধানে নৌকোটাকে একপাশে ভেড়াতেই কিরান বাকিদেরকে নামার ইশারা করে নিজে লাফিয়ে নেমে এলো হাঁটু পানিতে। পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে কিনারায় উঠে এসে শরীরটাকে টানটান করে আড়মোড়া ভাঙল। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় নৌকায় স্থির বসে থাকার কারণে শরীরে মনে হচ্ছে সব গিট্টু লেগে গেছে।

বেলা এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে রওনা দিয়েছে। দুপুরের দিকে খণ্ডালের গুহাতে যাওয়ার আগেই বিল্লাল সর্দার আর বৈঠাকে ও লাগিয়ে দিয়েছিল বেদুর খোঁজ বের করার জন্য। কারণ যে অভিযানে ওরা নামতে যাচ্ছে তাতে করে বেদুর মতো দক্ষ একজন বাজিকর ওর দরকার হবে। এছাড়াও বেদুর আলাদা আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলোর জন্য বেদু অন্যদের থেকে একেবারেই আলাদা। এর আগে কিরানের দলে সে বহুবছর হয় কাজ করেছে। আরেকটা কারণে বেদুকে ওর দরকার। ওর দলের সবচেয়ে দক্ষ গোলন্দাজ রঙ্গনের খোঁজ বের করার জন্য হলেও বেদুকে ওর দরকার। দল ভাঙার পর গোলন্দাজেরসঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাওয়াতে কিরান আর তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। তাই সে কোথায় আছে জানতে হলে বেদুকে দরকার ওর।

খণ্ডালের গুহাতে পণ্ডবর্ধন আর তুলারামের লোকদের রাতে রওনা দেওয়ার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আরো কিছু নির্দেশনা দিয়ে কিরান আর গোমেজ যখন মন্দারহাটে পৌঁছে দেখে ইতোমধ্যেই বেদুর খবর নিয়ে বিল্লাল আর বৈঠা ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেখানে বিল্লালের কাছ থেকেই জানতে পারে বেদু এখন হাটে-হাটে বাজিকরের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। তার নিজের কিছু পোষা প্রাণী আছে আর সেই সঙ্গে আছে ছোটো একটা দল। সেই দলটাকে নিয়ে আজ বিকেলে কাপসের হাটে খেলা দেখানোর কথা।

বিল্লাল সর্দারের মুখে প্রাণীদের কথা শুনে কিরাণের মুখে অদ্ভুত এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বিল্লাল আরো জানায়, বেদুর এই খেলা দেখানোর ব্যাপারটা ইদানীং বেশ ভালোই জনপ্রিয়তা পেয়েছে বৃহত্তর এলাকায়।

এরপর মন্দার হাটেই ওরা দুপুরে খাওয়া সেরে খানিক বিশ্রাম নিয়ে একটা নৌকা ভাড়া করে মন্দার হাট থেকে রওনা দেয় কাপসের হাটের উদ্দেশে।

তবে কাপসের হাটে এসে একটু অবাক হয়ে গেল কিরান। এখন থেকে পাঁচ বছর আগে সে শেষবারের মতো এসেছিল এই হাটে, তখন এই হাটের সবে গোড়াপত্তন হয়েছিল কিন্তু একটা বিশেষ কারণে অল্প সময়ের ভেতরেই এই হাট অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। আর সেই কারণটা ছিল কাপস নামের বিশেষ এক ধরনের তুলা। এই হাটের নাম কাপসের হাট হওয়ার পেছনেও এই তুলারই মূল অবদান। বাঙ্গাল মুল্লুকে যতগুলো উৎকৃষ্ট উপাদান তৈরি হয় তার মধ্যে অন্যতম এই এলাকার বস্ত্র। মসলিনের ব্যাপারটা বাদ দিলেও আরো নানা ধরনের বস্ত্র রয়েছে যা অত্যন্ত উন্নতমানের এবং রোসাঙ্গ, আরাকান, ত্রিপুরা থেকে শুরু করে হুগলি এমনকি দিল্লির বাজার পর্যন্ত এসব বস্ত্রের সীমাহীন চাহিদা। এ-কথা সবাই জানে। কিন্তু যে-কথাটা বেশিরভাগ মানুষই জানে না সেটা হলো শুধু বস্ত্রই নয় বরং বাঙ্গাল মুল্লুকের বিশেষ ধরনের তুলার চাহিদাও সুদূর আরব দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আর বাঙ্গাল মুল্লুকে যত ধরনের উন্নত তুলা থেকে সুতাতৈরি হয় তারমধ্যে সবচেয়ে সহজলভ্য এবং কম খরচের একটি হলো কাপস তুলা। আর সেই তুলা বেচা-কেনার জন্যই এই হাট। আর সে-থেকেই এর নাম কাপসের হাট।

রামু আর লাউক্কার বিশেষ সংযোগস্থলে পানি বিধৌত এক ছোটো দ্বীপে হাটটার অবস্থান হওয়ার কারণে এই হাট খুব অল্প সময়ে আর খুব সহজেই সব ধরনেরব্যবসায়ীদের ব্যবসার মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আজ পাঁচ বছর পর এখানে এসে কিরান ভেবেছিল দেখবে হাট আরো বড়ো হয়েছে, সেই সঙ্গে লোক সমাগম থেকে শুরু করে সবকিছুই আরো বাড়তে শুরু করেছে। কিন্তু এখানে এসে যা দেখল তাতে পরিষ্কার যে, হাটের বেশ দৈন্য দশা চলছে।

'কিরে বিল্লাল এই হাটের এমন অবস্থা ক্যান?' আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে জানতে চাইল কিরান।

কিন্তু তার প্রশ্নের জবাবটা দিল বৈঠা। 'হাম্মাদ ওস্তাদ,' বলে সে আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল। 'খালি এইয়া না, এই এলাকার সব হাট থেইকা শুরু কইরা যেন যা আছে এমনকি গ্রামকে গ্রামে এহন খালি ওই গেছে হাম্মাদগো ডরে। ওরা যেয়ানে যায় জিনিসপত্র সয়-সম্পদ তো বাদ যাক, মানুষ পর্যন্ত ছাড়ে না। যেয়ানে যারে পায় ধইরা লইয়া যায়।'

'এহন তো হেরা আর জিনিসপত্র, টেকা লুডও করে না। এহন হেগো নজর খালি মাইনষের দিকে। উপকূল এলাকা থ্যাইক্কা ঝাড়কে ঝাড় মানুষ ধইরা লই যাইতাছে। আমগো এয়ানে গ্রামকে গ্রাম খালি অইতাছে, হাটের পর হাট খালি অইতাছে অর এই মানুষগো নিয়া হেরা রোসাঙ্গের খালি ভূমি আবাদ করতাছে। হুগলির বাজারে চড়া দামে বেচতাছে মানুষগুলারে,' বলে জোরে ফুঁ দিয় শূন্যে যেন নিজের সব আফসোস উড়িয়ে দিল বিল্লাল। 'ভাবতে পার ওস্তাদ, বিদেশ থেইকা জানোয়ারের বাচ্চারা আইসা আমাগো মানুষগো নিয়া পশুর মতো বাজারে বেচতাছে। মুসলমান, ব্রাহ্মণ, ফকিররে একই লগে একই দড়ি দিয়া বাইন্দা হাটে তুলতাছে...'

কিরান একটা হাত তুলল। এসব ব্যাপার এমনিতেই সে মেনে নিতে পারে না। কেন জানি এসব অনাচারের কথা শুনলে নিজেকে খানিকটা হলেও দোষী মনে হয় ওর। আজ থেকে কয়েক বছর আগে ওদের বাহিনী যদি ওভাবে হেরে না যেত তবে হয়তো দক্ষিণ উপকূলের অবস্থা এতটা খারাপ হতো না।

'শোন, আমি বৈঠা আর বিল্লালরে নিয়া বাজারে ঢুকতাসি,' বলে সে গোমেজ আর বৈঠার ছেলেকে দেখাল। 'তোরা দুইজন এইহানেই থাকবি। সাবধানে থাকবি, নজর রাখবি আর কোনো বিপদ অইলে লুকায়া পড়বি। মনে থাকব?'

গোমেজ মাথা নেড়ে বোঝাল সে বুঝতে পেরেছে। কিরানের কথা শেষ হতেই সে বৈঠার ছেলের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। ছেলেটাও তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। কিরান বুঝল এদের দুজনের ভেতরে আলাদা একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করেছে।

কিরান বৈঠা আর বিল্লালকে ইশারা করল ওর সঙ্গে এগোনোর জন্য। ও ইচ্ছে করেই পেছন দিয়ে এসেছে। কারণ এসব খোলা বাজারে বিপদের কোনো আগা-মাথা নেই। আর যেকোনো সময় বিপদ হানা দিলেই যাতে চট করে সরে পড়া যায় সে কারণেই এই ব্যবস্থা। ঠিক একই কারণে সে গোমেজকে সঙ্গে আনেনি কারণ গোমেজকে নিয়ে এলে খুব সহজেই অনেকের চোখে পড়ে যাবে। সেই সঙ্গে খবর চাউর হতে দেরি লাগবে না। আর যে কয়েকটা কারণে ও আজ এই বাজারে এসেছে সেগুলোকে সফল করতে হলে ওকে যতটা সম্ভব কম লোকের চোখে পড়তে হবে।

বৈঠা আর বিল্লালকে নিয়ে বাজারের পথে পা বাড়াল কিরান। খালপাড়ে থাকা আস্তাবল পার হয়ে ওরা চলে এলো সারি সারি তুলা আর সুতার গুদাম এলাকায়। সেখান থেকে ওরা কোনাকুনি এগুলো মূল হাটের দিকে। কাপসের মূল বাজার এলাকাটা গড়ে উঠেছে দ্বীপের মতো জায়গাটার ঠিক কেন্দ্রে অবস্থিত বিরাট বট গাছটাকে কেন্দ্র করে। বিশাল বট গাছটাকে কেন্দ্রে রেখে গোল করে ছোটো ছোটো দোকানের মতো অস্থায়ী জায়গাতে বসে নানা ধরনের তুলার পাইকারি হাট। দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্যাপারিরা কেনাকাটা করে। তারপর নিজেদের নৌকো আর জাহাজে করে সেগুলো নিয়ে রওয়ানাদেয় বিভিন্ন দিকে।

বাজারের সারি সারি তুলার দোকানের বেশিরভাগই এখন খালি পড়ে আছে। কারণটাও সহজেই অনুমেয়, দিন প্রায় শেষ হতে চলেছে। একেবারে ভোর থেকে শুরু হওয়া হাটে সারা দিনের কেনা-বেচার পর এই সময়টা হাট প্রায় বন্ধ হওয়ার সময়। ঠিক একারণেই দোকান-পাট কিংবা গুদামের চেয়ে হাটের বেশিরভাগ মানুষের মনোযোগ এখন হাটের কেন্দ্রে থাকা বটগাছটার নিচে যেখানে বেদু তার নানাবিধ পশুপাখি নিয়ে জমিয়ে তুলেছে খেলা।

বটগাছটাকে দূর থেকে দেখে বৈঠা আর বিল্লাকে সেদিকে এগোনোর নির্দেশ দিল কিরান। আর ওর নির্দেশ শুনে দুজনেই আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে গেল সেদিকে। কিরান বাজারের এক কোনায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকে পুরো বাজারটাই চোখে পড়ে।

বাজারের একদিকে দাঁড়িয়ে কোমরে রাখা থলে থেকে একটা ছোটো বাক্স বের করে সেটার ভেতর থেকে খানিকটা তামাক বের করে গোল করে পাকাতে পাকাতে বাজারের চারপাশে নজর বোলাতে লাগল। পুরো বাজার এখন বলতে গেলে শেষ বিকেলের ঢিলেমিতে আক্রান্ত। শেষ বিকেলের আয়েশি সময়ে এখন বেশিরভাগ ব্যবসায়ী-ব্যাপারি আর জোতদারদের বেচাকেনার চেয়ে বরং আড্ডা আর বট গাছের নিচে খেলা দেখায় ব্যস্ত। কিরান খেয়াল করে দেখল যারা বটগাছের নিচে খেলা দেখছে তারা তো আছেই। বাকিরাও গোল করে বসে আয়েশ করে তামাক টানায় ব্যস্ত আর না হয় পাশা খেলার দান সাজাচ্ছে।

কিরান বাজারের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে ঘাটের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। সেখানে বিশেষ কিছু একটা ওর নজর কেড়ে নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ তাকিয়ে সে কিছু দেখতে পেল না। ওদিকে খানিকটা এগিয়ে আরো ভালোভাবে দেখবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই বটগাছের নিচ থেকে ভেসে আসা বাঘের গর্জনে চমকে উঠল সে। সেই সঙ্গে মুখে আবারও পুরনো হাসিটা ফুঁটে উঠল ওর। ঘাটের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সে বটগাছের গোড়ার দিকে তাকাল। হাতের মুঠোয় দলা পাকানো তামাকটা আবারও কোমরের চামড়ার থলিতে রেখে দ্রুত পায়ে এগোল বটগাছের গোড়ার দিকে।

কিন্তু তার প্রশ্নের জবাবটা দিল বৈঠা। 'হাম্মাদ ওস্তাদ,' বলে সে আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল। 'খালি এইয়া না, এই এলাকার সব হাট থেইকা শুরু কইরা যেন যা আছে এমনকি গ্রামকে গ্রামে এহন খালি ওই গেছে হাম্মাদগো ডরে। ওরা যেয়ানে যায় জিনিসপত্র সয়-সম্পদ তো বাদ যাক, মানুষ পর্যন্ত ছাড়ে না। যেয়ানে যারে পায় ধইরা লইয়া যায়।'

'এহন তো হেরা আর জিনিসপত্র, টেকা লুডও করে না। এহন হেগো নজর খালি মাইনষের দিকে। উপকূল এলাকা থাইক্কা ঝাড়কে ঝাড় মানুষ ধইরা লই যাইতাছে। আমগো এয়ানে গ্রামকে গ্রাম খালি অইতাছে, হাটের পর হাট খালি অইতাছে অর এই মানুষগো নিয়া হেরা রোসাঙ্গের খালি ভূমি আবাদ করতাছে। হুগলির বাজারে চড়া দামে বেচতাছে মানুষগুলারে,' বলে জোরে ফুঁ দিয় শূন্যে যেন নিজের সব আফসোস উড়িয়ে দিল বিল্লাল। 'ভাবতে পার ওস্তাদ, বিদেশ থেইকা জানোয়ারের বাচ্চারা আইসা আমাগো মানুষগো নিয়া পশুর মতো বাজারে বেচতাছে। মুসলমান, ব্রাহ্মণ, ফকিররে একই লগে একই দড়ি দিয়া বাইন্দা হাটে তুলতাছে...'

কিরান একটা হাত তুলল। এসব ব্যাপার এমনিতেই সে মেনে নিতে পারে না। কেন জানি এসব অনাচারের কথা শুনলে নিজেকে খানিকটা হলেও দোষী মনে হয় ওর। আজ থেকে কয়েক বছর আগে ওদের বাহিনী যদি ওভাবে হেরে না যেত তবে হয়তো দক্ষিণ উপকূলের অবস্থা এতটা খারাপ হতো না।

'শোন, আমি বৈঠা আর বিল্লালরে নিয়া বাজারে ঢুকতাসি,' বলে সে গোমেজ আর বৈঠার ছেলেকে দেখাল। 'তোরা দুইজন এইহানেই থাকবি। সাবধানে থাকবি, নজর রাখবি আর কোনো বিপদ অইলে লুকায়া পড়বি। মনে থাকব?'

গোমেজ মাথা নেড়ে বোঝাল সে বুঝতে পেরেছে। কিরানের কথা শেষ হতেই সে বৈঠার ছেলের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। ছেলেটাও তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। কিরান বুঝল এদের দুজনের ভেতরে আলাদা একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করেছে।

কিরান বৈঠা আর বিল্লালকে ইশারা করল ওর সঙ্গে এগোনোর জন্য। ও ইচ্ছে করেই পেছন দিয়ে এসেছে। কারণ এসব খোলা বাজারে বিপদের কোনো আগা-মাথা নেই। আর যেকোনো সময় বিপদ হানা দিলেই যাতে চট করে সরে পড়া যায় সে কারণেই এই ব্যবস্থা। ঠিক একই কারণে সে গোমেজকে সঙ্গে আনেনি কারণ গোমেজকে নিয়ে এলে খুব সহজেই অনেকের চোখে পড়ে যাবে। সেই সঙ্গে খবর চাউর হতে দেরি লাগবে না। আর যে কয়েকটা কারণে ও আজ এই বাজারে এসেছে সেগুলোকে সফল করতে হলে ওকে যতটা সম্ভব কম লোকের চোখে পড়তে হবে।

বৈঠা আর বিল্লালকে নিয়ে বাজারের পথে পা বাড়াল কিরান। খালপাড়ে থাকা আস্তাবল পার হয়ে ওরা চলে এলো সারি সারি তুলা আর সুতার গুদাম এলাকায়। সেখান থেকে ওরা কোনাকুনি এগুলো মূল হাটের দিকে। কাপসের মূল বাজার এলাকাটা গড়ে উঠেছে দ্বীপের মতো জায়গাটার ঠিক কেন্দ্রে অবস্থিত বিরাট বট গাছটাকে কেন্দ্র করে। বিশাল বট গাছটাকে কেন্দ্রে রেখে গোল করে ছোটো ছোটো দোকানের মতো অস্থায়ী জায়গাতে বসে নানা ধরনের তুলার পাইকারি হাট। দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্যাপারিরা কেনাকাটা করে। তারপর নিজেদের নৌকো আর জাহাজে করে সেগুলো নিয়ে রওয়ানাদেয় বিভিন্ন দিকে।

বাজারের সারি সারি তুলার দোকানের বেশিরভাগই এখন খালি পড়ে আছে। কারণটাও সহজেই অনুমেয়, দিন প্রায় শেষ হতে চলেছে। একেবারে ভোর থেকে শুরু হওয়া হাটে সারা দিনের কেনা-বেচার পর এই সময়টা হাট প্রায় বন্ধ হওয়ার সময়। ঠিক একারণেই দোকান-পাট কিংবা গুদামের চেয়ে হাটের বেশিরভাগ মানুষের মনোযোগ এখন হাটের কেন্দ্রে থাকা বটগাছটার নিচে যেখানে বেদু তার নানাবিধ পশুপাখি নিয়ে জমিয়ে তুলেছে খেলা।

বটগাছটাকে দূর থেকে দেখে বৈঠা আর বিল্লাকে সেদিকে এগোনোর নির্দেশ দিল কিরান। আর ওর নির্দেশ শুনে দুজনেই আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে গেল সেদিকে। কিরান বাজারের এক কোনায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকে পুরো বাজারটাই চোখে পড়ে।

বাজারের একদিকে দাঁড়িয়ে কোমরে রাখা থলে থেকে একটা ছোটো বাক্স বের করে সেটার ভেতর থেকে খানিকটা তামাক বের করে গোল করে পাকাতে পাকাতে বাজারের চারপাশে নজর বোলাতে লাগল। পুরো বাজার এখন বলতে গেলে শেষ বিকেলের ঢিলেমিতে আক্রান্ত। শেষ বিকেলের আয়েশি সময়ে এখন বেশিরভাগ ব্যবসায়ী-ব্যাপারি আর জোতদারদের বেচাকেনার চেয়ে বরং আড্ডা আর বট গাছের নিচে খেলা দেখায় ব্যস্ত। কিরান খেয়াল করে দেখল যারা বটগাছের নিচে খেলা দেখছে তারা তো আছেই। বাকিরাও গোল করে বসে আয়েশ করে তামাক টানায় ব্যস্ত আর না হয় পাশা খেলার দান সাজাচ্ছে।

কিরান বাজারের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে ঘাটের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। সেখানে বিশেষ কিছু একটা ওর নজর কেড়ে নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ তাকিয়ে সে কিছু দেখতে পেল না। ওদিকে খানিকটা এগিয়ে আরো ভালোভাবে দেখবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই বটগাছের নিচ থেকে ভেসে আসা বাঘের গর্জনে চমকে উঠল সে। সেই সঙ্গে মুখে আবারও পুরনো হাসিটা ফুঁটে উঠল ওর। ঘাটের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সে বটগাছের গোড়ার দিকে তাকাল। হাতের মুঠোয় দলা পাকানো তামাকটা আবারও কোমরের চামড়ার থলিতে রেখে দ্রুত পায়ে এগোল বটগাছের গোড়ার দিকে।

বেদুর দেখানো খেলা আগেও দেখেছে কিরান। কারণ বহু বছর বেদু তার অধীনেই কাজ করেছে। কিন্তু আজ এখানে আসার আগে লোকমুখে সে যা শুনেছে তাতে সত্যিই আশ্চর্য হয়েছে সে। বট গাছের গোড়া অব্দি পৌঁছাতে পৌঁছাতে ভিড়ের ভেতরে হাততালির শব্দ ফেটে পড়ল। লোকজনকে ঠেলেঠুলে ভিড়ের শেষ মাথায় পৌঁছাতে তার চোখে পড়লকাল রঙের একটা ঝলকের মতো এপাশ থেকে ওপাশে কী যেন নেচে বেড়াচ্ছে।

পাকানো দড়ির মতো পেশির অপূর্ব সমাহারে কুচকুচে কাল যে মানবদেহটা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো বটগাছের গোড়াকে কেন্দ্র করে এদিক থেকে সেদিকে ঝলসে উঠছে সেটা যে একজন মানুষ সেটা বুঝতে হলে আরেকটু মনোযোগ দিয়ে অবলোকন করতে হবে পুরো ব্যাপারটা। ভিড়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে সেটাই করার চেষ্টা করল কিরান।

গোল হয়ে দাঁড়ানো ভিড়টাকে বাদ দিলে ভিড়ের কেন্দ্রে ফাঁকা জায়গাতে মোট তিনটি প্রাণীর অস্তিত্ব আছে। কিরান জানে আশপাশে বা ওপরে আরো একটা আছে। কিন্তু এইমুহূর্তে মাটির বুকে যে খেলা জমে উঠেছে তিনটি প্রাণীর ভেতরে সেটাতে মনোযোগ দেওয়াটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো ওর কাছে। তিনটি প্রাণীর ভেতরে প্রথমেই খুব স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টি কেড়ে নেয় হলুদ রঙের রাজকীয় প্রাণীটা যাকে সুন্দরবনের রাজা নামে চেনে সবাই। এই মহূর্তে সে বটগাছের শিকড়ের কাছটাতে শরীরটাকে বাঁকা করে লাফ দেওয়ারভঙ্গিতে বসে আছে তার সামনে অবস্থিত বাকি দুটো দুষ্টু প্রাণীকে শায়েস্তা করার জন্যে। দ্বিতীয় প্রাণীটি অবশ্য মাটিতে অবস্থান করছে না। সে তার লম্বা লেজটা দিয়ে বটগাছ থেকে নেমে আসা একটা মোটা লতা আকড়ে ধরে একবার বাঘটাকে দেখে আরেকবার তার থেকে অদূরেই মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে দেখছে। দেখতে দেখতেই সে খোপ ধরে থাকা বাঘটার উদ্দেশে নিজের দাঁত বের করে আরেকবার ভেঙচে দিল। সঙ্গেসঙ্গে বাজ পড়ার মতো শব্দ করে রাগের সঙ্গে গর্জন করে উঠল বাঘটা।

অন্যদিকে বাঘের গর্জন শুনে হাসি মুখে ধমকে উঠল যে তৃতীয় প্রাণীটি সেই আসলে মঞ্চে উপবিষ্ট এই নাটকের মূল পরিচালক। তৃতীয় প্রাণীটিকে অবশ্য স্বাভাবিক জ্ঞানে মানুষ বলেই অবিহিত করা উচিত। কিন্তু তার শারীরিক গঠন আর অস্বাভাবিক সাহস তাকে আর দশটা মানুষের কাতার থেকে ওপরে তুলবে নাকি নিচে নামাবে সেটা ভাববার বিষয়। এই মানুষটার নামই বেদু, কিরান যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

পাকানো নারকেলেরর লতার মতো পেশিবহুল শরীরটা একেবারেই উদোম, পরনে শুধু একটা গেরুয়া রঙের ধুতি। সেটাও আবার এমনভাবে পেঁচিয়ে শক্ত করে পরা হয়েছে যে সেটাকে ধুতি কাম ল্যাঙট বেশি বলা উচিত। গাছের শিকড়ের

মতো মোটা পায়ে লোহার বালা, মাথায় নিশানের মতো সাদা কাপড় আর দুই হাতে পরা চামড়ার মোটা দস্তানায় তাকে মানুষ কম দৈত্য বেশি মনে হচ্ছে। তবে তার অবয়বের ভেতরে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে তার এক হাতে ধরা কাল রঙের লোহা কাঠ দিয়ে বানানো একটা মুগুর, যেটাকে সে তাক করে আছে বাঘটার দিকে।

কিরান বেদুকে ভালোভাবে লক্ষ করতে করতে বুঝতে পারল যে, সে বানর, বাঘ আর নিজেকে নিয়ে একটা নাটক সাজিয়েছে যেখানে এই বানর আর বাঘ হলো স্রেফ পাত্র-পাত্রী আর সে নিজে হলো একাধারে পরিচালক ও নায়ক। আর এই মুহূর্তে এই নাটকের শেষ দৃশ্য মঞ্চস্থ হতে চলেছে। বাঁদরটা বাঘটাকে ভেঙচে দিতেই বাঘটা রাগের সঙ্গে গর্জন করে উঠল। সঙ্গেসঙ্গে হাতের মুগুর তুলে বেদু ধমকে উঠল ওটাকে। লাফ দিতে গিয়েও বাঘটা যেন থমকে গেল খানিকটা। সঙ্গেসঙ্গে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো বেদু এগিয়ে গেল খানিকটা সামনের দিকে। তাকে হঠাৎ এভাবে এগোতে দেখে বানর আর বাঘ দুজনেই যেন খানিকটা থমকে গেল। বাঘটা আবারও নড়ে উঠেও থেমে গেল। কিন্তু লতা ধরে ঝুলতে থাকা বাঁদরটা বাঘের এই থেমে যাওয়া দেখে যেন আরো সাহসী হয়ে উঠল। সে আবারও জিভ বের করে ভেঙচে দিল বাঘটাকে। সঙ্গেসঙ্গে তালির সঙ্গে হেসে উঠল জনতা যা মোটেও ভালোভাবে নিল না বাঘটা। রাগের সঙ্গে গড় গড় করে সে লাফ দিল বাঁদরটাকে ধরার জন্য। কিন্তু বাঁদরটাও কম ক্ষিপ্র নয়, বাঘটাকে এগোতে দেখেই সে ল্যাঙচি মেরে সরে পড়তে লাগল।

এতে বাঘটা আরো খেপে উঠল। সে আবারও লাফ দিয়ে বাঁদরটার লাফাতে থাকা একটা লতার কিনারা ধরে ফেলল। গাছের দুলুনিতে বাঘ কি আর বাঁদরের সঙ্গে পারে? কিন্তু লতার দুলুনিতে বাদরটা ব্যালেন্স হারিয়ে পড়তে লাগল নিচের দিকে। খুশির সঙ্গে গর্জন করে উঠল বাঘ। সে বাঁদরটাকে ধরার জন্য লাফ দেবে কিন্তু তার আগেই মৃদু একটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দের সঙ্গে শূন্য থেকে উদয় হলো একটা ইগল। বাঘটা বাঁদরটাকে ধরার জন্য লাফ দেওয়ার আগেই ওটা নিচু হয়ে অপ্রস্তুত বাঘটার মুখে সামান্য খামচির মতো দিয়ে যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল তেমনি ঝড়ের বেগেই শূন্যে উঠে গেল। ইগলের আগমনে উত্তেজনা আর আনন্দে ফেটে পড়ল জনতা, কিন্তু রাগের সঙ্গে গর্জন করে উঠল বাঘটা। বাঁদর আর পাখি দুটোই গেছে, নিজেকে সামলে নিয়ে সে সামনে দেখতে পেল একমাত্র দু-পেয়ে মানুষটাকে। ওটার দিকেই ঝড়ের বেগে এগিয়ে গেল সে। বাঘটাকে ছুটে আসতে দেখে বেদু হাতে ধরা মুগুরটাকে উঁচু করল কিন্তু এই মুগুর ওরকম একটা বাঘের জন্য পলকা কাঠির চেয়ে বেশি কিছু না। বাঘটা এগিয়ে আসছে, প্রায় ধরে ফেলবে মানুষটাকে, সবাই ভাবছে বেদু হয়তো মুগুর দিয়ে বাঘটাকে আঘাত করবে, কিন্তু

তা না। বাঘটা তাকে ধরার ঠিক আগ মুহূর্তে লাফিয়ে সে বটগাছের একটা মোটা লতা ধরে ফেলল। প্রায় বাঁদরের মতোই ক্ষিপ্রতায় ওপরে উঠতে শুরু করল ওটা বেয়ে। শিকার ফসকে যেতেই বাঘ ওপরে লাফ দিল কিন্তু শিকার নাগালে বাইরে। তবে বেদুর কপাল খারাপ, সে আরেকটু উঠতেই হাত ফসকে সোজা বাঘটার গায়ের ওপরে এসে পড়ল। উত্তেজনা আনন্দ আর ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। কিন্তু একটু হুটোপুটির পর ধুলো সরে যেতেই সবাই দেখতে পেল হলদে বাঘের পিঠের ওপরে রাজার মতো বসে আছে এক মানবসন্তান। তার দুই হাত দুই দিকে ছড়ানো। নিখাদ প্রশংসা আর করতালিতে ফেটে পড়ল জনতা।

কিরান সরে এলো। ভিড়ের ভেতর থেকে এখন ওখানে কী হবে খুব ভালো করেই জানে ও। বাঁদর, ইগল আর বাঘটাকে নিয়ে আরো কিছুক্ষণ চক্কর কাটবে বেদু। তারপর সে আর তার সহযোগী অর্থ সংগ্রহ করবে ভিড়ের ভেতর থেকে।

কিরান ভিড়ের কাছ থেকে সরে এলো বাজারের সারি সারি দোকানগুলোর দিকে একটু আগে ঠিক যেখানে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে সে ঘাটের দিকে কিছু একটা চোখে পড়েছিল ওর। ঠিক কী চোখে পড়েছিল সেটা মনে করতে পারল না সে। বরং চামড়ার থলে থেকে আবারও তামাকটা বের করে আনল সে। এক হাতে নিয়ে ওটাকে দলা পাকাতে শুরু করবে তার আগেই পেছন থেকে ভারী একটা গলা শুনে খানিকটা চমকে উঠল সে।

'ওই জিনিসটার ঠিক ব্যবহারের জইন্যে তুমার একটা ভালো হুক্কা লাগব,' কিরান পেছন থেকে ভেসে আসা ভারী গলাটা, দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল বেদু হাসি মুখে হাতে একটা ছোটো হুকো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও ফিরে তাকাতেই হুকোটা সে ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। জিনিসটা হাতে নিয়ে তামাক না সাজিয়ে বরং বেদুর দিকে এগিয়ে গেল কিরান। ও কাছে যেতেই ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে প্রায় শূন্যে তুলে ফেলল বেদু।

'ওস্তাদ, কতদিন পরে তুমারে দেখলাম,' বলে সে আবারওশূন্যে তুলে ফেলল সে কিরানকে। 'তুমার ওজন কমপক্ষে পনরো-বিশ কেজি বাইড়া গেছে,' বলে সে হেসে উঠলআবারও।

'তাতে কী!' বলে বেদুর হাত ছেড়ে দিয়ে সে ওর কাঁধ আর হাতের পেশিতে হাত বুলাল। 'আমি মোটা অই গেলে কী হবো তুই তো আগের চায়া আরো অনেক বেশি শক্ত হয়া গেছোস,' বলে সে জোরে হেসে উঠে যোগ করল, 'যদিও তোর গায়ের বদ গন্ধটা আগের মতোই আছে।'

'হা-হা,' করে জোরে হেসে উঠল বেদু। আগের চেয়ে আরো জোরে হেসে উঠল সে। 'জীবনে আমার লগে কেউই বল্লম চালায়া পারে নাই ওস্তাদ একমাত্র তুমি ছাড়া। তুমি এই কথা কইলে হবে! আসো, তোমারে পরিচয় করায়া দিই,' বলে সে

কিরানকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এলো বটগাছের গোড়ার কাছে যেখানে গিয়ে দেখল বাঘটাকে শিকল পরিয়ে একটা লোহার খাঁচায় ঢোকানো হয়েছে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছোটো একটা ছেলে।

'ও অইলো মতি,' ছেলেটাকে দেখিয়ে বেদু বলে উঠল। 'এই ব্যাটা এনি আমার ওস্তাদ, তারে সালাম কর।' বেদু বলতেই ছেলেটা দৌড়ে এসে প্রায় ওর পায়ের ওপরে এসে পড়ল।

'এই থাক থাক,' কিরন প্রায় চমকে গেছে ছেলেটার আচরণে।

'আরে সালাম করছে দেইহা ভাইবো না ও ভালা। বহুত বদ পোলা,' বলে সে ছেলেটাকে টেনে তুলে স্নেহ ভরে তার চুল এলো করে দিল। 'আর এই দেহো,' বলে সে খাঁচার দিকে দেখাল। 'ও অইলো সুলেমান,' বাঘটাকে দেখাল। ওরে এইটুক থাকতে কিনছিলাম হুগলির বাজার থনে। এইটা কিচাক,' বলে সে মতিকে ইশারা করতেই খাঁচার ওপর থেকে লাফিয়ে মতির কাঁধ গিয়ে বসল বানরটা। কী বুঝল কে জানে। কিরানকে উদ্দেশ্য করে জিভ দেখিয়ে দিল সে। কিরান হেসে উঠল।

'তোর পরিবার তো দেখি...'

'আছে শেষ অয় নাই তো,' বলেই সে জোরে শিস বাজাতেই শূন্য থেকে উদয় হলো বিরাট একটা চিল। ওদের মাথার ওপরে একটা পাক খেয়ে বেদুর দস্তানা পরা হাতের ওপরে এসে বসে পড়ল। 'ও অইলো শায়ক, শায়ক মানে জানো তো ওস্তাদ, তীর। এই ব্যাটা সবসময় তীরের মতোনই উড়তে উড়তে নিশানার ওপরে ঝাঁপায়া পড়ে। ধইরা দেহো,' বলে মৃদু হেসে উঠল বেদু। 'হ ওস্তাদ, এহন ওরাই আমার পরিবার।'

'আমিও পরিচয় করায়া দিতাছি,' বলে সে পায়ে পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসা বৈঠা আর বিল্লালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ওদের দুজনকে দেখে বেদু একটু অবাক হলো। 'ওস্তাদ কি কোনো কামে আসছো নাকি?'

'তুই কি কিছু শুনেছিস আমার ব্যাপারে?' প্রশ্নটা করার সময়ে একটু সরু চোখে তাকাল সে, সেই সঙ্গে একবার দেখে নিল বৈঠা আর বিল্লালকে।

বেদুও প্রায় একইরকম সরু চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'কুন ব্যাপারে ওস্তাদ?'

'আচ্ছা, তার মানে তোর কানে এহনো কিছু আসে নাই,' বলে সে বেদুকে ইশারা করল। 'তোর লগে কথা আছে। নির্জনে বইসা বলা যাবে?'

'যাবে,' বলে সে মতিকে ইশারা করল প্রাণীগুলোকে নিয়ে নৌকায় ওঠাতে।

'ও পারবে এগুলারে নিয়া যাইতে একলা?'

'নাহ, আরো লোক আছে,' বলে বেদু ইশারা করল।

'শোন, তোর নৌকা কি ঘাটে বান্ধা?' বেদু হ্যাঁসূচক ইশারা করতেই কিরান বলে উঠল। 'এক কাম কর, হাটের পিছে খালের দিকে আমগো নাও বান্ধা। তোরডাও অইহানেই নিয়া রাখতে ক।'

বেদু কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করল তারপর কিছু না বলে মতিকে ডেকে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। কিরানও বৈঠা আর বিল্লালকে নৌকায় গিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। আর ওরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো নদীর কিনারায় হাটের একপাশে নির্জনে।

ওখানে একটা গাছের নিচে বসতেই এতক্ষণ হাতে রাখা হুঁকোটা বেদুর হাতে দিতেই সেটাতে আগুন দিয়ে গুড়গুড় করে এক বুক ধোঁয়া ছাড়ল বেদু। 'আহ, কতদিন পরে এত বালা তামুক টানলাম। তুমি ওস্তাদ আগের মতোই আছ। এই কারণেই তুমারে এত পছন্দ করি আমি।'

কিরান হেসে উঠে হুঁকোটা নিজের হাতে নিয়ে নিল। গুড়গুড় করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে উঠল, 'বেদু, আমি তোর এইহানে আইছি একটা বিশেষ কামে,' বলে সে একটু থামল। বেদু অপেক্ষা করে আছে কিরান কী বলে সেটা শোনার জন্য।

'তুই কি জানোস সম্রাট সুজারে আরাকানে খুন করা অইছে?'

'হুনলাম,' বেদু আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল। 'ব্যাপারটা বালা অয় নাই এমনেই...'

'ওইহনে ওইদিন রাইতে বাপুও আছিল,' বলে কিরান না থেমেই যোগ করল। 'ওইদিন রাতে ওইখান থেইক্কা কিছু মানুষ পলাইতে পারছিল। বাপু তাগো একজন। কিন্তু এরপরে হের কুনো হদিস নাই। ধারণা করা অইতাছে হেরা পশ্চিম দিকে গেছে কিন্তু সঠিক খবর নাই। হেগো পিছে লাগছে রোসাঙ্গের লোকেরা। আর সিলভেরার বিরাট বাহিনী,' বলে সে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল। খুব সাবধানে লক্ষ করছে বেদুর প্রতিক্রিয়া।

'কও কি ওস্তাদ, চাচায় যদি বাঁইচাও থাকে তাইলে তো,' বলে সে মাথা চুলকাল। 'তার চায়া বড়ো কথা সিলভেরারে ধরার এই সুযোগ। তুমি...'বলে সে চোখ তুলে তাকাল কিরানের দিকে।

'আমি ওগো পিছে যাইতেসি,' নিষ্কম্প গলা কিরানের। 'বাপুরে তো বাঁচাইতে হবেই। আর সিলভেরার লগে আমগো পুরান হিসাব চুক্তা করতে হবে।'

নিজের ডান হাতটা মাথার ওপরে তুলে হাঁটুর ওপরে সশব্দে নামিয়ে আনল বেদু। 'এইডা অইলো একটা কথার মতোন কথা। তুমি আমারে নিবা তো?'

কিরান হেসে উঠল। বেদু এত সহজে রাজি হবে সে ভাবেনি। 'আমি তো সে জন্যই আইছিলাম। কিন্তু আমি তো ভাবছি তুই রাজি হবি না। তুই খেলা দেহাস এহন, এত নাম-ডাক তোর।'

'তুমি কি পাগল নাকি ওস্তাদ,' বেদু প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। 'তুমি আমারে চিনো না। আমি অইলাম যুদ্ধের মানুষ। এইসব খেলা ফেলা,' বলে সে মাথা চুলকাল। 'কিন্তু আমি গেলে তো মতিরে দেহার কেউই নাই আর সুলেমান, শায়ক...''

'তুই যদি আমার সঙ্গে যাস তয় আমি ওগোরে নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করতে পারি,' কিরান বলে উঠল। 'আমার পরিকল্পনা অইছে বড়ো। আমার আরো লোক লাগবো। গোলন্দাজরে আমার লাগব। তুই কি হের খবর জানোস?'

বেদু একটু চিন্তা করল, 'গোলন্দাজের খবর বাইর করা কঠিন না। আমি জানি হেয় কই থাহে। কিন্তু কথা অইলো হেয় যাইব কি না। এক কাম করন যায়, তুমি আমি আমি গিয়া হেরে...'

'এখান থেকেই যাব আমরা,' কিরান তামাকটা আবারও বেদুর হাতে ধরিয়ে দিল। 'শোন এখানে একটা সমস্যা হইলো আমাগো হাতে অস্ত্র-জাহাজ সব আছে। খালি নাই তথ্য। আমার আরো কিছু ব্যাপারে জানতে অইবো...'

হঠাৎ বাজ পড়ার মতো শব্দ হতেই কিরানের কান খাড়া হয়ে গেল।

'ওস্তাদ এইটা বন্দুকের গুলি না?' বেদুও সচেতন হয়ে গেছে।

অবশ্যই বন্দুকের শব্দ। কিন্তু এখানে বন্দুকের শব্দ হবে কীভাবে।

কিরানের ভাবনা শেষ না হতেই আরো একাধিক বন্দুক একসঙ্গে গর্জে উঠল। সেই সঙ্গে মানুষজনের হইহল্লার সঙ্গেসঙ্গে আওয়াজ ভেসে এলো,

'হাম্মাদ, হাম্মাদ ভাগো...'

কিরান চট করে ফিরে তাকাল বিহ্বল বেদুর দিকে। কাপসের হাটে হার্মাদ ডাকাতরা আক্রমণ করেছে।

অধ্যায় ষোলো
বর্তমান সময়
পতেঙ্গা রোড, চট্টগ্রাম

ব্যাপারটাকে কি ঠিক আক্রমণ বলা যায় নাকি অপহরণ!

ফোনে কথা বলতে বলতেই সচেতন হয়ে উঠল শারিয়ার। যেইমাত্র সে জানতে পেরেছে অফিস থেকে নিয়োগ দেওয়া ভুবন নামের মানুষটা ওকে খুঁজে পায়নি সঙ্গেসঙ্গে আড়চোখে একবার দেখে নিয়েছে ড্রাইভিং হুইলের সামনে বসা ভুবন নামের ভুয়া লোকটাকে। কিন্তু ভিউ মিররে চোখ পড়তেই ধরা পড়ে গেল সে। লোকটা ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল। শারিয়ার সেদিকে তাকানোর পরেও সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল না।

গাড়ি চলছে প্রায় সত্তর-আশি কিলোমিটার বেগে। আর লোকটা ভিউ মিররে তাকিয়ে আছে শারিয়ারের দিকে। শারিয়ার কানে মোবাইলটা ধরে আছে। ওপাশ থেকে তড়বড়িয়ে কথা বলে যাচ্ছে মৌসুমি। কিন্তু কোনো কথাই কানে ঢুকছে না শারিয়ারের। দুজনেই আয়নার ভেতর দিয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে। মুহূর্ত যেন থমকে গেল।

শারিয়ারই প্রথমে সচকিত হয়ে উঠল। সে সামনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করতেই লোকটা স্টিয়ারিং হুইলটা একপাশে ঘুরিয়ে দিল চট করে। সামনে এগোতে গিয়েও ভারসাম্য হারিয়ে শারিয়ার পড়ে গেল পেছনের সিটের একপাশে। তালগোল পাকানো শরীরটাকে একটু ঠিকঠাক করেই হোলস্টার থেকে বের করে আনল কিং কোবরা। কিন্তু পিস্তলটা বের করে এনেও সে হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করল ড্রাইভার আর প্যাসেঞ্জার সিটের মাঝখান একটা স্বচ্ছ কাচের আবরণ দেয়ালের মতো উঠে এসে দুই অংশকে বিভক্ত করে ফেলেছে। আর জিনিসটা যে সাধারণ কাচ না সেটা বোঝার জন্য আইনস্টাইন হওয়ার দরকার নেই। শারিয়ার পিস্তল তুলতেই সামনের সিট থেকে আবছাভাবে মানুষটার গলা ভেসে এলো, 'মিস্টার শারিয়ার নিজের ক্ষতি করতে না চাইলে চুপচাপ বসে থাকুন। রাইডটা উপভোগ করুন। আপাতত আপনার কোনো ক্ষতি করা হবে না। আমার স্রেফ কিছু তথ্য দরকার,' মাঝখানের কাঁচের কারণে তার গলা অদ্ভুত শোনাচ্ছে।

জবাবে রাগের সঙ্গে সামনের কাচটাতে পিস্তলের বাট দিয়ে বাড়ি মারল শারিয়ার। যা ভেবেছিল তাই, একেবারেই আনব্রেকেবল এবং সম্ভবত বুলেটপ্রুফ কাচ। রাগের সঙ্গে বাড়ি মারলেও আরেকটু হলেই পিস্তলটা ওর হাত থেকে ছুটে যাচ্ছিল।

'মিস্টার শারিয়ার, নিজের ক্ষতি করতে না চাইলে চুপচাপ থাকুন,' আবারও সেই যান্ত্রিক গলা ভেসে এলো। শারিয়ার লোকটার কথা না শুনে বরং আরো অস্থির হয়ে উঠল। কী করা যায় বোঝার চেষ্টা করছে সে। গাড়ির মাঝখানের গ্লাসটা যদি আনব্রেকেবল হয়ে থাকে তবে জোরদার সম্ভাবনা যে, বাকি কাচগুলোও তাই। শারিয়ার পিস্তল তুলেও নামিয়ে নিল। সিনেমাতে যেমন দেখায় এসব গ্লাসে সেভাবে ক্রমাগত গুলি করে কাচ ভাঙার চেষ্টা করাটা অত্যন্ত বোকার মতো একটা কাজ। কারণ এসব ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়েই কাচে গুলি করলে গুলি ছুটে যায় এদিক-সেদিক। কাজেই খুব জোর সম্ভাবনা থাকে যেগুলি করছে সে যদি এরকম বদ্ধ একটা জায়গায় থাকে তবে গুলি উল্টাপাল্টা যেকোনো দিকে ছুটে এসে গুলি যে করবে তারই ক্ষতি করতে পারে।

শারিয়ার ফোনটা আবারও তুলে নিয়ে মৌসুমিকে ইনফর্ম করার চেষ্টা করল কিন্তু অবাক হয়ে দেখল নেটওয়ার্ক নেই। এই ব্যাটা নিশ্চয় কিছু একটা করেছে। কোনো ধরনের জ্যামার ব্যবহার করছে সে সম্ভবত। মাঝখানে কোনো কারণে জ্যামার কাজ না করাতেই শারিয়ার কল ধরতে পেরেছিল।

'মিস্টার শারিয়ার, আমি আবারও বলছি আপনি চুপচাপ বসুন।'

শারিয়ার পিস্তল আর ফোন দুটোই আগের জায়গাতে রেখে দিয়ে ওর চারপাশটা পরখ করতে শুরু করল। আফসাসের সঙ্গে দেখল ওর ব্যাকপ্যাকটা সামনের সিটে পড়ে আছে। এখন মনে পড়ে গেল এই ব্যাটা অতিরিক্ত চাটুকারিতা করে ব্যাগটা ইচ্ছে করেই নিজের কাছে নিয়ে নিয়েছিল। শারিয়ার মাথা ঠাণ্ডা রেখে সামনের কাচের প্রতিটি ইঞ্চি পরখ করতে শুরু করল। হঠাৎই একটা ব্যাপার খেয়াল করে সে খুশি হয়ে উঠল।

'চুপচাপ তোর মাথা! মাদারটোস্ট,' বলেই সে গাড়ির পেছনের সিটে শুয়ে পড়ল। তারপর শরীরটাকে কুঁকড়ে যতটা সম্ভব ছোটো করে ফেলল। তারপর যখন স্প্রিংয়ের মতো ঝট করে সোজা হলো স্টিলের পাত লাগানো বুটটা সোজা গিয়ে আছড়ে পড়ল বুলেটপ্রুফ কাচটার একটা নির্দিষ্ট জায়গায়। প্রতিক্রিয়া দেখে খুশি হয়ে উঠল শারিয়ার। আবারও লাথি মারল সে, আবারও...আবারও।

ছয়-সাতটা লাথি মেরে দম নিতে লাগল। কাচটাকে পরখ করার সময় সে দেখতে পায় কাচটা আনব্রেকেবল হলেও ওটা যেখানে গিয়ে মিশেছে সেই জায়গাটার কবজাটা খুব একটা শক্ত নয়। কাচটা ভাংগা সম্ভব না হলেও কবজাটা

ছোটানো সম্ভব হতে পারে। একটু থেমেই আবারও বুট পরা পায়ে লাথি মারতে শুরু করল শারিয়ার। শক্তিশালী পায়ের শক্ত জুতোর আরো কয়েকটা লাথি কাচের গোড়ায় আছড়ে পড়তেই কাচটা কেঁপে উঠল।

শারিয়ার যখন লাথি মারতে শুরু করে সামনের নকল ভুবন হেসে উঠেছিল কিন্তু কাচটা কেঁপে উঠতেই সে আর উপেক্ষা করতে পারল না। শারিয়ার যত লাথি মারছে সে বারবার পেছন ফিরে দেখছে।

কাচটা কেঁপে উঠতেই শারিয়ার আরো উৎসাহের সঙ্গে লাথি মারতে শুরু করল। কিন্তু আরো দুটো লাথি মারতেই ভুবন কিছু একটা করল, সঙ্গেসঙ্গে হিসহিস একটা শব্দের সঙ্গে গাড়ির পেছনটা ধোঁয়ায় ভরে যেতে শুরু করল।

প্রথমেই বেশ খানিকটা ধোঁয়া গিলে নিল অপ্রস্তুত শারিয়ার। সঙ্গেসঙ্গেই খকখক করে কেশে উঠল। কোনোমতো সোজা হয়ে বসে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পকেট থেকে রুমাল বের করে ফেলল ও। তারপর সেটাকে মুখের ওপরে বেঁধে সামনে তাকাতেই দেখতে পেল সামনের সিটে নকল ভুবনের মুখে ফুটে উঠেছে বত্রিশ ভোল্টের হাসি। শারিয়ারের ইতোমধ্যেই মাথা ভারী লাগতে শুরু করেছে। অনুমান করল সর্বোচ্চ ত্রিশ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট সময় পাবে ও আর। এর মধ্যে কিছু করতে না পারলে সব শেষ। শরীরটাকে আবারও গুটিয়ে আনল সে। এবার আগের চেয়ে দ্বিগুণ বেগে লাথি মারতে শুরু করল কবজায়। এক একটা লাথি কয়েক টনের শক্তি নিয়ে কবজার ওপরে আছড়ে পড়ছে। শেষ লাথিটা এত জোরে মারল শারিয়ারের মনে হলো যেন ওরে পায়ের কবজিই ভেঙে গেছে। পা-টাকে টেনে এনে আবার লাথি মারতে যাবে তার আগেই একটা কবজা ছুটে গিয়ে কাচটা একপাশ থেকে সরে হেলে পড়ল।

পেছনের ধোঁয়া গলগল করে প্রবেশ করতে শুরু করল সামনের দিকে। শারিয়ার পিস্তল বের করে এনে এক হাতে মুখ ঢেকে সামনের দিকে দেখল। চোখে অন্ধকার দেখছে সে। প্রায় অন্ধকার ধোঁয়ার ভেতরে ভুবনের আকৃতিটা চোখে পড়তেই সোজা গুলি চালাল। গুলি লাগল কি লাগল না, সেটা বুঝতে পারল না। কিন্তু অনুধাবন করল তীব্র বেগে চলতে থাকা গাড়িটার ভেতরে ওর শরীর শূন্যে উঠে গেল। তারপর বেশ কয়েকবার এদিক ওদিক বাড়ি খেয়ে থেমে গেল ওটা। তীব্র আঘাতে চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে এলো শারিয়ারের।

***

ঘুম থেকে জেগে উঠল নাকি অজ্ঞান অবস্থা থেকে জ্ঞান ফিরে এলো ঠিক বুঝতে পারল না শারিয়ার, তবে এটা অনুমান করতে পারল তীব্র কাশির চোটে শরীরটা বাঁকা হয়ে আসছে। কাশতে কাশতেই শোয়া থেকে সোজা হতে গিয়ে ধাম করে ওর

মাথাটা বাড়ি খেল কিছু একটার সঙ্গে। চোখের সামনের অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি, তার আগেই কাশতে কাশতে অন্ধের মতো একটা হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরে অন্য হাতে ডানে-বামে নেড়ে একটু ফাঁকা মনে হতেই শরীরটাকে সেদিকে গড়িয়ে দিল শারিয়ার। মুক্ত বাতাসে জোরে জোরে দম নিতেই চোখের সামনের আঁধার আর বুকের কাশি দুটোই কমে এলো অনেকটা।

কাশির দমক খানিকটা কমে আসতেই শারিয়ার অনুভব করল ঘাসের ওপরে শুয়ে আছে সে। সামনেই একপাশে কাত হয়ে আছে গাড়িটা। একটু আগে ওর শরীর আসলে অনেকটাই গাড়ির ভেতরে ছিল তাই সোজা হওয়ার সময়ে মাথায় বাড়ি খেয়েছিল। গাড়িটাকে দেখতে পেয়েই শারিয়ার সচকিত হয়ে উঠল। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ধরতে পারল একটু আগে আসলে ঘটেছিল কি। গাড়ির মাঝখানের পার্টিশনের কাচটা ভেঙে ও গুলি করাতে সম্ভবত নকল ভুবন গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। নিয়ন্ত্রণহীন গাড়িটা রাস্তা থেকে সরে এসে একাধিক গড়ান খেয়ে স্থির হয়ে যায় রাস্তার পাশে। ধোঁয়ার প্রকোপ আর আঘাতের চোটে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে শারিয়ার। খুব বেশি সময় ও অজ্ঞান ছিল না। কাজেই সেই নকল ভুবন আশপাশেই আছে।

গাড়িটার দিকে নজর রেখে খানিকটা টলতে টলতেই উঠে দাঁড়াল শারিয়ার। যতোটা সম্ভব নিজেকে স্থির করে খানিকটা কুঁজো হয়ে এগোল গাড়ির দিকে। গাড়ি থেকে এখনো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে, তবে পরিমাণে আগের চেয়ে কমে গেছে অনেকটা। নিজের অস্ত্রটা হাতে নেই, গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে ওটার দরজার কাছেই পড়ে থাকতে দেখল ও পিস্তলটা। ওটাকে হাতে নিয়ে অন্য হাতে নিজের মুখ ঢেকে পিস্তলের নলের ডগা দিয়ে ঠেলা দিয়ে ও কাত হয়ে থাকা গাড়ির দরজাটা খুলে ফেলল। ওটাকে খুলে দিতেই এক ঝলক ধোঁয়া বেরিয়ে এলো। এক হাতে ধোঁয়া সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল ও। পেছনের সিটে কেউই নেই। সামনের সিটে আছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। শারিয়ার খুব সাবধানে গাড়িটাকে কেন্দ্রে রেখে অনেকটা বৃত্তের মতো তৈরি করে চলে এলো গাড়ির সামনে। শরীরটাকে কুঁজো করে খুব সাবধানে উঁকি দিল গাড়ির সামনের সিটে। নিজের ব্যাকপ্যাকটাকে পড়ে থাকতে দেখল ড্যাশবোর্ডের ওপরে। কিন্তু ড্রাইভিং সিটে কেউ নেই।

‘ধূর, শালা,’ আপনাতেই বকে উঠল ও। তবে পিস্তলটা হাত থেকে নামাল না। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে খুব বেশি সময় হয়নি। লোকটা আশপাশেই কোথাও আছে। খুব বেশি দূরে সে যেতে পারেনি। গাড়ির সামনে এসে পিস্তলটাকে হাতে রেখেই পকেট থেকে মোবাইল বের করল। মৌসুমি আপাকে রিপোর্ট করতেই সে জানাল পাঁচ থেকে দশ মিনিটের ভেতরে ওর মোবাইল ট্র্যাক করে পুলিশের জিপ পাঠাচ্ছে। শারিয়ার কল কেটে দিয়ে প্রথমে গাড়ির ভেতর থেকে নিজের

ব্যাকপ্যাকটা বের করে পিঠের ওপরে নিয়ে নিল। তারপর মোবাইল বের করে গাড়িটার একট ছবি তুলল। তারপর ওটার নম্বর প্লেটের ছবি তুলে আশপাশের জায়গাটাকে খানিকটা পরখ করার জন্য মোবাইলটার টর্চ জ্বালতেই হঠাৎ একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। খানিকটা দূরেই যেন ঝোপের কাছে নড়ে উঠল কিছু একটা। ধোঁয়ার প্রভাবেই হোক অথবা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করাতেই হোক ওর মাথা এখনো ঘুরছে। তবুও চোখ কুঁচকে খানিকটা নিচু হয়ে সাবধানে পা বাড়াল ওদিকে। আরেকটু এগোতেই দেখল ঝোপের ভেতর থেকে একটা ছোটো সাইজের শেয়াল বের হয়ে দৌড় দিল জলার দিকে। শারিয়ার স্বস্তির হাসি হেসে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু আগেই ঘটে গেল বেশ কয়েকটা ঘটনা।

প্রথমেই একটা মোটরবাইকের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল ও। সম্ভবত এই শব্দেই শেয়ালটা পালিয়েছে। বাইকটাকে হাইওয়ে ধরে এগোতে দেখে খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই একটা দৃশ্য দেখে জমে গেল ও। বাইকটা যেদিক থেকে আসছে সেদিকেই রাস্তার একপাশ থেকে সাদা শার্ট পরা একটা ছায়ামূর্তি হাতে কিছু একটা ধরে উঠে আসছে। শারিয়ার পিস্তলটাকে বাগিয়ে ধরে দৌড় দিল রাস্তার দিকে। কিন্তু তার আগেই মূল রাস্তায় উঠে আসা মানুষটা হাতের ইশারায় থামিয়ে ফেলল বাইকটাকে। বাইকটা থেমে গেছে প্রায়। শারিয়ারও দৌড়ের গতি বাড়াতে শুরু করেছে কিন্তু তার আগেই নকল ভুবন হাতে ধরা জিনিসটা দিয়ে বাইকওয়ালাকে আঘাত করল।

শারিয়ার দেখতে পেল ভুবনের আঘাতে লোকটা পড়ে যেতেই সে লাফিয়ে বাইকে উঠে পড়ল। শারিয়ার প্রায় রাস্তার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এমন সময় সে বাইকটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত স্টার্ট করে ফেলল। শারিয়ার কাছাকাছি পৌঁছে পিস্তল তুলল কিন্তু ততক্ষণে নকল ভুবনের বাইকের গতি বাড়তে শুরু করেছে। যদিও গতি শ্লথ তবুও শারিয়ার যতটা সম্ভব দ্রুত দৌড়ানোর চেষ্টা করল। দৌড়াতে-দৌড়াতেই সে পিস্তল তুলল, কিন্তু ততক্ষণে বাইক ঝড়ের বেগে চলতে শুরু করেছে। আরেকটু এগিয়ে হাঁটুর ওপরে হাত রেখে হাঁপাতে লাগল, সেই সঙ্গে দেখল উল্টোদিক থেকে আসা আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে প্রায় অন্ধকার হাইওয়ে।

একহাতে চোখ আড়াল করে ভালোভাবে তাকাতেই দেখতে পেল একটা পুলিশের জিপ একেবারে কাছাকাছি এসে থেমে গেছে ওর।

জিপটা থামতেই ওটা থেকে নেমে এলো দুজন। পিস্তল হাতে ওকে হাঁপাতে দেখে সোজা অস্ত্র তাক করে পিস্তল ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিল।

'আমি আমিই এখানে আপনাদের আসার জন্য খবর দিয়েছিলাম,' হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে উঠল শারিয়ার।

'আগে অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে হাত ওপরে তোলো,' পরিষ্কার শান্ত গলায় নির্দেশ এলো। শারিয়ার তাই করল। শারিয়ার জানে এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। খবর যেই দিয়ে থাকুক ওরা ভেরিফাই করবে আগে।

'নিজেকে আইডেন্টিফাই করো।'

শারিয়ার নিজের ব্যাপারে বিস্তারিত বলতেই একজন এগিয়ে এসে ওর পকেট থেকে আইডিটা বের করে নিল। ওটা দেখে নিয়ে দুজনেই অস্ত্র নামিয়ে স্যালুট ঠুকল। 'স্যার, নির্দেশনা বলুন।'

শারিয়ার নিজের অস্ত্রটা তুলে দ্রুত এগোল জিপের দিকে। 'একটা মোটরসাইকেলকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছেন?'

'জি স্যার,' দুই পুলিশের ভেতরে অফিসার গোছের দেখতে একজন বলে উঠল। 'লাল রঙের একটা জিটি হান্ড্রেড বাইক মনে হলো।'

'পেছনে রাস্তার ওপরে দেখবেন একজন মানুষ পড়ে আছে,' তুমি বলে সে কনস্টেবলকেদেখাল। 'ওই লোকটা যদি কথা বলার মতো অবস্থায় থাকে তবে তাকে জিজ্ঞেস করে বাইকের নম্বরটা জেনে এসো। জলদি করো।'

'আপনি আমার সঙ্গে আসুন,' অফিসারকে নিয়ে জিপের কাছে চলে এলো শারিয়ার। 'আগে সামনের কোনো ইউনিট যদি থাকে তবে তাদের বলুন সম্ভব হলে বাইকটাকে আর না হয় কোনদিকে যাচ্ছে ট্রেস করার চেষ্টা করতে।'

তরুণ অফিসার টকিতে কথা বলতে শুরু করেছে, শারিয়ার মোবাইল বের করে এক মুহূর্ত ভাবল কল দেবে কিনা, তারপর সেটা বাতিল করে দিয়ে সে রাস্তার দিকে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল কনস্টেবল দৌড়ে আসছে। 'নম্বর পাওয়া গেছে?'

'জি, স্যার।'

'জলদি নম্বরটা আপনার অফিসারকে দিয়ে আপনি অ্যাম্বুলেন্সে কল করতে বলে লোকটার কাছে ফিরে যান। আমরা সামনে এগিয়ে বাইকটাকে ধরার চেষ্টা করব।'

এরপরের কয়েকমিনিটের ভেতরে খুবই দ্রুত ওরা বাইকটার নম্বর আশপাশের চৌকি আর টহল পুলিশের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ওরা উঠে বসল জিপে। জিপ ছাড়তেই সেটা ঝড়ের বেগে চলতে শুরু করল হাইওয়ে ধরে।

'আমরা এই মুহূর্তে আছি কোথায়?' শারিয়ার জানতে চাইল। ওর কপালের ওপরে চটচটে কিছু একটা টের পাচ্ছে ও। হাত দিতেই দেখতে পেল রক্ত। এত উত্তেজনায় টের পায়নি ও।

'স্যার, আমরা আছি পতেঙ্গা রোডের খুব কাছাকাছি, লং রোড হাইওয়েতে,' বলে সে শারিয়ারের দিকে নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে এগিয়ে দিল। 'স্যার, আপনার কপাল থেকে রক্ত পড়ছে। আমরা...'

শারিয়ার রুমালটা নিয়ে কপাল মুছবে তার আগেই অফিসারের রেডিও খর খর করে উঠল। রেডিওতে কথা বলে সে শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'স্যার, বাইকের ট্রেস পাওয়া গেছে।'

'কোথায়? কী অবস্থায় আছে এখন?' শারিয়ার শান্ত গলায় জানতে চাইল। যদিও শরীরের ভেতরে ওর রাগ চিড়বিড় করে উঠছে।

'স্যার, আমরা ধরতে পেরেছি। কারণ খুব কাছেই আছে বাইকটা,' বলে সে বাইকটা কোনদিকে গেছে সেটা বর্ণনা দিতে শুরু করল। আর সঙ্গেসঙ্গে ভ্রু কুঁচকে উঠল শারিয়ারের।

শুনতে শুনতেই সে জানতে চাইল, 'জায়গাটা এখান থেকে আর কতদূর?'

অফিসার ছেলেটা ঘড়ি দেখল তারপর খানিকটা চিন্তা করে বলে উঠল, 'একেবারেই কাছে স্যার। বড়োজোড় আর পাঁচ-ছয় মিনিট লাগবে যেতে।'

শারিয়ারের ভ্রু কুঁচকে উঠল। একটা ব্যাপার ওর মাথার ভেতরে পাক দিয়ে উঠছে কিন্তু সেটা নিয়ে বেশি ভাবার সময় পেল না বরং তার চেয়ে এসআইয়ের দেওয়া রুমালটা দিয়ে ভালেভাবে মুখ আর কপাল মুছে ওটাকে ভাঁজ করে বেঁধে ফেলল কপালের ক্ষতের ওপরে। এসআইকে ধন্যবাদ জানিয়ে হোলস্টার থেকে নিজের পিস্তলটা বের করে আনল। জিনিসটার সঙ্গে ওর সখ্যতা গড়ে ওঠার আগেই ওকে কাজে নামতে হয়েছে। অস্ত্রের ব্যাপারে শারিয়ারের ধারণা খুব পরিষ্কার। অস্ত্র হলে বন্ধুর মতো, ঠিকঠাক কাজে লাগালে বিপদে এর চেয়ে বড়ো ভরসা আর নেই। ঠিক একইভাবে বিগড়ে গেলে বিপদে এর চেয়ে বড়ো শত্রুও আর নেই। পিস্তলটাকে বের করে হোলস্টারের সঙ্গে সংযুক্ত এক্সট্রা ক্লিপ আর গ্রিপটাকে আটকে দিল পিস্তলের সঙ্গে। এটা এখন একটা মেশিন পিস্তলের মতো কাজ করবে।

'স্যার, আমরা প্রায় জায়গামতো চলে এসেছি,' শারিয়ারের পাশ থেকে এসআই ছেলেটা বলে উঠল। 'কিন্তু স্যার, একটা কথা বলি?'

শারিয়ার একটু অবাক হয়ে ফিরে তাকাল ছেলেটার দিকে। 'কি বলেন?'

'স্যার এই বাড়িটার সঙ্গে মানে...' ছেলেটার গলায় অস্বস্তি।

'আমতা আমতা না করে কী বলতে চাচ্ছেন ঝেড়ে কাশেন,' প্রায় ধমকে উঠল শারিয়ার। ও অস্ত্রটাকে তুলে ধরে বাড়িটার সামনে দেখে নিল আরেকবার। মেইনরোডের পাশেই, খানিকটা ভেতরে একটা বিরাট বাড়ি। বলতে গেলে প্রায় পুরো বাড়িটাই অন্ধকারে ছেয়ে আছে।

'স্যার এই বাড়িটাতে মানে কয়েকদিন আগে এই বাড়িটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটা ঘটনা ঘটে গেছে। মানে এই বাড়িটাতে লুকিয়ে থাকা একজন মানুষ কয়েকদিন আগে এই রোডে,' বলে সে মূল রাস্তাটা দেখাল। 'এইখানে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে,' একটানে কথাগুলো বলে সে থেমে গেল।

শারিয়ারের কুঁচকানো ভ্রু আরো একটু কুঁচকে উঠল। ব্যাপার কী! হচ্ছেটা কী আসলে এই এলাকাতে? প্রথমে স্টেশনের বাইরে থেকে ওকে অপহরণ করার চেষ্টা করল একজন তারপর আবার সেই লোক এখন বাইক নিয়ে পালিয়ে চলে এলো ঠিক সেখানে যেখানে ওর আসার কথা। এটা কীভাবে সম্ভব! আসলে ঘটছে কী?

শারিয়ারের মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না। ঘটনার পসরাগুলোকে সে একটার পর একটা ক্রমানুসারে সাজাতে পারছে না। কয়েক মুহূর্তের ভেতরে কথাগুলো ওর মাথার ভেতরে খেলে যেতেই শারিয়ার ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'আপনার নামকী?' বলে সে ছেলেটার বুকে লাগানো নেমপ্লেটটা দেখে বলে উঠল, 'মঞ্জুরে মোর্শেদ,' বলে সে নিজে জিপ থেকে নেমে ছেলেটাকেও নামার ইশারা করল। 'আপনি কী পোস্টে আছেন পুলিশে?'

'স্যার, এসআই,' ছেলেটা হঠাৎ শারিয়ারের অভিব্যক্তি দেখে খানিকটা ভয় পেয়ে গেছে। 'স্যার, ব্যাপারটা কি বলেন তো আমি তো কিছুই...'

'শোনেন মোর্শেদ,' বলে সে আবারও বাড়িটার আশপাশে দেখে নিল। এতটা অন্ধকার কেন এদিকে ঠিক বুঝতে পারছে না ও। 'আপনি এই বাড়ির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-ঘটনাটার কথা বললেন আমি ওই কেসটাই তদন্ত করতে এসেছি। কিন্তু এখানে আসলে কি হচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এক কাজ করেন। আপনার জিপের ড্রাইভারকে বলেন আশপাশের কোনো ফোর্সে খবর দিতে, যত অল্প সময়ে সম্ভব এখানে ফোর্স পাঠাতে বলুন। নির্দেশনা দিয়ে আপনি আমার সঙ্গে চলুন...'

'স্যার, ফোর্সের জন্য অপেক্ষা করলে ভালো হতো না,' মোর্শেদের চোখে ভয় দেখতে পাচ্ছে শারিয়ার। কিন্তু তার প্রশ্ন শুনে চূড়ান্ত বিরক্ত হলো ও।

'নাহ, ভালো হবে না,' বলে জিপের ড্রাইভারকে নির্দেশনা দিতে ও হাতের ইশারায় দ্রুত মোর্শেদকে বলল। মোর্শেদ ড্রাইভারের সঙ্গে কাজ শেষ করে ফিরে আসতেই ও বাড়ির পথের দিকে রওয়ানা দিল। 'আমি সামনে হাঁটছি। আপনি আমাকে পেছন থেকে কভার করবেন,' বলে ও ব্যাকপ্যাক থেকে নিয়ে আসা টর্চ লাইটটা জ্বেলে ওটাকে বাঁ হাতে ধরে পিস্তলটাকে ডান হাতে রেখে দুটোকে সমান্তরালে ধরে এগোতে শুরু করল বাড়িটার দিকে।

রাস্তা থেকে খানিকটা ভেতরে এবং বলতে গেলে প্রায় পুরো এলাকাই অন্ধকারে ছেয়ে আছে কিন্তু দূর থেকে দেখেই শারিয়ার বুঝতে পারল বাড়িটা বিরাট। গজ বিশেক এগোতেই পায়ে চলা পথটার পাশে বাইকটাকে কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখল ওরা। একবার রাস্তার দিকে দেখে নিয়ে আরেকবার বাইকটাকে দেখল ও। টহল পুলিশ কেন বাইকটাকে এখানে খুব সহজেই দেখতে পেয়েছে এবার বুঝতে পারল ও। রাস্তা থেকে এদিকে আলো ফেললে যে-জায়গাটাতে আলো পড়বে ঠিক সেখানেই কাত হয়ে পড়ে আছে বাইকটা।

বাইকটাকে পার হয়ে মোর্শেদকে সাবধানে থাকতে বলে শারিয়ার আরো সাবধানে বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। বাড়ির গেটের কাছে গিয়ে দেখল বিরাট গেটটা সামান্য ফাঁক হয়ে খুলে আছে। কিন্তু কোনো জনমানুষের ছায়াও নেই। গেটের আরেকটু কাছে যেতেই চোখে পড়ল হলুদ রঙের ক্রাইম সিন, হলুদ টেপ ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে আছে।

ব্যাপার কী? কোনো মানুষ নেই কেন?

এরকম একটা বাড়িতে যেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটা বড়ো ঘটনা ঘটে গেছে কিছুদিন আগে সেখানে একটা লোক কিংবা একজন পুলিশও থাকবে না একেমন কথা। যদিও কথাটা মনে মনে ভাবল শারিয়ার। কিন্তু তার মনের কথাটা মুখ দিয়ে ফুটে বেরিয়ে এলো মোর্শেদের।

'স্যার, কোনো মানুষ নেই, একটা প্রাণী নেই...'

'সাবধান, মোর্শেদ,' বলে শারিয়ার সাবধানে এক হাতে ঠেলা দিয়ে গেটটা খুলে ফেলল। কচ কচ শব্দ করে গেটটা খানিকটা খুলে গিয়ে আটকে গেল। জোরে ঠেলা দিতেই ক্রাইম সিনের হলুদ টেপ ছিঁড়ে গেটটা পুরো ফাঁক হয়ে গেল ভেতরে। ভেতরে প্রবেশ করতেই মনের ভেতর থেকে আসা প্রথম প্রশ্নটার জবাব পেয়ে গেল ওরা। কোনো মানুষ কিংবা পাহারাদার নেই কেন।

কারণ, গেটের ঠিক ভেতরেই একটা টুলের পাশে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে এক পুলিশ কনস্টেবল। লোকটাকে দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল মোর্শেদ। তাকে কভার করে দাঁড়াল শারিয়ার।

'স্যার, কানের নিচে বাড়ি মেরে বেহুঁশ করা হয়েছে,' কনস্টেবলে মাথা তুলে ধরে মোর্শেদ বলে উঠল।

'অবস্থা কি বেশি খারাপ?' শারিয়ার জানতে চাইল কিন্তু সে আরো সতর্ক হয়ে উঠেছে। কারণ এই খোলা জায়গাতে নিজেকে একদম নিরাপদ মনে হচ্ছে না ওর।

'না, স্যার, তেমন কিছু...'

'আচ্ছা, যেভাবে আছে সেভাবেই শুইয়ে দাও। মাথার নিচে পারলে কিছু একটা দিয়ে দাও,' বলে দ্রুত সামনে এগোনোর ইশারা করল ও।

শারিয়ার মোর্শদকে নিয়ে বাড়ির মূল দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

বিরাট বাড়ি কিন্তু ভেতরে কারো নাম-নিশানাও নেই। তবে বাড়ির ভেতরে পরিবেশ দেখেই বোঝা যায় এই বাড়িতে অনেকদিন কেউ আসে না কিংবা বসবাস করেনা। কারণ বাড়িটা বিরাট আর ভেতরে আরাম আয়েশের ব্যবস্থাও একেবারে পাকা থাকলেও বেশিরভাগ আসবাব মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা।

নিচের ফ্লোরটা দুজন মিলে দ্রুত দেখে নিল। ভেতরে কেউই নেই।

'আমাদের নিচে যেতে হবে,' শারিয়ার মোর্শেদকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল। 'সম্ভবত বাড়ির বেইজমেন্টই লোকটা বাস করত।'

'জি, স্যার। আমি চিনি,' মোর্শেদের কথা শুনে খুব অবাক হলো শারিয়ার। 'স্যার, আমি কেসের কাজে এখানে এসেছিলাম।'

অতো ব্যাখ্যা শোনার সময় নেই। 'ঠিক আছে, পথ দেখাও।'

শারিয়াকে নিয়ে মোর্শেদ বাড়ির নিচ তলা থেকে বেরিয়ে এলো গ্যারেজে। সেখান থেকে ছোটো একটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো বাড়ির বেইজমেটেন্ট। ওপরে যদি অন্ধকার হয় তবে এখানে পৃথিবীর সব অন্ধকার যেন একসঙ্গে জমা হয়ে আছে। 'এখানে কোনো পাহারাদার ছিল না?' শারিয়ার জানতে চাইল।

মোর্শেদ স্রেফ একবার কাঁধ ঝাঁকাল। 'স্যার, ওই যে, দরজাটা, ওখানে একটা ছোটো কোয়ার্টার আছে ওখানেই থাকত লোকটা। শারিয়ার টর্চ আর পিস্তল বাগিয়ে স্টিলের একটা দরজার দিকে এগোল দুজনেই সেদিকে এগোচ্ছে। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ একজন ধমকে উঠল।

'হল্ট, এই কে তোমরা?'

শারিয়ার সোজা ঘুরে দাঁড়িয়ে পিস্তল আর টর্চ দুটোই একসঙ্গে তাক করল মানুষটার দিকে। মানুষটার হাতেও একটা টর্চ। দুজনেই বলতে গেলে প্রায় একই সময়ে দুজনের দিকে টর্চ তাক করল। ফলে মুহূর্তের ভেতরে চোখ ঝলসে গেল শারিয়ারের। ধমকে উঠে সে সাবধান করে দিল। প্রায় একইসঙ্গে লোকটাও ধমকে উঠে পিস্তল নামাতে বলল ওকে। শারিয়ার সাবধানে পিস্তলটা নামাতে শুরু করেছে এমন সময় তীব্র আঘাতের সঙ্গে চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল মোর্শেদ।

স্রেফ প্রবৃত্তির বশে অন্ধের মতো সামনের দিকে গুলি চালাল শারিয়ার।

অধ্যায় সতেরো

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

কাপসের হাট, চট্টগ্রাম

প্রবৃত্তি শব্দটার ওপরে কিরানের সবসময়ই অন্যরকম একটা ভরসা আছে।

একজন মানুষ গড়ে ওঠে তার শারীরিক সামর্থ আর বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ে। কিন্তু যেকোনো মানুষের সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার প্রবৃত্তি আসলে কতটা প্রখর সেটার ওপরে। কিরানের বাবার মতে প্রবৃত্তি হলো মানুষের সেসব সত্তাগুলোর একটি যা মানুষ একেবারে সৃষ্টির আদি থেকে নিজের ভেতরে লালন করে আসছে। কিরান নিজেও দেখেছে যুদ্ধের ময়দান থেকে শুরু করে বহু ক্ষেত্রে নিজের প্রবৃত্তি তাকে রক্ষা করছে বহুবার। ঠিক যে প্রবৃত্তির বলে আজ কাপসের হাটে প্রবেশ করার সময়ে প্রায় কোনো কারণ ছাড়াই কিরানের মনে হচ্ছিল, যদি কোনো কারণে এখান থেকে পালাতে হয় তবে পেছন দিক থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখাই ভালো। আর ঠিক একারণেই বেদুর লোকদেরকেও বাজারের পেছন দিকে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল ও।

হার্মাদ শব্দটা কানে যেতেই বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে দুজনেই। যেকোনো জায়গায় হার্মাদের আক্রমণ হলে কী হয় দুজনের কারোই অজানা নয়। হার্মাদরা প্রথমেই গণহারে চারপাশে লুটপাট চালায়, তারপর সবকিছুতে আগুন লাগায়, এরপরেই শুরু হয় সবচেয়ে বীভৎস ব্যাপার মানুষ শিকার। যাকে সামনে পাবে তাকেই ধরতে শুরু করবে ওরা। একটু বেশি বয়স্ক কিংবা দুর্বল যারা তাদেরকে গুলি করে মারবে আর না হয় তলোয়ার কিংবা লম্বা ছুরির খোঁচায় মেরে ফেলবে। কিশোর, তরুণ, যুবক-যুবতীরা হলো এদের মূল শিকার। ছেলে-মেয়ে সবাইকে পাইকারিহারে ধরতে শুরু করবে। কাউকে মেরে, কাউকে ধরে কাউকে চাবুক মেরে সবাইকে ধরে এনে এনে লাইনে দাঁড় করানো হবে গরু-ছাগলের মতো। ছেলেদের ওপরে চলতে থাকবে প্রকোপ মার, মেয়েদেরকে গণহারে ধর্ষণ। হার্মাদদের জন্য এদেশীয় কারো জন্য কোনো মায়া-দয়া নেই। নিজ দেশ থেকে বিতারিত, গুন্ডা-বদমাশ-চোর-বাটপার অপরাধী সব জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে জাকিয়ে বসেছে এদেশের মানুষের ওপরে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল কিন্তু সম্পদে

ভরপুর বাঙ্গাল মুল্লুক হলো এদের জন্য স্বর্গরাজ্য। ছেলে, মেয়ে সবার ওপরে দস্যুদের প্রাথমিক খায়েশ মেটানোর পর সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে লোহার শিক আগুনে গরম করে সবার হাতের পাঞ্জাতে ফুটো করে দেওয়া হবে। সেই ফুটোতে প্রবেশ করানো হবে নলখাগড়ার কঞ্চি। একেকটা কঞ্চিতে পাঁচজন থেকে শুরু করে দশজন পর্যন্ত ঢোকানো হবে। ঠিক যেভাবে এক দড়িতে আট-দশটা ছাগলের পাশ বেঁধে তাড়িয়ে নেওয়া হয় ঠিক তেমনি মানুষদেরকে পশুর পালের মতোই তাড়িয়ে নিয়ে ঢোকানো হবে নৌকা কিংবা জাহাজের খোলে। সেই জাহাজ চলে যাবে রোসাঙ্গ কিংবা হুগলির বাজারে, আবার কখনো কখনো জাভা কিংবা গোয়া পর্যন্ত। সেখানে মানুষ বেচাকেনার হাটে বিক্রি হবে এরা।

কিরান কিংবা বেদু দুজনেই নিজেরে ঘাত-প্রতিঘাতের জীবনে বহুবার দেখেছে এসব। কখনো প্রতিহত করেছে আবার কখনো প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিজেরাই বিকোতে বসেছে। তো দুজনেই জানে ঠিক ঠিক কী হবে। হার্মাদ শব্দটা কানে যেতেই দুজন সচকিত হয়ে উঠেছে অভ্যাসবশত। বেদু কিরানের হাত ধরে বলেউঠল, 'চলো ওস্তাদ।'

দুজনেই দৌড় দিল হাটের পেছনের দিকে। সেদিকেও ওদের লোকজন সব থাকার কথা। কিন্তু পথ চলতে গিয়ে দুজনেই পড়ল বিপদে। প্রথমেই একটানে চলে এলো বটগাছটার কাছে। সেখানকার প্রধান ঘাটেই হার্মাদদের মূল আক্রমণটা হয়েছে। কাজেই সেদিকে খানিকটা এগোতেই দেখতে পেল দুটো বড়ো বড়ো জালিয়া নৌকা ভেড়ানো হয়েছে বাজারের ঘাটে। আর সেটা থেকে টালে টালে বন্দুক, বর্শা আর তলোয়ার নিয়ে দস্যুরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে লোকজনের ওপরে। সেই সঙ্গে চলছে আগুন লাগানো। মানুষের আর্তনাদ, আগুনের উত্তাপ, আহত মানুষের আহাজারি আর মুহুর্মুহু গুলির শব্দে একটু আগের শান্ত, স্নিগ্ধ আর উত্তাপবিহীন জায়গাটাতে যেন নরক নেমে এসেছে।

কিরান আর বেদু দৌড়াতে দৌড়াতে কিরান হঠাৎ থেমে গেল। ও হার্মাদের নৌকা দুটো আর ওদের লোকজনের সংখ্যা নিরূপণ করার চেষ্টা করছে।

'ওস্তাদ, কি অইলো? থামলা ক্যান?' কিরানকে থেমে যেতে দেখে বেদু দৌড়াতে দৌড়াতে থেমে গেছে। বেদুর ডাক শুনে কিরান আবারও দৌড়াতে শুরু করল। বেদু কাপসের হাটের সঙ্গে খুব ভালোভাবে পরিচিত। তাই একের পর এক গলি ঘুপচি পার হয়ে ওরা চলে এলো বাজারের পেছন দিকের খালপাড়ে।

সেখানে পৌঁছেই দেখতে পেল বৈঠা তার ছেলেকে কোলে তুলে উদগ্রীব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাজারের দিকে। তার ঠিক পাশেই বিল্লাল আর গোমেজ। কিরানকে দেখতে পেয়ে তিনজনেই হাত তুলে ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

'ওস্তাদ তুমি ঠিক আছ?' বৈঠার এগিয়ে এলো ওদের দিকে। 'বাজারে হার্মাদ পলে আইছে?'

'আমি ঠিক আছি,' কিরানের কথা শুনে ঘোঁৎ করে খুশির একটা শব্দ করল গোমেজ। ওর একটা হাত ধরে টেনে নিতে লাগল নৌকার দিকে।

'একটু অপেক্ষা কর,' বলে ও বেদুকে দেখল বেদু তখন উদগ্রীব হয়ে তার নৌকা আর প্রাণীগুলোকে খুঁজছে। কিরান দেখল ওরা পেছনের ঘাটের কাছে একটা নৌকায় বসে আছে। মুখের ভেতরে আঙুল পুরে দিয়ে বেদুকে ইশারায় দেখাল ওরা কোনদিকে আছে। বেদু সঙ্গেসঙ্গে দৌড়ে রওয়ানা দিল ওদের দিকে। কিরান ওর লোকদেরকে নিয়ে সেদিকেই চলল।

'ওস্তাদ তুমি করতাছোডা কী?' বৈঠা নিজের ছেলেকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে কিরানের পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে।

'একটু অপেক্ষা কর,' কিরান ওদের নিয়ে বেদুর নৌকার কাছে গিয়ে হাতের ইশারায় বেদুকে ডাকল। 'বেদু, তোর জিনিসপত্র ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, ওস্তাদ।'

'তাইলে এদিকে আয়,' আমার একটা পরিকল্পনা আছে,' যদিও হাটের যেদিকটায় ওরা আছে সেদিকে হইহট্টগোল কম কিন্তু কোনোভাবেই পরিস্থিতি শান্ত বলার উপায় নেই। কিরান দেখল ওর দিকেই তাকিয়ে আছে ওর সঙ্গীরা। বুক ভরে দম নিল ও। এখন যা বলতে যাচ্ছে সে এবং যা করতে যাচ্ছে সেটাকে সফল করতে হলে ওর নিজের লোকদের সহায়তা দরকার হবে। তবে তার চেয়ে বেশি দরকার হলো নিজের লোকদের ভেতরে সেই সাহসিকতাটুকু জন্মানো যেটা ওর পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'সবাই মন দিয়া শুনবি,' বলে ও একে একে ওদেরকে দেখল। তারপর নিজের দৃষ্টি বেদুর ওপরে স্থির করে বলে উঠল, 'তুমরা এহানে যারা আছ সবাই আমার নিজের মানুষ। যে বড়ো কাম আমি, মানে আমরা মিলা করতে যাইতেছি সেটার জন্য আমাগো সব আছে কিন্তু একটা জিনিস নাই,' একথা বলে সে নিজের একটা হাত তুলল। 'তথ্য।'

ওর লোকেরা সবাই এখনো দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওরা এখনো বুঝতে পারছে না, এই মুহূর্তে এখান থেকে যখন পালানো দরকার সেখানে কিরান ওদেরকে দাঁড়িয়ে গল্প করছে কেন।

'আর আমার যে তথ্য দরকার সেই তথ্য একজন মাত্র মানুষই দিতে পারব,' বলে নিজেকে খানিকটা শুধরে নিয়ে বলে উঠল, 'মানে, একটা মাত্র গোত্রের লোকেরাই দিতে পারব,' বলে সে একটু থেমে বোমাটা ফাটাল, 'হার্মাদ। আর এই কারণেই আমি একজন হার্মাদরে ধইরা আনতে চাই,' ওর দলের সবাই চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

এমন কথা বাঙ্গাল মুল্লুকে এর আগে কেউ শুনেছে কিনা সেটাও ওদের জানা নেই। কারণ হার্মাদ, দস্যু, মগ এই শব্দগুলো এদের মাথার ভেতরে এমন ভীতিকরভাবে বসে গেছে যে, হার্মাদ মানেই জীবনের ভীতি, মগ মানেই পলায়ন। আর কিরান কিনা সেই হার্মাদদের একজনকে ধরে আনতে চাইছে। সেটা কীভাবে সম্ভব!

কিরান বুকের ওপরে থাকা ওর বাবার দেওয়া দোলকটা চেপে ধরে বিড় বিড় করে বলে উঠল, 'বুকের বলই সবচেয়ে বড়ো বল,' বিড় বিড় করে কথাটা বলেই সে বাকিদের উদ্দেশ্যে জোরে বলে উঠল, 'সবাই মন দিয়া শোন, আমি কী বলি।'

***

বেদুর পায়ের নিচে পড়ে ছোটো একটা ডাল ভেঙে মট করে সামান্য একটু শব্দ হতেই পাথরের মতো জমে গেল কিরান। হাতের ইশারায় তাকে সাবধানে এগোতে বলে আবারও ধীর পায়ে এগোল সামনের দিকে।

কিরানের গায়ের পোশাকের ভেজা জায়গাটা জলকাদায় মিশে কাল রং ধারণ করেছে। একইরকম আধভেজা কাপড় দিয়ে ওর মুখও বাঁধা। এক হাতে ছোটো একটা গাদা পিস্তল, অন্য হাতটা কোমরে রাখা ড্যাগারের বাটের ওপরে। দুটো জিনিসই এমনভাবে রাখা যেকোনো মুহূর্তে প্রয়োজন হলেই যেন বের করে আনতে পারে খুব সহজেই।

আরেকটু এগিয়ে সামনের দিকে এসে একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল কিরান। ওর পেছন পেছন এগোতে থাকা বেদু আর গোমেজকে হাতের ইশারায় থামতে বলল ও। বেদুর একটু কাছাকাছি মুখ নিয়ে ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'এই তোর কিচাক আর শায়ক হতাশ করব না তো?' কিরান বেদু বানর আর ইগলটার কথা জানতে চাইল।

জবাবে বেদু কিছু না বলে গাছের ওপরের দিকে ইশারা করল কিরানকে। ওপরের তাকিয়ে কিরান দেখতে পেল মাথা ওপরে ওদেরকে কেন্দ্র করে চক্কর দিচ্ছে ইগলটা। আর গাছের ডাল ধরে ঝুলছে বানরটা।

মনে মনে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিরান। কারণ অজানা জিনিসের ওপরে বাজি ধরার অভ্যাস নয় ওর। কিন্তু আজ হুট করে হার্মাদ ধরার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে ঠিক এই কাজটাই করতে হয়েছে ওকে। কিন্তু এখন এই দুটোকে দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক ভুল করেনি ও। বেদুর দিকে তাকিয়ে চোখে সন্তুষ্টির দৃষ্টি হেনে বুক ভরে দম নিল কিরান। ও যুদ্ধের ময়দান ছেড়েছে আজ বহু

বছর। কাজেই সেই উত্তেজনা এখন আর আগের মতো বুকের ভেতরে লালন করা হয় না আগের মতো। অনেকদিন পর কিরান যেন সেই যুদ্ধের উত্তেজনা বোধ করতে শুরু করেছে।

প্রথমে কাপসের হাটের পেছন দিকে কিরান যখন সবাইকে জানাল ও একজন হার্মাদ দস্যুকে অপহরণ করতে চায় এক সময় প্রথমে সবাই চমকে যায় তারপরে সবাই একযোগে প্রশ্নের বাণ ছুঁড়ে দিতে থাকে ওর দিকে শুধু বেদুর চোখে সে পুরনো সেই উত্তেজনা দেখতে পায় ও। আর অন্যদিকে গোমেজ দাঁড়িয়ে ছিল পাথরের মতো স্থির হয়ে। তার কোনো বিকার নেই, কিরান যদি ওকে বলে পাহাড় ভেঙে নিয়ে আসতে ও সেটাও চেষ্টা করে দেখবে, কোনো সন্দেহ নেই।

সবাই যখন তড় বড় করে প্রশ্ন করতে শুরু করে তখন কিরান প্রথমেই জানায় এই পরিকল্পনায় সবাইকে সে নিতে চায়না। শুধু বেদু গোমেজ আর বেদুর বানর আর ইগলটাকে লাগবে ওর। বৈঠা, বিল্লাল শেঠ, বেদুর সহচর মতি, বৈঠার ছেলে আর বাকিরা বেদুর বাঘটাকে নিয়ে এই মুহূর্তে রওয়ানা হয়ে যাক খণ্ডালের গুহার দিকে। কিরান রাতের বেলা জাহাজ ছাড়ার আগে ওখানেই দেখা করবে ওদের সঙ্গে।

কিরানের কথা শুনে বিল্লাল শেঠ খুশিই হয়। কারণ এসব ঝামেলায় তার পড়ার কোনো আগ্রহ নেই। অন্য দিকে বৈঠা একটু দনোমনো করলেও নিজের ছেলের কথা ভেবে সে রাজি হয় চলে যেতে। ওদেরকে বিদায় দিয়ে বেদু আর গোমেজকে কিরান পরিকল্পনার কথা খুলে বলে। ওর পরিকল্পনা খুবই সহজ। কিন্তু সময় আর পরিস্থিতির ওপরে অনেক কিছুই নির্ভর করছে। ওর পরিকল্পনাটা অনেকটা এমন; এখান থেকে ওদের নৌকোটা নিয়ে ওরা চলে যাবে বাজারের ঘাটের কাছাকাছি। সেখান যেকোনো এক পাড়ে নৌকাটাকে লুকিয়ে রেখে ওরা পানি থেকে বাজারের ঘাটে লুকিয়ে উঠে পড়বে। সেখানে উঠে হার্মাদের কার্যক্রম অবলোকন করবে। যদি ওখানে কোনো হার্মাদকে একা পেয়ে যায় তো তিনজনে মিলে ওটাকে কাবু করে নিজেদের নৌকায় তুলে চম্পট দিবে। আর যদি সেটা না হয় তবে হার্মাদদের লক্ষ করে ওখান থেকে ওরা হার্মাদদের যেকোনো নৌকা বা জাহাজে ওঠার চেষ্টা করবে।

লুটপাটের সময়ে সাধারণত হার্মাদরা নিজেদের মূল জাহাজে খুব বেশি মানুষ রাখে না। কাজেই ওখান থেকে কাউকে ধরে ওরা পানিতে নামবে অথবা কাউকে নিয়ে নৌকোতে করে চম্পট দেবে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা সফল করতে হলে বেদুর বানরটার সাহায্য লাগবে ওর।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ওরা প্রথমেই নিজেদের নৌকা নিয়ে ঘাটের পেছন দিক থেকে চলে আসে কাপসের হাটের মূল ঘাটের কাছাকাছি। সেখান থেকে হাটে উঠে

আশপাশে অবলোকন করে একটা হার্মাদকেও দেখতে পায় না। কিরান আবারও অনুধাবন করল এরা যতই অসভ্য আর জংলি হোক না কেন কঠিনভাবে নিয়ম মেনে চলে। এমনকি লুটপাটের সময়ও এরা কেউ একা হয় না, দলের সঙ্গে থাকে। এখানে কাজ হবে না, বুঝতে পেরে কিরান ওদের দুজনকে বুঝিয়ে দেয় ও হার্মাদের জাহাজে যাচ্ছে।

বড়ো করে নেওয়া দমটা ছেড়ে দিয়ে কিরান বেদুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আমি পানিতে নামব, পানিতে লাফ দিতেই তোরা নাও নিয়া রওনা দিবি ওদিকে,' বলে সে হার্মাদদের জালিয়া দুটোকে দেখাল। ওগুলার পেছনে কোনো একদিকে লুকিয়ে থাকবি তোরা। আমি যদি কোনো হার্মাদরে ধরতে পারি তবে তারে নিয়া পানিতে নামলেই তোরা উঠায়া নিবি আমগোরে,' বলে কিরান পানিতে নামার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল, কিন্তু বেদু ওর একটা হাত চেপে ধরতেই অবাক দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল সে বেদুর দিকে।

'কী ব্যাপার?'

'ওস্তাদ বেশি ঝুঁকি অয়া যাইতাছে না, তুমি তো জানো না জাহাজে কয়জন আছে?' কিরান কিছু না বলে হাতটা ধরে আশ্বাসের ভঙ্গিতে জোরে চাপ দিল। 'আগুনে ঝাঁপ দিতে অইলে তাপের ভয় কইরা লাভ নাই,' বলে সে বেদুর বানরটার দিকে তাকিয়ে বিশেষ একটা শব্দ করল মুখ দিয়ে। শব্দটা বেদুই ওকে শিখিয়ে দিয়েছে ওটাকে ডাকার জন্য। কিরান ইশারা করতেই ওটা নেমে এলো একেবারে ওদের কাছের ডালে। কিরান, বেদু আর গোমেজের দিকে তাকিয়ে বড়ো করে দম নিয়ে দক্ষ সাঁতারুর ভঙ্গিতে পাড়ের মাটি থেকে লাফ দিল পানিতে।

ঠাণ্ডা নোনা পানি ওকে গিলে নিতেই হাত-পা নেড়ে ডুবসাঁতার দিতে শুরু করল সে। এক টানে প্রায় সত্তর-আশি গজ পানি নিচ দিয়ে এসে মাথা তুলে দেখল অনেকটাই সরে এসেছে ঘাট থেকে। ওর কাছেই সাঁতরাচ্ছে বেদুর বানরটা। মনে-মনে খুশি হয়ে উঠল ও, প্রাণীটা যথেষ্ট বুদ্ধিমান। বড়ো করে দম নিয়ে আবারও ডুব দিল ও। এবার লক্ষ্য, হার্মাদদের জাহাজের কাছে পৌছানো।

আরেকবার লম্বা ডুব দিয়ে এবার স্বাভাবিকভাবে সাঁতার কাটতে লাগল। হাত-পা পানিতে চললেও কিরানের মাথা চলছে একেবারেই ভিন্ন দিকে। অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়েছে ও। প্রথমত, পর্তুগিজরা অসাধারণ জাহাজি হলেও পানিতে সাঁতারের ব্যাপারে ওরা একেবারেই অদক্ষ, বিশেষ করে একবার পানিতে পড়ে গেলে ওরা শেষ। কাজেই কোনো দস্যুকে একবার কুপোকাত করে পানিতে ফেলে দিতে পারলে, কেল্লা ফতে। অন্যদিকে, আরেকটা বড়ো ব্যাপার হলো, হার্মাদরা যখন কোথাও লুটপাট চালাতে যায় তখন সাধারণত জাহাজে তেমন কাউকে রেখে যায় না। কারণ লুটপাটে অংশ নিতে চায় সবাই। আর একারণেই ওদের জাহাজে

পাহারাদার কিংবা রাঁধুনি ছাড়া তেমন কেউ থাকে না। আর কিরানেরও উদ্দেশ্য তেমন কাউকে কাবু করে ধরে নিয়ে যাওয়া। কারণ ওর যে-তথ্য দরকার সেটা পেতে বড়ো কোনো দস্যুর দরকার নেই। তবে ওর পরিকল্পনায় বিরাট একটা ফাঁক হলো, কোনো দস্যুকে ধরতে গেলে সে যদি একবার বন্দুক চালিয়ে দিতে পারে মানে তার সঙ্গীদেরকে খবর দিয়ে দিতে পারে তবেই খবর আছে পুরো দল তখন ওদের পিছু লাগবে।

কিরান বেশি ভাবার সময় পেল না। হার্মাদদের জালিয়ার কাছাকাছি এসে আবারও ডুব দিল ও পানিতে। এক সাঁতারে একেবারে জাহাজের গোড়ায় গিয়ে মুখ তুলল ও। কোমর থেকে ছুরি বের করে দাঁতে কামড়ে ধরল। কারণ একবার জাহাজের পাটাতনে উঠলে কী অবস্থায় পড়বে সে নিজেও জানে না। জাহাজের কাছাকাছি এসে ওটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল কিরান। এক জায়গায় একটা দড়ির দঙ্গল ঝুলতে দেখে প্রথমে বানরটাকে ইশারা করল ও। ওর ইশারা পেয়েই তরতড়িয়ে উঠতে শুরু করল ওটা। কিরান মনে মনে বেদুর প্রসংশা না করে পারল না। প্রাণীগুলোকে এমন প্রশিক্ষণ দিয়েছে, ইশারায় অনেক কিছু বুঝে ফেলে এরা। এবার ওকে উঠতে হবে। ওপরে কী পরিস্থিতি কে জানে।

***

কিরান পানিতে নেমে যেতেই বেদু একবার ইশারা করল গোমেজের দিকে। এখন ওদেরকে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করতে হবে। কিরান যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছে সেভাবে যদি ওরা কাজ করতে না পারে তবে পুরো ব্যাপারটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। জলার দিকে এগোতে এগোতে আড়চোখে একবার গোমেজকে দেখে নিল বেদু। এই লোকটার সঙ্গে তার কোনোদিনই সখ্যতা গড়ে ওঠেনি। এমনকি যখন কিরানের সঙ্গে জাহাজে কাজ করততখনো গোমেজকে এড়িয়েই চলত ও। এর পেছনে একটা বড়ো কারণ গোমেজের সাদা চামড়া। বেদু আজও বুঝতে পারেনি একটা সাদা চামড়ার মানুষ কীভাবে কালো মানুষদের সঙ্গে এভাবে ভিড়ে গেল। বিশেষ করে বেদু যতখানি জানে পর্তুগিজরা ভীষণ ধর্মভীরু হয়। সেই ধর্মভীরু একটা খ্রিস্টান এভাবে একদল হিন্দু আর মুসলমানের সঙ্গে থাকে— ব্যাপারটা যে দেখে সেই অবিশ্বাসের সঙ্গে অবলোকন করে। তার ওপরে আরেকটা বড়ো ব্যাপার হলো, এই লোকটাকে মাঝে মাঝে তার একেবারে শিশুর মতো লাগে আবার কখনো কখনো ভীষণ ভয় করে। বেদু নিজে অত্যন্ত শক্তিশালী গড়নের মানুষ। নিজ গোত্রের ভেতরে সে আজ অবধি এমন কোনো মানুষ পায়নি যে কিনা শারীরিক শক্তিতে তার সঙ্গে পেরে ওঠে। কিন্তু এই গোমেজকে দেখলে ওর নিজেকে কেন জানি ভীষণ দুর্বল আর অসহায় মনে হয়।

'গোমেজ এই দিকে,' তাকে তুই, তুমি নাকি আপনি বলবে ঠিক বুঝতে পারছে না বেদু। বরং সে তাকে হাতের ইশারায় তার সঙ্গে এগোতে বলল। গোমেজ কিছু না বলে নিজের হাতের লম্বা লাঠিটা দুবার ঘুরিয়ে ওর পিছু পিছু আসতে লাগল। আরেকবার অবাক হয়ে বেদু ভাবতে লাগল এরকম বিরাট আকৃতির একটা লোক কীভাবে এতটা নিঃশব্দে চলতে পারে।

ওরা মূল বাজার আর তার হট্টগোলকে পাশ কাটিয়ে খুব সাবধানে পানির ধারাকে অনুসরণ করে জলার ঘাটের দিকে এগিয়ে চলল, সেখানে ওদের নাও বাঁধা আছে। ওরা এখন যেখানে যেভাবে যাচ্ছে তাতে করে যেকোনো সময় কারো চোখে পড়ে যেতে পারে। বিশেষ করে হার্মাদদের কারো চোখে পড়লেই ওরা সোজা গুলি করবে আর না হয় দল বেঁধে তেড়ে আসবে ওদের দিকে। কিন্তু প্রায় নির্বিঘ্নেই ঘাটের কাছাকাছি এসে পৌঁছাতে পারল ওরা।

ঘাটের কাছে এসে ওদের নৌকোটাকে দেখে খুশিতে অদ্ভুত এক শব্দ করে উঠল গোমেজ। 'গোমেজ, আমি নৌকার দিকে আগাইতাছি, তুই নৌকার দড়িটা খুলে দিবি। বুঝছোস?' বেদু প্রশ্ন করতেই প্রায় নিঃশব্দে গোমেজ সেদিকে রওনাদিল যেখানে নৌকার দড়িটা বাঁধা আছে। বেদু খুশি মনে এগোল নৌকার দিকে। গোমেজ নৌকার দড়ি খুলে দিয়ে বৈঠা হাতে বেদু নৌকাটাকে ঘুরিয়ে দিতেই গোমেজ লাফিয়ে লাফিয়ে নৌকার কাছাকাছিপৌঁছে গেছে এমন সময় হঠাৎ ওদের নৌকাটা টান খেয়ে স্থির হয়ে গেল। দুজনেই একসঙ্গে ফিরে তাকিয়েহৈ দেখতে পেল কেউ একজন ওদের নৌকার দড়ি টেনে ধরেছে। সেটাও অতো বড়ো কোনো সমস্যা হতো না। কিন্তু নৌকার দড়ি টেনে ধরার সঙ্গেসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে লোকটা। আর ঘাটের ওপর থেকে একদল দস্যু দৌড়ে আসছে ওদের ধরার জন্য। সর্বনাশ,' আপনাতেই কথাটা বেদুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

***

ড্যাগারটাকে দাঁতে কামড়ে ধরে জাহাজে ওঠার দড়ির গোছাটাকে বেশ শক্ত হাতে ধরে ফেলল কিরান। কিন্তু ওটা বেয়ে উঠতে গিয়ে একটু অবাক হয়ে সে লক্ষ্য করল তার হাত চলছে না। দড়িটাকে আকড়ে ধরে নিজেকে স্থির করে ফেলল ও। বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে নিজের দম ফিরে পাবার চেষ্টা করতে লাগল সে। কিন্তু অবাক হয়ে গেল নিজের অবস্থা দেখে। বহু বছর যুদ্ধের ময়দানে, পানিতে,জাহাজে কাটানো যে মানুষটা আজ থেকে বছর কয়েক আগে হারিয়ে গিয়েছিল বিগত চার বছরের জীবনের নানা চড়াই-উৎতরাইয়ের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সে মানুষটার ভেতরটা কতটা ক্ষয় হয়ে গেছে তারই প্রমাণ যেন ওর এই অবস্থা। বহু বছরের

অনভ্যস্ততায় পানিতে কিছুদূরে সাঁতরেই দম হারিয়ে ফেলেছে ও। কিছুক্ষণ চুপ চাপ ঝুলে থেকে দম নিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করল ও। জাহাজের পাটাতনের কাছাকাছি পৌঁছে শরীরটাকে একবার দোল খাইয়ে সাবধানে পাটাতনের ওপাশ থেকে উঁকি দিল ও।

পাটাতনে একটা প্রাণীরও অস্তিত্ব নেই। ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এলো কিরান। বলতে গেলে প্রায় নিঃশব্দে জাহাজের ডেকের ওপরে নেমে দুপাশে চোখ বুলাল। কেউই নেই। ড্যাগারটাকে কোমরে গুঁজে পানিতে ভেজা পিস্তলটাকে হাতে নিয়ে এলো। জিনিসটা কোনো কাজের না, কিন্তু যে দেখবে সে তো আর সেটা জানে না। কাজেই এই বুদ্ধিতেই পিস্তলটাকে নিয়ে এসেছে ও।

যদিও এ ধরনের জালিয়া জাহাজের আকৃতির ব্যাপারে বেশ ভালো ধারণা আছে কিরানের কিন্তু তবুও সে একবার ভালোভাবে পরখ করে নিল চারপাশটা। কিরান অনুমান করল কমপক্ষে ছাব্বিশ দাড়ির জাহাজ হবে এটা। আবার ওপরে পাশের ব্যবস্থাও আছে। মাঝখানে বিরাট মাস্তুলের সঙ্গে ভাঁজ করা পাল আর দড়িদড়া ঝুলছে। জাহাজের একপাশ থেকে শুরু হয়েছে লোকেদের থাকার কামরা। সেটার ওপরে আবার ছোটো একটা ঘর। ওখান থেকেই শুরু করবে কিরান মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল।

'চল এখন পুরো জাহাজটা চক্কর দিতে হবে,' কথাটা সে বানরটার উদ্দেশ্যে ইশারা করে জাহজের খোলের দিকে রওনা দিল। কিন্তু বানরটা সাহায্য করার বদলে এদিকে ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। ওটাকে সামান্য ধমক দিয়ে কিরান চলে এলো জাহাজের একপাশে খোলের দিকে। প্রথমে যে কামরাটায় প্রবেশ করল সেটা জাহাজের রসুইঘর। কিরান ভেতরে ঢুকে চোখের পলক বুলিয়ে নিয়ে ও অন্য দিকে সরে যাবে তার আগেই রসুইয়ের পাশের দরজা খটখট শব্দে খুলে গেল।

কিরান চট করে একপাশে সরে গেল, ওর পিস্তল ধরা হাতটা ভাঁজ করা। কিন্তু অন্য হাতটা ড্যাগারের বাঁটের ওপরে। কিরান দম বন্ধ করে একপাশে স্থির হয়ে রইল। এখনো জানে না কে এসেছে ভেতরে। কোনো দস্যু হতেও পরে আবার হয়তো সাধারণ কোনো কাজের লোক। কাজেই কে আছে ওখানে নিশ্চিত না হয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে মোটেই আগ্রহী নয় ও। কিন্তু সেটা আর পূরণ হলো না।

কারণ কিরান সময়মতো সরে পড়তে পারলে ওর সঙ্গে নিয়ে আসা বানরটা খাবার পরিবেশনের চৌপায়ার ওপরে এমনভাবে বসেছিল ওটা না পারল সরতে, না কিরান পারল ওটাকে ইশারা করে সরাতে। পাশের দরজা দিয়ে যেই প্রবেশ করে থাকুক চৌপায়ার ওপরে বানরটাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল আর বানরটা ভয় পেয়ে

ঝুলতে ঝুলতে কামরার বাইরে দিকে রওনা মনে মনে কিরান খুশিই হলো। যে উদ্দেশ্যে বানরটাকে নিয়ে এসেছিল সেটা পূরণ না করে বরং ভেজাল লাগানোতে কিরান খানিকটা বিরক্তই হয়েছিল কিন্তু ওটার কারণে লোকটা বেরিয়ে যাওয়াতে খুশি হয়ে উঠল ও। কারণ লোকটা চেঁচিয়ে উঠেছে পর্তুগিজ ভাষায়। দ্বিতীয়ত, লোকটা বাইরে চলে গেলে পাটাতনের ওপরে ওটাকে কাবু করতে যেমন সুবিধা হবে ঠিক তেমনি ওটাকে পানিতে নামাতেও সুবিধা হবে। লোকটা বানরটার পিছু পিছু বেরিয়ে যেতেই কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল কিরান। তারপর বেরিয়ে এলো দরজার আড়াল থেকে।

বাইরে এসেই দেখতে পেল ডেকের ওপরে লোকটা বানরটার দিকে পিস্তল তাক করেছে। পেছন থেকে জোরে চেঁচিয়ে উঠে নিজের পিস্তল তুলল এবং সঙ্গেসঙ্গে বোকা বনে গেল। ডেকের ওপরে আরেক দস্যু খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দেখতেই পায়নি কিরান।

একজনের সঙ্গে লড়াই করা এক জিনিস আর দুজনার সঙ্গে লড়াই করে একটাকে নিকেশ করে অন্যটাকে বন্দি করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আপনাতেই মুখটা হা হয়ে গেল কিরানের।

***

বেদু আর গোমেজের উদ্দেশ্য ছিল যতটা সম্ভব কারো নজরে না পড়ে দ্রুত গতিতে নৌকা নিয়ে সরে পড়া। কিন্তু বাস্তবে ঘটে গেল একেবারে ভিন্ন ঘটনা। তাও আবার ব্যাপারটা ঘটল পুরোপুরি ভাগ্যের দোষে। যদি ব্যাপারটা নিজেদের দোষেও ঘটত তাও হয়তো ওরা নিজেদের খানিকটা সান্ত্বনা দিত। কিন্তু এভাবে স্রেফ ভাগ্যের দোষে ব্যাপারটা ঘটাতে বেদুর ইচ্ছে করছে নিজের চুল ছিঁড়তে।

আসলে ঘটনা ঘটেছে কিরান পানিতে লাফ দেওয়ার পর বেদু আর গোমেজ যখন লোকচক্ষুর অন্তরালে সন্তর্পণে ঘাটের দিকে এগোচ্ছে নৌকা আনার জন্য ঠিক তখুনি বাজারের ভেতরে এক দল লোককে তাড়া করেছে হার্মাদরা। সেই লোকগুলো তাড়া খেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ঘাটে এসে দেখে ঘাট থেকে একটা নৌকা ছাড়ছে। বেশির ভাগ নৌকাই যখন হয় হার্মাদরা ফুটো করে ফেলেছে আর না হয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে সেখানে আস্ত একটা নৌকা দেখে ওরা বাঁচার আশায় সেটা বেঁধে রাখা দড়ি ধরে টানতে শুরু করে। ঠিক একই সময়ে পলায়নরত লোকগুলোর পিছু নিয়ে পৌঁছায় একদল দস্যু। ওরাই এখন এদের পিছু নিয়েছে। সবমিলিয়ে ত্রাহি অবস্থায় পড়ে গেছে গোমেজ আর বেদু।

ব্যাপারটার সমাধান যে খুব জটিল তা কিন্তু না। তবে যে সমাধান বেদুর মাথায় এসেছে সেটা বাস্তবায়ন করতে বেদুর মন টানছে না। কারণ যে মানুষগুলো ওদের নৌকোতে উঠতে চাইছে তারাও বিপদে পড়েই কাজটা করছে। সমাধানটা হলো, ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে দেওয়া। লোকগুলো যে দড়িটা ধরে নৌকো টানছে সেই দড়িটা গোড়া থেকে কেটে দিলেই আর কেউ সেটা ধরতেও পারবে না আর নৌকাটাও মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানেই বেদুর মনটা আটকে গেছে। এতে করে ওরা পালাতে পারবে কিন্তু ধরা পড়ে যাবে লোকগুলো।

পাড়ে দাঁড়ানো লোকগুলো এবার দড়ি ধরে টানতে শুরু করেছে। ফলে নৌকোটা খোলা পানি দিক না গিয়ে উল্টো আবারও ঘাটের দিকে যেতে শুরু করল। গোমেজ আঁতকে উঠে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে বেদুর দিকে তাকিয়ে আছে। কী করবে সে জানতে চাইছে। উপায় না দেখে বেদু কোমরের কাছ থেকে ছুরিটা বের করে আনল। এখনো সে দড়িটা কেটে দিতে চাইছে না। একজনও যদি বাঁচে তাতেও তো একজন মানুষ হার্মাদদের হাত থেকে বাঁচল। কিন্তু সে তো আর জানে না ভবিতব্যে লেখা ছিল ভিন্ন কিছু।

লোকগুলো চিৎকার চেঁচামেচি করে দড়ি টানতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে ঘাটের ওপরে থাকা হার্মাদরা পৌঁছে গেছে ঘাটের কাছে। লোকগুলোকে রেঞ্জের মধ্যে পেয়েই একজন গুলি চালাল। কারো গায়ে না লাগলেও একেবারে বেদুর কাছাকাছি একটা বুলেট নৌকোর খানিকটা ছাল-চামড়া উঠিয়ে দিয়ে চলে গেল। এবার আর বেদুর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করল না গোমেজ। সে টানতে থাকা দড়িটার গোড়া ধরে ফেলল তারপর পা দুটো নৌকোর খোলের সঙ্গে শক্ত কর চেপে ধরে উল্টো টান মারল। দড়িটা ধরে টানছিল তিনজনে। গোমেজের ভীষণ শক্তিশালী টানে তিনজনই উল্টো পড়ে গেল পানিতে। নৌকাটা বাঁধন মুক্ত হতেই বেদু বৈঠা হাতে ওটাকে ঘোরাতে শুরু করে দিল। আর ওপার থেকে আরো দুটো গুলি ছুটে এলো নৌকার দিকে। দড়ি টেনে তুলে নিয়ে নৌকার ওপরে রেখেই গোমেজ নৌকাটাকে টেনে সরানোর লাঠিটা তুলে দিয়ে ওটাকে সর্বশক্তিতে ঠেলে দিতে লাগল।

পরবর্তী কয়েক মিনিট চোখে-মুখে কিছু না দেখে টানা স্রেফ নৌকো বেয়ে গেল দুজনে। মোটামুটি ঘাট আর হার্মাদের আয়ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে নৌকা বাইতে বাইতে ফিরে তাকাল ওরা দুজনে।

স্বস্তির সঙ্গে দেখল যা হয়েছে ভালো হয়েছে। পাড়ে দাঁড়ানো লোকগুলোর ভেতরে তিনজনে পানিতে পড়ে যাওয়াতে ওরাও সাঁতরে সরে পড়তে পেরেছে। বেদু হাসি মুখে ফিরে তাকাল গোমেজের দিকে। কিন্তু গোমেজের মুখে হাসি নেই।

সে মাইল দুয়েক দূরে দাঁড় করিয়ে রাখা জালিয়া দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে। নিজেরা তো কোনোমতে ঘাট থেকে পালাতে পেরেছে কিন্তু ওখানে কিরানের কী অবস্থা কে জানে।

***

কিরানের অবস্থা কাহিল। একইসঙ্গে একটা নয়, দুই-দুটো হার্মাদকে সামলাতে হচ্ছে ওর এই মুহূর্তে। কিরান জীবনে বহু জায়গায় বহু ধরনের শত্রুর মোকাবেলা করেছে। কখনো একা, আবার কখনো দলগতভাবে কিন্তু জীবনে কখনো ওকে একাই দুটো ফিরিঙ্গির মোকাবেলা করতে হবে তাও আবার একটা বানর আর একটা ইগল পাখিকে নিয়ে এমনটা কোনোদিন ওর কল্পনাতেও আসেনি।

একটু আগে ফিরিঙ্গিটাকে অনুসরণ করে জাহাজের খোলা জায়গাটাতে এসে পেছন থেকে ওর ভেজা নষ্ট পিস্তলটা তাক করতেই সে দেখতে পায় বিপরীত দিক থেকেও আরেকজন বন্দুক তাক করে আছে। কিন্তু ঘাবড়ে না গিয়ে বরং সে চেহারাটাকে শক্ত করে হেসে উঠে ভাঙা পর্তুগিজ দুজনকেই হাত তুলে দাঁড়াতে বলে, সেই সঙ্গে এটাও জানায় যদি ওর কথা না শোনে তবে খুলি উড়িয়ে দেবে সে। যে ফিরিঙ্গিটাকে অনুসরণ করে কিরান ডেকের ওপরে এসেছে ওর হাতের পিস্তল আর অভিব্যক্তি দেখে ভয়ে দুই হাত তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে বন্দুক তুলে থাকা ফিরিঙ্গি নিজের বুন্দকটাকে আরেকটু ওপরে তুলে ধরে কিরানকে দেখিয়ে অন্য ফিরিঙ্গিটাকে কিছু একটা বলে। কথাটা শুনতে পায়না কিরান। কিন্তু এটা বুঝতে পারে লোকটা কথাটা শুনেই ওর পিস্তল থেকে ঝরতে থাকা পানির দিকে তাকিয়ে হাত দুটো নামিয়ে নেয়। কিরানের মুখ শুকিয়ে যায়। কারণ ও বুঝতে পারে জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখে সে। চট করে একপাশে সরে যায় কিরান। এর ফলে বিপরীত দিক থেকে চাইলেও বন্দুক হাতের ফিরিঙ্গি ওকে গুলি করতে পারবে না। মাঝখানের জনের গায়ে লাগতে পারে তাতে। একপাশে সরে এসেই সে ডেকের ওপরে এক গড়ান দিয়ে এগিয়ে এসে প্রথম ফিরিঙ্গির দুই হাত চেপে ধরে কুস্তির কায়দায় শরীরটাকে খানিকটা বাঁকিয়ে কাত করে ফেলে একপাশে। এই লোকটাকে আরেকটু সরাতে পারলে একে নিয়ে দ্বিতীয়টার গায়ের ওপরে ফেলাই ওর উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা করার আগেই আটকে গেল সে।

ফিরিঙ্গিটা কিরানের হঠাৎ আঘাতে খানিকটা চমকে উঠলেও নিজেকে সামলে নিয়ে চট করে ধরে ফেলে কিরানকে। লম্বা চওড়া লোকটা কিরানকে ধরে ফেলেই বাচ্চাদের মতো তুলে ফেলে সরিয়ে দেয় একপাশে। বিশালদেহী ফিরিঙ্গির এক

ধাক্কায় পাটাতনের ওপরে পড়ে যায় কিরান। ওকে পড়ে যেতে দেখেই এগিয়ে এসে ওর পাঁজর বরাবর বুট পরা পায়ে সর্বশক্তি দিয়ে দুটো লাথি মারে লোকটা। সেই সঙ্গে মুখে ছুটছে গালির তুবড়ি। এই সুযোগে তার দ্বিতীয় সঙ্গী এগিয়ে এসে বন্দুক তোলে ওর দিকে। কিন্তু প্রথম জন তাকে থামিয়ে হড়বড়িয়ে কিছু একটা বলতে থাকে।

আঘাতের চোটে দিব্যলোকে তারা দেখতে পেলেও কিরান ওদের কথোপকথনে বুঝতে পারে ওকে মেরে ফেলতে মানা করছে। তাতে কারো লাভ নেই। বরং ওকে দাস হিসেবে বন্দি করতেই বেশি আগ্রহী প্রথম জন। কিরান কোনোমতে নিজেকে বাঁকিয়ে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ল ডেকের ওপরে।

ওকে সোজা হতে দেখে একজন এগিয়ে এসে ওর ঘাড় ধরতে চইছিল কিন্তু কাছাকাছি আসতেই পায়ে পা বাঁধিয়ে ল্যাং মারল ওকে কিরান। লোকটা পড়ে যেতেই তার গায়ের ওপরে গড়ান দিয়ে লাফিয়ে সোজা হলো ও। দ্বিতীয় জন আয়ত্তের মধ্যেই ছিল, তার বন্দুকের নলটা এক হাতে ধরে ওটাকে ওপরের দিকে উঠিয়ে দিল। সেই সঙ্গে লোকটার হাতে চাপ পড়ে কিরানের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল উত্তপ্ত সিসা। কিন্তু ধাক্কার চোটে বন্দুকটা ছুটে গিয়ে কিরানের হাতে চলে এলো।

পাটাতনের ওপরে সোজা হয়ে দাঁড়াল প্রথমজন। দুইপাশে দুই দস্যু, আর মাঝখানে খালি বন্দুক হাতে কিরান। প্রথম জন তার কোমর থেকে বের করে আনল ছোটো একটা তরবারি। লোকটাকে ওটা বার করতে দেখে হেসে উঠল কিরান। 'এমনটাই তো চাই,' বলে সে শিস বাজাল।

ওর শিসের শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই শূন্যে উদয় হলো ইগল পাখিটা। তরবারি হাতের লোকটার মাথার ওপরে ছোবল দেয়ার ভঙ্গিতে আচড় কাটল সেই সঙ্গে তার মুখের ওপরে চড়ে বসল বানরটা। এই সুযোগে কিরান হাতের খালি বন্দুকটাকে দুবার পাক খায়িয়ে ওটার বাট বসিয়ে দিল দ্বিতীয় দস্যুর খুলিতে।

তীব্র আঘাতে ফিরিঙ্গিটা গড়িয়ে পড়ে যেতেই কিরান হাচড়ে পাচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল মানুষ আর দুই প্রাণীর যুদ্ধ ততক্ষণে তুঙ্গে উঠেছে। আড়চোখে দেখল একটা নৌকা এগিয়ে আসছে জাহাজের দিকে। সেই সঙ্গে হট্টগোল বাড়ছে পাড়ের দিকে। খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে ও জোরে শিস বাজাল। পাখিটা সরে যেতেই এক দৌড়ে লোকটাকে জাপটে ধরে লাফ দিল পানিতে।

পানিতে পড়ার সঙ্গেসঙ্গে দুটো মানুষ আর একটা বানরকে যেন গিলে নিল নোনা ঠাণ্ডা পানি। কিরান পানিতে পড়েই ডুবসাঁতার দিল লোকটার দিকে। খানিকটা সাঁতরে ও চলে এলো মানুষটার পায়ের দিকে। ফিরিঙ্গিটাকে আরেকটু টেনে পানির নিচে নামাতেই ব্যাটা হাতের তলোয়ার ছেড়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা

করতে লাগল। লোকটাকে আরো খানিকটা চেপে রাখতে পারলেই জ্ঞান হারাত কিন্তু দম হারিয়ে কিরানের মনে হলো ও নিজেই জ্ঞান হারাবে। কোনোমতে নিজেকে টেনে পানির ওপরে এনে দম নিতে লাগল ও। স্রোতের ধাক্কায় কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পাশ থেকে শক্ত কিছু একটা ওর গলা পেঁচিয়ে ধরে আবারও টেনে নিল পানির নিচে। দস্যুটা চেপে ধরেছে ওকে। কিরান ইচ্ছে করেই পানির নিচে নামার চেষ্টা করল কিন্তু দস্যুটাও যেন নিয়ত করছে ওকে ছাড়বে না। লোকটার শক্ত হাতের চাপে যেন বুকের হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিরান বুঝতে পারছে আর একটু সময় এভাবে চললে জ্ঞান হারাবে। জিতে যাবে লোকটা।

হঠাৎ গলা থেকে লোকটা হাতের চাপ আলগা হয়ে গেল। ক্লান্তি ব্যথা আর পানির টানে টুপ করে ডুবে যেত অর্ধচেতন কিরান কিন্তু শক্ত এক জোড়া হাত ওকে টেনে নৌকায় তুলে ফেলল। নৌকায় উঠে কিরানের মনে হতে লাগল অনন্তকাল ধরে যেনে শুধু বাতাসই টেনে চলেছে বুকের ভেতরে।

একটু ধাতস্থ হয়ে উঠে বসে ও দেখতে পেল নৌকার একপাশে বসে নিজের বিরাট দুই হাতে ভিম বেগে বৈঠা চালাচ্ছে গোমেজ। আর ঠিক তার পাশেই বসে একহাতে নিজের ইগলটাকে কিছু একটা খাওয়াচ্ছে বেদু আর তার পাশেই গলুইয়ের ওপরে বসে কলা খাচ্ছে বানরটা। ওকে উঠে বসতে দেখে কিচকিচ করে খুশির শব্দ করল ওটা। কথা বলতে না পারলেও হাতের ইশারায় কিরান জানতে চাইল যেটার জন্য এত হাঙ্গামা ওটা কই।

ইশারায় বেদু নিচের দিকে দেখাল। নৌকার পাটাতনের নিচে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে ব্যাটাকে। আবারও নৌকার রেলিংয়ের সঙ্গে হেলান দিল ও। ক্লান্তিতে চোখ ভেঙে আসতে চাইছে কিন্তু ওকে কথা বলতে হবে ওই দস্যুটার সঙ্গে। ও উঠে বসে বেদুকে ডেকে বুঝিয়ে দিল কী করতে হবে। ও নিজে নৌকার হাল ধরে বসে রইল। বেদু আর গোমেজকে পাঠাল নৌকার অন্যপাশে দস্যুটার সঙ্গে কথা বলার জন্য। কিরান দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখল কাপসের হাট অনেক দূরে সরে গিয়ে ছোটো বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। আগুন জ্বলতে থাকা লালচে একটা বিন্দু।

সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর যে মানুষগুলো পরিবার-পরিজনের জন্য তার কষ্টে অর্জিত অর্থে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিয়ে যেত, আনন্দে মশগুল হতো পরিবারের সান্নিধ্যে, বিশ্রাম নিত, ভালোবাসত, স্নেহ-মমতায় ভরিয়ে তুলত জীবন, একদল দানবের থাবায় সেই সহজ-সরল মানুষগুলো আর কোনোদিন ফিরে যাবে না পরিবারের কাছে। অপেক্ষা করতে করতে একসময় পরিবারের লোকেরাও হয়তো ভুলে যাবে তাদের। কোনো এক অলস দুপুরে হয়তো কোনো গাঁয়ের বধূ মনে করবে তার হারানো স্বামীর কথা। মাঝ রাত্রিতে নিজের স্নেহময় সন্তানের কথা মনে

করে হয়তো কোনো মায়ের ঘুম ভেঙে যাবে। যে সন্তানকে সে ভালোবাসা আর স্নেহ দিয়ে ভরিয়ে তুলতে চাইবে। কিন্তু সেই সন্তান হয়তো তখন দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে গেছে অজানা-অচেনা কোনো বাজারে। গায়ের বধূ যখন মনে করবে তার হারানো স্বামীর কথা সে তখন হয়তো নিজের সাধ্যের চেয়ে অনেক বেশি শ্রম দিচ্ছে আরাকানের কোনো ফসলের মাঠে- বিনা অপনজনে, আপনজনের ভালোবাসা, সেবা-যত্ন ছাড়াই সেখানে হয়তো পরিজনবিহীন পরিবেশে মৃত্যু হবে তার। আর এ-জন্য দায়ী থাকবে স্রেফ কিছু দানবের লালসা।

নিজের ভাবনার জগতে পুরোপুরি হারিয়ে যেতে বসেছিল কিরান। কিন্তু হঠাৎ বেদু ফিরে এলো। তার চেহারা দেখেই কিরান বুঝল খারাপ কোনো খবর আছে। 'কী ব্যাপার?'

'চুকচুক,' মুখ দিয়ে বিশেষ শব্দ করে ইগলটাকে উড়িয়ে দিল বেদু। 'ওস্তাদ, ব্যাটা বহুত ঘেড়েল মাল। প্রথমে কিছু বলবেই না। তারপর টানা কয়েকবার গেমেজের হাতের শক্ত মার খেয়ে কথা বলেছে। ওর কাছে বহুত খবর আছে। সব বাইর করা যায় নাই।'

'এ-জন্যই এত ঝুঁকি নিয়েও ওকে ধরে এনেছি। কারণ এদের কাছে সিলভেরার ব্যাপারে তথ্য থাকতে বাধ্য। রাতে জাহাজ ছাড়ার পর ওকে শক্ত করে ধরব।'

'কিন্তু এখন বিশেষ একটা খবর আছে,' বলে বেদু একটু থেমে যোগ করল। 'ওরা কাপসের বাজারে হামলা চালাইতে আসে নাই। ওরা দুইটা জাহাজে কইরা একটা বিশেষ জায়গাতে যাইতেছিল। এর মধ্যে একটা জাহাজের কাপ্তান কাপসের বাজারের ধোঁয়া দেইখা এদিকে আসে। এইডা আসলে অগো মূল পরিকল্পনায় আছিল না।'

'ওরা যাইতাছিল কই?' কিরান চিন্তিত মুখে জানতে চাইল।

'দাঁড়াও দেহাই,' বলে বেদু হাতের খড়ি দিয়ে নৌকার পাটাতনে একটা ম্যাপের মতো এঁকে দেখাল। ওরা রওনা দিয়েছে সন্দ্বীপ থাইকা। এটা হইলো কাপসের বাজার। আর ওরা যাইতেছিল এহনে,' বলে সে ছোটো একটা বিন্দু দেখাল। 'জাগাডার নাম নুনের ভিটা।'

'কী আছে ওইখানে?'

'ওইখানে ওরা যাইতাছিল একজন মানুষরে ধইরা আনতে,' বলে বেদু থেমে কিরানের দিকে তাকিয়ে যোগ করল, 'গোলন্দাজ রঙ্গন।'

কিরানের মনে হলো ওর শরীরে সব লোম দাঁড়িয়ে গেছে। 'তাইলে তাইলে,' ওর মুখ দিয়ে কথা সরছে না।

'ওই ব্যাটার কথায় যা বুঝলাম,' বলে সে নৌকার অন্যদিকে থাকা ফিরিঙ্গিটাকে দেখাল। 'সিলভেরার সরাসরি নির্দেশে না হলেও তারই কোনো লোকের নির্দেশে বিশেষ অভিযানে নামার আগে ওগোর খুব ভালা কিছু কামাঞ্চি দরকার ছিল। আর সে-জন্যই গোলন্দাজরে ধইরা আনতে ওরা অইদিকে...'

'তারমানে সিলভেরার খবরডা ভুয়া না,' কিরানের দৃষ্টি পাথরের মতো স্থির। 'তারমানে ওরাও আমগো মতোই অভিযানে নামতাছে। কিন্তু অভিযান পরে। আগে গোলন্দাজরে বাঁচাইতে হবে,' বলে সে বেদুর দিকে ফিরে তাকিয়ে জানতে চাইল 'তুই চিনোস জায়গাডা? যেহানে ও থাহে পরিবারসহ? যেকোনো উপায়ে কি এহান থাইকা জলদি যাওয়া সম্ভব?'

'চিনি কিন্তু অগো আগে তো ওইহানে পৌঁছানো মনে অয় না সম্ভব অইবো,' বেদু মনে মনে হিসেব করছে। 'একটা রাস্তা আছে। ওরা তো বড় জাহাজ নিয়া যাইতাছে গতি বেশি হইলেও ওগো ঘুরা পথে যাইতে অইবো। কিন্তু আমরা নৌকা নিয়া যদি

বেদুকে কথা শেষ করতে দিল না কিরান। 'ওইটাই ধর। আগে গোলন্দাজরে বাঁচাইতে হবে। আগে কী হইছিলো সেইটা বিষয় না, ওরে বাঁচানো আমাগো দায়িত্ব,' বলে সে নৌকার হালটা বেদুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিল। 'যেহান দিয়া কম সময়ে যাওয়া যাবে, ওইদিক দিয়াই চল।'

অধ্যায় আঠারো

বর্তমান সময়

পতেঙ্গা রোড, চট্টগ্রাম

আর্মির ট্রেনিং থেকে শুরু করে অন্যান্য নানা ধরনের ট্রেনিংসহ মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা শারিয়ারের একেবারে কম নয়।

কিছু ক্ষেত্রে মাথা গরম করে একাধিক ভুলভাল করা বাদ দিলে মাঠ পর্যায়ে তার পারফরমেন্স বেশ ভালো। কিন্তু নিজের কর্মক্ষেত্রের পরিধি খুব দীর্ঘ না হলেও এই স্বল্প সময়ে একটা ব্যাপার শারিয়ার অনুধাবন করেছে ট্রেনিং হোক আর অভিজ্ঞতা হোক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারগুলো আসলে একজন ফিল্ড অপারেটিভকে স্রেফ তার কাজে সহায়তা করতে পারে। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। মাঠ পর্যায়ে যখন কাজে নামতে হয় সূত্র জোড়া লাগিয়ে কোনো একটা রহস্যের সমাধান হোক, নিজের ইনফর্মারদের মাঠে নামিয়ে কাউকে খুঁজে বের করা হোক কিংবা কেউ যখন আপনার দিকে পিস্তল তাক করে আছে সেখানে নিজেকে বাঁচানোই হোক, বেলা শেষে এই সবকিছুই নির্ভর করে একজন মানুষের নিজের বুদ্ধিমত্তার ওপরে। আর সেই বুদ্ধিমত্তাকে ধারালো করে তোলে যে ব্যাপারটা সেটা হলো, নিজের ইন্সটিঙ্কট।

অন্ধকার বাড়ির বেইজমেন্টে দাঁড়ানো অবস্থায় যে মুহূর্তে এসআই মোর্শেদ আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল সেই মুহূর্তে শারিয়ারের মনে হলো যে ভীষণ পরিস্থিতিতে সে পড়েছে সেটা থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হলো তার নিজের ইন্সটিঙ্কট। তাই এক সেকেন্ডের মধ্যে সে হাতের টর্চটাকে বন্ধ করে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শারিয়ার যেখানটাতে আছে সেই জায়গাটাতে তেমন কোনো আড়াল নেই। শত্রুর নজর অন্যদিকে সরাতে হবে। কাজেই মাটিতে শুয়ে পড়তে পড়তে সে পিস্তল থেকে সম্ভাব্য আক্রমণকারীর উদ্দেশে একটা গুলি ছুড়ে দিল। বদ্ধ বেইজমেন্টে শব্দ হলো প্রায় বাজ পড়ার মতো।

মাটিতে শুয়ে শারিয়ার প্রথমেই দ্রুত মোর্শেদকে পরীক্ষা করে নিল। ছেলেটার জ্ঞান নেই। ওকে সরাতে হবে। শোয়া অবস্থাতেই ছেলেটাকে জাপটে ধরে একপাশে দেয়ালের দিকে সরে এলো। যেহেতু মাটিতে শুয়ে পড়ার সময়ে শারিয়ার

গুলি ছুড়েছে কাজেই আক্রমণকারী ওর অবস্থান খুব ভালোভাবেই জানে। এই সুবিধা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে হবে। তা-না হলে বিপদে পড়তে হবে শারিয়ারকে।

মোর্শেদকে দেয়ালের কাছে সরিয়ে এনে দেয়ালের সঙ্গে লম্বালম্বি শুইয়ে দিল ও। এতে করে ছেলেটা নিরাপদ থাকবে, গুলি লাগার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যাবে, সেই সঙ্গে হঠাৎ জ্ঞান ফিরে এলেও ছেলেটার বিপদে পড়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। মোর্শেদকে শুইয়ে দিয়েই দ্রুত বেগে ছেলেটার দেহ পরীক্ষা করে ফেলল ও। পিস্তল আর ওয়াকিটকিটা নিয়ে নিল ওর থেকে। পিস্তলটা পরীক্ষা করে কোমরে রেখে দিল। আর ওয়াকিটকিটা বন্ধ করে কোমরে বেল্টের সঙ্গে আটকে দিল। কারণ ওটা শব্দ করে উঠলে বিপদ হতে পারে। মোটামুটি মিনিট খানেকের ভেতরে দ্রুত কাজগুলো সেরেই নিজের পিস্তলটাকে বাগিয়ে ধরে এবার আশপাশে ফিরে তাকাল শারিয়ার। এবার তাকে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে।

অবস্থানগত দিক থেকে সে খুবই বাজে জায়গায় আছে। কারণ যেখানে সে আছে সেই জায়গাটা একে তো অন্ধকার তার ওপরে অচেনা। তার ওপরে শত্রু কে ওর জানা নেই। কিন্তু ওর ব্যাপারে শত্রুর পরিষ্কার ধারণা আছে বলেই মনে হচ্ছে। তবে একটা ব্যাপার তাকে খানিকটা অবাক এবং খুশি করেছে, মোর্শেদকে আঘাত করা হয়েছে কিছু একটা দিয়ে কিন্তু তাকে গুলি করা হয়নি। এর মানে শত্রু যে বা যারাই হোক অন্তত ওদেরকে মেরে ফেলতে চাইছে না। পিস্তল বাগিয়ে ধরে শারিয়ার দেয়ালের ধার ঘেঁষে এগোল। যে-বাঁকটার কাছ ঘেঁষে ওরা ভেতরের দিকে ছিল সেটা ধরে বাইরে বেরিয়ে এলো ও। পিস্তল আর টর্চ দুটোই প্রস্তুত আছে।

বাঁকটা ঘুরে সরে আসতেই শারিয়ার দেখল বেইজমেন্টের এই অংশটা একটু হলেও আলোকিত। বাইরে কোথাও থেকে খুব আবছা আলো আসছে। সেই আবছা আলোতে পরিষ্কার দেখতে পেল দ্রুত গতিতে একটা ছায়া সরে গেল বেইজমেন্টের অন্যদিকে। ওদিকে এগোতে যাবে তার আগেই হুঁশহুঁশ শব্দে কিছু একটা চলে গেল ওর মাথা আর কানের পাশ দিয়ে। জিনিসটা কি বুঝে ওঠার আগেই কানের ওপরে জ্বালা ধরা তীব্র আঘাতে মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল ওর। না চাইতেই আপনাতেও উফফ করে শব্দ করে উঠল শারিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু একইরকম জিনিস ছুটে এলো ওর দিকে। হাতে আর পায়ে শক্ত আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ও। এখান থেকে এই মুহূর্তে না সরতে পারলে খবর আছে ওর। শোয়া অবস্থাতেই মাটিতে এক গড়ান দিয়ে সরে গেল পার্ক করে রাখা একটা গাড়ির আড়ালে। টর্চটাকে মাটির ওপরে রেখে আঘাত লাগা জায়গাটা খানিকটা ডলে নিল ও। তীব্র জ্বালাধরা এক ধরনের ব্যথা করছে ওর, তবে গুরুতর কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না।

চট করে বিপরীত দিক থেকে একটা ছায়া নড়তে দেখল ও। টর্চ তুলে নিয়ে শরীরটাকে সামান্য ঘুরিয়ে সেদিকে তাক করে আলো জ্বেলে দিল। সেই সঙ্গে পিস্তল তুলল গুলি করার উদ্দেশে। কিন্তু গুলি করা আগেই সে দেখতে পেল ঝড়ের বেগে কেউ একজন বাউলি কেটে ভেতরে সরে গেল। সরে যাওয়ার আগে আবারও হুঁশহুঁশ করে ছুটে এলো সেই অদ্ভুত জিনিসগুলো। অদ্ভুত সেই জিনিসগুলোর আঘাতে তীব্র বাড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল টর্চটা সেই সঙ্গে অন্যহাতের তালুর উল্টো দিকে আঘাত খেয়ে আরেকটু হলে ওর হাত থেকে পিস্তলটা ছুটে যাচ্ছিল কিন্তু কোনোমতে ওটাকে সামলে নিয়ে আবারও গাড়ির আড়ালে বসে পড়ল সে।

পিস্তলটাকে মাটিতে রেখে ব্যথা পাওয়া হাতটা চেপে ধরল অন্যহাতে। তীব্র ব্যথায় মনে হচ্ছে ওর হাতের হাড় ফেটে গেছে। হচ্ছেটা কি এখানে, সেটাই বুঝতে পারছে না ও। রাগে আর ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল শারিয়ার। সেটার জবাব হিসেবে বেইজমেন্টের অপর দিকে থেকে ভেসে এলো হাসির শব্দ। রাগে আরো গায়ে জ্বালা ধরে গেল শারিয়ারের। সে পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারল তাকে নিয়ে রীতিমতো খেলছে ওর শত্রু।

ব্যথা পাওয়া হাতটা চেপে ধরে রেখেই আশপাশে দেখে নিল আরেকবার। কিছুক্ষণ ধরে অন্ধকারে থাকার কারণে এতক্ষণে অন্ধকার খানিকটা সয়ে আসতে শুরু করেছে ওর চোখে। মাথাটাকে গাড়ির এক পাশ থেকে উঁচু করে পুরো বেইজমেন্টে আবছাভাবে চোখ বুলিয়ে নিল ও।

বিরাট বাড়িটার প্রায় পুরো নিচের অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে বেইজমেন্টটা। আকৃতি খানিকটা ইংরেজি অক্ষর এল শেইপের। ও আর মোর্শেদ যেদিক থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেদিক দিয়ে আরেকটু বামে গেলে ওখানে একটা কোয়ার্টারের মতো আছে। ওটার বিপরীত দিকেই মোর্শেদকে শুইয়ে রেখে এসেছে। কিন্তু ওর শত্রু লোকটা কোনদিকে আছে এটা বুঝতে পারছে না। তবে অনুমান করতে পারে যেদিকে বেশ কয়েকটা গাড়ি রাখা আছে, সম্ভবত সেদিকেই আছে লোকটা। আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মনে মনে একটা পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলল ও। এখানে বসে থাকলে কিছুই হবে না। তার চেয়ে দেখা যাক কাজ হয় কিনা।

হঠাৎ গাড়ির আড়াল ছেড়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো ও। সেখান থেকে এক গড়ান দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পিস্তল তুলল সম্ভাব্য শত্রুর উদ্দেশে। কিন্তু কোনো নড়া চড়া চোখে পড়ল না। আর এই সুযোগে সে উঠে দাঁড়িয়ে এগোতে শুরু করল লোকটার সম্ভাব্য অবস্থানের দিকে। দুই পা এগোনোর আগেই হাঁটুতে তীব্র আঘাতে মাটিতে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ও। নাক আর চোয়াল ভীষণভাবে ঠুকে গেল বেইজমেন্টের মেঝের সঙ্গে, হাত থেকে ছুটে গেল পিস্তলটা।

এত ব্যথা পেয়েছে যে, ক্ষণিকের জন্য শারিয়ারের মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে সে। কিন্তু পিস্তলটা হাত থেকে ছুটে গেছে সেটা ভাবতেই মাথা ঝাড়া দিয়ে বাউলি কেটে ওটার দিকে এগোনোর চেষ্টা করল ও। কিন্তু পিস্তলটা পর্যন্ত ওর হাত পৌঁছানোর আগেই দেখতে পেল। একটা ছায়া ছুটে আসছে ওটার দিকে। সমস্ত সামর্থ এক করে শোয়া অবস্থা থেকেই ডাইভ দিল শারিয়ার। সে আর লোকটা দুজনারই হাত একসঙ্গে পড়ল পিস্তলটার ওপরে। দুজনেই দুজনকে ধরে ফেলল।

পলকের জন্য শারিয়ারের দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল লোকটার ওপরে। আবছা অন্ধকারে সেই মঙ্গলয়েড ধাঁচের চেহারাটার ওপরে খানিকক্ষণের জন্য স্থির হয়ে রইতেই রাগে চিড়বিড় করে উঠল শারিয়ার। 'শালা ভুয়া,' বলে রাগের সঙ্গে খোলা বাঁ হাতে ঘুসি মারল সে লোকটার চোয়ালে। ঘুসিটা লেগে পিছলে গেল একদিকে কিন্তু লোকটা ওর হাত কিংবা পিস্তল ছাড়ল না। বরং ভীষণ শক্তিতে সেটাকে আরো জোরে চেপে ধরল। পিস্তল আর হাতের ওপরে জোরে টান পড়তেই দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তুকেউ কারো হাত ছাড়েনি। এবার পা চালাল শারিয়ার। লোকটার পায়ের সঙ্গে পা লেগে তীব্র ব্যথায় চোখে আবারও আঁধার দেখল।

দুজনেরই হাত ছুটে গেল পিস্তলটা থেকে। দুজনেই খানিকটা তফাতে সরে গেল। খটখট শব্দ তুলে পিস্তলটা সরে গেল খানিকটা। শারিয়ার গড়ান দিয়ে সরে যাবে কিন্তু তার আগেই লোকটা তার হাত নাড়ল সেই সঙ্গেকিছু এসে বাড়ি মারল শারিয়ারের নাকে-মুখে। তীব্র ব্যথায় উঁবু হয়ে গেল ও। এই সুযোগে লোকটা এগিয়ে এসে মাটি থেকে দ্রুত বেগে তুলে নিল পিস্তলটা। ওটাকে ওর দিকে তাক করে চিৎকার বলে উঠল, 'হল্ট,' বলে এগিয়ে এলো শারিয়ারের দিকে। পেছন থেকে জোর পায়ে লাথি মারল ওকে, তারপর রাগের সঙ্গে বলে উঠল, 'শালা আমি ভুয়া, তবে তুই কী?'

ব্যথা আর রাগের সঙ্গে শারিয়ার এমনিতেই চোখে অন্ধকার দেখছিল লোকটার লাথি খেয়ে একেবারে কুঁকড়ে যেতেই ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে মোর্শেদের পিস্তলটা।

একদিকে ওকে পড়ে যেতে দেখে অন্যদিকে ওর পিস্তলটা হাতিয়ে নিয়ে লোকটা খুব খুশি হয়ে উঠেছিল কিন্তু শারিয়ারকে পিস্তল হাতে ঘুরতে দেখে এতটাই অবাক হলো যে, হাতের পিস্তলটা তুলতেই ভুলে গেল।

পিস্তল হাতে সামান্য ঘুরে গেলেও শারিয়ার মুহূর্তের জন্য দ্বিধান্বিত বোধ করল গুলি করবে কি করবে না সেটা নিয়ে। অন্য দিকে লোকটাও একটু দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছিল কিন্তু শারিয়ারকে পিস্তল তুলতে দেখে সেও ট্রিগার টিপে দিল।

বলতে গেলে প্রায় একই সময়ে দুটো পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে এলো। দুই অস্ত্র থেকেই বুলেট ছুটে গেল লক্ষ্যের দিকে। দুজনেই পড়ে গেল গুলি খেয়ে।

শারিয়ারের মনে হতে লাগল বুকের ওপরে একটা লম্বা পেরেক দিয়ে কেউ মেঝের সঙ্গে গেঁথে ফেলেছে ওকে। বুলেট প্রুফ জ্যাকেটের ওপরে আঘাত করা বুলেট চেপে বসেছে ফুসফুসের ওপরে। কয়েক মিনিট নীরবে দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করল, তারপর কোনোমতে উঠে বসল।

অন্য লোকটাকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখেছে ও। তাই সেদিক থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা করছে না ও, তবুও কোনো ঝুঁকির ভেতরে যাওয়া যাবে না। কোনোমতে উঠে বসে আগে পিস্তলের খোঁজ করল। মোর্শেদের পিস্তলটা ওর কাছেই পড়ে আছে। সেটাকে তুলে নিয়ে ধোঁয়া বেরুতে থাকা বুকের ফুটোতে হাত বুলাল। ভেস্টের ওপরে আটকে থাকা বুলেটটা হাতে লাগল। পাটোয়ারির ভেস্ট কাজে দিয়েছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে পড়ে থাকা দেহটার কাছে গিয়ে হাতে ধরে মানুষটাকে সোজা করে দিল।

পিস্তল তাক করে পরীক্ষা করতে যাবে তার আগেই লোকটার বুট পরা পায়ের লাথিতে ওর হাতের পিস্তলটা উড়ে গেল। তাজ্জব হয়ে শারিয়ার দেখল একটু আগে গুলি খাওয়া লোকটা স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর আরেকটা দুই মণ ওজনের লাথি ছুড়ে দিল ওর বুকের ওপরে। লাথিটা খেয়ে শারিয়ারের মনে হলো, আঘাত পাওয়া বুকের সব বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে। শরীরটা বাঁকা হয়ে গেল প্রায় সঙ্গেসঙ্গে। গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো তীব্র চিৎকার।

ওকে বাঁকা হয়ে যেতে দেখে লোকটা এগিয়ে এসে কলার চেপে ধরে সোজা করে গলায় বলে উঠল, 'গুলি খেয়ে কেউ এভাবে...'

শারিয়ার লোকটার কবজি ধরে ফেলল। তারপর শরীরটাকে বলের মতো ঘুরিয়ে কবজি ধরা হাতটাকে নিয়ে এলো নিজের শরীরের নিচের অংশে। সেটাতে জোরে চাপ দিতেই তীব্র আর্তনাদ করে লোকটা বসে পড়ল মাটিতে। হাসি ফুটেউঠল শারিয়ারের মুখে। কিন্তু তার হাসি মুছে গেল মুহূর্তের ভেতরেই। লোকটা খোলা হাত দিয়ে ওর পায়ের কবজি চেপে ধরে টান মারল। সঙ্গেসঙ্গে দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে।

শারিয়ার উঠে দাঁড়াল চট করে। লোকটাও উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে দুই প্রতিপক্ষ মুখোমুখি।

'স্বীকার করছি,' লোকটার বাংলা কথায় কেমন জানি অদ্ভুত একটা টান। 'গত কয়েক বছরে এরকম ত্যাঁদড় কারো সঙ্গে লড়াই করিনি আমি।'

'আমিও না,' মাথাটা সামান্য নেড়ে স্বীকার করার ভঙ্গিতে নেড়েই আক্রমণ চালায় শারিয়ার। এই লোকের সঙ্গে কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে আগ্রহী না ও। বাঁয় পাটাকে সামান্য নেড়ে ডান পায়ে ডাবল কিক চালাল ও। প্রথমটা লোকটার কোমরে, আর দ্বিতীয়টা তার কানের ওপরে লাগল। আঘাত খেয়েও খুব সহজেই শারিয়ারের পা ধরে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এসে ধরে ফেলল ওর একটা

হাত। কিন্তু এটাই ছিল শারিয়ারের ট্র্যাপ। লোকটা ওর হাত ধরতেই অপর হাতে লোকটার হাতটা ধরে ফেলল শারিয়ার, ফলে ওর দুই হাতের ভেতরে বন্দি হয়ে গেল মানুষটার হাত। শরীরেটাকে ঘুরিয়ে সামান্য মোচড় দিয়েই লোকটাও ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে মাটিতে পড়তে শুরু করল। কিন্তু পড়ার সময়ে সেও দক্ষতার সঙ্গে খপ করে ধওে ফেলল শারিয়ারের কলার ফলে দুজনেই প্রায় একই সময়ে একই গতিতে মাটির দিকে রওয়ানা দিল।

লোকটা মাটিতে পড়ল সোজা। তার মুখের একপাশ বাড়ি খেল বেইজমেন্ট। আর শারিয়ারের শরীরটা বাড়ি খেল একটা গাড়ির বনেটের ওপরে তারপর আছড়ে পড়ল মাটিতে।

দুজনেই পাশাপাশি মাটিতে পড়ে আছে। কারো ওঠার শক্তি নেই।

জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে লোকটা বলে উঠল, 'দুনিয়ার যে ক্রিমিনাল অথরিটি এই কমব্যাট ট্রেনিং দেয় তাদের সঙ্গে কাজ করব আমি। দুনিয়ার সেরা কমান্ডো ট্রেনিংয়েও এই জিনিস শিখতে পারিনি আমি,' দম হারিয়ে হাঁপাতে লাগল সে।

শারিয়ারের মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর একসঙ্গে ব্যথা করছে। কোনোমতে সে বলে উঠল। 'ইংল্যান্ডের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর জার্মান পুলিশের একটা স্পেশাল ট্রেনিংয়ে শেখানো হয় এই জিনিস। আরো দুটো লাগলে বলতে পার,' একটা ধারণা মাথার ভেতরে পাকিয়ে উঠতে শুরু করেছে ওর। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই আবারও লোকটা কথা বলে উঠল।

'আপনি... আপনি বাই এনি চান্স, শারিয়ার স্যার নন তো?' বলে সে উঠে বসতে বসতে যোগ করল, 'হায় খোদা আপনি আমাকে আক্রমণ করতে গেলেন কেন...'

মুখ দিয়ে ফুঁ নিয়ে ধুলো উড়িয়ে শারিয়ার উঠে বসতে গিয়ে ওপরে গেল। 'শালা মাদারটোস্ট, কে রে তুই?' ও উঠে বসতে গিয়ে আবারও পড়ে গেল।

বসা অবস্থাতেই ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটা। 'স্যার আমি ভুবন। আজ সন্ধ্যে থেকে আপনাকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছি,' বলে সে শারিয়ারকে টেনে বসিয়ে দিল। 'স্যার, আমি কি পাসকোড বলব?'

'ধুর তোর বালের পাসকোড,' শারিয়ার উঠে বসেছে। 'ওই বালের কোড এখন সবাই জানে। 'আচ্ছা, আমি বুঝলাম আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। কিন্তু বাইরে গার্ডদেরকে মেরেছ কেন?'

যদিও অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না তবুও শারিয়ারের মনে হলো ছেলেটা খুবই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'স্যার, আমি ওদের কিছু করিনি। আমি যখন এখানে আসি দেখি ওরা ইতিমধ্যে কেউ মেরে অজ্ঞান করে রেখেছে। তাইতো আমি... আমি কিন্তু আপনাদের ওপরে আগে...'

বেইজমেন্টর অন্যদিকে যেদিকে মোর্শেদকে রেখে এসেছিল সেদিক থেকে কারো আওয়াজ ভেসে এলো। 'মোর্শেদ, ও আমার সঙ্গে এসেছিল, নিশ্চয়ই...' শারিয়ার হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। কাছেই পিস্তল পড়ে ছিল সেটা তুলে নিয়ে ভুবনকে উঠে আসতে ইশারা করর। ভুবন উঠে দাঁড়িয়ে ওর একটা হাত চেপে ধরল।

শারিয়ার অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে তাকাল। সে অস্ত্র হাতে শারিয়ারকে ইশারায় বলে উঠল, 'স্যার আমিও গার্ডদের মারিনি, আপনিও না। তাহলে কে করল কাজটা? কেউ না কেউ আজ রাতে আমাদের ট্র্যাপ...' ভুবন কথা শেষ করার আগেই আবার কেউ একজন চিৎকার করে উঠল।

দুজনেই যার যার অস্ত্র বাগিয়ে রওনা দিল সেদিকে। যদিও তেমন আলো নেই কিন্তু এখন আলো জ্বালাটা ঝুঁকিপূর্ণ। ওরা দুজনেই বেইজমেন্টের কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে দেখতে পেল মোর্শেদ দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে হাঁপাচ্ছে।

'মোর্শেদ তুমি ঠিক আছ?' শারিয়ার জানতে চাইল।

মোর্শেদ মাথা নাড়ল। তার হাতে মোবাইল আর সেটাকে টর্চের আলো জ্বলছে। 'স্যার, আপনি ঠিক?' বলে সে বিধ্বস্ত চেহারার শারিয়ার আর তার সঙ্গের ভুবনকে দেখছে। সে প্রশ্নটা করে জবাবের অপেক্ষায় না থেকে বেইজমেন্টের কোয়ার্টারের দরজাটা দেখাল। 'স্যার, ওইটার ভেতরে কেউ আছে,' তার দৃষ্টিতে ভয়।

'মানে?' শারিয়ার খুব অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'স্যার, আমার যখন জ্ঞান ফিরলো দেখি কেউ একজন পা টিপে টিপে এদিকে এসে ওইখানে ঢুকল। একবার ভাবলাম আপনারে ডাকব তারপর যে আওয়াজ পাইলাম ওই দিকে সাহস হলো না। তাই লোকটা ভেতরে ঢুকতেই ওই দরজাটা বাইরে থেইকা লাগায় দিসি। ভেতরে যে আছে, সে এখন আটকা পড়ছে।'

'সাব্বাস,' মনে মনে খুশি হয়ে উঠল শারিয়ার। অপচয়ের এই দিনে এবার মনে হচ্ছে কাজের মতো একটা কাজ হয়েছে। সে মোর্শেদকে আলোটা ধরতে বলে ভুবনকে ইশারায় সেদিকে এগোতে বলল। দুজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দরজাটার দিকে। স্টিলের একটা দরজা, বাইরে থেকে স্টিলের ছিটকানি লাগানো।

শারিয়ার ভুবনকে কভার করতে বলে নিজে হাত দিল ছিটকানিতে। সাবধানে প্রায় নিঃশব্দে খুলে ফেলল ওটাকে। ভেবেছিল ওটাকে খুলতেই ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে কেউ। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। ভুবনকে ইশারা করে এক দুই তিন বলে দরজাটাকে হাতের ইশারায় খুলে দিল শারিয়ার। দুজনেই একে অপরকে কভার করে সাবধানে ভেতরে প্রবেশ করল। ভেতরে একটা টেবিল ল্যাম্পের মতো ল্যাম্পে মৃদু আলো জ্বলছে। সেই আলোতে ওরা দেখতে পেল কোয়ার্টারটা বেশ বড়োই। অনেকটা স্টুডিওর মতো।

শুরুতে ঢুকতেই একপাশে কাপড় রাখার আর খাবার জন্য ডায়নিংয়ের মতো ব্যবস্থা। তারপরেই শুরু হয়েছে বিরাট আকারের একটা স্টাডির মতো। দেয়ালজোড়া সারি সারি বইয়ের তাক। আর তারপরেই একটা বিরাট টেবিল। একেবারে শেষ মাথায় একটা কট, আর ওটার সঙ্গে ওয়ার্ডরোব। কিন্তু এসবের দিকে কারো নজর নেই।

দুজনেই হা করে তাকিয়ে আছে বিরাট টেবিলটার ওপরে লাগানো দুই পাশের দেয়ালজোড়া বিরাট বিরাট আকারের বোর্ড দুটোর ওপরে। ও দুটোর ওপরে অসংখ্য ছবি, ম্যানুস্ক্রিপ্ট, পেপার কাটিং, ম্যাপ, গ্রাফ আর জ্যামিতিক প্যাটার্নসহ আরো কতো কি যে আটকানো।

'সর্বনাশ, আইনস্টাইন থাকত নাকি এখানে?' শারিয়ারের পেছন থেকে অবাক হয়ে জানতে চাইলভুবন। শারিয়ারও অবাক হয়ে বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ওদের পেছনে ফপ করে শব্দ হয়ে কিছু একটা জ্বলে উঠল। ভুবনকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে শারিয়ার যখন অস্ত্র তাক করল সেদিকে পরিষ্কার দেখতে পেল সন্ধ্যের সেই সাদা শার্ট পরা নকল ভুবন কিছু একটায় আগুন ধরিয়ে ছুড়ে দিল এদিকে। চিন্তা না করেই গুলি চালাল শারিয়ার।

স্পিরিটি জ্বলা ল্যাম্পটা শূন্যে থাকতে বিস্ফোরিত হলো মলোটভ ককটেলের মতো। সঙ্গেসঙ্গে আগুন ধরে গেল বই আর কাগজপত্রের মধ্যে। আগুনের ভাপ সামলাতে মুখ চেপে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়ল শারিয়ার। তারপর পিস্তল তুলে সাদা শার্টকে আর দেখতে পেল না। কিন্তু আবারও ওর চোখ গেল মাটিতে ওখানে একটা ছোটো কেরোসিন স্টোভের একপাশেলাগানো একটা সলতেতে আগুন দেখতে পেয়ে যা বোঝার বুঝে গেল ও। ভুবনকে একটা টানে তুলে ধরে লাফ দিল দরজার দিকে।

প্রায় একই সঙ্গে দুজনে লাফিয়ে পড়ল কামরাটা থেকে। বিস্ফোরণে ধাক্কায় কেঁপে উঠল পুরো বেইজমেন্ট।

মাটিতে শুয়ে নিজেকে আগুনের হলকা থেকে বাঁচাতে বাঁচাতে শারিয়ারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'পুরাই টোস্ট বানায়া দিল।'

অধ্যায় ঊনিশ

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

দক্ষিণ উপকূলের সমুদ্র, চট্টগ্রাম

গোলন্দাজ রঙ্গন মল্লিক ওরফে যাকে সবাই গোলন্দাজ বলে ডাকে সে ছিল মোঘল জাহাজ বাহিনীর সেরা কামাঞ্চি। গোলন্দাজ মল্লিককে বুঝতে হলে আগে কামাঞ্চি এবং বাঙ্গাল মুল্লুকে নৌবাহিনীর ব্যাপারটা বোঝা খুবই জরুরি। এই মুল্লুকে পর্তুগিজদের আগমন অনেক আগে হলেও তারা এদেশে বাণিজ্য ঘাঁটি নির্মাণ করতে পারেনি। এই সুযোগটা তারা পায় হুসেন শাহী বংশের সর্বশেষ শাসক মাহমুদ শাহের আমলে। মাহমুদ শাহ নিজের ভাইয়ের ছেলে আলাউদ্দিনকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করে। কিন্তু সে ছিল অযোগ্য শাসক। আফগান আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে প্রথম পর্তুগিজদেরকে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করার অনুমতি দেয়। এরপরে সুলতানি আমল, বারো ভূইয়াদের সঙ্গে মোঘলদের সংঘাত এবং বন্ধুত্ব থেকে শুরু করে শাসনামলে দিল্লি আর বাঙলার উত্থান আর পতনের সময়ে পর্তুগিজরা দিন-দিন শুধু নিজেদের শক্তি আর সামর্থ বৃদ্ধিই করতে থাকে। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে উপকূলীয় এলাকায় এদের সীমাহীন অত্যাচারের মাত্রা। একসময় খুবই অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সম্রাট শাহজাহানের সঙ্গে পর্তুগিজদের গণ্ডগোল বাঁধে। যে কারণে সম্রাট অনুধাবন করেন এদের সঙ্গে লড়তে হলে মোঘলদেরও সমরূপ একটা বাহিনী থাকাটা অত্যন্ত জরুরি।

মোঘলরা সর্বত্র স্থলব্যাপী অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও নৌযুদ্ধে তাদের পারদর্শিতা প্রায় শূন্যের কোঠায়। আর তাই সম্রাট শাহজাহান প্রথমবারের মতো ঘোষণা দেন সুবাদার কাশিম খানের নেতৃত্বে হুগলির পর্তুগিজদের দমন করার জন্য শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলা হবে। আর সেই বাহিনীতেই স্থান হয় ঘরছাড়া কিরানের। একদিকে ও ছিল অত্যন্ত সাহসী, শারীরিকভাবে দারুণ শক্তিশালী ও দুর্দান্ত নেতা। আর সেই সঙ্গে নৌবিদ্যায় অল্প সময়ে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখানোর কারণে খুব সহজেই নিজেই একটা বাহিনীর প্রথম হয়ে ওঠে। তবে ওদের বাহিনীতে একটা কমতি ছিল, ভালো গোলন্দাল বা কামাঞ্চি ছিল না ওদের। কামাঞ্চি হলো যারা জাহাজের যুদ্ধে কামান চালাতে পারে। পানির যুদ্ধ হোক আর ডাঙ্গার যুদ্ধ,

কামানের ওপরে অনেক কিছুই নির্ভর করে। আর তাই উভয়ক্ষেত্রের যুদ্ধেই ভালো কামাঞ্চির কোনো বিকল্প নেই। কাশিম খানের নেতৃত্বে হুগলি থেকে বিতারনের সময় কিরানের বাহিনীতে এক রত্নের সমাগম ঘটে।

মানুষটা ছিল গোলন্দাজ রঙ্গন মল্লিক। রঙ্গন মল্লিকের বাপ ছিল লবণ চাষি। নুনের ভিটা নামক জায়গাতে পারিবারিকভাবেই তাদের লবণের ঘের ছিল, কিন্তু ছোটোবেলা থেকে কোনোদিনই রঙ্গন মল্লিক পারিবারিক ব্যবসার দিকে মনোযোগ দেয়নি। বরং তার নেশা ছিল অন্য দিকে। আর তাই খুব ছোটোবেলাতেই ঘর ছেড়ে দিল্লিতে গিয়ে এক অস্ত্র কারখানায় শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করতে শুরু করে সে। সেখানেই সে ধীরে ধীরে কামানের গোলা বানাতে বানাতে হয়ে ওঠে দক্ষ কামাঞ্চি, তার ডাকনাম হয়ে যায় গোলন্দাজ। কিন্তু ছোটো জাতের হওয়ার কারণে কোনোদিনই প্রথম সারিতে আসতে পারেনি সেনাবাহিনীতে। তারপরে একসময় সে জানতে পারে হুগলির যুদ্ধের জন্য লোক নেওয়া হচ্ছে। ব্যাস ভিড়ে যায় কিরানের দলে।

তিন বছর সে কিরানের দলে ছিল। তার ব্যাপারে বলা হয়, সে কামান চালিয়ে প্রজাপতির ডানা দুইভাগ করে ফেলতে পারে। কিন্তু হুগলির ঘটনার পর কিরানের বাহিনী যখন সিলভেরার বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় সেই পরাজয়ের জন্য অনেকেই সরাসরি দায়ী করে রঙ্গন মল্লিককে, বিশেষ করে দ্বিতীয় কাপ্তান পট্টবর্ধন। এর পেছনে কারণও ছিল। কিন্তু সেই ঘটনার পর গোলন্দাজের সঙ্গে কিরানের আর দেখা হয়নি। আজ এত বছর পর সে এসেছে গোলন্দাজকে বাঁচাতে সেইসঙ্গে তাকে নিজের বাহিনীতে আরেকবারের জন্য শামিল করতে।

'অর কট্টুক দূরে?' কিরান আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় বোঝার চেষ্টা করছে। সবে মাত্র সন্ধ্যে হয়েছে। রাত গভীর না হলে চাঁদ-তারা দিয়ে সময় আর দিকনির্দেশনা করা খুবই দুরূহ একটা ব্যাপার।

'আর বেশিদূরে নাই ওস্তাদ,' জোরে বৈঠা চালাতে চালাতে বেদু বলে উঠল। 'এহান দিয় ঢুইক্কা আরেকটু সময় নিয়া আমরা খালপাড়ে নামব। তারপর হেয়ান থেইকা পায়ে হাইট্টা...'

'বুঝছি, জলদি কর,' বলে সে গোমেজের দিকে ফিরে ইশারা করল। 'গোমেজ আমরা যহন যাব তহন তুই নাওয়ে থাকবি। এই ব্যাটার দিকে খেয়াল রাখবি। এহন জলদি বৈঠা চালা,' বলে কিরান দেখতে পেল সামনে অন্ধকারের ভেতরে উঁচু ঢিপির মতো মাটির পাড় দেখা যাচ্ছে। আরেকটু এগোতেই কিরান হাঁটু পানিতে নেমে পড়ল। নেমেই নৌকোটাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল পাড়ের দিকে। ওর গায়ের কাপড় একবার ভিজেছে তারপর শুকিয়েছে। এরপরে আবারও ভিজছে। এখন পিস্তলটাকে সাবধানে সামলে রেখেছে এবার যাতে না ভিজে। কিরান আর

বেদু নৌকাটাকে গোমেজের দায়িত্বে রেখে এসে গায়ে মাথায় কাপড় চড়িয়ে দ্রুত পা চালাল রঙ্গনের পরিবার যেখানে বাস করে সেদিকে। 'বেদু, তোর কি মনে অয় আমরা পারব হাম্মাদগো আগে সেদিকে যাইতে?'

বেদু পায়ের গতি একবিন্দু না কমিয়ে প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে বলে উঠল, 'চেষ্টা করতে তো কুনো দোষ দেহি না। জোরে পা চালাও ওস্তাদ।'

জলা আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পা চালাতে চালাতে আরো মাইলখানেক এগিয়ে কিরান আর বেদু থেমে গেল, অদূরেই গ্রামের একপাশ থেকে বলকে বলকে কাল ধোঁয়া উড়তে দেখে। 'সর্বনাশ, ওস্তাদ। আমরা মনে অয় দেরি কইরা ফালাইছি।'

'কুনো দেরি অয় নাই। যেই পর্যন্ত শ্বাস সেই পর্যন্ত আঁশ,' বলে কিরান এক হাতে নিজের পিস্তলটা বের করে অন্যহাতে শক্ত করে চেপে ধরল বেদুর হাত, তারপর দৌড়াতে শুরু করল যেদিকে আগুন দেখা যাচ্ছে সেদিকে।

গ্রামের একপাশে খড়ের গাঁদার পাশ দিয়ে বাড়ির চৌহদ্দির ভেতরে প্রবেশ করে কিরান দেখতে পেল পাকা উঠানের একপাশে লবণ স্তূপ করে রাখা। যুদ্ধের ময়দান থেকে ফেরার পর রঙ্গন পুরোপুরি, পারিবারিক লবণ ব্যবসায় মনোযোগ দিয়েছে। বাড়ির চৌহদ্দির ভেতরে ঢুকেও কিরান আর বেদু তেমন কাউকে দেখতে পেল না। কিন্তু মানুষজনের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে আশপাশেই।

'আমার মনে অয় অগোরে ঘাটের দিকে লয়া গেছে,' বেদু বলে উঠল। কিরান তার কথা শুনে মৃদু মাথা নাড়ল। তারও প্রায় একইরকম মনে হচ্ছে। 'চল সেদিকেই যাইতে হবে।'

দুজনে মিলে সেদিকে রওয়ানা দেবে হঠাৎ কিরান বেদুর একটা হাত চেপে ধরল, 'শোন, আমরা একটা ভুল করতাছি,' বলে সে থেমে গেল পা চালাতে গিয়েও। বেদু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কিরানের দিকে। যখন সবকিছু দ্রুত করা দরকার এমন সময় মানুষটা কিনা দাঁড়িয়ে গেল।

কিরান একটা আঙুলতুলল বেদুর দিকে ফিরে। 'আমাগো এইখানে আসার পেছনে মূল উদ্দেশ্য কী?'

'গোলন্দাজরে খুঁইজা...'

'বাইর করা, ঠিক? হার্মাদগো লগে লড়াই কইরা তো সুবিধা করতে পারব না,' বলে সে বেদুর হাত ধরে জোরে টান দিল। 'তারমানে আমগো সবার পিছে নাই লাইগ্গা কিংবা হুদাই ঘুরাঘুরি না কইরা এহন উচিত যেই কামে আসছি সেটাইতে লাগা। সে কি এহনো মুক্ত আছে? লুকায়া আছে? নাকি ওগো হাতে ধরা পড়ছে? আগে সেইটা জানতে হবে। তারপর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ যদিও

আমগো পৌঁছাইতে খানিকটা দেরি অই গেছে কিন্তু আমার বিশ্বাস হার্মাদরাও আমগো খুব আগে এহানে পৌঁছাইতে পারে নাই। তুই কি গোলন্দাজের বাড়ি চিনোস?'

বেদু মাথা চুলকাতে চুলকাতে আধো অন্ধকার আবার আরো অগ্নি প্রজ্জ্বলিত গ্রামের দিকে ফিরে তাকাল। ভেবে নিয়ে সে ফিরে তাকাল অন্য বাড়িগুলোর দিকে তারপর কিরানকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'চলো ওস্তাদ, আমি পারব হের বাড়ি বাইর করতে। আগে এহানে একবার খেলা দেখাইতে আইছিলাম,' বলে ওরা দুজনেই আধো অন্ধকারের ভেতরেই দৌড়াতে শুরু করল। দু-তিনটে বাড়ি পার হয়ে ওরা চলে এলো গ্রামের কিনারায়। অন্য দিক থেকে মানুষজনের চিৎকার, পলায়ন, আহাজারি আর হার্মাদ দস্যুদের উল্লসিত হাসির শব্দ ভেসে আসছে।

আরো কয়েকটা বাড়ি পার হয়ে এলো ওরা। বলতে গেলে প্রায় গ্রামের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে ওরা। কিরান একটু অস্থির হয়ে উঠল। সে বেদুর ওপরে পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারছে না। কারণ এর আগে স্রেফ একবার এখানে আসা ছেলেটা আদৌ গোলন্দাজের বাড়ি বের করতে পারবে কিনা। এদিকে সময়ের একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। হয়তোবা সর্বনাশ আসলে ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে, কে জানে। 'বেদু...'

'ওস্তাদ পরায় চইলা আইছি,' বলে সে একটা হাত তুলল। গ্রামের কোনার দিকে বিরাট আকারের একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। ওটার পর থেকে খোলা সমতল ভূমি। 'ওই যে ওদিক থেইক্কা আরেট্টু পর থাইক্কা লবণের ঘের শুরু। চলো চলো,' বেদুর কথা শেষ হতেই দুজনেই পায়ের গতি আরো বাড়িয়ে দিল।

এতক্ষণ যে-বাড়িগুলো ওরা পার হয়ে এসেছে বেশিরভাগই মাটির আর না হয় ছনের কিন্তু এখন যে-বাড়িটার কাছাকাছি ওরা চলে এসেছে সেটা আগেরগুলোর তুলনায় অনেক উন্নত মানের। কিরান অনুমান করল, এই গ্রামে লবণ চাষের মূল পরিবারই সম্ভবত গোলন্দাজদের পরিবার।

বাড়ির বেড়ার কাছাকাছি পৌঁছে ভেতরে দিকে উঁকি দিয়ে দেখল বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র বাড়ির উঠানে জড়ো করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ভেতরের লোকজনকে জড়ো করা হয়েছে উঠানে। ওরা উঁকি দিয়েই দেখতে পেল লোকজনের ওপরে শপাং শপাং চাবুক চালানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে আহাজারিতে ভরে উঠেছে চারপাশ। দেখতে দেখতেই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো।

আগুন ধরিয়েই লোকজনকে গরু-ছাগলের পালের মতো খেদিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল বাইরের দিকে। কিরানের চোখ হন্যে হয়ে খুঁজছে গোলন্দাজকে। কিন্তু ভিড়ের ভেতরে কোথাও দেখতে পেল না ওকে। 'ব্যাপার কি, গোলন্দাজ কই? তোর চোখে পড়ছে নাকি?'

বেদু কিছু না বলে মাথা নাড়ল। 'ওস্তাদ আমগো সামনের দিকে যাইতে অইবো, না অইলে হেরে বাইর করন যাইবে না। কারণ আমার মনে অয় হেরে আগেই বাইরে লয়া গেছে।'

এক মুহূর্ত ভাবল কিরান। 'তাইলে অন্য পাশ দিয়ে ঘুরতে হবে,' বলে ও বেদুকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল। 'চল, বিপদ দেখলে সোজা উল্টা ঘুইরা দৌড় দিবি। মনে রাহিস গোলন্দাজরে বাঁচাইতে গিয়া নিজে মরলে চলবে না। এমনকি যদি আমরা গোলন্দাজরে খুঁইজ্জা বাইর করতে পারি তয় ওরে নিয়া সুজা উল্টাদিকের জঙ্গলে ঢুইক্কা জলার দিকে রওনা দিবো যেহানে নৌকাডা বান্দা আছে। একবার জঙ্গলে ঢুকতে পারলে কিংবা জলায় নামতে পারলে ওরা চাইলেও আর আমগো ধরতে পারব না।'

বেদু সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই ওরা রওনা দিল বাড়ির দিকে। বাড়িটাতে আগুন লাগানো হয়েছে কিন্তু আগুন এখনো পুরোপুরি ধরতে শুরু করেনি। বরং আগুনের হাত থেকে বাঁচতে সবাই সরে গেছে সামনের দিকে। হার্মাদরা পাইকারি হারে চাবুক মারতে মারতে সবাইকে উঠান থেকে সরিয়ে বাড়ির বাইরের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করেছে। কিরান আর বেদু উল্টো ঘুরে বাড়ির পেছন দিকে চলে এলো। তারপর সাবধানে আগুনের আঁচ বাঁচিয়ে প্রবেশ করল বাড়ির আঙ্গিনার ভেতরে। যেদিকে সবাইকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিরান সেদিকে এগোতে যাচ্ছিল বেদু হঠাৎ আলতো গলায় ওকে ডাক দিল। বাড়ির এক কোনের দিকে বেশ কিছু দেশি অস্ত্র পড়ে আছে। বেদু দেখে নিয়ে একটা বড়ো রাম দা তুলে নিল।

'ওইটা আমারে দে,' বলে কিরান একটা বড়ো তেল চকচকে লাঠি দেখাল। নিজেকে সামলে বেদু লাঠিটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিল। দুজনেই বাড়ির উঠান পেরিয়ে সন্তর্পণে চলে এলো বাড়ির বাইরের দিকে। ছোটো একটা কলাগাছের ঝাড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল বাড়ি থেকে বের করা মানুষগুলোকে সারি দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে। একজন হাতে কামারের হাপরের সামনে থেকে নামানো গনগনে লাল লোহার শিক হাতে নিয়ে সেটা দিয়ে মানুষগুলোর হাত ফুটো করে দিচ্ছে। আর চারপাঁচজন হতেই তাদের একে একে প্রবেশ করানো হচ্ছে লম্বা বাঁশের কঞ্চির ভেতরে। এরপরে এদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সামনের দিকে। এদের এখন নিয়ে তোলা হবে জাহাজের খোলের ভেতরে। যেখানে পশু পাখির মতো ফেলে রাখা হবে কোনো দাসবাজারে না নেওয়া পর্যন্ত। খোলের ভেতরে চাল ছিটিয়ে দেওয়া হবে খাবার জন্য। না থাকে পয়োনিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা, না থাকবে অন্য কোনো সুবিধা। সেইসঙ্গে কোনো সমস্যা হলেই গণহারে চালানো হবে চাবুক। তবে হ্যাঁ আরেকটা ব্যাপার ঘটবে। খোলের ভেতরে ঢোকানোর আগে আলাদা করা হবে মেয়েদেরকে। তারপর গণহারে চলবে ধর্ষণ। এরপরে তাদের ঢোকানো হবে খোলের ভেতরে।

এভাবে গরুর পালের মতো লোকগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখে মনে-মনে খানিকটা শঙ্কিত বোধ করল কিরান। গোলন্দাজকে এখনো দেখতে পায়নি সে। ওকে কি মেরে ফেলা হলো? নাহ, নিজেকেই প্রবোধ দিল সে। ওকে মেরে ফেলার কোনো কারণ নেই। ওকে বরং কাজে লাগাতে চাইলে জীবিত এবং সুস্থ রাখতে হবে। তবে হ্যাঁ, ওকে যদি জাহাজে তুলে ফেলা হয়ে থাকে তবে উদ্ধারের আশা ত্যাগ করতে হবে।

'বেদু সামনে চল,' বলে বেদুকে নিয়ে এগোতে থাকা লোকগুলোকে সমান্তরালে রেখে ওরা দ্রুত বেগে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। পানির ধারার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে এমন সময়ে বেদু হঠাৎ কিরানের হাত চেপে ধরল। সঙ্গেসঙ্গে যেদিকে ইশারা করল বেদু সেদিকে ফিরে তাকাতেই কিরাণ দেখতে পেল গ্রামের কিনারার দিকে যেখান থেকে সরু খালের মতো বেরিয়ে গেছে, সেখানে বেঁধে রাখা সারি সারি নৌকা। কিরান অনুমান করল এই নৌকাগুলোতে করেই হার্মাদরা এসেছে। ধরে নেওয়া লোকগুলোকে সারি দিয়ে সেই নৌকাগুলোতে তোলার আগে রাখা হচ্ছে পানির কিনারায়। সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন দস্যু। তাদের পোশাক দেখেই অনুধাবন করা যায় এরা অন্যদের থেকে আলাদা। চামড়ার পোশাক পরা বিরাটাকায় দাঁড়িওয়ালা এক দস্যুর পায়ের কাছে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে সাদা পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা একজন মানুষকে। রক্তাক্ত চোখে-মুখে মানুষটা অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে গরু-ছাগলের মতো সারি দিয়ে রাখা মানুষগুলোর দিকে।

'গোলন্দাজ,' আপনাতেই বলে উঠল কিরান। গোলন্দাজকে দেখতে পেয়ে একদিকে স্বস্তি বোধ করছে সে কিন্তু অন্যদিকে আতঙ্কের সঙ্গে অনুধাবন করল যেভাবে ওকে ঘিরে রেখেছে সব দস্যুরা ওখান থেকে তাকে উদ্ধার করে আনা অসম্ভব একটা ব্যাপার।

'ওইটারে চিনছো?' ইশারায় সামনের দিকে দেখাল বেদু।

'হুমম, গঞ্জালেস, সিলভেরার ডাইন হাত,' রাগে কড়মড় করে বলে উঠল কিরান। সিলভেরার দলের প্রধানদের সে ভালোভাবেই মনে রেখেছে।

'না ওস্তাদ,' আনমনে মাথা নাড়ল বেদু। 'তুমি যেইটা কথা কইতাছো সেইটা না। 'ওইটা যার লগে কথা কইতাছে, ওইডারে ভালা কইরা খেয়াল করো। হারামজাদা শ্যামাশঙ্কর।'

বেদুর মুখে নামটা শুনে অবাক হয়ে ওদের দিকে ফিরে তাকাল কিরান। গোলন্দাজকে দেখতে পাওয়া মাত্রই ওর নজর ছিল শুধু ওর দিকেই। শ্যামাশঙ্কর নামটা কানে যেতেই সচকিত হয়ে উঠল কিরান। ভালোভাবে খেয়াল করে দেখল গঞ্জালেস যার সঙ্গে কথা বলছে সে সাদা চামড়ার কেউ নয়, বরং এদেশীয় একজন। শুধু এই দুজনেই নয় দস্যুদের একটা অংশ এদেশীয়।

'তারমানে আকরাম বেগের কাছে যা শুনছিলাম তা ভুল না,' রাগে কিড়মিড় করে বলে উঠল কিরান। শ্যামাশঙ্কর মগ দস্যু, সে রোসাঙ্গের রাজার কেমন জানি ভাই হয় বলে জানে কিরান। 'পর্তুগিজগো লগে আসলেই হাত মিলাইছে আরাকানি মগেরা। কিন্তু কথা অইলো এহন কী করা?'

ভেতরে ভেতরে কিরান অস্থির হয়ে উঠেছে। এতক্ষণ ধরে লোকগুলোকে এখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল সম্ভবত ওদেরকে ওঠানোর জন্য। এদের একবার ওঠাতে শুরু করলে অর কিছুই করার থাকবে না।

রাগ-হতাশা আর অস্থিরতায় যে খড়ের গাদাটার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখছিল সেটার গায়ে হেলান দিল কিরান। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না ও। হঠাৎ খড়ের গায়ে হাত দিতেই বিদ্যুৎ চমকের মতো মাথায় এলো ধারণাটা। ও কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে একটা বিশেষ শব্দ। মানুষের আহাজারি, দস্যুদের উন্মাদ হাসি আর আগুনে পোড়ার শব্দ ভেদ করে শোনা যাচ্ছে বিশেষ একটা শব্দ। মনে মনে হেসে উঠল কিরান, এটা কাজে লাগানো যায়।

'বেদু আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসছে,' বলে সে হেসে উঠল মন দিয়ে শোন।'

***

বেদু এই মুহূর্তে ঠিক বুঝতে পারছে না কিরান আসলে ওকে দিক নির্দেশনা বলতে কী বুঝিয়েছে। কিরানের বুদ্ধিটা খুব সহজ আর কাজে লাগার সম্ভাবনা বলতে গেলে প্রায় শতভাগ, শুধু যদি দিক নির্দেশনাটা ঠিক রাখা যায়। কিন্তু এটা সে বুঝতে পারছে, কিরান যা করতে বলছে সেটাই ঠিক। বেশি চিন্তা না করে সে কাজে লেগে পড়ল।

প্রথমেই সে খড়ের গাদা থেকে সাবধানে টান দিয়ে বেশ কিছু খড় আলগা করে ফেলল। তারপর সবগুলোকে পাকিয়ে লম্বা করে মশালের মতো বানাল। তিনটে এরকম খড়ের মশাল বানাতে খুব বেশি হলে মিনিট কয়েক সময় লাগল ওর। তারপর তিনটাকেই হাতে নিয়ে দৌড়ে এলো দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা বাড়িটার কাছে। বাড়ির কাছে এসে তিনটেরই মাথায় আগুন ধরিয়ে ওগুলোকে সে তিনটে খড়ের গাদার দিকে ছুড়ে দিল।

কিছুক্ষণের ভেতরেই তিনটা গাদাই দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। যদিও চারপাশে জ্বলতে থাকা আগুনের ভেতরে এগুলোকে আলাদা করে তেমনভাবে লক্ষ করার কোনো কারণ নেই। তাই কেউ লক্ষ করলও না। দস্যুরা বেশিরভাগই পানির কাছাকাছি অপেক্ষা করছে নৌকাগুলোকে প্রস্তুত করে বন্দি ওঠানোর জন্য।

মানুষগুলোকে ওঠাতে একটু ঝামেলা হচ্ছে। কারণ ওরা ধরতে এসেছিল গুটি কয়েকজনকে। কিন্তু ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুরো একটা গ্রাম। এতে ভালোই সওদা হবে। আর যারা ধরা পড়েছে ওরা অপেক্ষা করছে নিজেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য। এমন সময় হঠাৎ কিছু একটা ছুটে আসার শব্দে সচকিত হয়ে উঠল সবাই।

এমনকি গাদাগুলোতে আগুন লাগিয়ে প্রায় নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল বেদু। সে আসলে জানত না কিরান কী করতে যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ যে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা, গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা গোলা ঘরের মতো, সেটার আরেকটা অংশে আগুন ধরে গেল। বেদু বুঝতে পারল এই আগুনটাও ধরানো হয়েছে, আর কাজটা কিরানেরই। কিন্তু সে এটা বুঝতে পারল না, কেন ধরানো হলো এই আগুন। আর এতে ক'রে খুব একটা লাভই বা হবে কী?

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই তীব্র আর্তনাদ আর পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠতেই সে অবাক হয়ে গেল। তার অবাক হওয়ার পালা বাকি ছিল। হঠাৎ যেদিকে সে খড়ের গাদাগুলোতে আগুন লাগিয়েছে তার বিপরীত দিকের গোলাঘরের মতো জায়গাটার খোলা দরজা দিয়ে বিস্ফোরণের মতোই বেরিয়ে এলো একদল বিশালাকায় প্রাণী। উন্মাদের মতো উত্তাল বেগে ছুটতে থাকা প্রাণীগুলোর দিকে প্রথমে উন্মাদের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বেদু। তারপর তার মুখে ফুটে উঠল হাসি। এবার সে বুঝতে পেরেছে কিরানের পরিকল্পনা আসলে কী।

ওরা যখন অসহায়ের মতো খড়ের গাদার আড়াল থেকে পানির তীরের দৃশ্য অবলোকন করছে এমন সময় কিরান প্রথম শুনতে পায় বদ্ধ কোনো জায়গাতে একদল প্রাণী উন্মাদের মতো চিৎকার করছে। সঙ্গেসঙ্গে বুঝতে পারে, যে-বাড়িটার সামনে ওরা দাঁড়িয়ে আছে সেটা আসলে গ্রামের একটা আস্তাবল। এখানে সবার গরু-ষাঁড় আর মহিষগুলোকে রাখা হয়। হার্মাদরা নগদ হিসেবে বিশ্বাস করে। ওরা লুট করে শুধু অর্থ আর মানুষ। এসব গবাদি প্রাণী যত মূল্যবানই হোক এদের নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তাই তারা এসবে হাত দেয়নি। ওদিকে বাইরে আগুনের হলকা টের পেয়ে আস্তাবলের ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছে প্রাণীগুলো, তখনই সে চিন্তা করে, শুধু রঙ্গন নয় চাইলে বন্দি সবাইকে মুক্ত করার একটা সুযোগ এসে যেতে পারে। আর সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সে বেদুকে খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে নিজে চলে যায় আস্তাবলের পেছন দিকে। সেখানে আস্তাবলের পেছনে আগুন লাগায় সে প্রথমে, তারপর খুলে দেয় আস্তাবলের মূল দরজাগুলো। সঙ্গেসঙ্গে আগুনে আতঙ্কে অস্থির হয়ে থাকা প্রাণীগুলো দিকবিদিক হারিয়ে পাগলের মতো ছুটতে শুরু করে যেদিকে খড়ের গাদাগুলোকে আগুন লাগানো হয়েছে সেদিকে। কারণ ওদিকে ছাড়া ওদের সামনে আর কোনো পথ নেই।

বিশালাকায় প্রাণীগুলো প্রাণ ভয়ে সমুদ্রের স্রোতের মতোই আগুনে খড়ের গাদাগুলোর ওপরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। ওগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে আগুনে গাদাগুলোকে নিয়েই দৌড়াতে লাগল উন্মাদের মতো। জলের পাড়ে যারাই দাঁড়িয়ে ছিল তার প্রথমে দেখল আগুনে খড়ের গাদাগুলো এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। কিন্তু ওরা সেই ভয় পুরোপুরি তাড়ানোর আগেই দেখল ওগুলোকে নিয়ে ওদের ওপরে আছড়ে পড়ল একদল উন্মত্ত প্রাণী। প্রস্তুত হওয়ার আগেই ওদের অনেককে গুতিয়ে দিয়ে বেশ কিছু প্রাণী নেমে পড়ল পানিতে। কিছু আবার ধাক্কা দিয়ে গুতিয়ে পথ করে নিতে লাগল। মুহূর্তের ভেতরে দস্যুদের দলটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল একে অপর থেকে। ভয়ের চোটে দিকবিদিক হারিয়ে ছুটতে শুরু করে অনেকেই লাফিয়ে পড়ল পানিতে। বন্দিরা নিজেদের মুক্ত পেয়ে ছুটতে শুরু করল কেউ গ্রামের দিকে, আবার কেউ কেউ লাফিয়ে পড়ল পানিতে।

শেষ প্রাণীটাকে আস্তাবল থেকে বের করে দিয়ে কিরান লাফিয়ে উঠে বসল ছুটন্ত একটা ষাঁড়ের পিঠের ওপরে। হাতে বেরিয়ে এসেছে বিরাট আকারের সেই লাঠিটা। ছুটন্ত ষাঁড়টা আস্তাবলের বাইরে আসতেই সে বেদুর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল।

যে লোক বাঘের খেলা দেখায় তার জন্য এসব ষাঁড় আর মহিষ কোনো বিষয়ই না। সেও কিরানের মতো লাফিয়ে উঠে বসল একটা মহিষের পিঠের ওপরে। একহাতে ওটার শিং ধরে অন্যহাতে বিরাট রামদাটা নিয়ে ছুটে চলল দস্যুদের উদ্দেশে।

দস্যুরাও প্রথমে একেবারেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেও ওরা নিজেদের খানিকটা সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। অনেকেই অস্ত্র বের করে ছুটন্ত প্রাণীগুলোর উদ্দেশে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে। একবার গুলি করে আবারও বন্দুক ঠিক করতে থাকা এক দস্যুর খুলি বিস্ফোরিত হলো কিরানের লাঠির আঘাতে। আরেক দস্যু নিজের হাত হারাল বেদুর রামদার কোপে। দুজনেই ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় দেখতে পেল শিকল পরানো সাদা পোশাকের একজনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তিন দস্যু। বেদুকে সাবধান করে দিয়ে কিরান লাফিয়ে নেমে পড়ল ষাঁড়টার ওপর থেকে, মাথার ওপরে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে সে যমদূতের মতো উপস্থিত হলো ওদের চারজনের সামনে। প্রথমজন সতর্ক হওয়ার আগেই তার হাতের বন্দুক উড়ে গেল ওর লাঠির আঘাতে। দ্বিতীয়জন পিস্তল তুলল ওকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু গোলন্দাজ পাশ থেকে চেপে ধরল তার হাত। তৃতীয় জন হাসতে হাসতে নিজের বন্দুক তুলাল কিরানকে গুলি করার জন্য কিন্তু আচমকা সে দেখতে পেল কনুইয়ের নিচ থেকে তার হাতটা নাই হয়ে গেল। সেখান থেকে স্রেফ ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। সে যখন নিশ্চিত গুলি করতে যাচ্ছে কিরানকে ঠিক তখুনি বেদুর রামদার এক কোপে হাত নাই হয়ে গেছে তার।

প্রথম দস্যু বন্দুক হারিয়ে নিজের ছোরা বের করতে যাচ্ছিল তার মস্তক বরাবর লাঠি চালাল কিরান। তারপর তিনজনে মিলে দ্বিতীয়জনকে কাবু করতেই দেখতে পেল ভীষণ অবাক চোখে গোলন্দাজ তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। 'কিরান তুমি?' তার চোখের বিস্ময় বাঁধ মানছে না।

কিরান একটানে তাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তার শিকলবন্দি দুই হাত সমান তুলে ধরে বেদুর দিকে তাকিয়ে ইশারা করল, 'বেদু।'

বেদু মাথার ওপরে রামদা তুলে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে কোপ মারল শিকলে। একবার, দুবার, তিনবারের কোপে শিকল মুক্ত হলো গোলন্দাজ রঙ্গন।

'জলদি চল, পলাইতে হবে,' তার জামার এক প্রান্ত চেপে ধরে কিরান বলে উঠল। ইতোমধ্যেই ওরা জলা-জঙ্গলারে দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে।

'আম্মার মানুষগো রাইখা...'

কিরান সমস্ত শক্তি দিয়ে রঙ্গনের জামা চেপে ধরে টানতে শুরু করল, 'হারামজাদা, গাউরামি পরে করিস, আগে পলাইতে হবে,' বলে সে রঙ্গনের পাঞ্জাবি চেপে ধরে টানতে লাগল। তিনজনেই প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

'ওস্তাদ কেউ আমগো পিছু নিছে,' বেদু বলে উঠল। কিরান পেছনে তাকিয়ে দেখল জঙ্গলের ভেতরে মশালের আলো দেখতে পাচ্ছে ওরা। 'জলদি দৌড়া। গোলন্দাজ তুই খালের দিকের পথ দেহা,' বলে আরো গতি বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল ওরা। কিন্তু বাজ পড়ার মতো শব্দে কানের পাশ দিয়ে বুলেট ছুটে যেতে শুরু করেছে। 'নিচা হ, নিচা অইয়া দৌড়া,' কিরান অনুধাবন করতে পারছে কারা ওদের পিছু নিতে পারে।

ব্যাপারটা বোঝা অতো কঠিন কিছু না। দস্যুরা এই গ্রামে এসেছিল সম্ভবত গোলন্দাজকে ধরে নিয়ে যেতে। কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ এমন গণ্ডগোল লেগে যাওয়াতে গোল বেঁধে গেছিল। কিন্তু গঞ্জালেস যেই মুহূর্তে দেখতে পেল গোলন্দাজ নেই সে বুঝতে পারল তাকে ছাড়ানোর জন্য এই গণ্ডগোলটা ইচ্ছে করেই লাগানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কোনদিকে ওরা পালাতে পারে সেটা অনুমান করে ওরা পিছু নিতে শুরু করেছে ওদের। অথবা গোলন্দাজকে উদ্ধার করার সময়ে গঞ্জালেস বা শ্যামাশঙ্করের লোকেরা ওদেরকে দেখেছে। ওরা পৌছাতে পৌছাতে কিরানরা গোলন্দাজকে নিয়ে সটকে পড়েছে। কিন্তু ততক্ষণে ওরা পিছু নিতে শুরু করেছে।

'বেদু-গোলন্দাজ জলদি পা চালা,' কথাটা শেষও করতে পারল না সে। তার আগেই আবারও এক গুচ্ছ বুলেট ছুটে এলো। মাটিতে শুয়ে পড়ল তিনজনই। তারপর যত দ্রুত সম্ভব হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল । 'সামনে জলা আছে কিরান, আমরা অইখানেই,' বলেই গোলন্দাজ ইশারা করে সেদিকে হামাগুড়ি দিতে

লাগল ওদের দিকে। কিন্তু সেদিকে এগোনোর আগেই একেবারেই কাছে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। 'দৌড়া, আর উপায় নাই,' বলে কিরান উঠে দাঁড়িয়ে বাকিদের নিয়ে দৌড় দিল প্রাণপণে। লুকোচুড়ির সময় শেষ। এখন পালাতে হবে। সামনেই আর কিছুদূর পরেই পানির ধারা দেখা যাচ্ছে।

ওরা উঠে দাঁড়াতেই আবারও গুলি বৃষ্টি ভেসে এলো। পানির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এমন সময় কিরানকে কেউ যেন হাতের পেছন থেকে ধাক্কা মারল। গুলির ধাক্কায় পানিতে পড়ে গেল ও। পড়তে পড়তে দেখতে পেল বেদু আর গোলন্দাজও লাফ দিয়েছে পানিতে। পানিতে পড়েই কনুইয়ের কাছে তীব্র জ্বালা করে উঠল ওর। হাতটা নাড়তে গিয়ে নাড়তে পারল না কিরান। এক হাতে সাঁতরাতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছিল কেউ ওর পা ধরে টান মারল তারপর নিয়ে চলল একপাশে। ওপর থেকে ছপছপ রকমের অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে। আসলে কেউ গুলি করছে পানিতে। কিরানকে টেনে নিয়ে ছায়াটা সরে এলো একপাশে। খালপাড়ের ঝুঁকে থাকা গাছের শিকর-বাকড়ের আড়ালে লুকিয়ে দম নিতে লাগল তিনজনেই। কিরান হাতে ধরে দেখল ওর বাঁহাতের কনুইয়ের কাছে রক্ত। মনে হয় সিসা লেগেছে।

আর কিছু চিন্তা না করে শিকড়ে হেলান দিয়ে বসে রইল ও। খালের পাড় থেকে দস্যুদের উত্তেজিত চিৎকার ভেসে আসছে। ওরা চুপচাপ পড়ে রইল যতক্ষণ পর্যন্ত দস্যুদের চিৎকার, চেঁচামেচি আর উন্মাদনা কমে না আসে। দস্যুরা একে অপরকে দোষারোপ করে পানিতে আরো গুলি ছুড়ে একসময় ক্ষান্ত দিল। তারপর ধীরে ধীরে তারা রওনাদিল যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে। ওরা পড়ে রইল ওখানেই। কোনো কথা নেই। স্রেফ চুপচাপ নিশ্বাস নিতেলাগল।

আর কতক্ষণ ওভাবে পড়ে থাকত কে জানে। কিন্তুজঙ্গল-জলার ভেতর থেকে একটা বৈঠার ছপাৎ শব্দ ভেসে এলো। সেই সঙ্গে কেউ একজন শিস বাজাচ্ছে যেন।

'কিরান কোনোমতে বলে উঠল, 'গোমেজ,' বলে সে পানিতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে সাঁতরাতে লাগল সেদিকে। ওরা নৌকার কাছাকাছি পৌঁছাতেই গোমেজ ওদের টেনেতুলে নিল একে একে। সে নীরব দৃষ্টিতে জানতে চাইল ওখানে আসলে হচ্ছেটা কি। কিন্তু কেউ তাকে কোনো জবাব দিল না। বরং নৌকায় ওঠার পর জ্বলন্ত গ্রামের দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। আর সেদিকে তাকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল গোলন্দাজ রঙ্গন মল্লিক।

আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল কিরান। গোলন্দাজকে হয়তো উদ্ধার করে আনতে পেরেছে ওরা। কিন্তু বাঁচাতে পারেনি তার গ্রামটাকে। ক্রন্দনরত গোলন্দাজের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নৌকা ছাড়তে ইশারা করল গোমেজের দিকে তাকিয়ে। ওদের মূল অভিযান শুরু করতে হলে জলদি পৌঁছাতে হবে খন্ডালের গুহায়।

অধ্যায় বিশ

বর্তমান সময়

পতেঙ্গা এলাকা, চট্টগ্রাম

কোকের ঠাণ্ডা ক্যানটাতে চুমুক দিতে দিতে শারিয়ারের মনে হতে লাগল এর চেয়ে সুস্বাদু কোনো জিনিস জীবনে কোনোদিন পান করেনি সে। চেনা জিনিসের স্বাদ পরিস্থিতি আর প্রেক্ষাপটের ভিন্নতায় এমনভাবে বদলে যেতে পারে সেটা কল্পনার অতীত একটা ব্যাপার। ক্যানটাতে আরেকবার চুমুক দিয়ে সে ডান হাতে ধরা ডানহিল সিগারেটে আরেকটা টান দিল। ও চেয়ারে হেলান দিয়ে পায়ের ওপরে আরেকটা পা তুলে দিল। কিন্তু কোক আর সিগারেটের দুর্দান্ত কম্বিনেশনের কারণে জীবনটা অনেক বেশি মধুময় মনে হচ্ছে ওর। যদিও পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী সেরকম মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই।

শারিয়ার এখন বসে আছে গতরাতে যে-বাড়ির বেইজমেন্টে এত কাণ্ড হয়ে গেছে সেই বাড়ির ডায়নিংরুমে। গত রাতের সেই বিস্ফোরণের পোড়া গন্ধ আর ধোঁয়ার ফ্লেভার এমনকি এখান থেকেও পরিষ্কার টের পাওয়া যাচ্ছে। গতরাতের ওই বিস্ফোরণের ফলে অনেকক্ষণ ও ভুবন কিংবা মোর্শেদ কেউই ওখান থেকে নড়তে পারেনি। বিস্ফোরণটা ঘটার বেশ কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে ওরা ডায়নিংরুমে উঠে আসে বেইজমেন্ট থেকে। ডায়নিংরুমে ঢোকার পর একদল পুলিশের সঙ্গে ওদের মোলাকাত হয়। প্রথমেই ভুবন আর মোর্শেদ নিজেদের ব্যাজ দেখিয়ে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। মোর্শেদই ওদের প্রথম জানায় সেই ওদেরকে এখানে ডেকেছিল ব্যাকআপ হিসেবে। টহল পুলিশের দলটা এখানে এসে পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগোযোগ করে। শারিয়ারও ওদের মাধ্যমে ঢাকা পিবিআই অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর কিছুক্ষণের ভেতরে পুলিশের বড়ো ফোর্স, অ্যাম্বুলেন্স সিবিআই পিবিআই সিডিআইয়ের লোকেদের পদচারণে ভরে যায় পুরো বাড়ি। মোর্শেদ আর গার্ডে থাকা অজ্ঞান পুলিশ অফিসারকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যায়। ভুবন আর শারিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়। পিবিআই আর তাদের ফরেনসিকের লোকেরা নিচে গিয়ে কাজ শুরু করে আর ওরা ওপরে ডায়নিংরুমে এসে অপেক্ষা করতে থাকে।

যদিও শারিয়ার বেশ শান্ত মুখে বসে আছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অস্থিরতার একটা জটিল মেঘ ছেয়ে ফেলেছে ওর মনটা। শারিয়ার এখনো বুঝতে পারছে না কেসটায় কতটা বেশি ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু এটা বুঝতে পারছে ক্ষতিটা পূরণ করা অনেক কঠিন হয়ে যাবে। এমনকি ওর কাজ তো বটেই, ওর চাকরি নিয়েও টান পড়ে যেতে পারে। ওর নিজের একটার পর একটা ভুল আর বোকার মতো সিদ্ধান্তের কারণেই আজ এই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। ওর পারফরমেন্স তো বটেই এমনকি কেসটারও সম্ভবত বারোটা বেজে গেছে। গতরাতের বিস্ফোরণের পর যখন হেড অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে তখন স্রেফ ডিউটি অফিসার বাদে কেউই আর রাতের বেলা অফিসে ছিল না। তবে বিস্তারিত রিপোর্ট করার পর সে জানায় সকালের প্রথম প্রহরেই অফিশিয়াল রিপোর্ট জানানো হবে উর্ধ্বতন কর্তাদের, আর সেটা শুনে তারা পরবর্তী করণীয় জানাবেন। শারিয়ার সেই অপেক্ষাতেই আছে এখন।

পাশ থেকে মৃদু কাশি শুনে ফিরে তাকাল শারিয়ার। ভুবন ছেলেটা চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে ফিরে এসেছে। ওর পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। 'বস, কিছু মনে না করলে কাল রাত থেকে তো অনেক কিছুই করে ফেলেছি। এখন বেয়াদবি না নিলে,' বলে সে শারিয়ারের সিগারেটটার দিকে ইশারা করল। ছেলেটার ইশারা দেখে শারিয়ার হেসে উঠল। কিছু না বলে ছেঁড়া ব্লেজারের পকেট থেকে নিজের ডানহিলের প্যাকেটটা বের করে এগিয়ে দিলভুবনের দিকে।

প্যাকেটটা দেখে ভুবন ছেলেটা হেসে উঠল। শারিয়ার খেয়াল করল ছেলেটার চেহারা মঙ্গলয়েড, মানে একটু চায়নিজ ধাঁচের হলেও দেখতে বেশ সুদর্শন ছেলেটা। বেশ লম্বা হালকাপাতলা শক্তিশালী গঠন। শারিয়ারের গত রাতের মারামারির ঘটনা মনে পড়ে গেল। এই ছেলের ট্রেনিং বিশ্বসেরা। তা না হলে কোনোমতেই এতটা টক্কর দিতে পারত না সে।

ভুবন ছেলেটা হেসে উঠে ডানহিলের প্যাকেট থেকে একটা লম্বা সিগোরেট বের করে নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে শারিয়ারের এগিয়ে দেওয়া লাইটার দিয়ে ধরাল। 'আহারে প্যাকেটটা চাপ খেয়ে দামি সিগারেটগুলো চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। একটা ব্যাপার বুঝলাম না বস, সরকার তোমাদের যে বেতন দেয় তাতে তুমি ডানহিল অ্যাফোর্ড করো কীভাবে?' বলে সে জিভ কেটে বলে উঠল। 'অহহো, তোমাকে তো আবার তুমি বলে ফেললাম।'

শারিয়ার হেসে উঠল ছেলেটার কথার ধরন শুনে। 'সরকারের বেতনে তো আমি চলি না,' বলে সে নিজের সিগারেটটাতে শেষ টান দিয়ে ওটাকে মাটিতে ফেলে পিষে দিল পায়ের নিচে। 'আমার মনে হয় আমাদের ফর্মালি পরিচয় হওয়া

দরকার,' বলে ও নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেইকের ভঙ্গিতে। 'আমি শারহান শারিয়ার স্পোশাল ইনভেস্টিগেশন অফিসার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, পিবিআই।'

'শাহরিয়ার?' প্রশ্নের ভঙ্গিতে জানতে চাইল ছেলেটা। সিগারেটটাকে ঠোঁটের কোনে আটকে নিজের ডান হাতটা এগিয়ে দিল শারিয়ারে দিকে।

জীবনে অসংখ্যবার শোনা প্রশ্নটা আবারও শুনতে পাবে এতে শারিয়ারের কোনোই অবাক লাগল না। 'নাহ, শারিয়ার আমার নাম। শাহরিয়ার না।'

ভুবন ছেলেটা এখনো ওর হাতটা ধরে আছে। 'শারিয়ার, শারিয়ার,' সে আনমনে দুবার বলে উঠল ওর নামটা। 'মানে আরব্য রজনীর সেই সম্রাট শারিয়ার? ঠিক বলেছি?'

শারিয়ার সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত অবাক হলো। কারণ নিজের এই জীবনে শারিয়ার আর শাহরিয়ার নিয়ে দ্বিধা হলেও ওর নামের প্রকৃত উৎসটা এখন পর্যন্ত এত দ্রুত কেউই ধরতে পারেনি। 'একদম ঠিক, আরব্য রজনীর সেই সম্রাট শারিয়ারের নামেই আমার নাম রাখা হয়েছে শারিয়ার। তুমি জানলে কীভাবে?'

ছেলেটা হেসে উঠল, 'সে অন্য গল্প। আগে আমার নিজের পরিচয়টা তো দিয়ে নেই। আমি ভুবন শর্মা। এক্স মিলিটারি, এক্স ফ্রিল্যান্স স্পেশাল প্যারা কমান্ডো ও লং রেঞ্জ শুটিং এক্সপার্ট, বর্তমানে স্রেফ একজন সিকিউরিটি গার্ড,' বলতে বলতেই ছেলেটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘনিশ্বাস । শারিয়ার অনুমান করল নিজের প্রফেশনাল জীবনের কথা বলতে গিয়ে বেরিয়ে আসা এই দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রমাণ করে এই নিয়ে তার ভেতরে অনেক তিক্ত স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

'স্নাইপার থেকে একেবারে সিকিউরিটি গার্ড?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে জানতে চাইল শারিয়ার। তারপর নিজের মুখের ক্ষতগুলো দেখিয়ে জানতে চাইল 'স্রেফ?' বলে হা-হা করে হেসে উঠল ও। ওর সঙ্গে ভুবনও হেসে উঠল। 'তাহলে এখানে কীভাবে?'

ভুবনের মুখ দিয়ে আবারও দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। 'সে অনেক লম্বা গল্প, বললাম তো। তবে আমি এই মুহূর্তে টেম্পোরারি হিসেবে আবারও ফোর্সে জয়েন করেছি পাশা স্যারের অনুরোধে,' বলে সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'বলতে পার নির্দেশে। কারণ স্যারের অনুরোধ মানেই আমার জন্য নির্দেশ।'

ছেলেটার জবাব শুনে শারিয়ার একটু অবাক হলেও মনে মনে সেও বলে উঠল ওর জন্যও তাই। 'কাল রাতের জন্য সরি।'

'সরি আসলে আমার বলা উচিত,' বলে ছেলেটা কাঁধ ঝাঁকাল। 'কিন্তু বস আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম না, কাল রাতে আসলে হলোটা কি। এই বালের কেসে এখন পর্যন্ত আসলে হচ্ছেটা কী? আমি জানতাম এই কেসটার শুরু শুধুই মাত্র একটা হিট অ্যান্ড রানের ঘটনা দিয়ে। কিন্তু কাজে নেমে দেখতে পাচ্ছি বড়ো বড়ো

সংস্থাগুলোর ইনভলভমেন্ট, আন্তর্জাতিক খুনি, টেক এক্সপার্টদের সমাগম,' বলে অসহায় একটা ভাব করল সে। 'এর মাঝখানে আমাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। না ধরতে পারছি লেজ, না বুঝতে পারছি মাথা। এভাবে কীভাবে কাজ করব? কাল রাতে তো আরেকটু হলে নিজেরাই নিজেদের মেরে ফেলতে বসেছিলাম।'

'আসলে এখানে...' যে ব্যাপারটা শারিয়ার অনুধাবন করছে সেটা ভুবনকে খুলে বলতে যাচ্ছিল তার আগেই বাইরে একাধিক পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল দুজনে। শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে ভুবন প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে। শারিয়ার কিছু বলে ওঠার আগেই রুমে প্রবেশ করল আট-দশজনের একটা দল। তাদের সর্বাগ্রে স্যুট পরিহিত একজন মহিলা। ভেতরে ঢুকেই সে একবার পরিস্থিতি দেখে নিল। ছেঁড়াফাটা পোশাক পরা কালিঝুলি মাখা ভুবন আর শারিয়ারের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন দুটো ছুঁচো দেখছে। তারপর নিজের টিমের একজনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'টমি, তুমি যাও ফরেনসিকের আপডেট দেখো। আমি ফরেনসিকের সমস্ত ডেটার ডিজিটাইজড ভার্সন চাই দুপুরের ভেতরে। বোঝা গেছে? থ্রি-কোয়ার্টার পরা পেটকা কিসিমের ক্যাপ পরা ছেলেটা তার পেটের চেয়েও মোটা একটা ব্যাকপ্যাক নিয়ে রওনা করল বেইজমেন্টের দিকে।

'সুমন আপনি, আবারও পুরো সাইটটা ঠিক মতো সিল করা হয়েছে কিনা চেক করুন। আমি পুরো স্পেস কমপ্যাক্ট চাই আগামী এক ঘণ্টার ভেতরে। শুধু ফরেনসিক বাদে অন্য সবাইকে আমি এর বাইরে দেখতে চাই। সেই সঙ্গে আগামী এক ঘণ্টার ভেতরেই সিকিউরিটি থেকে শুরু করে সমস্ত স্পেস আমাদের নিয়ন্ত্রণে চাই। বোঝা গেছে?'

অফিসার গোছের দেখতে সুমন লোকটা একবার ওদের দিকে দেখে নিয়ে নিজের টিমের পাঁচজনকে নিয়ে চলে গেল বাইরের দিকে। 'তোমরা আমার সঙ্গে এসো,' বলে সে এতক্ষণে এগিয়ে এলো শারিয়ার আর ভুবন যেখানে বসে আছে সেদিকে। ওদের দিকে হিলের খটাখট শব্দ তুলে সে এগিয়ে আসতেই তার পেছনে থাকা একজন অফিসার সামনে এসে একটা চেয়ার টেনে দিল তাকে। স্টেজে র‍্যাম্প করতে থাকা মডেলরা ঠিক যেভাবে হাঁটে অনেকটা সে-ভঙ্গিতে হেঁটে এসে বেসিক ইন্সটিঙ্কট সিনেমার শ্যারন স্টোনের মতো বসে পড়ল সে ওদের সামনে।

বসার সঙ্গেসঙ্গে শারিয়ার ভালোভাবে খেয়াল করে সে নিজেকে শুধরে নিল। এটা মহিলা নয় মেয়ে। বয়সে এই মেয়ে তার চেয়ে বড়ো তো হবেই না পারলে ছোটো হবে। কিছু না বলে সে তাকিয়ে রইল মেয়েটার দিকে।

মেয়েটা একবার ওকে দেখল তারপর ভুবনের দিকে তাকাল, তারপর আবারও ফিরে তাকাল শারিয়ারের দিকে। 'আপনি নিশ্চয়ই স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন

অফিসার শারহান শারিয়ার?' বলে সে ভুবনের দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'এবং আপনি স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট হিসেবে কাজ করা অফিসার ভুবন শর্মা?' বলে সে ওদের উত্তরের অপেক্ষা না করে সে নিজের পনিটেইল দুলিয়ে বলে উঠল, 'আমি রুম্পা, রুম্পা তালুকদার, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন অফিসার, পিবিআই চট্টগ্রাম ব্যুরো,' শারিয়ার ঠিক ধরতে পারল না মেয়েটা কি ইচ্ছে করেই স্পেশাল অফিসারের ব্যাপারটা একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কি? নাকি ওরই শুনতে ভুল হলো। তবে যেটাই হোক না কেন শারিয়ার এটা বুঝতে পারল মেয়েটা ওর মতো একই র‍্যাংকের অফিসার। কিন্তু এই ব্যাপারটাকে এতটা চিবিয়ে বলার কারণ কী?

মেয়েটা অবশ্য তখনো বলে চলেছে, 'স্পেশাল অফিসার শারিয়ার, আপনাকে অফিশিয়ালি কিছু সিদ্ধান্ত জানানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে। প্রথম সিদ্ধান্ত, এই কেসের সমস্ত দায়িত্ব থেকে আপনাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং এই কেস এখন থেকে আমার অধীনেই পরিচালিত হবে। আপনি চাইলে এই মুহূর্তে এখান থেকে ঢাকার জন্য রওনা করতে পারেন। কিংবা আগ্রাবাদে আমাদের পিবিআইয়ের একটা স্পেশাল গেস্ট হাউস আছে। চাইলে সেখানে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে বিশ্রাম নিয়ে তারপর বিদায় হতে পারেন। আর ইউ ক্লিয়ার অফিসার?'

যেন খুব মজার কোনো কৌতুক শুনছে এমন ভঙ্গিতে শারিয়ার তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। তার কথা শেষ হওয়ার পরও সে কোনো জবাব দিল না। বরং খুব ধীরে-সুস্থে সে পকেট থেকে ডানহিলের প্যাকেটটা আবারও বের করল তারপর সেটা থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে নিয়ে আগুন দিতে দিতে বলে উঠল, 'স্যুটটা কেন?'

'সরি?' মেয়েটা একটু তাজ্জব হয়ে গেছে শারিয়ারের প্রশ্নটা শুনে। সে অবাক হয়ে প্রশ্নটা করে নিজের লোক দুজনকে দেখে নিয়ে বলে উঠল, 'আপনি আমাকে বলছেন?'

'জি,' বলে শারিয়ার মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সিগারেট ধরা হাতের আঙুলটা মেয়েটার দিকে তাক করে বলে উঠল, 'সময়টা শীতকাল ঠিক আছে। কিন্তু পরিস্থিতি এমন না যে এত সকালবেলা আপনাকে এভাবে টাই-টুইসহ স্যুট পরতে হবে।'

'দেখুন মিস্টার শাহরিয়ার...'

'নামটা শারিয়ার,' শারিয়ার তাকে শুধরে দিল। 'শাহরিয়ার নয়...'

'মিস্টার হোয়াটএভার। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি আপনি আমার পরসোনাল কোনো বিষয় নিয়ে...'

'ব্যাপারটা আসলে ব্যক্তিত্বের,' বলে সে নিজেকে একটু এগিয়ে নিয়ে গেল মেয়েটার দিকে। 'তাইনা?' শারিয়ার সরাসরি তাকিয়ে আছে মেয়েটার পিঙ্গল রঙের চোখের দিকে। 'আরো বিশদ বলতে গেলে ব্যক্তিত্ব এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার। আর একারণেই স্যুট, যদি আমি ভুল বলে না থাকি। আপনি...'

'মিস্টার শারিয়ার, আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আমি স্রেফ আমার প্রফেশেনাল ডিউটি পালন করছি, কাজেই...'

'সীমার কথাই যদি বলেন তবে একটা কথা বলি। এই কেস আমার অধীনেই পরিচালিত হবে। আর সেটাকে পরিচালনা করার জন্যই আমি ঢাকা থেকে এসেছি। যে-পর্যন্ত আমার সরাসরি কর্তৃপক্ষ হাবিব আনোয়ার পাশা স্যার কিংবা আমার নিজের হেড অফিস থেকে আমাকে কিছু জানানো না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এখান থেকে এক পাও নড়ছি না। কাজেই খবরদার আমার ওপরে খবরদারি করার চেষ্টা করবেন না, মিস হোয়াটএভার। ভালো চাইলে আপনি আপনার এই আহামরি চেহারা আর নিজের লোকদেরকে নিয়ে আমাকে যদি সাহায্য করতে পারেন করেন, না পারলে ভাগেন। ইজ দ্যাট আন্ডারস্টুড?' শেষের কথাগুলো শারিয়ার বলতে গেলে প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল।

ওর সামনে বসা স্পেশাল অফিসার মেয়েটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন তার চেহারা লাল হতে হতে বোমার মতো বিস্ফোরিত হবে। সে একটা আঙুল তুলে শারিয়ারের দিকে তাক করল তারপর দুবার কথা বলার জন্য মুখ খুলল কিন্তু কথা বেরুল না মুখ দিয়ে। তার পরিবর্তে রাগের হলকা বেরিয়ে আসছে যেন।

মেয়েটা রাগের সঙ্গে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ভুবন এগিয়ে এলো সামনের দিকে। 'আমার মনে হয় এখানে একটু ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। আমাদের আসলে...' ভুবন কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই শারিয়ারের মোবাইলটা বাজতে লাগল। শারিয়ার বেশ চমকে উঠেছে, ভুবনের কথা থেমে গেছে, আর মেয়েটা তাকিয়ে আছে সেই আগ্নেয়গিরির দৃষ্টিতে। তার পেছনে দাঁড়ানো অফিসার দুজন একে অপরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

শারিয়ার ফোনটা পকেট থেকে বের করে চোখের সামনে তুলে দেখল ফোনটার ফাটা স্ক্রিনের ফাঁক দিয়ে ওর ঢাকা অফিসের নম্বর দেখা যাচ্ছে। মেয়েটার আগ্নেগিরির মতো চেহারায় সামান্য ফাটল দেখা দিল। তারপর সেখানে ধীরে ধীরে ফুটেউঠল কৌতুকের হাসি। যেন সে বলতে চাইছে, ফোনটা রিসিভ করুন হিরো। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই শারিয়ার কলটা রিসিভ করে কানে লাগাল মোবাইলটা।

যদিও জানত কে কথা বলবে তবুও এই অবস্থায় হাবিব আনোয়ার পাশার ভারী গলাটা শুনে বুকের ভেতরটা কেমন জানি কেঁপে উঠল ওর। 'শারিয়ার এই জন্য

আমি তোমাকে চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলাম?' কোনো সম্বোধন নয়, কোনো খোঁজখবর চাওয়া নয়, কিছুই নয়। এমনকি কোনো জোর গলায় ধমক পর্যন্ত নয়। শারিয়ার যে কোনো পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিল কিন্তু হাবিব আনোয়ার পাশার আবেগি গলা শুনে ওর ভেতরটা সত্যিকার অর্থেই কেঁপে উঠল ওর। 'স্যার...'

'তুমি কি জানো এই কেসটাকে লোকাল পুলিশ আর সিবিআইয়ের হাত থেকে আমাদের হাতে নিতে কী পরিমাণ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমার? তুমি কি জানো এই কেসটা কেন আমি আমাদের হাতে নিয়েছি?'

শারিয়ার চুপ, ওর মাথায় কিছু খেলছে না।

'আমি কতটা আশা নিয়ে আর সাহস করে তোমার ওপরে, স্রেফ তোমার ওপরে ভরসা করে পুরো দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলাম। আর তুমি কী করলে...' পাশা স্যারের গলার উত্তাপ ধীরে ধীরে বাড়ছে।

'স্যার, আই ক্যান এক্সপ্লেইন...'

'হোয়াই, শারিয়ার?' বলে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। 'কেন আমি তোমার ব্যাখ্যা শুনব শারিয়ার? যেখানে ব্যাখ্যা নয় বরং কাজে লাগানোর জন্য আমি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম। আমি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম কারণ তুমি অ্যাকশনের মানুষ। কিন্তু সেই অ্যাকশন যদি এরকম হয় যে সব হারিয়ে এমনকি কেসের প্রধান ক্লুগুলোই হারিয়ে বসে থাকো তবে এখানে ব্যাখ্যা শুনে কী হবে শারিয়ার?'

ফোনের ওপারে-এপারে দুপাশেই নীরবতা। শারিয়ার একবার আড়চোখে দেখে নিলভুবনকে সেইসঙ্গে তার সামনের মানুষগুলোকে। সবাই বুঝতে পারছে কথোপকথনটা কোনদিকে যাচ্ছে।

'তুমি এত চমৎকার একটা ট্রেনিং থেকে এসে একের পর এক গুবলেট করেই যাচ্ছ। গ্রো আপ বয়। এটা আমাদের জন্য এমন একটা কেস হতে পারত যেটা আমি নতুন যে ডিপার্টমেন্টটা খুলতে যাচ্ছি সেটার জন্য সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হতে পারত। হ্যাঁ, উদাহরণ এখনো হয়েছে সেটা উল্টোদিক থেকে। আল্লার ওয়াস্তে তুমি আমাকে মাফ করো...'

'স্যার, আমার জন্য আপনার কী নির্দেশনা?' পাশা স্যারের সঙ্গে এই কথোপকথনটা আর নিতে পারছে না শারিয়ার। তাই কথা শেষ করতে চাচ্ছে সে। আর তাছাড়া সিদ্ধান্ত কী হবে ইতোমধ্যেই বুঝে ফেলেছে ও।

'কেসটা এই মুহূর্তে আর আমার হাতে নেই। এর সঙ্গে অনেক ব্যাপার জড়িয়ে গেছে। সবকিছু একেবারে লেজেগোবরে হয়ে গেছে। অথরিটি চাচ্ছে এটাকে লোকাল অফিস ইনচার্জ রুম্পার হাতে তুলে দিতে। আমিও এগ্রি করেছি আর তাই রুম্পা যেভাবে বলে সেভাবেই তুমি অ্যাক্ট করবে। বোঝা গেছে শারিয়ার?'

'জি, স্যার,' বলে ও আড়চোখে রুম্পার দিকে দেখল। মেয়েটার চোখে বিজয়ের নীরব হাসি। 'মিস রুম্পা যেভাবে বলবে সেভাবেই আমি অ্যাক্ট করব,' কথা শেষ করে মোবাইলটা নামিয়ে রেখে ও দেখল ভুবন খুব দুঃখী চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। রুম্পার চোখে নীরব বিজয় আর তার পেছনের দুজনের চেহারা কোনো বিশেষ ভাব নেই।

মোবাইল নামিয়ে রেখে ঠাণ্ডা গলায় কথা বলে উঠল শারিয়ার। 'মিস রুম্পা আপনি নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পেরেছেন পাশা স্যারের সঙ্গে আমার কথোপকথন,' বলে সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'আপনি যা বলবেন সেটাই আমার জন্য নির্দেশনা।'

'আপনাকে এই কেস থেকে ডিসচার্জ করা হলো। এই কেসের জন্য আপনার সার্ভিস আর প্রয়োজন নেই অফিসার,' বেশ আত্মতৃপ্তি ভরা গলায় কথাটা বলে বাকিদের দিকে তাকিয়ে মৃদু একটা হাসি দিল স্পেশাল অফিসার রুম্পা তালুকদার।

অধ্যায় একুশ
সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ
খণ্ডালের গুহা, রামু, চট্টগ্রাম

নৌকা থেকে মাটিতে পা রাখার সময় নিজের শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পেরে পড়ে গেল কিরান। তাতে অবশ্য ভালোই হলো। একের পর এক শারীরিক আর মানসিক চাপে একেবারে কাবু হয়ে গেছিল ও। তার ওপরে দীর্ঘ সময় নৌকায় বসে থেকে শরীর একেবারে জমে গিয়েছিল। তাই মাটিতে পা রাখতেই শরীর আর ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। পড়ে গেছে সমুদ্রপারের আধভেজা বালিতে।

মাটিতে পড়ে যেতেই রাতের আকাশে চাঁদ আর নক্ষত্রের অবস্থান পরিষ্কার দেখতে পেল সে। সন্ধেবেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে সময়টা পরিষ্কার বুঝতে না পারলেও এবার রাতের আকাশে নক্ষত্রের অবস্থানের দিকে তাকিয়ে এটা বুঝতে পারল নৌকায় আসতে আসতে যতটা সময় পার হয়ে গেছে বলে ও ভেবেছিল সময় আসলে ততোটা পার হয়নি। ভোরের জোয়ার ধরতে হলে এখনো আরো আট দশ-ঘণ্টা সময় আছে। কাজেই এ-পর্যন্ত যেহেতু পৌঁছে গেছে ও তাতে করে আর সমস্যা হবে না।

'ওস্তাদ, তুমি ঠিক আছ?' চাঁদের হালকা আলোতে একটা ছায়া পড়ল ওর ওপরে। কিরান চোখ মেলে দেখল বেদু তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বেদুর কোলে বানরটাকে এমনভাবে ধরে রেখেছে যেন কোনো ঘুমন্ত মানবশিশু। অন্যদিকে দস্তানা পরা অন্য হাতটাতে ইগলটা বসে ছিল। ওটাকে মৃদু ঝাঁকি দিতেই শূন্যে উড়াল দিল ওটা। বেদু হাতটা বাড়িয়ে দিল কিরানের দিকে।

মাটিতে শুয়ে কিরানের এত আরাম লাগছিল ক্লান্তির চোটে মনে হচ্ছিল আধভেজা মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু বেদু হাত বাড়াতেই সে শক্ত করে বেদুর হাতটা ধরল। বেদু এক টানে দাঁড় করিয়ে ফেলল তাকে। উঠে দাঁড়িয়ে কিরানের দৃষ্টি গেল নৌকোটার দিকে।

গোমেজ ওটাতে চড়ে মাটিতে টেনে তুলে নৌকা থেকে ধরে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিল হালকা পাতলা আকৃতির মানুষটাকে। তারপর ঝুঁকে পড়ে নৌকোর পাটাতন থেকে তুলে নিল একটা ভারী বোঝা। বোঝাটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে

দাঁড় করানো মানুষটার কাঁধে ধরে এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে। কিরানকে উঠে দাঁড়াতে দেখে সে সামান্য হেসে উঠল। কাঁধের বিশালাকায় ফিরিঙ্গিটাকে এমনভাবে ধরে রেখেছে যেনে মানুষটা তুলোর চেয়ে হালকা।

কিরানও তার দিকে তাকিয়ে শুষ্ক একটা হাসি দিয়ে গোলন্দাজের কাছে জানতে চাইল, সে ঠিক আছে কিনা। গোলন্দাজ কোনো কথা না বলে সামান্য মাথা নেড়ে জবাব দিল, সে ঠিক আছে। যদিও তার চেহারা আর অবস্থা দেখে যে-কেউ বুঝতে পারবে আসলে কিছুই ঠিক নেই। কিরন একবার ফিরে তাকাল দূরের পাহাড়গুলোর দিকে। ওরা সৈকতের যেই প্রান্তে আছে সেখান থেকে খণ্ডালের গুহা কয়েক মাইল দূরে হবে। এই শরীরে কয়েক মাইল হাঁটতে কষ্ট হবে কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কি। যত দ্রুত হাঁটতে শুরু করবে ততো দ্রুত পৌছাতে পারবে। সবাইকে এগোনোর জন্য ইশারা করে কিরান হাঁটতে শুরু করল।

খণ্ডালের গুহার কাছাকাছি পৌছাতে পৌছাতে কিরানের মনে হলো পা আর চলছে না। কয়েক মন শিসে বেঁধে দেওয়া হয়েছে পায়ের সঙ্গে। আরেকটু এগোলে হয়তো হোঁচট খেয়ে পড়েই যেত হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে সবাই থেমে গেল। আঁধারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক সারি লাঠিয়াল। সবার অগ্রভাবে তুলারামকে দেখে মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল কিরানের। তার দিকে তাকিয়ে একটা হাত তুলে সে বলে উঠল, 'কুনোদিন ভাবি নাই তরে দেইখা এত খুশি হবো,' বলে সে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ে গেল তুলারামের গায়ের ওপরে।

***

জ্ঞান ফিরে আসতেই চট করে উঠে বসল কিরান। মুহূর্তের জন্য ওর মনে হতে লাগল ও শত্রুশিবিরে বন্দি আছে। পরমুহূর্তে যেইমনে পড়ল সে কোথায় আছে সেই মুহূর্তে পলকের জন্য মনে হলো ওকে ফেলে জাহাজসহ সবাই চলে গেছে। কিন্তু ওর সামনে উপবিষ্ট মানুষটার দিকে চোখ পড়তে আরো অনেক বেশি অবাক হলো কিরান।

'শান্ত অও কিরান, সব ঠিক আছে,' মানুষটা তার মুখের সামনে থাকা গড়গড়ার ধোঁয়া হাত দিয়ে তাড়ানোর মতো করে বলে উঠল। কিরান অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আকরাম চাচা আপনে?'

আকরাম বেগকে এই সময়ে এখানে দেখে খুবই অবাক হয়েছে কিরান। তার চেয়ে বড়ো যে প্রশ্নটা ওর মনে জেগেছে সেটা হলো, এই লোক এখানে কী করছে। 'আপনি এই সময়ে এখানে...!' নিজের বিস্ময়ভাবটা আসলেই লুকাতে পারল না কিরান। অথবা বলা চলে, সে চাইলও না।

কিরানের কথা শুনে হেসে উঠল আকরাম বেগ। 'তুমি খুশি হও নাই আমারে দেইখা?' প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে কথাটা বলে সে নিজেই হেসে উঠল তারপর অনেকটা মজা করার মতো করে বলে উঠল, 'এত বড়ো একটা কামে যাইতাছো তুমগোরে আশীর্বাদ করতে আইলাম। তুমি খুশি অও নাই?' জানতে চেয়ে সে আবারও হেসে উঠল।

কিরান হাত নেড়ে বলে উঠল, 'ঠিক আছে।'

'ঠিক নাই,' বলে আকরাম বেগ ওর দিকে এগিয়ে এলো খানিকটা। কিরান একটু অস্বস্তির সঙ্গে অনুভব করল আকরাম বেগ ওর কপালে হাত রেখে বলে উঠল, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'জি, আসলে?' কিরান গায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে উঠে বসল। ওভাবে বোকার মতো জ্ঞান হারিয়ে ফেলাতে কিরানের নিজের কাছেই এখন লজ্জা লাগছে খানিকটা। 'চাচা, আসলে তেমন কিছু না। অতিরিক্ত ক্লান্তিতে...'

'কিরান,' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আকরাম বেগ বলে উঠল। 'যে কামে তুমি যাইতাছো এর জন্য সবাই যখন তুমার নাম প্রস্তাব করল আমি প্রথমে মানা করছিলাম। সত্যি কথা অইলো তুমারে আমার এই কামের যোগ্য মনে অয় নাই। বিশেষ কইরা আগের তুমি অইলে কথা ছিল না। কিন্তু গত কয়েক বছর ধইরা, সারাক্ষণ মদ, তামাক আর অনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন তুমারে শেষ কইরা দিছে,' কিরান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আকরাম বেগ হাত তোলাতে সে তাকে থামিয়ে দিল। 'কিন্তু গত কাইল কামে নামার পর থেইকা তুমি যা দেহাইছো আমি হতবাক। আমার বন্ধু তালেব তৈমূর ক্যান সবসময় তুমারেই তার সত্যিকারের সন্তান মনে করত আমি খানিকটা অনুভব করতে পারতাছি। বিরাট সাহসের কাম করছ তুমি, বিশেষ কইরা আইজ বিকেলে ওই ফিরিঙ্গিটারে ধইরা আনা তারপরে আবার নুনের ভিটায় গিয়া গোলন্দাজরে উদ্ধার কইরা আনা, খালি তুমার সাহস কিংবা সামর্থের না বরং তুমার বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় পাইছি আমি। আমার বিশ্বাস তুমার বাপে...' কিরান খুব অবাক হয়ে দেখল পাথরের মতো মানুষটার চোখে পানি।

আবারও কিরান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই আকরাম বেগ উঠে দাঁড়াল নিজর গড়গড়া আর পাঞ্জাবি সামলে নিয়ে সে কিরানের দিকে হাত তুলে বলে উঠল, 'কিরান খুব বেশি সময় পার অয় নাই। এহনো জোয়ার ধরার লাইগ্গা অনেক সময় আছে কিন্তু অনেক কামও আছে। তুমি পরিষ্কায় অয়া,' বলে সে জায়গাটার কোনায় পানির একটা ঘরা দেখাল। 'ওই নতুন কাপড় পইড়া লও,' বলে সে খাটিয়াটার কিনারায় রাখা কাপড় দেখাল। কিরান কিছু না বলে মাথা নাড়ল।

আকরাম বেগ বেরিয়ে যেতেই চট করে উঠে দাঁড়াল কিরান। তারপর প্রথমেই আকরাম বেগের গড়গড়াটার কাছে গিয়ে ওটার নলটা মুখে নিয়ে টানতে লাগল। টানা বেশ কয়েক টান দিয়ে ধোঁয়া টেনে নিয়ে পরম তৃপ্তি পেল ও।

'মানুষ মইরা গেলেও সিধা অয় না,' ছোটো কামরাটার কিরানা থেকে একটা ভারী গলা বলে উঠল। কিরান ধোঁয়া টানতে টানতেই সেদিকে ফিরে তাকাল। 'কিছু করার নাই, যস্মিন দেশে যদাচার,' বলে কিরানও হেসে উঠল পট্টবর্ধনের কথা শুনে। 'আমার অবস্থায় পড়লে বুঝতা।'

গড়গড়ার নলটা রেখে কিরান শুধু কোমরবন্ধনী বাদে গায়ের বাকি পরিধেয় খুলে ফেলে পানির ঘরাটার কাছে গেল। গায়ে হাতে, মুখে পানি দিতে দিতে ফিরে তাকাল পট্টবর্ধনের দিকে। পট্টবর্ধন কিরানের শুয়ে থাকা খাটিয়ার কিনারায় বসে ওর দিকে এক চোখে তাকিয়ে প্রশংসার সুরে বলে উঠল। 'বিরাট খেইল নাহি দেখাইলা আইজ?' তার গলায় নিখাদ প্রশংসা।

গায়ে পানি ঢালতে ঢালতে কিরান বলে উঠল। 'শোন কাপ্তান, প্রস্তুতি যতই শক্ত হোক সেটাতে প্রশংসার কিছু নাই, যদি না তুমি কামে সফল অইতে পার,' বলে কিরান তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল, 'এহন পর্যন্ত যা অইছে সেটাকে কপাল ভালো আছিল, আমার লগে সাহসী লোক আছিল তাই পারছি। কিন্তু এই পারার দাম নাই যদি আসল কামে সফল না অইতে পারি। তুমগো কী অবস্থা, এহন পর্যন্ত?' কিরান পানি ঢালা শেষ করে গা মুছতে মুছতে জানতে চাইল। 'জোয়ার ধরা যাইব সকালের?'

'সব ঠিকঠাক থাকলে আমগো প্রস্তুতি একেবারে শেষ দিকে,' বলে পট্টপর্ধন নিজের সাদা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলে উঠল, 'তোমরা আলোচনা কইরা কর্তব্য ঠিক করতে পারলে আগামী তিন থেইকা চাইর ঘণ্টার ভেতরে আমরা জাহাজ ভাসাইতে পারব।'

'ঠিক আছে,' কিরানের পোশাক পরা শেষ হতেই সে দেখতে পেল ওর জোড়া ড্যাগার আর পিস্তল জোড়াও বিছানার কিনারায় রাখা আছে। 'গোলন্দাজের লগে দেহা অইছে?' অস্ত্রগুলোকে কোমরবন্ধনীর সঙ্গে আটকাতে আটকাতে জানতে চাইল কিরান। জবাব না পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল পট্টবর্ধনের ভালো চোখটা যেন জ্বলছে। কিরান তার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাতেই হেসে ফেলল সে। 'না, এহনো অয় নাই।'

'বেচারা আইজ সব হারাইছে,' কথা নয় যেন পট্টবর্ধনের কাছে আবেদন।

'শুনলাম,' মৃদু স্বরে বলে উঠল পট্টবর্ধন। 'এহন চলো।'

পট্টবর্ধনকে নিয়ে কিরান পা রাখল কামরার বাইরে। ওরা ছোটো জলা মতো জায়গাটা পার হয়ে প্রবেশ করল মূল গুহায়। সেখানে প্রবেশ করেই কিরান দেখতে

পেল তিনটে জাহাজই একেবারে প্রস্তুত অবস্থায় সারি দিয়ে রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটাতে সাজানো কামানগুলো দেখে কিরানের বুকো বল যেন তিন গুণ হয়ে গেল। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখা গোঁফে তা দিল একবার।

'দারুণ না?' পট্টবর্ধন বলে উঠল। 'কিরান কোনো জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইল জাহাজগুলোর দিকে। 'আমার লোকেরা সবাই প্রস্তুত?' সে জানতে চাইল।

'একেবারে ওস্তাদ? কিরান ফিরে তাকিয়ে দেখল একেবারে সমর সাজে সজ্জিত হয়ে কাঁধে বানর আর হাতে ইগলটাকে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এলো বেদু। কাছে এসে হুপ করে শব্দ করতেই ইগলটা শূন্যে উঠে পাক খেতে লাগল।

'তোর বাঘটা কই?' কিরান জানতে চাইল।

'ওইটা আছে। মতিরেসহ ওইটারে এইহানের মন্দার বাজারেই রাহার ব্যবস্থা করছে আকরাম বেগ।'

কিরান সন্তুষ্টির সঙ্গে মাথা নাড়ল। ডানে তাকিয়ে দেখতে পেল বৈঠা আর বিল্লাল শেঠ জাহাজে কোষা নৌকা তুলতে সাহায্য করছে। সেদিকে তাকিয়ে সামান্য হাত নাড়ল কিরান।

'অস্ত্রসস্ত্র সব সাজানো অইছে?' পট্টবর্ধনের দিকে দেখে জানতে চাইল কিরান।

'সব তোলা আছে গত দিনে যা যা দেখছিলা,' বলে সে মাথা নাড়ল। 'তুমগো সবার লগে রাইতের আহারের আয়োজন করা অইছে। সেখানেই সব আলোচনা অইবে। চলো,' বলে সে কিরানের পিঠে হাত রেখে গুহার একপাশে চলে এলো। সেখানে এসে দেখল পাহারাদারদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা আকরাম বেগের সঙ্গে কথা বলছে বাবুর্চি রহমত চাচা। তার সঙ্গেই একেবারে আপাদমস্তক কারো পোশাক পরা একজন মানুষ। লোকটা আকরাম বেগকে কিছু একটা বলছিল, কিরানকে দেখে থেমে গেল। রহমত চাচা তাকে নিয়ে রওয়ানা দিল জাহাজের ভেতরের দিকে।

কিরানকে দেখে আকরাম বেগ হাতের ইশারায় তাকে কাছে ডাকল। কিরান সেদিকে এগিয়ে যেতেই আকরাম বেগের কাছে জানতে চাইল, 'ওই লোকটা কে, ওরকম পোশাক পরে আছে কেন?'

আকরাম বেগ একটু অবাক হয়ে ফিরে তাকাল কিরানের দিকে, 'তুমি জানো না?' সে যেন একটু অবাক হয়েছে। কিরান মাথা নেড়ে মানা করল। আকরাম বেগ মাথা নাড়ল আফসোসের সঙ্গে। 'এরা এক অদ্ভুত প্রজাতির মানুষ। এগো কোনো ধর্ম নাই, সমাজে অবস্থান নাই। এইডা আমাগো সমাজেরই খুব অদ্ভুত এক প্রথা। জীবন থেইকা সব হারায়ে, সব শেষ হয়ে গেলে এরা যখন সর্বস্ব হারায় নিজে থেকেই ওগোরে কিছু অর্থ দিয়াঋণমুক্ত কইরা দেওয়া হয়। বিনিময়ে এরা চিরতরে

চুপ হইয়া যায়, এগোর কথা বলা নিষেধ, এদের নিজের চেহারা কাউকে দেখানো নিষেধ। এগোরে কী বলে জানো?' বলে আকরাম বেগ কিরানের দিকেতাকিয়ে দুঃখের হাসি হেসে উঠল। 'এগোরে বলে 'পতিত',' বলে সে কিরানের পিঠে জোরে চাপড় মারল।

কিরান একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল লোকটার খোঁজে। কিন্তু দেখতে পেল না। এই বিশেষ গোত্রের লোকদের কথা ওর জানা ছিল, কিন্তু কখনো সামনাসামনি দেখেনি। আকরাম বেগ ওর পিঠে চাপড় মেরে বলে উঠল, 'তুমি তো মনে হয় সেই দুপুরের পর থেইকা আর কিছু খাও নাই। আমরাও খাই নাই। চলো খাইতে খাইতে কথা হবে,' বলে সে কিরানকে গুহার এক প্রান্তে নিয়ে গিয়ে দেখতে পেল সেখানে লম্বা করে দস্তরখানা বিছানো হয়েছে খাবার জন্য।

আকরাম বেগ কিরানকে নিয়ে বসে পড়ল। কিরান বসে দেখল ওরা যেখানে বসেছে সেখানে গোল হয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবাই বসে যেতেই খাবার পরিবেশন করা হলো, সেইসঙ্গে চলল আলোচনা। খাওয়া শেষ হতেই প্রথমেই পট্টবর্ধন উঠে দাঁড়িয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সে আকরাম বেগের অনুমতি নিয়ে বলতে শুরু করল। 'আমি পট্টবর্ধন চাঁটগাওয়ের কায়স্থ বর্ধন পরিবারের সন্তান। আমি এখানকার সর্বাগ্রে থাকা বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের অনুমতি নিয়া শুরু করতাছি। এহানে ধর্ম-কর্ম, জাত-পাত সব কিছু নির্বিশেষে আমরা জড়ো হয়ছি একটা মহৎ উদ্দেশ্য মাথায় নিয়া। আমগোর নিয়োগকর্তা,' সে একটু বলতেই আকরাম বেগ মাথা নেড়ে মানা করল।

পট্টবর্ধন বলতে লাগল, 'আমি প্রথমেই আমগো প্রস্তুতির ব্যাপারে কয়া নেই। আমগো তিনটা জাহাজ আছে, দুইটা জালিয়া, একটা বড়ো যুদ্ধজাহাজ। বড়ো অস্ত্রের মধ্যে বড়ো জাহাজে আছে চাইরটা কামান, পরের দুইটাতে তিনটা কইরা কামান। তিন জাহাজ মিলায়া বন্দুক আছে প্রায় তিরিশটার বেশি। আর লাঠি, বর্শা, কোচ, বেইদ, তলোয়ার, ছুরি এইগুলার বহুত আছে,' সে এই পর্যন্ত বলতেই তালি দিয়ে উঠলসবাই।

'আমগো তিন জাহাজে মোট মানুষ আছে প্রায় চল্লিশজনের মতোন। এর বাইরে প্রত্যেক জাহাজে দাড়ি আছে আরো বিশ জন কইরা। যদিও আমরা পালের ওপরেই বেশি নির্ভর করব। এর পাশাপাশি আমাগো আছে,' বলে সে থেমে গেল। 'সবার সেরা যুদ্ধ জাহাজি তালেব কিরান,' কিরানের নাম নিতেই সবাই জোরে শব্দ করে উঠল মুখ দিয়ে।

কিরান উঠে দাঁড়াল। 'পট্টবর্ধন আমার বড়ো ভাইয়ের মতোন। সে অনেক কথাই বলছে কিন্তু একটা কথা আমি বলতে চাই। এই যে আমরা এত মানুষ। এত প্রস্তুতি সব কিসের লাইগ্না। আমরা আইজ নিজ ভূমে পরবাসী, দানবের থাবায় আমগো উপকূল খালি অইযাইতাছে, আমগো মানুষগো গরু-ছাগলের মতোন কেনাবেচা করতাছে হুগলির হাটে, রোসাঙ্গের বাজারে। কারা করতাছে?' বলে সে একটু থেমে যোগ করল। 'বিদেশিরা। যারা বাইরের মানুষ তারা আমগো উচ্ছেদ করতাছে, আর আমরা নিজের ভূমিতে ভয়ে কাঁপতাছি। সময় আসছে দানবের মোকাবেলা করার। আমগো সুবাদার যে কিনা এই বাঙ্গাল মুল্লুকের জন্য সবচে বেশি কষ্ট করছে সেই শাহ সুজারে পরিবারসহ হত্যা করা অইছে। আমার বাবা তারে সাহায্য করতে গিয়া প্রাণ লয়া ভাগতাছে। তারে সাহায্য করতেই আমগো এই অভিযান। তুমরা কি সবাই আছ আমার সঙ্গে?' শেষ শব্দগুলো কিরান উচ্চারণ করল গলার সর্বোচ্চ জোর নিয়ে।

সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল। কিরান আকরাম বেগদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'তাইলে কাজে নামব এখন, সকালের জোয়ারের প্রথম প্রহরেই আমগো জাহাজ পানিতে নামব। বোঝা গেছে?'

সবাই কাজে নেমে যেতেই কিরান পট্টবর্ধনকে কাছে ডেকে সব কাজ তদারকির নির্দেশ দিল। তারপর আকরাম বেগে দিকে ফিরে কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই দেখতে পেল গোলন্দাজ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। সে খাওয়াতেও ছিল না ওদের সঙ্গে।

'গোলন্দাজ, তুমি খাইছো?' গোলন্দাজ জবাব না দিয়ে কিরানের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর খুব হালকা স্বরে জানতে চাইল, 'কিরান তুমি সব কইলা কিন্তু সিলভেরার নাম নিলা না? কারণ কী?' সে হাতের হুঁকোতে দুটো টান দিল। 'এহনো ভয় পাও?'

কিরান একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গোলন্দাজের দিকে। 'আমি ভয় পাই, আর এই কারণেই আমি এই ভয়েরে শেষও করতে চাই,' বলে সে তাকিয়ে রইলগোলন্দাজের দিকে। 'আর আমি জানি তুমিও ভয় পাও। আর তুমারেও এই ভয় কাটাইতে হবে। আমি তো স্রেফ নিজেরে হারাইছি। তুমি তো সব হারাইছো। কাজেই যদি পার সব দিয়া আমারে সাহায্য করো।'

কিরান আর গোলন্দাজ কথা বলছে দূর থেকে পট্টবর্ধন তাকিয়েছিল ওদের দিকে। গোলন্দাজও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। পট্টবর্ধনই নিজে এগিয়ে এলো প্রথমে। 'গোলন্দাজ, কেমন আছো?' তর ভালো চোখটাতে কোনো ভাব নেই।

গোলন্দাজ কিছু না বলে মাথা নাড়ল।

'আইজ সন্ধ্যার সব কথা আমি শুনছি, খারাপ লাগছে,' বলে সে দম নিয়ে একবার কিরানকে দেখল। গোলন্দাজ মাথা নিচু করে আছে। 'তুমারে আমগো দরকার, গোলন্দাজ,' চট করে মুখ তুলে তাকাল গোলন্দাজ। যেন পট্টবর্ধনের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। যে মানুষটা এক সময় দাবি করত গোলন্দাজের কারণেই তাদের পরাজয় হয়েছে। যে মানুষটা একটা চোখ হারিয়েছে তার কারণে। সে কিনা... গোলন্দাজ এক এগিয়ে আবেগী গলায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই কথা বলে উঠল অন্য কেউ।

'এই জাহাজি, এইদিকে আহো,' কিরান ফিরে তাকিয়ে দেখল লাঠিয়াল তুলারাম ওকে ইশারায় গুহার এক প্রান্তের দিক ডাক দিচ্ছে। কিরান এগিয়ে যেতেই সে বলে উঠল, 'তুমি যে ফিরিঙ্গিটারে ধইরা আনছিলা ওরে গত দুই ঘণ্টা ধইরা জেরা কইরা একটা ব্যাপার জানা গেছে।'

কিরান তাকিয়ে আছে তুলারামের দিকে।

'হেয় জানাইলো হেগোরো কাপসের বাজার আর গোলন্দাজের বাড়ি থেইক্কা সোজা সন্দ্বীপে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া অইছিল।'

'তারমানে কি সিলভেরারে সন্দ্বীপে পাওয়া যাবে?' কিরান আপন মনে বলে উঠল।

'হইতেও পারে আবার নাও পারে,' আকরাম বেগ বলে উঠল। 'মনে রাইখো সন্দ্বীপ এহন দস্যুগোর মূল আস্তানা। সিলভেরা অইহানে না থাকলেও হের খবর ঠিকই পাওয়া যাবে ওইহানে। কিন্তু সন্দ্বীপ মানে বিপদের আখড়া–'

কিরান তাকিয়ে আছে বেদু গোমেজ আর আকরাম বেগের দিকে। 'আমগো সন্দ্বীপেই যাইতে হবে। আমার বিশ্বাস অইহানে গেলেই পাওয়া যাবে সিলভেরার খবর। সে কোনো দিকে রওনা দিছে অথবা বাপুর পিছু নিতে কোনো দিকে যাইতে পারে, সেইটার খবরও জানা যাবে ওইখান থেইকাই। কাজেই অমগো প্রথম গন্তব্য সন্দ্বীপ,' বলে সে বেদুকে ইশারা করল সিদ্ধান্তটা পট্টবর্ধনকে জানিয়ে দিতে।

'কিরান কাজের পরিকল্পনা কি?' আকরাম বেগ জানতে চাইল।

'আমি এহনো জানি না,' কিরান খানিকটা হেসে উঠল। 'জাহাজ তিনটাই লইয়া রওয়ানা দিব, সন্দ্বীপ যাব সিলভেরা আর বাপুর খবর বাইর করব। তারপর দেখব সিলভেরার কত তেল আছে,' কিরান চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠল।

'আমারও মনে হয় এখন সেটাই ঠিক হবে,' বলে সে কিরানের হাতে একটা চামড়ার থলি ধরিয়ে দিল। 'এটা এহন খুলবা না। এখানে সন্দ্বীপে আমার নিজের লোকের নাম আছে। লোকটা কে, তারে কেমনে পাইবা সব এহানে লেখা আছে। অর শোন জাহাজ সন্দ্বীপ থেইকা এট্টু দূরে রাখবা। সন্দ্বীপে এক দল যাবা না। কয়েক দলে ভাগ হয়া যাবা। খবর পাওয়া মাত্রই রওয়ানা দিবা, বোঝা গেছে?'

'জি, চাচা,' কিরান এই প্রথমবারের মতো আকরাম বেগকে চাচা ডাকল।

তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'বৈঠার পোলা, বেদুর সহকারী মতি আর ওর প্রাণীগুলা, তোমার আম্মা, আর এই ফিরিঙ্গিটারে নিয়া চিন্তা করিও না। ওগোরে আমি দেখবো। তুমি কামে নামো,' কিরান বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল হঠাৎ আকরাম বেগ পেছনে থেকে তাকে ডাক দিল। 'কিরান, মনে রাইখো তোমার আব্বা তোমার সঙ্গেই আছে, মানে তার আশীর্বাদ আছে তোমার সঙ্গে। সে তোমার ওপরে নির্ভর কইরা আছে,' তার মুখে মৃদু হাসি। তারপর মুখটাকে শক্ত করে বলে উঠল, 'মনে রাখবা, জয়ের আনন্দ সেই সবচেয়ে বেশি উপভোগ করতে পারে যে পরাজয়ের তিতা স্বাদ পাইছে। কাজেই,' বাক্যটা অসমাপ্ত রেখে সে ঘুরে দাঁড়াল। কিরানও আনমনে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে এলো গুহাতে। সেখানে দুর্দান্ত হাকডাকের সঙ্গে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জাহাজ জলে ভাসানোর।

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা ওরা চরম ব্যস্ততায় পার করল। ভোরের প্রথম আলোর সঙ্গেসঙ্গে ফেঁপে উঠল পানি। জাহাজ নামানো হলো সেই পানিতে। বহুদিন পর কিরান জাহাজের সঙ্গে লাগোয়া নিজের কামরার ছোটো বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জাহাজ এখনো সমুদ্রের পানিতে নামেনি। সেটা মোহনা ঘিরে চক্কর দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চলে এলো খোলা সমুদ্রে।

কিরান বুক ভরে টেনে নিল সমুদ্রের নোনা বাতাস। বহু বছর পরে নিজেকে জীবিত মনে হচ্ছে ওর। পট্টবর্ধন ওর দিকে তাকাতেই হাতের ইশারায় দাঁড় টানা বন্ধ করে পাল খুলে দিতে ইশারা করল কিরান। পাল খুলে যেতেই তড়তড়িয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করল জাহাজ।

'ওস্তাদ, সেই গানটা গাও,' বেদু পেছন থেকে বলে উঠল। কিরান দেখল পট্টবর্ধনে মুখেও প্রশ্রয়ের হাসি। আসার পর থেকে গম্ভীর মুখে থাকলেও এই প্রথমবারের মতো সামান্য হেসে উঠল গোলন্দাজ। কিরান মাথা নেড়ে মানা করল। কিন্তু গোলন্দাজই প্রথম হাতের ছোটো লাঠি দিয়ে বাড়ি মারল জাহাজের রেলিংয়ে। তারপর পট্টবর্ধন, তারপর তুলারামের বাহিনীর লোকেরা। একে একে পুরো জাহাজের সবাই যে যেখানে আছে সেখান থেকে হাতের তালে বাড়ি মারতে লাগল জাহাজের খোলে বা রেলিংয়ে।

কিরান পট্টবর্ধনের দিকে ইশারা করতেই সেই প্রথম গেয়ে উঠল,

‘শূন্য থেইকা আসে মানুষ, শূন্যে মিলাই যায়’,

চিৎকার করে গেয়ে উঠল সে। সঙ্গেসঙ্গে পেছন থেকে পুরো জাহাজের মাল্লা থেকে শুরু করে সবাই গেয়ে উঠল,

‘শূন্য থেইকা আসে মানুষ, শূন্যে মিলাই যায়”

‘শূন্য থেইকা আসে মানুষ, শূন্যে মিলাই যায়”

পট্টবর্ধন এর সঙ্গে যোগ করল,

‘নাওয়ের মাঝি হাল ধইরাছে, খবর কে-বা পায়’

‘ঘরের ছেলে ঘর ছাইড়াছে নোনা পানির টানে’

‘জীবন থাইকা জীবন হারাইছে পানির নেশার টানে’

পেছন থেকে সবাই আবারও বলে উঠল,

‘শূন্য থেইকা আসে মানুষ, শূন্যে মিলাই যায়”

‘শূন্য থেইকা আসে মানুষ, শূন্যে মিলাই যায়”

কিরান আবারও বুক ভরে টেনে নিল নোনা বাতাস, আক্ষরিক অর্থেই নিজেকে তার জীবিত মনে হচ্ছে বহুদিন পরে।

‘শূন্য থেইকা আসে মানুষ শূন্যে মিলাই যায়,’ বিড়বিড় করে কথাটা বলে সে বুকের সঙ্গে ঝুলতে থাকা তার বাবার দেওয়া দোলকটা চেপে ধরল। ‘বুকের বলই সবচেয়ে বড়ো বল, বুকের বলই সবচেয়ে বড়ো বল,’ চোখ বন্ধ করে মনে মনে বলে যেতে লাগল সে।

অধ্যায় বাইশ
বর্তমান সময়
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

মোবাইলের ভাইব্রেশনের শব্দে মাঝ দুপুরের গাঢ় ঘুমটা আচমকাই ভেঙে গেল শারিয়ারের। ব্যাপার কী! এইসময়ে কে করল করতে পারে ওকে! মোবাইলটা হাতে তুলে নেবার পর দেখতে পেল আননোন নম্বর থেকে কল এসেছে। কিন্তু নম্বরের ধরন দেখে সে বুঝতে পারল এটাঅফিসিয়াল নম্বর।

কলটা রিসিভ করবে কি না ভাবতে ভাবতে কলটা কেটে গেল। রিসিভ করেই বা লাভ কী। কেস তো শেষ। আবারও চাদর মুড়ি দিয়ে ওর মনে পড়ে গেল আজ সকালের ঘটনা। বলা যায়, ওর জীবনের সবচেয়ে লজ্জাজনক সকাল।

***

পাশা স্যারের সঙ্গে কথা বলার পর মেয়েটা যখন জানাল ওকে এই কেসটা থেকে ডিসচার্জ করা হয়েছে তখন শারিয়ার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই মেয়েটা একটা আঙুল তোলে ওর উদ্দেশে।

'আপনাকে ডিসচার্জ করা হচ্ছে ঠিকই, তবে,' বলে সে নিজের একটা হাত তুলল। 'আপনি চট্টগ্রাম ত্যাগ করার আগে আমাদের পুরো টিমের সামনে আপনার এবং আপনাদের পুরো ঘটনার ডিটেইল ব্রিফিং দেবেন, সঙ্গে লিখিত রিপোর্ট জমা দিয়ে আপনি চট্টগ্রাম ছাড়বেন। একই নিদের্শনা আপনার জন্যও মিস্টার ভুবন। তবে আপনাকে ডিসচার্জ করা হচ্ছে না। বরং আপনি আমার টিমের সঙ্গে কাজ করবেন। দুজনেই বুঝতে পেরেছেন আমার বক্তব্য?'

দুজনেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। 'আমার একটা অনুরোধ আছে। আমরা দুজনার কেউই অসলে এই মুহূর্তে ব্রিফ করার মতো অবস্থায় নেই কাজেই...'

'আমি তো আগেই বলেছি আপনারা পিবিআইয়ের বাংলোতে চলে যান। সেখানে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে পোশাক বদলে খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নেন। দুপুরের

পর আপনাদের সঙ্গে বসব আমি ও আমার টিম,' বলে সে পেছন ফিরে ঘুরে গেল নিজের টিমের দিকে। তাদের বিভিন্ন নির্দেশনা দিতে শুরু করল। শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে ভুবন হাতের ইশারা করল ওঠার জন্য। শারিয়ার নিজের ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে হাঁটা ধরল। পুলিশের একজন ওর ফাস্টপ্যাকটা সেই গাড়ি থেকে এনে পৌঁছে দিয়েছিল এখানে।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সকালের রোদ ঝাপ্পি মারল দুজনার চোখে। 'বস, রোদটা উঠছে দেখছেন আজকে?' শারিয়ার কিছু না বলে মাথা নাড়ল স্রেফ। 'তুমিও কি গেস্ট হাউসে যাবে?' শারিয়ার জানতে চাইল।

'না, বস আমি বাড়ি যাব। আমি তো পরিবারসহ এখানেই থাকি। যদিও আমার বাসা এখন খালি। তবে আমার কোনো সমস্যা নেই। আপনি ঠিক আছেন তো? বরং আপনি চাইলে বাংলোতে না গিয়ে আমার সঙ্গে আসতে পারেন,' বলে সে মনোযোগ দিয়ে পরখ করতে লাগল শারিয়ারকে। শারিয়ার মাথা নাড়ল।

'বস, মনের ওপরে চাপ নিয়েন না,' বলে সে শারিয়ারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'মনের ওপরে চাপ নিলেও প্রবলেম, আর প্রবলেম হইলেই সমস্যা,' বলে সে হেসে উঠল। শারিয়ারও হেসে উঠল তার সঙ্গেসঙ্গে। 'এই যে মজার কথাডা কইলাম এইটা কিন্তু অপনেরে খুশি কইরা আরেকটা দামি বিড়ি খাওয়ার জন্য,' বলে সে আবারও হেসে উঠল।

শারিয়ার ওর ব্যাকপ্যাকটা সাবধানে সামলে নিয়ে শতছিন্ন ব্লেজারের পকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করে নিজে একটা ধরিয়ে আরেকটা এগিয়ে দিল ভুবনকে।

'কিন্তু বস, একটা কথা, কাইল রাতে আসলে হইলোডা কী?' বলে সে সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে উঠল। 'ওই যে জিপ আসছে, মনে অয় ওইটাই আমারে বাসায় নামায়া আপনেরে গেস্ট হাউসে পৌঁছায়া দিব।'

জিপটা কাছে আসতেই দুজনেই চড়ে বসল ওটাতে। 'শোন ভুবন, আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি এই কেসে যা বলা হচ্ছে বা যা দেখা যাচ্ছে এর বাইরেও আরো অনেক ব্যাপার আছে। কিছুই না বুঝে হুট করে এসে কেসের ভেতরে ঢুকে বোকার মতো ঝামেলায় সেঁধিয়ে গেছি। যাকগে,' বলে নিজের এটা হাত বাড়াল শারিয়ার। 'এখন এসব ভেবে আর লাভ কি। তোমরা সামলাও এসব,' বলে সে হেসে উঠল। 'তবে আমার কিছু অবজারভেশন আছে যেগুলো আমি বিফ্রিংয়ে সময় বলার চেষ্টা করব। যদি আমার কথা শোনা হয় আরকি। এরমধ্যে ফ্রেশ হয়ে খেয়েদেয়ে রেস্ট নিয়ে আরেকটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাও করা যাবে।'

ভুবন নেমে যেতেই ওকে একটু পর পিবিআইয়ে গেস্ট হাউসে নামিয়ে দিয়ে গেল জিপ। যাওয়ার আগে ড্রাইভার শারিয়ারকে তার নাম আর নম্বর জানিয়ে গেল। দুপুরের পর ওকে নিয়ে যাওয়ার কথা। ফোন দিলেও সে চলে আসবে এটাও জানিয়ে গেল।

সুন্দর খোলামেলা জায়গাতে খুবই চমৎকার একটা বাংলোমতো বাড়িতে গেস্ট হাউসটা। সামনের দৃশ্য দেখার মতো, সেই সঙ্গে থাকার আয়োজনও চমৎকার। শারিয়ার ভেতরে যেতেই একজন মেসেঞ্জার এসে ওকে ভেতরে সিঙ্গেল বেডের একটা কামরাতে ওকে নিয়ে গেল লোকটা। সেখানে ফ্রেশ হয়ে খেয়েদেয়ে লম্বা একটা ঘুম দেয় শারিয়ার। না ঘুমানো পর্যন্ত মাথা কাজ করছিল না। তারপর হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল এই মোবাইল ভাইব্রেশনের শব্দে।

***

কলটা কেটে যেতেই শারিয়ার আবারও চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু লাভ হলো না। কারণ মোবাইলটা আবারও ভাইব্রেট করতে শুরু করল। শারিয়ার অনুমান করল এই কল কেটে দিলে কিংবা রিসিভ না করলে বাজতেই থাকবে। তাই আর দেরি না করে আবারও মোবাইলটা তুলে নিয়ে নিজেকে যতটা সম্ভব সামলে নিয়ে পরিষ্কার গলায় বলার চেষ্টা করল, ‘হ্যালো।’

‘ঘটনা নাকি উল্টো ঘটে গেছে? নায়ক নাকি ভিলেনের হাতে মার খেয়ে কুপোকাত হয়ে গেছে এবার?’ আদি অকৃত্রিম দরাজ একটা গলা বলে উঠল। সেকেন্ডের জন্য শারিয়ার বুঝতে পারল না কে কথা বলছে। যখন বুঝতে পারল খুশিতে মনটা আনচান করে উঠল ওর। কিন্তু সেটা গলায় ফুটে উঠতে না দিয়ে সে গম্ভীর গলায় বলল, ‘হ্যাঁ, মার কে খেয়েছে আর কাকে কার কাছ থেকে, আর কে কাকে উদ্ধার করেছে মাঝরাস্তা থেকে সেটা এখন সবাই জানে,’ শারিয়ার এটুকু বলতেই ফোনের অপর প্রান্ত থেকে হাসির শব্দ শোনা গেল। ‘শোন, বেশি কথা বলিস না। হাতি যখন কাঁদায় পড়ে পাশের বাসার আন্টিও তখন লাথি মারে,’ এবার আর শান্ত থাকল না, ওপর প্রান্ত থেকে জোরে হেসে ওঠার আওয়াজ পাওয়া গেল। শারিয়ার আবারও কিছু বলার আগেই ওপাশ থেকে মানুষটা কথা বলে উঠল, ‘বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে এভাবে কুপোকাত হয়ে গেলি বন্ধু। তাও আবার মেয়ে মানুষের কাছে! এটা একটা কথা হলো! তোর মতো তেজি মানুষ এভাবে

একটা মেয়েমানুষের কাছে ঝাড়ি খাবে, আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি। ছি ছি এভাবে আমার মানসম্মান না ডোবালে কি তোর আর চলছিল না ব্যাটা,' পিবিআইয়ের আরেক স্পেশাল অফিসার শারিয়ারের বন্ধু তানভীর মালিকের গলায় কৃত্রিম আনন্দ।

শারিয়ার আর তানভীরের বন্ধুত্বের শুরুটা খুব বেশি আগে নয়। বড়োজোড় ছয় কিংবা সাত মাস হতে পারে। শারিয়ার পিবিআইয়ের দক্ষ ফিল্ড এজেন্ট আর তানভীর ছিল পিবিআইয়ের একজন ডেস্ক অ্যানালিস্ট। কোনো এক অদ্ভুত কারণে আজ থেকে সাত মাস আগে যখন পিবিআই থেকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর জার্মান পুলিশের একটা স্পেশাল ট্রেনিংয়ে পাঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন পিবিআইয়ের ক্রিমিনাল অ্যানালিসিস উইংয়ের প্রধান হাবিব আনোয়ার পাশা এই দুজনকেই নির্ধারিত করে ইউরোপে ট্রেনিংয়ে যাওয়ার জন্য। তানভীরের সঙ্গে শারিয়ারের সখ্যতার শুরুটা সেই ট্রেনিং থেকেই। তবে ওদের বন্ধুত্বের শুরুটা খুব একটা ভালোভাবে হয়নি। দুই জগতের দুই মানুষ, দুই ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড। এমনকি দুজনেই কাজের আলাদা ক্ষেত্র থেকে এসেছে। ফলে শুরু ওদের দুজনার জন্য পরস্পরকে মানিয়ে নেয়াটা অসম্ভব মনে হচ্ছিল কিন্তু পরবর্তীতে দুজনেই যখন বন্ধু হিসেবে পরস্পরকে আবিষ্কার করতে শুরু করল, তখন থেকে বন্ধুত্বটা এমনভাবে গভীর হতে শুরু করে যা দুজনকেই নিয়ে যায় অন্য এক ভুবনে। বড়ো হওয়ার পর মানুষের বন্ধুত্ব গাঢ় হয় না এই ধারনাকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে দুজনেই হয়ে ওঠে পরস্পরের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। যদিও ওদের ট্রেনিংয়ের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে দুজনে আলাদা গ্রুপে পড়ে যায়। শারিয়ার নিজের ট্রেনিং পুরোটা শেষ করে আসতে পারলেও তানভীরর পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি। বিশেষ একটা মিশনের কারণে পাশা স্যারের নির্দেশে ট্রেনিংয়ের একেবারে শেষ পর্যায়ে সে চলে আসে বাংলাদেশে। ওদিকে শারিয়ার পুরো ট্রেনিং শেষ করে এসেছে। কিন্তু এরপরে দুজনার ভেতরে কোনো যোগাযোগ হয়নি।

তানভীরের টিপ্পনি হজম করে নিয়ে শারিয়ার বলে উঠল, 'আমার আলাপ বাদ দে। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। তোর কথা বল। আগে বল তোর শরীর এখন কেমন?'

অপারেশন ব্ল্যাক বুদ্ধার শেষ পর্যায়ে তানভীর গুলি খেয়ে সাংঘাতিক আহত হয়েছিল। সে-ব্যাপারেই শারিয়ার জানতে চাইছে ওর শরীর এখন কেমন। 'আমি এখন বেটার। শরীর সেরে উঠছে। জানিসই তো শরীরের ক্ষত সবসময়ই মনের

ক্ষতের চেয়ে দ্রুত শুকায়,' বলে তানভীর মৃদু হেসে উঠল। শুষ্ক হাসিই বলে দেয় ফিল্ড লেভেলে অপারেশন ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারলেও নিজের প্রথম মিশনে তাকে কী পরিমাণ মানসিক যাতনার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে।

শারিয়ারও তাকে প্রায় একই ধরনের শুষ্ক হাসি ফিরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ওয়েলকাম টু দা ওয়ার্ল্ড অব ক্যাওস,' বলে সে যোগ করল। 'প্রথমবারের মিশনে তুই নাকি জাদু দেখিয়েছিস। মৌসুমি আপা থেকে শুরু করে এমনকি পাশা স্যার পর্যন্ত তোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

'আসলে বিয়ষয়টা উল্টো বন্ধু,' ওপার থেকে তানভীর খুব তরল গলায় বলে উঠল। 'শোন, পুরো মিশনে আমি কিছুই ঠিকঠাক করতে পারিনি। বলতে গেলে আমি একের পর এক সবই গুবলেট পাকিয়ে ফেলেছি। দু-একটা জায়গায় হয়তো আমার অ্যানালিটিক্যাল স্কিলের কারণে কিছু ব্যাপার আমি ধরতে পেরেছি, বাকি সাফল্যের ক্রেডিট আসলে পুরোটাই আমার টিমের আর ভাগ্যের। বুঝতে পেরেছিস?'

'দোস্ত একটা কথা বলি,' শারিয়ার শোয়া থেকে উঠে বসল। 'তুই আদর্শ ফিল্ড এজেন্ট হবি একদিন। তোর কথার ধরনেই আমি বুঝতে পারছি,' বলে জোরে হেসে উঠল ও। 'ফিল্ড লেভেলের কাজ এভাবেই হয়। সিনেমায় আর উপন্যাসে যেমন দেখায় নায়ক সব ঠিকঠাক সমাধান করছে বাস্তবে তা হয় না। এখানে আসলে...'

'শারিয়ার, তোকে কয়েকটা কথা বলার জন্য ফোন করেছি আমি,' ফোনের ওপর থেকে তানভীরের গলা বেশ সিরিয়াস হয়ে গেছে। 'যদিও আমি জানি আমার পরামর্শ কোনো অবস্থাতেই তোর মতো একজন দক্ষ ফিল্ড এজেন্টের দরকার নেই। তবুও যদি বন্ধু মনে করিস, সেই জায়গা থেকে দু-একটা কথা আমি বলতে চাই।'

শারিয়ার হেসে উঠল, 'পাশা স্যার নতুন একটা টিম নাকি গঠন করছে। গুজব শুনলাম উনি নাকি তোকে ওটার প্রধান বানাতে যাচ্ছেন। তার মানে তুই খুব শীঘ্রই আমার বস হবি। তাই বলে এখনি বসগিরি ফলাতে শুরু করে দিলি। শালা ফর্মালিটি বাদ দিয়ে কী বলবি বল,' শারিয়ার বিছানার পাশ থেকে ডানহিলের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট বের করে মুখে লাগাল।

'ধন্যবাদ বন্ধু,' ওপাশ থেকে তানভীরের গলায় স্বস্তি। 'শোন, তুই তো বহু বছর ধরে ফিল্ডে কাজ করছিস, আমি আমার প্রথম মিশনেই একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছি, ফিল্ড লেভেলের কাজে কখনোই সবকিছু ঠিকঠাক হয় না। আমরা কেউই ইয়ান ফ্লেমিয়ের জেমস বন্ড না যে খুব স্মুথলি প্রত্যেকটা মিশন সম্পন্ন করব। বেলা

শেষে এসবই আসলে লেগে থাকার ব্যাপার, মাথা গরম না করার ব্যাপার এবং,' বলে তানভীর একটু থামল। 'সবচেয়ে বড়ো কথা হলো নিজের ইগোকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপার। শারিয়ার, আমাদের সবারই ইগো আছে, তবে আমরা যদি আমাদের ইগোকে নিজেদের অস্তিত্বের চেয়ে বড়ো হতে দিই সেটা ভালো কোনো ব্যাপার না। আমাদের কারো ইগোই আমাদের চেয়ে বড়ো না। আমি কী বলতে চাইছি তুই কি বুঝতে পারছিস?'

শারিয়ার নীরবে সিগারেট টেনে যাচ্ছে। মনে মনে সে শারিয়ারের কথাগুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করে। কিন্তু মুখে সেটা বলতে পারবে না। 'শোন, তোর কেসটার ব্যাপারে আমি মৌসুমি আপার কাছু থেকে সব শুনেছি। তুই হয়তো কেসটাকে যেভাবে দেখছিস ব্যাপারটা আমার সেরকম মনে হচ্ছে না। ভুল তো তুই করেছিস। কিন্তু তুই হয়তো ভাবছিস পাশা স্যার একটা ভুলের জন্য তোকে এতটুকু ছাড় দিল না। ব্যাপারটা আসলে এরকম নয়। তুই ট্রেনিং শেষ করে এসে রিপোর্ট করিসনি। তোকে স্যারের উদ্ধার করতে হয়েছে জেল থেকে। এটাতে সে কষ্ট পেয়েছে। তবুও তোকে মিশনে পাঠিয়েছে এবং সেখানে গিয়ে তুই ভুল করেছিস, ভুল করার পর মাতব্বরি করেছিস, অফিসারের সঙ্গে গোয়ার্তুমি করেছিস। বল আমি ভুল বলছি?'

'তুই আমাকে কী করতে বলিস তানভীর?' শারিয়ারের গলা থমথমে।

'আমি তোকে স্রেফ নিজের ইগোটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলছি, আর কিছু না।'

দুজনেই চুপ। 'তারমানে তুই কি আমাকে মিশনে ফিরতে বলছিস?' শারিয়ারের গলায় অবিশ্বাস। 'আমি নিজের সম্মান হারিয়ে কাজ করব না তানভীর। তুই আমাকে চিনিস।'

'আমি তোকে চিনি বলেই বলছি। তুই যেটাকে সম্মান হারানো বলছিস আমি সেটাকে বলছি নিজেকে প্রমাণ করা। তোর কি ধারণা পিবিআইয়ের চট্টগ্রাম ব্যুরোর লোকজনের কাছে তোর কিংবা আমাদের হেড অফিসের সম্মান বলে এই মুহূর্তে আদৌ কিছু আছে?'

শারিয়ার চুপ। তানভীর বলে চলেছে। 'তার চেয়ে একটা বড়ো কথা কী জানিস। এটা আমার বিশ্বাস। তুই যদি এই কেসটা ছেড়ে ঢাকা চলে যাস আমার ধারণা ওরা কেসটা সলভ করতে পারবে না।'

'এই কথা বলিস না। ওই তালুকদার না ফালুকদার ওর আস্ফালন দেখলে এই কথা বলতি না তুই,' রাগে ঝামটে উঠল শারিয়ার।

'শোন, মাতব্বরি দেখানোর সুযোগ পেলে তুইও তো দেখাস, দেখাস না? আর তোর ওপরে মাতব্বরি করার পেছনে ওই মেয়েটার কারণ আছে। পরে সেটা বলব। আমি তোকে স্রেফ একটা কথাই বলতে চাই। নিজের কারণেই হোক আর যে কারণেই হোক তুই তো কেসটার কিছুটা ভেতরে ঢুকেছিলি। তুই তো কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছিস কেসটা। এই কেসের ঘটনাগুলো কারো কাছেই এখনো পরিষ্কার না। যদি ধরে নেই আমরা একটা থ্রিলার উপন্যাসের ভেতরে তবে, এই কেসটাতে আসলে এখনো কী ঘটছে পাঠকের কাছে একেবারেই পরিষ্কার না। বলতে পারিস এখন পর্যন্ত স্রেফ গল্পের ভিত রচনা করা হয়েছে, গল্পটা বলা হয়নি। যে তোর আগে ময়দানে ছিল সে কিছুটা জানে, ফরেনসিক টিম কিছুটা জানে, তুই কিছুটা জানিস। তোরা যদি সবাই মিলে সবার সঙ্গে নিজের আইডিয়াগুলো শেয়ার করে টুকরোগুলোকে জোড়া না লাগাস তবে এই কেস সলভ হবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা আমরা এখনো জানি না আমাদের শত্রু কারা। তারা কী চায়, তবে এটা তো বুঝতে পেরেছি আমাদের শত্রু অনেক বেশি শক্তিশালী। তা না হলে ওরা এতটা ডেসপারেটলি আক্রমণ চালাত না। প্লিজ বন্ধু, তুই কেসটা ছাড়িস না।'

'কিন্তু আমাকে তো কেস থেকে ডিসচার্জড করে দেওয়া হয়েছে।'

'আমি মৌসুমি আপার সঙ্গে কথা বলেছি। আমি প্রয়োজনে পাশা স্যারের সঙ্গেও কথা বলব। লাগলে আমি চট্টগ্রাম ব্যুরো বা তালুকদারের সঙ্গে কথা বলব। তুই তো ওদের ব্রিফিংয়ে যাবি। আমি বলি তুই কেসের ফিল্ড অফিসার হিসেবে না থাকলেও কেসের যে-টিম সেই টিমের পার্ট হিসেবে কাজ কর,' ওপার থেকে তানভীরের গলায় অনুনয়ের সুর। 'আমি জানি এটা তোর জন্য সম্মানের নয়। কিন্তু বন্ধু ভেবে দেখ, তুই যদি এখন কেসটা থেকে সরে আসিস এবং শেষ পর্যন্ত কেসটা ব্যর্থ হয় এবং দেখা যায় এটা বিরাট কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল, যেমনটা পাশা স্যার ভাবছেন তবে সারাজীবনে তুই নিজেকে ক্ষমা করতে পারবি, বল?'

'ঠিক আছে,' অনেকক্ষণ চুপ থেকে শারিয়ার বলে উঠল, 'শুধু তোর জন্য। বল আমাকে কী করতে হবে?'

ওপাশে তানভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে শারিয়ার পরিষ্কার শুনতে পেল। 'ওদের ব্রিফিং শুরু হবে আড়াইটা থেকে, মানে লাঞ্চের পর থেকে। তোর হাতে এখনো কয়েক ঘণ্টা সময় আছে। তুই পুরো কেসটা নিয়ে আবারও বস। পেপার ওয়ার্কের সঙ্গে তোর কাল রাতের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখ। তারপর ব্রিফ করে আমার মনে হয় তুই কেসটাতে আলাদা একটা অ্যাঙ্গেল দিতে পারবি। একটা বিশেষ জায়গা

থেকে শুরু করতে পারবি। আমি হাসপাতালে বসে পুরো কেস ফাইলটা দেখেছি। একটা জায়গাতে এখনো কেউ টাচ করেনি। কিংবা করা হয়ে ওঠেনি কেসটাতে।'

'কোনটা সেটা?'

'স্পট থেকে।'

'মানে?' শারিয়ার বুঝতে পারেনি তানভীরের কথা।

'মানে হলো যেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। দেখ কেসটা শুরু হওয়ার পর থেকে সবাই লোকটার পরিচয়, তার ক্রিমিনাল রেকর্ড, এই লোকের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সব সংস্থার সংযোগ এসব অনেক ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করছে। কেসটা শুরু হওয়ার আগেই এতটা ছড়িয়ে গেছে যে ইটস আ কমপ্লিট মেস। কিন্তু লোকটা নিজে এবং যেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। তুই তোর টিমকে ওখান থেকে শুরু করতে বল।'

'ওই বেটি তালুকদার আমার কথা শুনবে ক্যান? সে যে মাতব্বর,' শারিয়ার টিপ্পনি কাটল।

'শারিয়ার, তুই মাঝে মাঝে বেশি কথা বলিস। শোন, আমি যা বলেছি তোকে সেখান থেকেই কাজটা করতে হবে তা কিন্তু না। এটা স্রেফ আমার সাজেশন। তুই নিজে ঘেঁটে দেখ। বললাম তো আরো কয়েক ঘণ্টা সময় আছে, তুই নিজে আমার চেয়ে অনেক বেশি এক্সপার্ট ও অভিজ্ঞ একজন এজেন্ট। কাজেই তুই ভেবে দেখ। আর যদি আমার পয়েন্টটা ঠিক হয় কিংবা তুই নিজে কিছু বের করতে পারিস তবে সেটাও ওদের সঙ্গে শেয়ার কর। আমি যা বলছি সেটা হলো, তুই নিজে সবসময় লিড দিয়ে এসেছিস ঠিক আছে। এখানে যেহেতু একটা ব্যাপার ঘটে গেছে তাই সেটাকে ভুলে গিয়ে তুই টিমের পার্ট হিসেবে কাজ কর। আমার অনুরোধ, তোর এখানে লক্ষ্য হবে কেসটাকে সলভ করা, অন্য কিছু না। তুই কি রাখবি আমার অনুরোধ?'

'হইছে, বহুত প্যাঁচাল পাড়ছোস, শালা টোস্ট,' শারিয়ার প্রায় ধমকে উঠল তানভীরকে। 'এখন ফোন রাখ। আমি কাজে নামব,' ওর কথা শুনে ওপাশ থেকে হেসে উঠল তানভীর। 'আর শোন, তোর জন্য আমি এই বালের কেসে টিকে যাচ্ছি। ঢাকায় এলে ট্রিট দিবি, আর ওই বেটি তালুকদার যত মাতব্বরি দেখাবে আমার ওপরে তোর ট্রিটের আয়তন তত বাড়বে, মনে রাখিস,' বলে সে হাসতে হাসতেই কল কেটে দিল।

কলটা কেটে দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে ফোনের দিকে। তানভীর যা বলেছে ভুল বলেনি। কিন্তু সেটাকে শুদ্ধ প্রমাণ করতে গেলে অনেক কিছু হারাতে

হবে। এমন সময় ওর ট্রেনিংয়ের একজন ইন্সট্রাকটরের কথা মনে পড়ে গেল। লোকটা ট্রেনিংয়ের সময় বলেছিল ফিল্ডে কাজ করার সময় নিজের শারীরিক শক্তি, বুদ্ধি, নিজের ইমোশন সবকিছুকে অনেকটা তরল স্রোতের মতো প্রবাহিত হতে দেওয়া উচিত। যে যত ভালোভাবে এই স্রোতটাকে প্রবাহিত হতে দিতে পারে এবং সঠিক নির্দেশনায় প্রবাহিত হতে দিতে পারে সে তত ভালো এজেন্ট হতে পারে। শারিয়ারের মনে হলো ও এতক্ষণ পর্যন্ত নিজের বুদ্ধি-শক্তি সবকিছুকে বাদ দিয়ে স্রেফ নিজের ইগো দিয়ে সব বোঝার চেষ্টা করছিল। এখন সময় এসেছে কাজে নামার এবং সময় এসেছে সত্যিকারের অ্যানালিটক্যাল স্কিলকে কাজে লাগিয়ে মাঠে নামার। 'ঠিক আছে, যাহা ভবিতব্য তাহাই কর্তব্য,' আনমনেই বলে উঠল ও।

টেবিলের ওপরে রাখা সমস্ত কেস ফাইলগুলোকে নিয়ে এলো ও মেঝের ওপরে। তারপর সবগুলোকে ফাইল আর ফোল্ডারের ভেতর থেকে বের করে একে একে ক্রমান্বয় অনুসারে সারি দিয়ে সাজাল সেগুলোকে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। সিগারেটটা শেষ করে ওটাকে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে প্রথম কাগজের গুচ্ছটা টেনে নিল ও নিজের দিকে। একে একে পড়ে যেতে লাগল ফাইলগুলো। সেইসঙ্গে নোট নেওয়া চলল নিজের ডিউটি প্যাডে।

পরবর্তী দু ঘণ্টা সে ডুবে রইল ফাইলের ভেতরে। সব ফাইল একে একে পড়ে, সেইসঙ্গে সব নোট মিলিয়ে, গতরাতের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতাগুলোকে একসঙ্গে করে এখন পর্যন্ত এলোমেলো কেসটার একটা চেহারা দাড় করানোর চেষ্টা করল ও। নির্দিষ্ট পয়েন্টগুলো নোট করে নিয়ে খানিকটা স্বস্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। এবার কেসটা একটা চেহারা পেতে শুরু করেছে ওর কাছে। আর তানভীর যা বলেছিল সেটা পুরোপুরি ঠিক না হলেও কেসটাকে নির্দিষ্ট একটা দিকে ধাবিত করার মতো উপকরণ জড়ো করতে পেরেছে সে গত দু-ঘণ্টার চেষ্টায়।

খুশি মনে মেঝে থেকে কাগজগুলো তুলে নিয়ে টেবিলে সাজিয়ে রাখল। অফিস থেকে দেওয়া ফাস্ট প্যাকটা থেকে নতুন এক সেট কাপড় বের করে এনে বিছানার ওপরে রেখে বাথরুম গিয়ে শেভ-গোসল সেরে ফিরে এসে কড়কড়ে নতুন পোশাক পরে নিল ও। টাইটেনিয়ামের বুটের সঙ্গে ম্যাচ করা গ্যাবার্ডিন প্যান্ট। তার ওপরে গায়ে প্রথমে চড়াল বুলেট প্রুফ ভেস্টটা। তার ওপরে কালো শার্ট, কালো শার্টের ওপরে হোলস্টরটা পরলেও পিস্তল আর বুলেটগুলো বের করে রেখে দিল টেবিলের ওপরে।

পিস্তলটা তুলে নিয়ে এই প্রথমবারের মতো ভালোভাবে পরখ করল সে। জিনিসটার ডিজাইন পুরনো আমলের হলেও একেবারে আধুনিক একটা ভার্সন। পিস্তলটার বাঁট কিং কোবরার মতোই। কাল রঙের বাঁটে একটা গোখরা সাপের মাথা খোদাই করা। জিনিসটা দেখে ছোটোবেলায় টিভিতে দেখা ওর প্রিয় একশন স্টার সিলভেস্টার স্ট্যালোনের কোবরা সিনেমার কথা মনে পড়ে গেল। লাইট ওয়েট কার্বনের তৈরি বডিটা একেবারে চকচকে। পুলথ্রু দিয়ে জিনিসটা পরিষ্কার করে বুলেট ভরে নিল ও। তারপর ওটার সঙ্গে মেশিনপার্ট আর লেজার অ্যাটাচ করে রেখে দিল হোলস্টারে। যে কেউ চাইলে ওটাকে দিয়ে সিঙ্গেল শটও চালাতে পারবে কিংবা কনভার্ট করে মেশিনের মতোও চালাতে পারবে। পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে কালো শার্টের ওপরে কালো ব্লেজার পরে নিল ও। হাতে ঘড়ি চাপিয়ে চুল ব্যাকব্রাশ করে ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে নেমে আসা চোখা গোঁফে হাত বোলাল একবার। ফাস্ট প্যাক থেকে ছোটো ছুরিটা বের করে পকেটে রেখে দিল ও।

নিজেকে আয়নায় দেখে নিয়ে খুশি হয়ে উঠল। আবারও গোঁফে হাত বোলাতে বোলাতে মনে মনে ভাবল, এবার ও মাঠে নামার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

দ্বিতীয় অংশ: শূন্য জীবন

অধ্যায় তেইশ

বর্তমান সময়

পিবিআই ব্যুরো, চট্টগ্রাম

মিটিং রুমের প্রবেশ দরজার বাইরে এসে বড়ো করে একবার দম নিল শারিয়ার। ঘড়ি দেখল। দুইটা চল্লিশ বাজে। গার্ডের কাছে শুনেছে মিটিং শুরু হয়েছে একটু আগেই।

মিটিং রুমের দরজার হাতলে হাত রেখে শারিয়ার অনুভব করল দুনিয়াতে আসলে সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো নিজের ইগো বিসর্জন দেওয়া। এত ভেবে লাভ নেই। দরজাটা ধরে ঠেলা দিল শারিয়ার। একহাতে নিজের ফাইল আর নোটবুকটাকে ধরে রেখে ভেতরে প্রবেশ করে মৃদু কাশি দিতেই সবাই ফিরে তাকাল ওর দিকে।

রুমের ভেতরে সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একটু নার্ভাস হাসি দিলো শারিয়ার। 'সরি, লাঞ্চ করতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল।'

রুমটা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার আর দশটা মিটিংরুম থেকে আলাদা কিছু নয়। একপাশে প্রজেক্টর থেকে শুরু করে সব ধরনের আইটি ফ্যাসিলিটি আছে। সেটাকে সামনে রেখে লম্বা একটা টেবিল। সেই টেবিলটাকে ঘিরে এই মুহূর্তে বসে আছে আট-দশ জন মানুষ। পেটমোটা ছোটোখাটো একজন মানুষ প্রজেক্টর সেট করতে ব্যস্ত। তার ঠিক পাশেই সকালের সেই স্যুট পরে দাঁড়িয়ে আছে রুম্পা তালুকদার, তার চেহারাতে সকালের সেই চকচকে ভাব আর নেই। খানিকটা এলোমেলো আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। একই অবস্থা তার টিমের বাকি মেম্বারদেরও। তবে মিটিং রুমের পরিস্থিতি দেখে শারিয়ার বুঝল ফর্মাল মিটিং এখনো শুরু হয়নি। বরং বলা চলে মিটিংয়ের প্রস্তুতি চলছে।

রুম্পা তালুকদার তার দিকে তাকিয়ে আছে। শারিয়ার মৃদু একটা হাসি দিয়ে হাতের ফাইলটা দেখাল। 'আমি কাল রাতের ব্যাপারে ব্রিফিং দিতে এসেছিলাম,' শারিয়ার এটুকু বলতেই তাকে হাতের ইশারায় ভেতরে প্রবেশ করল রুম্পা। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে থ্রিকোয়ার্টার পরা মোটুকে নির্দেশনা দিতে।

শারিয়ার ভেতরে ঢুকে টেবিলের একপাশে বসে থাকা ভুবনের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

'আরে, কী ব্যাপার বস?' ওকে বসতে দেখে একটা হাত বাড়িয়ে হ্যান্ড শেইক করে ভুবন সহাস্যে জানতে চাইল। শারিয়ার খেয়াল করে দেখল ওর মতোই ছেলেটার চেহারাতেও কাল রাতের ঘটনার ফলস্বরূপ বেশ কিছু কালশিটে পড়েছে। 'তোমার চেহারা একেবারে চকচক করছে দেখা যায়। বিউটি পার্লার হয়ে এলে নাকি?'

'এখানকার অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে বিউটি পার্লারে আমার চেয়ে বেশি যাওয়া দরকার তোমার বসের,' শারিয়ার ফাইলগুলো রাখতে রাখতে ইশারায় রুম্পার দিকে দেখিয়ে বলে উঠল।

'আরে বাদ দাও,' হাতের ইশারায় ওদেরকে উড়িয়ে দিয় ভুবন বলে উঠল। 'তুমি আসাতে আমি খুশি হয়েছি বস। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আসবেই না। তা ফিরে যাচ্ছ কখন? রাতের ট্রেনে নাকি প্লেনে?'

শারিয়ার ভুবনের দিকে তাকিয়ে খানিকটা রহস্যের হাসি হাসল। 'এত সহজে তোমাদের ছেড়ে ফিরছি না আমি। সিনেমাতে মাত্র ইনটারভাল হলো, মূল গল্প তো এখনো অর্ধেকের চেয়ে বেশি বাকি।'

ভুবন খুব অবাক হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই সামনে থেকে রুম্পা তালুকদার কথা বলে উঠল। 'এক্সকিউজ মি,' বলে সে হাতের লেজার পয়েন্টারটা দিয়ে টেবিলে টোকা মারল। সবাই তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে বলতে শুরু করল।

'প্রথমেই সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আজকের ফর্মাল মিটিংয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আমি রুম্পা তালুকদার, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন অফিসার, পিবিআই চট্টগ্রাম ব্যুরো। প্রফেসর সুলতান আবদেল হিট অ্যান্ড রান কেসের দায়িত্বরত অফিসার হিসেবে কর্মরত আছি। এখানে উপস্থিত কয়েকজন সুপিরিয়র অফিসার, যারা এই কেসের মনিটরিং এন্ড অবজারভেশন করবেন- তারা বাদে বাকিরা সবাই আমার অধীনেই কাজ করবেন,' শেষে কথাটা বলার সময়ে সে তাকিয়ে রইল শারিয়ারের দিকে। 'আমি প্রথমেই এখানে উপস্থিত সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। প্রথমেই আমার টিমের সাইবার ম্যাটেরিয়াল এক্সপার্ট এবং ডিজিটাইজড ফরেনসিকের এক্সপার্ট ঢাকা থেকে আসা,' বলতেই পাশ থেকে থ্রি-কোয়ার্টার পরা পেট মোটা খানিকটা গোপাল ভাড় টাইপের চেহারার মানুষটা কাশি দিয়ে বলে উঠল, 'ইয়ে আমি ময়মনসিংহ থেকে এসেছি গতকাল।'

'ও আচ্ছা,' নিজেকে দ্রুত শুধরে নিল রুম্পা। 'অফিসার টমি পোদ্দার আমাদের সাইবার রিলেটেড সব ব্যাপার থেকে শুরু করে ফরেনসিকের ডিজিটাইজড ইস্যুগুলো নিয়ে হেল্প করবে। এছাড়া আমাদের টিমে আছে অফিসার

মল্লিক সারোয়ার, তারিক জামেল, সাবরিনা সুলতানা, সুমন হাওলাদার,' নিজের টিমের লোকদেরকে একে একে পরিচয় করিয়ে দিল সে। 'এছাড়া আরেকজন আছে, এই মুহূর্তে সে অবস্থান করছে পতেঙ্গা রোডের সেই বাড়িতে। একজন স্পেশাল কমান্ডো অপারেটিভ আছে আমাদের সঙ্গে,' বলে সে ভুবনকে দেখাল। 'এক্স স্পেশাল অপস কমান্ডো অফিসার ভুবন শর্মা আমাদের ফিল্ড লেভেল অপারেশনে সাহায্য করবে,' বলে সে চলে গেল টেবিলের সামনের দিকে। 'এছাড়া এখানে আমাদের টিমের মনিটরিং ও অ্যাডভাইজিং সেলের পার্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন সারোয়ার আহমেদ স্যার ও ডেইজি সুলতানা ম্যাডাম। এখন আমরা...'

রুম্পা এটুকু বলতেই শারিয়ার নিজের হাত তুলল।

শারিয়ারকে হাত তুলতে দেখে রুম্পা বলে উঠল, 'ও সরি আমি পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলে গেছিলাম। এখানে আছেন স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন অফিসার শারহান শাহরিয়ার।'

'শারিয়ার,' শারিয়ার মৃদু হাসিমুখে বলে উঠল।

'মিস্টার শারিয়ার,' রুম্পা চিবিয়ে বলে উঠল, 'এই কেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। কিন্তু আজ সকালে উনাকে সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তবে উনি এই কেস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উনার অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন,' বলে সে টমির দিকে ফিরে বলে উঠল, 'টমি, তুমি প্রস্তুত?' টমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই রুম্পা তার অফিসারদের একজনকে উদ্দেশ্য করে মাথা নাড়ল। সে রুমের লাইটগুলো অফ করে দিতেই টমি তার প্রেজেন্টেশন শুরু করল।

'টমি আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু মূলত আমি শুরু থেকে কেসের ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করব। এই বিশেষ কেস, যেটাকে নাম দেওয়া হয়েছে প্রফেসর সুলতান আবদেল হিট অ্যান্ড রান কেস, এই কেসটার শুরু হয় একটা অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা দিয়ে। গত পরশু রাতে, আনুমানিক রাত একটা বা দেড়টার দিকে বৃষ্টির ভেতরে চট্টগ্রামেরই কিছু ধনী পরিবারের বখাটে ছেলেমেয়েরা লং ড্রাইভে ঘুরে বেড়ানোর সময় পতেঙ্গা রোডের এই জায়গাতে, ম্যাপে একটা বিন্দু দেখাল সে, 'একজনকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলে,' আবারও বাটন চাপতেই একটা গাড়ি ও সেটার নম্বর প্লেটের ছবি ফুটে উঠল। এরপরের একটা স্লাইডে পাঁচজন ছেলেমেয়ের ছবি দেখা গেল।

'শুরুতে কেসটা খুবই সাধারণ একটা হিট অ্যান্ড রান কেস ছিল। ছেলেমেয়েগুলো টহল পুলিশের গাড়ির সামনে ধরা পড়ে যায় এবং এটা পরিষ্কার হয় যে, ওরা অ্যাক্সিডেন্টলিই লোকটাকে চাপা দেয়। কিন্তু ঘটনা জটিল হতে শুরু করে পরের দিন। পরদিন ভোরে পুলিশ যেখন লোকটার পরিচয়ের ব্যাপারে খোঁজ নিতে যায় তখন বের হয় লোকটা কাছেই একটা বাড়ির বেইজমেন্টে গত তিন বছর ধরে

লুকিয়ে ছিল এবং কিছু একটা নিয়ে গবেষণা করছিল সে। ওই বেইজমেন্টে আমাদের লোকেরা ঢুকে এগুলো দেখতে পায় এবং বেশ অবাক হয়ে যায়,' বলে সে আরো বেশ কিছু ছবি দেখাল এবং সবাই বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মৃত মানুষটার বিস্তারিত গবেণষণার ছবি দেখে।

'সর্বনাশ,' একজন উপদেষ্টা শব্দ করে বলে উঠল। 'কে এই লোক?'

'পুরো কেসটা জটিল চেহারা পেতে শুরু করে এখান থেকেই। লোকটার পরিচয় উদ্ধার করতে গিয়ে দুটো ব্যাপার ঘটে। প্রথমত, অ্যাক্সিডেন্টের পরের দিন সকালেই লোকটার ছবিসহ নিউজ ছাপা হয় কয়েকটা পত্রিকায়। ওইদিন বিকেলেই মর্গ থেকে লোকটার লাশ চুরি করার চেষ্টা চালানো হয়। অন্যদিকে আমরা ধারণা করছি লোকটার নিউজ পত্রিকাতে বেরুবার পরপরই এই ব্যাপারটা ঘটানো হয়। কারা করতে পারে সেটা নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে এবং লোকটার পরিচয় নিয়ে খোঁজ করতে গিয়ে বের হয় আরো বড়ো চমকপ্রদ তথ্য। মানুষটা পেশায় ছিলেন একজন আর্কিওলজিস্ট। নিজের ফিল্ডের বেশ বিখ্যাত মানুষ উনি। তবে কুখ্যাত বললেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ এই লোকটাই একের পর এক বিভিন্ন সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ঝামেলাতে জড়িয়েছে সময়ে এবং এর আর্কিওলজির লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে আজ থেকে কয়েক বছর আগে। এছাড়াও ধারণা করা হয় এই লোকটা আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাত কিছু সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল। বেইজমেন্টে তার রুমে বেশ কিছু কাগজ পাওয়া গেছে, যা থেকে পরিষ্কার ধারণা করা যায় যে, নেক্রপলিশ এবং রেলিক নামে অন্তত দুটো সংগঠনের হয়ে কাজ করত সে। প্রশ্ন হলো, এই লোকটা গত তিন বছর ধরে এই বাড়ির বেইজমেন্টে লুকিয়ে আসলে করছিলটা কী?' রুম্পা টানা কথা বলে একটু থামল। তারপর আবারও বলতে শুরু করল।

'এরপর কী হলো?' একজন জানতে চাইল।

'এইখানে কেইস হিস্ট্রির ব্যাপারে একটু আলোকপাত করব আমরা। কারণ এই কেসের সিরিয়াসনেস বুঝতে হলে এই অংশটুকু জানা খুব জরুরি। প্রথমে কেসটা ছিল পুলিশের কাছে, তারপর এটার গভীরতা অনুভব করে সেটাকে দেওয়া হয় সিবিআইকে। আন্তর্জাতিক চোরাচালানিদের সঙ্গে এর সংশ্লিষ্টতা পাওয়ার পর পিবিআই ঢাকা ব্যুরো থেকে বিশেষ নির্দেশে কেসটা ওদেরেকে হস্তান্তর করা হয়। পিবিআই চট্টগ্রাম ব্যুরোর হাজারো অনুরোধ উপেক্ষা করে কেসটাকে তাদের অধীনে দেওয়া হয় এবং ঢাকা থেকে একজন স্পেশাল অফিসার রওয়ানা দেয় কেসটাকে নিয়ে কাজ করার উদ্দেশে। সেই সঙ্গে তাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য টেম্পোরারিভাবে গেস্ট অপারেটিভ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এক্স কমান্ডো অফিসার মিস্টার

ভুবনকে। এরপরের অংশটুক আমি সেই স্পেশাল অফিসারের কাছ থেকে শুনতে চাই। মিস্টার শারিয়ার,' শারিয়ারের নামের প্রথম অংশটুক রুম্পা খুব সাবধানে এবং যত্নের সঙ্গে উচ্চারণ করল।

শারিয়ার বসা অবস্থা থেকেই কথা বলে উঠল, সবাইকে অভিবাদন জানাল সে প্রথম। তারপর গতরাতে কী ঘটেছে সেটা বিস্তারিত বর্ণনা করে গেল। শারিয়ারের বর্ণনা থামল একেবারে সকালে বাসার ডায়নিংরুমে রুম্পার টিম প্রবেশ করা আগ পর্যন্ত। শেষ করে শারিয়ার বলে উঠল, 'যা বললাম এটা হলো ঘটনা। এখানে আমার কয়েকটা বিষয় আলোচনা করার আছে,' বলে সে টেবিল থেকে নিজের নোটবুকটা হাতে তুলে নিল।

'আপনার কথা আমরা পরে শুনব,' শারিয়ারের কথা রুম্পা পাত্তা দিল না, বরং সে ফিরে তাকালভুবনের দিকে। 'এখানে আমি মিস্টার ভুবনের বক্তব্য আগে শুনতে চাই,' বলে সে ভুবনের দিকে ফিরে ইশারা করল।

শারিয়ার কথা বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল। ভুবন একবার রুম্পার দিকে তাকিয়ে তারপর ফিরে তাকাল শারিয়ারের দিক। সে এখনো কিছু বলতে শুরু করেনি। শারিয়ার ওকে ইশারায় কথা শুরু করতে বলল। ভুবন একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতে লাগলো।

'আমার পরিচয় তো আপনারা পেয়েছেন। এক্স স্পেশাল অপস কমান্ডো ছিলাম। দূরপাল্লার স্নাইপিং রাইফেলে আমার স্পেশালিটি। যদিও আমি এখন আর এসব কোনোটাতেই নেই। আমি একটা প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানিতে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করি। মাসখানেক আগে পাশা স্যারের বিশেষ অনুরোধে বিজিবির সঙ্গে একটা বিশেষ অপারেশনে কাজ করেছিলাম। এরপরে গতকাল সকালে পাশা স্যার হঠাৎ বললেন পতেঙ্গা রোডে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছে। সে জন্য ঢাকা থেকে একজন স্পেশাল অফিসার আসছে। আমি যেন পিবিআই অফিসে গিয়ে এই বিশেষ ব্যাপারে ওদেরকে হেল্প করি। সে অনুযায়ী আমি গতকাল দুপুরের পর পিবিআই অফিসে গিয়ে অস্ত্র, এই কেসে কাজ করার স্পেশাল অনুমতিপত্র, আর শারিয়ার স্যারের ফোন নম্বর থেকে শুরু করে পাসকোড সব বুঝে নেই। সেই অনুযায়ী আমি বিকেলের দিকে যখন ঢাকা থেকে ট্রেন আসার কথা তখন চট্টগ্রাম রেলস্টেশনের দিকে রওয়ানা দিই। এমন সময় আমার মোবাইলে একটা কল আসে। সেখানে আমাকে জানানো হয়, পিবিআই থেকে নতুন নির্দেশনা এসেছে, ঢাকা থেকে ট্রেন আসতে লেট হবে, আমি যেন স্টেশনে না গিয়ে পতেঙ্গা রোডের সেই বাড়িতে চলে যাই। আমাকে যথাযথ পাসকোড বলা হয়। আমাকে যথাযথ নির্দেশনাও দেওয়া হয় এবং কলটাও এসেছিল পিবিআইয়ের টিএনটি নম্বর থেকে। কাজেই সন্দেহ করার কোনো কারণ ছিল না। তবুও আমি যেহেতু কথা বলতে

বলতে স্টেশনের একেবারে কাছে চলে গেছিলাম কাজেই আমি স্টেশনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ট্রেন আসলেই লেট। কাজেই আমি পতেঙ্গা রোডের সেই বাড়িতে চলে যাই। সেখানে গিয়ে ডিউটিরত পুলিশের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকি। অনেক সময় গড়িয়ে যায় কিন্তু কেউ আসেনি। একটা সময় পরে আমি ঢাকা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং জানতে পারি শারিয়ার স্যার চট্টগ্রাম এসেছেন এবং বেশ কিছু ঝামেলা হয়ে গেছে। আমার কেন জানি সন্দেহ হয় কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। এমন সময় ওখানে আমাদের পুরো বাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়। আমি বাইরে বেরুতেই আমার ওপরে হামলা হয়। একেবারেই হঠাৎ আমার ওপরে কোনো ধরনের স্প্রে করা হয়, যে কারণে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তবে খুব বেশি সময় আমি অজ্ঞান ছিলাম না। জ্ঞান ফিরে আসতেই আমি বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে দেখি গার্ড দুজন অজ্ঞান। বাড়ির ভেতরে আওয়াজ পেয়ে সেখানে যাই। সেখানে গিয়ে অন্ধকারের ভেতরে একজনকে দেখতে পেয়ে তাকে থামতে বলি। সেই লোকটাই শারিয়ার স্যার ছিলেন। এরপর তো... 'বাক্য সম্পূর্ণ না করে সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'বাকিটা আপনারা জানেন, তবুও আমি সংক্ষেপে বলছি,' ভুবন অল্প পরিসরে সব বলে গেল সেই বেইজমেন্টে কী হয়েছিল।

ভুবনের কথা শেষ হতেই রুমের চারপাশ থেকে অনেক প্রশ্ন ভেসে আসতে থাকে। রুম্পা একটা হাত তুলে সবাইকে শান্ত থাকতে বলে। 'আমি জানি এখানে অনেক গড়মিল আছে। আমি একে একে পুরো পরিস্থিতি সাজিয়ে বলার চেষ্টা করছি। প্রথমত, প্রফেসর সুলতান আবদেল হিট অ্যান্ড রান কেসের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট,' বলে সে টমির দিকে ইশারা করল। টমি একটা বাটন চাপতেই সিসি টিভি ফুটেজে একজন মানুষের চেহারা ফুটে উঠল। শারিয়ার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ছবিটার দিকে।

রুম্পাও তাকিয়ে আছে শারিয়ারের দিকে। 'আমার ধারণা মিস্টার শারিয়ার খুব ভালোভাবেই চিনতে পেরেছেন মানুষটাকে। এই মানুষটাই মিস্টার ভুবনের ছদ্মবেশে মিস্টার শারিয়ারকে অপহরণের চেষ্টা করেছিল,' আবারও প্রজেক্টরে একটা ছবি দেখা গেল। মানুষটা চট্টগ্রাম স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সিসি টিভির জুম করা ছবি। 'শুধু তাই না, এই লোকটাই চট্টগ্রাম মেডিকেলের মর্গ থেকে প্রফেসরের লাশ চুরির চেষ্টা করেছিল,' আবারও লোকটার একটা ছবি ফুটে উঠল। 'সেখানে পরিষ্কার দেখা গেল মেডিকেলের বাইরে আরো দুজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে অছে এই লোক।

'মানুষটা কে?' কেউ একজন প্রশ্ন করল।

'মানুষটা কে, সেটা জানার আগে আরো গুরুত্বপূর্ণ বাপার হলো এই কেসটাতে আসলে ঘটছে কি, আমরা একে একে জোড়া লাগাব এখন,' বলে সে টমির দিকে

তাকিয়ে ইশারা করল। 'একেবারে শুরু থেকে যদি শুরু করি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন প্রফেসর-যাকে নিয়ে এই কাহিনির শুরু, হঠাৎ তার দীর্ঘদিনের প্রজেক্ট নিয়ে সরকারের সঙ্গে ঝামেলা বাঁধাল। তার লাইসেন্স বাতিল করা হলো। সে বছরখানেক পর স্রেফ গায়েব হয়ে গেল। এর তিন বছর পর সেই মানুষটার লাশ পাওয়া গেল নিতান্তই আকস্মিভাবে চট্টগ্রামের এক বাড়ির রাস্তার বাইরে বৃষ্টির রাতে। জানা গেল, সেই মানুষটা ওই বাড়ির বেইজমেন্টে লুকিয়ে গত তিন বছর ধরে কিছু একটা নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছিল। এই পর্যন্ত আমরা পরিষ্কার। সমস্যা দেখা দেয় এই মানুষটার সঙ্গে অন্তত দুটো বড়ো বড়ো আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাত সংগঠনের সংযোগ পাবার সম্ভবানা দেখা দেয়। সেই সম্ভবানাকে আরো জোরদার করে এই মানুষটা,' বলে সে নকল ভুবনের ছবিটা দেখাল। 'এই লোকটা পরের দিন মর্গ থেকে লাশ চুরির চেষ্টা করে। সেটা করতে না পেরে সে ভিন্নভাবে পরিকল্পনা করে। সে কোনো না কোনোভাবে জানতে পারে, ঢাকা থেকে একজন এজেন্ট আসছে। সে সম্ভবত পিবিআইয়ের ভেতরের কারো সঙ্গে আঁতাত করে এই তথ্য বের করে নেয় এবং তার বা তাদের মাধ্যমেই সে ফোন কলটাও করায়। এই লোকই ফোন করিয়ে ভুবনকে দূরে সরিয়ে নিজে ভুবন সেজে শারিয়ারকে অপহরণ করার চেষ্টা চালায়। সেটাও করতে না পেরে সে চলে আসে সেই বাড়িতে। একদিকে গার্ডদের আহত করে অন্যদিকে,' মেয়েটা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল আবারও শারিয়ার হাত তুলল। কিন্তু এবারও তাকে কথা বলতে না দিয়ে মেয়েটা বলে চলল।

'আপনার জিজ্ঞাসা কিংবা ফিডব্যাক পরে নেওয়া হবে। আগে আমরা পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করে নেই,' বলে আবারও সবার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করবে তার আগেই ভুবন কথা বলে উঠল।

'এখানে আমার একটু কথা বলার আছে। না হলে পরিস্থিতিটা বোঝানো যাবে না,' সে অনুমতির ধার না ধেরে সোজা বলতে লাগল। 'যেভাবে সবাই শুধু শারিয়ার স্যারকে দোষারোপ করছে গতকালের রাতের ব্যাপারে এখানে উনাকে এতটা দোষারোপ করার কিছু নেই। আমরা দুজনেই পরিস্থিতির শিকার ছিলাম। আর হ্যাঁ, দোষ যদি থেকে থাকে, ভুল যদি হয়ে থাকে তবে শারিয়ার স্যারের সঙ্গে আমারও সমান পরিমাণ দোষই আছে।'

'মিস্টার ভুবন আমরা এখানে ব্লেইম গেম খেলছি না। আমরা এখানে একটা জটিল বিষয় রিসলভ করার চেষ্টা করছি...'

'ম্যাডাম আপনি এই পয়েন্টটা মিস করছেন। আমি কথা বলতে চাইছি পরিস্থিতিটা বোঝানোর জন্যই। আমাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝিটা হয়েছে, কারণ অন্ধকারের ভেতরে আমাদের দুজনার মাঝে এই পরিস্থিতিটা সৃষ্টি করা হয়েছে।'

রুমের সবাই তাকিয়ে আছে ভুবনের দিকে।

'আচ্ছা,' রুম্পা নিজের হাত তুলল। 'ধন্যবাদ ভুবনকে, তাহলে পরিস্থিতিটা কী দাঁড়াল। এই লোকটা প্রথমে মর্গ থেকে প্রফেসরে লাশ চুরি করতে চাইল তারপর সে কেসের অপারেটিভকে অপহরণ করতে চাইল। এরপর সে দুজন অপারেটিভের মাঝে গণ্ডগোল পাকিয়ে...'

'সে চেয়েছিল আমাদের দুজনার ভেতরে গণ্ডগোল লাগানোর সুযোগে বেইজমেন্টের সেই রুমে ঢুকে কিছু একটা করতে। কিন্তু সেটা সে করতে পারেনি। কারণ সে রুমের ভেতরে ঢুকতেই মোর্শেদের জ্ঞান ফিরে আসে এবং মোর্শেদ বাইরে থেকে দরজা লক করে দেয়। এরপরে যখন আমি সেটা খুলি তখন আমার আর ভুবনের সঙ্গে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে সে," এইটুকু বলে শারিয়ার একটা হাত তুলল। 'আমি স্বীকার করছি ওই সময়ে ওই রুমে দরজাটা খোলার সিদ্ধান্তটা আমার সবচেয়ে বড়ো ভুল। কিন্তু ওই মুহূর্তে আসলে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।'

'হ্যাঁ মিস্টার শারিয়ার, আমি এইখানে আপনার সঙ্গে একমত পোষণ করি। আপনি যদি ওই রুমটা না খুলতেন তবে লোকটা হয়তো এখন আমাদের হাতে বন্দি থাকত এবং সম্ভবত বেইজমেন্টের ওই রুমটাও অক্ষত থাকত। আপনার ছোটো একটা ভুলের কারণে পুরো ব্যাপারটাই শেষ হয়ে গেছে বলতে গেলে,' রুম্পা শান্ত গলায় কথা বলছে। কিন্তু তার গলায় চাপা আগুন। 'কারণ খুব অযাচিতভাবেই লোকটাকে ধরার বিরাট একটা সুযোগ এসে গেছিল আমাদের হাতে।'

শারিয়ার কিছু না বলে চুপ হয়ে রইল। আনমনেই সে একবার ভুবনের দিকে তাকাল। ছেলেটা এভাবে সবার মাঝে ওকে সাপোর্ট করে ওকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে ফেলেছে।

'কে এই লোক, আমাদের মাঝে থেকে এতকিছু করে ফেলল আমরা তার টিকিও ছুঁতে পারলাম না,' উপদেষ্টাদের একজন জানতে চাইল।

'এইবার আমি বলতে চাই,' রুম্পার পাশ থেকে টমি বলে উঠল। বাটন চাপতেই লোকটার সবগুলো টুকরো টুকরো ছবি কোলাজ হয়ে একটা ফ্রেমে চলে এলো। তারপর সেখান থেকে চলে গেল একটা ওয়েবসাইটে। 'এটা ইন্টারপোলের এশিয়া জোনের অপরাধীদের একটা তালিকা। এখানে এই লোকের ব্যাপারে বেশ বিশদ বলা আছে। এর নাম হুয়ান জিং। চায়না অরিজিনেটেড হলেও সে মূলত অপারেট করে থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া-মায়ানমার-ইন্ডিয়া-নেপাল এসব দেশে। এই প্রথমবারের মতো তাকে বাংলাদেশে অপারেট করতে দেখা গেল। এই লোক একজন প্রফেশনাল অ্যান্টিক হান্টার এবং কিলার। একটা সময় সে চায়নিজ আর্মিতে কমান্ডো হিসেবে কাজ করেছে। এরপরে ইন্দো-পাক যুদ্ধের পর থেকে

তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু কেস ফাইল হয় যে, সে যুদ্ধের সুযোগ সেসব দেশ থেকে অনেক টাকার বিনিময়ে মিলিটারি রিসোর্স ব্যবহার করে অ্যান্টিক পাচার করছিল। আর্মি থেকে বহিষ্কার হওয়ার পর সে অনেকদিন গায়েব ছিল। এরপর তাকে দেখা যায় এশিয়াসহ বিশ্বের বড়ো বড়ো সব অ্যান্টিক চোরাচালানির হয়ে ভাড়ায় কাজ করতে। প্রায় আট-দশটা ভাষা জানা, মিলিটারি ট্রেনিং পাওয়া এই আন্তর্জাতিক অপরাধী সেরাদেরও সেরা। তার টেকনো স্কিলও অসাধারণ। আমরা ধারণা করছি প্রফেসরের সঙ্গে রেলিক নামে যে সংস্থার কানেকশন ছিল বা নেক্রপলিস তাদের কেউ এই লোকটাকে ভাড়া করে থাকতে পারে। এ ধরনের অপরাধীদের এখনকার সময়ে বলা হয় থাকে টেকনো ক্রিমিনাল। তার টেকনো স্কিলের একটা উদাহরণ দিচ্ছি,' বলে টমি আরেকটা বাটন চাপল।

প্রজেক্টরে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া একটা গাড়ির ছবি ফুটে উঠল। 'এই সেই এসইউভি যেটাতে করে সে শারিয়ার স্যারকে অপহরণ করতে চেয়েছিল। এই গাড়িটা এর আগের দিন সে স্টেশন রোড থেকে চুরি করে। এক বেলায় গাড়িটাতে বুলেট প্রুফ ডিভাইডার সেট করা হয়, গ্যাস অপারেটরের ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি গাড়িটাতে একটা ছোটো জ্যামারও বসানো ছিল। যে কারণে গাড়িতে বসা অবস্থায় শারিয়ার স্যার কাউকে কল করতে পারেনি কিংবা তার কাছে কোনো কল আসেনি।'

'তাহলে মৌসুমি আপা...'

'সম্ভবত কোনো কারণে একটা পর্যায়ে ঝাঁকি লেগে বা কোনোভাবে জ্যামারটা ঠিকমতো কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এ-থেকে দুটো ব্যাপার প্রমাণ হয়। এক, সে একা অপারেট করছে না। দুই, সে বা তার টিমের অসাধারণ স্কিল আছে, সেইসঙ্গে রিসোর্স। তা না হলে একটা গাড়িকে এভাবে একবেলায় এতটা বদলে ফেলা, এমনকি চট্টগ্রাম শহরের সেরা ওয়ার্কশপের পক্ষেও কঠিন।'

'এই লোক আসলে চাচ্ছেটা কী?'

'তার চেয়ে জরুরি প্রশ্ন,' রুম্পা একটা হাত তুলল। 'কেসের এই পর্যায়ে আমরা যা যা জানি সব শেয়ার করা হয়েছে। অনেক প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই। তবে এখন সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন, আমাদের নেক্সট পরিকল্পনা কী?' বলে রুম্পা কাঁধ ঝাঁকাল। যদিও আমি কেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার তবুও আমি সবার ইনপুট চাচ্ছি যেহেতু এটা একটা টিম ওয়ার্ক।'

সবাই চুপ। আবারও শারিয়ার হাত তুলল।

'ইয়েস মিস্টার শারিয়ার এবার আপনি বলতে পারেন।'

'ধন্যবাদ,' শারিয়ার। মৃদু হাসি মুখে বলে উঠল। কেন জানি ওর ভীষণ সিগারেটের তৃষ্ণা পাচ্ছে। 'প্রথমেই আমি নিজের অবস্থানটা একটু পরিষ্কার করতে

চাই। যদিও এই কেস থেকে আমাকে ডিসচার্জ করা হয়েছে এবং আমি কাল রাতের ব্যাপারে রিপোর্ট করে ফেলেছি এবং সেই রিপোর্টটা লিখিত আকারে জমা দিলেই এই কেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমার সব দায়িত্ব শেষ করে আমি ঢাকায় ফিরে যেতে পারি। কিন্তু আমি যেহেতু একটা পর্যায় পর্যন্ত কেসের সঙ্গে ছিলাম সেহেতু আমার কিছু বলার আছে। সেইসঙ্গে,' বলে সে সবাইকে দেখল একবার। 'যদি টিমের এবং অথরিটির আপত্তি না থাকে আমি এই টিমের অংশ হিসেবে কাজ করতে চাই,' বলে সে একবার রুম্পার দিকে দেখল। 'মিস রুম্পার অধীনে।'

রুম্পা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই শারিয়ার বলে উঠল, 'তবে সেটা পরের বিষয়। আমি আগে পুরো কেসটাকে যেভাবে অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করেছি অনেকটা সেভাবে বিয়ষটা সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এরপরে আমি কেসের সঙ্গে থাকলে থাকব, না থাকলে নেই।'

সবাই তাকিয়ে আছে শারিয়ারের দিকে। 'যেহেতু এই কেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার মিস রুম্পা তালুকদার সেহেতু উনি অনুমতি দিলে আমি শুরু করতে চাই।'

রুম্পা কিছু না বলে তাকিয়ে আছে শারিয়ারের দিকে। হঠাৎ এই লোকের এত ভক্তিকে সে খানিকটা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে। কিছু না বলে সে মাথা নেড়ে সম্মতি দিল।

'আমি সম্প্রতি ইউরোপ থেকে একটা স্পেশাল ইনেভস্টিগেশন, ফরেনসিক ও কমান্ডো ট্রেনিং সমাপ্ত করে এসেছি। সেখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার শিখেছি আমি। কর্পোরেট থেকে শুরু করে অ্যাকাডেমিক জগতে এই ব্যাপারটা আগে থেকেই প্রচলিত আছে। যেটাকে বলে সোয়াট অ্যানালিসিস।'

'SWOT- Strength, weakness, opportunities, threats,' শারিয়ারের পাশ থেকে ভুবন বলে উঠল।

'একদম ঠিক,' ভুবন ব্যাপারটা জানে দেখে একটু অবাক হলেও তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ধন্যবাদ জানাল শারিয়ার। 'এই সোয়াট অ্যানালিসিস ব্যাপারটা একটা সময় শুধু কর্পোরেট ও অ্যাকাডেমিক জগতে ব্যবহৃত হলেও ইদানীং ইনভেস্টিগেশন তো বটেই এমনকি সাইকোলজিক্যাল ইভালুয়েশনের জন্যেও ব্যবহার করা হয়। গতকালের ঘটনার পর আমি যখন কেসটা নিয়ে বসলাম আমিও ঠিক এই পদ্ধতিতে কেসটাকে সাজানোর চেষ্টা করেছি এবং সেখান থেকে কিছু জিনিস বের করতে পেরেছি, যেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই,' বলে শারিয়ার তার অডিয়েন্সের দিকে তাকাল। সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছে। এমনকি রুম্পাও ভীষণ কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'প্রথমেই আসি, স্ট্রেন্থ বা এই কেসে আমাদের শক্তি বা সামর্থ কী সেই বিষয়ে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এই কেসে আমাদের শক্তি খুব কম। এখানে আমাদের সবচেয়ে বড়ো শক্তি আমাদের ম্যান পাওয়ার, আমাদের অথোরিটি এবং রিসোর্স। এই কেসে একটা শক্তিশালী টিম কাজ করছে, সরকারি যেকোনো সংস্থা থেকে চাইলেই আমরা সাহায্য পাব, যেকোনো রিসোর্স চাইলেই ম্যানেজ করা সম্ভব এবং ট্রাস্ট মি আমরা এটাকেই কাজে লাগাব। এরপরে আসে উইকনেস বা দুর্বলতা। এই কেসে আমাদের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হলো আমাদের অজ্ঞতা। এই কেসের পুরো চিত্রটা এমনকি আজ দুপুরের এই মিটিংয়ের আগে আমরা বুঝতেই পারছিলাম না। আমার ধারনা এই মিটিংয়ের পর সেটা খানিকটা দূর হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস সামনে আরো হবে। আমাদের আরেকটা বড়ো দুর্বলতা হলো আমাদের হাতে কোনো তথ্য নেই। আমরা কার হয়ে, কার জন্য লড়ছি। প্রফেসর আসলে কে, সে কেন গুরুত্বপূর্ণ, আমরা জানি না। আমরা আসলে কী সমাধান করতে চাইছি। আমরা প্রফেসরের ব্যক্তিজীবনের রহস্য সমাধান করতে চাইছি। নাকি তার মৃত্যুরহস্য ভেদ করতে চাইছি, নাকি তার মৃত্যুকে ঘিরে যেসব জটিলতা তৈরি হয়েছে সেগুলোর সমাধান করতে চাইছি, এটাই এখনো পরিষ্কার নয়। এরপর তিন নম্বর দুর্বলতা হলো, আমাদের শত্রু আসলে কে এবং তারা কী চায় আমরা এখনো পরিষ্কার জানি না। আর এই জায়গা থেকেই আমরা সোয়াটের পরের পয়েন্ট মানে অপরচুনিটি বা সুযোগ বাদ দিয়ে চলে যাব থ্রেট বা ঝুঁকিতে। আমি মনে করি এই কেসে আমাদের সবচেয়ে বড়ো থ্রেট বা ঝুঁকি হলো আসলে আমরা এই কেসটায় বিফল হলে কী হারাবো জানি না। দ্বিতীয়ত, এই থ্রেটকে শক্তিশালী করে তুলেছে এই কেসে আন্তর্জাতিক একাধিক সংস্থার ইনভলভমেন্ট থাকা। এটাই এই কেসের সবচেয়ে বড়ো ঝুঁকি,' শারিয়ার টানা কথা বলে সামনে থেকে পানির গ্লাসটা তুলে নিল।

শারিয়ার পানি খাচ্ছে সামনে থেকে উপদেষ্টাদের একজন বলে উঠল, 'আর অপরচুনিটিজ?'

'বলছি। এবার তৃতীয় পয়েন্ট কিংবা শেষ পয়েন্টটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাই,' বলে শারিয়ার একটা আঙুল তুলল। 'কিন্তু তার আগে আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। যেহেতু এখানে ফিল্ড অপারেটেড টিমের লোকজন আছেন এবং ফরেনসিকের মানুষেরাও আছেন সেহেতু আমি আশা করি উত্তরগুলো ঠিকঠাক পাব,' বলে সে রুম্পার দিকে তাকালে। রুম্পা সামান্য মাথা নেড়ে টমির দিকে তাকাল। টমিও মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'আমার প্রথম প্রশ্নটা ছিল, যে গাড়িটাতে করে আমাকে অপহরণের চেষ্টা চালানো হয়েছিল সেটাকে কেন্দ্র করে। সেটার জবাব আমার ধারণা আমরা পেয়ে গেছি এবং সেই লোকটা কীভাবে আমাদের বোকা বানিয়েছে এবং কীভাবে কল ব্লক করেছে সেটারও ধারণা আমরা পেয়েছি। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে, আমাদের ভেতরে সমস্যা আছে। শর্ষের ভেতরে ভূত আছে,' বলে সে কঠিন চোখে তাকাল রুমের সবার দিকে। 'যেহেতু আমরা জানি না ইনসাইড জবটা কে করছে কাজেই সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। প্রয়োজনে পিবিআই অফিসে অভিযান চালাতে হবে। সিসি টিভি ফুটেজ চেক করতে হবে,' বলে সে আবারও নিজের নোটবুকের দিকে তাকাল। 'এরপরে আমার প্রশ্ন প্রফেসরকে ঘিরে। আমরা আসলে প্রফেসর সুলতান আবদেল সম্পর্কে কতটুকু জানি। সে সফল একজন আর্কিওলজিস্ট ছিল এবং একটা সময় সে বিগড়ে যায়। এগুলো জানা আছে কিন্তু আরো বিস্তারিত জানা দরকার।'

'এখানে আমি একটু হাইলাইট করতে পারি,' টমি পোদ্দার তার মোটা শরীরটা নেড়ে বলে উঠল। 'প্রফেসরের বিস্তারিত বায়ো আমার এখানে আছে। খুব সংক্ষেপে বলি। প্রফেসরের বাড়ি নারায়নগঞ্জে। স্কুলে পড়াকালীন সময়ে সে পরিবারের সঙ্গে ইংল্যান্ডে চলে যায়। সেখানে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। আর্কিওলজি ছিল তার মেজর। অনার্স শেষ করে মাস্টার্স করার সময়ে সে তার সুপারভাইজারের সঙ্গে চলে যায় মিশরে। সেখানেই দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে সে। এরপর একটা সময়ে সে এশিয়ান আর্কিওলজি নিয়ে কাজ করতে শুরু করে। সেই ভিত্তিতেই নিজের দেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছে দীর্ঘদিন। এরপরে...'

'এতকিছু আমাদের জানার দরকার নেই। আমার একটাই প্রশ্ন, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যে বিষয়টা নিয়ে তার সমস্যা হয় সেটার ব্যাপারে আমি জানতে চাই,' শারিয়ার না থামালে টমি বলেই যেত।

টমি একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে জবাব দিল, 'এই বিষয়ের ওপরে তেমন কিছু নেই আমারে ডাটবেইজে।

'প্রফেসরের পরিবার এবং এই ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দরকার আমার,' বলে শারিয়ার ফিরে তাকাল বাকিদের দিকে। 'এরপরের প্রশ্ন যেটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, সেই ছেলেমেয়েগুলো যারা প্রফেসরকে চাপা দিয়েছিল তারা কি এখনো বন্দি?'

'হুমম, বিশেষ ক্ষমতাবলে এখনো কাস্টডিতে রাখা হয়েছে তাদের।'

‘ওদের সঙ্গে কী বিস্তারিত কথা হয়েছে,’ বলে শারিয়ার কাঁধ ঝাঁকাল। ‘আই মিন ওরা কি আসলেই...’

‘এটার জবাব আমি জানি,’ রুম্পার পাশ থেকে একজন অফিসার বলে উঠল। ‘এই কেসের শুরু থেকে আমি ছিলাম এবং আমি জানি ওদের ব্যাপারটা আসলেই অথেনটিক। ওরা আসলেই ভুল করে সেদিন বৃষ্টির ভেতরে প্রফেসরকে চাপা দেয়। তাকে ইনটেনশনালি হত্যা করার উদ্দেশ্য বা মোটিভ কোনোটাই তাদের নেই এবং প্রফেসরের অটপসি রিপোর্টও তাই বলছে। আসলেই সে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।’

শারিয়ার এক মুহূর্ত ভাবল। ‘এরপরের প্রশ্ন, প্রফেসর যে বেইজমেন্টে থাকত সেটার দারোয়ান বা বাড়ির মালিককে কি ধরা হয়েছে। ওরা কী বলছে?’

‘বাড়ির মালিককে পাওয়া যায়নি। সে পরিবারসহ বিদেশ থাকে। আর আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি,’ খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে বলে উঠল রুম্পা। ‘এই ব্যাপারে মালিকের জড়িত থাকার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেছে তা হলো, দারোয়ান ব্যাটা মালিক বিদেশ থাকার সুবাদে চুরি করে বেইজমেন্টটা ভাড়া দিয়েছিল প্রফেসরকে। প্রফেসর তাকে এক কাড়ি টাকা দিত প্রতি মাসে, তার ওপরে সে কোনো ঝামেলাও করত না। আর যেহেতু বেইজমেন্টে থাকত সে এবং খুব একটা বাইরেও যেত না, কাজেই জানাজানি হওয়ার কোনো সুযোগও ছিল না। কাজেই এখান থেকে খুব বেশি কিছু জানা যাবে না,’ কাঁধ ঝাঁকাল রুম্পা।

‘আমার এর পরের জিজ্ঞাসা, ফরেনসিকের কাছে,’ বলে সে টমির দিকে তাকাল। ‘যদিও আমি জানি পুড়ে গেছে, কিন্তু সেই বেইজমেন্ট থেকে কি কিছু বোঝা গেছে?’

‘এটার জবাব আমি দিতে পারব। টমির পাশ থেকে আরেকজন অফিসার বলে উঠল, ‘ওখানে যেটা হয়েছে; আগে এক রাউন্ড কাজ করেছিলাম আমরা। প্রফেসর আবদেলের ডিটেইল স্টাডির ব্যাপারটা তো দেখেছেনই আপনারা,’ বলে সে টমির দিকে ইশারা করতেই টমি প্রফেসরের স্টাডির সেই গবেষণার দেয়াল ছবি দেখাল। সবাই আরেক রাউন্ড অবাক হলো। ‘অফিসার বলে উঠল। এই ছবি আর গবেষণা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয়েছে দেখি ওরা কী বলে। কাল রাতে আগুন লাগার পর আজ সকাল থেকে আমাদের টিম কাজ করে যাচ্ছে। তবে আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যা বুঝতে পেরেছি ওখান থেকে খুব বেশি কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।’

‘আরেকটা অন্ধ গলি,’ ভুবন বলে উঠল।

'উপস্থিত সবার জ্ঞাতার্থে বলছি, আমি প্রশ্নগুলো করেছিলাম মূলত দুটো উদ্দেশে। উত্তরগুলো জবাব সবার জানার দরকার ছিল। অন্যদিকে এই প্রশ্নগুলোর জবাব জানাটা দরকার ছিল আমাদের সোয়াটের তৃতীয় পয়েন্ট অপরচুনিটি বা সুযোগগুলোর বোঝার জন্য। আমার কাছে মনে হয় এই কেসের যে জিনিসগুলো আমাদের ঘোলাটে ছিল সেগুলোর কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। সেই হিসেবে আমাদেরকে এখন ফোকাস করতে হবে তিনটে প্রশ্নের ওপরে। তাহলেই আমরা আমাদের সুযোগগুলো বুঝতে পারব। 'প্রথম প্রশ্ন, আমাদের সারকারের সঙ্গে প্রফেসরের বিরোধের কারণটা বের করতে হবে। তাহলেই প্রফেসরের হাইবারনেশন বা লুকিয়ে থাকার কারণ এবং নেক্রপলিস বা রেলিকের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা খানিকটা পরিষ্কার হবে। মানে, প্রফেসর ওখানে বসে আসলে কী করছিল সেটা বোঝা যাবে। আর সেটা বোঝা গেলে আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাত এই সংস্থাগুলো কেন তার পেছনে লেগেছিল বা মৃত্যুর পরেও কেন লেগে আছে সেটা বোঝা যাবে। একটা কথা মনে রাখবেন, ওরা যে কারণেই তার পিছু লেগে থাক ওরা এখনো সেই কারণ সমাধান করতে পারেনি, তানা হলে ওরা এখনো লেগে থাকত না, প্রফেসরের লাশ চুরির চেষ্টা করতো না। এর মানে কেস এখনো আমাদের হাতে আছে, এটা আমাদের প্রথম সুযোগ।' বলে শারিয়ার একটা আঙুল তুলল।

'দ্বিতীয় সুযোগ, আমরা অনেক কিছুই এখন পর্যন্ত আলোচনা-পর্যালোচনা করছি। কিন্তু একটা খুব অবভিয়াস প্রশ্নের উত্তর কি আমরা জানতে পেরেছি বা জানার চেষ্টা করেছি?' বলে সে অডিয়েন্সের দিকে তাকিয়ে রইল। 'যে মানুষটা তিন বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে কিছু একটা করছিল সেই মানুষটা ওইদিন বৃষ্টির রাতে মূল রাস্তার ওপরে যেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয় সেখানে আসলে সে করছিলটা কী? এটা কি আমরা জানি?'

শেষ প্রশ্নটা শারিয়ার উচ্চারণ করছ রুম্পার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু রুম্পার মুখে কোনো জবাব নেই। বাকি সবাইও চুপ।

'আমার ধারণা এই প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা নেই। আমরা যদি কেসের সমাধান চাই তবে এই প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে জানতে হবে বা খুঁজে বের করতে হবে। এটা আমাদের জন্য দ্বিতীয় সুযোগ। আমি যদি এই কেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার হতাম তবে আমি এখন যেটা করতাম সেটা অনেকটা এমন,' বলে শারিয়ার রুম্পার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতে শুরু করল। 'অথবা বলতে পারেন এই কেসের অফিসার রুম্পার প্রতি আমার সাজেশনটা থাকবে অনেকটা এরকম। প্রথমত, প্রফেসরের অতীত খুঁজতে হবে আমাদের, তাকে বুঝতে হবে।

এই কাজে টিমের একটা অংশকে লাগিয়ে দিন। দ্বিতীয়, যে সংস্থাগুলো বা এজেন্ট বা হুয়ান নামের লোকটা, সে নিজে হোক বা টিম নিয়ে হোক অপারেট করছে। যত বড়ো সংস্থারই হাত থাকনা কেন তার পেছনে, কাজ করতে হলে তাকে মুভ করতে হবে। আপনার টিমের একটা অংশ লাগিয়ে দিন রুট লেভেল থেকে এদের ব্যাপারে তথ্য খুঁজে বের করতে। লিস্টেড ইনফর্মার, পারসোনাল খবরি, টিকটিকি যার যা সোর্স আছে লাগিয়ে দিলে কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই। তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই কেস সমাধান করতে হলে এর অ্যাবসুলুট বেসিক থেকে শুরু করতে হবে,' বলে সে তাকিয়ে রইল রুম্পার দিকে।

'সেই স্পট থেকে যেখানে প্রফেসরের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। এই কেস সমাধান করতে হলে আপনাকে জানতে হবে কেন প্রফেসর ওই রাতে বেরিয়েছিল এবং মাঝরাতে বৃষ্টির ভেতরে ওখানে কী করছিল সে,' বলে সে খানিকটা এগিয়ে টিমের সবার উদ্দেশে বলে উঠল। 'আমার পরামর্শ হলো, কেস সলভ করতে হলে এক্ষুণি কাজে নামুন। এখনো সুযোগ আছে, একটু পর আর থাকবে না,' সে নিজের হাতের স্পোর্টস ঘড়িটাতে টোকা দিয়ে বলে উঠল।

'সময় বোমার মতোই টিকটিক করে প্রবাহিত হচ্ছে।'

অধ্যায় চব্বিশ

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

দক্ষিণ উপকূলের সমুদ্র, রামু আর সন্দ্বীপের মাঝামাঝি

প্রবাহিত সময় আর সমুদ্রের স্রোতকেই কাজে লাগাতে হবে, কথাটা মনে মনে একবার নিজেকে মনে করিয়ে দিয়ে নিজের লোকদেও দিকে তাকিয়ে কিরান বলে উঠল, 'পরিকল্পনা-কার্যকরণ-বাস্তবায়ন,' একবার হেসে উঠল সে। বিশেষ করে পট্টবর্ধন আর গোলন্দাজের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশভরায় হেসে বলে উঠল, 'মনে পড়ে পুরান দিনগুলার কথা?'

'মনে পড়ে মানে,' হুকোতে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গোলন্দাজ কথা বলে উঠল। সে এখন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। একটা ব্যাপার জানার পরে কিরানও খানিকটা স্বস্তিবোধ করছে যে নুনের ভিটায় হার্মাদ আর মগরা আক্রমণ চালানোর সময়ে ওখানে গোলন্দাজের পরিবার ছিল না। ওর স্ত্রী ছেলেমেয়ে এর আগের হপ্তায় নানা বাড়িতেবেড়াতে গিয়েছিল। সেই সুবাদে গতকালের আক্রমণে গোলন্দাজের পরিবারের কিছু হয়নি। তবে ওদের পারিবারিক ব্যবসা, লবণের ভাণ্ডার, পুরো গ্রাম থেকে শুরু করে ওর সব লোকজনসহ বাকি সবাই বন্দি হয়েছে। তাই প্রথমে খুব বিভ্রান্ত থাকলেও শান্ত হওয়ার পর সে কিরানের কাছে এসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। কারণ ওরা যদি সময়মতো না যেত তবে হয়তো আরো বেশি ক্ষতি হতো। এমনকি সে নিজেও ওদের হাতে ধরা তো পড়তই, হয়তো মারাও পড়ত। কিরান আর বেদু ওই গ্রামে গতকাল যা করেছে সেটা করাতে হয়তো গ্রামের কিছু মানুষ বেঁচেও গেছে। গোলন্দাজ নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিরানের কাছে ওয়াদা করেছে ও নিজের সর্বোচ্চ বিলিয়ে দেবে কিরানের বাবাকে উদ্ধার আর সিলভেরার শেষ দেখার জন্য। তারপর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এই বিষয়ে।

'আমরা বেশিরভাগ সময়ে আলোচনা করতাম জাহাজের খোলের ওপরে,' গোলন্দাজ হাসতে হাসতেই বলে উঠল। 'ঠিক এমনে,' বলে সে কিরানের দিকে ফিরে হাতের হুঁকো উঁচু করে বলে উঠল, 'কত দিন পরে ওস্তাদ তোমার কারণেই সম্ভব অইতাছে আবার।'

'আমি ভাবছিলাম আর কুনোদিনই জাহাজে পা রাহা অইবে না,' গোলন্দাজের পাশ থেকে পট্টবর্ধন বলে উঠল। 'কিরানের কারণেই ব্যাপারটা সম্ভব অইতাছে আবার। এইবার মরলেও আফসোস নাই আর। হয় জিত না অয় মত্যু,' বলে সে হাতে ধরে রাখা আরকের বোতলটা তুলে ধরলো মুখের সামনে, তারপর হইহই করে বলে উঠল, 'কিরানের লাইগা।' পট্টবর্ধনের সঙ্গে সবাই গলা মিলিয়ে হইহই করে উঠল।

খণ্ডালের গুহা থেকে ভোরের জোয়ারের সঙ্গে রওয়ানা দিয়ে কিরানদের তিনটে জাহাজ টানা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দুপুরের ভেতরে পৌঁছে যায় সন্দ্বীপের মোহনার কাছাকাছি। জাহাজ ছাড়ার পর যারা যারা জাহাজ চালনার সঙ্গে সরাসরি নিয়োজিত তারা বাদে বাকিদের কিরান নির্দেশ দেয় দুপুর পর্যন্ত বিশ্রামের জন্য। কারণ সে জানে অন্যরা তো বটেই, এমনকি সে নিজেও কতটা ক্লান্ত। আর জাহাজ একবার সন্দ্বীপে পৌঁছালে কী অবস্থায় পড়বে কেউ জানে না। কাজেই সবাইকে সে এক বেলা ঘুম দিয়ে নিতে বলে নিজেও দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেয়। ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পায় জাহাজ তিনটে সন্দ্বীপের কাছেই মোহনাতে উপবিষ্ট অবস্থায় নোঙর ফেলা আছে। ঘুম থেকে উঠে নিজে প্রস্তুত হয়ে জাহাজের সবাইকে নিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিজেদের কার্যকরণ ঠিক করার জন্য বড়ো জাহাজটার পাটাতনের ওপরে আলোচনায় বসেছে।

সবাই হইহই করে ওঠাতে রেলিংয়ের ওপরে পা তুলে বসে থাকা কিরান সবার দিকে হাসি মুখে ফিরে তাকাল। হাতের আরকের বোতলটা উঁচু করে ধরে বলে উঠল, 'আমার গুরু, যে আমাওে জাহাজি হিসেবে গইড়া তুলছিল,' বলে সে নিজের শরীরটা দেখাল। 'আমার শরীরের শিরাগুলোর ভেতর দিয়ে রক্তের চেয়ে বেশির সমুদ্রের নোনা পানি। রক্তের ভেতরে নোনা পানির যে নেশা সেই নেশা ধরা আছিল যে মানুষটা, তরফদার চাচা, সেই মানুষটা আর আমগো লগে নাই। সেই মানুষটার কাছ থেইকা আমি একটা জিনিস শিখছি। সেইটা অইলো নিজের জন্য বাঁচা। চাচা সবসময় কইত জীবনে উত্থান পতন থাকব, বড়ো ছোটো থাকবই, কিন্তু এই মুহূর্তের লাইগ্গা বাঁচবি সবসময়। আমরা সবাই এইহানে যারা আছি বেশির ভাগই আগে একরগে ছিলাম। একলগে অনেকদিন কাম করছি। আমরা একসময় ভাবতাম আমরা কুনোদিন হারব না। আমগো ক্ষয় নাই। কিন্তু আসলে তেমনডা অয় নাই। আমগো সব থাহার পরও আমরা হাইরা গেছিলাম। ছিন্ন-ভিন্ন অয়া গেছিল আমগো জীবন। কিন্তু ভাগ্য আমগোরে আবারও একসঙ্গে করছে। আমি সত্যি ভাবি নাই কুনোদিন আবারও একসঙ্গে অবো। কুনোদিন আবারও সবার সঙ্গে খোলা সমুদ্রে বইসা এমনে কথা কইতে পারব। আমরা সবাই একটা উদ্দেশ্য লইয়া ঘর ছাড়ছি যা আমরা আমরা হারাইছিলাম সেইটা ফিরা পাবার লাইগ্গা। সামনে কী আছে আমি

জানি না। কিন্তু বন্ধুরা এই মুহূর্তে তুমগো সবার মাঝে, তুমগো সবার লগে থাহার কারণেই আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। সবচেয়ে সুখী মানুষ,' বলে সে বোতলটা উঁচু করতেই সবাই আবারও হইহই করে উঠল।

'আমগো নেতা, আমগো কাপ্তান, আমগো জাহাজি ভাই কিরানের লাইগ্গা,' বলে নিজের সিরাজির বোতলটা উঁচু করে ধরল সবাই।

গল্প করতে করতে পান করতে করতে স্মৃতিচারণ চলল কিছুক্ষণ। তারপর কিরান আবারও হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বলল। 'বন্ধুরা, এবার আমরা কাজের কথায় ফিরা আসব। তুমরা তো সবাই জানো কী উদ্দেশে আমরা সবাই এইখানে এক অইছি। এত আয়োজন, এত কিছু, সবকিছু একটাই উদ্দেশে।'

কিরান এই পর্যন্ত বলতেই ওর পাশ থেকে পট্টবর্ধন বলে উঠল, 'চট্টগ্রামের প্রধান, বলা যায় অন্যতম ব্যবসায়ী এবং আরাকানের রাজার রোষ থেকে বাইচা যাওয়া সম্রাট শাহ সুজার ডান হাত তালেব তৈমূররে খুঁইজা বাইর করে উদ্ধার করা।'

'এবং আপনারা সবাই জানেন বাপু মানে, তালেব তৈমূর সম্রাট সুজার ওখান থেকে পালানোর পর তার পিছু নিছে রোসাঙ্গের রাজার লোকেরা। তার পিছু নিছে দক্ষিণের ত্রাস সিলভেরা,' সিরভেরার নামটা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল কিরান। 'এই মানুষগুলার কারণে আমাগো নিজের দেশের মানুষ আইজ ঘরছাড়া। এদের কারণে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারতাছে না দক্ষিণে। এদের কারণে আজ আমার দেশের মানুষর গরু-ছাগলের মতো বিক্রি অইতাছে। এই সিলভেরা জানা, না, জানা কত মানুষের কত পরিবার শেষ করছে তার কোনো গুনতি নাই। এই জন্যই সিলভেরারে উপযুক্ত শিক্ষা দেওনের এইটাই বিরাট সুযোগ,' বলে কিরান তাকিয়ে আছে সবার দিকে। যদিও সবাই জানত তবুও সিলভেরার নাম শুনে পরিস্থিতি একটু হলেও বদলে গেছে। 'তোমরা যারা এইখানে আছ সবাই কোনো না কোনো দিক দিয়ে আহত অইছো এই লোকটার কারণে, হয় ধনে না হয় মনে। এই সুযোগ এসেছে শায়েস্তা করার। আগেরবার আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। এইবার আমরা প্রস্তুত। আমগো লগে তিনটা জাহাজ আছে, মানুষ আছে, আমগো অস্ত্রের কোনো সীমা নাই। আমগো সেরা জাহাজি আছে,' বলে সে পট্টবর্ধনের দিকে তাকাল।

সবাই হইহই করে উঠল। 'আমগো প্রত্যেকটা জাহাজে কামান আছে,' বলে একটু থেমে কিরান রঙ্গনের দিকে দেখাল। 'তার চেয়ে বড়ো কথা আমগো লগে দক্ষিণের সেরা কামাঞ্চি আছে, যারে এমনকি সিলভেরার মানুষেরাও ডরায়,' বলে সে গোলন্দাজের দিকে দেখাল। সবাই আবারও হইহই করে উঠল। 'আমগো লগে সেরা লাঠিয়াল বাহিনী আছে তুলারামের। সেরা বর্শাবিদ আছে, বেদু-গোমেজ। আর কিছু লাগে?'

সবাই হইহই করে উঠল। কিরান থামতেই পট্টবর্ধন পাশ থেকে বলে উঠল, 'আমগো সবই আছে, দরকার শুধু সঠিক একটা পরিকল্পনা, আর বুকে বল। আর আমি তুমগো কথা দিতাছি সময় আইলে আমি নিজে সিলভেরার বুকে হয় একটা শিসা ঢুকায়া দিবো আর না হয় ওর বুকের ভিতর থাইক্কা কইলজাটা কাইট্টা বাইর করা নিয়া আসব।'

সবাই হইহই করে উঠল, উঁচিয়ে ধরল যার যার নিজের অস্ত্র। কিরান এবার ইশারা করল ওর লোকদের দিকে। জাহাজের মূল রেলিংয়ের ওপরে কাঠের ফ্রেমে আটকানো একটা কাপড়ের ওপরে হাতে আঁকা একটা ম্যাপ এনে রাখা হলো ওর পাশে। ছোটো একটা লাঠি দিয়ে ম্যাপটা দেখাল কিরান। 'আমগো পুরা দলের মধ্যে যারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছ সবাই এইখানে আসো। আমি আগেই বলছি আমগো সবচেয়ে বেশি দরকার সঠিক পরিকল্পনা। আমগো যাত্রার সবকিছু তুমগো সামনে তুইলা ধইরা এইখানেই সবার লগে আলোচনা কইরা আমরা পুরা পরিকল্পনা ঠিক করব। প্রথমেই আলোচনা হবে, আমরা আসলে কী কী জানি পুরা ব্যাপারটার সম্পর্কে। এইটা আমার মনে হয় পট্টবর্ধন আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবে।'

পট্টবর্ধন সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'প্রথমেই তুমগো একটা কথা কই। তুমরা তো জানো, আমরা সবাই সম্রাট সুজারে পছন্দ করি। এর পেছনে মূল কারণ অইলো শাহ সুজা বাংলায় সুবাদার থাকাকালে বাংলার যে উন্নতি অইছে আমরা সেইটা জানি। দিল্লির রাজনীতি সুজা সম্রাট কি সম্রাট না সেইটা আমগো বিবেচনার বিষয় না। আমরা সুজারে পছন্দ করি। সেই সুজারে পরিবারসহ আরাকানে হত্যা করা অইছে। তার কাছের লোকদের ভেতরে তালেব তৈমূর আর গুটিকয়েক মানুষ স্রেফ পলাইতে পারছে। বলা অইতাছে তারা সম্রাট সুজার সম্পদের একটা বড়ো অংশ তালেব তৈমূরের হাতেই ছিল। মূলত এইটার কারণেই আরাকানের রাজা আর সিলভেরা তাগো পিছে লাগছে। এইখানে একটা কথা পরিষ্কার করতে চাই। আমগোরে যারা নিয়োগ দিছে, চাঁটগায়ের ব্যবসায়ীরা-তারা বেশ কয়েকটা কারণে আমগোরে নিয়োগ দিছে। প্রথমত, তালেব তৈমূর হেগো বন্ধু, তারে উদ্ধার করতে চায় তারা। দ্বিতীয়ত, এই সম্পদ যদি বাঙ্গাল মুল্লুকে ফিরায়া আনা যায় তবে তাতে বাঙ্গাল মুল্লুকেরই উপকার। তৃতীয়ত, তারা আরাকানের রাজারে একটা শিক্ষা দিতে চায়, সেইসঙ্গে দক্ষিণের সমুদ্রে সিলভেরার অত্যাচার মাত্রা ছাড়ায়া গেছে, তারা এইটারও অবসান চায়। এই কারণেই এত সম্পদ ব্যয় কইরা আমরা হেগো পিছে লাগছি। বোঝা গেছে?' বলে পট্টবর্ধন একটু থামল।

'এখন প্রশ্ন অইলো, যে কামে আমরা যাইতাছি এতে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা অইলো তথ্য। আমগো হাতে যথেষ্ট তথ্য নাই। আমরা যা জানি স্রেফ মুখে মুখে শুনছি। বৈঠা আর বিল্লাল শেঠ মিলা কিছু কথা বাইর করছে। চাঁটগায়ের ব্যবসায়ীরা

আকরাম বেগ থেইকা শুরু কইরা বাকিরা, আমগো কিছু জানাইছে। আর কিরানের ধইরা আনা ফিরিঙ্গির কাছ থেইকা কিছু ব্যাপার আমরা জানতে পারছি। যা যা আমরা জানতে পারছি হেরে যদি এক করতে পারি তাইলে বিষয়টা এমন দাঁড়ায়; প্রথমে আমরা জানছি সম্রাট সুজারে হত্যা করার সময়ে তালেব তৈমূর আর তার কাছের কয়েকজন মিল্লা পলায়া প্রথমে জাহাজে উঠছে। সেই জাহাজের পিছু নেওয়া অয় সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু এই জাহাজ খোলা পানির পরিবর্তে জলা জঙলা আর দ্বীপাঞ্চলে পলায়া থাকে বেশ কিছু দিন। এই কারণে রোসাঙ্গের রাজার বাহিনী জাহাজডা ধরতে পারে নাই। হেগো প্রথম বাহিনী পরাস্থ হয়া ফিরা যাওনের পর তালেব তৈমূর জাহাজ নিয়া কোনদিকে গেছে সেইটা আমরা জানতে পারি নাই। তবে হেগো জাহাজ চাঁটগায়ে পৌঁছাইতে পারে নাই। পারে নাই হুগলীর দিকে যাইতে। পারে নাই সুন্দরবনের দিকে যাইতে। এর পেছনে কারণ অইলো, রোসাঙ্গ রাজের প্রথম বাহিনী ব্যর্থ অইলেও হেরা খবর চাউর কইরা দিছিল। যে কারনে মাঝি-মাল্লাগো নৌকা থেইকা শুরু কইরা পর্তুগিজ জাহাজে বাহিনীর হাজারো চোখ পানিতে নজর রাখতে শুরু করে। তবে এই খবর আমগো কাছে আছে হেরা এইখান তাইক্কা সন্দ্বীপ গেছিল। এই খবর আকরাম বেগের খাস লোকের দেয়া। হিসাব করলেও এই খবরের একটা মূল্য আছে। কারণ হেরা যেইখানে ছিল সেইখান থাইক্কা সন্দ্বীপই সবচেয়ে কাছে এবং রসদের লাইগ্গা অইলেও হেগো সন্দ্বীপ যাইতেই হইতো।'

খবরি বিল্লাল শেঠ এইখানে হাত তুলল। 'আমার ওস্তাদও এইটা নিশ্চিত করছে হেরা সন্দ্বীপ গেছিল। আমরা আবারও খোঁজ নিতে পারবে।'

বিপরীত দিক থেকে গোলন্দাজ বলে উঠল, 'আমার প্রশ্ন সন্দ্বীপ অইলো পর্তুগিজ দস্যুগো মূল আখড়া। তাইলে হেরা যাগো কাছ থাইকা বাঁচতে চাইতাছে হেইখানেই ক্যান যাইব?'

'এই প্রশ্ন আমার মনেও আসে নাই তা না,' কিরান বলে উঠল কিন্তু পট্টবর্ধন যেইটা বলল সেইটাও অসম্ভব না। রোসাঙ্গ থেইকা পলানোর পরে সন্দ্বীপ ছাড়া হেগো আর উপায় ছিল। রসদের লাইগ্গা অইলেও।'

'এরপরে,' পট্টবর্ধন আবারও বলতে লাগল। 'এমনকি কিরানের ধইরা আনা ফিরিঙ্গিও এইটা নিশ্চিত করছে হেরা সন্দ্বীপ ছিল। কিন্তু আমগো যেইটা বড়ো সমস্যা আমরা জানি না, হেরা সন্দ্বীপ থেইকা কোনদিকে গেছে। যদি খবর আর হিসাব আমরা মিলায় দেখতে পারি তয় এইটা নিশ্চিত যে, হেরা সন্দ্বীপ থেইক্কা খুব বেশি দূরে যাইতে পারে নাই। কই আছে, কুন দিকে গেছে বা সিলভেরা আর রোসাঙ্গের বাহিনী এখন কী অবস্থায় আছে জানতে অইলে আমগো একটাই উপায়,' পট্টবর্ধন থেমে গেল।

'সন্দ্বীপ যাইতে অইবো আমগো,' কিরান আকরাম বেগের দেওয়া মোড়ানো চামড়ার পুটলিটা বের করে ফেলল কোমরবন্ধনি থেকে। এখানেই আকরাম বেগের খাস লোকের নাম আছে, যাকে খুঁজে বের করতে হবে সন্দ্বীপে গিয়ে।

'বুঝলাম,' বেদু বলে উঠল। নিজের বাঘ-বানর আর ইগলটাকে রেখে আসায় সামান্য মন খারাপ তার। 'কিন্তু সেইখানে গিয়া আমরা খবর পাব ক্যামনে? ওস্তাদ ভুইলো না সন্দ্বীপ অইলো মগ আর পর্তুগিজগো আখড়া। সেইখানে গিয়া আমগোর পক্ষে খবর বাইর করা খুব কঠিন অইবে। বিপদের কথা বাদই দিলাম।'

কিরান এক পা সামনে এগিয়ে এলো। 'মূলত এই পরিকল্পনার লাইগ্গাই আমরা এইখানে আসছি এখন,' বলে সে সবাইকে দেখল। 'আমরা এখন যেইখানে আছি সেইখান থাইকা সন্দ্বীপ যাইতে আমগো সময় লাগব ঘণ্টা তিনেক। মানে এখন রওনা দিলে বিকালের ভিতরে পৌঁছায়া যাব আমরা। আলোচনা শেষ কইরাই রওনা দেব। কিন্তু ওইখানে পৌঁছাইলেও আমরা দ্বীপের সামনের দিকে মানে যেদিকে জাহাজ ভিড়ানি অয় সেদিক দিয়া যাব না। সত্যি কথা অইলো আমরা জাহাজ নিয়াই সন্দ্বীপ যাব না। আমগো জাহাজ থাকব দ্বীপ থেইকা দূরে, খাড়ির কাছে। আমরা তিনটা দল যাব সন্দ্বীপে, কোষা নৌকা নিয়া। দ্বীপের পেছন দিকে পৌঁছায়া আমরা তিনটা দলে ভাগ হয়ে তিন দিকে যাব খবরের জন্য।'

সে প্রথমেই গোলন্দাজকে দেখাল। 'প্রথম দলের নেতা হিসেবে থাকব গোলন্দাজ। এই দলটা মূলত যাইব বিল্লাল শেঠের ওস্তাদের কাছ থেইকা খবর বাইর করার লাইগ্গা। এরপরে দুই নম্বর দলে থাকব লাঠিয়াল তুলারাম। এই দলে বেদুও থাকব। এই দলডা যাইব মূল বাজার এলাকার দিকে। এই দলটার উদ্দেশ্য থাকব বাজারে ঘুরাঘুরি কইরা খবর বাইর করা। আর তিন নম্বর দলে থাকব আমি নিজে, আমার লগে থাকব গোমেজ। আমরা যাব আকরাম বেগের দেওয়া মানুষটার সঙ্গে দেখা করনের লাইগা। আমরা সাবধানে যাব, ছদ্মবেশে যাব, অস্ত্র থাকব আমগো লগে। তবে আমরা যেকোনো অবস্থায় যেকোনো গণ্ডগোল এড়ানোর চেষ্টা করব,' বলে সে হাত তুলে সবাইকে সাবধান করে দিল। সবাই মনে রাখবা, আমগো দলের মূল উদ্দেশ্য থাকব খবর বাইর করা। যেকোনো খবর আমরা বাইর কইরা নিয়া আসব, যেইটা দিয়া আমরা যাত্রার পরের অংশ ঠিক করতে পারি। মনে থাকব সবার?' সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই সে নিজের লোকদের ইশারা করল।

কার দলে কারা যাবে, কীভাবে যাবে, সব ঠিক করে পট্টবর্ধনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিল সে। সব ঠিক করা হয়ে গেছে। এবার মাঠে নামতে হবে কাজের জন্য।

অধ্যায় পঁচিশ

বর্তমান সময়

পতেঙ্গা রোড, চট্টগ্রাম

মাঠে নেমে কাজের আনন্দই আলাদা।

একবার বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আরেকবার রাস্তাটার দিকে ফিরে শারিয়ারের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। একারণেই ফিল্ড লেভেল কাজে, যেখানে বেশিরভাগ মানুষ ভয় পায় সেখানে সে অনেক বেশি আনন্দ পায়। আসলে খাতাকলমে কাজ করা এক জিনিস, আর মাঠে নেমে সত্যিকারের পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সবুজে ছাওয়া গাছপালার মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া চওড়া সুন্দর রাস্তাটা যেন শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে ভেঙচে উঠল। শারিয়ার হাতের স্পোর্টস ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। সন্ধে হতে আর বেশি বাকি নেই। বড়োজোর ঘণ্টা দুয়েক। মিটিং রুমের আলোচনার পর আরো এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।

মিটিংয়ে ওর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর সবাই তালি দিয়ে ওঠে। ওর বক্তব্যের পর রুম্পা আর তার টিম নিজেদের ভেতরে আলোচনা করে তাদের কার্যকরণ ঠিক করে নেয়। মিটিং শেষ করার পর ওর নিজের অভিজ্ঞতা আর নোটবুকে নেওয়া নোটগুলো রুম্পার হাতে দিয়ে শারিয়ার কেসের ব্যাপারে তাকে লাক উইশ করার সময় রুম্পা তাকে জানায়, ঢাকায় হেড অফিসে তার কথা হয়েছে, শারিয়ার চাইলে টিমের অংশ হিসেবে কাজ করতে পারে। শারিয়ার কিছু না বলে চুপ করে থাকে। কেসে কাজ করার ইচ্ছে ওর ফিফটি ফিফটি। যে ড্যামেজ সে করেছিল নিজের অ্যানালিসিস থেকে একটা নতুন অ্যাঙ্গেল দাঁড় করাতে পেরে সেটা সে কিছুটা হলেও পুষিয়ে দিয়েছে কাজেই এখন এই কেসে সে কাজ করবে কি করবে না সেটা নির্ভর করবে রুম্পার ওপরে। শুধু হেড অফিসে কথা বলে লাভ হবে না। কিন্তু হেড অফিসে কথা বলার পর রুম্পা তালুকদার তাকে এটাও জানায়, তার কেসের উপদেষ্টা কমিটি, এমনকি তার টিমের মেম্বাররাও চাইছে শারিয়ার যেন টিমের অংশ হিসেবে থাকে। এরপরে শারিয়ার রাজি হয়ে যায়।

ওখানে বসেই ওরা পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলে কীভাবে এবং কোথা থেকে কেসটা নিয়ে ওরা আগাবে। প্রথমেই টমি এবং তার সঙ্গে আইটি টিমকে দায়িত্ব

দেওয়া হয় প্রফেসরের কাজ এবং তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তথ্য বের করার, বিশেষ করে সরকারের সঙ্গে তার গণ্ডগোলের ব্যাপারটা নিয়ে বিশদ জানার জন্য। এরপরে ভুবন এবং তার সঙ্গে রুম্পার টিমের আরো তিনজনকে মিলিয়ে একা দল তৈরি করে দায়িত্ব দেওয়া হয় স্থানীয় ইনফর্মার, মানে খবরিদেরকে। টিমটা ঠিক করা হয় স্থানীয়দের কথা মাথায় রেখে। ভুবন নিজে স্থানীয় ছেলে সেইসঙ্গে এই টিমে তাদেরকেই রাখা হয় যারা স্থানীয়। কারণ এই কাজটার জন্য ওদেরকে অবশ্যই স্থানীয় লোক হতে হবে। এছাড়া এখান থেকে কোনো কাজ উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। এরপরে তিন নম্বর টিমটা বানানো হয় শারিয়ার, রুম্পা আর ফরেনসিকের দুজনকে নিয়ে, এই টিমটা মূলত তাদেরই যাদের ফিল্ডে কাজ করার অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি এবং যাদের ট্র্যাকিং এবং ফরেনসিকের ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা আছে। এরা কাজ শুরু করবে স্পট থেকে। একেবারে বাড়ি এবং তদসংলগ্ন রাস্তাটা থেকে। আর পিবিআইয়ের ভেতরে খতিয়ে দেখার জন্যে কোনো টিম বানানো হয়নি, কিন্তু সেখানে খোজ করা হবে ভিন্ন ভাবে। কাজ ভাগ করে দেয়ার পর পরই তিনটে টিম মাঠে নেমে যায়।

তৃতীয় নম্বর টিমের সঙ্গে পতেঙ্গা রোডের সেই বাড়িতে চলে আসে ওরা। আর সেখানেই এখন রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে শারিয়ার। ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ও চলে এলো যেখানে প্রফেসর মারা পড়েছিল সেখানে। রাস্তার ওপরে মানুষের আকৃতির মার্কিং আঁকা রয়েছে, যেখানে প্রফেসরের বডিটা পাওয়া গেছিল। শারিয়ার সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সেখান থেকে রাস্তা আর বাড়িটার দূরত্ব জরিপ করার চেষ্টা করছে।

'আমাদের লোকেরা মাঠে নেমেছে,' পেছনে থেকে রিনরিনে গলা শুনে ফিরে তাকাল শারিয়ার। রুম্পা তালুকদার এসে দাঁড়িয়েছে ওর পেছনে। শারিয়ার ভালোভাবে খেয়াল করে দেখল মিটিংয়ের সময়ে তাকে যেরকম বিধ্বস্ত লাগছিল এখন ততটা লাগছে না। মেয়েদের এই এক আজব রহস্য, শারিয়ার যেটা আজও ধরতে পারেনি। এই এক মুহূর্তে এরা এলোকেশী থেকে মুহূর্তের ভেতরেই রাজরানি। সম্ভবত সে মিটিংয়ের আগে নিজেকে গোছানোর সময় পায়নি কাজের চাপে। এখন অনেকটাই ফ্রেশ লাগছে তাকে দেখতে। শারিয়ার ফিরে তাকাতেই সে মৃদু হেসে বলে উঠল, 'আপনি আবার পোশাক নোংরা করতে গেলেন কেন?'

শারিয়ার মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল। 'মিস রুম্পা মাঠে তো সবে নামলাম আমরা, আরো কত কী যে নোংরা হবে কে জানে,' বলে সে বাড়িটার দিকে দেখাল, তারপর ফিরে রাস্তার ওপরে যেখানে বডিটা ছিল সেদিকটা দেখাল। 'কিছু ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করছিলাম। আপনি তো জানেনেই, ক্রাইম সিন হলো দ্রুত পচনশীল মাছের মতো। যত সময় পার হয় দ্রুত নষ্ট হতে শুরু করে। আর এখানে তো মনে হয়

অনন্ত কাল পার হয়ে গেছে। তার ওপরে আবার ওইদিন রাতে ছিল বৃষ্টি,' বলে শারিয়ার কাঁধ ঝাঁকাল। 'কাজেই এখান থেকে কিছু বের করাটা খুব কঠিন হবে।'

'হুমম, তাই মনে হচ্ছে,' রুম্পাও কাঁধ ঝাঁকাল। 'তবে আপনার কথাটা আমি মানি,' চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ফেলল সে। 'প্রফেসর আসলে এখানে কী করছিল সেটার জবাব এখান থেকেই পাবার একটা সম্ভাবনা আছে। আমার ইন্সট্রাক্টর বলতেন, ক্রাইম সিন আর ডিসেকশন টেবিল হলো খোলা বইয়ের মতো। সবই তোমার চোখের সামনে আছে, তুমি কতটা ধরতে পারছ সেটা পুরোপুরি তোমার ব্যাপার। আর তোমার ধরতে পারার ক্ষমতার ওপরেই নির্ভর করবে তুমি কতটা দক্ষ ইনভেস্টিগেটর হতে পারবে।'

রুম্পার কথা শেষ হতেই শারিয়ার হেসে উঠল। 'আমরা মনে হয় একই ইন্সট্রাক্টরের অনুসারী ছিলাম,' বলে সেও মৃদু হেসে উঠল।

'তবুও আপনি আজকের মিটিংয়ে যেভাবে পুরো কেসটাকে 'সোয়াট' অনুযায়ী সাজালেন এই ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না।'

'এটা একেবারে রিসেন্ট সংযোজন,' শারিয়ার মাথা ঘুরিয়ে ক্রাইম সিন রেডিয়াসের ভেতরে রাউন্ড আপে থাকা লোকগুলোকে দেখতে দেখতে বলে উঠল, 'আসলে খুব বেশি সময় পাইনি, যতটা পেরেছি,' বলে সে একটু থেমে যোগ করল, 'বলতে পারেন এটা আমার রিডেম্পশন ছিল, কেসটার প্রতি। যে ড্যামেজ করেছি সেটা পূরণ তো সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাকআপ দেয়ার একটা চেষ্টা বলতে পারেন। আই ওয়াজ ভেরি ইম্পালসিভ লাস্ট নাইট,' আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল শারিয়ার।

রুম্পা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই সে আবারও মাঠে কাজ করা টিমের দিকে দেখিয়ে জানতে চাইল, 'ওরা কতটা রেডিয়াস নিয়ে কাজ করছে?'

রুম্পা টকিতে কথা বলল অন্যদের সঙ্গে। তারপর শারিয়ারের দিকে ফিরে জানাল, 'এক শ মিটার রেডিয়াস নিয়ে কাজ করছে পুরো টিম।'

'হবে না,' এক বাক্যে মানা করে দিল শারিয়ার। 'কমপক্ষে পাঁচ শ মিটার রেডিয়াস নিয়ে কাজ করতে বলুন। তা না হলে এই ধুয়ে যাওয়া ময়দানে কিছুই পাওয়া যাবে না।'

'পাঁচ শ মিটার টু মাচ হয়ে যাবে,' রুম্পা মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল। 'টিম তো একেবারে ছোটো। আপাতত দুই শ বলি।'

শারিয়ার কিছু না বলে মাথা নাড়ল। মনে মনে ভাবল করুক। এখন মানা করতে গেলে বা বাড়াবাড়ি করতে গেলে তো এটাও করবে না। 'ওরা কাজ করতে করতে বরং চলুন আরো একটু এটা নিয়ে এনালিসিস করার চেষ্টা করি। আপনার সঙ্গে কেস ফাইলটা আছে?' শারিয়ার রুম্পার কাছে জানতে চাইল।

রুম্পা জবাব দিল, 'গাড়ি থেকে আনানো যাবে,' বলে সে টকিতে নির্দেশ দিতেই ড্রাইভার দৌড়ে এসে কেস ফাইলটা দিয়ে গেল। সেখান থেকে শারিয়ার ক্রাইম স্পটে প্রফেসরের পড়ে থাকার ছবিটা বের করে নিল। বৃষ্টির ভেতরে তোলা

ছবিটা খুবই অস্পষ্ট, সম্ভবত এটা অফিসিয়াল ছবিও নয়। স্পটে পৌঁছানো কোনো পুলিশের মোবাইল দিয়ে তোলা। তবুও একটা সাক্ষাৎ দলিল তো আছে। শারিয়ার ছবিটা নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাটাতে চলে এলো। সেখানে এসে মার্কিংয়ের সঙ্গে ছবিটা মিলিয়ে দেখে সেটা ফেরত দিল। তারপর আবারও আগের মতো বাড়িটাকে সোজা একটা লাইন ধরে বডিটা যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। নিজের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি তুলে একটা মাপ দিল সে বডির সঙ্গে বাড়িটার অ্যাঙ্গেলের।

'রুম্পা, এখানে একটু আসবেন প্লিজ,' বলে সে নিজের পাশে আসতে বলল রুম্পাকে। রুম্পা এগিয়ে এসে খানিকটা দ্বিধার সঙ্গে শারিয়ারের পাশে একইরকম হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। 'এখানে দেখুন, প্রফেসরের বডিটা পড়ে ছিল এখানে। আমরা যদি বাড়িটার বের হয়ে আসার পথটাকে এর সঙ্গে স্ট্রেইট লাইন ধরি তাহলে প্রফেসরের বডি পড়ে থাকার অ্যাঙ্গেলটা একদম মিলে যায়। কিন্তু এতে একটা সমস্যা আছে, কী সেটা ধরতে পারছেন?'

রুম্পা এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর জবাব দিল, 'প্রফেসরের বডি পড়ে থাকার অ্যাঙ্গেলটা বাড়ির সঙ্গে এতটা মিলে যাওয়ার ব্যাপারটা তো হওয়ার কথা নয় কারণ, কারণ খুব স্বাভাবিকভাবেই গাড়ির সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট করে প্রফেসরের দেহটা ছিটকে সরে পড়ার কথা। যেখানে তার বডি পাওয়া গেছে সেটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার প্রবেশ পথের একেবারে বরাবর কীভাবে হয়?' রুম্পা চিন্তিত মুখে বলে উঠল।

'একদম ঠিক রুম্পা,' প্রায় বাচ্চাদের মতো খুশি হয়ে উঠল শারিয়ার। সে একটা আঙুল তুলে বলে উঠল, 'তার ওপরে খেয়াল করে দেখুন ছেলেমেয়েগুলোর গাড়িটা চালাচ্ছিলো প্রায় আশি কিলোমিটারের ওপর স্পিডে। মানে যেটা বলা আছে ফাইলে। গাড়িটা এতটাই জোরে এসে প্রফেসরের দেহে আঘাত করে যে প্রফেসর স্পটেই মারা যায়। এই আঘাতে দেহ এক জায়গায় পড়ে থাকার কোনো কারণই নেই। তাহলে ব্যাপারটা কী?'

রুম্পা আবারও চিন্তিত মুখে বলে উঠল, 'এর মানে কি ছেলেমেয়েগুলো প্রফেসরের দেহটা সরিয়েছে বা সরানোর চেষ্টা করছিল?'

'ডিউটি অফিসার যারা ছেলেমেয়েগুলোকে স্পটেই ধরে ফেলে তাদের ভাষ্যমতে ছেলেমেয়েগুলো প্রফেসরকে ধরেছিল কিন্তু তার দেহ সরানোর আগেই পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যায়। এরমানে প্রফেসরের দেহ এখানেই ছিল। এই হিসেবে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তবে প্রফেসর যখন ভালো ছিল তার অবস্থান বাড়িটা থেকে কোনো দিকে হতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

রুম্পা ভেবে নিয়ে জবাব দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই তার ওয়াকিটকি খড়খড় করে উঠল। টকিতে কথা বলে সে শারিয়ারের দিকে ফিরে আফসোসের সঙ্গে বলে উঠল, 'কাজ হয়নি। কিছুই পায়নি ওরা।'

শারিয়ার মাছি তাড়ানোর মতো করে হাত নাড়ল, 'গুল্লি মারেন ওদের,' সে নিজের রুক্ষ স্বরূপে ফিরে আসছে। 'এক কাজ করেন, ওখান থেকে সেরা দুজন অফিসারকে এখানে চলে আসতে বলেন। বাকিদের বলেন গাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করুক।'

রুম্পা টকিতে সেরকমই নির্দেশ দিল। 'আপনি আসলে কী করতে চাচ্ছেন বলুন তো আমাকে?'

তার দিকে তাকিয়ে শারিয়ার একটা হাসি দিল তারপর বলে উঠল, 'আমরা একটু জ্যামিতিক মাপজোখ করব। এই ধরেন অনেকটা হাই স্কুলের সম্পাদ্য-উপপাদ্যের মতো। এখন দেখুন,' বলে সে বডিটা যেখানে ছিল সেদিকে দেখাল। তারপর দেখাল বাড়িটাকে। 'যতই রাত হোক, আর বৃষ্টি থাক নিশ্চয়ই প্রফেসর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে না এসে উড়ে আসেনি এখানে। তাইনা?'

'নাহ,' রুম্পার সরল জবাব।

'ঠিক আছে। তাহলে সোজাসরলভাবে রাস্তা পার হয়ে এলে তার থাকার কথা হয় ওখানে আর না হয় এখানে। ঠিক,' বাড়িটা থেকে উঠে আসা রাস্তা বরাবর রাস্তা এপার ওপার দুইদিকেই দেখাল শারিয়ার। তারপর রুম্পার জবাবের অপেক্ষা না করে সে এগিয়ে গেল বডিটার দিকে। 'কিন্তু বডিটা ছিল এখানে। এখন যদি আমি ধরে নেই,' সে অন্যদিকে দেখাল। 'ছেলেমেয়েগুলো আসছিল ওদিকে থেকে, আরযাচ্ছিল ওদিকে। তারমানে। সেদিকে যদি এগিয়ে যাই তাহলে যে গতিতে আসছিল সে গতিতে প্রফেসরের দেহে আঘাত লাগলে প্রফেসর অন্তত এতটুকু এদিকে থাকার কথা ঠিক,' বলে সে প্রফেসরের বডিটা যেখানে পড়ে ছিল সে দিক থেকে গাড়িটা যেদিকে আসছিল সেদিকে এগিয়ে গেল অনেকটা। 'তারমানে প্রফেসর তার থাকার বাড়ি বরারর ছিল না। সে এদিকে এগোচ্ছিলো।'

রুম্পা খানিকটা সরে এসে শারিয়ারের হাতের দিকে দেখল, তারপর বাড়িটার সঙ্গে অ্যাঙ্গেল মিলিয়ে একমত পোষণ করল। 'এটাই হতে বাধ্য, তাছাড়া প্রফেসরের বডি যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে যাওয়ার কথা না।'

'একদম ঠিক,' বলে সে আবারও হাত তুলে দেখাতে লাগল। 'একজন স্বেচ্ছাবন্দি লোক যে নিজেকে দীর্ঘদিন ধরে একটা বাড়ির বেইজমেন্টে আটকে রেখেছিল সেই লোকটা এরকম অন্ধকার বৃষ্টির রাতে নির্জনের ভেতরে এখানে কেন আসবে?'

'হতে পারে সে কোনো ইমার্জেন্সিতে পড়েছিল। হয়তো সে কোথায় যেতে চাচ্ছিল,' রুম্পা বলে উঠল। তার অফিসারেরা ফিরে আসতে শুরু করেছে। তারাও অবাক হয়ে দেখছে শারিয়ারের কাজ।

'তাহলে সে বাড়ির বেইজমেন্টে থাকা গাড়ি দুটোর একটাও কেন ব্যবহার করল না? মনে রাখবেন, সে কিন্তু চাইলেই সেটা করতে পারত। কারণ ফাইলে দেখলাম দুটো গাড়ির চাবিই ছিল বাড়ির দারোয়ানের রুমে। হয়তো একটু কঠিন

হতো, কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল। সে সম্ভাবনা যদি বাদ দিই তবে আরেকটা সম্ভাবনাই থাকে,' বলে শারিয়ার থামল।

'সে কারো সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল,' রুম্পা চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে উঠল। 'কিন্তু সে জন্য তাকে বাড়ির বাইরে আসতে হবে কেন?'

'একটামাত্র ক্ষেত্রেই সেটা হতে পারে,' শারিয়ার ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে রাস্তার পাশের ঝোপঝাড় যেখানে নেমে গেছে সেদিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ওদিকটাকে কী আছে। 'যদি সে কারো পিছু নিয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে যদি সত্যি কারো পিছু নিয়ে থাকে তবে অ্যাক্সিডেন্টের পর মানুষটা গেল কোথায়? সে কি সরে পড়ল অ্যাক্সিডেন্ট হতে দেখে নাকি অন্যকিছু?'

'এটাই বের করতে হবে আমাদের, কিন্তু কীভাবে সম্ভব?' বলে রুম্পা বাড়িটার দিকে দেখল তারপর নির্জন রাস্তা আর আশপাশটা দেখে তার অফিসারদের একজনের কাছে জানতে চাইল, 'সুমন, বাড়িটাতে থাকা সিসি ক্যামেরাগুলোর কী অবস্থা চেক করেছিলে?'

'জি, ম্যাডাম,' পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো সুমন ছেলেটা। 'সবগুলো ভুয়া। লাগানোর পর থেকে একটাও চেক করা হয়নি কিংবা ঠিক করা হয়নি। শুধু লাগিয়ে রাখা হয়েছে দেখানোর জন্য যে ক্যামেরা আছে। আসলে কিছুই নেই।'

'আশপাশে তো অন্য কোনো বাড়িও নেই কিংবা এটিএমবুথ কিংবা অফিস যে ওগুলোর কোনোটা থেকে কোনোকিছু পাবার সম্ভাবনা আছে,' আনমনেই বলে উঠল রুম্পা। তারপর শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল, 'ওমা আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

কিন্তু রুম্পার কথার জবাব না দিয়ে শারিয়ার নামতে শুরু করেছে মূল রাস্তাটা থেকে। সে নামতে নামতে থেমে গিয়ে বলে উঠল, 'ম্যাডাম, যেহেতু ক্যামেরা ফ্যামেরার বালাই নেই কাজেই আর একটাই উপায় আছে, সরেজমিনে পরীক্ষা করা। এখানে দেখুন, যদি প্রফেসর কারো পিছু নিয়ে থাকে তবে মানুষটা যদি মূল রাস্তা ধরে সরে গিয়ে না থাকে তবে সেক্ষেত্রে দেখেন এদিক দিয়ে তার কোথাও না কোথাও সরে পড়ার কথা। যদি তাই হয়ে থাকে তবে রাস্তার এদিকে-ওদিকে দুদিকে দেখলে ওইপাশে যেহেতু বাড়ি কাজেই এদিকটাই ভরসা। সমস্যা হলো বৃষ্টির কারণে সব ধুয়ে-মুছে গেছে। কিন্তু এখানে দেখেন,' বলে শারিয়ার ছোটো-ছোটো কয়েকটা গাছের মতো দেখাল।

'গাছের ডাল ভাঙা,' রুম্পা বলে উঠল।

'বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই গাছের ডাল ভাঙতে পারে না,' শারিয়ার রুম্পাকে কথাটা বলেই সে সুমনকে উদ্দেশ্য করে জানতে চাইল, 'আপনারা কি এদিকে চেক করেছিলেন?'

সুমন মাথা চুলকে আনমনে একবার জায়গাটার দিকে দেখল তারপর নিজের দুই সঙ্গীর দিকে দেখে নিয়ে আবার শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,

'দেখেছি, মানে রাস্তা থেকে চোখ বুলিয়েছিলাম। মানে, স্যার আপনি যেভাবে দেখছেন সেভাবে...'

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে শারিয়ার খুশি হয়ে উঠল। 'এইটাই আমি জানতে চাচ্ছিলাম, আপনারা কেউ এখানে নেমেছিলেন কিনা?' বলেই সে রুম্পার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আমাদের লোকেরা কেউই এখানে নামেনি, এর মানে কেউ না কেউ তো এদিক দিয়ে নেমেছিল সম্প্রতি। কারণ মানুষ না নামলে এভাবে...' সে বাক্যটা শেষ না করে নামতে শুরু করল রাস্তার পাশের ঢাল বেয়ে। রুম্পা বাকিদের ইশারা করল ওদেরকে অনুসরণ করতে।

রাস্তার পাশের ঢাল বেশি গভীর না। আট-দশ ফিট নামতেই রাস্তার পাশের বড়ো ডালপালাওয়ালা গাছ শেষ হয়ে জঙ্গলের মতো জায়গাটার শুরু। শারিয়ার সাবধানে দেখতে দেখতে এগোচ্ছে। সে পেছন ফিরে রুম্পার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'বৃষ্টিতে সব শেষ কিন্তু,' বলে সে আরেকটু এগিয়েই মাটিতে নিচু হয়ে বসে পড়ল, তারপর জংলামতো জায়গাটার একটা জায়গা থেকে বড়ো একটা গাছের পাতা সরিয়ে খানিকটা খুশি হয়ে রুম্পাকে ডেকে দেখাল। রুম্পা কৌতূহলী হয়ে শারিয়ারের কাঁধের ওপাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, বড়ো পাতার নিচে একটা বুট জুতোর ছাপের বেশ খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। 'কেউ যে এখান দিয়ে গেছে তার সামান্য প্রমাণ। আমার বিশ্বাস এখান দিয়ে একজন নয় একাধিক লোক গেছে, হয় সেদিন আর না হয় সম্প্রতি এবং জুতোর ছাপের ধরন দেখলেই বলা যায় এই ধরণের হেভি ডিউটি বুট আমাদের দেশের মানুষেরা সহজে পরে না। এর মানে...'

'বিশেষ কেউ গেছে এদিক দিয়ে...'

শারিয়ার উঠে দাঁড়াতেই রুম্পা তার লোকদের উদ্দেশে নির্দেশ দিল ছাপটার ছবি আর নমুনা নিতে। শারিয়ার উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এগোতে লাগল। 'রুম্পা ম্যাডাম, বিশ্বাস করেন যদি আমার অনুমান ভুল না হয় তবে সামনে...' বাক্যটা শেষ করার আগেই সে ঝোপঝাড়ের ওপাশ থেকে অন্যদিকে চলে এলো এবং সাবধান না হলে সে আরেকটু হলেই পড়ে যেত সামনের বিরাট পুকুরটার একপাশে।

'সাবধান ম্যাডাম,' সে নিজে থেমে গিয়ে সাবধান করে দিল ওর পিছু পিছু আসতে থাকা রুম্পাকে। রুম্পাও জংলা জায়গাটার একপাশে এসে সামনেই বিরাট পুকুরটা দেখে বেশ অবাক হয়ে গেছে।

'ওমা এখানে তো পানি,' ছোটো পোলাপান অবাক হলে যেভাবে বলে ওঠে সেভাবে বলে উঠল সে। শারিয়ার মাথা চুলকাতে চুলকাতে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে পানির দিকে। ওর অনুমান এভাবে বোকার মতো ভুল প্রমাণ হয়ে যাবে ভাবতেই পারেনি সে। ঠিক যেখান থেকে ওর ধারণাটা ঠিক প্রমাণ হতে শুরু করছিল সেখানেই এভাবে থেমে যেতে হবে কে ভেবেছিল।

খানিকটা বোকার মতোই জলাধারটার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

অধ্যায় ছাব্বিশ

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

জংলাটিলা, সন্দ্বীপ ও সপ্তগ্রামের মাঝের সমুদ্র

অস্তমিত সূর্যের লালিমা দিগন্তের রেখা ছাড়িয়ে লুটিয়ে পড়েছে নীল পানিতে। সেই লালিমার প্রভাবে সমুদ্রের পানিরক্তাক্ত লালকে আক্ষরিক অর্থেই অধিক লাল করে তুলছে। দিগন্তরেখা থেকে চোখ ফিরিয়ে সামনের পড়ন্ত বিকেলের একরাশ মুগ্ধতার দিকে তাকিয়ে আরকের বোতলে চুমুক দিল পদ্ম। সেইসঙ্গে তার মনে পড়ে গেল এরকম শান্ত বিকেলের লালচে আলোতেই বদলে গিয়েছিল তার জীবন।

দক্ষিণ উপকূলের চাঁটগাওয়ের অতি সাধারণ এক কায়স্থ তাঁতি পরিবারে জন্ম হয়েছিল পদ্মের। তার প্রকৃত নাম পদ্ম নয়। পদ্মরানি নামটা দস্যু হওয়ার পর সে অর্জন করেছিল নিজের শক্তি আর যোগ্যতা দিয়ে। এর আগে নিজের পরিবারের সঙ্গে থাকার সময়ে তার নাম ছিল করবী। তার তাঁতি বাপ করবী তুলার সুতো দিয়ে বস্ত্র তৈরি করতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত বিধায় নিজের তিন ছেলের পর জন্মানো একমাত্র ছোটো মেয়ের নাম রেখেছিল নিজের প্রিয় সুতোর নামে। কিন্তু সে কি জানত যে, নিজের আদরের মেয়ের নাম বেশিদিন তার সঙ্গী হবে না। যে হাত একদিন দক্ষিণের সবচেয়ে মোলায়েম সুতো কাটতে পারতো সেই হাতেই একদিন লোহার তরবারি দিয়ে মানুষের গলা কাটতে হবে।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে-সময়ে পুরো ভারতবর্ষে বাঙ্গাল মুলুকের তাঁতিদের বোনা কাপড়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। এই সুনামে মাত্রা এতটাই বেশি যে, একেবারে মোঘল অন্দরমহল থেকে শুরু করে সাধারণ অবস্থাসম্পন্ন গোমস্তা পরিবারে পর্যন্ত বাংলার তাঁতিদের বোনা কাপড়ের চাহিদা ছিল। এই কারণেই সবচেয়ে উচ্চমানের মসলিন থেকে শুরু করে একেবারে সাধারণ হাতে বোনা সুতোর কাপড় বোনার কাজ শুরু হয়েছে বাঙলার সর্বত্র। নিঃসন্দেহে এই সমস্ত কর্মযজ্ঞের মূলকেন্দ্র বাংলার রাজধানী ঢাকা আর সোনারগাঁয় হলেও তাঁত সংক্রান্ত বিভিন্ন জিনিস যেমন, তাঁত নির্মাণের জন্য বিশেষ কাঠ, তাঁতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ ধরনের বাঁশ থেকে শুরু করে নানা ধরনের আর নানান বর্ণের সুতোর চাহিদার কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। আর তাই ঢাকা ছাড়িয়ে এই সব জিনিসের চাহিদা ছড়িয়ে পড়েছে একেবারে দক্ষিণের উপকূলে।

যখনই বাঙাল মুল্লুকের বিখ্যাত কাপড়ের বিষয়ে আলাপ হয় তখনই সবার আগে উঠে আসে মসলিনের কথা। নিঃসন্দেহে মসলিন সেরাদের সেরা হলেও মসলিনের পাশাপাশি বাংলায় আরো অসংখ্য ধরনের কাপড় ছিল, সেইসঙ্গে ছিল নানা ধরনের তাঁতের কারবারি। যারা কাপড় বুনতে পারত তাদের মূল্যায়ন সবচেয়ে সেরা হলেও আসলে বাকি কারবারিদেরও মূল্যায়ন একেবারে কম ছিল না। কারণ এরা ঠিকমতো জোগান না দিলেও তাঁতের কারিগরেরা একেবারেই অসহায়। পদ্মদের পরিবার ছিল এরকমই কারবারের কারবারি। কায়স্থ পরিবার হলেও দাদার আমল থেকে নানা ধরনের সুতোর কারবার করে পদ্মদের পরিবার বেশ অবস্থাসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে হুগলী, সপ্তগ্রাম, চাঁটগা তো বটেই তাদের পরিবারের বিশেষ সুতোর চাহিদা ছিল এমনকি সুদূর ঢাকা পর্যন্ত। এর পেছনে কারণও ছিল। সুতো নির্মাণ একটা শিল্প বিশেষ। আর পদ্মের পরিবার ছিল এই শিল্পের আক্ষরিক শিল্পী। দরবারে আম, মলমলে খাস থেকে শুরু করে সাধারণ সুতো পর্যন্ত তৈরি হতো তার পরিবারে। আর এইসব সুতোর কারবারের জন্য ছিল দক্ষ থেকে দক্ষতর লোকজন। পদ্মর পরিবারের তুলনায় তার মায়ের পরিবার ছিল খানিকটা নিচু জাতের কিন্তু পদ্মর মাকে তার বাবা বিয়ে করেছিল কারণ পদ্মের মায়ের সুতো চেনা থেকে শুরু করে সুতো নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা ছিল। এই ব্যাপারটা এমন যে, সবাই চাইলেই করতে পারে না। এর জন্য বিশেষ অনুভূতি শক্তি এবং সেইসঙ্গে বিশেষ আঙুল লাগে। একজন শিল্পীর যেমন গানের গলা লাগে, চিত্রকরের লাগে বিশেষ হাত, এই ব্যাপারটাও ঠিক তেমন। তিন ছেলে জন্মের পর পদ্মের জন্ম হওয়ার পর তার বাবা বিশেষ খুশি হয়েছিল কারণ একটা মেয়ের জন্য তার অপরিসীম ভালোবাসা তো ছিলই সেইসঙ্গে পদ্মের জন্ম হতেই তার চিকন চিকন সরু আঙুল দেখেই তার বাপ বুঝতে পেরেছিল মেয়ে জন্মগতভাবেই মায়ের দক্ষতা নিয়ে জন্মেছে। এ মেয়ে একদিন দক্ষিণের সেরা সুতোর শিল্পী হবে।

বাস্তবিক অর্থে হতেও যাচ্ছিল তাই। জন্ম থেকেই পদ্ম বেড়ে উঠছিল নানা ধরনের সুতো আর সুতোর কারবারের ভেতরেই। চার বছর বয়সের সময়েই সে প্রথম সুতো চিনতে শিখে যায়। তার বয়স যখন বারো তখন সে শুধু সুতো নয় বরং সুতো নির্মাণে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে পুরো দক্ষিণের অঞ্চলে। একদিকে বলতে গেলে সুতোর দক্ষ শিল্পী আর অন্যদিকে বাপের আদরের দুলালি হিসেবে বড়ো হয়ে উঠছিল পদ্ম। এমন সময় স্বাভাবিক নিয়মেই পনেরো বছর বয়সের সময়েই তাদের নিজেদের গ্রামেরই এক কাপড়ের কারবারি পরিবারের একমাত্র ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় তার। পদ্মের জীবনটা খুবই সাধারণ আর সুখী ছিল। কারণ নিজের জামাই বাড়ির দু-বাড়ি পরেই নিজের বাপের বাড়ি। সেইসঙ্গে তার পরিবারে সঙ্গেই যৌথ কারবার নিজের শ্বশুরবাড়ির। সেইসঙ্গে পদ্মের সংসার

জীবন শুরু করার আগেই নিজের স্বামীর প্রেমে পড়ে যায়। পদ্মের স্বামী তার চেয়ে বড়োজোর বছর দুয়েকের বড়ো হবে। সে সময়ে ছেলেমেয়েদের এমন বয়সেই বিয়ে দেওয়া হতো।

পদ্মের স্বামী মোহন ছিল গ্রামের সবচেয়ে ভদ্র ছেলেদের একজন। বিয়ের পরে পদ্ম শুধু সংসারই করছিল না সে বাপ আর শ্বশুরের সঙ্গে সুতোর কারবারিতেও অংশীদার ছিল। আর তার স্বামী নিজের বাপ মানে পদ্মের শ্বশুরের কাছ থেকে ধীরে ধীরে শিখে নিচ্ছিল কাপড়ের কারবার। এরই মাঝে বিয়ের বছর দুয়েকের ভেতরেই পদ্মের কোলজুড়ে আসে তার প্রথম সন্তান। নিজের স্বামী-সংসার আর ছেলেকে নিয়ে পদ্মের চেয়ে সুখী কেউ ছিল না কর্ণফুলীর তীরে।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে ব্যবসা থেকে শুরু করে চাষবাস সব কিছুতেই আক্ষরিক অর্থে সোনা ফলছে। কিন্তু শান্তি নেই বাংলার মানুষদের জীবনে। স্রেফ বহিরাগতদের কারণে। একদিকে দিল্লিতে উত্থান-পতন বারবার নাড়িয়ে দিচ্ছে বাংলার মসনদ। আবার এদিকে বারোভূঁইয়া আর অন্যদিকে একে একে আসতে শুরু করেছে সাদা চামড়ার উৎপাত। সবার নজর ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করে সুখী সমৃদ্ধ বাংলার দিকে। বিশেষ করে বাংলার দক্ষিণ উপকূল উত্তাল হয়ে উঠেছে পর্তুগিজ আর মগ জলদস্যুদের অত্যাচারে। অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত নিষ্ঠুর এসব দস্যুদের অত্যাচারে অস্থির হয়ে উঠেছে উপকূলীয় অঞ্চল। আর দিনে দিনে এতটাই বেড়ে চলেছে এদের সাহস যে, এরা ধীরে ধীরে সমুদ্র অঞ্চল তো বটেই এমনকি নদীপথ আর খাল-বিল বেয়ে ঢুকে পড়তে শুরু করেছে বাংলার ভেতরের দিকে।

এ ফিরিঙ্গি দস্যুদের কথা নিজের স্বামী আর শ্বশুরের মুখে শুনলেও নিজেকে এসব দস্যুর খপ্পরে পড়তে হবে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি পদ্ম। আজও মনে পড়ে তার জীবনটা যেদিন এলোমেলো হয় গেছিল সেদিন ছিল বছরের উষ্ণতম দিন। বিরাট একটা কাপড়ের চালান নিয়ে তাদের পরিবারের দুটো বড়ো-বড়ো ব্যাপারি নৌকা রওনা দেয়ার কথা ছিল সপ্তগ্রামের উদ্দেশে। আর তাই কয়েকদিন ধরে টানা কাজ করে চলেছিল ওদের পরিবারের সবাই। প্রতিদিন বেলা ওঠার আগেই কাজ শুরু করত, আর সেই কাজ চলত একেবারে সন্ধ্যা অবধি। সেদিনও তারা সবাই সেই ভোর থেকে কাজ করছিল। কারণ সেদিন দুপুরের পর থেকে কর্ণফুলীর জোয়ার ধরার জন্য দুপুরের ভেতরেই নৌকা বোঝাই করার কথা ছিল। তার আগের দিন গভীর রাত অবধি কাজ করার পর আবার খুব ভোরে উঠে কাজ শুরু করেছিল সবাই। প্রথমে সুতোগুলো শেষবারের মতো পরখ করে সেগুলো ধরন অনুযায়ী আলাদা করা। তারপর সেগুলোর গাটছড়া বাঁধা। তারপর সেগুলোকে

নির্দিষ্ট বাঁশের খোলের ভেতরে ভরা। তারপর আবার সেই বাঁশের খোলের ওপরে আলাদা আলাদা করে নিশান লাগানো। সব শেষে বাঁশের খোলগুলাকে আবার একসঙ্গে করে নৌকায় বোঝাই করা।

এই সমস্ত কাজের ভেতরে পদ্মের কাজের পরিমাণই ছিল সবচেয়ে বেশি। কারণ তাকে একাই প্রথমে সুতোগুলোকে পরখ করে সেগুলোকে ধরন অনুযায়ী আলাদা করতে হতো। এই কাজটার জন্য না পদ্মের শ্বশুর না তার বাবা কিংবা স্বামী কেউই তাকে ছাড়া অন্য কারো ওপরে ভরসা করতে পারত না। আর তাই ভোরবেলা সবার আগে কাজ শুরু করতে হতো ওকে। প্রতিটা সুতোর গাঁটে হাত বুলিয়ে সেগুলো পরখ করতে হতো তাকে। পরখ করে আলাদা করার পরেই শুরু হতো বাকিদের কাজ। আর তাই তাকে কাজ শুরু করতে হতো সবার আগে।

যাই হোক সেদিন ভোর থেকে কাজ শুরু করে একেবারে দুপুরের ভেতরে মালবোঝাই হতেই আবার শুরু হতো তিন নৌকার লোকজনের জন্য খাবার প্রস্তুত করার কাজ। সবশেষে সবাইকে খাইয়ে নৌকায় তুলে বিদেয় জানিয়ে পদ্মসহ বাড়ির বৌ-ঝিরা মিলে শেষ বিকেলে গিয়েছিল নদীতে গোসল করতে।

সারাদিনের অসহ্য ক্লান্তি শেষে বিকেলে ঠাণ্ডা পানিতে গা জুড়িয়ে গোসল সেরে পদ্ম ভাবছিল বাড়ি ফিরে ভালোভাবে খেয়েদেয়ে একটা লম্বা ঘুম দেবে। এমন সময় সাক্ষাৎ যমদূত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপরে।

বাকিদের সঙ্গে নদীতে গোসল সরার সময়ই ওরা দেখতে পেয়েছিল দুটো কোষা নৌকা এগিয়ে আসছে ঘাটের দিকে। আর তাতে চট মুড়ি দিয়ে বসে আছে পনেরো-বিশজন মানুষ। বিষয়টা কেউ খেয়ালও করেনি, পাত্তাও দেয়নি। কারণ এরকম অসংখ্য নৌকা প্রতিদিন ঘাটে আসে যায়। এগুলো বেশিরভাগই দূরের সমুদ্রের পানিতে নোঙর করা সদাগরি জাহাজ থেকে নেমে আসা নৌকা হয়ে থাকে। এই নৌকাগুলো যে সাধারণ কোনো নৌকা নয় সেটা ধরতে পারেনি কেউই। এমনকি ঘাটের প্রহরীরাও না।

হার্মাদ ডাকাতদের উৎপাতের কথা শুনলেও, গ্রামের লোকজন জানত যে এসব দস্যুরা উৎপাত চলায় দূরের সমুদ্রে। এরা যে এত ভেতরের গ্রাম পর্যন্ত চলে আসবে কেউ ভাবতেও পারেনি। কোষা নৌকা দুটো ঘাটের কাছে আসতেই চট মুড়ি দেওয়া লোকগুলো গায়ের ওপর থেকে চট ফেলে সোজা হয়েই বন্দুকে গুলি ছুড়তে শুরু করে ছাপিয়ে পড়ে ঘাটের লোকজনের ওপরে। যাকে সামনে পায় হয় গুলি চালায় আর না হয় তলোয়ারের কোপে মাথা আলাদা করে দেয়। সেই সঙ্গে চলে গণহারে আগুন লাগানো। প্রথমে এই কাজটা তারা করে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য। এরপরেই তারা বেছে বেছে মনুষকে ধরতে শুরু করে। একটু শক্ত সমর্থ হলেই বন্দি করে। কারণ মানুষই তাদের কাছে সবচেয়ে দামি লুটের সামগ্রী।

পদ্মেরা এসব কিছুই জানে না। কারণ তারা ছিল ঘাট থেকে খানিকটা দূরে। গোসল সেরে উঠে আসতে গিয়ে প্রায় তীরের কাছে চলে এসেছে এমন সময় পদ্মের পরনের শাড়ি আটকে যায় কিছু একটার সঙ্গে। বারবার টেনেও শাড়ির আঁচল ছোটাতে না পেরে সে চোখ ফিরিয়ে দেখে লম্বা-চওড়া চুল দাঁড়িতে ভর্তি দানবের মতো এক লোক এক হাতে তার শাড়ির আঁচল ধরে রেখেছে অন্য হাতে বিরাট একটা তলোয়ার। এরকম কোনো মানুষ পদ্ম কোনোদিন দেখেনি। এরকম ভয়ংকর এক লোক তার শাড়ির আঁচল ধরে রেখেছে দেখে ভয়ে জ্ঞান হারানোর দশা হয় তার। আঁচল ছাড়ানোর জন্য টানাটানি করবে, নাকি পালাবে বুঝে ওঠার আগেই আরেকজন উদয় হয় সেখানে। দুজনে মিলে টানাটানি করে শাড়ি খুলেই ফেলে তার গা থেকে। একদিকে যুগপৎ আতঙ্ক অন্যদিকে ঘৃণা, লজ্জা আর ভয়ে প্রায় মরার দশা হয় তার। সেইসঙ্গে চারপাশের আগুন আর দানবের উল্লাস ধ্বনির মাঝেই যে শক্তি অবশিষ্ট ছিল সেটাকে এক করে শাড়ি খুলে যেতে সে দৌড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু কাদার ভেতরে কয়েক পা যেতেই তাকে এসে ধরে ফেলে দুই দানব। দুজনেই পাঁজাকোলা করে তাকে নৌকার পাটাতনে নিয়ে ফেলে রাখে।

ব্যথা, ভয় আর আতঙ্কের ভেতর পদ্মের চোখে শুধু ভাসছিল তার ছেলেটার মুখ। সেই অবস্থাতেই সে দেখতে পায় তারই গ্রামের আরো অনেককে বন্দি করে এনে ফেলে রাখা হয়েছে নৌকার পাটাতনে। সবাইকে গণহারে চাবুক মারতে মারতে নৌকার পাটাতনের কাছে স্তূপের মতো রেখে নৌকা ছেড়ে দেওয়া হলো। কোনোমতে একটুখানি মাথা তুলে পদ্ম দেখতে পেল তার গ্রাম, তার শৈশব, নিজের সাজানো সংসার আর সন্তানকে ফেলে নিজের জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে অজানার পানে যাত্রা শুরু হয়েছে তার।

হার্মাদ আর মগদের নিয়মই হলো কোনো না কোনো গ্রামে বা হাটে ঝটিকা সফর চালিয়ে যত দ্রুত সম্ভব লোকজন বা নগদ সম্পদ যা পাবে নিয়ে নৌকায় করে দ্রুত সরে পড়া। পদ্মদের নিয়ে আসা নৌকাটা জাহাজের কাছে আসতেই জাহাজের নিচের অংশে খোলের কাছে একটা অংশ আলগা হয়ে গেল।

ঠিক যেভাবে জানোয়ার তাড়ানো হয় সেভাবেই তাড়িয়ে চাবুক মারতে মারতে তাদেরকে নৌকা থেকে নিয়ে ঢোকানো হলো সেই খোলের ভেতরে। জাহাজের অন্ধকারের ভেতরে নিয়ে তাদের সারি দিয়ে দাঁড় করানো হলো। দুইপাশে পর্তুগিজ আর মগ দস্যুদের প্রহরীরা ইচ্ছেমতো চাবুক মারছে একে-ওকে। মেয়েদের ওপরে চলছে গণহারে ধর্ষণ। আর মেয়েদের ভেতরে যারা তখনো দাঁড়ানো, যত্রতত্র যে যাচ্ছে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে তাদের বুক টিপে দিয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি তো আছেই। সব মিলিয়ে নরক বলতে যা বোঝায় সেটাই নেমে এসেছে জাহাজের খোলের ভেতরে।

শরীরের ওপর ইচ্ছেমতো অত্যাচার চললেও তখনো পদ্ম দাঁড়িয়েই ছিল। কিন্তু সে দেখতে পায় তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেই দুই দস্যু আর নিজেদের ভেতরে কী নিয়ে যেন আলোচনা করছে। বন্দিদের দাঁড় করানো সারিতে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল বন্দিদের একে-একে তাদের হাতের তালুতে ফুটো করে সেটার ভেতর দিয়ে লোহার শিকল গলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সারিতে এগোতে এগোতে পদ্মের সময় চলে এলো। কিন্তু তার হাতের তালুতে ফুটো করা হবে এমন সময় কেউ একজন তার হাত চেপে ধরল। পদ্ম দেখল সেই দুই দস্যুর একজন, অন্যটাও আছে ঠিক পেছনেই, তাকে সেখান থেকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো জাহাজের পাটাতনের ওপরে। তবুও এই বিপদের ভেতরেও খোলা বাতাসে এসে একটু হলেও স্বস্তি পেল সে।

তাকে দুই দস্যু মিলে টানতে টানতে নিয়ে এলো পাটাতনের ওপরে,যেখানে জাহাজের চাকা লাগানো থাকে। ঠিক সেখানে এনে তাকে বেঁধে ফেলা হলো একটা খুঁটির সঙ্গে। কী হচ্ছে কিছুই ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও অচেনা দুই দস্যুর ঝগড়া থেকে পদ্ম অনুমান করল দুই দস্যুর ভেতরে সম্ভবত তাকে নিয়ে ঝগড়া চলছে। একজন দাবি করেছে সে তাকে আগে দেখেছে। অন্যজনের দাবি সে তাকে আগে ধরেছে। এসব অবশ্য পদ্মের বোঝার কথা নয়, সে বুঝতেও পারেনি। শুধু অনুধাবন করল, সে মাঝখানে অর্ধনগ্ন অবস্থায় একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। আর তাকে মাঝখানে রেখে তুমুল ঝগড়া করছে দুই দস্যু। বাকি আরো অনেকেই চারপাশ থেকে হাসিমুখে মজা দেখছে। একজন মানুষের চূড়ান্ত অপমান আর বেদনা যে অন্য অনেকের জন্য আনন্দের অভিজ্ঞতা হতে পারে, এটা প্রথমবারের মতো সেদিনই অনুধাবন করতে পারল পদ্ম। তবে সে জানত না, তার অনুধাবনের তখনও অনেক পথ বাকি।

চারপাশ থেকে হর্ষধ্বনি ভেসে আসছিল কিন্তু হঠাৎই সব কোলাহল একেবারে থেমে গেল একটা ভারী পায়ের শব্দে। পদধ্বনিটা ভেসে আসছিল ওপরের কাপ্তানের কামরার কাছ থেকে। প্রথমেই রেলিংয়ের ওপরে দেখা দিল এক রাশ ধোঁয়া, তারপর লাল কাফতান পরা একজন মানুষের বুট পরা পা দেখা গেল প্রথমে তারপর তার চামড়ার পোশাক পরা অস্ত্রসজ্জিত ভারী পোশাক পরা দেহটা দেখা গেল। আর তখুনি প্রথমবারের মতো মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকাতে সমর্থ হলো পদ্ম।

একজন মানুষ তিনজন মানুষের সমান হতে পারে এরকম সে শুনেছিল। কিন্তু নিজ চোখে কোনোদিন দেখবে বলে ভাবতে পারেনি। কিন্তু তাই দেখতে পেল। মুখের চারপাশে উড়ন্ত ধোঁয়ার বলয় নিয়ে একজন বিরাটাকায় মানুষের ভারী পায়ের শব্দে ঢাকা পড়ে গেল বাকি সব কোলাহল। পদ্ম পরে জেনেছিল মানুষটার নাম

সিলভেরা। মানুষটাকে নেমে আসতে দেখে সবাই চুপ হয়ে গেছে। মগ-পর্তুগিজ, দেশি-বিদেশি, সাদা-বাদামি সব দস্যু একেবারে চুপ হয়ে গেছে। লোকটা নিচে নেমে এসে একবার খুঁটিতে বাঁধা অর্ধনগ্ন পদ্মকে দেখল আরেকবার সে তাকাল দুই দস্যুর দিকে। যদিও তারা তখন আর ঝগড়া করছিল না কিন্তু এদেরকে দেখেই সিলভেরা মুহূর্তের ভেতরেই বুঝে গেল আসলে হচ্ছেটা কি। কারণ এরকম ঘটনা নতুন নয়। সে নিচে নেমে মুখ থেকে ধোঁয়া টানার কাল সরু নলটা সরাল। তারপর বড়ো বড়ো করে ভিন্ন ভাষায় কিছু একটা বলে গেল একটানা। তার কথা শেষ হতেই সবাই সমস্বরে আনন্দধ্বনি করে উঠল। ঘোষণা শেষ করে সে একবার পদ্মকে দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে রওনা দিল ওপরের দিকে।

তার থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাতেই পদ্ম দেখতে পেল, দুই দস্যুর একজন তার কাপড় খুলতে শুরু করেছে ইতোমধ্যেই। কাপড় খোলা হতেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল পদ্মের ওপরে। সেদিন খুঁটিতে বাঁধা পদ্মকে ঠিক কতোজন ধর্ষণ করেছিল ঠিক মনে নেই ওর। বুঝতেও পারেনি। প্রথম দুই তিনজনের সময় তার কষ্ট হয়েছিল, যন্ত্রণা হয়েছিল। পরে সবকিছু ধীরে ধীরে ভোঁতা হয়ে আসতে থাকে। শেষদিকে সে কিছুই টের পায়নি। এরপরে অনেকবার জ্ঞান হারিয়েছে, আবার ফিরে পেয়েছে। শেষবার যখন তার জ্ঞান ফেরে তখন রাতের কাল আকাশ ভেদ করে তীরের মতো ছুটে আসছে পানির ধারা।

আসলে বৃষ্টি পড়ছিল তীব্র বেগে। সে ভেবেছিল মরে গেছে। কিন্তু জ্ঞান ফেরার পরে সে হাত-পা নাড়াতে পারছিল। অবাক হয়ে দেখে, তখনো সে খুঁটির কাছেই পড়ে আছে। দুলনিতে বুঝতে পারে জাহাজ চলছে। কিন্তু তার হাত পা খোলা। নিজের রক্তের ধারার ওপরেই শুয়ে আছে সে। কোনোমতে শুয়ে শুয়েই মুখ খুলে বৃষ্টির পানি খেতে থাকে। তীব্র ঘৃণা আর যন্ত্রণায় পুড়তে থাকা গলা-বুক বেয়ে নেমে যেতে থাকে পানির ধারা। তৃষ্ণা মিটে যেতেই সে অনুভব করে বেঁচে থাকার সমস্ত ইচ্ছে আর উপায় ফুরিয়েছে তার জীবনে। কাজেই এবার মুক্তির পথ তার জন্য একটাই। মৃত্যু। কিন্তু সে তো জানত না শুধু এবারই নয় বরং জীবনে আরো বহুবার তাকে মৃত্যুর চেষ্টা করতে হবে। কাজেই প্রথমবারেই সফল হলে চলবে কীভাবে।

কোনোমতে হাত-পা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে আহত বিধ্বস্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে যায় সে জাহাজের রেলিংয়ের কাছে। তারপর ওটা টপকে পড়ে যায় অথৈ জলের রাশিতে। বৃষ্টি আর স্রোতের টান তাকে গিলে নেয় পুরোপুরি। নিজেকে সমুদ্রমাতার বুকে বিলিয়ে দিয়ে পরম শান্তিতে চোখ বুজে পদ্ম। শেষবারের মতো নিজের সন্তানের চেহারাটা একবার মনে করার ব্যর্থ চেষ্টা করে পানিতে তলিয়ে যায় সে।

তার ঘুম ভাঙে আধো কাদার ভেতরে নিমজ্জিত অবস্থায়। ভেবেছিল মারা গেছে সে। কিন্তু চোখ খুলে সে সামনে দেখতে পায় দুজন মানুষ খানিকটা দূর থেকে অবলোকন করছে তাকে। কোনোমতে সামান্য হাত-পা নাড়তে পারে সে। সে হাত নাড়তেই দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো বুঝতে পারে বেঁচে আছে সে। দুজনেই দৌড়ে এসে পুরেপুরি নগ্ন পদ্মকে উদ্ধার করে সেই আধো জল-কাদার ভেতর থেকে। তাকে নিয়ে তোলা হয় একটা নৌকাতে। প্রথমদিন সে কিছু বুঝতেই পারেনি। কোনোমতে তাকে যতটা পারে পরিষ্কার করে কিছু একটা খেতে দেওয়া হয়। সেটা খেয়ে ঘুম দেয় সে। লম্বা ঘুম দিয়ে ওঠার পর কিছুটা বল পায় সে। নৌকার পাটাতনের কোনায় সামান্য আড়ালে খড়ের বিছানায় নিজেকে আবিষ্কার করে সে। ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পায় সামান্য খাবার রাখা আছে তার মাথার কাছে। শুধু তাই নয় তার পরনে প্যাঁচানো আছে একটা শাড়ির মতো কাপড়। হাপুসহুপুস করে খাবারগুলো খেয়ে খানিকটা বল পেয়ে সে বাইরে বেরিয়ে দেখতে পায়, নৌকাটা একটা দ্বীপের পাড়ে, নোঙর ফেলা। নৌকার মাল্লারা তাকে দেখে ফিরে তাকায় সবাই। তাদের কাছেই সে জানতে পারে, এটা সপ্তগ্রাম আর হুগলীতে যাতায়াতকারী একটা সদাগরি নৌকা। যাত্রাপথে খাবার আর বিশুদ্ধ পানির জন্য থামে এই দ্বীপে। সে-উদ্দেশে এখানে থেকেই দ্বীপের কিনারায় তাকে দেখতে পায় তারা।

পদ্ম কী বলবে বুঝতে না পেরে ধন্যবাদ জানানোর চেষ্টা করে লোকগুলোকে। জীবনে যে মানুষ কোনোদিন বাইরের পরপুরুষের সামনে কথাও বলেনি সে মানুষ হুট করে এই অবস্থায় এতগুলো পরপুরুষের সামনে স্বচ্ছন্দে কথা বলে উঠবে এটা ভাবাও যায় না। মানুষগুলোর প্রতি মন থেকেই সে শ্রদ্ধা অনুভব করছিল। কিন্তু সেটা কেটে যায় বেলা আরেকটু ফুরোতেই।

আসলে পদ্ম যাদেরকে উদ্ধারকারী রক্ষক ভাবছিল তারাই রাত হতেই পাটাতনের আড়ালে যেখানে সে আছে সেখানে হানা দেয় একে একে। নিজেদের আদিম ক্ষুধা মেটাতে একজন একজন করে প্রবেশ করতে থাকে সেই আড়ালের খোপে। সেদিন আরেকবার পদ্ম অনুভব করতে পারে মানুষ সুযোগ পেলে কতটা ইতর শ্রেণির প্রাণীতে পরিণত হতে পারে। যাদেরকে রক্ষক ভেবে সে পুজো করতে যাচ্ছিল তারাই ভক্ষকের মতো তাকে ভোগ করতে থাকে একের পর এক।

সেই সদাগরি নৌকাতে সাত দিন ছিল সে। সদাগর শেঠ থেকে শুরু করে মাল্লারা কেউই বাদ যায়নি তাকে ভোগ করতে। একপর্যায়ে সে যখন ভাবছিল আরেকবার তাকে মরতে হবে এমন সময় দিগন্ত রেখায় দেখা দেয় হুগলী। লোকগুলো তাকে হুগলীর বাজারে বেচে দেয় দাসী হিসেবে।

সেখানে শুরু হয় পদ্মের আরেক নতুন জীবন। হুগলীর বাজারের দাস ব্যবসায়ীরা একেবারেই পেশাদার। পেশাদারের মতোই তাকে সাজিয়ে বাজারে তোলে তারা। কিন্তু দেখতে ভালো হওয়ার পরও কোনো অদ্ভুত কারণে তাকে প্রথম দুই দিনে বেচতে পারে না তারা। তৃতীয় দিনে যখন তাকে বাজারে তোলা হয় ততক্ষণে বেলা প্রায় ফুরোবার পথে। এই কয়দিনের জীবনে পদ্ম পুরোপুরি নিরাসক্ত হয়ে গেছে। তার মনে তখন একটাই ভাবনা। যেকোনো সময় আরেকবার সুযোগ পাওয়ামাত্রই সে আবারও মরার চেষ্টা করবে। তার বেঁচে থাকার সমস্ত কারণ শেষ হয়েছে। সে জানতে পেরেছে যেই তাকে কিনে নিয়ে যাক, হয় তাকে নিজের হারেমে নিয়ে তুলবে, আর না হয় কোঠায় বসাবে। আর না হয় রোসাঙ্গের বাজারে নিয়ে আরেকটু বেশি দামে আবারও বেচে দেবে।

তৃতীয় দিনে বাজারের একেবারে শেষ মুহূর্তে বেলা যখন প্রায় ফুরোবার পথে এমন সময় দাসের হাটের পাশ দিয়ে এক ব্যাপারী যাওয়ার পথে চট করে থেমে যায়। পদ্মকে তখন দাঁড় করিয়ে বিক্রির অয়োজন চলছে। বয়স্ক লোকটাকে দেখলেই বোঝা যায়, সে ব্যবসায়ী। অনেক লোক-লস্কর আর কুলি তার সঙ্গে। মালবহন করছে। দাঁড়িওয়ালা লোকটা তামাক টানতে টানতে হাটে এসে দাঁড়িয়ে পদ্মের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। পদ্ম অবাক হয়ে দেখে লোকটা তাকে প্রচলিত দামের চেয়ে বেশ অনেকটাই বেশি দামে কিনে নেয়। তাকে নিয়ে তোলা হয় লোকটার সদাগরি নায়ে। পদ্ম জানত রাত হলেই আবারও আসবে হায়নারা।

সন্ধ্যে হওয়ার পর সত্যি সত্যি সেই লোক হাতে কিছু খাবার নিয়ে প্রবেশ করে বজরার কামরায়। ভেতরে ঢুকে খাবারগুলো রাখতে রাখতে সে বেশ হাসিমুখে জানায় এই কামরাটায় সে থাকে। পদ্ম খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারে তাকে কীসের ইঙ্গিত করছে মানুষটা। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে সেরকম কোনো লক্ষণ দেখা যায় না তার ভেতরে। মানুষটা আবারও তাকে খাবার খেতে বলে। এবার পদ্ম প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে খেতে শুরু করে। খাওয়া শেষ হতেই মানুষটার কথা শুনে একেবারে চমকে ওঠে সে। প্রশ্নটা বুঝতে পারলেও জবাব না দিয়ে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে লম্বা দাড়িওয়ালা মানুষটার দিকে।

'মা, তোর বাড়ি কই?'

পদ্ম তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। মানুষটা আবারও কথা বলে ওঠে, 'ভয় পাসনে মা। তোর বাড়ি বাঙাল মুল্লুকে আমি সেইটা অনুমান করতে পারি। কিন্তু জায়গাটার নাম তো বলতে হবে তোকে।'

নিজের বাড়ির সামনের নদীর তীর থেকে দস্যুদের হাতে ধরা পড়ার পর কতদিন পার হয়েছে পদ্মের হিসেব নেই। কী ঘটেছে সেটাও পরিষ্কার মনে নেই।

কিন্তু একটা পর্যায়ে এটা সে অনুধাবন করতে পারছিল তার আর এই জীবন রাখার কোনো মানেই হয় না। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো লোকটার মুখে মা ডাক শুনে এবং বাড়ির কথা শুনে আর নিজের চোখের জল ধরে রাখতে পারে না সে। হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে।

লোকটা তাকে সান্ত্বনা দেয়। সে যে বেঁচে আছে এটাই অনেক বড়ো ব্যাপার। পদ্মও একে একে খুলে বলে সব। কী কী হয়েছে। লোকটাও তাকে জানায় সে চাঁটগায়ের ব্যবসায়ী। হুগলী থেকে মাল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল এমন সময় হুগলীর বাজারে তাকে দেখে মানুষটার নিজের এক বোনের কথা মনে পড়ে যায়। সেই বোন নাকি সতেরো-আঠারো বছর বয়সে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়েছিল। পদ্মকে দেখে তার সেই বোনের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে তাকে কিনে নিয়েছে। পদ্মকে সে নিশ্চিত করে জানায় চাঁটগায়ে ফেরার পথে তাকে বাড়িতে নামিয়ে দেবে সে। মানুষটার কথায় নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে পদ্ম।

কিন্তু বাড়িতে আর ফেরা হয়ে ওঠেনি তার। পরবর্তীকালে যা ঘটে সেটা ভাবলেই পদ্ম মাঝে মাঝে চিন্তা করে সে আসলে কাকে বেশি ঘৃণা করে পরদেশি দস্যুদেরকে নাকি নিজের স্বজাতিকে। নিজের সদাগরি নাও নিয়ে একেবারে পদ্মদের বাড়ির ঘাটে গিয়ে নোঙর করে মানুষটা। পদ্ম ভেবেছিল তাকে দেখে পরিবারে সবাই ছুটে আসবে তাকে বরণ করে নিতে। কিন্তু যা ঘটে সেটা তাকে জীবনের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষাটা দেয়।

মানুষটার সঙ্গে নিজের বাড়ির কাছাকাছি যেতেই পদ্মের শ্বশুর নিজের লোকদেরেকে নিয়ে তাকে বাধা দেয়। তার সঙ্গে গলা মেলায় গ্রামবাসী। আর নিশ্চুপ থাকে এমনকি পদ্মের নিজের পরিবার, বাবা-মা ও তার স্বামী।

সবাই তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় সে এখন মগদোষী, তাকে এই গ্রামে থাকতে দেওয়া হবে না। বাঙাল মুল্লুকের মানুষেরা চিরকালই উজবুক, তারই আরেক প্রমাণ এই মগদোষী শব্দটি। এই শব্দ পদ্ম আগে শুনলেও কোনোদিন ভাবতে পারেনি এই দোষে তাকেও দুষ্ট হতে হবে। একজন নারী স্রেফ ভাগ্যের দোষে ভিনদেশি একদল দস্যুর খপ্পরে পড়ে যখন চূড়ান্তভাবে নিগৃহীত হয়ে কোনোমতে যদি জীবন নিয়ে ফিরে আসতেও পারে লোকসমাজে। যেখানে সমাজের উচিত তাকে সর্বোচ্চ সহায়তা করা সেখানে সমাজ তাকে মগদোষী নাম দিয়ে বিতাড়িত করে দেয়।

মগরা যেসব নারীদের স্পর্শ করে তাদের বলা হয় মগদোষী। এরা হলো সমাজের অস্পৃশ্য মানুষ যাদের আর সমাজে বাস করতে দেওয়া হয় না। মগদোষীদের না থাকে সমাজে বসবাসের সুযোগ, না থাকে ভালোভাবে বাঁচার

সুযোগ, না থাকে আবারও বিয়ে করে সংসার করার সুযোগ। সে-যুগে মগদোষীদের জন্য দুটো পথ খোলা থাকত, হয় আত্মহত্যা আর না হয় দেহপসারিনী হওয়া। পদ্মকেও এই দুটো পথের একটাই বেছে নিতে হতো যদি না সেই সওদাগর তাকে সহায়তা করত।

নিজের গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়ে পদ্ম সওদাগরের নাওয়ে ফিরে এসে একদিন টানা কাঁদল। এরপরে একটা সময় সে আবারও মরার কথা ভাবল কিন্তু সওদাগর লোকটা তাকে বোঝাল। অনেক সান্ত্বনা দিল, বলল পদ্ম চাইলে তাকে সে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও সমাজ তাকে একইভাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু পদ্ম যদি নিজের পায়ে শক্ত হয়ে বাঁচতে চায় তবে তার জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেই ব্যবস্থার জন্য আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে।

সওদাগর পদ্মকে চাঁটগায়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে ফিরে গেল নিজের বাড়িতে। এরপর আবারও একমাস পর ফিরে এলো সে। আবারও সে হুগলী আর সপ্তগ্রামে যাবে। এবার যাওয়ার সময় পদ্মকে নিজের নাওয়ে উঠিয়ে নিল। মানুষটাকে ততদিনে বাপু ডাকতে শুরু করেছে সে। অনেকটা নিজের মেয়ের মতোই তাকে স্নেহ করে আর বাপের মতোই তাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে পদ্ম। সেখান থেকে নৌকায় করে পদ্ম সন্দ্বীপ, হুগলী ও সপ্তগ্রাম হয়ে অবশেষে ফেরার সময়ে তাকে অদ্ভুত এক টিলাময় জলাধারের ওখানে নিয়ে গেল। সেখানে পাহাড়ের ওপরে একগ্রামে এসে হাজির হলো তারা। সেখানে ভয়ংকর দেখতে একজন মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাকে জানাল, এখন থেকে এখানেই থাকবে পদ্ম।

তালেব তৈমূর বিদেয় নিতেই ধীরে ধীরে সেই গ্রামে বসবাস শুরু করল পদ্ম। সেখানে সে জানতে পারল জায়গাটার নাম জংলাটিলা। জায়গাটা সন্দ্বীপ, হুগলী আর সপ্তগ্রামের মাঝামাঝি এমন একটা জায়গায় অবস্থিত যে অবস্থানগত কারণে এই এলাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই জঙ্গুলে টিলা এলাকার পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে একদল মেয়ে। কারা এরা? এরা সবাই মগদোষী। পরবাসীদের দ্বারা নির্যাতিত বিধ্বস্ত, সমাজ থেকে বিতাড়িত এমন সব মেয়েদের গোপনে স্থান দেওয়া হয় এখানে, এই গ্রামে। আর তাই এই গ্রামের নাম মগদোষীদের গ্রাম। সেখানে নিজের মনের মতো অনেককেই খুঁজে পেল পদ্ম। সেইসঙ্গে আবিষ্কার করল সে যে ভয়ংকর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে এরাও সবাই প্রায় একই পথের পথিক। ফলে একজন আরেক জনের দুঃখে সমব্যথী। ফলে এখানে সবার সঙ্গে সবার মিল-মোহব্বত আর অনেক অন্যরকম মিল। ধীরে ধীরে সেখানে বাস করে নিজেকে মানিয়ে নিতে শুরু করল পদ্ম।

সেখানে মগদোষীদের গ্রামে সবাই সবাইকে বোন ডাকে। বোনেদের সেই গ্রামে বসবাস করতেকরতে পদ্ম আবিষ্কার করল পুরো গ্রাম দারুণভাবে সুরক্ষিত এবং এদের যেকোনো অবস্থা থেকে শুরু করে এমনকি নিজের জাহাজ পর্যন্ত আছে। সেখান থেকে পদ্ম বুঝতে শুরু করল, এটা সাধারণ কোন গ্রাম নয়। এটা আসলে একটা জলদস্যুদের গ্রাম। সবকিছু জেনে একদিন সে মুখোমুখি হলো গ্রামের মোড়ল ভয়ংকর দেখতে সেই মহিলার, তাকে সে জানাল, সে যুদ্ধে যেতে চায়। মহিলা হেসে উঠে তাকে জানাল, সব হবে।

সেখান থেকেই শুরু হলো পদ্মের নতুন জীবন। সে ধীরে ধীরে শিখল তলোয়ার, বন্দুক থেকে শুরু করে তীর-ধনুক এমনকি কামান চালানো পর্যন্ত। শিখল কীভাবে জাহাজ চালাতে হয়, কীভাবে আক্রমণ করতে হয়। এই গ্রামের নারী দস্যুদের কর্তাকে একটা বিশেষ নামে ডাকা হয়। সেটা অনেকটা উপাধির মতোই পদ্মরানি। মনে-মনে নিজেকে সে জানায়, একদিন নিজের যোগ্যতা বলে সে এই উপাধি নিজের করে নেবে। এই গ্রামের নেতা হবে সে।

সে আরো জানতে পারল এই গ্রামের পেছনে চাঁটগায়ের অনেক ব্যবসায়ীদের ভূমিকা আছে। যাদের মধ্যে অন্যতম হলো সেই সওদাগর। একদিকে তারা অসহায় মেয়েদের পুনর্বাসন করে অন্যদিকে এই দস্যুদলের সঙ্গে রয়েছে তাদের গোপন বাহিনী। এই এলাকার সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে হুগলী থেকে ব্যাসায়ীদের চালান নিয়ন্ত্রণ করা এমনি আরো নানা কাজে গোপনে একদিকে তারা ওদের সাহায্য করে অন্যদিকে ওরা এদের রসদ থেকে শুরু করে বাকি সবকিছু দিয়ে সাহায্য করে। আর এই পুরো ব্যাপারটার নেতা হলো সেই সওদাগর। মগদোষীদের গ্রামেই ধীরে ধীরে নিজেকে শক্তিশালী করে তোলে সে এবং একটা সময় পুরো গ্রাম তো বটেই দস্যুবাহিনীর প্রধান হয়ে ওঠে এবং সে পদ্মরানি উপাধি লাভ করে।

যেদিন সে পদ্মরানি উপাধি লাভ করে সেদিন থেকেই পদ্ম জানত সওদাগর তার জন্য যা করেছে সেটার ঋণ তাকে শোধ করতে হবে। সেই সওদাগরই ছিল তালেব তৈমূর, পদ্ম যাকে বাপু বলে ডাকে। আর সেই মানুষটাই আজ বিপদে আছে।

'রানি মা,' জাহাজের পাটাতন থেকে থেকে চোখ সরিয়ে পদ্ম দেখল তার বাহিনীর প্রধান হালেমা দাঁড়িয়ে আছে। তার বাহিনীর প্রধান তো বটেই এই বাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী নারীও হালেমা। 'বলো, হালেমা।'

'মাতা,' এইটাই দলের নেতাকে সম্বোধন করার মাধ্যম। 'খারাপ খবর আছে।'

পদ্মকিছু না বলে তাকিয়ে রইল তার দিকে। শোনার অপেক্ষায় আছে সে।

'কবি ধরা পড়ে গেছে।'

'এইটা খারাপ খবর না,' সে নিজের কোমরে ঝোলানো বোতল থেকে এক ঢোক আরক টেনে নিয়ে হাত নেড়ে বলে উঠল, 'কবি ধরা পড়বোই, আমি জানতাম। বাপু বুদ্ধিমান মানুষ কিন্তু তাড়াহুড়ায় কিছু ভুল করছেন উনি। উপায়ও ছিলো না তার। খারাপ খবর অইল এখন তার সঙ্গে কী করা অইবে। বাপুর পোলার খবর কী?'

'তারা রওয়ানা দিছে সন্দ্বীপের দিকে।'

'আমরাও সন্দ্বীপ যাব,' পদ্ম ঘোষণার সুরে বলে উঠল। 'বাপুর পোলা তো গন্ধ শুইকা ঠিকই কবির কাছে পৌঁছাইয়া যাইব। তারে আমগোর সাহায্য করতে হবে কবিরে উদ্ধার করতে। কবি অনেককিছু জানে, সেইগুলা বাপুর পোলার জানা দরকার।'

'জি মাতা,' বলে সে চলে গেলে।

পদ্ম মনে মনে বলে উঠল, *নাটক সাজানো হয়া গেছে, এইবার অভিনয়ের পালা শুরু।*

অধ্যায় সাতাশ

বর্তমান সময়

পতেঙ্গা রোড, চট্টগ্রাম

জংলা জায়গার অন্যপাশে বিস্তৃত জলাধারটার দিকে বেশ বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে শারিয়ার। মেজাজটা পুরোপুরি গরম হয়ে আছে ওর। কারণ ও আসলেই ভাবতে শুরু করেছিল এখানে এসে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ধরতে পারছে। সেটা তো হলোই না, বরং এই জলাধারের কিনারায় এসে থেমে যেতে হলো।

'তো এখন কী?' শারিয়ারের পাশ থেকে রুম্পা জানতে চাইল।

'এখন...' একটু হাতাশ গলায় সে জায়গাটাকে অবজার্ভ করার চেষ্টা করছে। ওরা যেখানে আছে সেদিকটা খোলা হলেও জায়গাটা বেশ বড়ো আর অনেকখানি জুড়ে বাউন্ডারি দেওয়া দেয়াল। জায়গাটা এতটাই বড়ো যে জলাধারের ওপারে বাউন্ডারিটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু ওপাশের দেয়াল খালি চোখে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। সুমন নামের ছেলেটার দিকে তাকিয়ে শারিয়ার জানতে চাইল, 'এই দিঘির মতো জায়গাটা কীসের, বলতে পারবেন?'

'স্যার, একেবারে সঠিকভাবে বলতে পারব না। তবে যা বুঝতে পারছি এটা একটা প্রাইভেট প্রপার্টি। সম্ভবত পরিকল্পনা করেই করা হয়েছে। ইদানিং এই সিস্টেমটা খুব বেড়েছে স্যার। শহরের আশপাশের পরিত্যক্ত বা খালি পড়ে থাকা জায়গাগুলোতে প্রক্রিয়া করে মাছ চাষ করা হচ্ছে, ক্ষেত্রবিশেষে সামুদ্রিক মাছও। আমার মনে হয় এটাও সেরকমই হবে।'

সুমন ছেলেটার কথাটা পছন্দ হলো শারিয়ারের। 'ঠিকই বলেছেন,' এখানেও মাছ চাষ হয়। ওই যে দেখেন,' জলাধারটাকে পুকুর না বলে দিঘি বলাই ভালো। গোলচে দিঘিটার চারপাশে ছোটো ছোটো বাঁশ পুঁতে কিছু একটা নির্দেশনা দেওয়া। আর দিঘিটার ওপরেও চকচকে ফিতার মতো কিছু একটা দিয়ে লাইন টানা হয়েছে। জিনিসটার দিকে তাকিয়ে ছোটোবেলার একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল শারিয়ারের। মুখে সামান্য হাসি নিয়ে সে রুম্পার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'ম্যাডাম কি গ্রামে বড়ো হয়েছেন, না শহরে? পানির ওপরে ওই চকচকে জিনিসটা কী বলতে পারবেন?'

শারিয়ারের একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে সামান্য ভ্রু নাচিয়ে সে বলে উঠল, 'আমি সমুদ্র উপকূল এলাকার মেয়ে। এসব জিনিসের পরীক্ষা আমাদের নিতে নেই। ওটা লাগানো হয়েছে যাতে পাখিরা ভয় পেয়ে দূরে থাকে। মাছ-টাছ খেতে না আসে।'

শারিয়ার হেসে উঠল, 'ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম। কিন্তু আজকালকার পাখিরা এসব দেখে অভ্যস্ত। এই জিনিস দেখে ওরা কতখনি ভয় পাবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আচ্ছা, এখানে কোনো পাহারাদার নেই?' বলেই ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে পানির ধারাটা শুরু হয়েছে যতটা দূর থেকে এর মাঝখানে ঘাস আর ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পাতলা পায়ে চলা পথটা দেখতে পেল।

'ধুরো,' বিরক্তির সঙ্গে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদিকে ফিরে তাকাল। 'অকারণে সময় নষ্ট করলাম। আমি ভেবেছিলাম এখানেই পথ শেষ। কেউ এখানে এসে থাকলে এখানেই পথ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখান থেকে যে এই পথ দিয়ে খুব সহজেই এদিক দিয়ে এগোনো যেতে পারে ব্যাপারটা মোটেই মাথায় আসেনি,' বলে ও খানিকটা লাফিয়ে প্রায় অদৃশ্য পায়ে চলা পথটার ওপরে নেমে এলো। 'সাবধানে আসবেন ম্যাডাম,' রুম্পাকে সাবধান করে দিয়ে সুমনের উদ্দেশে বলে উঠল। 'আপনিও আসুন আমাদের সঙ্গে। আর বাকিদের বলুন মূল রাস্তার ওখানে ফিরে গিয়ে গাড়ির কাছে অপেক্ষা করতে।'

শারিয়ার দিঘির পাড়টাকে ডানে রেখে বামের সরু রাস্তাটা ধরে এগোল সামনের দিকে। আসলে এই পায়ে চলা পথটাকে রাস্তা বলার কোনো উপায় নেই সম্ভবত এখানকার কেয়ারটেকার বা এরকম কেউ দিঘির যত্ন নেওয়ার জন্য এদিক দিয়ে চলাচল করে। আর তাতেই পায়ে চলা এই পথটা তৈরি হয়েছে। শারিয়ার খুব বেশি দ্রুতও এগোচ্ছে না আবার এতটাও আস্তে এগোচ্ছে না যে, বেশি দেরি হয়ে যায়। কারণ বিকেল প্রায় হয়ে এসেছে। সন্ধ্যে হতে আর খুব বেশি দেরি নেই।

'আপনার কী মনে হয় মিস্টার শারিয়ার এখানে আসলে আমরা কী পেতে পারি?' পেছন থেকে রুম্পা জানতে চাইল।

'কিছুই না,' সন্তর্পণে এগোতে এগোতে বলে উঠল শারিয়ার।

'কিছুই না, তবে?' আরেকটু হলে রুম্পা এগোতে গিয়ে হঠাৎ উঁবু হয়ে মাটিতে বসে পড়া শারিয়ারের গায়ের ওপরে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে।

'আবার অনেক কিছুই,' বলে শারিয়ার ছোটো একটা ডাল দিয়ে মাটির দিকে ইশারা করল। সুমন আর রুম্পা দুজনেই এগিয়ে এসে দেখল মাটিতে আরেকটা পায়ের ছাপ, বুট পরা পায়ের ছাপ। এটাও কোনো না কোনোভাবে বেঁচে গেছে রোদ-বৃষ্টির প্রকোপ থেকে। জিনিসটাকে একটা বড়ো পাতা দিয়ে ঢেকে দিয়ে উঠে

দাঁড়াল শারিয়ার। মুখ-চোখ কুঁচকে আছে ওর। 'ম্যাডাম, আমি আপনাকে আজ বলেছিলাম না। ক্রাইম সিন হলো পচনশীল মাছের মতো। মাছ যেমন দ্রুত পচতে থাকে তেমনি ক্রাইম সিন দ্রুতই নষ্ট হতে থাকে...'

'হুমম,' রুম্পা বলে উঠল।

'কথাটা ফিরিয়ে নিলাম,' শারিয়ার মৃদু হেসে বলে উঠল। 'কারণ মাছ একবার পচে গেলে আর সেটাকে কোনোভাবেই কাজে লাগানো যায় না। কিন্তু ক্রাইম সিন নষ্ট হয়ে গেলেও সেটা থেকে কিছু না কিছু ঠিকই বের করা যায়।' শারিয়ার পায়ের ছাপটার ছবি তুলে নিল মোবাইলে। সেটা রুম্পা আর সুমনকে দেখাতে দেখাতে বলে উঠল। 'ওইদিন রাতে এখানে কেউ না কেউ এসেছিল এবং তারা এখান দিয়েই গেছে। আমি অনেকটা নিশ্চিত।'

'তারা?' রুম্পা অবাক হয়ে বলে উঠল। 'বহুবচন কেন? মানে আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন একাধিক মানুষ ছিল?'

শারিয়ার আগে পাওয়া ছাপটার ছবি মোবাইলে দেখাল। তারপর নতুন ছাপের ছবিটা দেখিয়ে বলে উঠল, 'কি বুঝলেন?'

'দুটো ছাপ আলাদা পায়ের, মানে আলাদা জুতোর,' সুমন বলে উঠল।

'একদম ঠিক,' শারিয়ার আশপাশটা দেখে নিতে নিতে বলে উঠল, 'এখানে একজন নয় বরং একাধিক লোক এসেছিল। কারণ ছাপগুলো দেখে কোনোভাবেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে, এগুলো এখানে যারা কাজ করে তাদের ব্যবহৃত জুতোর ছাপ। আমাদের দেশের মজুরেরা এসব হেভি ডিউটি বুট ব্যবহার করে না,' বলে সে আবারও সামনে এগোতে শুরু করল।

'কিন্তু এখানে আসা কোনো ভিজিটরেরও তো হতে পারে?' রুম্পা বলল।

'হ্যাঁ, সেটা হওয়ারও জোর সম্ভাবনা আছে,' শারিয়ার চলার গতি বৃদ্ধি করল। 'আর একারণেই এখানে পাহারাদার বা গার্ড যারাই আছে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমি নিশ্চিত, দিঘি যেহেতু আছে আর তাতে মাছও আছে, তবে পাহারাদার থাকতে বাধ্য। কারণ আমাদের দেশের মানুষ এখনো এত ভালো হয়ে যায়নি যে পাহারাদার ছাড়া পুকুরে মাছ রেখে দিবে,' শারিয়ার এটুকু বলতেই পেছন থেকে সুমন আর রুম্পা দুজনেই হেসে উঠল। ওরা দিঘির পাড়ের রাস্তাটা ধরে এগোতে এগোতে দিঘিটাকে হাতের ডানে রেখে আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে আবারও ডানে মোড় নিল।

'বাপরে! এত বিরাট জায়গা,' হাঁটতে হাঁটতে হাঁপাচ্ছে এখন সুমন। 'ওই যে স্যার ওইখানে কাউকে পাওয়া যেতে পারে,' বলে সে দিঘির একপাশে ছোটো একটা ঘাট। আর তার সঙ্গে লাগোয়া ছোটো ঘরের মতো দেখাল। শারিয়ার আগেই দেখতে পেয়ে সেদিকে পা চালাতে শুরু করেছে। বাঁশ দিয়ে বানানো ছোট একটা

সাঁকোর মতো। তবে সেটার পাশেই ছোটো একটা কুঁড়ে আর অন্যপাশে পানির ওপরে একটা ঘরের মতো দেখা যাচ্ছে। ওটার অন্যপাশের পানিতে একটা ছোটো নৌকা ভাসতে দেখা গেল। নৌকাটা দিয়েই সম্ভবত মাছ ধরাসহ অন্যান্য কাজ করা হয়।

'কী ব্যাপার? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না,' রুম্পাও হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে উঠেছে।

শারিয়ার মুখের সামনে দুই হাত জড়ো করে চিৎকার করে উঠল, 'কেউ আছেন?' কিন্তু তার চিৎকার বাউন্ডারারির ভেতরে বাড়ি খেয়ে ফিরে এসে যেন ওকেই ব্যঙ্গ করল। আবারও দুবার ডেকে উঠল শারিয়ার, কোনো সারাশব্দ নেই। আপনাতেই হোলস্টারের ভেতর থেকে পিস্তল বের করে আনল শারিয়ার। কেন জানি সবুজে ঢাকা জায়গাটাতে প্রবাহিত পানির ধারার বহমান শান্তির মাঝে অদৃশ্য এক ধরনের অশান্তি অনুভব করতে শুরু করেছে ও।

'ব্যাকআপ কল করব?' রুম্পা জানতে চাইল।

'রিল্যাক্স, এখনো দরকার নেই,' নিজে পিস্তল বের করে আনলেও অন্যদের সে মানা করল। 'আমি স্রেফ একটু সাবধান থাকতে চাইছি,' বলে সে ঘাটের কাছে এগিয়ে গেল। ঘাটের আশপাশে ছড়ানো-ছিটানো টুকরো টুকরো জিনিসপত্র পড়ে আছে। ঘাটের পাশেই বসার জন্য ছোটো একটা কুঁড়ের মতো। জিনিসটাকে কুঁড়ে না বলে আসলে একটা ছাউনি বলা যেতে পারে বড়োজোর।

'কেউ থাকলে এখানেই থাকে,' বলে শারিয়ার ইশারায় ওদের পেছনে থাকতে বলল। তিনজনে মিলে ছোটো বাড়িটার দিকে এগোল। কাছে এগোতেই দেখল পানির ওপরে বাঁশ আর টিন দিয়ে বানানো খুবই সাধারণ একটা বাড়ি। ওটার নিচে ছোটো ছোটো খাঁচার মতো ঝুলছে। সেগুলোতে বেশ কিছু মুরগি কল-কল করছে। গ্রামের বাড়িতে অনেকেই ইদানীং এ-কাজটা করে। পানির ওপরে খোয়ারে মুরগি পালে। এতে মুরগির বর্জ্য মাছের খাবার হিসেবে সরাসরি কাজে লাগানো যায়। বাড়িটার অর্ধেক ডাঙায় আর বাকি অর্ধেক পানিতে। ডাঙা থেকে বাঁশের টুকরো পাশাপাশি বসিয়ে বাড়িটার ভেতরের দিকে চলে গেছে। ওদের দুজনকে এখানেই অপেক্ষা করতে বলে হাতে পিস্তল ধরে সাবধানে বাড়িটার দিকে এগোল ও। বাড়ি না বলে একটা রুম বলা উচিত। ভেতরে ঢুকে দেখল একপাশে একটা চৌকি, তাতে দলামোচড়া করে কাপড়চোপড় রাখা। একপাশে একটা মাটির কলস। এই যুগেও মাটির কলস জিনিসটা বেঁচে আছে না দেখলে শারিয়ার ঠিক বিশ্বাস করতেই পারত না। একপাশে একটা চুলা, তার পাশে ভাঙা র‍্যাকের মতো, তাতে বাসনকোসন রাখার ব্যবস্থা। ঘরটার জানালা দিয়ে অন্যপাশে উঁকি দিয়ে দেখল পুরো দিঘিটা এখান থেকে সুন্দর চোখে পড়ে। নজর রাখার জন্য এর চেয়ে ভালো

ব্যবস্থা আর হতেই পারে না।

শারিয়ার দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে বলে উঠল, 'ভেতরে কেউই নেই। এখানে মনে হয় কেয়ারটেকার বা গার্ড থাকে। বাইরে-' শারিয়ার কথা শেষ করতে পারল না। বাইরে এসে দেখল রুম্পা আর সুমন দুজনেই পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে চোখ গোল গোল করে ফিরে তাকাল দুজনেই।

ওকে উদ্দেশ্য করে সুমন বলে উঠল, 'স্যার, কেয়ারটেকার এখানে থাকে না, থাকত,' বলেই বাড়ির নিচের ঘোলাটে ময়লা পানির দিকে ইশারা করল সে। শারিয়ার ভালোভাবে লক্ষ করতেই দেখল ময়লা পানিতে ভাসছে একজন মানুষের লাশ। 'সর্বনাশ।'

***

সিগারেটে কষে একটা টান দিয়ে শারিয়ার সামনের দিকে মুখ তুলে তাকাল। দিঘিটার পাড়ের একটু আগের সেই শান্ত খোলা প্রান্তর এখন রূপ নিয়েছে কোলাহলমুখর প্রান্তরে। পুলিশের গাড়ি, পিবিআইয়ের গাড়ি, ফরেনসিক সব মিলিয়ে সামনের এলাহি কারবারের দিকে তাকিয়ে শারিয়ারের মুখে খুব অদ্ভুত একটা ভাবনা খেলে গেল। পাশে দাঁড়ানো ভুবনের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কেয়ারটেকার লোকটা, মানে যে মারা গেছে, লোকটা কী কোনোদিন ধারণা করতে পেরেছিল তার মৃত্যুতে এত বড়ো বড়ো সরকারি লোকজন এতগুলো গাড়ি এখানে এসে এত কাহিনি করবে? হয়তো লোকটা কোনোদিন এত দামি গাড়িতে চড়েইনি। এরকম একজন মানুষ যে কিনা দিনের পর দিন এখানে একা থাকত, যে লোকটা আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও আমরা নোটিশ করতাম না, সেই মানুষটার বিকৃত মৃত্যু তাকে আলোচিত করে তুলল। ব্যাপারটা আসলে কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে ভাবা যায়! একজন মানুষের মৃত্যু তার জীবনের চেয়ে অনেক বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করল, এর চেয়ে নিষ্ঠুর আর কী হতে পারে,' সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ওটাকে ফেলে দিল শারিয়ার।

'কিন্তু তার জন্য এগুলোর কোনোকিছুই আর ব্যাপার না বস,' ভুবন সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকটা আনমনেই সে বলে উঠল। 'জান শেষ তো খেলা শেষ। এখন এখানে কেউ থাকুক আর দেশের প্রধানমন্ত্রী এসে দাঁড়িয়ে থাকুক ওই মানুষটার জন্য সবই সমান,' ভুবনের গলায় এক আকাশ উদাসীনতা। 'তুমি নাকি সেরকম খেল দেখালে সবাই বলাবলি করছে।'

'হুমম?' শারিয়ার ঘড়ি দেখে সময়ের হিসেব করছিল। সে শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে একটু চমকে উঠল। একেবারেই ভিন্ন কিছু ভাবছিল ও যে কারণে ভুবনের কথাটা উপলব্ধি করতে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। কথাটা বুঝতে পারার সঙ্গেসঙ্গে একটা আঙুল তুলল। 'এটা ভালো কিছু নয়,' বলে সে অদূরেই কয়েকজন ফরেনসিকের লোকের সঙ্গে কাজ করতে থাকা রুম্পার দিকে তাকাল। 'কেন ভালো না বলছি সেটা পরে বিস্তারিত বলব। এখন আমার বেশ কিছু তথ্য দরকার। কেসটার যত ভেতরে ঢুকছি তত বেশি জড়িয়ে যাচ্ছি ঘটনার সথে। কিন্তু চিত্রটা পরিষ্কার না হয়ে আরো ঘোলাটে হচ্ছে, ব্যাপারটা ভীষণ বিরক্ত লাগছে।'

রুম্পাকে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল দুজনেই। 'মিস্টার শারিয়ার, আপনি যা ধারণা করেছিলেন সেটাই ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। বডিটা এখানকার পাহারাদারের। ফরেনসিকের ওরা ধারণা করছে লোকটা খুন হয়েছে...'

'আজ থেকে দুদিন আগের রাতে। যখন প্রফেসর গাড়ি চাপা পড়ে তার কিছু সময় পরেই,' বলে ও রুম্পা আর ভুবনের দিকে তাকাল। 'এই লোকটার মৃত্যু কেসটাকে আরো জটিল আর ঘোলাটে করে তুলবে যদি আমরা এগুলোর সঙ্গে এডিশনাল কিছু ব্যাপারে সংযোগ না পাই।'

'এডিশনাল জিনিস বলতে?' বলে রুম্পা জানতে চাইল। 'আপনার কাছে কি মনে হয়, এই লোকটাকে কে বা কারা খুন করল। আর এর খুন হওয়ার পেছনে কারণটাই বা কী?' রুম্পাকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'আমি এখানে একটু বলতে চাই,' ভুবন বলে উঠল। 'এটা ক্লিয়ার কেস অব কোলাটেরাল ড্যামেজ। মানে লোকটা স্রেফ ঘটনার শিকার ছাড়া আর কিছু না।'

'কিন্তু,' শারিয়ার এক হাত তুলে সামনের দিকে দেখাল। 'সেটা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণ হচ্ছেনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নির্দিষ্টভাবে জানতে পারছি এখানে কী ঘটেছে। মনে রেখো, এখন পর্যন্ত আমরা স্রেফ দুটো আধা ঝাপসা পায়ের ছাপ ছাড়া আর কিছুই পাইনি। এ-কারণেই এই মানুষটার মৃত্যু আমাদের কেসের পরবর্তী পদক্ষেপ হতে পারে যদি আমরা এখান থেকে কিছু একটা বের করতে পারি। আর না পারলে আমাদের কেসটা আবারও শুরু থেকে শুরু করতে হবে। ম্যাডাম,' বলে সে রুম্পাকে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে উঠল।

'আপনি তো এই কেসের অথরিটি। আপনি ফরেনসিকে যারা কাজ করছে তাদেরকে এই এলাকার প্রতিটা ধূলিকণা পরীক্ষা করতে বলেন। স্পটের প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি জিনিস ঘেঁটে ফেলতে বলেন। ছোটো থেকে ছোটো বিষয় কিছুই যেন বাদ না দেয় ওরা। রুম্পা, মনে রাখবেন, এই জায়গা থেকে আমরা কিছু বের করতে না পারলে আমাদের বড্ড দেরি হয়ে যাবে।'

রুম্পা কিছু না বলে স্রেফ একবার মাথা নেড়ে চলে গেল।

'বস, ম্যাডামকে কিন্তু খুব একটা সুখী মনে হচ্ছে না,' ভুবন বলে উঠল ওর পাশে থেকে। কিন্তু শারিয়ার তার কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। সে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিঘি, ওটার সঙ্গে সংলগ্ন এলাকা আর বাড়িটার দিকে। 'হুমম, আগেই বলেছি সব ভালো ভালো না। বাদ দাও। আমার প্রশ্ন হলো, যদি মানুষটার মৃত্যু কোলাটেরাল ড্যামেজ মানে ঘটনার নিরীহ শিকার হয়ে থাকে তবুও তাকে মরতে কেন হলো? এর জবাব জানতে হবে আমাকে,' বলতে বলতে সে বাড়িটার দিকে এগোতে লাগল। সেখানে সবাই ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে।

ভুবন আর শারিয়ার পায়ে পায়ে বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। দিঘির কিনারায় দাঁড়িয়ে ভুবন বলে উঠল, 'জায়গাটা দেখে বস ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি তো পাহাড়ি এলাকার ছেলে, আমি আর খালাতো ভাইরা মিলে পাহাড়ের খাঁড়ির ওপর থেকে ছোটো নৌকা নিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে পড়তাম। ব্যাপারটা অনেকটা রোলার কোস্টারের মতো। যেরকম উত্তেজনা সেরকম ঝুঁকি। তখন কি আর এসব মনে আসত,' বলে সে আনমনে মাথা নাড়ল। 'নৌকাটা দেখে আমার ইচ্ছে করছে ওটাতে চড়ে ঘুরে বেড়াতে,' বলেই সে ঝট করে নৌকাটার দিকে দেখল। 'বস, একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন, নৌকাটা কিন্তু পুকুরের ভেতরে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে!'

ভুবনের কথা শুনে শারিয়ার হেসে উঠল। 'নৌকা কি কোনো প্রাণী নাকি যে এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াবে,' শারিয়ারের পেছনেই ছিল সুমন, সেও হেসে উঠল।

'স্যারের মাথা গরম হয়ে গেছে ডেড বডি দেখে,' সে হেসে উঠে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ভুবনের গরম চক্ষু দেখে থেমে গেল। 'আরে বস, কথাটা উড়িয়ে দিলেন। ব্যাপারটা খেয়াল করেন, নৌকাটা এখানে কী পারপাসে ব্যবহার করা হয় বলে মনে করেন?'

'মাছের খাবার দিতে কিংবা মাঝ ধরতে,' সুমনই বলে উঠল।

'একদম ঠিক, খুব স্বাভাবিকভাবেই তাহলে নৌকাটা পাড়ে বাঁধা থাকার কথা, ওটা দিঘির মাঝখানে থাকবে কেন?'

'ভুবন মনে রেখ, লোকটা মারা যাওয়ার পর আজ প্রায় কয়েকদিন পার হতে চলেছে। মাঝে...' বলে সে থেমে গেল। 'সুমন ওটাকে এখানে আনানোর ব্যবস্থা করেন,' সুমন মাথা নেড়ে চলে যেতেই শারিয়ার ভুবনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'তুমি কি ভাবছ ওটা কেউ ব্যবহার...'

'আমি কিছুই ভাবছি না বস। ওটা স্রেফ পরীক্ষা করে দেখা দরকার,' ভুবন সরল মুখে বলে উঠল। পরবর্তী আধা ঘণ্টার ভেতরে নৌকাটাকে টেনে আনা হলো

দিঘির পাড়ে। ওটাকে আনার পর ভুবনই ফরেনসিকের একজনকে নিয়ে ওটাতে নামল পরীক্ষা করার জন্য। একটু পরেই সে গ্লাভস পরা হাতে হাসি মুখে তুলে ধরল কিছু একটা। নৌকার পাটাতনের নিচে পড়েছিল জিনিসটা।

কাছে আনতেই রুম্পা বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল, 'পার্টস। এরকম ব্যাগতো মেয়েরা সাধারণত হ্যান্ডব্যাগের ভেতরে টাকা বা টুকিটাকি জিনিস রাখার জন্য ব্যবহার করে।'

'ভেতরে কি আছে দেখো তো?' শারিয়ার কিনারা থেকেই বলে উঠল।

'বস, ভেতরে কিছুই নেই, যা ছিল নৌকার পাটাতনে পড়ে গেছে,' বলে সে ফরেনসিকের লোকটাকে নিয়ে নৌকার পাটাতন থেকে ভেজা কয়টা নোট তুলে ব্যাগে ভরল। আর একটা লিপস্টিক আর কাজলের ভাঙা পেন্সিল পেল। 'সাব্বাশ', ভুবনের খুশির চিৎকার শুনে শারিয়ারও খুশি হয়ে উঠল।

একটু পরেই ভুবন নৌকাটা থেকে উঠে এলো। তার হাতে প্লাস্টিকের স্বচ্ছ এভিডেন্স ব্যাগের ভেতরে কাগজের মতো সাদা কিছু একটা দেখতে পেল শারিয়ার। হাসিমুখে জিনিসটা শারিয়ার আর রুম্পার দিকে এগিয়ে ধরল ভুবন। 'বস, তোমার কোলাটোরাল ড্যামেজের প্রমাণ এবং এই কেসের পরবর্তী ভাইটাল পয়েন্ট।'

জিনিসটা হাতে নিয়ে রুম্পা মনোযোগ দিয়ে দেখছে, শারিয়ারও তার পাশে এসে দাঁড়াল। এভিডেন্স রাখার পাতলা স্বচ্ছ ব্যাগের ভেতরে ভেজা একটা আইডি কার্ড। কার্ডটাতে একটা মেয়ের ছবি।

'কেসের ভাইটাল পয়েন্ট তো বটেই, সেইসঙ্গে প্রফেসরের ওই বৃষ্টির রাতে বাইরে বের হওয়ার কারণ,' বলে সে রুম্পার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিল।

অধ্যায় আটাশ

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

বিকেলের সূর্যের লালিমা দিগন্তরেখার কাছে হারিয়ে গেছে অনেক আগেই। সন্ধ্যের রূপরেখা সবেমাত্র দিগন্তের লালিমাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে রাতের প্রথম প্রহরের দিকে এগোতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে তিনটে কোষা নৌকা নীরবে এগিয়ে চলেছে চলেছে সন্দ্বীপের দক্ষিণপূর্ব প্রান্তের দিকে।

দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকার সবচেয়ে বড়ো দ্বীপ, সন্দ্বীপ। সবচেয়ে বড়ো লবণ চাষ ও ব্যবসার ক্ষেত্র, সবচেয়ে বড়ো জাহাজ মেরামতির কারখানা থেকে শুরু করে এর পরিচয়ের কোনো শেষ নেই। তবে সব ছাপিয়ে এখন সন্দ্বীপের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় একেবারে পোর্ট গ্রান্ডে থেকে শুরু করে উত্তর-দক্ষিণ সব দিক তো বটেই মগ, আরাকান পর্তুগিজ থেকে শুরু করে দেশীয় সব জলদস্যুর সবচেয়ে বড়ো আখড়া এই সন্দ্বীপ। শ্রীপুরের রাজা কেদাররায়ের হাত ধরে ব্যাবসায়ীক কেন্দ্র হিসেবে যে দ্বীপের প্রতিষ্ঠা, তারপর কার্ভালহো থেকে শুরু করে সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস টিবাওয়ের শাসন সন্দ্বীপকে করে তুলেছে দক্ষিণ উপকূলের জলদস্যুদের সবচেয়ে বড়ো.মিলনকেন্দ্র। দক্ষিণের সমুদ্রে জলদস্যুদের স্বর্গ।

সন্দ্বীপে পাওয়া যায়না এমন কিছু নেই। দ্বীপের পশ্চিম তীরে রয়েছে জাহাজ নোঙর করার ব্যবস্থা আর সেখান থেকে কাছেই জাহাজ নির্মাণ থেকে শুরু করে জাহাজ মেরামতির ব্যবস্থা। বিশেষ করে দীর্ঘদিন সমুদ্রে থাকার পর জীর্ণশীর্ণ জাহাজ ঠিক করার ব্যবস্থা যেমন আছে, ঠিক তেমনি দীর্ঘ দিন পানির ওপরে থেকে জাহাজে থাকা মানুষগুলোর শরীর আর মন দুটো ঠিক করা পর্যন্ত সবই চলে এই দ্বীপে। জোগাড়যন্ত্র, বিনোদন থেকে শুরু করে থাকা-খাওয়া তো বটেই এই দ্বীপে সবচেয়ে বেশি চলে যেটা সেটা হলো খবর।

দিল্লি থেকে শুরু করে জাভার সমুদ্র পর্যন্ত। পোর্ট গ্রান্ডে থেকে শুরু করে হুগলীর বাজার পর্যন্ত, কে কোথায় কখন কী করছে। কে কোন সমুদ্রে কয়টা জাহাজ লুট করল। কে কোন গ্রামে হানা দিল। মসলিনের কারবারিরা চট্টগ্রামে কী করছে, রোসাঙ্গের বাজারের হাল-হকিকত, হুগলীর শ্যামদাশের ঘোড়া, আর বোম্বাইয়ের

শাসকেরা কী ঘটাচ্ছে, সবই জানতে পারা যায় এই সন্দ্বীপে। এখানে সবাই আসে-যায়, ব্যবসা করে, জীবন উপভোগ করে খবর জানে, তারপর নিজের পথে পা বাড়ায়। এই হলো সন্দ্বীপের জীবন। আর তাই দক্ষিণের সমুদ্রের সবচেয়ে বড়ো ঘটনার খবর জানার জন্য কিরানদের এখানে আসতে হবে, এ তো জানা কথা।

কিরান জানত আগে হোক কিংবা পরে সন্দ্বীপে ওকে আসতেই হতো। আর এ-জন্যই সে সন্দ্বীপে পৌঁছানোর জন্য নিয়মিত পানির পথ মানে ঘাট ব্যবহার না করে দ্বীপে পৌঁছানোর জন্য বেছে নিয়েছে দক্ষিণ পূর্ব দিক। এতে করে হয়তো মোহনা থেকে সমুদ্রপথে দ্বীপে পৌঁছানোর জন্য ভাটার স্রোতের মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু নির্বিঘ্নে পৌঁছানোর জন্য এর চেয়ে বেশি সুবিধা সে আর কোথাও পেত না। আর স্রোতের ব্যাপারটা সে তেমন আমলে নিচ্ছে না। এর পেছনে একটা বড়ো কারণ হলো তার সঙ্গে নিয়ে আসা কোষা নৌকোগুলো অত্যন্ত মজবুত আর ওর দাঁড়িরাও দক্ষ।

অন্ধকারের ভেতরে তাকিয়ে কিরান দেখতে পেল ওদের তিনটে কোষা নৌকা স্রোতের উল্টো বেগ ঠেলে বেশ তরতরিয়েই এগিয়ে চলেছে দ্বীপের দিকে। সমুদ্রের বুক থেকে অতিকায় কোনো জন্তুর মতো দ্বীপটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের নৌকাগুলো দ্বীপের কাছাকাছি হাঁটু পানিতে পৌঁছাতেই কিরান লাফিয়ে নেমে এলো। কিরান লাফিয়ে নামতেই একে একে সবাই নেমে পড়ল নৌকো থেকে। বালিময় তীরভূমিতে নৌকাগুলো টেনে নিয়ে এলো বেশ খানিকটা ওপরে। পানির ধারা থেকে সরে এসে প্রথমেই কিরান দাঁড়িদেরকে নিদের্শ দিল নৌকাগুলোকে সাবধানে পাহারা দিয়ে রাখতে। সেই সঙ্গে যেকোনো সময়ে দ্রুত পানিতে ভাসানোর মতো প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে। দাঁড়িদের নির্দেশনা দেয়া শেষ হতেই সে ফিরে তাকাল নিজের লোকেদের দিকে।

প্রতিদলে চার-পাঁচজন করে তিনটা দলে ভাগ হয়ে ওরা এগোবে সামনের দিকে। প্রথম দলনেতা হিসেবে আছে গোলন্দাজ। কালো পোশাকে তাকে দেখাচ্ছে অনেকটা ব্যবসায়ীদের মতো। পোশাকের নিচেই খাটো তলোয়ার আর পিঠে বন্দুক প্রস্তুত আছে। পিঠের লম্বা বন্দুকটাকে চাদর দিয়ে এমনভাবে মাথাসহ মুড়িয়েছে সে, দেখে ওটার অস্তিত্ব বোঝার উপায় নেই। অনেক দিন পরে গোলন্দাজকে তার স্বরূপে দেখে ভালো লাগল কিরানের। নিজের গ্রাম আর পারিবারিক ব্যবসা হারিয়ে মানুষটা অনেকটাই ভেঙে পড়েছিল। প্রথম দলে গোলন্দাজের সঙ্গে আছে বৈঠা আর বিল্লাল। সেইসঙ্গে একজন লাঠিয়াল। দ্বিতীয় দলে আছে লাঠিয়ালদের সর্দার তুলারাম। তার সঙ্গে আছে বেদু। আর তৃতীয় দলে আছে কিরান নিজে। ওর সঙ্গে থাকবে গোমেজ আর দুজন লাঠিয়াল।

নিজের লোকেদের দিকে তাকিয়ে কিরান জানতে চাইল, 'সবার নিজ নিজ গন্তব্য মনে আছে তো?' সবাই মাথা নাড়তেই সে আবারও বলে উঠল, 'তারপরেও আমি আরেকবার বইলা দিই। 'প্রথম দলের গোলন্দাজ তুমি যাবা বিল্লালের ওস্তাদের কাছে। হের কাছ থেইকা কথা বাইর করতে হবে,' কথাটা বলে সে গোলন্দাজের দিকে তাকিয়ে চোখে বিশেষ একটা ইশারা করল। এটা বিল্লাল কিংবা বৈঠা দেখতে পেল না। এই ইশারাটা করার পেছনে কারণ হলো বিল্লালের ওস্তাদ খুব একটা সুবিধের লোক না। যে লোক সন্দ্বীপের মতো দ্বীপে খবর বেচাকেনা করে তার সুবিধার হওয়ার কোনো কারণও নেই। কাজেই তার ব্যাপারে সাবধান হওয়ার জন্যই এই ইশারা।

'এরপরে তুলারাম, তুমি,' বলে বেদু আর তুলারামের দিকে তাকাল। 'তোমরা যাবা বাজার এলাকার দিকে। আমি নিশ্চিত শুঁড়িখানা, চণ্ডুখানা আর আর বাজারে ঘুরলে কিছু না কিছু কানে আসবই। আর সবশেষে আমি যাব আকরাম চাচার খবরির লগে দেহা করতে। সবাই বুঝছো?' তার প্রশ্নের জবাবে সবাই মাথা নাড়তেই কিরান বলে উঠল, 'সবাই সাবধানে থাকবা। মনে রাখবা, আমরা এইহানে আইছি ব্যবসায়ী আড়তদার আর জাহাজির ছদ্মবেশে। এইখানে এইরহম লোকের আনগোনাই সবচেয়ে বেশি। কাজেই আমগো যে খুব বেশি ভয় আছে তা না। তারপরেও সবাই সাবধান। সবাই অস্ত্র প্রস্তত রাখবা, বিপদের লাইগা। কিন্তু ভুলেও বাইর করবা না। অস্ত্র যেমন সহজে বাইর করবা না, কাউরে আঘাত করবা না, আবার একবার কাউরে আঘাত করলে সেইটা এমনভাবে করবা যেন দ্বিতীয় আঘাত আর করতে না অয়। মনে থাকব?'

সবাই সমস্বরে নিচু স্বরে সম্মতি জানাল।

'আর যদি কুনো বিপদ অয়। তয় ভুলেও নিজের কাউরে পিছে ফালায় আসবা না। প্রয়োজনে জীবন দিবা কিন্তু সঙ্গী ফালায়া আসা চলবে না। আমরা আগামী দুই থেইকা তিন ঘণ্টার ভেতরে আবার সবাই এইখানে ফেরতে আসব। চলো কামে নামি,' বলে কিরান নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে হাঁক ছেড়ে বালিময় সৈকত ধরে হাঁটতে শুরু করল মূল দ্বীপের দিকে।

জনসমাগম এলাকার কাছাকাছি এসে তিনটে দলে ভাগ হয়ে তিনদিকে রওনা দিল ওরা। গোমেজ আর লাঠিয়াল দুজনকে নিয়ে পায়ে হাঁটা সরু রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাজার এলাকার ভেতরের দিকে প্রবেশ করল ওরা। 'গোমেজ,' কিরান গোমেজের দিকে তাকিয়ে কোমরবন্ধনী থেকে আকরাম বেগের দেওয়া থলেটা বের করে মুঠোর ভেতরে নিয়ে নিল। আকরাম বেগ শক্ত নিদের্শনা দিয়ে বলে দিয়েছেন সন্দ্বীপে পৌছানোর আগে যেন কিরান থলেটা না খোলে। সেইসঙ্গে এও নির্দেশনা ছিল এটা খোলার আগে ওকে আড়ত এলাকার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছে সেখানে সফরউদ্দিন নামে একজনকে খুঁজে বের করতে হবে। নিজের সঙ্গে আসা

দুই লাঠিয়ালকে সাবধান থাকতে বলে গোমেজকে ইশারা করল ও। ওরা বাজার এলাকায় ঢুকতে যাচ্ছে এখান থেকে বাজারের দিকে না গিয়ে ওরা যাবে আড়ত মানে মজুতদারির এলাকার দিকে। সেখানে গিয়ে নির্দিষ্ট মানুষটাকে বের করতে হবে।

'গোমেজ সাবধান, মনুষ্য এলাকায় ঢুকবার যাইতাছি আমরা,' বলে হাত দিয়ে পোশাকের আড়ালে থাকা গোমেজের মোটা গদাটাকে আরো ভালোভাবে আড়াল করে দিল কিরান। তারপর দুই লাঠিয়ালের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'তুমি ভিখু আর তুমি মধু তাই না?' কাল চাপদাঁড়ি ভিখু আর মোটা গোঁফ মধুকে সম্বোধন করে বলে উঠল কিরান। 'শোন, তোমরা নিজেগো লাঠি সামলাই রাইখো। আর মনে রাইখো, এহানে আমরা জাভা থাইক্কা আসা ব্যবসায়ী। আর তোমরা আমার দেহরক্ষী। মনে থাকব?' দুজনেই মাথা নাড়তেই কিরান বলে উঠল, 'ঠিক আছে। আর যত বিপদই আসুক আর যাই হোক আমার নির্দেশ ছাড়া কিছু করবা না। চলো,' বলে সে তিনজনকে নিয়ে বাজার এলাকায় প্রবেশ করল।

বিকেল পার হয়ে সন্ধ্যে সবেমাত্র শুরু হয়েছে। লোকমুখে অনেক কথা শুনলেও সন্দ্বীপে এর আগে কিরান এসেছিল মাত্র একবার। সে শুনেছে সন্দ্বীপ হলো অত্র মল্লুকে এমন এক জায়গা যেখানে সব ধরনের, সব রঙের, সব জাতির সব শ্রেণির মানুষ পাওয়া যায়। প্রচলিত সমাজের নিয়মকানুন এখানে কাজ করেনা। এখানে জাতিগত ভেদাভেদ নেই, সমাজের কোনো স্তর নেই। এখানে শ্রেণিবৈষম্য নির্ধারিত হয় পুরোপুরি পেশি শক্তি আর অর্থ দিয়ে। এখানে ক্ষমতার মূলমন্ত্র একটাই। শক্তি অথবা অর্থ।

যদিও আগে শুনেছিল তবুও নিজ চোখে দেখে খানিকটা অবাক হলো যে, অন্য সব জায়গায় যেখানে সন্ধ্যে নামতেই দিনের কারবার শেষ হয়ে থাকে, এখানে সন্ধ্যে নামতেই জীবনের স্রোত যেন সবে বইতে শুরু করেছে। এভাবে সন্ধে থেকে আয়োজন শুরু হয়, চলে মাঝরাত পর্যন্ত। বাজারের মূল এলাকা দিয়ে ওরা ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল আড়তদারির এলাকার দিকে। আড়তদারির দিকে এসে আবার ওরা দেখল এখানে হিসেব উল্টো। এখানে বাজার এলাকার তুলনায় ভিড় একেবারেই কম। সন্ধ্যে নামতেই বেশিরভাগ আড়তই বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে অথবা বন্ধ করতে উদ্যোগী হচ্ছে আড়তদারিরা। এখানে কাজ শুরু হয় খুব ভোরে। বিশেষ করে, জাহাজে মাল ওঠানো-নামানো যত ভোরে করা যায় তত ভালো। আর তাই এখানে সন্দ্বীপের অন্য জায়গার হিসেব খাটে না। কিরানরা হাঁটতে হাঁটতে আড়তদারির এলাকার একপ্রান্তে চলে এলো। তারপর ধীরে ধীরে ঠিকানা মিলিয়ে নির্দিষ্ট এলাকায় এসে খোঁজ নিতে লাগল এখানে পানের মজুতদার সফরউদ্দিন কে আছে।

ওরা খোঁজ করতে করতে একজনকে জিজ্ঞেস করে সবে হাঁটতে শুরু করেছে পেছন থেকে শিসের শব্দে চমকে উঠল কিরান। মাথায় চাদর আর গায়ে লাল রঙের কুর্তা পরা মানুষটাকে হঠাৎ দেখার ঝলকে কিরান ফিরিঙ্গি বলে ভুল করত আরেকটু হলে। কিন্তু পরক্ষণে ভালোভাবে দেখে বুঝতে পারল পরনের কাপড় ভিন্ন হলেও যে মানুষটা পরে আছে সে একেবারেই এ দেশীয় মাল। মাথায় এলোমেলো ঝাঁকড়া চুল আর হাতে ছোটো একটা লাঠি। কিরানদের দেখে এক গাল হাসি দিয়ে বলে উঠল, 'আমি সফরউদ্দিন আড়তে কাম করি। আপনেগো লই যাইতে পারি যদি এট্টু,' বলে সে কথা শেষ না করে বিগলিত হাসি দিল।

কিরান কিছু না বলে মাথা নেড়ে সায় জানাল। লোকটা ওদেরকে গলির ভেতরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পেছন থেকে লোকটার লাল কুর্তা টেনে ধরে কাপড়ের ভেতর থেকেই কিরান ওর ড্যাগারটা দিয়ে লোকটার পাজরের একপাশে সামান্য খোঁচা দিল। 'জায়গামতো নিবি, নাইলে জায়গামতো ঢুকায়া দিবো এইটা।'

লোকটা এতক্ষণ কিরানকে বিগলিত দৃষ্টিতে দেখছিল। এবার খানিকটা ভয়ের দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল কিরানের দিকে। তারপরে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'জি হুজুর।' কিরান মাথা নেড়ে এগোতে বলল। কিরান খুব ভালোভাবেই জানে এইসব এলাকায় এসব আধখেচরা লোকেরা ঘুরে বেড়ায় এবং সুযোগ পেলে হয় নিজেরা আর না অন্য দলের হাতে এদেরকে তুলে দিয়ে দুই পয়সা কামানোর ধান্ধায় থাকে। কাজেই কোনো ঝুঁকি নেওয়া যাবে না।

লোকটা ওদের নিয়ে দুটো গলি পার হয়ে চলে এলো তুলনামূলক ছোটো একটা ঘরের সামনে। ওটার সামনে এসে জোরে একটা শিস বাজাতেই ভেতর থেকে ডাক এলো। 'হুজুর ভেতরে আছে,' বলে সে কিরানের দিকে তাকিয়ে রইল। কিরান তার দিকে এটা রূপার মুদ্রা ছুড়ে দিতেই সেটা লুফে নিয়ে আরেক দফা বিগলিত হাসি দিয়ে বিদেয় নিল সে।

কিরান দলের বাকিদের পেছনে থাকতে বলে ভেতরে প্রবেশ করল। আড়ত বললেও আসলে ওটাও এক ধরনের দোকানই। বাইরে থেকে যতটা ছোটো মনে হয়, ভেতরটা অতটাও ছোটো নয়। কিরান ভেতরে প্রবেশ করতেই নাকে এসে লাগল বিচিত্র এক গন্ধ। দুই পাশে রাখা ছোটো ছোটো বস্তার স্তূপের মতো জিনিসগুলোর ভেতর থেকে আসছে এই বিচিত্র সুগন্ধ। গোমেজ কাছে গিয়ে একটা বস্তার কাছে নাক নিয়ে ঘ্রাণ নিতে লাগল। কিরান তাকে ধমক দিয়ে ভেতরে আসতে বলল।

'ফিরিঙ্গিরে ধমকায়া লাভ কী জাহাজি,' কিরানরা ভেতরে ঢুকে দেখল চারপাশে সাজানো নানা ধরনের ছোটো-বড়ো বস্তা আর মালামালের মতো ছোটো একটা জলচৌকি রাখা। সেটার ওপরে ছোটো একটা কাছের চৌপায়া আর ওপরে রাখা

তেলের প্রদ্বীপ, একটা পানের বাটা আর জলচৌকির চারপাশে পাতা খেজুর পাতার মাদুর। গলার স্বরটা শোনা গেল। কিন্তু ভেতরে মানুষ দেখা গেল না কোনো। আপনাতেই নিজের পোশাকের ভেতরে ড্যাগারের হাতলে কিরানের হাতের আঙুলগুলো শক্ত হয়ে উঠল।

কিরান মৃদু কাশি দিল মানুষটার সন্ধানে। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। সে আবারও কাশি দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তার অগেই জলচৌকির অন্যপাশ থেকে ছোটোখাটো একটা মূর্তি প্রকট হলো এপাশে। কিরান দেখল ছোটো ধূতি আর ছোটো পাঞ্জাবি পরা ছোটো সাইজের একজন মানুষ যেন গড়িয়ে উঠে এলো জলচৌকির ওপরে। তারপর ওপরে উঠে বেশ আয়েশ করে হেলান দিয়ে বসল সে বালিশে। হেলান দিয়ে তারপর অদৃশ্য কারো উদ্দেশে হাতের ইশারা করল সে। 'বলছিলাম তোমার সঙ্গের ফিরিঙ্গিরে ধমক দিয়ে লাভ কী?' কিরান অবাক হয়ে দেখল বামন অকৃতির মানুষটার কথা একেবারেই পরিষ্কার আর শুদ্ধ। 'এই গন্ধ পারস্য থেকে শুরু করে চীন দেশ পর্যন্ত মানুষরে পাগল বানায়া রাখে আর ও তো...' বলে সে কিরানকে ইশারা করল পেতে রাখা মাদুরে বসার জন্য। 'তালেব তৈমূরের পোলা তালেব কিরান, সুন্দর কইরা বসো। হাত-পা ছড়ায়া বসো,' সে ইশারায় কিরানের ড্যাগার ধরে রাখা হাতটা দেখাল। 'গলির চিপায় যারে ধমক দিসো হেইগুলা এহানে চলবে না। তুমি কামের পোলা, বোঝার বুদ্ধি আছে আশা করি।' মানুষটা এইটুক বলতেই কামরার দুদিক থেকে দুজনে প্রবেশ করল কামরার ভেতরে।

একজনের হাতে গড়গড়া। সেটা সে সাজিয়ে দিল মানুষটার সামনে। আর অন্যজন ছোটো ছোটো পাত্রে করে বাহারি পান সাজিয়ে দিয়ে গেল ওদের সামনে। ইশরারায় ওদেরকে পান নিতে বলল মানুষটা। 'নেও তৈমূরের ছেলে। তোমার বাপের কল্যাণের জন্য হলেও একটা পান নেও,' বলে সে মৃদু হেসে উঠল। 'তুমি হয়তো ভাবতাছো, আমি তোমার বাপরে এভাবে নামধইরা ডাকছি,' গড়াগড়ায় টান দিতে দিতে হেসে উঠল সে। 'তবে শুনে রাখো, আমারে দেখতে যত কম দেহায় বয়স আসলে অত কম না আমার। এখন বলো, আমি কী করতে পারি তোমার জন্য?'

কিরান দেখল ওর সঙ্গে আসা লাঠিয়াল দুজনে পান তুলে নিয়ে বেশ আয়েশের সঙ্গে চিবুচ্ছে। সুন্দর একটা গন্ধ পেল সে। তবে গোমেজের কোনো বিকার নেই। সে দুই হাত ভাঁজ করে বসে আছে। মুখে কোনো ভাব নেই। কিরান পাত্র থেকে একটা পান তুলে হাতে নিল। কিন্তু মুখে দিল না সে। সফরউদ্দিন দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আপনার কাছে আমাকে আকরাম বেগ পাঠাইছে। আপনে তারে তো চিনেন?'

সফরউদ্দিন মৃদু হেসে উঠল। 'তারপর, কও ভাতিজা...'।

'এইটা দিতে বলছে সে আমারে আপনার কাছে,' বলে সে কোমর থেকে ভাঁজ করা চামড়ার পুঁটলিটা এগিয়ে দিল তার দিকে। সফরউদ্দিন সেটা হাতে নিয়ে সাবধানে বাঁধনটা খুলে ফেলল। এক নজর জিনিসটা দেখে নিয়ে সেটা আবারও আগের মতো মুড়িয়ে বেঁধে ফেলল সুতো দিয়ে। 'তুমি কি আমার কাছে শুধু এই কামের লাইগ্গাই আসছো?' কিরান মুখে কিছু না বলে স্রেফ মাথা ঝাঁকাল। ওর জবাব শুনে সফরউদ্দিন আবারও আপনমনে খানিকটা হেসে উঠল। 'আমি একটু হতাশ অইলাম আকরামের ওপরে। আমি ভাবছিলাম... যাক গা। কাম যোগ্য লোকের হাতে পড়ছে এতেই আমি খুশি।' বলে সে গড়গড়ায় দুটো টান দিল। 'তুমার কাম এক লহমেই হয়ে যাবে। আমার লোকেরা তুমারে দিয়ে আসবে ওইখানে।'

'আপনাকে ধন্যবাদ,' কিরান উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল।

'উমম উমম,' হাতের ইশারায় ওকে বসতে বলল সে। 'তুমি কিন্তু পানটা খাও নাই ভাতিজা,' বলে সে কিরানের হাতের দিকে দেখাল। 'আমার পান কিন্তুক মক্কা থেইক্কা শুরু কইরা পুরা দুনিয়াতে বিখ্যাত। এই যে সব বস্তা-পেঁটরা দেখতাছো এইগুলা সব পান-মসলা। সুমাত্রা, আন্দামান, রোসাঙ্গ, জাভা থেইক্কা শুরু কইরা পুরা দুনিয়া থেইক্কা আসে। তারপর আবার সব চইলা যায়...' কথা শেষ না করে গড়গড়ায় টান দিল সে। 'তুমার আগ্রহ অইতাছে না ভাতিজা, এই কাঁচা পান দুনিয়ার সবখানে যায় কীভাবে জানার জন্য?'

কিরান বিরক্তির সঙ্গে গোমেজকে দেখল একবার। এই লোক এত কথা বলতে শুরু করেছে কেন। গোমেজের কাছ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে সফরউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে দেখল লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। 'যাক গা ভাতিজা, তুমি কামে আসছো। এসব আজাইরা প্যাঁচালে বিরক্ত অইতাছো বুঝবার পারছি। এই শুন,' বলে সে ডাক দিতেই দুজন লোক এসে হাজির হলো। ওদের মৃদু স্বরে কাজ বুঝিয়ে দিতেই বেরিয়ে গেল লোক দুজন। 'ওরা বাইরে আছে। তোমরা বাইর অইলেই ওরা তুমগো জায়গামতো নিয়া যাব। তয় যাওয়ার আগে তোমারে দুইটা কথা কই। সাদা চোখে যা দেখবো বুঝবা সেইটাই সব না। আর যা করতে যাইতেছো সেটার লাইগ্গা জাহাজ, অস্ত্র, মানুষ, গোলাবারুদ অনেক জরুরি। কিন্তু সবচেয়ে জরুরি কী জানো, নিজের মনের জোর। অনেক অনেক মনের জোর লাগব তোমার ভাতিজা। বুকের বলই সবচেয়ে বড়ো বল,' নিজের একটা হাত মুঠো করে বুকের কাছে চেপে ধরে বলে উঠল সে। কিরান একটু চমকে উঠে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলো। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই লোকদুজন ওদেরকে ইশারা করল পেছনে এগোতে। কিরান পানটা মুখে পুরে

এগোতে শুরু করল। লোকটা ভুল বলেনি পানটা আসলেই সুস্বাদু।

সফরউদ্দিনের লোক দুজন ওদেরকে নিয়ে এ-গলি ও-গলি ঘুরে একটা পাকা বাড়ির সামনে নিয়ে এলো। তারপর কিরানকে জানাল, মালিক তাদের এখানেই দিয়ে যেতে বলেছে। ভেতরে গিয়ে ওকে আছিয়া নামে একজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

কিরান ভেবেছিল লোকগুলো ওদের জায়গামতো নিয়ে এলে দুটো মুদ্রা বকশিশ দেবে। কিন্তু সেটা না করে হা করে তাকিয়ে রইল ওদের যেখানে নিয়ে এসেছে সেই বাড়ির দিকে। নানা ধরনের নানা বর্ণের মেয়েরা সাজগোজ করে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। কিরান মনে-মনে আঁতকে উঠল।

সর্বনাশ! এরা তো দেখি ওদেরকে গণিকালয়ে নিয়ে এসেছে।

***

কিরানদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেতেই গোলন্দাজ তার লোকদের দেখল একবার। এদের ভেতরে সে বৈঠাকে চেনে শুধু। তাও এই লোকটা যখন তার সঙ্গে জাহাজে কাজ করত সে ছিল প্রধান কামাঞ্চি আর এই লোকটা ছিল সাধারণ এক লস্কও, যে কিনা জাহাজে ফুটফরমাইশ খাটে। তাই তার সঙ্গে সখ্যতা থাকার প্রশ্নই আসেনা। তবু যেহেতু কিরানের দলের লোক খানিকটা ভরসা আছে এর ওপরে। কিন্তু অন্য লোকটা যাকে বিল্লাল নামে চেনে সবাই ওই লোকটাকে গোলন্দাজের খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছে না। কারণ একে দেখে কেন জানি অতিরিক্ত চতুর মনে হচ্ছে। ওদের সঙ্গে আছে দুজন লাঠিয়াল।

গোলন্দাজ ভয় পাওয়ার মতো মানুষ নয়। মাত্র তেরো বছর বয়সে ঘর ছেড়ে কাজে নেমেছিল সে। কতবার পাড়ি দিয়েছে সমুদ্র। সেই যে নোনা পানির নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল সে থেকে আর ছাড়েনি। এরপরে একেবারে যৌবনের শেষ প্রান্তে এসে বাড়ি ফিরেছে সে। আজ থেকে কয়েক বছর আগে সিলভেরার বাহিনীর সঙ্গে যা ঘটেছিল তাতে দুর্ভাগ্য তো ছিলই মাঝে মাঝে গোলন্দাজের মনে হয় ওই ঘটনাটা তার কারণেই ঘটেছিল। ভুল আসলে সবারই ছিল। বিশেষ করে তাদের কাপ্তান কিরানের। জোশের বসে সে সিলভেরার বাহিনীকে অনেক নিচু করে দেখেছিল। কিন্তু সেটার ফল পেতে হয়েছে সবাইকে। যদিও কিরানের দলের অনেকেরই অভিমত আসলে যা ঘটেছিল সেটার জন্য দায়ভার অনেকটা গোলন্দাজের ছিল। কারণ যুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সময়ে গোলন্দাজ ভয়ে কামান ছেড়ে তার বাহিনী নিয়ে পিছু হটেছিল। আর একারণেই সিলভেরার বাহিনী তাদের নৌবহরের একটা অংশ উড়িয়ে দিতে পেরেছিল। যদিও জনসম্মুখে এই

কথাটা গোলন্দাজ কোনোদিনই স্বীকার করেনি। নিজের দল নিয়ে পেছনে পড়ার যুক্তি হিসেবে সে বলেছিল যে, তার লোকেদের নিরাপত্তা আগে দেখেছে সে, সে-কারণেই পিছিয়ে গিয়েছিল সে। যুক্তি হিসেবে কথাটা ঠিক আছে। কিন্তু নিজের মনের গহিনে সে জানে যদি তার লোকদের নিয়ে আরেকটু সাহস করে নিজের অবস্থানটা না ছাড়ত, তাহলে তারা প্রাণে না বাঁচলেও কিরানের বাহিনীকে পরাজিত হতে হতো না। অন্তত পরাজয়টা এতটা গ্লানিকর হতো না।

এই কারণে কিরানের ওপরে গোলন্দাজের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এই ব্যাপারটা একমাত্র কিরান জানত কিন্তু সে কাউকেই বলেনি। যদিও সবাই গোলন্দাজকে দোষারোপ করেছে। কিন্তু এ-থেকে সবসময় তাকে ফিরিয়ে রেখেছে কিরান। সে নিজের ওপরে সব দায়ভার নিয়েছে। তার দলের কারো ওপরে আঁচ আসতে দেয়নি। ওই ঘটনার পর গোলন্দাজ প্রথমে বাড়ি ফিরে যেতে চায়নি। কারণ অল্প বয়সে বাড়ি ছাড়ার পর পূর্ণ বয়সে আবারও বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজের প্রায় অচেনা হয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নতুন করে সব মানিয়ে নিতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তার ওপরে আবার ভেতরে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে বিরাট এক ক্ষত। কিন্তু বাড়ির লোকদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে তেমন একটা কষ্ট হয়নি তার। তারপর ধীরে ধীরে আবারও সব গড়ে তুলেছে। আজ এক লহমায় আবারও হারিয়ে গেছে সব। কিন্তু পুরস্কার হিসেবে ফিরে এসেছে পুরনো সেই জীবন।

হাঁটতে হাঁটতে নিজের ভাবনার জগতে হারিয়ে যেতে বসেছিল গোলন্দাজ হঠাৎ পাশ থেকে বৈঠার ডাক শুনে সে বর্তমানে ফিরে এলো। 'হুজুর, এট্টু শুনেন না,' বলে সে গোলন্দাজকে টেনে একটু পিছিয়ে আনল। লাঠিয়াল দুজনকে বিল্লালের সঙ্গে এগোতে বলে গোলন্দাজ খানিকটা পিছিয়ে এলো বৈঠার কাছাকাছি। 'বলো, কী অইছে?'

'হুজুর, এই বিল্লাল শেঠ কিন্তু খুব সুবিধার লোকনা,' বলে সে সামনে আগে-আগে হাঁটতে থাকা বিল্লাল শেঠকে দেখাল। 'ওস্তাদ কিরানরে হেয় বাঘের মতোন ডরায় কিন্তু অন্য কেউরে পাত্তাই দেয় না। আর হের যে গুরু হেয় কিন্তু আরো খারাপ, সফদর শেঠ। হের কামই অইলো খবর কেনাবেচা করা। আমগো...'

'সাবধান থাকতে হবে,' বৈঠার বাক্যটা শেষ করল গোলন্দাজ নিজে। বলে সে বৈঠার কাঁধে একটা চাপড় মারল। বৈঠা তাকে যা বলল, কিরান এই তথ্য আরো অনেক আগেই তাকেও দিয়েছে এবং সাবধান থাকার কথা বলে দিয়েছে। গোলন্দাজ নিজে পোশাকের ভেতরে একটা ছুরি রেখেছে। সেই সঙ্গে তার পিঠের ওপরে একটা গুলি ভরা বন্দুক প্রস্তুত। মনে মনে ভাবল বিল্লাল শেঠ যত বড়ো তালেবরই হোকনা কেন এইবার ফাইজলামি করলে তার খবর আছে। পায়ে পায়ে সে সামনে এগিয়ে গেল। বিল্লাল শেঠ বেশ খুশি মনে হাঁটছে। তার পাশে এসে বিল্লাল শেঠের কাঁধে একটা হাত রাখল গোলন্দাজ।

'আরে শেঠ, এক লগে কাম করতাছি। আমগো তো ঠিকমতো আলাপই অইলো না,' হঠাৎ গোলন্দাজের এই আচরণ দেখে বিল্লাল শেঠের চোখ কপালে ওঠার জোগাড় হলো, যদিও সে জানে কিরানের দলে জাত-পাত-ধর্ম এগুলো কোনো বিষয় না। কিন্তু তবু উঁচু জাতের একজন হিন্দু যে নিচু জাতের নিজের ধর্মের কারো সঙ্গেই কথা বলার কথাই না, স্পর্শ করা তো দূরে থাক, সে কিনা তার মতো একজন মুসলমানের কাঁধে হাত রেখে কথা বলছে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্যই বটে। সে প্রায় বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলে উঠল, 'জি হুজুর, আপনের অনেক নাম শুনছি সবার কাছে। আপনের নাকি কামানে বিরাট হাত...' বলে সে গোলন্দাজের প্রশংসা করেই চলল। বাজার এলাকা থেকে ওরা যাবে হাম্মামখানার দিকে।

হাম্মামখানা ব্যাপারটা কিঞ্চিত অদ্ভুত আর অবাক করার মতো। কারণ হাম্মামখানার প্রকৃত উৎস মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। এই অঞ্চলে হাম্মামখানার তেমন একটা প্রচলন নেই। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য ঘুরে হজ করে আসা হাজি সফদর পাটোয়ারির ব্যাপারটাকে ভিন্ন একটা মাত্রা দিয়েছে এই সন্দ্বীপকে। এই এলাকায় সে একমাত্র হাম্মামখানা মানে গোসলখানা খুলে রেখেছে দ্বীপের এক প্রান্তে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগতে পারে এই কারণে যে, মধ্যপ্রাচ্যে যেখানে পানির তীব্র অভাব সেখানে শহরের কেন্দ্রে গোসলের ব্যবস্থা একটা বিরাট রাজসিক এবং প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কিন্তু পানি বিধৌত এই অঞ্চলে এটার গুরুত্ব আসলে কতটুকু। কিংবা চাহিদাইবা কতটুকু। সফদর পাটোয়ারি যখন ব্যাপারটা খুলল তখন সবাই হাসাহাসি করেছে। কিন্তু পরে দেখা গেল ধীরে ধীরে জমে উঠতে শুরু করল তার হাম্মামখানা। এর পেছনে কারণ হলো এখানে গোসলের সুব্যবস্থা তো আছেই সেই সঙ্গে আছে পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে গড়াগড়া টানার ব্যবস্থা, গোসলের আগে তেল মালিশের ব্যবস্থা, পানিতে আধডোবা হয়ে চণ্ডু টানতে টানতে পাশা কিংবা শতরঞ্জি খেলার ব্যবস্থাও আছে। এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, সফদর শেঠের হাম্মামখানায় গোসল করতে রীতিমতো লাইন লেগে যায়। সকাল, দুপুর কী সন্ধ্যে। আর এসবের পেছনে সফদর শেঠের মূল উদ্দেশ্য হলো, এখানে লোক সমাগমের সুযোগে সব খবর চলে আসে তার কাছে। এর বাইরে তার টিকটিকি জাসুস আর খবরিরা তো পুরো এলাকায় ছড়িয়ে আছেই। আর তাই গণ্যমান্য মহল থেকে শুরু করে সবখানে তার গোসলখানা আর খবরের চাহিদার কোনো তুলনাই নেই। বিল্লাল শেঠও তার এরকমই খবরিদের একজন যে কিনা তাকে রামু আর রাউজান এলাকার কোথায় কী হচ্ছে সব খবর এনে দেয়।

এসবই আগে শুনেছে গোলন্দাজ। আর তাই বাজার এলাকা ছাড়িয়ে খানিকটা সরে আসতেই রংমহলের মতো দেখতে আলোকিত সুসজ্জিত হাম্মামখানাটা দেখে

সে দূর থেকেই খুব সহজেই বুঝতে পারল এটাই সফদর শেঠের হাম্মামখানা। ‘দেখছেন ওস্তাদের কারবার! করছেডা কী?’ গোলন্দাজের সঙ্গে গল্প করতে করতেই বিল্লাল শেঠ খুশির সুরে বলে উঠল কথাটা।

গোলন্দাজ একটু অবাক হয়ে দেখছে। সে ভাবেনি এই মরা দ্বীপের একপ্রান্তে এরকম আলোকিত আয়োজন থাকবে। তবে হাম্মামখানার প্রাঙ্গণে কোনো মানুষ দেখা গেল না। ‘কী ব্যাপার, মানুষ কই?’ সে কৌতূহলী সুরে জানতে চাইল।

‘আরে এই সইন্ধ্যা বেলা কী আর মাইনষের গুসলের সময়! এহন অইলো ওস্তাদের বিশেষ কামের সময়। তাই বিশেষ লোকজন ছাড়া এহন কেউ থাকব না, এইডাই স্বাভাবিক। আর হেয় জানে আমরা আসব কাজেই...’ বলে সে ওদেরকে পথ দেখিয়ে হাম্মামখানার প্রাঙ্গণে নিয়ে এলো। ওরা ছোটো উঠানের মতো জায়গাটা পার হয়ে হাম্মামখানার পানির চৌবাচ্চার মতো জায়গাটা পার হয়ে এলো। এখান থেকে সারি সারি খোপের মতো জায়গায় গোসলের সুব্যবস্থা আছে। সব কিছু সাজানো-গোছানো। কিন্তু একটা কাকপক্ষীও দেখা গেল না কোনো দিকে।

রঙ্গন মল্লিক সবাইকে সাবধান থাকতে বলে বিল্লাল শেঠকে পথ দেখাতে বলল। একেবারে বিরান প্রান্তরের নির্জনতা দেখে বিল্লাল শেঠও মনে হয় একটু ঘাবড়ে গেছে। সে ওদেরকে নিয়ে সারিসারি খোপ পার হয়ে এক কোণে কামরার দিকে এগিয়ে গেল। ওটার দরজার কাছে গিয়ে মৃদু স্বরে সফদর শেঠকে ডাক দিল।

পায়ে পায়ে দরজা ঠেলে সাবধানে সেদিকে এগিয়ে গেল গোলন্দাজ আর বৈঠা। ওদের ঠিক পেছনেই লাঠিয়াল দুজন। ভেতরে ঢুকে দেখল ভেতরে বেশ বড়ো একটা কামরা। ভেতরে দেয়ালের একপাশে মশাল থেকে আলো আসছে। মেঝেতে পাতা শতরঞ্জির ওপরে সুগন্ধি তেলের বাতি, তার ঠিক পাশেই সরাপাত্র আর পানপাত্র। কিন্তু ভেতরে কোনো মানুষ নেই।

‘কী রে, কী ব্যাপার?’ গোলন্দাজ খানিকটা হতভম্ভ হয়ে কামরার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকা বিল্লাল শেঠের দিকে এগিয়ে কড়া সুরে জানতে চাইল। ‘তোর ওস্তাদ কই? তুই না বলছিলি আমরা আসতেছি এটা সে জানে। সে গেল কই?’

বিল্লাল শেঠকে খানিকটা বোকা দেখাচ্ছে, সে রঙ্গন মল্লিকের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। ‘বুঝতেসি না তো। হের তো,’ বলে সে কামরা থেকে বের হওয়ার দুটো দরজাদেখাল। ‘আমি এক কাজ করি হেরে...’ সে কথা শেষ করার আগেই রঙ্গন মল্লিক বিল্লাল শেঠের কুর্তার একপাশে চেপে ধরে তাকে ঠেসে ধরল দেয়ালের সঙ্গে। তারপর পোশাকের ভেতর থেকে ছুরিটা বের করে সেটা ঠেকাল বিল্লাল শেঠের গলার কাছে। ‘বিল্লাল শেঠ, আমি খালি কামান না, ছুরি আরো ভালো চালাইতে পারি, দেখতে চাস?’

বিল্লাল শেঠ কুঁইকুঁই করতে শুরু করেছে গোলন্দাজের ফাঁস থেকে বের হওয়ার জন্য। হঠাৎ কামরার অন্য দিক থেকে বৈঠা ডেকে উঠল ওদেরকে। কাছে গিয়ে গোলন্দাজ দেখল লাঠিয়াল দুজন আর বৈঠা দাঁড়িয়ে আছে কামরাটাতে রাখা পর্দার অন্যপাশে। তিনজনেই সতর্ক। ওদেরকে দেখেই বৈঠা বলে উঠল, 'হুজুর দেহেন।'

গোলন্দাজ উঁকি দিয়ে দেখল আড়ালের অন্যপাশে একটা বড়ো সিন্দুক, সেটার পাশেই মাটিতে পড়ে আছে মধ্যবয়স্ক একজন মানুষের গলাকাটা দেহ। গোলন্দাজ সঙ্গেসঙ্গে পিঠের ওপর থেকে টান দিয়ে বন্দুকটা বের করে আনল। বিল্লাল শেঠ এগিয়ে যেতেই তাকে প্রশ্ন করল, 'এইটাই কী সফদর?' বিল্লাল দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁসূচক জবাব দিল। তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'ওস্তাদ রে...'

তার ঠোঁটের ওপরে আঙুল রেখে চুপ থাকতে বলল গোলন্দাজ রঙ্গন মল্লিক। তার ধারণা যে বা যারা সফদর শেঠকে খুন করেছে তারা এখানেই আছে এখনো। সে নিজের অস্ত্র সামনে ধরে বৈঠা আর লাঠিয়াল দুজনকে চোখের ইশারায় সতর্ক করে আড়ালের ওপাশের দরজাটা দেখাল। একটু আগেই মৃদু আওয়াজ ভেসে এসেছে ওখান থেকে। কেউ আছে ওই কামরায়।

***

দুজনেই তারা দুজনকে একটু পরপর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে। প্রতিটি মানুষের জীবনের বর্তমান অবস্থানকে সংজ্ঞায়িত করে তার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান। আর সেই অবস্থানকে মজবুত কিংবা দুর্বল করে তার ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ। প্রচলিত হিন্দু সমাজে শুধু অর্থ থাকলেই সবকিছু করা সম্ভব নয় জাতপাতের কারণে। তবে এই বিশ্বাস এবং অবস্থান ধীরে ধীরে বদলে যেতে শুরু করেছে সামাজের বিভিন্ন স্তরে। তবে শত কিংবা হাজারো বছর ধরে রক্তের ভেতরে লালন এবং ধারণ করে আসা ব্যাপার কী আর চাইলেই বদলে ফেলা যায়। তবে সমাজের ও ধর্মের ওপরের স্তরের মানুষদের নিচের স্তরের প্রতি আবার নিচের স্তরের মানুষদের ওপরের স্তরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ভেতরে একটা অবধারিত ছন্দ বিরাজমান থাকে, সেটা ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক, সেখানে একটা সংজ্ঞায়িত ব্যাপার থাকে। কিন্তু যখনই সমাজের একই স্তরের মানুষদের ভেতরে সমান পরিমাণ ক্ষমতা কিংবা অবস্থানগত বিষয় বিরাজ করে তখন চিত্রটা খানিকটা হলেও বদলে যায়। ব্যাপারটা ঘটে দুইভাবে, খুব ভালোভাবে, আর না হয় সন্দেহের ভিত্তিতে।

এই মুহূর্তে লাঠিয়াল বাহিনীর সর্দার তুলারাম আর বাজিকর বেদুর ভেতরে ঠিক দ্বিতীয় ব্যাপারটাই ঘটছে। তারা দুজনেই সমাজের একই স্তর থেকে উঠে আসা

মানুষ। এদের কারো পূর্বপুরুষই সমাজে ধর্মীয় কিংবা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অবস্থানে ছিল না। কিন্তু বেদুর জন্য মোঘল বাহিনীর অন্তর্গত হওয়া কিংবা তুলারামের জন্য আকরাম বেগের মতো একজন মুসলিমের অধীনে একটা লাঠিয়াল বাহিনীর সর্দার হিসেবে নিজের অবস্থান শক্ত করার ফলে যেটা হয়েছে দুজনেই নিজের সামাজিক স্তর ভেদ করে উঠে এসেছে পূর্বপুরুষদের চাইতে একটু হলেও মুক্ত অবস্থানে। ফলে এই দুজন মানুষ যখন পরস্পরের সাহচর্যে এসেছে সমধর্মী চুম্বক যেমন বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটায়, এরাও পরস্পরের থেকে ঠিক তেমনি বিপরীতধর্মী নেতিবাচক বিক্রিয়া ঘটাচ্ছে।

কিরানদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে প্রথম গোলন্দাজের দলটা চলে যায় সোজা বাজারের রাস্তা বরাবর। অন্যদিকে কিরান আর ওর দল আড়তদারির দিকে বিদেয় নিতেই ওরা আলাদা হয়ে মূল বাজারের পথে হাঁটতে শুরু করে। ওদের দলে আছে তুলারাম, বেদু আর সঙ্গে দুজন লাঠিয়াল।

কিরান যখন দলগুলোকে সাজায় একটা দলে সে নেতা আর অন্যদলে গোলন্দাজকে নেতা করেছে। কিন্তু এই দলটা যেহেতু মূল বাজারের ভেতরে অবস্থান করবে কাজেই এদের ভেতরে কোনো নেতা রাখা হয়নি। চারজনকেই পরানো হয়েছে সাধারণ দেহরক্ষী কিংবা লাঠিয়ালের পোশাক। তাদের ভাবটা এমন যে, তারা এসেছে একজন মালিকের সঙ্গে, মালিক তাদেরকে রেখে গেছে রঙ্গশালায়। আর তারা এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে নিজের মতো। বেদু নিজের সঙ্গে নিয়েছে একটা মোটা গদা, সেটাকে সে পোশাকের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে, সেই সঙ্গে তার ধুতির ভেতরে গোঁজা আছে একটা লম্বা মাথা বাঁকা আরাকানি ছুরি। সে তুলারামের দিকে তাকিয়ে দেখল তুলারামের হাতে তেল চকচকে লাঠিটা তো আছেই, তার সঙ্গে তলোয়ারও আছে। বড়ো নয়, খাটো তলোয়ার। আর তুলারামের সঙ্গে যে দুজন, তাদের ভেতরে অন্তত একজনের সঙ্গে একটা বন্দুক লুকানো আছে।

বেদু তুলারামের দিকে একটু পর পর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আবার সে অন্যদিকে তাকালে অনুভব করতে পারছে তুলারামও তাকে একই দৃষ্টিতে অবলোকন করছে। এর পেছনে কারণ সেই হাজার বছরের সামাজিক অবস্থানগত দ্বন্দ্ব। কিরানরা আলাদা হয়ে যেতেই ওরা আরেকটু সামনে এগোতেই বেদু মৃদু শিসের সঙ্গে তুলারামকে কাছে ডাকল।

'আমরা এইহান থনে কোন দিকে যাবো?' সে গলার স্বর যতটা সম্ভব ভারী করে প্রশ্নটা করার চেষ্টা করল। তুলারামের ওপরে খানিকটা কর্তৃত্ব দেখানোর ইচ্ছে। কিন্তু তুলারাম তাকে পাত্তাই দিল না। সে একবার বেদুকে দেখে নিয়ে নিজের কোমর থেকে একটা থলের মতো বের করে তা থেকে খানকিটা খইনি বের করে

নিজের ঠোঁটের নিচে গুঁজে দিল। বেদু তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর রাগের সঙ্গে জানতে চাইল, 'কতা জিগাইলাম জবাব দিলানা, লেঠেল?'

তুলারাম হাত নেড়ে আবারও তার কোমরে থলিটা রেখে দিল। তারপর মাটিতে থুতু ফেলে ধীরে সুস্থে জবাব দিল। 'তুমিই কও তামশাকর,' বিভিন্ন ধরনের খেলা দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করে যারা তাদের এই নামে ডাকা হয়, খানিকটা নিচু করে অবশ্য।

তুলারামের জবাব শুনে বেদু খানিকটা বেজার হলো। তাকে তামশাকর বলাতে সে রাগ অনুভব করছে ভেতরে ভেতরে। আবার দলটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও তাকেই দিয়েছে, ব্যাপারটা ভেবে একটু ভালোও লাগল তার। 'ঠিক আছে লেঠেল, তুমি যখন কইতাছো তাইলে আমরা আগে সোজা বাজারে ঢুকব। সেখানে ঢুইকা আগে খোঁজখবর করব, তারপর ওইখানে কিছু না পাইলে আমরা অন্যদিকে যাব। বুঝছো?' বলে সে তুলারামের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছে।

তুলারাম ঠিকমতো তার কথা শোনেওনি। সে কথা বলছিল নিজের দলের একজনের সঙ্গে। বেদুর কথা শেষ হবার পরও সে কথা বলেই যেতে লাগল। বেদু কথা শেষ করে দেখল লোকটা কোনো জবাব দিচ্ছে না। সে মৃদু কাশি দিল। তার কাশি শুনে তুলারাম তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো,' বলে সে একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে পথ দেখাতে বলল। বেদু চিন্তিত মুখে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা কী তাকে সম্মান দেখাচ্ছে নাকি তাকে নিয়ে মজা করার চেষ্টা করছে সে বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু বুঝতে না পেরে পা চালাল সামনে দিকে। হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে ভাবল ব্যাটা যদি তালেবরি করে ওর মুখটা সে ভেঙে দেবে।

পুরো দলটা পা চালিয়ে চলে এলো বাজার এলাকার মূল রাস্তায়। সন্দ্বীপের এই বাজারটা গড়ে উঠেছে দুই ধরনের চাহিদাকে মাথায় রেখে। প্রথম, যারা এখানে স্থায়ীভাবে থাকে তাদের চাহিদার জোগান... যাদের ভেতরে আছে নিয়মিত বাসিন্দা, অনেক স্থানীয় ও পর্তুগিজ পরিবার। এরপরে আছে খাবার ঘর, থাকার জায়গা, পানশালা, গণিকালয় এসব। আবার বাজারের একটা বড়ো অংশ গড়ে উঠেছে এই বাজার থেকে চারিপাশের বিভিন্ন রাজ্যে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের জন্য যেসব জিনিস রপ্তানি কিংবা আমদানি করা হয় সেসবের কথা ভেবে। মূলত দ্বিতীয় ব্যাবসাটাই এখানে প্রধান। আর তাই বাজারটাও গড়ে উঠেছে সেভাবেই নানা জিনিসের ধরন অনুযায়ী আলাদা আলাদা অংশে।

বাজারের নিত্য প্রয়োজনীয় অংশ যেসব জায়গায় বিক্রি হয় সেদিক দিয়ে ওরা বাজার এলাকায় প্রবেশ করল। চাল, ডাল থেকে শুরু করে গম ইত্যাদি একদিকে বিক্রি হয়, এরপরেই কাঁচামাল আর মাছ-গোশত এসব জিনিসের দোকান।

যেখানে ভারতবর্ষের বেশির ভাগ জায়গাতেই কেনাবেচা হয় সকালে, সেখানে সন্দ্বীপের হিসেব একেবারেই আলাদা। সন্ধ্যে নামার কারণেই হোক আর যেকারণেই হোক বাজার এলাকা এই মুহূর্তে সরগরম। ওরা বাজারের ছোটো ছোটো এলাকাগুলো পার হয়ে চলে এলো মসলা বিক্রির জায়গায়। এখানে না এলে বৈশ্বিক বাজারে ভারতবর্ষের মসলার যে বিপুল চাহিদা সেটা বোঝার কোনো উপায়ই নেই। পুরো বিশ্বের মূল ব্যবসায়িক উপদানগুলোর অন্যতম একটি হলো মসলা। আর এই মসলার বেশিরভাগ যোগানদানকারীই হলো ভারতবর্ষ। আর ভরতবর্ষের মসলার বাজার আগে পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করত আরবের লোকেরা। তারা ভারতবর্ষ থেকে মসলা কিনে নিয়ে যেত মধ্যপ্রাচ্যে। সেখান থেকে ইতালির ভেনিসে। সেখানে চড়া দামে সেগুলো বিক্রি করত ইউরোপীয় বণিকদের কাছে। এর ফলে ভারতবর্ষের সমুদ্রবন্দর থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য, এমনকি ইউরোপ পর্যন্ত সমুদ্রপথও নিয়ন্ত্রণ করত তারাই। পুরো বিশ্বের ব্যবসায়িক মহলে তাদেরই ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটটা বদলে যেতে শুরু করে ইউরোপীয় বণিকরা ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কারের পর থেকে। ভাস্কো দা গামা কালিকটে নামার পর থেকে প্রায় দুইশ বছরের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের মাধ্যমে মসলার বৈশ্বিক এই বাজার এখন অনেকটাই ইউরোপীয়দের দখলে। আর তাই ভারতের বড়ো বাজার মানেই মসলা, আর মসলা মানেই বিদেশি খরিদদার। আর বাজারের মসলার অংশটাও সেরকমই হয়, কিন্তু ওখানে ঘণ্টাখানেকের ওপরে ঘোরাঘুরি করেও তেমন কিছুই পেল না ওরা। তবে বাজারের হঠাৎ এই সরগরম হয়ে ওঠার কারণটা জানতে পারল। আজ রাতে নাকি বাজারে ফাঁসির মঞ্চে একজনকে ফাঁসি দেওয়া হবে। সেটা দেখার জন্য সবাই জলদি বাজার বন্ধ করে সেখানে যাওয়ার তাড়ায় আছে।

একটু পরেই তুলরাম বেদু আর তার লোকেদের ইশারা করল অন্যদিকে সরে যেতে। ওরা সরতে সরতে তুলারাম আবারও মাটিতে থুতু ফেলে বলে উঠল, 'কি মিয়া কই আনলা? কিছুই তো হুনতাছি না। খালি কিনা আর বেচা, বেচা আর কিনা।'

'ওই মিয়া এইহানে কী সবাই তুমারে খবর দিওনের লাইগ্গা বইসা আছে নাহি?' বেদু খেঁকিয়ে উঠল। তুলারাম তাকে কর্তৃত্ব দেওয়ার পেছনে তার দুরভিসন্ধি কিছুটা হলেও বুঝতে পারছে সে। দোষারোপ করা।

'আরে চেতো ক্যান?' তুলারাম হাস্যরসের সঙ্গে বলে উঠল। 'আমি আরো ভাবলাম, তুমি কামেল লোক, দুনিয়াসুদ্ধা তামশা দেহায়া বেড়াও তাই তুমার হিসাবই আলাদা,' বলে সে নিজের লোক দুজনার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। বেদু রাগের সঙ্গে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই তুলারাম নিজের দুই হাত তুলল সম্পর্কের ভঙ্গিতে তারপর বলে উঠল, 'আরে চেইতো না। চলো, আমি তুমগোরো এক জায়গায় লয়া যাই। আমি নিশ্চিত সেইখানে গেলে আমরা কিছু না কিছু জানতে পারবই,' বলে সে ইশারা করল সামনে এগোনোর জন্য। বেদু কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। আসলেও তো ওরা এখনো তেমন কিছু বের করতে পারেনি। কাজেই যদি তুলারামের পন্থায় কাজ হয় তবে সমস্যা কোথায়। সে চুপচাপ তাকে অনুসরণ করতে শুরু করল।

ওরা বাজার এলাকার একপাশে চলে এলো। এখানে বণিক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাজারের এক কোণে সাদা চুনকাম করা একটা ছোটো ঘরের মতো দেখে তুলারাম সবাইকে ইশারা করে সেটার ভেতরে ঢুকে পড়ল। বেদু চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার কথা শোনার মতো কেউই নেই। বাকিরাও ভেতরে ঢুকে গেছে। বেদু তাদের পিছু ঢুকে দেখল ভেতরে এলাহি কারবার চলছে। সে দেখল, তুলারাম ছোটো ঘরটা পার হয়ে অন্যপাশে চলে গেলে। সেখানে ছোটো ছোটো খাটিয়া পাতা। তাতে বসে লোকজন গল্প করছে আর ধোঁয়া টানছে।

'চণ্ডু খানা!' বেদু অবাক হয়ে বলে উঠল।

'এক্কেরে ঠিক, তামশা মিয়া,' ওর পাশ থেকে তুলারাম বলে উঠল। 'আমগো যেসব খবর দেয়ার হেগুলার লাইগ্গা এর চেয়ে ভালা আর কিছু অইতেই পারেনা,' বলে ওরা দুটো খাটিয়া টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসে গেল। কাকে বলতেই সে ছোটো ছোটো গড়গড়ায় করে চণ্ডু সাজিয়ে দিয়ে গেল ওদেরকে। বেদু মনোযোগ দিয়ে জিনিস দেখছে। তুলারাম হেসে উঠল। 'কি মিয়া টানবা নাকি?'

বেদু কিছু না বলে চুপচাপ রইল। তার একেবারে ইচ্ছে যে হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু টানলে আবার কী না কী হয় ভেবে সে বিরত রইল। বেদু জিনিসটাকে দেখছে, তুলারাম তাকে টিপ্পনী কেটে কিছু এটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ওদের সঙ্গে থাকা দুই লাঠিয়ালের একজন তুলারামকে হাতের ইশারায় কিছু একটা বলল বেদুও তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। তুলারাম মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।

ওদের পেছনেই দুই চণ্ডুখোর আলাপ করছে। খুব কান পেতে যে শুনতে হবে তা নয়। কারণ তেমন রাখঢাক নেই। বেশ জোর গলায় আলোচনা চলছে ওদের ভেতরে। বিষয়টা হলো আজ বাজারের ফাঁসির মঞ্চে কারো ফাঁসি দেওয়া হবে।

বেদু তুলারামের দিকে ফিরে ইশারা করল, তুলারাম কাঁধ ঝাঁকাল। সে ইচ্ছে করেই খাটিয়াটাকে টেনে নিল খানিকটা ওদের দিকে। কিন্তু আসলে সেটা না করলেও চলত। কারণ লোকগুলা খোলাখুলিই আলাপ করছে। কে নাকি ধরা পড়েছে সন্দ্বীপের বাজার এলাকায়। আজ ফাঁসির মঞ্চে, রাতের বেলাতেই তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

তুলারামকে চণ্ডু দিয়ে গেছিল যে ছেলেটা তাকে ডাক দিয়ে গল্প করার ছলেই বিষয়টা জানতে চাইল। ছেলেটা উত্তরে যা জানাল তাতে মাথা গরম হয়ে উঠল ওদের। সন্দ্বীপের বাজার এলাকার হাম্মামখানার মালিক ছিল সফদর পাটোয়ারী নামে এক লোক। তার ওখান থেকে দ্বীপের শাসক পর্তুগিজ আর আরাকানিরা কাকে নাকি ধরে এনেছে। তার ফাঁসি দেওয়া হবে আজ। সবাই সেটা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

লোকগুলোর বক্তব্য পুরোটা শুনে বেদুর কান গরম হয়ে উঠল। সে তুলারামের দিকে ফিরতেই দেখল তুলারামের মুখও শুকিয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে আসা কেউ কী তবে ধরা পড়ে গেল।

তাদেরই ফাঁসি দেওয়া হবে নাকি?

অধ্যায় ঊনত্রিশ
বর্তমান সময়
পিবিআই হেডকোয়ার্টার, চট্টগ্রাম

'শশী সুলতানা।'

'ডক্টর শশী সুলতানা,' চেয়ারে বসা ভুবন বলে উঠল।

রুম্পা তার দিকে সামান্য মাথা নেড়ে হাসি মুখে বলে উঠল। 'হ্যাঁ, ডক্টর শশী সুলতানা,' বলে রুম্পা তালুকদার প্রজেক্টের সবার সামনে একটা ছবি দেখাল। প্রজেক্টরের স্ক্রিনে রোদে পোড়া হালকা শ্যামলা মতো সুন্দর চেহারার হাসিমুখের একটা ছবি ফুটে উঠল।

'আমরা প্রফেসর সুলতান আবদেলের মৃত্যুর স্থান সংলগ্ন জায়গাটা থেকে যে আইডি কার্ডটা পেয়েছি সেটা মূলত এই ব্যক্তিরই। যে আইডিটা পাওয়া গেছে সেটা কায়রোর একটা ইউনিভার্সিটির আর্কিওলোজি ডিপার্টমেন্টের,' বলে সে মিটিংয়ে উপস্থিত সব টিম মেম্বারদের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত ব্রিফিং শুরু করল।

শারিয়ার মিটিং রুমের জানালা দিয়ে বাইরে দেখল একবার। যেকোনো কেসের কাজে দুটো ব্যাপার অত্যন্ত ঘৃণা করে শারিয়ার; একটা হলো ফাইল ওয়ার্ক, অন্যটা কেস অ্যানালিসিস মিটিং। শারিয়ার জানে এই দুটো ব্যাপারই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপার দুটো এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে,কখনো কখনো কেসের কাজ মাঠের চেয়ে ফাইলেই বেশি পরিমাণে সমাধান করা সম্ভব হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেসের স্ট্র্যাটেজি ডেভলপমেন্ট থেকে শুরু করে অনেক মেজর ডিসিশন মেকিংও হয়ে থাকে কেস অ্যানালিসিস মিটিংয়ে। কিন্তু এত কিছু জানার পরেও আজও যেকোনো কেসের কাছে এই দুটো ব্যাপার একেবারেই উপভোগ করতে শিখতে পারল না শারিয়ার। এই মুহূর্তে ওরা বসে আছে পিবিআইয়ের সেই মিটিং রুমে, যেখানে দুপরের মিটিংটা হয়েছিল। সেই দিঘির পাড়ে নৌকার ভেতরে ওই আইডিকার্ডটা পাওয়ার পর খুব দ্রুত কাজ শুরু করে টিমের বিভিন্ন সেকশন। এখন সে বিষয়েই আলোচনা হচ্ছে মিটিংয়ে। শারিয়ার দেখতে পেল বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে অনেক আগে। মুখের সামনে হাত তুলে হাইম ছাড়তে লাগল সে।

'মিস্টার শারিয়ার, আপনি শুনছেন?' হঠাৎ টেবিলের সামনের অংশ থেকে ওর নাম শুনে চমকে উঠে সেদিকে তাকাল সে।

'ইয়েস, ইয়েস ম্যাডাম,' বলে সে সামনে রাখা ফাইলটা হাতে তুলে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করল।

রুম্পা একবার ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আবারও বলতে শুরু করল, 'ওই দিঘির নৌকাতে আইডি কার্ডটা পাওয়ার পর আমাদের আইটির টিমকে দায়িত্ব দেওয়া হয় কাজের জন্য। ওরা গত কয়েক ঘণ্টায় বেশ ভালো কাজ দেখিয়েছে। বিশেষ করে আইডির মানুষটাকে ট্রেস করার ব্যাপারে। আমি টমিকেই বলব ব্রিফ করার জন্য,' সে টমির উদ্দেশ্যে ইশারা করে বসে পড়ল চেয়ারে।

টমি কানে হেডফোন লাগিয়ে কিছু একটা শুনছিল, রুম্পার ইশারা পেয়ে সে কান থেকে হেডফোন সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার পরনে কালো একটা টি-শার্ট। সেটার ওপরে লেখা 'আই এম হট'। প্রথম দুটো অক্ষরের চেয়ে হট লেখাটা অনেক বড়ো। আর সেটা ঠেলে বেরিয়ে আছে তার বিশাল ভুঁড়ি।

শারিয়ারের পাশ থেকে ভুবন মুখ তুলে ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল, 'এই ব্যাটা কী প্রেগনেন্ট নাকি। এরকম একটা শরীরে এই আকারের ভুঁড়ি ক্যামনে হয়!' ভুবনকে দেখে মনে হচ্ছে, সে বেশ সিরিয়াসলি ভাবছে বিষয়টা নিয়ে। হাতের ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বলল শারিয়ার। রুম্পা একবার ঝাড়ি দিয়েছে। আবার কথা বলতে দেখলে খবর আছে।

'তো সবাই ভালো আছেন আশা করি,' খানিকটা ন্যাকা ন্যাকা গলায় টমি বলে উঠল। 'তো যেটা বিষয়, এই আইডিটা হাতে পাওয়ার পর আমি মানুষটাকে সার্চ করতে শুরু করি খুব অবভিয়াস দুটো জায়গা থেকে। এক, তার বিশ্ববিদ্যালয়। মানে যেটার আইডি কার্ড আমরা পেয়েছি। দুই, সোশাল মিডিয়া। লাকিলি দুটো জায়গাতেই আমরা হিট পাই। প্রথমেই ভার্সিটির ওয়েবসাইটের শিক্ষক তালিকায় উনার নাম আছে। আর দ্বিতীয়ত ফেসবুকেও আছেন উনি। এরপরে উনার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করা হলে তারা জানায় এই ভদ্রমহিলা গত সপ্তাহ থেকে ছুটিতে আছেন। হোটেল রেকর্ড থেকে জানা যায় সে মৃত্যুর দুইদিন আগে বাংলাদেশে আসে এবং ঢাকায় একটা হোটেলে ওঠে।'

'মহিলা কী বাংলাদেশের নাগরিক?' শারিয়ার জানতে চাইল।

'না, সে বাংলাদেশি অরিজিন হলেও ঢাকার হোটেলে সে যে পাসপোর্টের ফটোকপি জমা দিয়েছে সেটা ইংল্যান্ডের। এর মানে সে ইংল্যান্ডের নাগরিক। যাই হোক, সে প্রফেসরের মৃত্যুর আগের দিন সে চট্টগ্রামে আসে। ওঠে নিউ মার্কেটের কাছে একটা হোটেলে। হোটেলের রেজিস্টার এবং সিসিটিভির ফুটেজ থেকে এসব কিছু কনফার্ম করা হয়েছে। এটাও ওখান থেকে জানা গেছে যে, সে ওইদিন মানে, প্রফেসর খুন হওয়ার দিন বিকেলে হোটেল থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। হোটেল থেকে একাধিকবার তার নম্বরে ফোন করে পায়নি। আমরাও হোটেলের রেজিস্টারে

লেখা তার নম্বরে ফোন করে পাইনি। এমনকি তার নম্বর ধরে তাকে ট্রেস করার চেষ্টা করেও শেষ অ্যাকটিভ লোকেশন দেখা গেছে ওই প্রফেসরের বাড়ির কাছেই।'

'তারমানে এটা পরিষ্কার যে, ওই মহিলা ওইদিন ওখানে গেছিল এবং সম্ভবত প্রফেসরের সঙ্গেই দেখা করতে গেছিল সে ওখানে,' রুম্পা আবারও দাঁড়িয়ে বলা শুরু করল। 'সম্ভবত তাকে ওখান থেকেই অপহরণ করা হয়।'

'এটা আমরা ধরে নিচ্ছি,' শারিয়ার মৃদু গলা খাঁকরি দিয়ে বলে উঠল, 'তাহলে এই কেসে এখন পর্যন্ত যে একটি বড়ো প্রশ্নের উত্তর খালি জায়গা ছিল সেখানে উত্তর হিসেবে আমরা পেলাম প্রফেসর আসলে ওইদিন রাতে এই ডক্টর শশীকে পিক করতেই গিয়েছিল। ঠিক?' প্রশ্নটা করে আবারও যোগ করল সে। 'আচ্ছা প্রফেসরের সঙ্গে এই মহিলার কোনো সংযোগ পাওয়া গেছে?'

'গেছে,' আবারও টমি বলে উঠল। 'ইংল্যান্ডে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর পড়েছে এবং পরে কাজ করেছে এই মহিলাও সে-জায়গারই ছাত্রী ছিল এবং এই মহিলা কায়রোতেও প্রফেসরের সঙ্গে কাজ করেছে।'

'তারমানে দাঁড়াল, প্রফেসর ওই বাড়ির বেইজমেন্টে বসে কিছু একটা করছিল এবং একটা পর্যায়ে সে এই মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই মেয়ে প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করতে এলে কিছু একটা ঘটে এবং তাকে কেউ অপহরণ করার চেষ্টা করলে সে সম্ভবত পালিয়ে ওই দিঘির ওদিকে যাওয়ার চেষ্টা করে,' রুম্পা বলতে শুরু করেছে। 'এরপরে সম্ভবত দিঘির ওই দিকে গিয়ে রুম্পা ঢুকে পড়ে পাহারাদারের রুমে। এটা খুবই সম্ভব যে বৃষ্টি হচ্ছিল পাহারাদারও রুমেই ছিল। কিন্তু যারাই মেয়েটার পিছু নিয়েছিল তারাও সেখানে ঢুকে পড়ে। পাহারাদার বাধা দিতে চাইলে কিংবা তারা কোনো সাক্ষী রাখতে না চাইলে লোকটাকে মেরে তারা ডক্টর শশীকে নিয়ে কেটে পড়ে ওখান থেকে,' বলে সে হাতে কাগজগুলোর টেবিলের ওপরে ঠাস করে রেখে দিল। 'প্রফেসর ওইদিন রাতে রাস্তায় কী করছিল সেই জবাব আমরা পেয়েছি,' রুম্পা শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'এখন প্রশ্ন হলো, তিন বছর ধরে প্রফেসর বাড়ির বেইজমেন্টে আসলে করছিল কী?'

শারিয়ার হাত তুলল, 'এটা অবশ্যই এই কেসের সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। কিন্তু এই মুহূর্তে এর চেয়েও বড়ো প্রশ্ন আছে আমাদের হাতে,' বলে সে একটু থামল। কিন্তু সে আবারও কিছু বলার আগেই ওর পাশ থেকে ভুবন বলে উঠল, 'ডক্টর শশীকে ওরা নিয়ে গেছে কোথায়?' বলে সে শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে রইল।

শারিয়ার মৃদু হেসে বলে উঠল, 'একদম ঠিক। এই ব্যাপারে কোনো আপডেট?'

রুম্পা নিজে জবাব না দিয়ে টমির দিকে তাকাল। 'জবাবটা হলো, এই ব্যাপারেও আপডেট আছে। আর আপডেটটা হলো, কোনো আপডেট নেই,' বলে

সে সবার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠল। 'বুঝিয়ে বলছি। আইডিয়াটা ছিল রুম্পা ম্যামের। যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে সেখানকার আশেপাশে আমরা কোনো সিসি টিভি পাইনি। কিন্তু ম্যাডামের পরামর্শেই এলাকাটার রেডিয়াস আমরা বাড়াতে থাকি। ধীরে ধীরে আমরা রেডিয়াস বাড়িয়ে কয়েক মাইল করে ফেলি। এরপরে এর ভেতরে যে কয়টা ক্যামরা আছে সেগুলো লোকেট করি।'

'ভেরি গুড,' আনমনেই বলে উঠল শারিয়ার। কথাটা সে বলেছে রুম্পার দিকে তাকিয়ে। রুম্পা ইশারায় তাকে ওয়েলকাম জানাল। 'এরপর?'

'আমরা প্রথমে রেডিয়াস বাড়িয়ে সব ক্যামেরা লোকেট করি। এরপরে ওই দিঘি এবং এর আশপাশ থেকে বের হওয়ার মতো সম্ভাব্য যত রুট থাকতে পারে সেগুলোকে নির্দিষ্ট করে ফেলি। সেগুলোর অথরিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট সময়ের সিসি টিভি ফুটেজ আনিয়ে পরীক্ষা করে আমাদের টিম,' সে একটু থেমে যোগ করল। 'আসলে এখনো কাজ চলছে। এক্ষেত্রে আমরা দুটো সোর্সের ওপরে নির্ভর করছি। প্রথমত ডক্টর শশীর ফেস রিকগনিশনের জন্য স্ক্যান করা হয়েছে। কিছুই পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, আমাদের লোকেরা ম্যানুয়াল ওয়েতে নিজেরা দেখে দেখে চেক করছে। আমরা এখনো কিছুই পাইনি। ওটার কাজ এখনো চলছে। কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এতে আমরা কিছু নাও পেতে পারি। আর ক্যামেরা থেকে না পাওয়ার এক শ একটা কারণ থাকতে পারে।'

'অহ, কাম অন,' রুম্পা রাগের সঙ্গে বলে উঠল। 'তারা নিশ্চয়ই ওখান থেকে হাওয়া হয়ে যায়নি। কোনো না কোনো দিক দিয়ে তো বের হয়েছেই, তাইনা? কাজেই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে,' রুম্পার গলায় জেদ। 'ওরা তো আর ওখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। কিংবা উড়ে চলে যেতে পারে না।'

শারিয়ার চট করে রুম্পার দিকে ফিরল। 'কি বললেন আপনি?'

শারিয়ার এই কথা বলাতে রুম্পা হঠাৎ একটু অবাক হয়ে গেছে, 'মানে বুঝিনি,' সে অবাক হয়েই বলে উঠল। একবার তাকাল ভুবনের দিকে।

'না মানে শেষ কথাটা কী বললেন? উড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে তাইনা?' শারিয়ার জানতে চাইল।

'আরে আমি দুষ্টুমি করে বলেছি। ওই জায়গা থেকে উড়ে যাওয়া সম্ভব নাকি। এমনকি হেলিকপ্টার আনলেও ওখানে নামানো সম্ভব নয়।'

'না, আমিও সেটা ভাবছি না,' বলে শারিয়ার টমির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল 'টমি, আমাদের ওই জায়গার ম্যাপটা একটু দেখানো যাবে?'

টমি গুগল ম্যাপে জুম করে ওই জায়গায় নিয়ে এলো। তারপর জানতে চাইল, 'কোনটা রাখব? ম্যাপ নাকি আর্থ?'

'আর্থ হলে বেটার,' শারিয়ার বলে উঠে দাঁড়াল। টমি ম্যাপটাকে সেট করতেই সে কাছে চলে এলো। টেবিলের সামনে থেকে মার্কার উঠিয়ে নিয়েছে হাতে। 'সিসি টিভির কাজ চলুক। ওতে কোনো বাধা নেই। কাজটা সময়সাপেক্ষ। আর আমাদের হাতে সময় কম। এমনিতেই কেসের অনেক কাজে। বেশ দেরি হয়ে গেছে এই ক্ষেত্রে আমার একটা থিওরি আছে। আইডিয়াটা আমার মাথায় এসেছে রুম্পার উড়ে যাওয়ার কথাটা থেকে,' শারিয়ার কথাগুলো বলছিল রুমে উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে তারপর সে রুম্পার দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে মাথা নেড়ে কথা বলতে শুরু করল।

'আমরা সূত্র জোড়া লাগিয়ে ওই জায়গা থেকে কেয়ারটেকারের ডেড বডিসহ অনেককিছুই বের করেছি। বিশেষ করে আমাদের ফরেনসিক টিম অনেক কাজ করেছে। কিন্তু আমার কাছে দুটো প্রশ্নের জবাব একেবারেই পরিষ্কার নয়। প্রথমত, দিঘির পাহাড়াদারকে একেবারে মেরে ফেলা হলো কেন?'

ভুবন হাত তুলল। 'হয়তো তারা কোনো সাক্ষী রাখতে চায়নি। মানে ব্যাপারটা আমি যেটা বুঝতে পারছি। ওইদিন প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করতে গেল ডক্টর শশী। তারপর কিছু হলো প্রফেসর মারা পড়ল ওই লোকগুলো ওদের পিছু নিলো, ডক্টর শশী পালিয়ে চলে গেল দিঘির ওদিকে। ওখানে গিয়ে সে আশ্রয়ের জন্য ঢুকল কেয়ারটেকারের ঘরে। তার পিছু নিয়ে ওখানে সত্যিই ঢুকল ওই লোকগুলোও। এক্ষেত্রে পাহারাদারকে মেরে ফেলার একটা অন্যতম কারণ হতে পারে যাতে সে অন্য কাউকে বলতে না পারে সেটা হতে পারে...'

'একদম, এই কথাটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম,' শারিয়ার তালি দিয়ে উঠল। 'কেয়ারটেকার কী বলতে না পারে?' সে ভুবনের দিকে তকিয়ে আছে।

'মানে, ওরা ওখান থেকে কাউকে ধরে নিয়ে গেছে বা এরকম কিছু,' ভুবন কাঁধ নাচিয়ে বলে উঠল।

'যদি তাই হয়, তারা যদি ওখানে কেয়ারটেকারকে বেঁধে রেখে যায় তাও তেমন সমস্যা নেই। কারণ লোকটাকে মেরে ফেললেও কয়দিন পর কেউনা কেউ তার লাশ পাবে। যদি বেঁধেও রেখে যায় তবুও কেউনা কেউ এসে তাকে খুলবে। কিন্তু কেউ কেন তাকে মারবে?'

'যদি না সে বিশেষ কিছু দেখে ফেলে তবে সেটা সে অন্য কাউকে বলতে না পারে,' রুম্পা বলে উঠল।

'একদম ঠিক,' আবারও তালি দিয়ে উঠল শারিয়ার। 'এখন প্রশ্ন হলো, সেই বিশেষ কিছুটা কী?' বলে সে অফিসার সুমনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'এখানে আমার আরেকটা ব্যাপারে বলার আছে। আপনারা কী খেয়াল করেছেন আমরা ডক্টরের আইডি কার্ডটা কোথায় পেয়েছি, সুমন বলেন তো?'

'নৌকাটার ওপরে,' সুমন বলে উঠল।

'যদি ডক্টর শশী পালিয়ে ওই বাড়িতে ঢুকে থাকে তবে তার আইডি এবং ছোটো পার্সটা নৌকায় গেল কীভাবে? তার ওপরে নৌকাটাও ছিল দিঘিটার মাঝামাঝি। এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছিল। ঠিক?' সে এখনো তাকিয়ে আছে সুমনের দিকে। সুমন মাথা নাড়ল, সঙ্গে ভুবনও। 'ঠিক।'

'তোমরা কেউ কী খেয়াল করেছিলে নৌকাটা ঘাটে বেঁধে রাখার দড়িটা?' সবাই চুপ। 'আমি করেছি ওটা যে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা থাকে সেটা উপরানো ছিল। এর একটাই মানে হতে পারে,' বলে সে থেমে গেল।

'কি সেটা?' রুম্পা জানতে চাইল।

'ওই দিন রাতে নৌকাটা কেউ না কেউ ব্যবহার করেছে।'

'আপনি বলতে চাইছেন শশী? কিন্তু উনি কেন...'

'ডক্টর শশী নয়, আমার ধারণা উনাকে ওইদিন রাতে ওই নৌকায় করে সরানো হয়েছে ওখান থেকে,' শারিয়ার ম্যাপের মধ্যে দেখাল।

'কাম অন মিস্টার শারিয়ার,' রুম্পা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল। 'এ কেমন কথা! ওটা একটা বদ্ধ জায়গা, চারপাশে বাউন্ডারি দেওয়া। ওখান থেকে নৌকায় করে ওরা তাকে কোথায় সরাবে? ওখানে তো দেয়াল ছাড়া আর কিছু নেই।'

'একেবারে ঠিক,' হেসে উঠল শারিয়ার। 'আমিও তাই বলতে চাইছি,' বলে সে প্রজেক্টরের ম্যাপের সামনে চলে এলো। 'দেখেন এই জায়গার একটা বড়ো অংশ বাউন্ডারির সংলগ্ন পানিতে।' বলে সে মার্কার দিয়ে লাইন টানলো। 'অনেকটা জায়গা। আমার বিশ্বাস ওইদিন রাতে পাহারাদারকে খুন করার পর ডক্টর শশীকে যারাই ওখান থেকে কিডন্যাপ করেছে তারা তাকে নিয়ে নৌকাতে উঠে তারপর ওটাকে নিয়ে চলে আসে এই বাউন্ডারির কাছে। এরপর সেখান থেকে দেয়াল টপকে তাকে নিয়ে অন্যপাশে গিয়ে সরে পড়ে। নৌকাটা খোলা থাকার এবং বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাঘুরি করার এটাই ব্যাখ্যা,' বলে সে একটা আঙুল তুলল। 'এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা ডক্টর শশীর পার্টস আর আইডি কার্ডটা ওখানে পাওয়া যাওয়ার। কারণ অন্য কোনো জায়গাতে সুযোগ না পেলেও আমার বিশ্বাস যখন তাকে নৌকায় তোলা হয় কিংবা নৌকা থেকে দেয়ালের অন্যপাশে নেওয়া হয়, কোনো এক ফাঁকে সে জিনিসটা নৌকাতে ফেলে দেয়। আর এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা তাকে অন্য কোনো রুট দিয়ে না সরানোর এবং আমার ধারণা যদি ভুল না হয় আগামী কয়েক ঘণ্টা কেন কয়েক বছরের ফুটেজ ঘাটলেও কোনো সিসি টিভিতে ডক্টরকে সরানোর কিছুই পাওয়া যাবে না। কারণ তাকে কোনো রাস্তা দিয়ে ওখান থেকে সরোনোই হয়নি। তাকে সরানো হয়েছে এখানে এবং এই বাউন্ডারির ওপাশে কী আছে আমি জানি না। এমন হতে পারে ডক্টর শশী এখনো ওই এলাকাতেই আছে।'

টানা অনেকক্ষণ কথা বলে থেমে গেল শারিয়ার। সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। টমি প্রথমে বলে উঠল, 'সম্ভাবনা যাচাইয়ে আমারো মনে হচ্ছে এটা হতে পারে।'

'আমারও,' ভুবন যোগ করল। মুখে কিছু না বললেও রুম্পার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে অফিসার সুমনও হাত তুলল।

'তাহলে আপনি বলতে চাইছেন ওই দেয়ালের ওপাশে কী আছে সেটা জানাটা সম্ভব হলে এই এলাকাটাতে একটা থরো সার্চ করা এখন আমাদের মূল দায়িত্ব?' রুম্পা জানতে চাইল।

'একদম ঠিক,' শারিয়ার বলল। 'এবং কাজটা আজকেই করতে হবে। সম্ভব হলে এক্ষুণি। একটা ব্যাপার সবাই মনে রাখবেন, যারাই ডক্টর শশীকে দূরে নিয়ে গিয়ে থাকুক সম্ভবত তারা কয়েক বছর ধরে প্রফেসর আবদেলকে ট্রেস করার চেষ্টা করছিল, পারেনি। না পেরে তারা তার সম্ভাব্য কাছের মানুষ যাদের সঙ্গে ডক্টর যোগাযোগ করতে পারে, তাদের ওপরে নজর রাখছিল। এরপর ডক্টর আবদেল যখন ডক্টর শশীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন সঙ্গে সঙ্গে ওরা ধরে ফেলে এবং তার পিছু নেয়। ডক্টর আবদেলকে কবজা করতে না পারলেও তারা শশীকে ক্যাপচার করতে সমর্থ হয়। কাজেই এর খুবই ডেসপারেট পিপল। আমাদের এক্ষুণি অ্যাকশনে যাওয়া উচিত।'

রুম্পা টমির দিকে ইশারা করে কিছু নির্দেশনা দিল। তারপর বাকিদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'আমরা দশ মিনিটের একটা কফি ব্রেক নেব।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, এক কাপ কফি এখন অমৃত মনে হবে,' শারিয়ার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল রুম্পাকে।

'আপনাকেও ধন্যবাদ, কেসটাকে একের পর এক সুন্দর ক্লু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য,' শারিয়ার আর রুম্পা পাশাপাশি হাঁটছে। ওদের পেছনে ফোনে কথা বলতে বলতে আসছে ভুবন।

'আরে নাহ, আমি তো আমার কর্তব্য করছি,' শারিয়ার মিটিং রুমের বাইরে পরিবেশিত কাপ থেকে কফি নিতে নিতে বলে উঠল।

'আমি একটা সত্যি কথা বলি,' রুম্পা কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে সহাস্যে বলে উঠল। 'আপনাকে যখন এই কেসে আবারও ইনভলভ করতে হলো ঢাকার নির্দেশে আমি খুবই আনহ্যাপি ছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনি না থাকলে আমরা কোনো থই পেতাম না। আমি ফ্রাংকলি বলছি, আপনার কাজে আমি সত্যি মুগ্ধ। আসলে পিবিআইয়ের ঢাকা উইংয়ের এত সুনাম শুনেছি এতদিন, কথাটা ভুল নয়।'

শারিয়ার কিছু না বলে স্রেফ মাথা ঝাঁকালো।

'আপনার কাছে কী মনে হয় ডক্টর আবদেল আসলে,' সে প্রশ্নটা শেষ করতে পারলে না। মিটিং রুম থেকে কেউ একজন দৌড়ে এসে ডেকে নিয়ে গেল তাকে। 'আসছি বলে সে কফি কাপ হাতে নিয়ে চলে গেল ভেতরে।

'কী ব্যাপার বস? মিষ্টি কথাবার্তা চলছিল দেখলাম,' বলে সে টেবিলের ওপর থেকে বিস্কিট তুলে কামড় বসাল।

'বাজে মিষ্টি আলাপ, আমার ভালো চেহারাটা দেখেছে তো শয়তান চেহারাটা দেখলে ডাণ্ডা মারবে ধরে,' বল সে ভুবনকে টানতে লাগল। 'বারান্দায় চল, বিড়ি খেতে হবে,' বলে সে ভুবনকে টানতে লাগল।

'আরে আরে কফির কাপটা তো নিতে দাও...'

'আর শোন, ওই সুমনকেও নিয়ে আয়। আমি দেখেছি ও বিড়ি খায় লুকিয়ে লুকিয়ে,' বলে সে ফ্লোর সংলগ্ন বারান্দায় এসে দাঁড়াল। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে শুরু করল। ভুবন সুমনকে নিয়ে আসতেই ওদের দিকে প্যাকেট এগিয়ে দিল শারিয়ার।

'আরে বস,' লজ্জা পেয়ে বলে উঠল সুমন।

'রাখো মিয়া, আগে ধরাও, পরে শরম কইরো,' বলে শারিয়ার প্যাকেটটা তার হাতে ধরিয়ে দিল। 'শাস্ত্রে বলা আছে আগে টানলে পরে বাপের নাম। এখন জিগাইয়া না কোনো শাস্ত্রে আছে,' বলে সে হেসে উঠল। ওর সঙ্গেসঙ্গে হেসে উঠল বাকিদুজনও।

'বস একটা কথা বলতাম,'

'একটা ক্যান দুইটা বলো,' শারিয়ার বলল।

'বস...' কিন্তু সে কথা বলার আগেই একজন আর্দালি দৌড়ে এসে জানাল রুম্পা ম্যাডাম ডাকছে সবাইকে।

'চলো চলো দেরি হলে খবর আছে,' শারিয়ার হাতের সিগারেটে জোরে শেষ টান দিয়ে ওটাকে পিষে এগিয়ে যেতে শুরু করল। ওকে অনুসরণ করল বাকিরা। দ্রুত পা চালিয়ে মিটিং রুমে গিয়ে দেখল রুম্পা আর টমি ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করছে। ওদেরকে দেখে রুম্পা বেশ আফসোসের গলায় বলে উঠল, 'সরি গাইজ, নিউজ আছে।'

'কী ব্যাপার?' শারিয়ার চেয়ার টেনে বসতে বসতে জানতে চাইল।

'ভালো খবর হলো, বাউন্ডারির ওপাশে কী আছে এবং ওটার মালিক কে আমরা বের করে ফেলেছি। আর খারাপ খবর হলো ওটার ওপাশটা অত্যন্ত প্রভাবশালী একটা পরিবারের সম্পত্তি। ওটা মূলত কনটেইনার রাখার জায়গা আর ওটার সঙ্গে বিরাট এলাকা জুড়ে আছে জাহাজ ভাঙার ইয়ার্ড। আরো খারাপ খবর

হলো, ওইখানে ওয়ারেন্ট ছাড়া কোনো কিছুই করার উপায় নেই। আর ওয়ারেন্ট পেতে পেতে কমপক্ষে কাল দুপুর,' রুম্পা আফসোসের সঙ্গে বলে উঠল।

'কিন্তু আজ এরকম দেরি হওয়া মানে অনেক কিছু দেরি হয়ে যাওয়া,' শারিয়ার কিছু বলার আগে ভুবন বলে উঠল ওর পাশ থেকে।

'কিন্তু কিছু করার নেই, ওই জায়গাতে হাত দেওয়া মানে আগুনে হাত দেয়া,' রুম্পা জানাল। 'এমনিতেই যারা ওটার মালিক এরা খুব ফাজিল প্রকৃতির। তার ওপরে এসব ডকইয়ার্ড কন্ট্রোল করে শ্রমিকরা। যারা আবার অ্যাসোসিয়েশন মেইনটেন করে। কাজেই...' রুম্পা তার কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল।

'কিন্তু...' সুমনও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই বসা থেকে শারিয়ার বলে উঠল। 'যাক গে, কী আর করা,' বলে সে উঠে দাঁড়াল। 'কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। আর সবাই আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি। শরীর এবং মাথা ঠিকমতো কাজ করানোর জন্য হলেও বিশ্রাম দরকার আমাদের,' বলে সে রুম্পার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিয়ে সবার অবাক দৃষ্টি উপেক্ষা করে বেরিয়ে এলো মিটিংরুমের বাইরে। বাইরে বেরিয়ে সোজা চলে এলো একটু আগের বারান্দায়।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে প্রকৃতি দেখছিল, পেছন থেকে ভুবনের অবাক গলা শুনে ফিরে তাকাল। 'তুমি সত্যি সত্যি বিশ্রাম নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছো?' তার গলায় চূড়ান্ত কৌতূহল। সুমনও অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ওদের দুজনার দিকে তাকিয়ে শারিয়ার বলে উঠল। 'ভুবন তোর লোকাল কানেকশন কেমন রে? আমার একটা হেল্প লাগবে,' বলে সে সুমনদের দেখাল। 'তোমারও।'

ভুবন এবার ভিন্ন প্রকৃতির অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'তাই নাকী? কী বিষয়ে হেল্প? ' বলে সে একবার সুমনকে দেখে নিয়ে জানতে চাইল।

শারিয়ার জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে উঠল। 'একটু আগে বলেছিলাম না শয়তানি। সেই শয়তানি করার সময় এসে গেছে।'

অধ্যায় ত্রিশ

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

সন্দ্বীপ, দক্ষিণ উপকূল এলাকা, চট্টগ্রাম

সামনের পাকা বাড়িটার আঙিনাতে বেশ অস্বস্তির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে কিরান। আশেপাশে সাজগোজ করা নানা ধরনের মেয়ে মানুষের মেলা বসেছে যেন।সেই সঙ্গে খদ্দেরেরও কোনো অভাব নেই। মেয়ে যেমন আছে নানা বর্ণের, নানা ধরনের, নানা রঙের ঠিক তেমনি আছে নানা ধরনের, নানা বর্ণের আর নানা পদের খদ্দের। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে কিরান আরো একবার চারিদিকে তাকাল। এই ব্যাটা ওকে এখানে কেন নিয়ে এলো কিছুতেই বুঝতে পারছে না সে। কিরান দেখল ওর সঙ্গে লাঠিয়াল ভিখু আর মধুও একইরকম অস্বস্তির সঙ্গে আশেপাশে তাকাচ্ছে। কিন্তু কিরান অত্যন্ত অবাক হয়ে খেয়াল করল, গোমেজ বেশ হাসি আনন্দের সঙ্গে চারিদিকে দেখছে। আশেপাশে ঘুরতে থাকা মেয়েদের সঙ্গে বেশ হাসিমুখে এটা-সেটা ইশারা করছে আর সেই সঙ্গে হাত নাড়ছে। কিরান মৃদু স্বরে গোমেজকে ধমক লাগাল। কিন্তু গোমেজের কোনো বিকার নেই।

কিরান অনুধাবন করতে পারছে এখানে অকারণে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। হয় ওদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে, আর না হয় ভেতরে ঢুকতে হবে। হাতের মুঠোয় আকরাম বেগের দেওয়া চামড়ার থলেটা চেপে ধরে সে চাপদাড়ি ভিখুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ভিখু, আমরা ভেতরে ঢুকব। সাবধানে থাকিস।'

'হুজুর, ভেতরে,' বলে সে একবার অস্বস্তির সঙ্গে কিরানকে দেখল তারপর ফিরে তাকাল তার সঙ্গী মধুর দিকে। 'হুজুর, আপনে নিশ্চিত এইখানে আইতে কইছে আকরাম বেগ হুজুরে?'

কিরান একটু রাগের সঙ্গেই ফিরে তাকাল ভিখুর দিকে। 'সবকিছু তো তোগো চোখের সামনেই অইলো। দেখলিই তো। আকরাম চাচা যার কাছে পাঠাইছো, তার কাছেই গেলাম। আর হের লুকেরাই তো এইখানে দিয়া গেল আমগো। চল,' বল দুরুদুরু বুকে ভেতরের দিকে ইশারা করল সে। এই পতিতালয়ে এলেও একটা ব্যাপার ভেবে স্বস্তি লাগছে যে, এটা ওর পরিচিত এলাকার বাইরে। এখানে অন্তত

ওর পরিচিত কেউ দেখতে পাবে না। চট্টগ্রাম কিংবা রামু অথবা রাউজানে হলে কেউ দেখে ফেললে মান-ইজ্জত আর কিছু থাকত না। কিরান গোমেজকে একহাতে ধরে ভেতরের দিকে হাঁটা দিল। পাকা বাড়িটার বাইরে থেকে যতটা ছোটো মনে হচ্ছিল ভেতরে ঢুকে কিরান অবাক হয়ে খেয়াল করল, ভেতরটা আরো অনেক বড়ো। ভেতরে একটা গোল অঙ্গিনার মতো। সেটাকে ঘিরে ছোটো ছোটো খোপের মতো ঘর। গোল হয়ে ঘিরে থাকা আঙিনাটাতে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, কথাবার্তা বলছে আর খদ্দেরদের সঙ্গে বনিবনা হয়ে গলে গিয়ে ঢুকে পড়ছে কোনো না কোনো খোপের ভেতরে। কিরান আরো অবাক হয়ে দেখল এখানে সাদা চামড়া আর বিদেশি খদ্দেরই বেশি।

'এইখানে কেউ বুঝি বেটাগো হাত ধরার লাইগ্গা আসে?' কিরান আঙিনাটাতে চোখ বুলাচ্ছিলো পেছন থেকে একটা নারী গলা সহাস্যে বলে উঠল। তার সঙ্গে গলা মেলাল একাধিক নারী কণ্ঠস্বর। কিরান ফিরে তাকিয়ে দেখল লাল রংচঙে পোশাক পরা একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে আরো দু-তিনজন। 'নিজের বন্ধুর হাতই ধরাবা, তাইলে ইয়ানে আইছো ক্যান?' আবারও সহাস্যে বলে উঠল সে। তার পাশ থেকে আরেকজন বলে উঠল। 'মরদে মনে অয় ডরাইতাছে,' আরেকদফা হাসির হুল্লোড় উঠল।

কিরান অস্বস্তির সঙ্গে গোমেজের হাত ছেড়ে দিল। সে মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই পেছন থেকে রুক্ষ গলার স্বর শুনে চমকে উঠল সবাই। 'এই বান্দির দলেরা কী করতাছে ইহানে?' কিরান ফিরে তাকিয়ে দেখল অতিরিক্ত সাজগোজ করা নারী দেহের ওপরে পুরুষ একটা মুখমণ্ডল থেকে গলার স্বরটা বেরিয়ে আসছে। কিরান অবাক হয়ে দেখল একটা হিজড়া। হিজড়াটার ধমক খেয়ে মেয়েগুলো সরে গেল। হিজড়াটা হাসি মুখে এগিয়ে এলো কিরানদের দিকে।

'আরে, হুজুর, আদাব,' বলে সে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রায় কুর্নিশ করে উঠল। 'হুজুর, ভেতরে না আইলে ক্যামনে খিদমদ করব কহেন।'

কিরানের পোশাক-আশাক আর ওর সঙ্গে আসা লাঠিয়ালদের দেখে সে তাকে বড়ো কোনো ব্যবসায়ী ভেবেছে। কিরান তার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে কঠিন স্বরেই বলে উঠল, 'আমি আছিয়া নামে একজনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

আছিয়া নামটা শুনে হিজড়াটার মুখের হাসি এক মুহূর্তের জন্য মলিন হয়েও আবার ফিরে এলো সেটা। 'হুজুর আছিয়া ক্যান, জমেলা, ফাতেহা যারে চান তার লগে মোলাকাত করানো যাবে। আগে আসেন, একটু গলা ভিজান তারপর,' বলে সে কিরানের একটা হাত ধরে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে এলো।

কিরান ঝট করে ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিল। 'আমি তোমগো খদ্দের না। এক্ষণ আমারে আছিয়ার কাছে নিয়া চলো, আমি মজাক করতাছি না।' কিরান কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে হিজড়াটার দিকে। হিজড়াটা কিরানের ধমক খেয়ে বিগলিত দৃষ্টিতেই তাকিয়ে ছিল হঠাৎ তার দৃষ্টিটা পরিবর্তন হয়ে প্রায় একইরকম কঠিন হয়ে উঠল।

'জাহাজি, মনে রাইখো বাড়ি থেইকা অনেক দূরে আছ তুমি,' বলে সে লাঠিয়াল আর গোমেজকে দেখাল। 'এইখানে গরম দেখায়া কেউ পার পায় না। আছিয়া এই পাড়ার প্রধান, চাইলেই হের লগে দেখা করা যায় না। হেরে তুমার কী দরকার?

কিরান নিজের দুইহাত তুলল। 'আমি এইহানে ঝামেলা পাকাইতে আসি নাই। আমি কামে আসছি। আমি আছিয়ারে দরকারেই খুঁজতাছি,' বলে সে হাতের মুঠোয় থাকা থলে থেকে গোল করে রাখা চামড়ার টুকরোটা ধরিয়ে দিল হিজড়াটার হাতে। কিরানের দিকে একইরকম কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে জিনিসটা হাতে নিয়ে খুলে ফেলল। সে এখনো তাকিয়ে আছে কিরানের দিকেই, ওটা খুলে তাকাতেই মুহূর্তের জন্য সে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। তারপর তার দৃষ্টি পরিবর্তন হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। চট করে জিনিসটা হাতের মুঠোয় লুকিয়ে ফেলল সে, তারপর আশেপাশে দেখল। 'সর্দার কী মরার তাল করছো? আসো আমার সঙ্গে,' বলে সে একরকম তড়িঘড়ি করে রওনা দিল ভেতরের দিকে। কিরান একবার লাঠিয়াল দুজনকে দেখে নিয়ে গোমেজকে ওর পিছু আসতে বলে রওনা দিল হিজড়াটার পিছু পিছু। হিজড়া ওদেরকে নিয়ে আঙিনা পার হয়ে চলে এলো বাড়িটার পেছন দিকে।

কিরান দেখল বাড়িটার এদিকটা আরো অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ। এদিকটা আসলে নাচঘর আর উচ্চ বিত্ত খরিদ্দারদের জন্য। হিজড়াটা এগিয়েই চলেছে, কিরান পেছন থেকে একটা প্রশ্ন করতে চাইছিল কিন্তু সে পিছু ফিরে কিরানকে চুপ থাকতে বলল। তারপর ওদেরকে নিয়ে বাড়ির পেছনের অংশটা ঘুরে চলে এলো একেবারে পেছন দিকে। নিচে নাচঘর থেকে মানুষের উচ্চকিত স্বর ঘুঙরুর শব্দ আর গানের আওয়াজ ভেসে এলো। ওটার একপাশে কিরান লোহার মইয়ের মতে লাগানো। দেখল হিজড়াটা সেটা দিয়ে উঠতে শুরু করল। কিরানও পিছু নিল। ওরা ওপরে উঠে আসতেই দেখল নিচের ঘরের ওপরে ছোটো একটা কামরার মতো বানানো। সেটার সামনে পালোয়ানের মতো একজন লোক বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কিরানরা এগিয়ে যেতেই সে বল্লমটা এক হাত থেকে অন্য হাতে নিয়ে ওদেরকে উঠতে মানা করার জন্য হাত বাড়াতে যাচ্ছিল কিন্তু হিজড়াটা তাকে মানা করল। তারপর কিরানের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আইসো সর্দার। আছিয়া বানু এইখানেই আছে। সাবধানে কথা কইবা,' বলে সে চামড়ার জিনিসটা নিয়ে ভেতরে

ঢুকে গেল। তার ঠিক পেছনেই ঢুকে গেল কিরান। ভেতরে ঢুকে দেখল ভেতরের কামরাটা বেশ রঙিন আর আলোতে ভরপুর। কামরার ভেতরে এখানে ওখানে ঝুলছে নানা ধরনের রঙিন ঝালর আর রঙিন কাচ আর পুতির কারুকাজ করা দেয়াল চিত্র। রুমের একপাশে একটা লম্বা বিছানার মতো পাতা শতরঞ্জি আর সামনের দুপাশে গদিটা লম্বা জলচৌকিতে বসার ব্যবস্থা। প্রতিটা শতরঞ্জি আর জলচৌকির সামনে সুরাপাত্র আর গড়গড়ার ব্যবস্থা রাখা আছে।

যদিও কামরায় এই মুহূর্তে তেমন কেউই নেই কিন্তু বিছানার মতো বসার জায়গাটাতে রঙিন ঘাগড়া আর এক বস্তা অলংকার পরা এক মহিলা বসে আছে। মহিলার এক হাতে গড়গড়ার নল, অন্যহাতে কিরানের নিয়ে আসা সেই চামড়ার জিনিসটা। তার কানের কাছে হিজড়াটা ফিসফিস করে কিছু একটা বলছে। মহিলার মুখ পানের রসে লাল হয়ে আছে। কিরানরা ভেতরে ঢুকতেই মহিলার পেছন থেকে দুজন মুশকো পালোয়ানের মতো দেখতে লোক সামনের দিকে এগিয়ে এসে দুপাশে দাঁড়িয়ে গেল। কিরান কামরায় ঢুকে প্রথম এদের দেখেনি কারণ সম্ভবত এরা অন্ধকারের ভেতরে ছিল।

মহিলা ওদেরকে দেখেও দেখল না যেন। হিজড়াটা কথা শেষ হতেই সে কানে-কানে হিজড়াটাকে কিছু বলল। হিজড়াটা তাকে কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল। হিজড়াটা বেরিয়ে যেতেই মহিলা খানিকটা এগিয়ে এলো। কিরান দেখল মহিলার বয়স ষাটের কম না, টকটকে ফরসা গায়ের রং আর টিকালো নাক দেখে বোঝা যায় মহিলা একসময় দুর্দান্ত সুন্দরী ছিল। সে সন্দেহের দৃষ্টিতে চামড়ার জিনিসটাতে আরেকবার চোখ বুলাল তারপর কিরানের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'তুমি সর্দার তৈমূরের পোলা?' মহিলাকে না দেখে চট করে যদি কেউ তার গলা শোনে তবে ভাবতে পারে কোনো পুরুষের গলা শুনছে।

কিরান এক পা সামনে এগিয়ে গেল। 'জি,আমি...'

'তুমার বাপের লগে তো দেহি চেহারার কোনো মিলই নাই,' মহিলার গলা শুনে বোঝা যাচ্ছে সে তালেব তৈমূরকে খুবই ভালোভাবে জানত। এতে করে কিরান কী খুশি হবে না বেজার হবে ঠিক বুঝতে পারল না। একটা গণিকালয়ের প্রধানের সঙ্গে তার বাবার সম্পর্কে খুশি হওয়া উচিত কিনা কিরান জানে না। 'আমি তার পালক সন্তান ছিলাম,' দৃঢ় গলায় বলে উঠল কিরান। 'আপনি...'

'বসো,' বলে সে কিরান আর ওর পেছনের সবাইকে নির্দেশ করল। 'তুমি আবার খারাপ কিছু ভাইবো না। তুমার বাপেরে আমি বড়ো ভাইয়ের মতো সম্মান করতাম। হেয় না থাকলে...যাগ্গা। তুমারে এইডা কে দিসে?' বলে সে চামড়ার জিনিসটা দেখাল।

'আকরাম বেগ। আমরা আসলে...'

এবারও কিরান বাক্য শেষ করার সুযোগ পেল না। তার আগেই মহিলা আবারও কথা বলে উঠল। 'তুমি কী জানো এইটা কী?' বলে সে জিনিসটা কিরানের দিকে ছুঁড়ে দিল। কিরান এই প্রথমবারের মতো জিনিসটার গায়ে নিজ থেকে চোখ বুলাল এবং একটু অবাকই হলো সে। পালিশ করা পাতলা চামড়ায় গায়ে একটা নিশান আঁকা। দুইপাশে দুটো তলোয়ারের মাঝখানে একটা পদ্ম ফুল। 'না, আমি জানি না এইটা কি,' কিরান তাকিয়ে আছে মহিলার দিকে।

'ভালো, না জানা তুমার জন্য ভালো,' বলে সে গড়গড়ায় টান দিল। 'এট্টু বসো, তুমার ব্যবস্থা অই যাইতাছে...'

এবার কিরন একটু রেগে উঠল সেই সন্ধ্যে থেকে এর কাছে ওর কাছে এদিকে-ওদিকে বারবার যেতে যেতে রাগ উঠে গেছে ওর। 'আসলে এইখানে হইতাছেটা কী বলেন তো?'

মহিলা হেসে উঠল। 'শোন পোলা, যার যট্টুকু জানা দরকার হে ওট্টুক জানাই ভালো। বেশি জানার দরকার নাই,' বলে সে ওদের মাথার পেছনে কারো উদ্দেশ্যে ইশারা করল। 'যাও, ওগোরে নিয়া যাও। আসল কতা যার বলার হে-ই কইবে।'

কিরান উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বের হওয়ার জন্য। বাকিদেরকেও ইশারা করল, কিরানের মনে হলো দরজার কাছে হিজড়াটাকে পলকের জন্য দেখতে পেল সে কিন্তু বাইরে বেরিয়ে কাউকে দেখতে পেল না ওরা। ব্যাপার কী? নিচে তাকিয়ে দেখল মইয়ের নিচে দাঁড়িয়ে আছে সে। কিরান মই বেয়ে নামতে শুরু করল ওর পেছনে গোমেজ আর লাঠিয়ালরা। প্রায় নেমে এসেছে এমন সময় শপাং করে কিছু একটা এসে লাগল মইয়ের নিচের অংশে। তীব্র টানের চোটে কিরানের মনে হলো ওর শরীরটা শূন্যে উঠে গেছে। তারপর পপাত ধরণীতলে মাটিতে আছড়ে পড়ল ও। মাটিতে পড়ে মুহূর্তের জন্য বেকুব হয়ে গেলেও ব্যথা পায়নি ও। উঠে দাঁড়ানোর জন্য সোজা হয়েই অনুভব করল ওদেরকে ঘিরে ফেলেছে একদল অস্ত্রধারী। ওকে মাটি থেকে উঠতে হলো না, কেউ একজন টেনে তুলে ফেলল ওকে। কিরান দেখল গোমেজসহ বাকি দুজনারও একই অবস্থা।

কিরানকে মাটি থেকে টেনে তুলে সোজা করা হলো। আট-দশ জনের একটা দল। সবার পরনে কালো পোশাক, মাথা থেকে শুরু করে মুখ সব ঢাকা। ওকে টেনে সোজা করতেই চাবুক হাতে এক অস্ত্রধারী এগিয়ে এলো ওর দিকে। এই লোকটাই সম্ভবত মইয়ে চাবুক পেঁচিয়ে টান দিয়েছিল ওটাকে আলগা করে দেয়ার জন্য। কিরান নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলেও শক্তিশালী হাতের কারণে পারল না। চাবুকধারী মানুষটা ওর দিকে এগিয়ে একেবারে সামনে এসে কিরানের চোখ বরাবর তাকাল। তারপর খুলে ফেলল। নিজের মুখের আবরণ। কিরান অবাক হয়ে দেখল

মানুষটা একজন মহিলা, আরো ভালোভাবে বলতে গেলে একটা মেয়ে। সে আরো অবাক হয়ে উপলব্ধি করল এই মেয়েটাই তখন আঙিনার মুখে ওকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল। কিরান চারপাশে তাকিয়ে আরো অবাক হয়ে অনুধাবন করল ওদেরকে যারা ধরে রেখেছে তারা সবাই মেয়ে। হঠাৎ একটা ভাবনা খেলে গেল ওর মাথার ভেতরে। সঙ্গেসঙ্গে অনেক হিসেব মিলে গেল ওর। এত ঢাক গুড়গুড় এত গোপনীয়তা সব পরিষ্কার হয়ে এলো ওর কাছে। সে অবাক গলায় বলে উঠল, 'তুমরা তুমরা... দস্যু পদ্মরাণীর দলের লোক?'

কিরান এ-কথা বলতেই সামনের মেয়েটা হেসে উঠল। 'জাহাজি, আমরা কারা তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অইলো, তুমি যদি তালেব কিরানের পোলা অই থাকো তয় তুমরা দেরি কইরা ফালাইছো। তুমার বাপের খবর যার কাছে আছিল সে ধরা পইড়া গেছে শত্রুর হাতে। আইজ রাতে তার ফাঁসি দেওয়া হইবে,' ভাবলেশহীন গলায় বলে উঠল দক্ষিণের সমুদ্রের একমাত্র নারী জলদস্যু দল পদ্মরানির দলের মেয়েটা।

***

হাম্মামখানার ভেতরে যাওয়ার সময় গোলন্দাজ রঙ্গন আর তার দল আশা করেছিল এখানে তথ্য পাবে কিন্তু এসে পেল মালিকের লাশ। তার ওপরে আবার অন্য কামরা থেকে শব্দটা ভেসে আসতেই সচকিত হয়ে উঠল গোলন্দাজের দলের লোকেরা। গোলন্দাজ যদিও এসব থেকে দূরে আছে আজ অনেকদিন কিন্তু নিজের জীবনের বিশ বছরেরও অধিক সময়ে পার করেছে এসব কাজে। কাজেই কখন কোথায় কী করতে হবে সে বেশ ভালোভাবেই জানে।

শব্দটা ভেসে আসামাত্রই সে নিজের লাঠিয়াল দুজনকে সাবধান করে দিল। ওরা তার দুপাশে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মাঝখানে সে, ওদের পেছনে বৈঠা আর বিল্লাল শেঠ। তারপর ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল দরজা দুটো যেদিকে সেদিকে।

কামরার অন্য প্রান্তে দুপাশে দুটো দরজা। দুটো দরজার কোনোটার অন্যপাশ থেকে শব্দ এসেছে ওরা জানে না। কাজেই রঙ্গন প্রথমে লাঠিয়াল দুজনকে প্রস্তুত থাকতে বলে বাম পাশের মানে প্রথম দরজাটাতে নিজের হাতের বন্দুকের নল দিয়ে ঠেলা মারল। দরজাটা খুলে যেতেই গোলন্দাজ দেখল অন্যপাশে একটা লম্বা আর ফাঁকা বারান্দা আছে, সেদিকে কেউ নেই। এরমানে হিসেব পরিষ্কার। যদি এখানে কেউ থেকে থাকে তবে সে আছে অন্য দরজাটার ওপাশে। আবারও ঘুরে দাঁড়িয়ে

গোলন্দাজ ইশারা করল নিজের লোকদের। ওদেরকে প্রস্তুত থাকতে বলে সে অন্য দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল। ওপাশে কে আছে কারা আছে বা কয়জন আছে জানা নেই। কাজেই যতটুক সম্ভব সাবধানে থেকে দরজাটায় একটা ঠেলা মারল।

দরজার ওপাশে একটা ছোটো রসুইঘরের মতো। আসলে রসুইঘর না, কারণ এসব বাড়িতে রসুইঘর হয়ে থাকে বাড়ির বাইরে। এখানে যে কামরাটা আছে সেটা আসলে একটা গোলাঘরের মতো। এ-ধরনের কামরায় সাধারণত বিভিন্ন জিনিস রাখা হয়ে থাকে, একইসঙ্গে এখান থেকে অন্যান্য কামরায় বা জায়গা অতিথিদের আপ্যায়নের বিভিন্ন জিনিস রাখা থাকে। কামরাটা ছোটো কিন্তু চিকন আর লম্বা। গোলন্দাজ ঠেলা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললেও প্রথমে ভেতরে কাউকে দেখতে পেল না। কিন্তু কামরার ভেতরে পা রাখতেই মেঝেতে পায়ের ছাপ দেখতে পেল। রক্তমাখা পায়ের ছাপ চলে গেছে দেয়ালে ঝোলানো একটা বেতের দেয়াল পর্দার আড়ালে।

গোলন্দাজ ফিসফিস করে নিজের দুই লাঠিয়ালকে এগোতে বলল। ওরা দুজন সামনে এগিয়ে জিনিসটার সামনে দাঁড়াল তারপর গোলন্দাজের দিকে ইশারা করে একটানে ওটাকে তুলে ফেলল শূন্যের ওপরে। আর গোলন্দাজ বন্দুক তাক করল ওটার মাঝ বরাবর। কিন্তু ওটার ভেতরে যা দেখতে পেল সেটা দেখার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না মোটেও।

দেয়াল আর তাকগুলো আড়াল করার জন্য। ছোটো এই রসুইখানার দেয়ালের বেতের ঝালড় ঝোলানো ছিল সেই ফাঁকে একজন ছোটোখাটো মানুষ গুঁটিসুঁটি মেরে বসে ছিল, গোলন্দাজসহ ভয়ংকর দুজন মানুষকে বন্দুক হাতে ওটার সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে এক লাফে হাউ-মাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে একেবারে মাটিতে বসে পড়ল। তারপর প্রায় চিৎকার করে বলতে লাগল, 'হুজুর, হুজুর আমারে মাইরেন না। আমি খালি একজন তদারক।'

গোলন্দাজ উঁচিয়ে ধরা বন্দুকটাকে নামিয়ে নিল, তারপর ওদের পেছনে থাকা বিল্লাল শেঠ আর বৈঠাকে ইশারা করল লোকটাকে শান্ত করার জন্য। বিল্লাল শেঠ এগিয়ে এলো লোকটার দিকে। 'আরে তকি মিয়া, তুমি এইখানে কী করো? ওস্তাদ সফদরের কী অইলো? হেরে মারল কেডা?'

মাটিতে শুয়ে পড়া তকি মিয়া প্রথমে মুখ তুলে তাকিয়েও বিল্লাল শেঠকে চিনতে পারল না। তারপর চিনতে পেরে সে তাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করতে লাগল। রঙ্গন মল্লিক খানিকটা বিরক্ত হলেও বুঝতে পারছে লোকটা আসলে ভয়ের চোটে এমন করছে। 'ওরে ঠাণ্ডা করো, পানি খাওয়াও তারপর জিগাও এইহানে কী অইছে।'

সে ইশারায় লাঠিয়ালদের বলল বাইরে পাহারা দিতে। কেউ এলে সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে সাবধান করে দিতে। গোলন্দাজ এটা বুঝতে পারছে, এখানে যাই হয়ে থাকুক না কেন বড়ো কিছু একটা ওদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু এখনো কিছু জানার সুযোগ আছে হয়তো।

তকি মিয়াকে পানি খাওয়ানো হলো। তাকে খানিকটা শান্ত করে যা জানা গেল সেটা অনেকটা এরকম। আজ বিকেল থেকে হাম্মামখানা বন্ধ করে সফদর পাটোয়ারি কারো জন্য অপেক্ষা করছিল। কারণ কাদের নাকি আসার কথা ছিল। গোলন্দাজ বিল্লালের দিকে তাকাল। সে বুঝতে পারছে ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিল সে। কিন্তু এরপরে যা শুনল সেটা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে।

'ওস্তাদে কয়েকদিন ধইরা একজনরে লুকায়া রাখছিল, হেরে এইহানে রাখা মুশকিল অইতেছিলে তাই হেয় ভাবছিল হেরা আইলে হেগের কাছে উঠায়া দিব হেরে,' তকি মিয়া এইটুক বলতেই গোলন্দাজ তার দিকে এগিয়ে গেল । একবার বিল্লার শেঠের দিকে দেখে নিয়ে সে তকির কাঁধে হাত রাখল, 'কারে লুকায় রাখছিল হেয়?'

'আমি সঠিক জানি না হুজুর,' তকি হাত জোড় করে বলতে লাগল। 'তয় এইটা জানি হেয় আরাকান থেইকা আসছিল। হেরেই লুকায় রাখছিল।' গোলন্দাজ বিল্লালের দিকে তাকালে বিল্লাল কাঁধ ঝাঁকাল, সেও কিছু জানে না এই ব্যাপারে।

'তারপর?' গোলন্দাজ তাড়া দিল তকিকে। 'বিকালের পরে এরপর একদল লুক আইলো। প্রথমে ওস্তাদ ভাবছিল হের লুকেরা আইছে। কিন্তু যারা ঢুকলো হেরা এইহানেরই লুক। হেরা রোসাঙ্গের রাজার লুক। হেরা আইসা প্রথমে ওস্তাদরে মারল। তারপর ভেতরের কামরা থেইকা হেই লুকানি মানুষটারে বাইর করল। তারপর হেরে নিয়া চইলা গেল। আমি পুরা সময় লুকায়া আছিলাম। লুকায়া লুকয়াই শুনলাম হেরে আইজ ফাঁসি দিব সুলতানের বাজারে।'

গোলন্দাজ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বৈঠার দিকে। 'ব্যাপার কী? কাকে এনে লুকিয়ে রেখেছিল সফদর পাটোয়ারি? তুমি কী কিছু জানো?'

'আমি জানি না হুজুর, আমি খবর পাঠাইছিলাম ওস্তাদরে যে, আকরাম বেগের হয়ে এখানে আজকের দিকে খবর নিতে আসব আর কিছু জানি না।'

গোলন্দাজ চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকাল ওদের দুজনার দিকে। 'আমি জানি না কাকে ধরে এনে রেখেছিল পটোয়ারি কিন্তু সে যেই হোক তার কাছে তালেব চাচার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। এমনও হইতে পারে, সে তালেব চাচার সঙ্গেই রোসাঙ্গ থেইকা আসছিল,' বলে সে বৈঠার দিকে তাকাল। 'কিরান আর দলের বাকিগো খবর দিতে পারলে ভালো অইতো কিন্তু সেইটা তো সম্ভব না। কিন্তু

আমগো কিছু একটা করতে হইবে। এছাড়া উপায় নাই,' এইটুকু বলে সে একটু থেমে যোগ করল 'সুলতানের বাজারে যাইতে হবে। এই ফাঁসি ঠেকাইতে হবে যেমনেই হোক।'

***

গোলন্দাজ যোদ্ধা আর নেতা মানুষ। তার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়াটা যতটা সহজ বেদু আর তুলারামের মতো মানুষদের জন্য সেই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ঠিক ততটাই কঠিন। কারণ একে তো ওদের ভেতরে নেতা গোছের কেউ নেই। এছাড়া এরা মাঠের মানুষ কাউকে, মারতে বললে বা ঠেঙাতে বললে এদের জন্য যতটা সহজ, কোনো মাথা খাটানোর কাজ করতে বললে সেটা ওদের জন্য ঠিক ততোটাই কঠিন। আর এ-কারণেই ওদের ভেতরে একটা গোল বেঁধেই আছে।

যেই মুহূর্তে ওরা জানতে পারল আজ সুলতানের বাজারে কারো ফাঁসি দেওয়া হবে প্রথমে ওদের জন্য সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল কিন্তু পরমুহূর্তে ওরা আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারে যেগুলো ওদের কাছে পুরো ব্যাপারটাকে আরো অনেক বেশি ঘোলাটে করে তোলে। সেই সঙ্গে তারা এই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে শুরু করে যে, ওদের আসলে কী করা উচিত।

চণ্ডুখানায় বসে যে লোকগুলো ওদের পেছনে বসে কথা বলছিল তাদের কাছ থেকে ফাঁসির ব্যাপারটা জানতে পারে। সেই সঙ্গে এটাও জানতে পারে যে, ফাঁসিটা আজই কার্যকর হবে। তারপর যে লোকটা ওদেরকে চণ্ডু দিয়ে গেছে তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করার পর আরো বিস্তারিত জানতে পারে ওরা। লোকটা বিদেয় নিতেই তুলারাম বেদুকে ইশারা করে ওদের পেছনে যে লোকগুলো আছে তাদের সঙ্গে খাতির জমানোর চেষ্টা করে।

তুলারাম প্রথমে লোকগুলোর দিকে ঘুরে বসে বেশ আগ্রহের সঙ্গে বলে ওঠে, 'জনাব, আপনারা কী এই জাগারই বাশিন্দা?'

দুই বুড়োর ভেতরে একজন তুলারামকে পরখ করে বলে ওঠে। 'আর কোথায়? আইজ থেকে বিশ বছর আগে আসছিলাম বাড়ি থেকে পলায়ে জাহাজের খালাসি হয়ে। ভাবছিলাম বছর এক দুই থাইকা চলে যাবো। আর পাইলাম কই? বিশ বছর পার হয়ে গেল,' বলে সে তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। তুলারাম লোকগুলোকে ভালো করে পরখ করল। পরনে সাধারণ পাজামা আর কাফতান। খুব বেশি পয়সাওয়ালা মনে হচ্ছে না। অবশ্য খুব বেশি পয়সাওয়ালা হলে এই রাস্তার পাশের চণ্ডুখানাতে আসতোও না এরা। তুলারাম হেসে উঠে ওদের জন্য

আনা চণ্ডু বুড়ো দুজনকে সাধতেই ওরা খুশি হয়ে ওঠে। ওরা ঘুরে বসে বুড়ো দুজনার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়।

বেদু বলে ওঠে, 'জনাব, আপনেগো জায়গাটা দারুন। আমরা আইজিই প্রথম এলাম এহানে। মালিকেরা গেছে অমোদ করতে, আমরা ঘুরে বেড়োাইতেছি।'

'বড়ো ভালা দিনে আইয়েছেন,' অপর বুড়ো বলে ওঠে। 'আইজ এহানে বিরাট ঘটনা ঘটতে যাইতেছে।'

তুলারাম বেদুর পাঁজরে কনুই দিয়ে সামান্য গুঁতো মারে। 'তাই নাকি জনাব, ব্যাপারটা আসলে কী?'

বুড়ো চণ্ডুর নলে টান দিয়ে নেশার ঘোরে গড়গড় করে কথা বলতে শুরু করে। 'আর কইয়েন নাই। আরাকানি আর আর চাঁটগাইয়াগো রাজনীতি এহানটারে শেষ করে দিচ্ছে। তাই ঝামেলা শেষ নাই।'

'আরে এনু ঝামেলার কী আছে?' বলে প্রথম বুড়ো বেদুর পিঠে জোরে একটা চাপড় মারল। 'বিরাট কাহিনি অইছে এহানে। হেরই ফল আজকের ঘটনা। রোসাঙ্গে শাহ সুজারে মাইরা ফালাইছে হেয় তো জানো?' বেদু বোকার মতো মাথা নাড়তে লাগল। 'হের কাছের লুকেরা হেগো সয়-সম্পদ লাইয়া পলাইছিল। কিন্তু হেরা বেশিদূরে যাইতে পারে নাই। এদিকেই ঘুরপাক খাইতাছে।'

'তাই নাকি? হের লগে আইজের ঘটনার মিল কী?' এবার তুলারাম জানতে চাইল।

'ঘটনা অইলো যারা পলাইছিল হেগো ভেতরে রোসাঙ্গের রাজার এক সভা কবিও আছিল। হেয় ক্যামনে জানি পলায়া এই সন্দ্বীপে চইলা আইছিল। হ্যাঁয় এহানে সফদর পাটোয়ারি নামে এক ব্যবসায়ীর ওখানে পলায়া ছিল। মনে অয় সুযোগ বুজে দূরের কোনো দেশে পলানির নিয়ত আছিল। কিন্তু রোসাঙ্গের রাজার চর সবখানে আছে। হেয় অইজ ধরা পড়ছে,' এটুকু বলে বুড়ো গড়গড়া টানতে লাগল।

বেদু আর তুলারাম দুজনে দুজনার দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই এই ঘটনার সঙ্গে ওদের কোনো সংযোগ আছে। 'তারপর?' বেদু প্রশ্ন করল।

'এরপরে আর কী হেরা যে পাঁজি, ওরে কী আর ছাড়ে। এমনিতেই অনেকদিন ধইরা এটা ওইটার কানে মানুষ অস্থির হয়া ছিল। তার ওপরে আবার দিল্লির ঝামেলা, রোসাঙ্গে শাহ সুজারে পরিবারসহ খুন। শুনছি চাঁটগায়েরাও নাকি আরাকানের লগে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করতাছে। সব মিলায় মানুষ অস্থির...' প্রথম বুড়ো এটুক বলতেই দ্বিতীয় বুড়ো নিজের হাঁটুতে চাপড় মেরে বলে উঠল।

'আর তাই দ্বীপের শাসকেরা পর্তুগিজ আর আরকানিরা মিলা আইজ ওরে ফাঁসি দিব। আমোদও অইবে, মানুষও ঠাণ্ডা অইবে, সব ঠিক,' বলে বুড়া খিকখিক করে হাসতে লাগল।

বেদু তুলারামের দিকে তকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চট করে হাঁটতে শুরু করল পেছনে দুই বুড়ো ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ব্যাপার কি, আড্ডা মাত্র জমে উঠেছে। বুড়োরা ভেবেছিল ওদের কাছ থেকে আরো কিছু চণ্ডু খসানো যাবে। এভাবে উঠে যাওয়াতে রীতিমতো হতাশ হলো তারা।

চণ্ডুর দাম পরিশোধ করে ওরা বেরিয়ে এলো চণ্ডুখানা থেকে। খানিকটা নির্জনে আসতেই বেদু তুলারামকে থামিয়ে জানতে চাইল। 'নিশ্চিত এই ঘটনার লগে আমাগো কোনো না কোনো যুগাযুগ আছে।'

'তা আর কইতে?' তুলারামকেও অস্থির দেখাচ্ছে।

'এহন কী করব আমরা?' বেদু জানতে চাইল।

'ওস্তাদ কিরানরে জানাইতে হবে,' তুলারাম নির্দেশ অনুসরণ করার লোক, নিজে থেকে কিছু করার ক্ষমতা তার নাই।

'না, না সময় নাই। ওস্তাদের লইগ্গা অপেক্ষা করতে করতে সব শেষ ওয়া যাবো। ততোক্ষণে-'

'আরে তাইলে আমরা কী করব। আদেশ না দিলে...' বেদুকে কথা শেষ করতে দিল না তুলারাম। আর সে কথা শেষ করতে পারল না একটা বিকট শব্দে। অবাক হয়ে ওরা দেখল বাজারের কেন্দ্র থেকে ভেসে আসছে এই উৎকট শব্দ। ফাঁসির সমন জারি করার জন্য দ্বীপের প্রশাসন থেকে বাজানো হয় এই শব্দ। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

অধ্যায় একত্রিশ
বর্তমান সময়
ফজলুল কাদের রোড, চট্টগ্রাম

'এই জন্যই, বুঝেছিস, আমি কাজে যাওয়ার আগে খুব ভালো জায়গাতে খেতে চাইনা,' শারিয়ার বাম হাতে ওর পেটের ওপরে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে ডান হাতে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল।

'আরে বস,' শারিয়ারের কথা শুনে ভুবন হেসে উঠল। 'জানো তো, ফাঁসির আসামিদেরকে ফাঁসি দেয়ার আগে ভালো-মন্দ খাওয়ানো হয়। তুমি আমাদের যেখানে নিয়ে যেতে চাইছো সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর কী না কী হয় কে জানে। কাজেই ভালোভাবে একটা খাওয়া না দিলে কী হয়!'

'হুমম, এখন নড়তে না পারলে ব্যাপারটা যে আরো ত্বরান্বিত হবে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই,' শারিয়ার ভুবনের দিকে তাকিয়ে দেখল পানের রসে ছেলেটার দুই ঠোঁট একেবার লাল হয়ে উঠেছে। ভুবনকে আরাম করে মিষ্টি পান চিবুতে দেখে ওরও খানিকটা লোভ লাগল। একবার ভাবল নেবে নাকি নিজেও একটা। পরমুহূর্তে ভাবল না থাক, এমনিতেই বেশি হয়ে গেছে পান-টান খেয়ে আবার যদি জর্দার কারণে মাথা চক্কর দেয় তখন বিপদ হবে একটা।

সিগারেটে আরেক টান দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করে রেস্টুরেন্টটার একটা ছবি তুলল শারিয়ার। নামটা বেশ ভালো লেগেছে ওর 'মেজ্জান হাইলে অইয়ুন'। নামটার শুদ্ধ বাংলা দাঁড়ায় 'মেজবান খেলে আসুন'। নামটা যেমন সুন্দর তেমনি এখানকার খাবারের স্বাদ। বিশেষ করে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানি খাবারের স্বাদ পেতে তুলনা নেই।

'বস, তুমার মনে হয় রেস্টুরেন্টটা পছন্দ হয়েছে?' ভুবন জানতে চাইল।

'হুমম, ভালো লেগেছে,' বলে ও মোবাইলে তোলা ছবিটা দেখে নিয়ে ওটা রেখে দিল। 'এখন তো টেনশনে আছি। এরপরে একসময় মুড ভালো থাকলে তখন এখানে এসে খেয়ে যেতে হবে। মেজবান খেয়েছিলাম সেই আর্মিতে থাকতে। ট্রেনিংয়ের সময়ে একবার ছুটিতে এসে বেশ কয়েকজন মিলে খেয়েছিলাম আমরা,' বলে শারিয়ার স্মৃতিচারণা করে খানিকটা অবেগজড়িত গলায় বলে উঠল, 'কত বছর পার হয়ে গেছে, অথচ মনে হয় সেদিনের ঘটনা,' আনমনেই মাথা নাড়ল সে।

'তুমি আর্মিতে ছিলে?' ভুবন বেশ অবাক হয়ে জানতে চাইল। বিকেল থেকে একসঙ্গে থাকতে থাকতে দুজনার ভেতরের সম্পর্ক আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে ইতিমধ্যেই। 'ছাড়লে কেন?'

'হা-হা-হা,' করে হেসে উঠল শারিয়ার। 'সে এক লম্বা গল্প,' বলে সে রাস্তার অন্যপাশে চায়ের দোকানটা দেখাল। 'সুমনের আসতে সময় লাগবে মনে হয়, চল চা খাই। খেতে খেতে গল্প করি,' দুজনেই চায়ের দোকানের সামনে এসে দুকাপ চা অর্ডার করে শারিয়ার বলে উঠল। 'আসলে ছাড়িনি,' বলে ও মৃদু হেসে উঠে যোগ করল। 'বের করে দিয়েছিল। নিজের কমান্ডিং অফিসারকে চড় মেরেছিলাম,' বলে সে দোকানদারকে দিয়ে যাওয়া চায়ের কাপটা তুলে ধরে বলে উঠল, 'চিয়ার্স।'

ভুবন ওর দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। তারপর আনমনেই মাথা নেড়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে উঠল, 'হায়রে মানুষ! তুমি একটা পাগল ছাড়া আর কিছু না। তুমি কমান্ডিং অফিসারকে মেরে আর্মি ছাড়লে। আর আমি কী করিনি একটা সময় আর্মিতে যাওয়ার জন্য,' বলে সে আনমনেই মাথা নাড়ল। 'আর এখন ওই সময়টাকে জীবনের...' সে বাক্যটা শেষ করল না ইচ্ছে করেই।

'কেন? তুই না স্পেশাল অপসে ছিলি কমান্ডো হিসেবে?' শারিয়ার একটু অবাক হয়ে গেছে ছেলেটার কথা শুনে। 'আর্মিতে না থাকলে সেটা কীভাবে সম্ভব?'

ভুবন খানিকটা হেসে বলে উঠল, 'আমি স্পেশাল অপসে ছিলাম, কিন্তু এই দেশের আর্মিতেই ছিলাম, এটা তো বলিনি। তবে হ্যাঁ আমি বাংলাদেশের আর্মিতে কাজ করেছি কিন্তু সেটা ওদের নিয়মিত হিসেবে নয় অনেকটা এই মুহূর্তে যেমন করছি এখানে।'

'অনেক বিচিত্র গল্প আছে মনে হয় এই লম্বা যাত্রায়,' শারিয়ার চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে উঠল। 'আদিবাসী গোত্রের এক ছেলের স্পেশাল অপস কমান্ডো হওয়া, তারপর সেখান থেকে এখন একটা সিকিউরিটি কোম্পানির অফিসার,' আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল শারিয়ার। 'কোনোভাবেই মেলাতে পারছি না।'

'উফফ বস, আর বলোনা,' বলে সে হেসে উঠল। স্মৃতিকাতরতার হাসি। 'যদি কোনোদিন সুযোগ হয় একটা বই লিখব এ নিয়ে,' বলে সে নিজের ডান হাতটা তুলে শূন্যের ওপরে মেলে ধরল। 'নাম দিব কী জানো, 'রিগ্রি ক্ষ্যাং'।'

'এ কেমন নাম?'

'আমি যে গোত্রের মানুষ সে পুরো গোত্রেরই বসবাস এগারোটা পাহাড়ের ওপরে একটা গ্রামে। আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটা পাহাড়ি পানির ছড়া, যেটাকে নদীও বলতে পারো। নদীটার নাম 'রিগ্রি ক্ষ্যাং'। তোমাদের বাংলায় এর অর্থ শান্ত পানির ধারা।'

'বাহ, একেবারে কবি কবি ব্যাপার,' হেসে উঠল শারিয়ার।

'মোটেই না বস। অনেক রক্ত লেগে আছে এই পানির শান্ত ধারায়,' বলে সে নিজের হাত দুটো দেখাল। 'আর এই দুই হাতে, অনেক যন্ত্রণা মিশে আছে আছে এই রিগ্রি ক্ষ্যাঙের মৃদু মন্দ স্রোতে। আমাদের গ্রামের প্রথম শিক্ষিত মানুষ ছিল আমার দাদা। সেই প্রথম আমাদের গোত্রকে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় করায়। এর ফল ভালো হয়নি, আর তাই আমার বাবা যখন গোত্র প্রধান হয় সেই নীতি থেকে সরে আসে সে। কিন্তু আমি ব্যতিক্রম ছিলাম, দুনিয়া দেখতে চেয়েছিলাম, আমি বিশ্বকে জয় করতে চেয়েছিলাম কিন্তু...' হঠাৎ থেমে গেল সে। তারপর দুঃখী হাসি দিয়ে বলে উঠল। 'দেশপ্রেম, বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর বিসর্জন, এসব মিথ কাটিয়ে উঠেছি বস এখন দুনিয়াতে একটাই মিথ আছে আমার জন্য। আমার স্ত্রী আর ছোটো বাচ্চাটা। আচ্ছা বাদ দাও। তোমার কথা বলো। তোমার পরিবারে কে আছে?'

'টাকা,' চায়ের কাপটা ফেরত দিতে দিতে বলে উঠল শারিয়ার।

'মানে?' ভুবনকে দেখে মনে হচ্ছে আরেকটু হলে চায়ের কাপে বিষম খেতো সে।

'বস্তা বস্তা টাকা আছে আমার পরিবারে,' বলে হেসে উঠল শারিয়ার। 'কিন্তু সে টাকা খরচ করার মতো কেউ নেই। বাবা আছে, আজ ত্রিশ বছর ধরে ডিজ্যাবল, কোমায় আছে। আর পরিবারে একটাই ছেলে সেটাও পাগল, কিসের নেশায় দুনিয়া ঘুরে বেড়ায় খোদাই জানে একমাত্র।'

'তা তুমি কিছু করো না কেন, তুমি বুঝিয়ে-শুনিয়ে বাড়িতে নিয়ে এলেই তো পারো?' ভুবন খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে উঠল।

শারিয়ার মুখ তুলে তাকাল তার দিকে। 'হ্যাঁ চেষ্টা করেছিলাম, শুনলো আর কই। সব বাদ দিয়ে চট্টগ্রামে ফজলুল কাদের রোডে চা খাচ্ছে এখন ব্যাটা, আর জুনিয়র কলিগের সঙ্গে জীবনের গভীরতা নিয়ে ফালতু ফিলোসফি কপচাচ্ছে,' বলে হেসে উঠল সে।

ভুবন এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে। কয়েক মুহূর্ত লাগল তার বিয়ষটা বুঝতে। তারপর হা-হা করে হেসে উঠল সে। দুজনেই হাসতে লাগল। শারিয়ার হাত তুলে ঘড়ি দেখল। 'সুমন হারামজাদা তো ভালো দেরি করছে। আরো সময় পার হলে তো ঝামেলা বাড়বে।'

'আমরা যে কাজ করতে যাচ্ছি তাতে এমনিতেও ঝামেলা কম হবে না। এমন এক কাজ, যেটাতে বিফল হলে সব মেসআপ হবেই। সফল হলেও জবাব দিতে দিতে জান বের হয়ে যাবে,' বলে সে শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বলে উঠল, 'বস, তুমি একটা খারাপ লোক। ডানহিল খাইয়ে খাইয়ে অভ্যাস খারাপ করে ফেলেছো। এখন আর রেগুলার সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে না,' সে হাত বাড়িয়ে আছে শারিয়ারের দিকে।

'ভালো,' শারিয়ার ব্লেজারের পকেট থেকে ডানহিলের প্যাকেটটা বের করে ধরিয়ে দিল ওর হাতে। 'শালা, প্রত্যেকটা বিড়ি উসুল করব আমি তোর কাছ থেকে,' কপট রাগের ভঙ্গিত বলল সে। 'আচ্ছা ভুবন, একটা ব্যাপার বলত। তুই যে যেতে চাচ্ছিস আমার সঙ্গে, কাজটা কী ভালো হবে তোর জন্য? তুই তো ফ্যামিলি ম্যান,' বলে হেসে উঠল শারিয়ার। 'মানে পারিবারিক মানুষ।'

ভুবনও হেসে উঠল ওর শব্দচয়ন শুনে। 'পারিবারিক মানুষ! যা বললে বস,' বলে সে শারিয়ারের দিকে ফিরে তাকাল। 'শোন, আমি ঘরে বসে থাকার মানুষ নই। আমি নিয়ম মেনে নিয়মকে বদলে দেবার মানুষ। আর আমি একটা কথা বিশ্বাস করি, তুমি যদি গণ্ডির বাইরে কিছু একটা করতে চাও তবে অবশ্যই তোমাকে গণ্ডির বাইরে বেরুতেই হবে। কিছু করার নেই,' বলে সে শারিয়ারের দিকে একটা আঙুল তুলল। 'বস, তুমি সুপার হিরো মুভি দেখো?'

'আমি মুভিই দেখি না,' শারিয়ার হেসে বলে উঠল। 'তার ওপরে আবার সুপারহিরো মুভি! তবে হ্যাঁ, ছোটোবেলায় কমিকস পড়তাম খুব।'

'তোমার ফেভারিট সুপারহিরো কে?' ভুবনকে দেখে মনে হচ্ছে আলোচনার জন্য সে খুব মাজার বিষয় পেয়ে গেছে।

'হুমম,' শারিয়ার পড়ে গেছে দ্বিধায়। 'ওরকম স্পেশাল ফেভারিট তো কেউ নেই। তবে ব্যাটম্যানকে ভালো লাগে সবসময়ই।'

'আমার কে জানো?' বলে সে ভ্রু নাচাল। 'সবাই শুনে অবাক হয়। টনি স্টার্ক, মানে আয়রন ম্যান। আয়রন ম্যানের মুভিতে একটা ডায়লগ আছে যেটা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। কথাটা অনেকটা এরকম 'কখনো কখনো হাঁটতে শেখার আগে দৌড়াতে হয়'। আর এসব কেসের ক্ষেত্রে দৌড়াতে না পারলে কখনোই সামনে আগানো যায় না।'

'কিন্তু সুমন তো অনেক দেরি করে ফেলছে,' শারিয়ার ঘড়ি দেখল।

'কল দিই?' ভুবন মোবাইল বের করতে করতে বলে উঠল। মোবাইলে কথা বলে সে শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'চলে এসেছে প্রায়। তবে মজার একটা কথা বলল সুমন। গাড়ি, খবর আর মানুষ তিনটাই নাকি আছে তার কাছে।'

'গাড়ি আর খবর তো বুঝলাম,' শারিয়ার আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিতে-দিতে বলে উঠল। 'কিন্তু মানুষটা আবার কে?'

'সেইটাই তো বুঝলাম না। চলে আসছে প্রায়, আমি একেবারে এখানকার লোকেশনই বলেছি, এলেই দেখতে পাব আর কি।'

শারিয়ার খানিকটা অস্থির ভঙ্গিতে আরেকবার ঘড়ি দেখল। 'খুব দেরি হয়নি ওদের। কিন্তু সময় বেশি নেই আমাদের হাতে। কারণ এখান থেকে আমাদের গেস্ট

হাউজে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে পোশাক বদলাতে হবে। সেই সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। তারপর বেরোতে হবে। যা বুঝতে পারছি ওখানে একবার ঢুকলে আর... ওই যে চলে এসেছে ওরা। আরে সুমন দেখি টমিকে নিয়ে এসেছে।'

রাস্তা পার হয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকা টমিকে দেখিয়ে বলে উঠল ভুবনকে। ভুবনও তাকিয়ে আছে রাস্তা পার হয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকা টমি আর সুমনের দিকে।

সন্ধ্যেবেলা ওরা যখন জানতে পারে কাল সকালের আগে বাউন্ডারির অন্যপাশের প্রাইভেট প্রপার্টিতে ওরা সার্চ করতে পারবে না। তখন শারিয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, ও নিজেই ঢুকবে ওখানে। ভুবনের সঙ্গে শেয়ার করার পর সেও বেশ মজা পায় পরিকল্পনাটাতে।

তবে আজ রাতেই ওই এলাকাতে অভিযান চালানোর পেছনে শারিয়ারের আরেকটা বড়ো কারণ হলো কেন জানি সে সন্দেহ করছে প্রশাসনের ভেতর শত্রুপক্ষের লোক আছে। কারণ যতবার ওরা যাই করতে যাচ্ছে সেটা করার আগেই শত্রুপক্ষের লোকজন জেনে যাচ্ছে। ওরা যে ওই এলাকাতে কিছু একটা বের করতে পেরেছে, এই খবর দেখা যাবে জায়গামতো চলে গেছে। ওরা কাল সকালে ওয়ারেন্ট ম্যানেজ করে ওখানে অভিযান চালানোর আগেই। আর এ কারণে আজ রাতেই অভিযান চালানোর পরিকল্পনা শারিয়ারের, আর সেটাও নিজে থেকে।

তবে ওদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে শুধু ওরা দুজন যথেষ্ট ছিল না। কারণ ওরা দুজনেই বাইরের লোক কেউ তাই সরাসরি টিমের স্থানীয় কাউকে দরকার ছিল ওদের শারিয়ার আর ভুবন দুজনে মিলে ঠিক করে সুমনকে ওদের সঙ্গে নেওয়া হবে। তবে তাকে প্রস্তাব দেওয়া হবে যদি সে রাজি হয় হবে, না হলে তাকে ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলা হবে। কিন্তু সুমনকে প্রস্তাব দেয়ার পর প্রথমে খুব চিন্তায় পড়ে গেলেও পরে সে রাজি হয়ে যায়। এরপর তিনজনে বসে পরিকল্পনা করে।

প্রথমে, ওরা ঠিক করে ওদের একটা গাড়ি লাগবে। ওরা যেহেতু আনঅফিসিয়ালি অপারেশনটা চালাচ্ছে কাজেই এই গাড়ি আনরেজিস্টার্ড হতে হবে। সুমন জানায় তার পরিচিত মেকানিক আছে, চাইলে সে গাড়ি ম্যানেজ করতে পারবে। এরপরে যেই ব্যাপারটা ওদের দরকার সেটা হলো নির্দিষ্ট কিছু তথ্য। ওই ডকইয়ার্ডে কাজ করে এমন কাউকে লাগবে ওদের যে ওদেরকে সামান্যতম হলেও কিছু তথ্য দিতে পারবে যে, গত কয়েকদিনে ওই ইয়ার্ডে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে কিনা। কারণ একেবারে আউট অব দ্য ব্লু শারিয়ার ঢুকতে চাচ্ছে না ওখানে। অপারেশনটা চালানোর জন্য ওর কিছুটা হলেও তথ্য দরকার সুমন জানায় ওই

ইয়ার্ডে কাজ করে এমন একজন ইনফর্মার আছে ওদের। শারিয়ার চাইলে সে যোগাযোগ করে দেখতে পারে লোকটার সঙ্গে।

তো সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সুমন চলে যায় ইনফর্মারের ওখান থেকে খবর সংগ্রহ করে মেকানিকের কাছ থেকে গাড়ি ম্যানেজ করে নিয়ে আসার জন্য। আর শারিয়ারকে নিয়ে ভুবন চলে আসে রাতের খাওয়া-দাওয়া করার জন্য। কথা ছিল সুমন সব কাজ সেরে সোজা চলে আসবে ওদের ওখানে। তারপর সেখান থেকে গেস্ট হাউজে গিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে ওরা বেরুবে রাতের অভিযানে। কিন্তু সুমন কোথা থেকে এবং কীভাবে টমিকে নিয়ে এলো সেটা বোধগম্য হচ্ছে না শারিয়ারের কাছে। সুমন কাছাকাছি আসতেই দুই কাঁধ নেড়ে বিশেষ ভঙ্গি করল শারিয়ার, 'ব্যাপার কী?'

'আরে বস আর বলোনা, তুমিই কথা বলো,' বলে সে টমির দিকে দেখাল।

টমিকে একাধিকবার কনফারেন্স রুমে দেখলেও তাকে সামনাসামনি ভালোভাবে দেখেনি শারিয়ার। তাকে দেখে যতটা খাটো আর মোটা মনে হচ্ছিল এখন কাছ থেকে দেখে বোঝা গেল সে তার চেয়েও একটু বেশি খাটো, সেই সঙ্গে আরো খানিকটা বেশি মোটা। পরনে তার হালকা স্নিকার্স, খাকি থ্রি-কোয়ার্টার আর কালো টি-শার্ট। শারিয়ার দেখল তার আগের টি-শার্টটা বদলে অন্য একটা পরেছে সে এখন। এটাতে হিথ লেজারের জোকারের মুখ দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে ট্যাগ লাইন লেখা 'হোয়াই সো সিরিয়াস?'। সিরিয়াস লেখা জায়গাটা ঠেলে উপচে আছে টমির ভূঁড়ি। পিঠে তার ভূঁড়ির চেয়েও পেটমোটা একটা ব্যাগ, সেই সঙ্গে মাথায় একটা হাস্যকর টুপি।

'বস, আগেই বলে নেই। আমি আপনাদের রাতের অভিযানের ব্যাপারে জানি,' বলে সে এমন একটা হাসি দিল যেন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ওয়াটারগেইট কেলেঙ্কারির পর ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো কন্সপিরেসির তথ্যটা তার জানা। কিন্তু তার তথ্যটা শুনে শারিয়ার সোজা তাকাল সুমনের দিকে। তার দিকে তাকিয়েই সে বলে উঠল, 'কীভাবে?'

'আরে! আমি জানি নাকি?' সুমন আঁতকে ওঠার মতো বলে উঠল। আমি গেছি পিবিআইতে একটা কাজে, সে এসে বলা শুরু করল তোমরা নাকি রাতের অভিযানে যাবে, এই ব্যাপারে ও নাকি সব জানে। আসতে চাইল, আমি কী করে মানা করব। তাই নিয়ে এসেছি।'

'আরে শারিয়ার স্যার, শান্ত হোন,' বলে টমি একটা হাসি দিল। 'আমি আপনাদের অভিযানের ব্যাপারে জেনেছি তানভীর স্যারের কাছ থেকে। আপনি পরিকল্পনা ঠিক করার পর সম্ভবত তানভীরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। আপনি

কল করার একটু পরেই তানভীর স্যার আমাকে কল করে বলল আপনাকে আনঅফিসিয়ালি যা যা টেকনো সাপোর্ট লাগে দিতে। তাই চলে এলাম,' বলে সে খুব চটুল একটা ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

'তানভীর বলেছে?' শারিয়ার ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'আপনি তানভীরকে চেনেন কীভাবে। আর ও আমাকে না জানিয়ে আপনাকে বলতে যাবে কেন?'

'আমি তানভীর স্যারের সঙ্গে সিলেটে অপারেশন ব্ল্যাক বুদ্ধাতে ছিলাম। অপারেশন ব্ল্যাক বুদ্ধার কাজ শেষ করার পর স্যার যখন অসুস্থ আমি গিয়েছিলাম ময়মনসিংহে আরেকটা কেসে কাজ করতে। এরপর স্যারের নির্দেশেই আমি চট্টগ্রাম আসি। উনি আমাকে অসম্ভব স্নেহ করেন। উনি আর আমিও এরকম মানে আনঅফিসিয়ালি অনেক কাজ করেছি একসঙ্গে,' বলে সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'আর তার চেয়ে বড়ো কথা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে।'

শারিয়ার এখনো ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে টমির দিকে। 'নিরাপত্তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য হতে পারে না। কাজেই সাবধান টমি,' বলে সে টমিকে হাতের ইশারায় সাবধান করে দিয়ে সুমনের দিকে দেখল। 'আমি বন্ধু তানভীরকে কল করব, সে যদি টমির ব্যাপারে আমাকে গ্রিন সিগন্যাল না দেয়, আমি ওরে সোজা গেস্ট হাউসে নিয়ে আমার রুমের বাথরুমে আটকে রাখব আমাদের অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত।'

'আরে বস, আপনি দেখি বেশি সিরিয়াস হয়ে গেছেন,' বলে হেসে উঠল টমি। 'আপনি তানভীর স্যারকে কল করেন। কোনো সমস্যা নাই।'

'আচ্ছা আগে বলেন টমি সাহেব, কী খবর আছে আপনার কাছে?' বলে শারিয়ার হেসে উঠল। 'আপনারে পরেও বাইন্ধা রাখা যাবে।' সবাই হেসে উঠল। টমিও হাসল তবে তার হাসি অন্যদের তুলনায় খানিকটা মলিন। 'আচ্ছা এখানে না, এই রাস্তার ওপরে আলোচনার দরকার নেই। আমরা গেস্ট হাউসে যেতে যেতে কথা বলব। যত সময় বাঁচানো যায় ততই ভালো। চলো সবাই,' বলে ওরা রাস্তা পার হয়ে সেখানে চলে এলো যেখানে সুমন তার সঙ্গে নিয়ে আসা মাইক্রোটা রেখে এসেছে।

শারিয়ারসহ সবাইকে গাড়িটার সামনে নিয়ে এসে সে দেখাল। 'বস এইটাই পেলাম। দারুন না?' নীল রঙের ছোটো মাইক্রোটা দেখিয়ে সে বলে উঠল। 'নম্বর প্লেট একদম ভুয়া, কারো বাপেরও সাধ্য নাই ধরার।'

'দারুণ না মোটেই, তবে কাজ চলবে মনে হচ্ছে,' শারিয়ার মাইক্রোর স্লাইডিং ডোরটা ঠেলে উঠে পড়ল ভেতরে। ওর সঙ্গে উঠল টমি। আর সুমন ড্রাইভিং সিটে, তার পাশে ভুবন।

'বলেন টমি সর্দার, কী আছে আপনার তথ্যের ভাণ্ডারে?'

'বস, প্রথমে দুপুরবেলা আপনার করা প্রশ্নটা দিয়ে শুরু করি,' টমি বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করল। শারিয়ারের একদম মনে নেই দুপুরবেলা সে কী প্রশ্ন করেছিল। 'কোনো প্রশ্ন?'

'প্রফেসর সুলতানের সঙ্গে অথরিটির কোনো ব্যাপারে সমস্যা হয়েছিল? কোনো বিষয়ে সমস্যা হওয়ার পর তার আর্কিওলজিস্টের লাইসেন্স বাতিল করা হয়।'

'সেটা কী জানা গেছে?' সামনে থেকে ভুবন জানতে চাইল।

'নাহ অনেক চেষ্টা করেও সেটা জানা যায়নি, কিন্তু সেখানেই তো মজা?' টমি অকারণে নাটকীয়তা করার চেষ্টা করছে তবে, শারিয়ার অনুমান করল এটা সম্ভবত ছেলেটার অভ্যাস। 'বিষয়টা কীভাবে জানতে পারলাম সেটা বলি। প্রথমে আমি অনলাইনে চেষ্টা করি নিজের অথরাইজড আইডি থেকে নির্দিষ্ট কেস ফাইলটাকে এক্সেস করতে। কারণ আমি যতটুকু জানি ডিজিটাইজড প্রসেসে আর্কিওলজি, মানে প্রত্নতত্ত্বের বেশিরভাগ ফাইলই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাজেই অথরাইজড আইডি দিয়ে চেষ্টা করলে ফাইলগুলোতে অ্যাক্সেস করতে না পারার কোনো কারণ নেই। কিন্তু,' বলে টমি আবারও হেভি একটা ভাব নিতে যাচ্ছিল কিন্তু শারিয়ারের চোখে চোখ পড়াতে সে কঠিন দৃষ্টি দেখে চোখ সরিয়ে নিল। 'আমি ওদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এক্সেস করতে পারলাম। সেখানে সব ফাইলই আছে কিন্তু প্রফেসর সুলতানের কোনো ফাইল নেই। এরপরে আরেকটা মিডিয়াম থেকে চেষ্টা করে বহু ঘাঁটাঘাঁটি করার পর প্রফেসরের লাইসেন্স বাতিল করার ফাইলটা পেলাম। কিন্তু কেন তা করা হয়েছে তার কোনো ডিটেইল নেই।'

'এরপরে আমি একজনকে ঢাকায় ওদের ওখানে পাঠালাম। ওরা জানাল ওদের অনেক কেস সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় হ্যান্ডেল করে। তাই এমনও হতে পারে সেকশন পরিবর্তন হওয়ার পর হয়তো সেটা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে চলে গেছে। এবার পাশা স্যারের স্পেশাল রিকোমেন্ডেশনে একজনকে পাঠানো হলো ওখানে। ওখানে গিয়ে বহু চেষ্টা করেও এই রিলেটেড কোনো ফাইল পাওয়া গেল না। এর মানে, না প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে না সংস্কৃত মন্ত্রণালয়ে এরকম কোনো ফাইল আছে । এর মানে কী দাঁড়াল?'

'এর মানে দাঁড়াল, হয় অথরিটি অথবা এর ভেতরের কেউ অথবা বাইরে থেকে কেউ না কেউ কলকাঠি নেড়ে ফাইলটাকে রেকর্ড থেকে মুছে দিয়েছে,' বলে শারিয়ার ভুবনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'ভুবন কেসটাকে আসলে সাদা চোখে প্রথমে যেরকম মনে হচ্ছে আদতে সেটা নয়। এর ভেতরে আরো অনেক অনেক ম্যাটেরিয়াল আছে।'

'বস একটা ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করো, যদি প্রফেসরের কেসটাকে একটা মই মনে করি আমরা, এই মইয়ের একট বড়ো মিসিং ধাপ হলো এই ফাইল গায়েব,' বলে সে সামনের সিট থেকে একবার পেছন ফিরে বলে উঠল। 'কেন জানি আমার ফিলিং হচ্ছে যে, এই মিসিং ধাপটাকে পূরণ করতে পারে একমাত্র ডক্টর শশী। আর সে-কারণেই সম্ভবত সে অপহৃত হয়েছে।'

শারিয়ার চিন্তিত মুখে ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে নেমে আসা নিজের চোখা গোঁফে হাত বুলাচ্ছে। 'তবুও একটা ব্যাপার মিলছে না,' বলে সে সামনে সুমনের দিকে ইশারা করে বলে উঠল। 'এবার সুমন মিয়া, তুমি জানাও কী বের করতে পারলে? কী আছে বাউন্ডারির ওপাশে?'

'ওখানেও গরম খবর আছে বস,' সুমন সামনে থেকে গাড়ি চালাতে চালাতে বলে উঠল। 'তোমরা তো জানোই ওই জায়গাটা একজনের পারিবারিক সম্পত্তি। ওটা মূলত একটা প্রাইভেট ডকইয়ার্ড। ওখানে একপাশে কন্টেইনার রাখা হয়। অন্যদিকে জাহাজ ভাঙার কাজ চলে। কাজেই জায়গাটা খুব একটা সুবিধার না। কারণ কন্টেইনার রাখার অংশটুকু মোটামুটি সিকিউরড হলেও যেদিক থেকে জাহাজ ভাঙার কাজ চলে সেদিকটা আসলে একেবারেই খোলা। এই হলো জায়গা। আর মালিকের ব্যাপারে যদি বলি তবে ওটা একটা পারিবারিক ব্যাবসার অংশ। ওখানে মালিকপক্ষ তাদের নিজেদের মতো লোককে, সোজা কথায় বলতে গেলে শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছে। ওখানে ওরাই সব নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই বুঝতেই পারছো। এরা হলো হিংস্র ধরনের মানুষ।'

শারিয়ার ডানহিলের প্যাকেট বের করে নিজে ধরাতে ধরাতে একটা এগিয়ে দিল ভুবনের দিকে। টমির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'আপনি কি...?'

'না, বস আমি খাই না,' বলে সে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলে উঠল। 'বস, তানভীর বস আমাকে তুই করে ডাকে। আপনি অন্তত তুমি করে না ডাকলে কেমন জানি অস্বস্তি লাগছে।'

'হা-হা,' জোরে হেসে উঠল শারিয়ার। 'ঠিক আছে। সুমন এরপরে বলো। যে খবরের জন্য বলেছিলাম সেটার ব্যাপারে কিছু কী জানা গেছে?'

'বস, তোমাকে একটু বলে নেই। এসব ডকইয়ার্ডগুলো হলো ক্রাইম আর ড্রাগের আখড়া। কারণ আগেই বলেছি এসব জায়গায় মালিকদের চেয়ে অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ন্ত্রণ থাকে অনেক বেশি। যে কারণ এসব জায়গায় আমাদের ইনফরমার থাকেই। কিন্তু অনফরচুনেটলি এখানে আমার নিজের কোনো ইনফরমার ছিল না। আমার এক ছোটো ভাই আছে পুলিশে, ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারি ওর খুব কাছের একজন কাজ করে ওখানে। তো ওই ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে আমি গেলাম তার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে লোকটার সঙ্গে বিস্তারিত কথা

হলো। সে ওখানে বসেই বেশ খোঁজখবর নিল। তারপর বলল গত কয়েকদিনে ওখানে তেমন কিছু ঘটেনি। তবে একটা ব্যাপার সে জানাল যেদিন বৃষ্টি হয় তার পরের দিন বেশ কিছু কন্টেইনারের কনসাইনমেন্ট ছিল ওখানে। ওদের অ্যাসোসিয়েশনের নেতাগোছের একজন প্রায় কোনো কারণ ছাড়াই সেটা বাতিল করে। এটাও নাকি তেমন কোনো সমস্যা নয়। কারণ এরকম নাকি প্রায়ই হয়। কিন্তু সে খবর নিয়ে জানতে পারে এর আগের দিন থেকে ওই জায়গাটুকু নাকি রীতিমতো লকডাউন করে রেখেছে তার লোকেরা এবং ওখানে নাকি বেশ কিছু বাইরের লোকজনের যাতায়াত হচ্ছে বিগত কয়েকদিন ধরে। এমনকি তাদের কাছেও ব্যাপারটা বেশ অস্বাভাবিক লেগেছে।'

'আচ্ছা শুনে যেটা মনে হচ্ছে কিছু হতে পারে·আবার নাও পারে। তবে যাচাই করে দেখতে তো আর কোনো সমস্যা নেই। কারণ আমার বিশ্বাস ওই জায়গায় কিছু না কিছু ঘাপলা তো আছেই তা-না হলে ডক্টর শশীকে অপহরণ করে ওদিক দিয়ে নিয়ে যেত না ওরা। কারণ সহজ পথ ছেড়ে এত ঘুরবে কেন?' গোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে উঠল শারিয়ার।

'এই সামনে রাখো, রাখো,' হঠাৎ ভুবন ইশারা করল সুমনকে গাড়ি থামানোর জন্য। 'বস,' বলে সে শারিয়ারের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আমার বাসা পাশের গলিতে। তোমরা খানিক অপেক্ষা করো। আমি যাব আর আসব,' বলে সে চট করে মাইক্রো থেকে নেমে গেল।

'ভুবন স্যার আসতে আসতে আমি একটা জিনিস দেখাই আপনাদের,' বলে টমি তার ল্যাপটপ বের করে শারিয়ারকে ইশারা করল। ল্যাপটপে একটা সফটওয়্যার ওপেন করে শারিয়ারকে দেখাল। 'দেখো এটা অনেকটা গুগল আর্থের কাছাকাছি একটা জিনিস। সেইম জিনিসটা তুমি চাইলে মোবাইলে অ্যাপের মতোও ব্যবহার করতে পারো। এখন দেখো সুমন ভাইয়ের বক্তব্য অনুযায়ী আমি বাউন্ডারির ওপাশে পুরো জায়গাটাকে এখান থেকে মার্ক করে আলাদা একটা ম্যাপের স্লটে ওপেন করেছি। এখানে দেখো পরের জায়গাটা দেখা যাচ্ছে,' বলে সে শারিয়ারকে জায়গাটার একটা থ্রিডি ইমেজের মতো ভিউ দেখাল। 'হয়তো ভাবছেন এসব খুব কঠিন কাজ ব্যাপারটা আসলে একেবারেই সহজ। আমি গাড়িতে আসতে আসতেই করে ফেলেছি। 'আসলে এসব সামান্য ব্যাপার আমার জন্য,' বলে সে আরো কিছু আত্মম্ভরি কথাবার্তা যোগ করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই শারিয়ার মৃদু ধমক দিল তাকে।

'টমি, কাজের কথা...'

'ওকে ওকে বসো,' বলে সে পুরো থ্রিডি মডেলটা আবারও ঘুরিয়ে দেখাল। 'একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন। তাহলেই পুরো জায়গাটার ব্যাপারে আমরা

একটা সম্যক ধারণা পেয়ে যাব। এই জায়গাটার ব্যাপ্তি বিশাল হলেও পুরোটা আমাদের দরকার নেই। জায়গাটাতে প্রবেশ করার তিনটে পথ আছে। একটা জলপথে, ওটা বাদ। এরপরে এই দেখো এটা বাউন্ডারির পেছন দিক দিয়ে এখানে বিরাট একটা গেট আছে। আর এখানে মূল রাস্তা থেকে প্রবেশ পথ ধরে। এখানেও বিরাট একটা গেট আছে। আর বাকি রইল আকাশপথ। আচ্ছা আপনারা কোনোদিক দিয়ে ওখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করছো?'

'তুমি যেগুলো বললে টমি আমরা এগুলোর কোনোটাই ব্যবহার করব না আমরা ওখানে প্রবেশ করব আমরা ভাবছি বাউন্ডারি টপকে ওখানে ঢুকব । কারণ এছাড়া অন্যদিক দিয়ে ঢুকতে গেলে হয় অনেক ঘুরতে হবে, তার ওপরে সিকিউরটির ঝামেলা তো আছেই।'

'ভেরি গুড। তাহলে ওখান থেকে শুরু করে আমি পুরো জায়গাটার ব্যাপারে একটা সম্যক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব। প্রথমেই দেখো। যদি তুমি বাউন্ডারি দিয়ে ভেতরে ঢোক তবে দেখবে এখানে দেয়ালের ঠিক ওপাশেই বেশ অনেকটা জায়গায় পানি। তোমাদের জন্য বেটার হবে, ওখানে দেয়ালের ওপরে উঠে অনেকখানি এগিয়ে যাবে। তারপর এখানে নামবে। দুটো কারণে; এদিকটা খুবই ভালো হবে, এখানে কোনো পাহারা নেই। আর দুই, এখান থেকে তোমরা যেখানে যাবে সেই জায়গাটাও বেশ কাছে।'

'আচ্ছা,' শারিয়ার মনোযোগ দিয়ে দেখে পুরো জায়গাটার একটা আউটলেট মাথায় নেয়ার চেষ্টা করছে। 'কিন্তু এত বিস্তারিত মনে রাখা তো মুশকিল।'

'কোনো চিন্তা নেই বস, ব্যবস্থা আছে। এখন মনোযোগ দিয়ে দেখো। এখানে নেমে এখান থেকে তোমরা যদি তোমারে হাতের বামে যাও তবে কন্টেইনার রাখার এলাকা পড়বে যদি ডানে যাও তবে আধমাইলের মতো এগোলে মূল প্রবেশপথ। আর যদি সোজা যাও তবে কোয়ার্টার মাইলের মতো এগোলে সামনে থেকে ডকইয়ার্ড এলাকা শুরু। এখন সুমন স্যারের সোর্সের তথ্য অনুযায়ী সন্দেহভাজন জায়গাটা যেখানে সেখানে পৌঁছাতে হলে তোমাকে প্রথমে ওখানে নেমে সেখান থেকে সোজা এগোতে হবে পাঁচশ গজের মতো, তারপর সেখান থেকে ডানে মোড় নিতে হবে। তারপর আরো আধ মাইলের মতো গেলে তবে পৌঁছে যাবে সেই অফিস এলাকাটাতে,' বলে সে থ্রিডি মডেলে রেড মার্ক করে দেখাল জায়গাটা।'

শারিয়ার অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই ভুবন চলে এলো। 'বেশি দেরি করলাম না তো?' বলে সে সহাস্যে উঠে বসল গাড়িতে। শারিয়ার তাকিয়ে দেখল ভুবনের পরনে কালো প্যান্ট, কালো শার্টের ওপরে ধূসর জ্যাকেট। মাথায় একটা মাঙ্কি ক্যাপ ভাঁজ করে রাখা। হাতে একটা ব্যাগ।

'পারফেক্ট,' ভুবনের পোশাকটা দেখে খুশি হয়ে উঠেছে শারিয়ার। মনে মনে সে ভাবল প্রফেশনার লোকের সঙ্গে কাজ করার এই এক মজা। না বললেও এরা অনেক কিছু বুঝে ফেলে। 'সুমন, গাড়ি ছাড়ো। সোজা গেস্ট হাউস। ব্যাগে কী?' সে কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করল ভুবনকে।

শারিয়ারের প্রশ্ন শুনে ভুবন হেসে উঠল। 'গেস্ট হাউসে গিয়ে দেখাচ্ছি। তুমি মজা পাবে দেখলে।'

সুমন গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে আধা ঘণ্টার ভেতর চলে এলো গেস্ট হাউসে। সেখানে পৌঁছে সবাইকে নিয়ে নিজের কামরায় চলে এলো শারিয়ার। টমি যে প্ল্যানটা শারিয়ারকে বুঝিয়েছে সেটাই ভুবনকে বোঝাতে বলে সে তার ফাস্ট প্যাকটা থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করে চলে এলো ওয়াশ রুমে। ওয়াশ রুমে এসে আগের পোশাক পাল্টে পরে নিল কালো প্যান্ট। কালো শার্টের ওপরে নেভি ব্লু সোয়েটার পরে সেও ভুবনের মতো মাথায় চাপিয়ে দিল কালো একটা মাঙ্কি ক্যাপ। রুমে ফিরে এসে নিজের পিস্তল, ছুরি আর ছোটো পিস্তলটা সাজিয়ে রাখল টেবিলের ওপরে।

জিনিসগুলো রেখে সবার দিকে ফিরে সে বলে উঠল, 'আচ্ছা, এখন আমি পুরো পরিকল্পনাটা সবাইকে জানাব। আমরা এখান থেকে গাড়ি নিয়ে চলে যাব সেই দিঘির ওখানে যেখানে কেয়ারটেকারটা খুন হয়েছে। সেখান থেকে আমি আর ভুবন সেই নৌকোটাতে করে বাউন্ডারির কাছে চলে যাব। আমরা বাউন্ডারির ভেতর দিয়ে ওখানে ঢুকে সুমনের সোর্স আর টমির মডেল অনুসরণ করে সেই সন্দেহজনক অফিস এলাকাতে অভিযান চালিয়ে বের করার চেষ্টা করব ডক্টর শশীকে ওখানে আটকে রাখা হয়েছে কিনা। যদি পাই তো ভালো, না পেলে আমরা আর সেই বাউন্ডারির কাছে না গিয়ে মূল গেট দিয়েই বের হওয়ার চেষ্টা করব। একারণেই আমরা বাউন্ডারির ভেতরে ঢোকার পর টমি আর সুমন তোমরা ওখান থেকে গাড়ি চালিয়ে মূল রাস্তায় উঠে সেই বাউন্ডারি এলাকার মূল গেটের কাছাকাছি এসে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করবে। কারণ আমরা ওখানে অপারেশন সেরে এই মূল গেট দিয়েই বের হওয়ার চেষ্টা করব। কাজেই এখানেই তোমাদের নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করাটা খুব জরুরি। এখন পর্যন্ত এই হলো আমার পরিকল্পনা এখন বলো কারো কোনো প্রশ্ন আছে?'

'ভেতরে তাহলে আমি আর তুমি যাচ্ছি?' ভুবন জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' শারিয়ারের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'বস আমরা কি...' সুমন কিছু একটা বলছিল কিন্তু শারিয়ার একটা হাত তুলে থামিয়ে দিল। 'সুমন তোমার জন্য বাইরে থাকাটাই ভালো হবে। কারণ এ-অভিযান আমরা চালাচ্ছি অবৈধভাবে। কাজেই এতে নানা সমস্যা হতে পারে। আমি চাইছি

তোমাকে যতটা সম্ভব ঝামেলা মুক্ত রাখতে। তারপরও কে জানে কী হয়। আর টমি তুমি গাড়িতে থাকেব সুমনের সঙ্গে। গাড়িতে বসেই তুমি কমিউনিকেশন ডিভাইসগুলোর নিয়ন্ত্রণ করবে এবং আমাদেরকে তোমার ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করে গাইড করবে। বোঝা গেছে?'

'জি বস,' টমি বাচ্চাদের মতো মাথা নাড়ল। 'বস যদি অভয় দেন তো একটা আইডিয়া আছে আমার,' স্কুলের ক্লাসে পড়া ধরলে ছোটো পোলাপান যেভাবে হাত তোলে সেভাবে হাত তুলল টমি।

'বলো,' শারিয়ার নিজের অস্ত্রগুলো বিছানার ওপরে টাওয়াল বিছিয়ে সেটার ওপরে সাজাতে সাজাতে জানতে চাইল। 'সভয়ে বলব নাকি অভয়ে বলব?' টমি মৃদু হেসে জানতে চাইল।

'সভয়ে বলেন জনাব,' শারিয়ারও হেসে উঠল তার সঙ্গে। সে নিজের অস্ত্রগুলো টাওয়ালের ওপরে সাজিয়ে রেখে তার জিনিসপত্র ভুবনকে ইশারা করল বের করতে। 'বস, আপনারা একবার ওই গ্রাউন্ডের ভেতরে ঢুকলে তো ওখানে অপারেশন চালানোটা আপনাদের জন্য যেরকম ঝামেলার হবে। আবার অন্যদিকে, ডক্টর শশীকে খোঁজা আবার তাকে পেয়ে গেলে বেরোতেও সমস্যা হবে। কারণ আপনারা কেউই ওই এলাকাটা চেনেন না।'

'কিন্তু তোমার ওই সফটওয়্যার, যেটা আমার মোবাইলে সেট করে দিতে বলেছিলাম,' শারিয়ার টমিকে কথাটা বলতে বলতে দেখতে পেলভুবন তার জিনিসপত্র বের করে সাজাতে শুরু করেছে।

'সেটা তো আছেই,' টমি সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথা বলছে দেখে শারিয়ারের কাছে ভালো লাগল ব্যাপারটা। 'কিন্তু ভেবে দেখলাম ওটাতে দুটো প্রবলেম আছে। কারণ একে তো অন্ধকারে ওটা বের করলে অন্যদের চোখে পড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। তার ওপরে তোমরা যদি দৌড়ের ওপরে থাক তবে ওটা দেখার সময়ই পাবে না। এই জন্যই এর একটা সমাধান আছে আমার কাছে।'

টমি কথা বলতে বলতে থেমে গেছে। কিন্তু সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। তোমরা যেখানে প্রবেশ করতে যাচ্ছো এর কাছেই 'আমরা যেহেতু অবস্থান করব কাজেই আমি চাইছি ছোটো একটা ক্যামেরা ড্রোন যদি ফ্লাই করতে পারি তবে তোমাদের নির্দেশনা তো দিতেই পারব সেই সঙ্গেযেকোনো মুভমেন্ট থেকে যেকোনো ব্যাপারে তোমাদের খুব সহজেই এলার্টও করতে পারব। আর তোমাদেরকেও কিছু করতে হবে না স্রেফ হেডসেটে আমার সঙ্গে অডিও কানেকশনে থাকলেই চলবে।'

'আইডিয়া ভালো কিন্তু এই জিনিস পাবে কোথায়?' ভুবন নিজের ব্যাগ খুলে জিনিসপত্র বের করতে করতে প্রশ্ন করল।

'আছে আমার নিজের কাছেই আছে। আমাকে জাস্ট অফিসে যেতে হবে একবার,' টমির গলায় আবার পুরনো সেই বাহাদুরি ভাব ফিরে আসছে।

'এখন আবার অফিসে যাবা?' প্রশ্নটা টমিকে উদ্দেশ্য করলেও শারিয়ার তাকিয়ে আছে ভুবনের দিকে। ভুবন মাথা নেড়ে তার সাপোর্ট ব্যক্ত করল। 'ঠিক আছে যাব, যদি কাজে লাগে তবে সময় আর কতই-বা লাগবে?' বলে সে টাওয়ালের ওপরে ভুবনের রাখা জিনিসগুলো দেখে আঁতকে উঠল। 'ওরে মাদারটোস্ট, এইগুলা কী?'

ভুবন একে একে তার ব্যাগ থেকে দুনিয়ার জিনিস বের করে সাজিয়ে রেখেছে টাওয়ালের ওপরে। শারিয়ার তো বটেই টমি আর সুমনও এগিয়ে এসেছে দেখার জন্য। 'এইগুলা কী?' শারিয়ার জানতে চাইল। 'তুমি তো দেখি মিয়া পুরো যুদ্ধ বাঁধানোর আয়োজন নিয়া আসছো।'

'আরে বস, এগুলা তো কিছুই না। আমার কালেকশনে যা আছে তার কিছুই তো আনি নাই,' দেখো। 'বলে সে সারি দিয়ে সাজিয়ে রাখা জিনিসগুলো দেখাতে লাগল। 'ম্যাগনাম থ্রি-সিক্সটি,' বলে সে টাওয়ালের ওপর থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে ম্যাগজিন লাগিয়ে লোড-আনলড করে চেক করে নিল। 'পনেরো গুলির রাউন্ড ম্যাগজিন, আর সাইলেন্সার,' বলে সে সাইলেন্সার আর পিস্তল হোলস্টারে রেখে দিল।

'এটা আমার কোল্ট সেভেন্টি কিং কোবরা,' বলে শারিয়ার নিজের পিস্তলটা তুলে দেখাল। ছয় রাউন্ডের ক্লাসিক সিলিন্ডার কিন্তু এটাতে এক্সট্রা ক্লিপ আর লেজার পয়েন্টার সেট করে মেশিনে কনভার্ট করা যায়,' বলে সে ওটাকে মেশিনে কনভার্ট করে হোলস্টারে রেখে সাইলেন্সারটাও রেখে দিল পকেটে। 'এটা আমার লাইটওয়েট কার্বনের ছুরি, আমেরিকার মাইক্রোটেক কোম্পানির, ' বলে সে ছোটো কালো ফলার ছুরিটা দেখাল। 'এটার উল্টোদিকের অংশ দিয়ে তারও কাটা যাবে,' বলে ওটা দেখিয়ে নিজের পায়ের গোড়ালির সঙ্গে রেখে দিল। 'আমার আর ছোটো একটা পিস্তল আছে। কমিউনিকেশন ডিভাইস টমি দেবে।'

'এই?' হাসির সঙ্গে খানিকটা টিটকিরির ভঙ্গিতে বলে উঠল ভুবন। 'এবার আমারগুলো দেখো। বলে সে ছোটো একটা পিস্তল তুলে দেখাল। 'গ্লক পিস্তল মেল ভার্সন,' বলে ওটাতে ক্লিপ লাগিয়ে নিজের গোড়ালির সঙ্গে আটকে নিল। এরপরে টাওয়ালের ওপর থেকে সে পাঞ্জার মতো দেখতে একটা চকচকে ফলার ছুরি দেখিয়ে বলে উঠল। 'আমার গোত্রের বিশেষ ছুরি, এটাকে আমরা বলি হোগলা,' বলে সে ছুরিটা নিজের পিঠের দিকে খাপের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল।

'এইটা ছুরি না তলোয়ার,' ফোড়ন কাটার মতো বলে উঠল সুমন।

'এইগুলা কী?' জানতে চেয়ে টাওয়ালের ওপর থেকে গোল দেখতে পায়রার ডিমের মতো সাইজের গোল বলের মতো একটা জিনিস তুলে দেখতে লাগল টমি।

'এই রাখ,' বলে সে বলটা টমির হাত থেকে নিয়ে সাবধানে শারিয়ারের হাতে দিয়ে দিল। 'বস তুমি এটা রাখো,' বলে সে আরেকটা ওরকম দেখতে জিনিস তুলে দিল। 'এগুলো হলো ছোটো স্মোক বম্ব। বেশি গণ্ডগোল দেখলে ওপরের এই জায়গাটা চেপে দিয়ে এগুলো ছুড়ে দেবে। ঝাঁঝালো ধোঁয়া বেরিয়ে এসে নাক-মুখ জ্বালিয়ে দেবে শত্রুর। তবে সাবধানে, কারণ নিজের নিঃশ্বাস বন্ধ রাখতে হবে।'

শারিয়ার বল দুটো নিয়ে নিজের ভেতরের পকেটে রেখে দিল। 'ওগুলো কী?' খুবই অবাক হয়ে শারিয়ার জানতে চাইল।

ভুবন মৃদু হেসে ওঠে অনেকটা ইংরেজি ওয়াই (Y) অক্ষরের মতো দেখতে জিনিসটা তুলে দেখাল সবাইকে।

'এটা একটা গুলতি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল টমি।

তার দিকে একটা আঙুল তুলে হেসে উঠল শারিয়ার। 'একদম ঠিক। আজ রাতে আমি এটা ব্যবহার করব, পিস্তল না।'

'তুমি গুলতি ব্যবহার করবে?' সুমন প্রশ্ন করল। চেয়ারে হেলান দিয়ে হাইম ছাড়ছিল সে। 'ওটার ফিতাটা এমন ক্যান?'

'হ্যাঁ, আমি গুলতি ব্যবহার করব,' সে শারিয়ারের দিকে দেখিয়ে বলে উঠল। 'যেদিন তোমার সঙ্গে আমার গ্যারাজে মারামারি হলো নিঃশব্দে তোমাকে যে বারবার আঘাত করছিলাম সেটা কী ছিল জানো?'

'এই গুলতি?' শারিয়ার অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। 'এইজন্যই...' তীব্র নিঃশব্দ ব্যথার কথা মনে হতেই সে খানিকটা শিউরে উঠল।

'একদম,' বল সে টাওয়ালের ওপর থেকে চামড়ার থলের মতো দেখতে একটা থলে তুলে নিয়ে মুখটা খুলে দেখাল ওটার ভেতরে রুপালি রঙের ছোটোছোটো বল। 'একটা গুলতি আর এই ছোটো এক ব্যাগ সাইকেলের বল দিয়ে যেকোনো জায়গায় নিঃশব্দে নরক নামিয়ে আনতে পারি আমি। আর এই গুলতিটা কী দিয়ে বানানো জানিস?' বলে সে গুলতির কাঠের হ্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে আসা পাকানো রাবারের মতো ফিতে দুটো দেখাল। 'কনডম দিয়ে।'

'কি দিয়ে!' সুমন চেয়ারে হেলান দেওয়া থেকে সোজা হয়ে বসল।

ভুবন হাসতে হাসতে জিনিসটাকে টেনে দেখাল আবারও। 'কনডম পাকিয়ে। জিনিসটা হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু এটার মতো মারাত্মক জিনিস খুব কমই আছে। কাঠের এই হ্যান্ডেলের সঙ্গে দুই দিকে দুটো করে চারটে খুব ভালো কোয়ালিটির নতুন কনডম খুব ভালো করে পাকিয়ে ওটাতে বিশেষ ধরনের তেল দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়, তারপর আবার ওটাকে দুই হাতে বারবার ভালোভাবে

পাকিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা আটকে দিয়ে বানানো হয় জিনিসটা। ছোটোবেলায় এগুলো দিয়ে আমরা উড়ন্ত চড়ুই পাখি থেকে শুরু করে বাঁদুড় পর্যন্ত ফেলে দিতে পারতাম। আর এখন বড়ো বড়ো অফিসার ফেলে দিতে পারি,' বলে সে শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে উঠল। তার সঙ্গে হেসে উঠল সুমন আর টমি।

'এই চলো চলো, অনেক খাজুরে আলাপ হয়েছে,' শারিয়ার ধমকে উঠল। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

শারিয়ার ধমকে উঠতেই সবাই যার যার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিচে চলে এলো। সুমন নীল মাইক্রোটাকে নিয়ে আসতেই একে একে উঠে বসল সবাই ওটাতে। 'বস কোন দিকে?'

'আগে অফিসে চলো, টমির ড্রোনটা নিতে হবে,' বলে সে টমির দিকে দেখল একবার। 'তারপর ওখান থেকে সোজা সেই দিঘির ওখানে। আজ রাতের ভেতরেই ডক্টর শশীর খবর বের করতে হবে আমাদের।

অধ্যায় বত্রিশ

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

সন্দ্বীপ, দক্ষিণ উপকূল এলাকা

মেয়ে মানুষের জগৎ থেকে কিরানের দূরত্ব আজকের নয়, বহু পুরনো। সত্যি কথা হলো দূরত্ব নয়, আসলে ওই জগতে কোনোদিন ঢোকারই সুযোগ হয়নি ওর। তার ওপরে সমুদ্রে জীবন কাটানো, এরপরে সেখানে সব হারানোর পরের চারটা বছর কোন দিকে দিয়ে গেছে টেরই পায়নি। আর তাই মেয়েদের কাছাকাছি হওয়া কিংবা সংসার করার চিন্তা-ভাবনা এসব আর কোনোদিন মাথায়ই আসেনি। তবে মেয়ে মানুষের ব্যাপারে সে অজ্ঞ কিংবা বোকা নয়। চোখের সামনে যে মেয়েটাকে সে দেখতে পাচ্ছে কিংবা বলা চলে মেয়েদের যে দলটাকে সে দেখতে পাচ্ছে সেটা একেবারেই অদ্ভুত একটা দল।

পদ্মরানির দস্যু দলের কথা সে শুনেছিল লোকমুখে। সে শুনেছিল দক্ষিণের সমুদ্রে নাকি নারীদের একটা দস্যুদল ঘুরে বেড়ায়। এরা নাকি ঠিক যেমন নিষ্ঠুর তেমনি যুদ্ধবাজ। আর অস্ত্র চালনায় দক্ষ। কিন্তু এই দলটার অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা এ-ব্যাপারে সে কোনোদিন কোনো সঠিক তথ্য পায়নি। সমাজের কাছে এই দলটার ব্যাপারে সবার ধারণা অনেকটাই ওরকম। আর তাই এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এরকম একটা দলের মুখোমুখি হবে তাও আবার আকরাম বেগের মতো একজন মানুষের দেখানো পথে সেটা সে ভাবতেই পারছে না।

বিশেষ করে চোখের সামনে যে মেয়েটাকে সে দেখতে পাচ্ছে এরকম কোনো মেয়েমানুষ হতে পারে তার কোনো ধারণাই ছিল না। বিশেষ করে সন্ধ্যের সময়ে গণিকালয়ের আঙিনাতে দেখা মেয়েটা আর এই মেয়ের ভেতরে আকাশ আর পাতালের পার্থক্য। 'কিছু সময় আগে আপনেই ছিলেন না ওইখানে?' বলে সে ইশারায় আঙিনাটা দেখাল।

'আমি অনেক সময়েই অনেক জায়গায় থাকতে পারি। এইটা কুনো বিষয় না,' মেয়েটা একেবারে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিরানের সামনে। দুই পা ফাঁক করা, এক হাত কোমরে রাখা কিরান অনুমান করল মেয়েটার কোমরে অস্ত্র রাখা আছে। শুধু অস্ত্র না, কিরান খেয়াল করে দেখল দলের সব মেয়েই ছেলেদের পোশাক

পরনে, প্রত্যেকের পোশাক কালো এবং প্রত্যেকের সঙ্গেই অস্ত্র। কিরান সবচেয়ে বেশি অবাক হলো মেয়েগুলোর শারীরিক ভঙ্গি দাঁড়ানো আর নড়াচড়ার ধরন দেখে। মেয়েরা এভাবে দাঁড়ায় না, এভাবে কথা বলে না। এরা একেবারেই অন্যরকম।

যেমন, ওর সামনে এই মুহূর্তে যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে সে দুই পা ফাঁক করে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন দুনিয়ার কিছুই পরোয়া করে না। 'আমি ঠিক বুঝতে পারতাছি না। তুমরা এইখানে এইবাবে তুমগো লগে বাবা মানে তালেব কিরান অথবা আকরাম চাচার সম্পর্ক কী?' কিরান একবার ওদের দিকে দেখে নিল। ওদেরকে একেবারে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে দলটা। কিরান জানে যদিও কারো হাতে এই মুহূর্তে অস্ত্র নেই কিন্তু প্রয়োজনে মুহূর্তের ভেতরেই এরা অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করবে না।

'শোন, তৈমূর চাচার পোলা তালেব কিরান,' ওর সামনে দাঁড়ানো মেয়েটা নিজের বাদামি চোখজোড়া যেন তীরের মতো তাক করে রেখেছে কিরানের ওপরে। ঠিক তীরের মতোই সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে আর বাণের মতো ছুটে আসছে মুখের কথা। 'তুমি তোমার বাপেরে কট্টুক চিনতা আমি জানি না। কিন্তু তুমার বাপের অনেকগুলা চেহারা আছিল। যাকগা সেইটা বিষয়না। এই যে তুমি আমার সামনে খাড়ায়া আছ, কথা কইতাছো, এইটা একমাত্র তুমার বাপের কারণে পারতাছো। নাইলে এতক্ষণে...'

পেছন থেকে কেউ একজন বলে উঠল, 'পদ্ম, কামের কথা বল। বেলা অনেক চইলা গেছে।'

দস্যুদলের মেয়েটার নাম পদ্ম। এই মেয়ের নামেই কী তবে দলটার নাম দস্যু পদ্মরানির দল। প্রশ্নটা কিরানের মুখে চলে এলেও সে জিজ্ঞেস করল না। বরং মাঠের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'তুমরা কী বলতে চাইতেছো ঠিকঠাক বলো।'

মেয়েটা একবার তার দলের অন্যদের দিকে দেখে নিয়ে বলে উঠল, 'তুমার বাপের লাইগ্গা আমরা কথা দিসিলিম তুমারে সাহাইয্য করব। কিন্তু সত্য কথা অইলো একটা বিরাট ফ্যাঁকরা অই গেছে।'

কিরান একট হাত তুলল সামনের দিকে। 'দেখো অত কথা জানি না। আমি স্রেফ আকরাম চাচার কারণে এইখানে আসছি। আমি জানি না বাপু। কিংবা আকরাম চাচার লগে তুমগো কী সম্পর্ক আমি জানতে চাইওনা। এই দুনিয়ার লগেও তুমগো কী সম্পর্ক সেইটা আমার জানার আগ্রহও নাই, আমার আগহ একটাই। আমি বাপুর ব্যাপারে জানতে চাই। বাবা কোথায় আছে আর সিলভেরা কই আছে,' কিরানের গলায় পুরনো জোর ফিরে আসছে।

'বাহ পুলায় তো দেহি কথা ভালাই জানে,' পদ্মের পেছন থেকে একজন এগিয়ে এলো সামনের দিকে। মহিলা বিশালাকায় দেখতে। প্রায় কিরানের সমানই লম্বা

সে, কিন্তু চওড়ায় ওর দ্বিগুণ হবে। কিরানের সামনে এসে মুখের আবরণ সরাতেই কিরান দেখে রুক্ষ একটা চেহারা। আর চোখের নিচ থেকে শুরু করে বাম কানের গোড়া পর্যন্ত লম্বা একটা কাটা দাগ চোহারাটাকে আরো রুক্ষ করে তুলেছে। 'এই পুলা, কথা যত বড়ো কইলজা অত বড়ো নি?'

'মাসি আমি কথা বলতাছি,' মহিলাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে পদ্ম আবারও এগিয়ে এলো সামনের দিকে। 'দেখো জাহাজি, আমরা তুমারে সাহায্য করতে চাই দেইখাই এইখানে আসছি আমরা। কিন্তু হের লাইগা আগে বিশ্বাস করতে অইবে।'

'দস্যুগরে আবার বিশ্বাস কীসের?' কিরানের পেছন থেকে একজন লাঠিয়াল বলে উঠল। কিরান একটা হাত তুলে থামিয়ে দিল তাকে।

'বলো, ব্যাপার কী?'

'দেখো, আগেই বলছিলাম তুমার বাপের কাছে ঋণ আছে আমগো। তাই তারে কথা দিসিলাম তাকে সাহায্য করব। কিন্তু সেই অনুযায়ী একটা আমানত রাইখা গেছিল সে আমগো কাছে। আসলে ঠিক বলতে গেলে আমগো কাছে না। আমগো আরেকজনের কাছে। কিন্তু সেইটা আমরা রক্ষা করতে পারি নাই।'

'আমি আরো ভাঙায়া বলতাছি,' পেছন থেকে আরেক দস্যু মহিলা সামনের দিকে এগিয়ে এলো। 'রোসাঙ্গ থেইকা যখন তুমার বাপে পলায় হের ঘরে ছিল আরাকানের রাজার এক সভা কবি। হেয় তুমার বাপের খাস বন্ধু আছিল। হের কাছেই তুমার বাপুর সব খবর আছে। তুমার বাপে তো জাহাজ নিয়া সইরা পড়ল। তার আগে এই কবিরে সে সন্দ্বীপের পাটোয়ারির কাছে রাইখা যায়। শর্ত ছিল সে তুমগোরে তৈমূর কোন দিকে যাবে সেই ব্যাপারে সব জানাবে, আর তুমরা তাকে মক্কার বা ওইদিকের কোনো জাহাজে উঠায়া দিবা। কিন্তু সে সন্দ্বীপে আইসা আইটকা গেছিল। আমগোরে তুমার বাপে নির্দেশ করছিল হেরে কুনোমতে তুমার হাতে দিতে। সেইটাই আমগো নিয়ত আছিল কিন্তু এর আগেই রোসাঙ্গের লোক সব টের পাইয়া যায়। হেরে ধইরা লই গেছে। আইজ তার ফাঁসি হবে সুলতানের বাজারে।'

'মানে হইলো,' কিরন এখনো পুরো ব্যাপারটা ধরতে পারছে। 'বাপু আর তার লোকেরা কোথায় আছে, কোন দিকে গেছে এইটা একমাত্র এই কবি জানে, আর সেই কবির আজ ফাঁসি?'

'একদম ঠিক। কারণ আমরা এইটা জানি তুমার বাপে সন্দ্বীপ আসছিল। কিন্তু আমরা এইটা কেউই জানি না, এইখান থনে তুমার বাপ কুন দিকে গেছে। সিলভেরা হের পিছু নিয়া কোন দিকে গেছে। এইটা জানে একমাত্র ওই কবি,' পদ্মের গলায় আকুতি।

'খালি তাইনা?' তৃতীয় সেই মহিলা দস্যু যোগ করল। 'তুমি যদি তুমার বাপের ব্যাপারে তথ্য জানতে চাও মানে তারে বাঁচাইতে চাও তবে তুমার আগে অই কবিরে বাঁচাইতে হবে।'

'হায় খোদা,' দীর্ঘ এক নিঃশ্বাস নিয়ে কিরান বলে উঠল। 'সেইটা কীভাবে সম্ভব? আমার সঙ্গে আছে তিনজন। এইখানে আমার আরো লোক আছে। কিন্তু হেরা কই আছে আমি জানিনা। কাজেই...'

'সম্ভব,' পদ্ম বলে উঠল। 'তুমার সঙ্গে লোক আছে। আমগো লোক আছে। আমরা তুমারে সাহায্য করব। তার চেয়ে বড়ো কথা আমার একটা পরিকল্পনা আছে। এখন কও।'

কিরান কিছু বলার আগেই বাজারের দিক থেকে ভেসে এলো অদ্ভুত এক শব্দ। ঢাকের শব্দের মতো শোনাচ্ছে শব্দটা। কিরান ভালো করেই জানে এই শব্দ। কাউকে ফাঁসি দেয়ার আগে আরাকানিরা এ-ধরনের ঢাক বাজায়।

'জাহাজি, জলদি করতে অইবো, আমি কী বলি মন দিয়া শোন।'

***

যতটা না মন দিয়ে শুনছে তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহের সঙ্গে তারা প্রায় সবাই সামনের দিকে তাকিয়ে আছে দেখার জন্য। গোলন্দাজ আর তার দলের বাকি চারজন এই মুহূর্তে উপস্থিত সুলতানের বাজারের কেন্দ্রের দিকে। সুলতানের বাজারের গঠনটা খুবই অদ্ভুত। একেকটা অংশ এখানে একেকটা গলির মতো লম্বা হয়ে এগিয়েছে একদিকে। যেমন মসলা একটা গলি ধরে, কাঁচাবাজার একটা গলি ধরে। আর এরকম সাতটা গলি এসে মিশেছে বাজারের ঠিক কেন্দ্রের মধ্যে, যেখানে গোল করে একটা চত্বরের কাছে। সেই চত্বরে যখন কোনো বড়ো ঘটনার আয়োজন করা হয় তখন সেখানে বসানো হয় একটা বড়ো মঞ্চের মতো। সেই মঞ্চের ওপরে উঠে বড়ো দুটো ঢাক বসানো হয়েছে। সেগুলো দুজন মুশকো পালোয়ান ধুমসে ঢাক বাজাচ্ছে।

'এইটা অইলো ফাঁসি দিওনের আগে মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা,' গোলন্দাজের পাশ থেকে বিল্লাল শেঠ বলে উঠল। পাটোয়ারির হাম্মামখানায় যখন তারা জানতে পারে যে কবিকে বাজারের মঞ্চে ফাঁসি দেওয়া হবে তখন প্রথমে ওরা ভেবেছিল কিরানের দলকে খবর দেবে। কিন্তু সেটা না করে তারা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয় সোজা সেখানে চলে যাবে যেখানে ফাঁসি দেওয়া হবে। এরপর সম্ভব হলে তাই করার চেষ্টা করবে ফাঁসি থামাতে। এর পেছনে রঙ্গন মল্লিকের সূক্ষ্ম একটা বুদ্ধি আছে। কারণ সে এটা

বুঝতে পারছে যেখানেই হোক কিরান কিংবা তার অন্য লোকেরা ঠিকই বের করে ফেলবে এখানে কাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। রঙ্গনের ধারণা ওরাও কোনো না কোনোভাবে সেটা ঠেকানোর জন্য এখানে চলে আসবে।

গোলন্দাজ আর তার সঙ্গে বাকিরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে ফাঁসি যেখানে দেওয়া হবে সেই মঞ্চ থেকে কয়েকশ গজ দূরে। এটাও গোলন্দাজেরই পরিকল্পনা। আগে ওরা পরিস্থিতি বুঝবে, তারপর চেষ্টা করবে সব সামাল দেয়ার। আর সেকারণেই তারা চেষ্টা করছে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে সাহায্য করার। রঙ্গন তার সঙ্গে বৈঠা আর বিল্লাল শেঠকে রেখেছে একপাশে আর লাঠিয়াল দুজনকে রেখেছে অন্যপাশে। সে একবার অন্যদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল।

তারা প্রস্তুত হতে হতেই বাজারে একদিকের গলি দিয়ে প্রবেশ করল দীপের প্রহরীদের একটা দল। 'আসতেছে ফাঁসির আসামি।' দলের অগ্রভাবে দুজন ঢুলি, তারা ঢোল বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে। তাদের ঠিক পেছনেই দুজন পাহারাদার। পাহারাদার দুজনার মাঝখানে মুখে কালো কাপড়, ছেঁড়া ফতুয়া পরা হাত বাঁধা একজন মানুষ। তার মুখমণ্ডল কালো কাপড়ে ঢাকা। তাদের পেছনে কালো ঘোড়া দেখা গেল। সেগুলোতে করে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসছে।

এদের ভেতরে একজনকে দেখে সঙ্গেসঙ্গে চিনতে পারল গোলন্দাজ, রোসাঙ্গের রাজার খাস লোক। এই লোকটাই ওদের গ্রামে অভিযান চালানোর সময় নেতৃত্ব দিচ্ছিল। গোলন্দাজের পুরো গ্রাম তছনছ করার জন্য এই লোকই দায়ী। গোলন্দাজের গা জ্বলে উঠল লোকটাকে দেখে। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু করার নেই। বরং সে খানিকটা সচকিত হয়ে উঠল, এই ব্যাটা না আবার ওকে দেখে চিনে ফেলে। লোকটার ঘোড়া প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। আরেকটু এগোলেই ওদের দেখতে পাবে। আর কোনো কারণে যদি লোকটা এদিকে তাকায় তবেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। সরাসরি সে দেখতে পাবে গোলন্দাজকে।

গোলন্দাজ এমন পোশাক পরে আছে যে চাইলেই চট করে মুখটা ঢেকে ফেলা সম্ভব নয়। আবার এরকম বাজারের মধ্যে হঠাৎ মুখ ঢেকে রাখাটাও সন্দেহজনক। দেখা যাবে মুখ ঢেকে রাখার কারণেই তার দিকে দৃষ্টি পড়ে যেতে পারে। মুহূর্তের জন্য দ্বিধার ভেতরে পড়ে গেলেও গোলন্দাজ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, কী করতে হবে। প্রথমেই চট করে খানিকটা নিচু হয়ে গেল সে। এতে করে ভিড়ের ভেতরে তাকে নজরে পড়ার সম্ভাবনা খানিকটা কমে গেল। তারপর ভিড় ঠেলে পিছিয়ে গেল দুইপা। ভিড়ের ভেতরে উল্টো ঘুরে হাঁটতে গেলে নজরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই এই পন্থা। কয়েক পা পিছিয়ে এসে সে বসে পড়ল একটা বন্ধ দোকানের চৌকাঠের ওপরে। দম নিতে লাগল বড়ো করে। আরেকটু হলেই ধরা

পড়ে যাচ্ছিল। হয়তো কিছুই হতো না, তারপরও একটা ঝুঁকি ঠিকই ছিল। কিন্তু এখন বড়ো ভাবনার বিষয় হলো, এখানে কী করবে। কীভাবে ঠেকাবে এই লোকগুলোকে, কীভাবেই বা উদ্ধার করবে সেই লোকটাকে। কিরান সঙ্গে থাকলে একটা উপায় বের করতে পরত। কিন্তু এখন উপায় কী।

যে বন্ধ দোকানটার সামনে বসে আছে ওটার চৌকাঠের ওপরে একপাশে স্তূপ করে রাখা আছে নানা ধরনের দড়িদড়া। দড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে গোলন্দাজের মাথায় খেলে গেল ধারণাটা। পিঠের ওপরে সে অনুভব করল বন্দুকটাকে। একটা উপায় মাথায় এসেছে। কিন্তু এর জন্য লোকবল আরেকটু ভালো হলে ভালো হতো। কিন্তু উপায় কি। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে সে ফিরে এলো নিজের লোকদের কাছে। হাতের ইশারায় বৈঠা, বিল্লাল শেঠ আর লাঠিয়াল দুজনকে সে বলে দিল কী করতে হবে। ওরা খানিকটা আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল কিন্তু ওদের ভিড়ের ভেতরে একজনকে দেখে বৈঠা চেঁচিয়ে উঠল। তার দেখাদেখি গোলন্দাজও সেদিকে ফিরে তাকাল।

প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না সে। তারপর ভালোভাবে খেয়াল করে দেখল ওদের থেকে খানিকটা দূরে ভিড়ের ভেতরে আরেকটা দল দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দেখায় চট করে চিনতে না পারলেও খেয়াল করলেই দলের মূল লোকটাকে দেখতে পেল সে। 'তুলারাম,' আনমনেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওর।

'খালি তুলারাম না, বেদু আর আগো লগের লাঠালরাও আছে,' খুশি খুশি গলায় বলে উঠল বৈঠা।

'এক্ষণ যা, আগোরে ডাইকা নিয়া আয় এহানে,' বৈঠাকে নির্দেশ দেয়ার আগেই সে রওনা দিতে যাচ্ছিল, গোলন্দাজ আবারও তাকে ঠেকাল। 'শুনো, এহানে না। আগোরে নিয়া পিছে আয়,' বলে সে বৈঠাকে পাঠিয়ে দিল ওদের দিকে। তারপর নিজের সঙ্গের তিনজনকে নিয়ে রওনা দিল দোকানের পেছন দিকে। ভিড় ঠেলে ওরা ওখানে পৌঁছানোর একটু পরেই বৈঠা, বেদু, তুলারাম আর ওদের সঙ্গের দুজন লঠিয়াল চলে এলো দোকানের পেছনে। ওদের কাছ থেকে ওরা জানতে পারল ওরা বাজারে ঘুরতে ঘুরতে চণ্ডুখানায় জানতে পারে এখানে একজনের ফাঁসি দেওয়া হবে যে কিনা রোসাঙ্গ থেকে আসছে। তাই ওরাও মনে করছে কোনোভাবে যদি ঠেকানো যায় বিষয়টা তাই চলে আসছে এখানে।

গোলন্দাজ ওদেরকে দেখে খুশি হয়ে উঠল। কারণ সে যা করতে যাচ্ছিল তাতে ওদের লোকবল দরকার ছিল। আর ওরা আসাতে খানিকটা হলেও লোকবল বৃদ্ধি পেয়েছে যে কারণে এখন পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা বেড়ে গেছে বহুগুণ। 'শোন, আমরা সবাই এখানে বুঝতে পারছি যারে ফাঁসি দেওয়া অইতাছে

তারে আমগো দরকার। তার ফাঁসি ঠেকাইতেই হবে যেহেতু কিরানরে পাইতেছি না কাজেই আমগোরই চেষ্টা করতে হবে,' বলে সে নিজের পিঠের ওপর থেকে বন্দুকটা বের করে আনল। সবাইকে সেটা দেখিয়ে বলে উঠল, 'যা করতে চাইতেছি সেটাতে ঝুঁকি আছে কিন্তু কাম হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। আমি কী কই ভালোভাবে শুনো। কারণ সময় খুবই কম,' এইটুকু বলে সে সবাইকে নিজের পরিকল্পনা খুলে বলে প্রত্যেককে যার যার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে তুলারামকে তদারকির দায়িত্ব দিয়ে দ্রুত বিদেয় করে দিল। সবাই চলে যেতেই সে দোকানের পেছনের অন্ধকার জায়গাটা ভালোভাবে দিখে নিল, কেউ আছে কিনা।

একেবারে শুনশান। কোনো মানুষের ছায়াও নেই। সবাই যার যার মতো ফাঁসি দেখতে গেছে। গোলন্দাজ আশেপাশে দেখে নিয়ে হাতের বন্দুকটাকে আবারও পিঠের ওপরে ঝুলিয়ে নিলো, তারপর দোকানের পেছনে মাটির দেয়ালের মতো উঁচু জায়গাটাতে চড়ে বসলো। সেখানে একটা গাছের ডাল ঝুঁকে দিয়ে সেটা থেকে লাফিয়ে চড়ে বসলো গাছের ডালে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে একটার পর একটা ডাল বেয়ে চলে এলো বেশ উঁচুতে। সেখানে একটা ডালের দুই পাশে দুই পা রেখে হেলান দিয়ে বসল গাছের মূল কাণ্ডের ওপরে।

বসে হাঁপাতে লাগল সে। একসময় এসব কাজ ডালভাত ছিল, এখন বয়স বেড়েছে গত কয়েক বছরের আরামদায়ক জীবনের কারণে শরীর অনেকটাই ঢিলে হয়ে গেছে, তবু অভ্যাস বলে একটা ব্যাপার আছে। আর সেটার কারণেই সে এখনো আগের মতোই ঝুঁকি নেবার নেশাটা রয়ে গেছে। গাছে উঠতে উঠতে সে ভয় পাচ্ছিল যে, দেরি হয়ে গেল কিনা। কিন্তু গাছে উঠে ভালোভাবে সামনে তাকিয়ে দেখল, আয়োজন প্রায় শেষের দিকে হলেও ফাঁসি এখনো হয়নি। সে ভালোভাবে শরীরটাকে সেট করে নিয়ে পিঠের ওপর থেকে বন্দুকটাকে নামিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিল। কারণ বন্দুকে গুলি ভরা আছে একটাই। আর একবারই গুলি করার সুযোগ আছে। কারণ একবার গুলি না লাগাতে পারলে আবারও কোমরের থলে থেকে সিসা বের করে সেটা বন্দুকে ভরতে হবে। বারুদের পুরিয়া দিয়ে সেটাকে ঠেসে ভরে লোড করে তাক করতে করতে গুলি করার সুযোগ সে আর পাবে না। কাজেই একবারই সুযোগ।

গোলন্দাজ জানে না তার লোকেরা এখনো জায়গামতো পৌঁছাতে পেরেছে কিনা। সে জানে না কিরানেরা কোথায় আছে। সে একমাত্র নজরে রেখেছে ফাঁসির মঞ্চ আর সেখানে উপবিষ্ট মানুষদের দিকে। মঞ্চের ওপরে একটা চারকোনা কাঠের চৌকাঠের মতো। সেটার সঙ্গে ঝোলানো হয়েছে একটা মোটা দড়ি। আর সেই

দড়িতে ঝোলানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মানুষটাকে। গোলন্দাজ বন্দুক তাক করল। মানুষটাকে ফাঁসির মঞ্চের নিয়ে তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হলো দড়ির ফাঁসটা।

গোলন্দাজ বন্দুকের ওপরে নিশানা ঠিক করে বন্দুকের নিশানা করার দুটো বিন্দুকে নিয়ে এলো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে। আর সেটা নিশানা করছে ঠিক ফাঁসির দড়িটার ওপরে। দড়িটা মানুষের নড়াচড়ায় সামান্য নড়ছে। গোলন্দাজ দুই হাত আরো শক্ত করে বন্দুকটাকে আরো শক্ত করে চেপে ধরল কাঁধের সঙ্গে। মুহূর্তের জন্য একটাবার নিশানা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেখে নিল জল্লাদকে। এখানে ফাঁসি দেওয়ার নিয়ম হলো, ফাঁসির আসামিকে দাঁড় করানো হয়েছে একটা টুলের ওপরে। সেই টুলটা একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। যারা ফাঁসির নির্দেশ দেবে তারা ইশারা করতেই জল্লাদ দড়িতে টান দিতেই টুলটা সরে যাবে, আর লোকটা ঝুলে পড়বে।

জল্লাদ লোকটা শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে টুল সরানোর দড়িটা টানটান করে ধরে রেখেছে। ইশারা করামাত্রই সে দড়িটা টেনে দেবে আর ঝুলে পড়বে লোকটা। গোলন্দাজ তাকিয়ে আছে ফাঁসির দড়িটার দিকে। ওটা টানটান হতেই সে টেনে দেবে ঘোড়া।

কোথায় যেন বিকট শব্দ হলো।সেই সঙ্গে দূর থেকে শব্দ না পেলেও মানুষের চিৎকার ঠিক কানে এলো তার। কিন্তু তাকানোর উপায় নেই। সে দৃষ্টি স্থির রাখল সেকেন্ডের মধ্যে দড়িটা টানটান হয়ে গেল আর গোলন্দাজ বন্দুকের ঘোড়া টেনে দিল। বিকট শব্দে গুলিটা ছুটে যেতেই গোলন্দাজ চোখ তুলে দেখল গুলিটা দড়িতে লাগেনি।

কিন্তু ব্যাপারটা পুরোপুরি অনুধাবন করার আগেই একসঙ্গে ঘটতে শুরু করল অনেকগুলো ঘটনা।

অধ্যায় তেত্রিশ

বর্তমান সময়

পিবিআই অফিসের সামনে, চট্টগ্রাম

'কি ব্যাপার, পোদ্দার সাহেব এত দেরি করছে কেন?' শারিয়ার ঘড়ি দেখতে দেখতে আনমনেই বলে উঠল। আপাদমস্তক গাঢ় রঙের পোশাকে তাকে আর ভুবনকে খানিকটা অদ্ভুতই দেখাচ্ছে। বিশেষ করে ভুবন আবার এখানে-সেখানে নানা ধরনের অস্ত্র-সস্ত্র নেয়াতে তাকে আরেক কাঠি সরেস লাগছে দেখতে।

পিবিআইয়ের রেস্ট হাউস থেকে এসে এই মুহূর্তে ওদের মাইক্রো অবস্থান করছে পিবিআইয়ের জোনাল অফিস থেকে একটু দূরেই। অপারেশনে যাবার আগে এখানে আসার কারণ হলো টমি পোদ্দার অফিসে গেছে তার নাইট ভিশন মিনি ড্রোন ক্যামেরাটা নিয়ে আসার জন্যে। আর বাকিরা অপেক্ষা করছে সুমনের নিয়ে আসা সেই নীল মাইক্রোতে।

'চলে আসবে, বস,' ড্রাইভিং সিট থেকে সুমন বলে উঠল। 'বস, কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?' সুমনের গলায় অদ্ভুত এক অস্বস্তি। শারিয়ার আর ভুবন দুজনেই ফিরে তাকাল তার দিকে।

'একটা ক্যান, দুইটা জিজ্ঞেস করো,' শারিয়ার অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে মৃদু হাসির সঙ্গে বলে উঠল।

'বস, যে-কামে যাইতেসি ধরা পড়লে চাকরি থাকবে তো?' সুমনের গলায় অস্বস্তির পরিমাণ আরেক কাঠি বৃদ্ধি পেয়েছে। 'বস, বিয়ে হইছে মাত্র দেড় বছর। এখনি...'

সুমনের কথা শেষ হবার আগেই তার পাশের সিট থেকে ভুবন হেসে উঠল। 'ভুল প্রশ্ন করলা অফিসার সুমন মিয়া,' বলে সে আরেকবার হেসে উঠে পেছনের সিটে বসা শারিয়ারের দিকে দেখল। শারিয়ারের মুখেও মৃদু হাসি। 'সুমন, তোমার প্রশ্ন করা উচিত ছিল যে-অপারেশনে তুমি যাচ্ছো, তা থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে কিনা?' বলে সে বেশ উচ্চ স্বরে হেসে উঠল।

যদিও ভুবনের উচ্চ হাসির সঙ্গেসঙ্গে শারিয়ারও হেসে উঠেছিল কিন্তু ভিউ মিরর থেকে প্রতিফলিত হওয়া সুমনরে পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে সে খানিকটা

সিরিয়াসনেসের সঙ্গে হাসি থামিয়ে ধমকে উঠল ভুবনকে। 'এই এমনেই যাচ্ছি একটা কাজে তার উপরে আবার ভয় দেখাচ্ছে আজাইরা,' যদিও সে কথাটা খানিকটা সিরিয়াস ভঙ্গিতেই বলার চেষ্টা করেছে কিন্তু বলার সঙ্গেসঙ্গে আবারো হেসে উঠল সে। আর শারিয়ারের হাসি দেখে ভুবন যাও হাসি থামিয়ে ফেলতে যাচ্ছিলো তার আগেই সে আরো উচ্চস্বরে হেসে উঠল। দুজনে মিলে হাসতেই থাকল।

সামনে থেকে রীতিমতো দুঃখী চেহারা করে ওদের দিকে ফিরে তাকাল সুমন তারপর প্রায় ছোট বাচ্চাদের মতো অভিযোগের সুরে বলে উঠল, 'বস, আপনিও।'

কোনমতে হাসি থামিয়ে পেছন দিকে দেখিয়ে শারিয়ার বলে উঠল, 'ওই যে, টমি চলে এসেছে।'

টমি তার আগের ব্যাগটা গাড়িতে রেখে গেছিল এখন নতুন একটা ব্রিফকেসের মতো দেখতে ব্যাগ হাতে নিয়ে ত্রস্ত পায়ে এসে গাড়িতে উঠে পড়ল। 'চলেন চলেন গাড়ি ছাড়েন,' দম নিতে নিতে সে বলে উঠল।

'সুমন গাড়ি ছাড়ো,' বলেই সে টমির কাছে জানতে চাইল, 'কি, জিনিস পাওয়া গেছে?' শারিয়ার তার হাতে থেকে ব্রিফকেসটা নিয়ে পাশের সিটে রেখে মাইক্রোর দরজা বন্ধ করতে করতে জানতে চাইল।

'আরে বস আর বইলেন না। বুঝলাম না কাহিনি অফিসে দুনিয়ার লোকজন এই সময়েও। এমনে তো ৫টা বাজার পর একটা মাছিও দেখা যায় না। আরে সবাই ফাঁকি ফুঁকি দিয়া...'

'টমি,' মৃদু ধমকের সুরে বলে উঠল শারিয়ার।

'ওকে ওকে বস,' টমি নিজের হাত তুলল আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। 'জিনিস পাইছি, নিয়াও আসছি। তোমাদের জায়গামতো নামিয়ে দিয়েই আমি সেট করে ফেলব জিনিসটা। আশা করি, একবার আমরা জায়গামতো পৌঁছে যেতে পারলে ওটার মাধ্যমে ভালো একটা ব্যাকআপ দিতে পারব তোমাদের।'

সন্তুষ্টির সঙ্গে মাথা নাড়ল শারিয়ার তারপর সুমনের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'সুমন, তখন হাসছিলাম দুষ্টামি করে। শোন, আমি তোমাদের অভিযানে নিয়ে যাচ্ছি একরকম বলতে পারো বাধ্য হয়ে।'

'আরে, বস-' সামনে থেকে সুমন ক্লারিফিকেশনের জন্যে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই শারিয়ার আবারো কথা বলে উঠল।

'আমি আগে বলি,' বলে সে মৃদু হেসে উঠল। 'কিন্তু তারপরও যেহেতু নিয়ে যাচ্ছি আমি তোমাদের কাজেই তোমাদের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে এমনকি চাকরি বা এসব বিষয়ের দায়িত্বও আমার। যদি এখানে কিছু একটা ঘটে। আমি দেখবো। আর আমরা ডিপার্টমেন্টের কাছেই যদি ধরা পড়ে যাই বা কোনো সমস্যা হয় তবে

সেই দায়ভার আমার। আর যেহেতু আমাদের ভেতরে আমি আর ভুবন দুজনেই এইসব অপারেশনের জন্যে ট্রেইন্ড, এই কারণেই আমি আর ভুবন ওখানে যাব আর তোমরা বাইরেই অপেক্ষা করবে। টমি তুমি আমাদের সবাইকে এন্টারনাল কমিউনিকেশন ডিভাইস লাগিয়ে দেও।'

'অবশ্যই বস,' বলে সে আগের ব্যাগ খুলে মেয়েদের গয়নার বাক্সের মতো দেখতে কালো একটা চেপ্টা বাক্স বের করে এনে ওটা থেকে ছোট ছোট ইয়ার পিস বের করে সবার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পরে নিতে বলল যার যার কানে। সবাই যার যার মতো পরে নিজেদের ভেতরে ডিভাইস চেক করে নিল।

'বস কাছাকাছি চলে এসছি,' সুমন বলে উঠল।

'বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে গাড়ির লাইট অফ করে আমাদের মূল রাস্তার ওপরে নামিয়ে দেবে,' বলে সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বলে উঠল। 'নাহ থাক এই অন্ধকারে পায়ে হেঁটে পুকুরপাড়ে যেতে সমস্যা হবে। কাজেই গাড়ি নিয়ে একটু ঘুরে সোজা পুকুরপাড়ে চলে যাও।'

সুমন তাই করল। বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে পথ ঘুরে সেই বাউন্ডারির গেট পার হয়ে গাড়িটাকে নিয়ে সোজা চলে এলো কেয়ারটেকারের লাশ পাওয়া সেই পুকুরপাড়ে।

পুরো এলাকা একেবারে অন্ধকারে ডুবে আছে। একমাত্র ওদের গাড়ির হেডলাইট ছাড়া আর কোনো আলো নেই! শারিয়ার আর ভুবন গাড়ি থেকে নেমে এসে জিনিসপত্র চেক করে নিল। সুমন গাড়ির জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শারিয়ার দুজনকেই উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'শোন, আমরা নৌকোটায় ওঠা মাত্রই তোমরা এখান থেকে গাড়ি নিয়ে চলে যাবে ওই বাউন্ডারি ঘেরা এলাকাটার মেইন গেটের কাছে,'বলে শারিয়ার একটা আঙুল তুলল। 'সুমন এবং টমি দুজনকেই বলছে যেখানেই অবস্থান করো বিপজ্জনক এলাকা থেকে যথেষ্ঠ পরিমাণ দূরত্ব বজায় রাখবে। কোনো ধরনের ঝুঁকিতে যাবে না, আমি আবারো বলছি কোনো ধরনের ঝুঁকিতে যাবে না।

দুজনেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। 'আমি একবার বাউন্ডারির বাইরের গেটের কাছে অবস্থান নিলেই ড্রোনটা ওড়াব।'

'কোন সমস্যা নেই,' বলে শারিয়ার সুমনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে উঠল, 'সুমন, চাকরি নিয়ে চিন্তা করোনা। এখান থেকে বেঁচে ফিরলে যদি চাকরি নাও থাকে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি এখানে যা বেতন পাও তারচেয়ে বেশি বেতনের চাকরি আমি তোমাকে দেব। খুশি?' বলে সে হেসে উঠল। তার সঙ্গে হেসে উঠল বাকিরাও।

'গুড লাক, বস।'

শারিয়ার একবার মাথা নেড়ে ভুবনকে ইশারা করে দুজনে মিলে এগোতে শুরু করল নৌকা রাখার ঘাটের দিকে। গাড়ির আলোতেই নৌকোটার দড়ি খুলে ওটাতে চড়ে বসল দুজনে। নৌকায় উঠে দাঁড় তুলে নিয়ে গাড়িটার দিকে ইশারা করে শারিয়ার দাঁড় নামাল পানিতে। নৌকাটাকে সামান্য ঘুরিয়ে নিতেই ধীরেধীরে জাকিরদের গাড়িটাও ঘুরতে শুরু করল। মিনিটখানেকের ভেতরেই গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেল এলাকা ছেড়ে। সঙ্গেসঙ্গে যেন অন্ধকারের একটা ঢাকনা নামিয়ে দেয়া হলো ওদের ওপরে। সেইসঙ্গে শীতের রাতের কুয়াশা তো আছেই।

'সর্বনাশ বস, এত দেখি ঝুম অন্ধকার আর ঠাণ্ডা,' ভুবন নৌকার পাটাতনে বসে শিউরে উঠল রীতিমতো। শারিয়ার দাঁড় টানাতে অবশ্য খুব বেশি ঠাণ্ডা এখনো লাগছে ওর কাছে।

'আসলে আমরা আলোতে ছিলাম তো তাই অন্ধকারটা বেশি লাগছে আর পানির ওপরে থাকাতে ঠাণ্ডাটাও বেশি লাগছে,' বলে ও একবার দিঘির পাড়ের কেয়ারটেকারের বাড়িটার দিকে দেখিয়ে জানতে চাইল। 'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম না। এখানে একটা ডেড বডি পাওয়া গেল আজ বিকেলে অথচ কোনো পাহারাদার নেই। এমন হবে কেন?'

ভুবন মৃদু হেসে উঠল। 'আরে বস ভালোই তো হয়েছে আমাদের জন্যে পাহারাদার থাকলে একটা ঝক্কি সামলাতে হতো। তবে মনে হয় পাহারাদার ছিল। হয় রাত হওয়াতে বাড়ি চলে গেছে আর না হয় রাতের খাওয়া সারতে গেছে। হয়তো খেতে গিয়ে আর ফেরেনি।'

'হমম, হতে পারে,' বলে শারিয়ার দাঁড় চালানোর গতি খানকিটা বাড়িয়ে দিল। ওরা বাউন্ডারির প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। বাউন্ডারির কাছে পৌঁছে নৌকাটার কোনা ঘুরি ওটাকে ভিড়িয়ে দিল দেয়ালের সঙ্গে। দাঁড়টাকে পাটাতনে রেখে ভুবন আর ও দুজনেই চলে এলো নৌকোটার মাঝামাঝি।

'শালার দেয়াল তো দেখি ভালোই উঁচু,' ভুবন আনমনে বলে উঠল। 'নৌকা থেকে ওখানে ওঠাটা তো দেখি ভালো প্যারাদায়ক হবে।'

'সেটাতো হবেই,' বলে শারিয়ার দেয়ালের ওপরের অংশ দেখাল। 'আমি ভাবছি অন্য কথা। ওইদিন রাতে ওই লোকগুলো এই বৃষ্টির ভেতরে এই নৌকা থেকে নিজেরাই বা উঠল কিভাবে আর মেয়েটাকেই বা টেনে তুলল কিভাবে?' কথাটা আনমনে বলেই সে ভুবনের দিকে ইশারা করে বলে উঠল। 'শোন ভুবন, আমি দুই হাত পাতছি, তুই এই দুই হাতের ওপরে পা রেখে লাফিয়ে দেয়ালের একটাদিক ধরে ফেলতে পারিস কিনা দেখ। একটাই সমস্যা নৌকোটা সরে পড়তে পারে।'

'তুমি বসে হাত দুটো এক করো,তাতে মনে হয় নৌকাটার ওপরে ধাক্কাটা কম লাগবে।'

'ভালো বুদ্ধি,' বলে শারিয়ার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল নৌকার পাটাতনের ওপরে। আর ভুবন পিছিয়ে গেল দুই পা। খানিকটা পিছিয়ে। সে লাফ দিয়ে আগে বাড়ল। শক্ত করে ধরে রাখা শারিয়ারের দুই হাতের ওপরে একটা পা রাখতেই শারিয়ার বুট পরা পা জোড়া ঠেলে দিল ওপরের দিকে। অন্যদিকে শরীরটাকে টান করে ওপরের দিকে যতটা সম্ভব শূন্যে লাফ দিল ভুবন। হাত আর শরীরের সম্মিলিত শক্তিতে ওপরের দিকে লাফিয়ে কোনোমতে দেয়ালের একটা ধার ধরে ফেলতে পারল সে।

একবার ধরে ফেলতেই হাত থেকে দেয়ালের পাশটা ছুটে যাচ্ছিল, কোনোমতে অপর হাতটা চেপে ধরে শরীরটাকে টেনে তুলে ফেলল সে ওপরে। দেয়ালের ওপরে উঠে দম নিয়ে সে নিজের একটা হাত বাড়িয়ে দিল নিচের দিকে। শারিয়ার নৌকাটাকে যতটা সম্ভব দেয়ালের কাছাকাছি এনে ওটার মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল, তারপর শরীরটাকে কুঁজো করে লাফ দিল ওপরের দিকে। দেয়ালের ওপরের দিকে হাতটা পৌঁছোতেই খপ করে সেটা ধরে ফেলল দেয়ালের ওপরে থাকা ভুবন।

'আহ, সাবধানে এবার ধীরে ধীরে উঠে বসো,' বলে সে টেনে শারিয়ারের একটা পা তুলে ফেলল দেয়ালের ওপরে। শরীরটাকে মুচড়ে দেয়ালের ওপরে নিয়ে এসে দম নিতে লাগল শারিয়ার।

'উফফ, উঠলাম তো, নামবো কিভাবে?' সে দেয়ালের ওপাশটা দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল। 'এপাশেও দেখি পানি।'

'পানি হলে তো ভালোই ছিল। এদিকটা একেবারেই জলকাঁদা,' বলে সে আরো খানিকটা ওপাশে দেখাল। 'ওই পর্যন্ত দেয়ালের ওপর দিয়ে এগোতে হবে। যদি একবার এগোতে পারি তবে লাফিয়ে নামাটা তেমন কঠিন হবে না।'

'চল,' বলে সাবধানে দেয়ালের ওপরে উঠে দাঁড়াল শারিয়ার। 'সাবধানে এগোতে থাক। আর কেউ না দেখলেই হয়।' বলে সে পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করলে দেয়ালের ওপর দিকে। দেয়ালের অন্যপাশে যেদিকটাতে মোটামুটি পরিষ্কার মাটি সেখানে এসে ইশারায় ভুবনকে দেখাল সে। ভুবনও ইশারায় সম্মতি জানাতেই শরীরটাকে দেয়ালের একপাশে ঝুলিয়ে দিয়ে ঝুপ করে মাটির ওপরে লাফিয়ে নামলো শারিয়ার। ভুবন অবশ্য এত ঝামেলায় গেল না সে সোজা দেয়াল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। কিন্তু সে লাফিয়ে নামতেই ধুপ করে শব্দ হলো আর সঙ্গেসঙ্গে আশপাশে কোথায় কুকুর ডেকে উঠল। 'সর্বনাশ বস, কুকুরও আছে নাকি এদের এখানে?'

'পাহারাদার কুকুর ব'লে তো মনে হলো না,' নিজেকে সামলে নিয়ে হোলস্টার থেকে অস্ত্র আর ছোট একটা পেন্সিল টর্চ বের করে আনতে আনতে বলে উঠল শারিয়ার। 'আবার হতেও পারে। সাবধানে থাকার বিকল্প নেই। অস্ত্র সাবধান। আর তোর টর্চ বের করার দরকার নেই। আমারটা দিয়েই দুজনে এগোতে পারব,' সে ওদের সামনে উপবিষ্ট বড় বড় আকৃতিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'কিন্তু এই ব্যাটা টমি এখনো পৌঁছায়নি নাকি?'

***

শারিয়ারদেরকে দিঘির পাড়ে নামিয়ে গেট দিয়ে ঘুরিয়ে নীল মাইক্রোটাকে নিয়ে সুমন মাইল দুয়েক ঘুরে চলে এলো মেইন রোডের যেখানে বাউন্ডারি দিয়ে ঘেরা এলাকাটার মেইন গেট অবস্থিত সেখানে।

'টমি ভাই, কতদূর রাখব গাড়ি?' সুমন জানতে চাইল টমির কাছে।

টমি খুব ভাব নিয়ে ব্রিফকেস থেকে ড্রোনটাকে বের করে ওটাকে সেট করতে ব্যস্ত হয়েছিল। সুমনের প্রশ্ন শুনে সে ততোধিক ভাব নিয়ে জানতে চাইল। 'আপনি কি আমাকে বললেও সুমন ভাই?'

'জি, ভাইজান আপনারেই বলছি,' টমির ভাবে ভরা জবাব শুনে আপনাতেই একবার মাথা নাড়ল সুমন। মনে মনে সে ভাবল, এই লোক ভাব নেয়ার সুযোগ পেলে এক ইঞ্চিও ছাড় দিতে রাজি না। সুমন গাড়িটার গতি কমিয়ে এসে ধীরে ধীর ওটাকে মেইন রোডের পাশে একটা জয়লামতো জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল গাড়িটাকে। তারপর ওটাকে খানিকটা ঘুরিয়ে রাস্তার পাশের ঝোপের আড়ালে খোলা জায়গায় এনে দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে নেমে বাইরে এসে দেখল এখান থেকে দূরের গেটের আলো দেখাচ্ছে। মনে মনে সে ভাবল আধ মাইলের বেশি হবে একবার রাস্তার দিকে দেখে নিয়ে সে সন্তুষ্টির সঙ্গে মাথা নাড়ল। কারণ এই জায়গাটা মোটামুটি রাস্তা থেকে একটু আড়ালও আছে । আবার একদিকে খোলাও আছে। টমি চাইলে এখান থেকে ড্রোনটাকে ওড়াতে পারবে।

সুমনের পেছন পেছন বেরিয়ে এলো টমি। তার এক হাতে ছোট একটা খেলনার মতো দেখতে ড্রোন অন্যহাতে ওটাকে নিয়ন্ত্রণের জিনিস।

বাইরে এসে নিজেদের ভেতরে কমিউনিকেশনের লিসেনিং ডিভাইসগুলো অ্যাকটিভ করে টমি আশপাশটা দেখে নিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এই জায়গাটা ভালো হয়েছে আমি আবার জায়গা পছন্দ না হলে কাজ করতে পারি না, ইউ নো,' বলে ড্রোনটাকে ধরিয়ে দিল সুমনের হাতে।

টমির ভাব দেখে সুমন আবারো আনমনে মাথা নাড়ল।

***

'হ্যালো, হ্যা টমি বল,' শারিয়ার বাঁহাতের মুঠোর ভেতরে পেন্সিল চর্টটাকে চেপে ধরে ডান হাতে সাইলেন্সার লাগানো কিং কোবরাটাকে চেপে ধরে রেখেছে নিজের সোয়েটারের কোমরের কাছে বেল্টের ভেতরে। ওর ঠিক পাশাপাশি হাঁটছে ভুবন। দুজনেই গল্প করতে করতে এমনভাবে এগোচ্ছে যেন দুজনে এই এলাকারই বাসিন্দা। কোনো একটা কাজে বাইরে বেরিয়েছিল এখন ফিরে যাচ্ছে।

'বস, তুমি শুনতে পাচ্ছো?' কানের ভেতরে থাক ছোট্ট ইয়ার পিসের ভেতর থেকে আবারো টমির গলা ভেসে এলো। 'বস, বস।'

'আরে যন্ত্রণা,' টমির আর্ত চিৎকারে শারিয়ারের মনে হলো কানের ভেতর থেকেই চিৎকার করছে টমি। 'এত চিৎকার চেঁচামেচির কিছু নেই। আমি তোর কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি,' বলতে বলতে শারিয়ার মৃদু হেসে উঠল ভুবনের দিকে তাকিয়ে। কারণ কয়েকজন শ্রমিক কিসিমের মানুষ ওদের পার হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, টমি বল। তোরা কি জায়গামতো পৌঁছাতে পেরেছিস? সুমন আছে তোর সঙ্গে?'

'জি, বস,' সুমন কথা বলে উঠল ইয়ারপিসের ভেতর থেকে। 'আমরা জায়গামতো পৌঁছে গেছি। এলাকাটার মেইন গেটের বাইরে আধ মাইলের মতো দূরত্বে মেইন রোডের পাশেই একটা জংলামতো জায়গাতে গাড়ি নিয়ে অবস্থান করছি আমরা। আর টমির খেলানাটাও ওড়ানো গেছে এখান থেকে বেশ ভালোমতোই...'

'কি, ওটা খেলনা,' ইয়ার পিসের ভেতর দিয়ে ভেসে আসা টমির চিৎকারে মুখ কুঁচকে উঠল শারিয়ারে। তবে ও কিছু বলার আগেই ভুবন ধমকে উঠল। 'এই আস্তে কথা বল টমি।'

'সরি বস, একটা আস্ত ড্রোনকে যদি কেউ খেলনা বলে...'

'টমি,' শারিয়ার তাকে বেশি কথা বলার সুযোগ না দিয়ে জানতে চাইল। 'তোর ড্রোনের অবস্থান কি? তুই কি আমাদের দেখতে পাচ্ছিস?'

'আরেকটু বস। ড্রোনটা মাত্র ওই এলাকাতে প্রবেশ করল। আচ্ছা, তোমরা আমাকে কোনো কো-অর্ডিনেটস দিতে পারবে? মানে কোনদিকে আছো কিংবা তোমাদের আশপাশে বড় কিছু আছে কি না?' টমির গলার আওয়াজ শুনেই মনে হচ্ছে সে ড্রোনটাকে নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ব্যস্ত।

শারিয়ার একবার আশপাশটা দেখে নিল। একটু আগে যাদের সামনে পড়ে গেছিল সেই লোকগুলো চলে গেছে। ও একবার চারপাশে দেখে নিয়ে বলে উঠল,

'আমরা সেই দেয়াল বেয়ে নিচে নেমে কাঁদাময় এলাকাটা পার হয়ে এখন একটা ছোট পায়ে চলা পথ ধরে হাঁটছি। সামনে অনেকগুলো বড়-বড় আকৃতি দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় ওগুলো জাহাজের কন্টেইনার সারি দিয়ে রাখা আছে। আমরা আর কয়েক শ গজ হাঁটলেই ওই পর্যন্ত পৌঁছে যাব।'

'আচ্ছা, আরেকটু,' বলে টমি একটু সময় নিতেই একটু পরেই তার উল্লসিত গলা ভেসে এলো। 'হ্যাঁ, মনে হয় তোমারে দেখতে পাচ্ছি। বস তুমি যেকোনো একটা হাত তোলো তো,' শরিয়ার নিজের একটা হাত তুলতেই টমি হেসে উঠল। 'হ্যাঁ, তুমি ডান হাত তুলেছো। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। সেইসঙ্গে তোমার হাতের উচ্চকিত মধ্যমাটাও,' বলে সে হেসে উঠল। বাকিদেরও হাসি ভেসে এলো।

'শোন, মজা অনেক হচ্ছে এখন সিরিয়াস কাজের সময়,' বলে শারিয়ার একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল। 'মনে রাখিস এখান থেকে আমাদের আর কোন কো-অর্ডিনেটস নেই। আর এই এলাকাও আমরা কেউ চিনি না, কাজেই তুই আর তোর ওই খেলনা,' বলে শারিয়ার কোনোমতে নিজের হাসি চেপে বলে উঠল। 'মানে তোর ওই ড্রোনই ভরসা। বুঝতে পেরেছিস?'

'জি বস, লাউড এন্ড ক্লিয়ার,' বলে সে সুমনের সঙ্গে কিছু একটা বলে আবারো বলতে শুরু করল। 'বস, তোমার মনে আছে কি না, আমি গেস্ট হাউসে থাকতেই তোমাকে বলেছিলাম কিছু কথা। এই মুহূর্তেই তোমাদের অবস্থান অনুযায়ী সেগুলোই আবরো বলব। তোমরা এখন যেখানে আছো সেখান থেকে খানিকটা এগিয়ে সামনে বামে ঘুরলে কন্টেইনার রাখার এলাকা। আর সেখান থেকে বরাবর সামনের দিকে গেলে জাহাজ মেরামতির জায়গা আর ডানে গেলে অফিস। আর তোমরা যেদিক থেকে এসেছো সেদিকটা মূলত গুদামঘর আর যন্ত্রপাতি রাখার জায়গা।'

'তারমানে আমরা যে-জায়গাটায় যেতে চাচ্ছি, মানে ডক্টর শশীকে সম্ভাব্য যেখানে পাবার সম্ভবনা আছে সেখানটায় পৌঁছাতে হলে আমাদের আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে বামে মোড় নিতে হবে। ঠিক?'

'জি, বস।'

টমি উত্তর দিতেই শারিয়ার ভুবনের দিকে ফিরে ইশারা করল। দুজনে মিলে আবারো আগের মতোই এগোতে শুরু করল। হাঁটতে-হাঁটতে পেরিয়ে এলো দুটো ব্লক। আরেকটু এগিয়ে বামে ঘুরতে গিয়ে আরেকটু হলে একদল লোকের গায়ের ওপরে পড়তে যাচ্ছিল। শারিয়ার ইয়ার পিসের ভেতর থেকে আসা টমির নির্দেশনা শুনতে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে সে মানুষজনের গলায় আওয়াজ খেয়ালই করেনি।

দুজনেই মোড় ঘুরতেই দেখতে পেল প্রায় আট-দশজনের একটা দল। কাঠ-খড় দিয়ে আগুন জ্বেলে সেটাকে ঘিরে বসে আছে। উচ্চস্বরে কথা বলছে, সেইসঙ্গে ধোঁয়া টানছে। শারিয়ার আর ভুবন ঘুরে ওদের সামনে পড়তেই তারাও ফিরে

তাকাল ওদের দিকে, ওরাও স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। শারিয়ার দেখল একাধিক লোকের হাতে সিগারেটের আগুন জ্বলছে, তবে ধোঁয়ার গন্ধ শুঁকেই সে বুঝতে পারল ওগুলো আসলে সিগারেট নয় গাঁজা। দু-একজনের হাতে দেশি মদের বোতল দেখতে পেল। ওদের সামনে পড়তেই দুই দলই কয়েক সেকেন্ড বোকার মতো তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

শারিয়ার সাবধান হবার আগে ভুবনই হেসে উঠল। স্থানীয় ভাষায় ওদের উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলে হাত নাড়ল চালিয়ে যাবার মতো করে। ওদের সবাইকে দেখে শ্রমিকেরাও হেসে উঠল। একজন নিজের হাতের বোতল এগিয়ে দিল ওদের দিকে। হাত নেড়ে সহাস্যে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে শারিয়ারেরর একটা হাত ধরে টেনে তাকে সরিয়ে নিতে শুরু করল অন্যদিকে।

'চলো চলো চলো জলদি চলো,' বলে শারিয়াকে টেনে নিয়ে আবারো রাস্তার ওপরে সরিয়ে আনলো।

'বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছি এইবারের মতো,' বলে শারিয়ার টমিকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'এই টমি, ব্যাটা সাবধান করবি না।'

'আরে বস চ্যাতো ক্যান এইটা দিয়া কি সব দেখা যায়?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' বলে শারিয়ার ভুবনের দিকে ইশারা করল। টমির ওপরে সব বিষয়ে নির্ভর করা যাবে না এটাই বোঝাল সে। কিন্তু কিছু বলার আগেই কানের ভেতর থেকে টমির গলা ভেসে এলো।

'বস, তোমরা কিন্তু সেই অফিস এলাকার দিকেই যাচ্ছো। আর একটু এগিয়ে বামে মোড় নিলেই সেই অফিস।'

'ওকে,' বলে ভুবনকে নিয়ে রাস্তার ওপর থেকে অন্ধকারে সরে এলো শারিয়ার। সেইসঙ্গে বের করে আনল নিজের অস্ত্র। 'সাবধানে ভুবন। তুই আর আমি পরস্পরকে কভার করে এগোব,' বলে সে খানিকটা এগিয়ে গেল আর তার থেকে পাঁচ-ছয় হাত পেছনে ভুবন ঘুরে গেলো সমকোনি ভঙ্গিতে। এতে করে দুজনে দুজনকে কভার করতে পারবে।

শারিয়ার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল ওরা পায়ে চলা পথটা থেকে সরে এসে যেখানে ঢুকেছে এখানটায় সারি সারি কন্টেইনার সাজিয়ে রাখা। সেগুলোর ভেতর দিকে সামনের দিকে পথের শেষ মাথায় বেশ আলো দেখা যাচ্ছে। ও অনুমান করল ওখানেই সেই অফিসঘরটা হতে পারে যেখানে সম্ভবনা আছে কিছু একটা পাবার।

'বস, সামনে অস্ত্রধারী পাহারাদার আছে, সাবধান।'

টমির কথা কানের একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে গেল। কারণ আধো অন্ধকারের ভেতরে ওর পূর্ণ নজর এখন সামনের দিকে। 'ভুবন,' মৃদু স্বরে

সে ডেকে উঠলভুবনকে। সামনেই একজন পাহারাদার দেখা যাচ্ছে একটা কন্টেইনারের গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট টানছে। একহাতে একটা অস্ত্রের মতো কিছু ধরা। কিন্তু জিনিসটা কি সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল না। শারিয়ার ইশারা করতেই এগিয়ে গেল সামনের দিকে আর শারিয়ার ঢুকে পড়ল অন্ধকার এক কোনা দিয়ে। ভুবন দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে।

'এই, এদ্দিকে কি?' লোকটা হঠাৎ অন্ধকারর ভেতরে থেকে আলোতে বেরিয়ে আসা ভুবনকে দেখে প্রাথমিকভাবে চমক উঠলেও সে সামলে নিল নিজেকে। ধমকে উঠে সাবধান করে দিচ্ছে মনে হয় সে ভেবেছে এই এলাকারই লোক। 'বাই ইয়াত, টয়লেট খুঁজতেছিলাম,' বলে ভুবন বোকা বোকা একটা হাসি দিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। এবার লোকটা সিগারেটটা ফেলে দিয়ে রাগের সঙ্গে এগিয়ে এলো ভুবনের দিকে। মানুষটা আরেকটু এগোতেই ভুবন দেখল লোকটার হাতে একটা হ্যান্ডগান। ভুবনের দৃষ্টি অস্ত্রটার দিকে চলে গেছে আর লোকটা সোজা অস্ত্রটা তার দিকে তুলে ধমকে উঠে জানিয়ে দিল এই দিকে আসা নিষেধ।

ভুবন দুই হাত তুলে মৃদু হাসি দিয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। লোকটা এবার সোজা অস্ত্রটা তাক করল ভুবনের দিকে। ভুবনও জোরে হেসে উঠল। লোকটা ভুবনের হাসি দেখে কিছু একটা অনুধাবন করার চেষ্টা করল কিন্তু যখন সে ঘুরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ততক্ষণে অন্ধকারের কোনা ঘুরে তার দিকে পৌঁছে গেছে শারিয়ার। লোকটা ঘুরে দাঁড়াতেই শারিয়ারের পিস্তলের বাটটা সোজা বসে গেল তার চাঁদিতে আর পড়ন্ত লোকটাকে ধরে ফেলল ভুবন। আলতো করে মানুষটাকে শুইয়ে দিল অন্ধকারের ভেতরে। লোকটার পায়ের মোজা খুলে সেটা মুখে ঢুকিয়ে বেল্ট দিয়ে হাত আর রুমাল দিয়ে মুখ বেঁধে দিল। যদিও আঘাতের গভীরতায় শারিয়ার জানে জ্ঞান ফিরতে এর দেরি হবে।

লোকটাকে সামলানো শেষ হতেই শারিয়ার মাটি থেকে হ্যান্ডগানটা তুলে নিল। বিদেশি জিনিস। 'দেখেছিস অবস্থা? অবশ্যই এখানে কিছু একটা আছে তা-না হলে এসব স্থানীয় গুণ্ডাপাণ্ডাদের কাছে এই জিনিস থাকত না।'

'অই কাদের কাদের,' দুজনেই লোকটার হ্যান্ডগানটা পরীক্ষা করছিল আচমকা ডাক শুনে সতর্ক হবার আগেই কন্টেইনারের ওপাশ থেকে একজন উদয় হলো ওদের একেবারে সামনে। ভারি শীতের পোশাক পরা লোকটর হাতেও একইরকম হ্যান্ডগান। 'কি রে বিড়ি একলাই...' সে সম্ভবত তার সঙ্গের সঙ্গে সিগারেট টানতে আসছিল। কিন্তু চোখের সামনে ভিন্ন দুজনকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তখানেক লাগল তার কিছু একটা অনুধাবন করতে। কিছু একটা গণ্ডগোল অনুধাবনকরেই সে হ্যান্ডগানটা তুলতে যচ্ছিল কিন্তু তার আগেই শারিয়ার আর ভুবন তার চেয়ে অন্তত দশ গুণ বেশি ফাস্ট। শারিয়ার নিজের সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা বের করে এনেছিল কিন্তু তার আগেই দেখল ভুবনের হাতে কিছু একটা ঝলসে উঠল। আর লোকটা মাটিতে পড়ে গেলে প্রায় কোনো শব্দ না করেই।

ভুবন এগিয়ে যেতে শুরু করেছে লোকটার দিকে, শারিয়ার অবাক হয়ে দেখল তার হাতে সেই গুলতিটা। 'বাহ তোর এই জিনিসটাতো সেই কাজের।'

'আসলে জিনিসটা কতটা কাজের সেটা নির্ভর করে এটাকে চালানোর ওপরে। অবশ্য সব অস্ত্রের ক্ষেত্রেই কথাটা প্রযোজ্য,' বলে সে শারিয়ারের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'এখন ধরবে নাকি?'

দ্বিতীয় পাহারাদারেরও স্থান হলো প্রথমটার পাশেই। শারিয়ার আর ভুবন মিলে এবার আরো অন্তত তিনগুণ সাবধানে আর দ্রত গতিতে এগোনো শুরু করল অপিসটার দিকে। 'বস, সামনে তোমাদের থেকে তিন কন্টেইনার দূরে। অফিসের ঠিক আগে দুটো কন্টেইনারের ওপরে একজন আছে,' টমি তথ্যটা দিতেই শারিয়ার ভুবনের দিকে ইশারা করেই দৌড় দিল। লোকটা মনে হয় কিছু একটা দেখেছে। সে কন্টেইনারের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে সতর্ক চোখে চোখ বুলাচ্ছে। শারিয়ার দৌড়ে দিয়ে একেবার লোকটার বরাবর নিচে দাঁড়াল। লোকটা শারিয়ারকে দেখে অস্ত্র তুলবে তার আগেই ভুবনের লোহার বলের আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। তার পড়ন্ত দেহটা ধরে ফেলল শারিয়ার। কিন্তু তাকে সামলাতে গিয়ে নিজেও পড়ে গেল মাটিতে। লোকটা তার ওপরে পড়েছে। তাকে সামলানোর আগেই আরেকজন উদয় হলো একেবারে সামনে।

অজ্ঞান লোকটা আর শারিয়ার দুজনকেই দেখে সঙ্গেসঙ্গে সে হ্যান্ডগান তুলল। শারিয়ার যদিও শরীরের একপাশ থেকে নিজের পিস্তল তুলেছে, ওটাতে সাইলেন্সারও লাগানো আছে কিন্তু লোকটাকে গুলি করতে সায় দিচ্ছে না মন। তাকে এই দ্বিধা থেকে বাঁচিয়ে দিল ভুবন। সে ভূতের মতোই অন্ধকারের ভেতর থেকে উদয় হলো লোকটার পেছনে। লোকটা চিৎকার করে শারিয়রের দিকে বন্দুক তুলতে যাচ্ছিল তার আগেই পেছন থেকে তার খোলা মুখটা চেপে ধরে বিশেষ কায়দায় চাপ দিতেই হা করা মুখ আর বন্ধ হলো না, তার আগেই লোকটা জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল। ভুবন আস্তে করে তাকে শুইয়ে দিল মাটিতে। শারিয়ার মাটি থেকে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসতে যাচ্ছিল ভুবন এগিয়ে এসে একটা হাত দিয়ে টেনে তুলল তাকে।

'ঠিক আছো?'

ভুবনের প্রশ্নের জবাবে মাথা নাড়ল শারিয়ার। 'এগুলো?' অজ্ঞান শরীরগুলো দেখাল সে। 'বাদ দে। টমি, আর কেউ আছে আশেপাশে?' টমির কোন জবাব নেই। 'টমি টমি,' ভুবনের দিকে তাকিয়ে আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল একবার সেইসঙ্গে তীব্র ধমকের শব্দে ফিরে তাকালো দুজনেই।

'এই এই,' দুজন পাহারাদার ওদেরকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল।

শারিয়ার মনে মনে একবার দূরত্ব হিসেব করল। একজনের কাছ পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব। স্রেফ একবার হাত ঝাঁকিয়েই সে দৌড় দিল। কয়েক ধাপ সামনে গিয়ে একহাতে ধরে ফেলল লোকটার অস্ত্র ধরা কবজি, অন্য হাতে লোকটার এক কান চেপে ধরে নিজের শরীরকে ছেড়ে দিল। ক্রিকেট ব্যাটে ছয় মারার মতো আঘাত হলে যেরকম শব্দ হয় অনেকটা সেরকম শব্দের সঙ্গে লোকটা ঢলে পড়ল কিন্তু তাকে ছেড়ে সোজা হবার আগেই অপর লোকটা চিৎকার করে উঠল। সেইসঙ্গে শারিয়ার দেখল লোকটার হ্যান্ডগানের কালো নলটা ওর মুখের ওপরে। ট্রিগারে লোকটার আঙুল শক্ত হয়ে উঠছে কট করে একটা শব্দের সঙ্গে দুই চোখের মাঝখানে আরেকটা তৃতীয় চোখ নিয়ে লোকটা শুয়ে পড়ল উল্টো হয়ে। স্বস্তির সঙ্গে শারিয়ার উঠে দাঁড়িয়ে দেখল নিজের গুলতি নামিয়ে নিচ্ছে ভুবন। তার উদ্দেশ্যে একবার মাথা নেড়ে অফিস ভবনটা দেখাল শারিয়ার। দুজনেই সন্তর্পণে এগোতে শুরু করলে অফিসটার দিকে। 'টমি টমি,' আরো দুবার ডাকল শারিয়ার কিন্তু কোনো সাড়া নেই।

অফিস ঘটরার কাছেই মৃদু গুঞ্জনে সঙ্গে চলছে একটা জেনারেটর। সেটার কাছে এসে অফিসের কাছের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল দুজনে। সামনে থেকে অন্তত দুজনের গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এরা অস্থির হয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই লোক দুজনার চিৎকার কানে গেছে। এদের ভেতরে অন্তত একজন মোবাইলে কথা বলছে। 'জলদি করতে হবে,' বলেই সে জেনারেটরের পাশে পড়ে থাকা একটা পাইপ তুলে নিল। পিস্তল কোমরে রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে অন্ধকারের ভেতর থেকে ভূতের মতো উদয় হলো লোক দুজনার সামনে।

আসলেই একজন মোবাইলে কথা বলছিল, অন্যজন উঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে সামনে কি হচ্ছে। সম্ভবত সে কারো নাম ধরে ডাকছিল, শরিয়ারকে দেখে একজন এতটাই চমকে উঠল টপ করে হাত থেকে মোবাইলটা পড়ে গেল। কিন্তু সে সাবধান হবার কিংবা নিজের অস্ত্র তোলার কোনো সুযোগই পেল না। যদিও হাতে একটা লোহার পাইপ আছে কিন্তু সেটা ব্যবহার না করে শারিয়ার নর্তকীর মতো স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। এগোনোর গতির সঙ্গেসঙ্গে তার ডান পাটা উঠে গেল শূন্যের দিকে। শূন্যে থাকা অবস্থাতেই সেটা খানিকটা দিক পরিবর্তন করে কোমর বরাবর আছড়ে পড়ল লোকটার। তীব্র চিৎকারের সঙ্গে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল সে। একহাতে লোকটার মুখ চেপে ধরে পাইপ ধরা হাতের কনুইটা কট করে গিয়ে আঘাত হানল লোকটার কপালের পাশে, কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল সে মাটিতে।

তার পেছনে অস্থির দ্বিতীয় সঙ্গী তখন নিজের অস্ত্র তুলতে শুরু করেছে। লোকটা পড়ে যেতেই শারিয়ার পাইপটাকে এক চক্কর ঘোরাল শূন্যের ওপরে।

ভারতের ব্যাটসম্যান মহেন্দ্র সিং ধোনির হেলিকপ্টার শটের মতো লোহার পাইপটা গিয়ে বাড়ি মারল লোকটার হাতের অস্ত্রটাতে। সেটা ছিটকে উঠল কিন্তু পড়ে গেলনা কারণ জিনিসটা একটা স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে ছিল তার গলার সঙ্গে। গলার সঙ্গে জিনিসটার শক্ত টান লাগতেই তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সে। শারিয়ার এগিয়ে যাচ্ছিল লোকটার চিৎকার বন্ধ করতে কিন্তু সেটা করার আগেই ঠিক আগের মতো ধূপ করে একটা শব্দের সঙ্গে কপালের ওপরে লাল দাগ নিয়ে ভূপতিত হলো সে মাটিতে।

হাঁপাতে হাঁপাতে শরিয়ার ফিরে তকাল ভুবনের দিকে। 'এটা একদম ঠিক না। আমার শিকারে তুই ভাগ বসাচ্ছিস একেবারেই ঠিক হয়নি।'

'হয়েছে তোমার শিকার,' ভুবন তার গুলতি কোমরে গুঁজে নিয়ে পিস্তল বের করে লোকদুটোর দিকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'দুইটা লোকরে নিঃশব্দে সামলাতে পারলে না। দুজনেই চিৎকার করে উঠল। এটা কোন কথা?'

শারিয়ার মৃদু হেসে নিজের লোহার পাইটা দিয়ে দরজাটায় আঘাত করতে যাচ্ছিল তার আগেই চেঁচিয়ে উঠলভুবন, 'তুমি একটা লোকরে ভাই। এমনিতেই যে চিৎকার চেঁচামেচি করছে লোক দুজন। তার ওপরে আবার শব্দ করতে চাও?' বলে সে শারিয়ারকে সরতে ইশারা করল।

'দেখা যাক, উদ্দেশ্য পূরণ হলো কিনা?' বরে শারিয়ার পাইপটা ফেলে দিয়ে পিস্তল বের করে আনতেই ভুবন খুব সাবধানে দরজার লকটার ওপরে দুই দুবার ধূপ ধূপ করে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে গুলি করল। তারপর শারিয়ারকে কভার করতে বরে এক ধাক্কায় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ভেতরে লোক থাকতে পারে, বন্দুক হাতে পাহারাদার থাকতে পারে, মুখে টেপ আটকানো হাত-পা বাঁধা বন্দিনী থাকতে পাওে, এরকম অনেক কিছুই ভেবেছিল ওরা। কিন্তু তার বদলে যা দেখল তাতে দুজনেই বেকুব হয় গেল।

ভেতরে কেউই নেই, কিছুই নেই। খুবই সাধারণ একটা অফিস রুম ভেতরে। দুজনেই দুজনার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল তারপর কয়েক কদম এগিয়ে ভেতরে ঢুকে টেবিলের ওপাশ আর কেবিনেটের অন্যপাশ দেখে নিয়ে নামিয়ে নিল পিস্তল। 'সর্বনাশ! এখানে তো কেউই নেই।'

'কিন্তু-' শারিয়ার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সেট শেষ করতে না পেরে দুজনেই অবাক হয়ে ফিরে তাকাল দরজার দিকে। দুজনকেই অবাক করে দিয়ে সেখানে উদয় হয়েছে অস্ত্রধারী এক পাহারাদার।

***

টমি ভীষণ ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করছে দেখে এই প্রথমবারের মতো সুমন একটু সহানুভূতি অনুভব করল ছেলেটার প্রতি। এ ছাড়া এই আধা ছেলে-আধা লোকটকে তার অত্যন্ত বিরক্ত লাগছিল। একবার টমির দিকে দেখে নিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল। শীতের রাতের সামান্য বাতাসও কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে তার শরীরে।

বৃহত্তর ফরিদপুর এলাকার ছেলে সুমন তরফদার পিবিআইতে অফিসার হিসেবে যোগদান করেছে খুব বেশি সময় হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে সে এখানকার কাজকর্ম তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সে মেধাবী ছাত্র ছিল। খুব বেশি ক্যারিয়ার সচেতন সে কখনোই ছিল না। যখন যা সামনে আসে সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকাটাই তার কছে জীবন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পর প্রথম চাকরির বিজ্ঞাপন দেখছিল সে এঁই পিবিআইতে। এটাই ছিল তার প্রথম চাকরির ইন্টারভিউ। এক বন্ধু বলতে গেলে একরকম জোরকরেই তাকে দিয়ে অবেদন করায়। এমনকি তার আবেদনের টাকাও সেই বন্ধুই দিয়েছিল। প্রথমে শারীরিক পরীক্ষা তারপর একে একে লিখিত মৌখিক দিয়ে যখন তার চাকরি হয়ে গেল সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিল সে নিজেই। কারণ এখানে তার চাকরি হবে সে ভাবেনি, আর ঘুষ ছাড়া এরকম চাকরি হয় বলেও তার জানা ছিল না। কিন্তু তারটা হলো। ছয় মাসের ট্রেনিং নিয়ে জয়েন করার পর থেকে ভালো লাগতে থাকে তার কাছে। এরপর বছর দেড়েক আগে মায়ের পছন্দের পাত্রী দেখে বিয়ে করেছে। সুন্দর গোছানো সংসার তার। কিন্তু সেই কলেজ জীবনের শুরু থেকে অ্যাডভেঞ্চারের যে নেশা সেটা আজো কাটেনি। আর সেটার লোভেই সে এখন এখানে।

এই শীতের রাতে মাঠের কিনারায় দাঁড়িয়ে বেনসনে টান দিতে দিতে জীবনের স্মৃতিচারন আর কতক্ষণ চলত কে জানে, কিন্তু হঠাৎ ও টমির ডাকে সে ফিরে তাকাল। 'সুমন ভাই একটু হেল্প করো না। ওখানে তো ভয়াবহ অবস্থা চলছে।'

সিগারেটটা পিষে দিয়ে পায়ে পায়ে টমির দিকে এগোল সুমন কিন্তু হঠাৎ জংলা জায়গাটার কোনো এক দিক থেকে অত্যন্ত পরিচিত একটা শব্দ শুনে চট করে সচকিত হয়ে উঠল সে। কেউ একজন পিস্তল লোড করেছে খুব কাছেই। সুমনকে থেমে যেতে দেখে টমিও ফিরে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই সুমন ইশরায় তাকে চুপ থাকতে বলল। যদিও পিস্তল লোড করার শব্দ শুনেই সুমন বুঝতে পেরেছে যে দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও সে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে নিজের কোমরের পাশে রাখা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করেছিল কিন্তু জংলার ভেতর থেকে একটা খিটখিটে হাসি শুনে থেমে গেল সে। কেউ একজন হাসির সঙ্গেসঙ্গে অদ্ভুত একটা টানে বাংলাতে বলে উঠল, 'অফিসার, আরেকটু এগোও হাতটা পিস্তলের দিকে। তারপর দেখো কী করি।'

সুমন নিজের হাত দুটোকেই সরিয়ে এনে মাথার দুপাশে তুলে ধরর। 'গুড বয়,' সুমন অনুভব করল পেছন থেকে কণ্ঠস্বরের মালিক এগিয়ে আসছে তার দিকে। কয়েক সেকেন্ড পরেই তার ধারণাকে সত্যি প্রমাণ করে কেউ একজন এগিয়ে এসে খাপের ভেতর থেকে নিয়ে নিলে সুমনের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা। তারপর জোরে একটা ঠেলা মারল তাকে।

পড়ে যেতে যেতেও কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে টমির পাশে এসে থেমে গেল সুমন। টমিও দুই হাত তুলে আধ বসা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুজনেই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল চার-পাঁচজনের একটা দল বেরিয়ে এসেছে জংলা জায়গাটার ভেতর থেকে। তাদের সর্বাগ্রে চায়নিজ মতো দেখতে লম্বা চেহারার একজন মানুষ ওদের দিকে পিস্তল তাক করে অত্যন্ত হাসি-খুশি চেহারায় তাকিয়ে আছে।

'হেই বয়েজ,' আবারো সেইই অদ্ভুত টানে বলে উঠল সে। 'যদি নিজেরা বাঁচতে চাও এবং তোমাদের বসদেরকে বাঁচাতে চাও তবে আমি কী বলি ভালো করে শোন।'

যদিও চারপাশে অন্ধকার এবং লোকটাকে খুব বেশি পরিষ্কার দেখাও যাচ্ছে না। কিন্তু তবুও এই আধো অন্ধকারের ভেতরেই লোকটাকে দেখে পরিষ্কার চিনতে পারল টমি। এই সেই লোক যে শারিয়ারকে ট্রেন স্টেশনের বাইরে থেকে পিক করেছিল এবং পরবর্তীতে তাকে অপহরণের চেষ্টা করেছিল। পরবর্তীতে তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে এই লোকটাই সেই বেইজমেন্টে ট্রিক করে শারিয়ার আর ভুবনের ভেতরে মারামারি বাধিয়ে চেষ্টা করছিল বেইজমেন্টে প্রফেসরের রুম থেকে জিনিসগুলো নিয়ে কেটে পড়তে। এই লোকটাই সেই রুমে আগুন লাগা এবং সবকিছু পুড়ে যাবার জন্যে দায়ী।

'টমির কানের ভেতরে থাকা ইয়ার পিসের ভেতর থেকে শারিয়ারের গলা ভেসে আসছে। ওদের একজন এসে একটান দিয়ে খুলে নিল সেটা। সুমনের দিকে তাকিয়ে মৃদু আফসোসের সঙ্গে মাথা নড়ল টমি।

অধ্যায় চৌত্রিশ

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

গোলন্দাজ যে মুহূর্তে বিল্লাল শেঠ, বৈঠা আর তুলারামের বাহিনীর সঙ্গে নিজের পরিকল্পনা ঠিক করে ওদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে গাছে উঠছে সেই মুহূর্তে কিরান আছে ভিন্ন এক পরিকল্পনার মাঝখানে।

একটু আগেও বাজারের ঠিক যেখানে সাতটা রাস্তার কেন্দ্রে ফাঁসি দেওয়ার জন্য কাঠের মঞ্চ বানানো হয়েছে সেখানে থাকলেও এই মুহূর্তে সেখান থেকে খানিকটা সরে এসে ওরা সাতটা গলির ঠিক যে গলিটা থেকে ফাঁসি দেয়ার জায়গাটা সবচেয়ে কাছে সেখানে এসে একটা দোকান ঘরের ফেলে দেওয়া ঝাঁপির আড়ালে লুকিয়ে আছে। যদিও ভিড়ের কাছাকাছি থাকার সময়েই বাদ্যের শব্দ শুনতে পেয়েছিল কিন্তু এখন সেটা আরো পরিষ্কার কানে আসছে। তারমানে যাকে ফাঁসি দেওয়া হবে তাকে নিয়ে দ্বীপের মূল শাসনকর্তাদের দলটা এগিয়ে আসছে মঞ্চের দিকে।

বাদ্যের শব্দ আরো পরিষ্কার কানে আসতেই কিরান তার পাশে উপবিষ্ট মানুষটার দিকে ফিরে তাকাল। বাদ্যের শব্দে সে খানিকটা অস্থির হয়ে উঠেছে কিন্তু তার পাশে থাকা মানুষটার মধ্যে কোনো বিকার নেই। সে একেবারেই স্থির ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে সামনের ভিড় আর মঞ্চের দিকে। কিরান থাকতে না পেরে এবার জিজ্ঞেস করেই বসল, 'সবকিছু ঠিকঠাক হইবে তো? তোমার লোকেরা জায়গামতো আছে?' কিরানের প্রশ্নের জবাবে মানুষটা কিছুই বলল না। এমনকি সে ফিরেও তাকাল না। নিজের ডান হাতটাকে খনিকটা উঁচু করে অদৃশ্য কারো উদ্দেশ্যে ইশারা করল সে। তারপর ফিরে তাকাল কিরানের দিকে।

পুরোদস্তুর পুরুষ মানুষের পোশাক পরিহিত মেয়েটার চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সেই গভীর কালো চোখের দৃষ্টিতে আবার একাধিক ধোঁকার প্রলেপ। কিরানের দিকে তাকিয়ে সেই প্রলেপে যেন আরো কয়েকটা নতুন স্তর যোগ হলো। তারপর যেন খানিকটা হাসির সুরেই সে বলে উঠল, 'একটা কথা মনে রাইখো জাহাজি, তুমি আমার কাছে একটা ছিঁড়া তেনার চেয়েও মূল্যহীন। কিন্তু তুমার বাপে আমার লাইগা, আমগো লাইগা অনেক কিছু করছে। আর এইহানে আমরা

আইছি তুমার বাপের লাইগ্গা। কাজেই যা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আমরা। পরিকল্পনা পুরাপুরি ঠিক আছে। আমার লোকেরা প্রত্যেকেই জায়গামতো আছে। কাজেই নিজের জবানডারে লাগাম দিয়া যেমনে কই এমনে কাম করো,' বলে মেয়েটা ফিরে তাকাল সামনের দিকে। আর কিরানের মনে পড়ে গেল একটু আগে সেই পতিতালয়ের সামনে এই পদ্মরানীর দস্যুদের সঙ্গে ওদের মোলাকাতের পরবর্তী ঘটনাটুকু।

প্রথম মোলাকাতের পর যখন মেয়ে জলদস্যু পদ্মরানীর দলের প্রধান পদ্ম ওদেরকে জানায় ওদের একটা পরিকল্পনা আছে কবিকে উদ্ধার করার ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে বাজারের এদিক থেকে ভেসে যায় বাদ্যের শব্দ। সবার জানা কথা এই শব্দ তখনই বাজানো হয় যখন কাউকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ঢাকের শব্দ শুনে পদ্ম কিরানের এক হাত চেপে ধরে জানায় ওদেরকে যত দ্রুত সম্ভব বাজারের কাছে যেতে হবে। সেখান থেকে দুটো ভাগ হয়ে দ্রুত ওরা রওনা দেয় বাজারের উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছে সবাইকে নিয়ে একটা অন্ধকার গলিতে দাঁড়িয়ে পদ্ম বুঝিয়ে দেয় তার পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা খুবই পরিষ্কার এবং ঝুঁকিপূর্ণ। পদ্ম জানায়, তার দলে আছে মোট সাতজন আর কিরানরা আছে চারজন। মোট এগারোজন। অস্ত্র বলতে আছে লাঠি-তীর-ধনুক-তলোয়ার আর দুটো ছোটো বন্দুক। ওরা এই এগারোজন তিনটে দলে ভাগ হয়ে বাজারের মঞ্চের কাছে অবস্থান নেবে। ওদের উদ্দেশ্য হবে বাজারের মঞ্চে যেখানে ফাঁসি দেওয়া হবে তার যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকা। বাজারের মঞ্চে প্রথমেই এনে তোলা হবে যাকে ফাঁসি দেওয়া হবে তাকে,তারপর দুই ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে আসবে সন্দ্বীপের প্রধান। সে নেমে সবার উদ্দেশ্যে কথা বলবে, তারপর সে নির্দেশ দিতেই ফাঁসি কার্যকর করা হবে।

ওদের পরিকল্পনা হলো, ওরা দুটো দল মঞ্চের একেবারে কাছেই থাকবে অবস্থান নিয়ে। আর অন্য একটা দলের তিনজর মঞ্চের উল্টো দিকের একটা গলিতে ঢুকে অবস্থান নিয়ে থাকবে। যেই মুহূর্তে দ্বীপের প্রধান শাসনকর্তা মঞ্চে তার বক্তব্য শেষ করবে সেই মুহুর্তে উল্টোদিকের গলিতে থাকা দলটা ছোটো একটা বারুদের পুটলি আগুন দিয়ে বিকট শব্দ করবে আর তাতে সবার মনোযোগ সরে যাবে সেদিকে। আর ঠিক তখনই মঞ্চের কাছে থাকা দল দুটো সক্রিয় হয়ে উঠবে। প্রথম দল যেটাতে কিরান, পদ্ম আর গোমেজ থাকবে সেই দলটা দৌড়ে গিয়ে মঞ্চের কাছেই থাকা দ্বীপ প্রধানের ঘোড়ার গাড়িটা দখল করে ওটাতে চড়ে বসবে। ঠিক ওই সময়ে অন্য দলটা মঞ্চের মূল বেদির সঙ্গে আটকানো দড়িটা বেঁধে ফেলবে ঘোড়ার গাড়িটার সঙ্গে। ঘোড়া গাড়িটার সঙ্গে দড়ি আটকানো সঙ্গেসঙ্গে ওরা গাড়িটাকে ঘোরাতে শুরু করবে মঞ্চের চারপাশে। ওটা এক পাক ঘুরে আসার আগেই মঞ্চের যেদিকে ফাঁসি হওয়ার কথা সেদিকটা গাড়ির টানে

ভেঙে পড়বে। আর ওরা গাড়িটাকে নিয়ে ঘুরে এসে কবি লোকটাকে তুলে নেবে ঘোড়ার গাড়িতে। তারপর চম্পট দেবে।

পরিকল্পনাটাতে ঝুঁকির পরিমাণ অনেক। কিন্তু সেই সঙ্গে সফল হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা এই অল্প সময়ে এছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই।

সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ওরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে বাজারের মঞ্চের একেবারেই কাছে, সেই দোকানের ঝাঁপির আড়ালে।

পদ্ম সামনের দিকে তাকিয়ে আবারও জানতে চাইল, 'জাহাজি সব মনে আছে তো। মনে রাইখো। একবার বোমাটা ফাটলে কিন্তু আর ফেরার কোনো উপায় থাকব না। আমি গাড়ি ছোটাবো, তুমি গাড়িতে উইঠা বসবা। আমার মাইয়ারা তো সাহায্য করবই, তুমার লাঠিয়ালরা যেন গাড়িটারে পাহারায় রাখে যাতে ওইটারে কেউ আটকাইতে না পারে অথবা ওইটারে কেউ আক্রমণ কইরা সুবিধা করতে না পারে। মনে থাকব?'

কিরান স্রেফ একবার মাথা নেড়ে সে নিজের আড়াল থেকে খানিকটা উঁচু করে দেখে নিল গলিটার অন্যদিকে লুকিয়ে থাকা গোমেজ আর তার সঙ্গের বাকি দুই লাঠিয়ালের দিকে। ওদের ইশারায় সে একেবারে প্রস্তুত থাকতে বলল। ওরাও ফিরতি ইশারায় জানাল ওরা একদমই প্রস্তুত আছে। ইশারা বিনিময় হতেই কিরান ফিরে তাকাল মেয়েটার দিকে। যদিও বসে আছে সে কিন্তু শরীরটা একেবারে ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে আছে মেয়েটার। কিরান তার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'আপনার দলের প্রতি আমার আসলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কারণ পরে আর সুযোগ পাই না পাই।'

'জাহাজি তুমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দরকার নাই। খালি খোদারে ডাকো, যাতে কামডা ঠিকমতো অয়। কারণ তুমার বাপেরে খুঁজি আর বাইর করতে অইলে কবিরে লাগব তুমার। আর সেই লগে সিলভেরার খোঁজও পাবা ওইহান থেইক্কাই,' বলে সে আরেকবার কিরানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'আরেকটা কথা জাহাজি, কবিরে যদি এই ফাঁদ থেইক্কা বাইর করতে পারো তাইলে তারে নিয়া সটকায়া পড়ার দায়িত্বও কিন্তু তুমার। একবার এইহান থাইকা সইরা পড়লে আমি আর আমার মাইয়ারা স্রেফ হাওয়ায় মিলায়া যাব। মনে থাকব? খবরদার আমগো খোঁজ করবা না, আর আমগো কথা কাউরেই কইবা না,' পদ্ম নামক দস্যু মেয়েটার চোখের ভাষা পাথরের চেয়েও কঠিন।

কিরান সেদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর বলে উঠল, 'সমস্যা নাই আমার লোকেরা...'

কিরান তার বাক্য শেষ করার আগেই দেখতে পেল মঞ্চে তোলা হচ্ছে মুখ ঢাকা একটা মূর্তি। তাকে ফাঁসির মঞ্চের কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে পরিয়ে দেয়া

হলো ফাঁসির দড়ি। তারপর মঞ্চে উপবিষ্ট হলো দ্বীপের শাসনকর্তা। সে মঞ্চে উঠেই কথা বলতে শুরু করল। আর এদিকে পদ্ম বলে উঠল, 'সময় উপস্থিত, জাহাজি।'

কিরান একবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই মেয়েটা একবার চারপাশে দেখে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আর নির্দেশনা অনুযায়ী কিরান হাতের কড়ের পাঁচ পর্যন্ত গুনল তারপর মুখের আবরণটা দিয়ে মুখ ঢেকে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের লোকদের দিকে ইশারা করে হাঁটতে শুরু করল। ও আরেকটু এগোতেই ওর থেকে হাত দশেকের দূরত্বে এগোতে শুরু করেছে গোমেজ আর তার সঙ্গের লোকেরা। কিরান সামনে তাকিয়ে দেখল সামনেও পদ্মের কথা অনুযায়ী তার দলের আরো কয়েকজন একসঙ্গে হয়ে গেছে। কিরান নিজের কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলের বাটে হাতের মুঠি আরেকটু শক্ত করল, তারপর জোর কদমে এগিয়ে যেতে শুরু করল সামনের দিকে। ভিড়ের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে এমন সময় সে দেখতে পেল দ্বীপের শাসনকর্তার কোনো একটা কথায় সমবেত জনতা হইহই করে উঠল। ওরা কোনোরকম ভ্রুক্ষেপ না করে সামনের দিকে এগিয়ে চললো। কিরান সামনে তাকিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল ওদের সামনে উপবিষ্ট দলটা ফাঁসির বেদির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এমন সময়ে তীব্র বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। কিরান অনুধাবন করতে পারল অন্যপাশের গলিতে পদ্মের দস্যুদলের মেয়েরা বারুদের পিপাতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছে।

বিস্ফোরণের শব্দে সবাই যখন সকম্পিত হয়ে উঠেছে কিরান নিজের লোকদের দিকে একবার ইশারা করেই দৌড়াতে শুরু করল সামনের দিকে। মঞ্চের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এমন সময় পদ্ম মেয়েটার হাতে গোল নারকেলের মতো কিছু একটা নিয়ে ওটার এক কিনারায় আগুন ধরিয়ে এগিয়ে দিল ওর দিকে। জিনিসটা হাতে ধরেই কিরান সেটাকে সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে মারল মঞ্চের দিকে। জিনিসটা উড়ে মঞ্চের দিকে যাচ্ছে পদ্ম চিৎকার করে ঘোড়ার গাড়িটা দেখাল। 'ওটা ফাটলেই...' সঙ্গেসঙ্গে বিস্ফোরণের সঙ্গে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছে মঞ্চের ওপর থেকে। 'কর্তার লোকেরা এদিকে এগিয়ে আসাব কবিরে সরায়া ফেলার জন্য। জলদি...' বলেই সে ইশারা করল। সঙ্গেসঙ্গে কিরান আর তার লোকেরা সবাই মিলে দৌড় দিল ঘোড়ার গাড়িটার দিকে। ঘোড়ার গাড়ির কাছে পৌঁছাল আর সঙ্গেসঙ্গে ওদের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল ঘোড়ার গাড়ির সহিস। কিরান তাকিয়ে দেখল ইতোমধ্যেই ঘোড়ার গাড়ির সহিসের জায়গার পাশে চড়ে বসেছে পদ্মের দলের একজন। ওরা কাছাকাছি পৌঁছাতেই পদ্ম লাফিয়ে উঠে পড়ল ঘোড়ার সহিসের জায়গায়। সেখানে উঠেই সে সহিসের চাবুকটা সাঁই সাঁই করে দুবার শূন্যে

ঘোরাল। কিরান পৌঁছাতেই লাফিয়ে পেছনে উঠে দাঁড়াল আর একটা মেয়ে। ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে আটকানো দড়িটার একটা প্রান্ত ছুঁড়ে দিল ওদের দিকে। কিরান সেটা হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দিল গোমেজের দিকে।

দড়িটাকে পেয়েই লাঠিয়াল দুজনকে নিয়ে গোমেজ দৌড়াতে শুরু করল ফাঁসির বেদির দিকে। 'জাহাজি, জলদি।' সামনে থেকে পদ্মের চিৎকার শুনে কিরান তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরে তাকিয়ে দেখল লোকজন ছুটোছুটি করতে শুরু করেছে। আর তার ভেতর দিয়েই হইহই করতে করতে দ্বীপের সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। কোমর থেকে টান দিয়ে নিজের পিস্তলটা বের করে আনল কিরান। সেই সঙ্গে আপনাতেই সে একবার ফিরে তাকাল মঞ্চে উপবিষ্ট ফাঁসির বেদিটার দিকে। সেখানে দেখতে পেল কবিকে ফাঁসির দড়ি পরিয়ে ফেলা হয়েছে। অসহায়ের মতো সে গোমেজের দিকে ফিরে চিৎকার করতে যাবে তার আগেই দেখতে পেল লাঠিয়ালদের নিয়ে গোমেজ দড়িটা মঞ্চের বেদির ঠিক নিচের খুঁটিটার সঙ্গে আটকে দিয়েছে। 'জলদি জলদি,' কিরান চিৎকার করে উঠতেই সাঁই সাঁই করে চাবুক কষাল সহিসের জায়গায় থাকা পদ্ম আর সেই মেয়েটা।

লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়ার গাড়ি। সামনের লোকজন আর দ্বীপের সৈন্যবাহিনীকে এলোমেলো করে দিয়ে মঞ্চটাকে একটা বৃত্তের মতো পরিধি ধরে ঝড়ের বেগ এগিয়ে যেতে শুরু করল ঘোড়ার গাড়িটা।

কিরান মঞ্চে দিকে তাকিয়ে দেখল লোকটাকে চড়ানো ফাঁসির দড়িটা টানটান হতে শুরু করেছে। আরেকবার চিৎকার করে উঠল সে। পদ্ম আরো জোরে গাড়ি ছোটাল, আরেকটু এগোলেই গাড়ির সঙ্গে বাঁধা দড়িটা টান খেয়ে বেদিটা ভেঙে পড়বে, আর না হয় ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো লোকটা মারা পড়বে। ঘোড়ার গাড়িটা আরেকটু এগিয়ে যেতেই টানটান হতে শুরু করল দড়িটা, যেকোনো সময় হয় বেদী ভেঙে পড়বে আর না হয় ফাঁসির দড়িতে আটকোনো লোকটা লটকে পড়বে। কিরান দেখল দুটো দড়িই টানটান হয়ে উঠছে। আর কয়েক ধাপ এগিয়েই ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে বাঁধা দড়িটা টান টান হয়ে গেল।

খুশিতে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু অবাক হয়ে দেখল ওদের গাড়ির সামনে জুড়ে দেওয়া ঘোড়া দুটো হ্রেষা ধ্বনি করে নিজেদের দুইপা শুনে তুলে ফেলেছে। কিন্তু গাড়ির টানে মঞ্চ তো ভেঙে পড়েইনি বরং দড়িতে টান খেয়ে থেমে গেছে গাড়িটা। ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে লোকটাকে। অসহায়ভাবে চিৎকার করে উঠল কিরান।

অন্যদিকে লাঠিয়াল দুজনকে নিয়ে গদা হাতে মঞ্চের বেদির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল গোমেজ। গাড়িটাকে থেমে যেতে দেখে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দেখছিল।

ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে। গাড়িটা থেমে যেতেই সে পরিস্থিতি দেখতে পেল মঞ্চের ওপরে মানুষটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মঞ্চের অন্যদিক থেকে ভেসে এলো কিরানের অসহায় চিৎকার। প্রায় কোনোকিছুই চিন্তা না করে সে নিজের ভারী শরীরটা নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল মঞ্চের দিকে। যে খুঁটিটাতে দড়ি আটকানো ছিল নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে পূর্ণ বেগে দৌড়াতে দৌড়াতে কাঁধ দিয়ে গিয়ে পড়ল সে ওটার ওপরে।

কিরান ফিরে তাকাল মঞ্চের দিকে। চারপাশের হট্টগোলের ভেতরেও পরিষ্কার শুনতে পেল গুলির শব্দটা। অবাক হয়ে সে তাকিয়ে দেখল যে, চৌকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষটাকে, সেই চৌকাঠে আটকানো দড়ির পাশটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল গুলির আঘাতে। সঙ্গেসঙ্গে দড়িতে ঝোলানো চৌকাঠ ভেঙে ছিটকে পড়ে গেলে মঞ্চের ওপরে।

তিনটে ঘটনা একসঙ্গে ঘটল; গাড়িটা থেমে গেলেও পদ্ম সাঁই সাঁই করে চাবুক চালাল। অন্যদিকে গোমেজের ভারী শরীরটা আছড়ে পড়ল মঞ্চের খুঁটির ওপরে। সেই সঙ্গে মঞ্চের ওপর থেকে ফাঁসির বেদি ভেঙে মানুষটা ছিটকে পড়ল ঠিক ওই জায়গাটাতেই। একইসঙ্গে তিনদিক থেকে তিনটে চাপ পড়াতে মঞ্চের ওই অংশটাই ভেঙে বসে গেল একপাশে। কিরানদের ঘোড়ার গাড়িটা লাফ দিয়ে আগে বাড়ল তীব্র বেগে। সেই সঙ্গে নিয়ে চললো মঞ্চের গোড়ার সঙ্গে আটকানো খুটিটার একটা অংশ। অন্যদিকে গোমেজ খুঁটিটাকে আঘাত করেই সরে আসতে যাচ্ছিল তার আগেই মঞ্চের একটা অংশ ভেঙে পড়ল ওর ওপরে। তার ওপরে ছিটকে এসে পড়ল ফাঁসির দড়ি থেকে পড়ে যাওয়া মানুষটা।

কিরানদের গাড়িটা তীব্র বেগে সামনে এগোলেও পদ্ম সেটার বেগ কমিয়ে গাড়িটাকে যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল তারপর সেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলো মঞ্চের ঠিক যেখানে ফাঁসি হতে যাচ্ছিল সেখানটায়। সেখানে পৌঁছেই কিরান দেখতে পেল মঞ্চের বেদির একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। সেটার নিচে চাপা পড়া গোমেজকে টেনে বের করে আনছে তার সঙ্গে লাঠিয়ালদের একটা দল সেইসাথে অবাক হয়ে সে দেখল তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বেদু বিল্লাল শেঠসহ আর আরো কয়েকজন।

গাড়িটা ওখানে পৌছাতেই নিজের লোকদের চিৎকার করে অজ্ঞান গোমেজ। আর মুখ ঢাকা অন্য লোকটাকে গাড়িতে তোলার নির্দেশ দিয়ে কিরান ফিরে তাকাল বেদু তুলারাম আর বিল্লাল শেঠের দিকে। 'তোমরা?'

'হুজুর, আমরা এইখানেই ছিলাম,' বলেই বেদু ভিন্নদিকে ইশারা করে বলে উঠল, 'ওইখান থেইকা ওস্তাদ গোলন্দাজ গুলি করছে।'

কিরান সঙ্গেসঙ্গে সেদিকে ফিরে তাকিয়ে বুঝতে পারল ফাঁসির চৌকাঠটা কীভাবে ভেঙেছে। সে ওদেরকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে এলো পদ্ম মেয়েটা, তার সঙ্গে আরো কয়েকজন। কিরান কিছু বলার আগেই সে তড়িঘড়ি করে বলে উঠল,

'জাহাজি আমগো দায়িত্ব শেষ, এহন এইখান থেইকা পলানো তুমগো কাম। ওই দেখো দ্বীপের সৈন্যরা আইতাছে। মাইরা কাইটা বাইর অইতে অইবো। জলদি করো,' বলে সে সহিসের চাবুকটা কিরানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের মেয়েদের নিয়ে ভিড়ের ভেতরে হারিয়ে গেল। কিরান তাকে এমনকি ধন্যবাদ জানানোর সময় পর্যন্ত পেল না। 'ওস্তাদ, দুইজনরেই তোলা অইছে।'

কিরান একবার ধেয়ে আসা সৈন্যদের দিকে দেখল তারপর ফিরে তাকাল নিজের লোকদের দিকে। 'জলদি করো। বেদু তুই আমার লগে বইবি, তুলারাম তুমি তোমার লোকেগো লইয়া আমি গাড়ি নিয়া আগানোর সময়ে পথ পরিষ্কার করবা। আর বাকিরা। আঘাত করবা...' সে কথা শেষ করার আগেই একটা গুলি লেগে গাড়িটার চলটা উঠে গেল এক জায়গা থেকে। এখন এই গাড়ির ক্ষতি হলে সর্বনাশ। 'জলদি জলদি। আমরা সইরা পড়লেই তুমরা ভিড়ের ভেতরে মিশা যাবা,' আরো একাধিক গুলি এসে লাগল গাড়িটাতে। ঘোড়া দুটো অস্থির হয়ে হ্রেষা ধ্বনি ছাড়তে শুরু করেছে। কিরান লাফিয়ে উঠে বসল গাড়ির সহিসের জায়গার ঠিক পাশেই। নিজের ছোটো বন্দুকটা সে ধরিয়ে দিল বেদুর হাতে। বেদুর একহাতে লাঠি, অন্য হাতে ছোটো বন্দুক। কিরানের একহাতে চাবুক, অন্যহাতে গাড়ি সামলানোর দড়ি। সে পেছন ফিরে দেখল তুলারমের দল লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে গেছে ওদেরকে পথ করে দেয়ার জন্য। গাড়ির পেছনে তোলা হয়েছে অজ্ঞান গোমেজ আর কবি লোকটাকে। ওদেরকে দুদিক থেকে পাহারা দিচ্ছে বৈঠা আর বিল্লাল।

'হুশশ হুশশ,' করে শূন্যে চাবুক চালাল কিরান। মুখ দিয়ে হ্রেষা ধ্বনি ছেড়ে লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়া দুটো। পেছনে প্রায় লাফিয়ে উঠেল ওরা। 'আস্তে ওস্তাদ,' পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল কেউ একজন।

বহু বছর ঘোড়ার গাড়ি চালায়নি। তাই অনভ্যস্ত হাতে কোনোমতে সামলে এগোতে লাগল গাড়িটা। পেছন থেকে হই হই শব্দ ভেসে আসছে সেই সঙ্গে অনেক মানুষের হল্লা। আর ধুমধাম গুলি এসে লাগছে এদিকে সেদিকে। গাড়িটাকে প্রথমে বামে নিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে কিরান ধরতে পারল ভুল রাস্তায় চলে এসেছে। কোনোমতে ঘোড়াগুলোকে সামলে আবার ডানে নিয়ে এলো। সঙ্গেসঙ্গে ওদের গাড়িটার দিকে ধেয়ে এলো সৈন্যদের একটা দল। তুলারামের বাহিনীকে রীতিমতো ঢালের মতো দাঁড়িয়ে খণ্ডযুদ্ধ চালাতে দেখল কিরান। খণ্ডযুদ্ধের ভেতরেই কোনোমতে অদক্ষ হাতে সামলে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল ও গাড়িটাকে।

এমন সময় এক সৈনিক হাতে তলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল কিরান যেদিকে আছে সেদিকে। কিরান দড়ি সামলে কোনোমতে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। মুখের এপাশে ধাম করে এসে লাগল কিছু একটা। আরেকটু হলেই সে ছেড়ে দিচ্ছিল ঘোড়ার গাড়ির নিয়ন্ত্রণ। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিলেও মুখের একপাশ থেকে রক্ত ঝরছে পরিষ্কার টের পেল। পেছনে অনুভব করতে পারল বিল্লাল শেঠ আর বৈঠাও লড়াইয়ে ব্যস্ত। দড়িটাকে একহাতে সামলে কোনোমতে চিৎকার করে উঠল, 'বেদু।'

ওকে সাহায্য করবে তো দূরে, অন্তত দুজন সৈনিককে সামলাতে ব্যস্ত তখন বেদু। ওরাও ঠিক একইভাবে লাফিয়ে উঠে তাকে চেপে ধরেছে একপাশ থেকে। একজন টেনে ধরেছে তার চুল, আরেকজন তার গলার সঙ্গে ঠেকিয়ে তলোয়ার চালিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। চুলওয়ালাকে কনুই দিয়ে আঘাত করে কোনোমতে তলোয়ার ধরা সৈনিকটার বুকে বন্দুক তাক করে ঘোড়া টেনে দিল সে। তীব্র আলো আর শব্দের ঝলকানির সঙ্গে এক চিৎকার করে লোকটা পড়ে গেল নিচে। অন্য লোকটাকে খানিকটা টেনে এনে ঘুষি মারল সে ওটার মুখে। এই লোকটাও অদৃশ্য হয়ে যেতেই সে ফিরে তাকিয়ে দেখল কিরানকে টেনে ধরে প্রায় নামিয়ে ফেলল আরেকজন সৈনিক। পেছন থেকে বিল্লাল শেঠ নিজের হাতের লাঠি দিয়ে প্রাণপনে বাড়ি মারল লোকটাকে। কিরানকে ছেড়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ এক চিৎকার করে পড়ে গেল লোকটা। কোনোমতে নিজেকে সামলে সোজা হলো কিরান। তারপর আবারও পূর্ণ বেগে ঘোড়া ছোটাতে শুরু করল।

'তুমি ঠিক আছ ওস্তাদ?' পাশ থেকে বেদু জানতে চাইল।

কিছু না বলে নিজের মুখের বাম পাশ বেদুর দিকে ফিরিয়ে সে জানতে চাইল, 'দেখ তো বেশি কেটেছে কিনা?'

বেদু হালকাভাবে দেখে বলে উঠল। 'তেমন না। কিন্তু গালের পাশে কানের নিচে মনে অয় সিলাই লাগতে পারে।'

কিরান কিছু না বলে, আরো জোরে চাবুক চালাতে চালাতে জানতে চাইল, 'বৈঠা আর বিল্লাল ঠিক আছস তোরা?'

'ঠিক আছি, ওস্তাদ,' পেছন থেকে জানাল বৈঠা।

'ভালো কইরা দেখ তো গোমেজ বেশি আহত অইছে কিনা?' ওদের ঘোড়ার গাড়ি বাজার এলাকা ছাড়িয়ে এখন জাহাজ নির্মাণের এলাকার দিকে এগিয়ে চলেছে।

'কেউ আসে না পিছে। আমরা তো আইলাম তুলারামের লোকেরা ঠিক ঠিক আইতে পারলে অয়,' বেদু আপনমনেই বলে উঠল। কিরানও একবার পেছন ফিরে বাজারে দিকে ধোঁয়া দেখতে পেল আর আগুন ছাড়া আবছাভাবে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না।

'ওস্তাদ গোমেজ কান্ধে ব্যথা পাইছে, তেমুন কিছু না।'

'ঠিক আছে,' গোমেজকে নিয়ে তেমন কিছু ভাবছে না ও। কারণ এর চেয়ে আরো অনেক ভয়াবহ আঘাত ওকে অবলীলায় কাটিয়ে উঠতে দেখেছে সে।

কিরান সামনে তাকিয়ে রাস্তাটাকে একবার পরখ করে নিল। 'সবাই ভালো করে শোন। এখন আমরা আগায়া আসছি আর বাজারেও গণ্ডগোল।কিন্তু কিছুক্ষণের ভেতরেই সন্দ্বীপের কর্তার লোকেরা পিছু নেবে। এর আগেই আমগো দ্বীপ ছাড়তে অইবো। তবে আমি ওগোরে আরেকটু ঘোল খাওয়াইতে চাই। যাতে রঙ্গন আর তুলারাম সময়মতো আইসা পৌঁছাইতে পারে। আমরা ঘোড়া নিয়া কোন দিকে আগাইছি এইটা ওরা দেখছে। কাজেই ওরা এইদিকেই আইবো। আমি যেইটা করব, আরেকটু আগায়া গাড়িটারে অন্যদিকে চালায়া দেব গাড়ি ওইদিকে আগাইতে থাক, ওরা এই পর্যন্ত আইসা সেদিকে যাইব গাড়ির পিছে। আর এই সুযোগে আমরা পৌঁছাইয়া যাইতে পারব। বোঝা গেছে?' সবাই সম্মতি জানাতেই কিরান আরো জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আরো আধ মাইলের মতো এগোল, তারপর গাড়ি থামিয়ে বেদুকে নিয়ে নেমে এলো নিচে।

'ওই মানুষটাকে আমি কান্ধে নিতাছি, কিন্তু সমস্যা তো গোমেজ,' বলে সে বেদু বৈঠা আর বিল্লালকে দেখল। 'এই পাহাড় কে টানবে! ওরে তো তুলতে পারলে ভালো অইতো। যাকগা। বৈঠা আর বিল্লাল ওর দুইপাশে দাঁড়াইয়া কোনোমতে ধইরা জোরে-সোরে আগাইতে থাক। এইখান থাইক্কা আমগো নৌকা বেশি দূরে না। বেদু ওরে নামা। প্রথমে লোকটাকে নামিয়ে বেদুর কাঁধে তুলে দিল কিরান। তারপর গোমেজকে চারজনে মিলে টেনে নামিয়ে বৈঠা আর বিল্লালের কাঁধে তুলে দিল। তোরা আগাইতে থাক। আমি গাড়িটার ব্যবস্থা কইরা আসি।'

বলে সে লাফিয়ে উঠে বসেই চাবুক চালাল সাঁই সাঁই করে। ঘোড়াদুটোকে আরো সামনে এগোতেই খনিকটা ঘুরে ওরা যেদিকে যাবে সেই জায়গাটাকে ডানে রেখে উল্টোদিকে গাড়িটাকে ধাবিত করল কিরান। গাড়িটার গতি বাড়িয়ে দিল আরো বেশ খানিকটা। যত এগোতে লাগল গাড়ির গতি বাড়াতে লাগল সে। ঘোড়াদুটো যখন পূর্ণ বেগে ছুটতে শুরু করেছে তখন চাবুকটাকে রেখে গাড়ি থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। কয়েক গড়ান দিয়ে যখন সোজা হলো ততক্ষণে গাড়ি খানিকটা তফাতে সরে গেছে এবং পূর্ণ বেগে ঘোড়া দুটোকে ছুটতে দেখে মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর। এবার এটা ছুটতেই থাকবে সামনে যে পর্যন্ত কোনো বাধা না পায়। আর দ্বীপের সৈনিকেরা এই ওটার পিছু নিয়ে ভুল পথে ধাবিত হবে। এই সময়ের ভেতরেই পালাতে হবে।

খানিকটা দম নিয়ে সে দৌড়াতে শুরু করল। মাইলখানেক দৌড়ে এসে দেখল বেদুরা এগিয়ে চলেছে। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বেদুর কাছ থেকে অজ্ঞান কবিকে নিজের কাঁধে নিয়ে ওরা হাঁটতে শুরু করল জোরকদমে। 'জলদি আগাইতে হবে,'

বলে সে এগিয়ে গেল খানিকটা অন্যদের থেকে। মুখের একপাশে অসম্ভব ব্যথা করছে কাটা জায়গায়। আরো খানিকটা এগিয়ে দূর থেকেই দেখতে পেল ওদের রেখে যাওয়া নৌকাগুলোকে। চলার গতি আরো বাড়িয়ে দিল ওরা। কিরান এগিয়ে গেলেও গোমেজের ভারী দেহটাকে বহন করতে থাকা বাকিরা চাইলেও সহজে এগোতে পারেছে না। আরো খানিকটা এগোতেই নৌকার মাঝিরা এগিয়ে এসে ওদেরকে সাহায্য করল।

'নৌকাগুলা পানিতে নামাও,' বলে সে নির্দেশ দিল ওদেরকে। কিছুক্ষণের ভেতরেই মাঝিরা নৌকাগুলোকে টেনে নামিয়ে নিল হাঁটু পানিতে। প্রথমেই গোমেজ আর সেই লোকটাকে নৌকায় তুলে দিয়ে বৈঠা আর বিল্লালকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'তোরা দুজন আগে যা। জাহাজে পৌঁছাইয়াই গোমেজ আর ওই কবির যত্ন নিতে বলবি। পট্টবর্ধন আর রহমত চাচা ভালো বৈদ্য জানে। ওগোরে কবির দেখভাল করতে বলিস,' বলে ওদের নৌকায় ওঠার নির্দেশ দিয়ে বাকি দুই নৌকার মাঝিকে নির্দেশ দিল নৌকা প্রস্তুত রাখতে। তারপর বেদুকে নিয়ে চলে এলো তীরের কাছে।

'দূর থেকে আবছা অন্ধকারের ভেতরে লোকজনকে এগিয়ে আসতে দেখে কিরান নিজের তলোয়ার আর পিস্তলটা বের করে বেদুকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'প্রস্তুত থাক, শত্রু না মিত্র জানা নাই। কাজেই সাবধান।'

মানুষগুলো আরেকটু এগোতেই দেখতে পেল ওদের সর্বাগ্রে দাড়িওয়ালা তুলারামকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তুলারামের সঙ্গে আরো বেশি লোক থাকার কথা। মানুষ কম দেখে খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলে সে, কিন্তু তুলারামের সঙ্গেই বন্দুক হাতে গোলন্দাজকে দেখে উদ্বিগ্নতা একটু হলেও কমল। ওরা প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে এগিয়ে এলেও তাদের সঙ্গে আহত কয়কজনকেও দেখতে পেল। গোলন্দাজ আর তুলারাম কাছে আসতেই কিরান দেখল তুলারামের দলের লোকেদের অবস্থা কাহিল। কাছে গিয়ে তুলারামকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সে। 'বাকিরা কই?'

তুলারাম আনমনেই মাথা নাড়ল, 'তিনজন মারা পড়ছে। আর দুইজন সাংঘাতিক আহত।'

'আগে ওগোরে নিয়া তুমি নাওয়ে ওঠো। পরের নাওতে আমরা আসতাসি,' বলে সে তুলারামকে এগোতে বলে গোলন্দাজের দিকে ফিরে তাকে আবারও জড়িয়ে ধরল। 'তুমি সঠিক সময়ে গুলিটা না চালাইলে লোকটারে মনে অয় বাঁচাইতে পারতামনা। কিন্তু ওগোরে পাইলা কই?'

'আমি তো গুলি চালাইয়াই গাছ থেইকা নাইমা আসছিলাম। কিন্তু তুমগোরে পুরা পাকের ভেতরে রীতিমতো যুদ্ধ করতে দেইখা বুঝতাছিলাম না কী করব। তারপর যখন তুমগো গাড়ি বাজার থেইকা বাইর অইয়া গেলো তখন দেখলাম

তুলরামের লোকেরা ভিড়ের ভেতরে মানুষের লগে মিইশা গেল। সুযোগ বুইঝা আমিও আগো লগে মিইশা গেলাম। এইখান থেইকা এখন জলদি কাটতে হবে। কারণ যেকোনো সময় কর্তার লোকেরা আসতে পারে,' বলে সে কিরানের মুখের ক্ষত দেখল। 'তুমার তো দেখি অনেক কাইট্টা গেছে।'

'সমস্যা নাই, চলো,' বলে কিরান বেদু আর গোলন্দাজ দ্রুত এগোতে লাগল পানি ধরে। হাঁটু পানিতে আসতেই ওরা চড়ে বসল নৌকায়। আধ ঘণ্টার ভেতরে ওদের নৌকা জাহাজের কাছে আসতেই দড়ির জালি নেমে এলো ওদের ওপরে ওঠার জন্য। ওপরে উঠে দেখল পুরো জাহাজ আলোকিত, সবাই উত্তেজিত। সন্দ্বীপে কী হয়েছে খানিকটা শুনেছে সবাই কিন্তু আরো শোনার জন্য অস্থির হয়ে আছে। জাহাজের পাটাতনে পা রাখতেই পট্টবর্ধনসহ অন্যরা কিরানের রক্তাক্ত চেহারা দেখে রীতিমতো হইহই করতে করতে এগিয়ে এলো ।

'আরে কর কী?' কিরান দেখল ওরা উঠে আসতেই দড়ি বেঁধে নৌকাগুলোকে টেনে তোলা হচ্ছে ওপরে। পট্টবর্ধনের দিকে তাকিয়ে সে নির্দেশ দিল, 'আগে জাহাজের সব আলো নিভাও। তারপর জলদি নোঙর তোলো। এইখানে এখন এক মুহূর্তও থাকাটা ঠিক না। জলদি জলদি।'

কিরানের নির্দেশ পেতেই সবাই কাজে লেগে গেল। জাহাজের বেশিরভাগ আলো নিভিয়ে নিঃশব্দে নোঙর তুলে চলতে শুরু করল তিনটে জাহাজ। 'গোমেজ আর কবির যত্ন নেওয়া অইছে?'

পট্টবর্ধন কিরানের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মাথা নেড়ে জানাল ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সে জানতে চাইল, 'সন্দ্বীপে অইলাটা কী?'

কিরান জাহাজে ওর কামরার দিকে এগোতে এগোতে ওখানে কী হয়েছে বিস্তারিত জানাল। 'এখন মানুষটার সঙ্গে কথা বলতে হবে। সে সত্যিই আদৌ কিছু জানে কিনা,' বলে সে মুখ বিকৃত করে উঠল ব্যথার চোটে। 'যেহেতু সে বাপুর সঙ্গে রোসাঙ্গ থাইক্কা আসছে অবশ্যই সে কিছু বলতে পারবে। তবে তার আগে রহমত চাচারে পাঠাও এইটার যত্ন নিতে হবে,' বলে সে ফিরে তাকাল জাহাজের রসুইয়ের দরজার দিকে। কালো পোশাক পরা মুখ বাঁধা কালো একটা মূর্তি তীব্র আগ্রহের সঙ্গে দেখছিল ওকে। ও তাকাতেই মাথা নিচু করে বসে গেল সে। রাঁধুনির সহকারী সেই পতিত লোকটা। মানুষটাকে কেমন জানি অদ্ভুত লাগে কিরানের কাছে।

আনমনেই একবার মাথা ঝাঁকিয়ে সে দ্রুত এসে ঢুকল নিজের কামরায়। প্রথমেই পরিচ্ছন্ন হয়ে ক্ষতটার যত্ন নিল যতটা সম্ভব। তারপর সেটাতে পট্টি লাগিয়ে পোশাক বদলে বেরিয়ে এলো জাহাজের পাটাতনে।

সঙ্গেসঙ্গে রহমত চাচা দৌড়ে এলো ওর দিকে। 'তুমার মুখের অইটা...?

'লাগব না চাচা। কবি ঠিক আছে?'

'হের জ্ঞান ফিরছে। খানা দিছি, খাইতাছে,' রহমত চাচার দ্রুত জবাব।

'ঠিক আছে চাচা, আমারে এক বোতল আরক আর এট্টু তামুক আইন্না দেও। আর পট্টবর্ধন চাচারে ডাকো। মানুষটার লগে কথা কইতে হবে,' এত হাঙ্গামা করে কাকে আনল, কেন আনল, জানতে হবে এবার।

***

কিরান এগোল সেই কামরার দিকে যেখানে মানুষটাকে রাখা হয়েছে।

দুজনে মিলে কামরার ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পেল বিছানাতে আধ বসা হয়ে আছে মানুষটা। কিরান ভালোভাবে খেয়াল করে দেখল মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। একেবারেই হালকা-পাতলা শরীর। মুখে ফুরফুরা মোচ-দাড়ি। বেশ গভীর এক জোড়া চোখ। যদিও এই মুহূর্তে সেই চোখ জোড়ায় ক্লান্তি-ভীতি আর বিহ্বলতা সেটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তবুও সেই চোখের দিকে তাকিয়ে মানুষটার ভেতরের প্রজ্ঞার আঁচ টের পাওয়া যায়।

কিরান আর পট্টবর্ধন ভেতরে প্রবেশ করতেই মুখ তুলে তাকাল মানুষটা। বয়স্ক মানুষটার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কী পরিমাণ ঝড় বয়ে গেছে মানুষটার ওপর দিয়ে। কিরান আর পট্টবর্ধন দুজনেই বিছানার দিকে এগিয়ে গেল কিরান। বসে পড়ল তার শিয়রের পাশে উপবিষ্ট আসনে। তারপর মানুষটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জানতে চাইল, আপনি ঠিক আছেন?'

প্রথমে মানুষটা মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। তারপর সেই অবসন্ন মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে হাত নেড়ে জানাল সে ঠিক আছে। কিন্তু মুখে কোনো কথা বলল না। শারিয়ার একবার পট্টবর্ধনের দিকে দেখে নিয়ে মানুষটার হাত থেকে পানির পাত্রটা নিয়ে বিছানার পাশে রেখে দিল। সে আবারও পট্টবর্ধনের দিকে দেখে নিয়ে মানুষটার দিকে ফিরে তাকাল। আসলে কীভাবে কথা শুরু করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। 'আপনি আমার বাবাকে চিনতেন?'

'বাবা!' এই প্রথমবারের মতো বলে উঠল মানুষটা। 'কোনোনা কোনোভাবে তুমি কী তালেব তৈমূরের ছেলে?' মানুষটার কণ্ঠস্বর বয়সের সঙ্গে একেবারেই যায়না। চেহারা না দেখে এই মানুষটার গলা শুনলে মনে হতো কোনো যুবক কথা বলছে। শান্ত সুরেলা কণ্ঠস্বর যেন কবিতা পড়ছে এমন শোনায়।

'জি, আমি তালেব তৈমূরের ছেলে তালেব কিরান,' কথাটা শারিয়ারের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হতেই মানুষটার মুখে সামান্য হাসি ফুটে উঠল। কিরান খানিকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মানুষটার মুখের দিকে।

'তুমি কী জানো তোমার বাবা কী পরিমাণ বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন?' বলে সে আপনাতেই সামান্য মাথা নাড়ল। 'আমার ভাগ্য যে, তোমার বাপের মতো মানুষকে আমি অল্প সময়ের জন্য হলেও বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম। এরকম মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া যেকোনো মানুষের জন্যই সৌভাগ্যের।'

মানুষটার কথা শুনে কিরানের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। আর এই মানুষটার কাছ থেকেই কিনা সে জীবনের বেশিরভাগ সময় পালিয়ে বেড়িয়েছে।

'আমি হাসছিলাম। কারণ, যেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম কেউ না কেউ আমাকে ফাঁসি থেকে বাঁচাতে এসেছে আমি বুঝলাম যে, সেটা হয় তৈমূর নিজে আর না হয় তার ছেলে।'

'আপনাকে ফাঁসি দিতে চাইছিল কেন তারা?' এবার পট্টবর্ধন জানতে চাইল।

মানুষটা পট্টবর্ধনের দিকে ফিরে তাকাল। 'সেটা বোঝাতে হলে আরো অনেককিছু জানাতে হবে তোমাদের। কিন্তু তার আগে আমাকে খানিকটা সিরাজি পান করাতে পারবে?'

'অবশ্যই,' বলে কিরান দরজার বাইরে থাকা লস্কর ছেলেটাকে ডেকে সিরাজি আনতে বলল। 'যদি কিছু মনে না করেন আপনার পরিচয়টা জানা হয়নি। আমরা এটুকু জানি আপনি একজন কবি। কিন্তু...'

'আমার নাম আলাওল, সৈয়দ আলাওল,' মানুষটা অবসন্ন গলায় বলে উঠল।

সঙ্গেসঙ্গে মুখ তুলে তাকাল কিরান। আর এক পা সামনে এগিয়ে এলো পট্টবর্ধন। 'আপনি কবি আলাওল? মানে আরাকানের রাজসভার সভা কবি আলাওল। পদ্মাবতীর আলাওল?' অনেকগুলো প্রশ্ন করে সে কিরানের দিকে ফিরে তাকাল একবার।

মৃদু হাসিমুখে মানুষটা বলে উঠল। 'হ্যাঁ, আমিই আরাকানের রাজসভার কবি আলাওল। আমিই পদ্মাবতীর...' এইটুকু বলতেই লস্কর ছেলেটা দৌড়ে এসে একটা সিরাজির বোতল আর তিনটে গেলাস দিয়ে গেল। মানুষটা গেলাসে না ঢেলে সোজা বোতল মুখে লাগিয়ে তাতে চুমুক দিল। টানা কয়েকটা চুমুক দিয়ে সে ফিরে তাকাল কিরানের দিকে। 'তোমরা হয়তো মনে মনে ভাবছো আরাকানের রাজসভার কবির সঙ্গে তৈমূরের আবার সম্পর্ক কী? আর তাকেই বা কেন তোমাদের সন্দ্বীপের শাসনকর্তার ফাঁসির মঞ্চ থেকে উদ্ধার করে আনতে হলো,' বলে সে আবার চমুক দিল বোতলে, তারপর আবারও বলে উঠল।

'তাহলে শুরু থেকেই শুরু করি। তোমরা জানো কী না জানি না, আমি আরাকানের মানুষ নই। আমার জন্ম এই বঙ্গদেশে। ফরিদপুরর ফতেহাবাদে জন্ম আমার। ষোলো বছর বয়সের সময়ে বাবার সঙ্গে বাণিজ্য করতে গিয়ে আমি আর আমার বাবা দাস ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে বিক্রি হয়ে যাই আরাকানে। তারপর

কেটে গেছে অনেক বছর,' মানুষটা বলে চলেছে আর দৃষ্টি চলে গেছে বহুদূরে, সেটা সিরাজির প্রভাবে, নাকি নিজের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সেটা বোঝা গেল না। 'তো আরাকানের গল্প অনেক লম্বা। সেই গল্প তোমাদের শোনাব না। কারণ তোমরা জানতে চাইছো ভিন্ন গল্প। তো এটুকু বলি আমি আরাকানের রাজসভাতে বেশ ভালো অবস্থানেই ছিলাম। কিন্তু বর্তমান রাজার সময়ে সেই ভালো অবস্থা আর আগের মতো নেই। কারণ বর্তমান রাজা আর তার লোকেরা একদিকে যেমন অমানুষ অন্য দিকে তেমনি স্থূল বুদ্ধির মানুষ। এদের শুধু চাই অর্থ, মেয়েমানুষ অর অকারণ দুঃশাসন।'

'তো যাই হোক, আমার দিনকাল যথারীতি কাটছিল। এর মধ্যেই বঙ্গদেশে আর ভারতবর্ষের তক্তপোশে যা ঘটছিল সেটার আঁচ আমরা আরাকানেও টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু সেটার আঁচ সরাসরি টের পাই যখন মোঘল রাজপুত্র বাঙ্গাল মুল্লুকের প্রাক্তন সুবাদার সম্রাট শাহ সুজা তার যুদ্ধে হেরে আরাকানে গিয়ে আশ্রয় নিল। আরাকানের রাজা তাকে বেশ ভালোভাবে আমন্ত্রণ জানাল। আমরা ভেতরে ভেতরে জানতাম যে, রাজার নজর শাহ সুজার সুন্দরী কন্যা আর তার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বিপুল পরিমাণ সম্পদের দিকে। আর এইসব ব্যাপারে শাহ সুজা খুব বেখেয়ালি ধরনের মানুষ ছিলেন। কিন্তু তোমার বাবা মানে তৈমূর তাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু শাহ সুজা সেটা শোনেননি। আমি এসবই জানতাম কারণ শাহসুজার আরাকানে অবস্থানের প্রথম দিন থেকেই তার সঙ্গে আমার গড়ে উঠেছিল গভীর বন্ধুত্ব। সময় আর সামাজিকতার বাঁধনকে ছিন্ন করে স্রেফ বয়স আর প্রজ্ঞার বন্ধন তিনজন মানুষকে কতটা কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে তারই সবচেয়ে সেরা উদাহরণ ছিল সম্রাট সুজা, তোমার বাবা আর আমার বন্ধুত্ব,' এই পর্যন্ত বলে মহাকবি আলাওল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। 'কে জানত এই বন্ধুত্ব এতটা সংক্ষিপ্ত হবে। আমরা সবাই জানতাম রাজা ওপরে ওপরে যতই খাতির জমাক না কেন আর আপ্যায়নের বাহানা দেখাক না কেন ভেতরে ভেতরে সে সাংঘাতিক কিছু একটা করার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু সেটা যে এত দ্রুত করে ফেলবে আমরা কেউই বুঝে উঠতে পারিনি। সম্রাটকে বলা হয়েছিল মক্কা রওনা দেয়ার জন্য তাকে আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে। এমন সময় হঠাৎই একদিন রাতে সম্রাটের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। ভাগ্যক্রমে সেদিন রাতে আমি সম্রাটের বাড়িতেই অবস্থান করছিলাম। সব তছনছ হওয়ার পরও যে দলটা সামান্যতম হলেও ম্রোহঙের পাশের জঙ্গলে অবস্থান নিতে পেরেছিল আমিও সে-দলেই ছিলাম। সেদিন রাতে তোমার বাবার পরামর্শেই অল্প কিছু লোকজন নিয়ে আমরা সামান্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম সেই জঙ্গলে। এরপরে সেখানেও আক্রমণ হয়। কিন্তু তার আগেই সম্রাটের সঙ্গে থাকা বিপুল পরিমাণ সম্পদের প্রায় পুরোটাই

নিয়ে তোমার বাবা তার খুব কাছের কিছু মানুষ আর আমি সরে পড়তে পারি। সম্রাটের জন্য সরে পড়ার সুযোগ ছিল কিন্তু সে নিজের লোকদের সঙ্গেই থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ সম্রাটের বক্তব্য ছিল, যদি তারা তাকে এই জঙ্গলে খুঁজে পায় তবে তারা অন্যদিকে নজর দেবে কম। এই সুযোগে তার বিরাট সম্পদ তৈমূরের পক্ষে নিয়ে সরে পড়াটা সম্ভব হলেও হতে পারে। পরবর্তীতে আসলে হয়েছেও তাই। সম্রাটের শেষ ইচ্ছে ছিল বিপুল সম্পদ যেন কিছুতেই আরাকানি আর মগদের হাতে না পড়ে। যেভাবেই হোক এই সম্পদ যেন বঙ্গদেশের মানুষদের কাছে পৌঁছায়, এই সম্পদ যেন এই দেশের মানুষের কাজে লাগে,' কিরান দেখলে শেষ কথাটা বলার সময়ে মানুষটার চোখের কম্পনরত প্যাতা সামান্য যেন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

'আমার নিজের জন্ম এই বঙ্গদেশে কিন্তু কোনোদিন এই বঙ্গদেশের জন্য আমি কিছু করতে পারিনি। এমনকি দূরদেশে থাকতে থাকতে এই বঙ্গদেশের ভূমি মানুষ আর ভালোবাসা সবই ভুলতে বসেছিলাম। মাঝে মাঝে মনে হতো এই বঙ্গদেশ যেন আমার জন্য দূরের কোনো স্বপ্ন। কিন্তু আমার সেই স্বপ্নকে আবারও আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেছিল তোমার বাবা আর সম্রাট সুজা। আমি জানি সম্রাট সুজাও আর দশজন সম্রাটের মতোই কলঙ্কমুক্ত নয়। কিন্তু তার যে ব্যাপারটা তোমার বাবা কিংবা আমি অসম্ভব পছন্দ করতাম সেটা হলো, এই বঙ্গভূমির প্রতি তার নিখাদ ভালোবাসা। তুমি বিগত শত বছরের ইতিহাস বিবেচনা করে দেখো এই ভূমিতে যারাই এসেছে সুজলা এই ভূমিকে শুধু ব্যবহারই করেছে, ধর্ষণ করছে বেনিয়ার মতো। সাধারণ মানুষের কথা কেউই ভাবেনি, উন্নয়ন তো দূরে থাক। শুধু লুটপাট করেছে। কিন্তু এই একজন মানুষ সেটা করেছে। একমাত্র তার সুবাদারির সময়েই সবচেয়ে সুখে ছিল, শান্তিতে ছিল এই মুল্লুকের মানুষ। দক্ষিণ উপকূলের এই দস্যুদের অত্যাচার বাদ দিলে এই মুল্লুকের মানুষ বিগত বহু বছরে এতটা ভালো আর কখনই ছিল না। এ-কারণেই সম্রাটেরও শেষ ইচ্ছে ছিল মোঘলদের সম্পদের যে বিরাট ভাণ্ডার ছিল সেটা যেন এই বাঙ্গাল মুল্লুকের মানুষের কাজে লাগে।'

মানুষটা এই পর্যন্ত বলতেই কিরান বলে উঠল, 'এরপর কী হলো? সম্রাট মারা পড়লেন সেই জঙ্গলে আর আপনারা সরে পড়লেন সেখান থেকে। এরপর বাবার কী হলো, সেই সম্পদ কোথায় আর আপনিই বা সন্দ্বীপে আটকা পড়লেন কীভাবে?'

'বলছি,' বৃদ্ধ মানুষটা এত ধকলের পর হাঁপিয়ে উঠেছেন। সিরাজির বোতলে আরেকটা চুমুক দিয়ে সে আবারও বলতে শুরু করল। 'আমরা ম্রোহঙের কাছের সেই জঙ্গল থেকে চারটা নৌকায় করে বেশ অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে চলে আসি আগে থেকে ঠিক করে রাখা জাহাজে। ছোটো এই জাহাজটাতে করেই তোমার

বাবা আরাকান থেকে চট্টগ্রামে এসেছিল কাজ সারতে। তারপর কাজ সেরে সে এটাতে করেই ফিরে গেছিল আরাকানে। ইচ্ছে করেই সে জাহাজকে বন্দরের কাছে নিয়ে যায়নি। কারণ একমাত্র তোমার বাবাই বিপদের পাঁচ করতে পারছিল। তো যাই হোক, আমরা মাঝরাতের দিকে জাহাজে পৌঁছাই। জাহাজে পৌঁছে সঙ্গে নিয়ে আসা পিপেগুলো তুলতে তুলতে প্রায় ভোর রাত হয়ে যায়। সকালের জোয়ারে আমরা জাহাজ ছেড়ে দেই। পরে খবর পেয়েছি সকাল হতেই পুরো দক্ষিণের এলাকা আরাকানের নৌবাহিনী, মগ দস্যু আরপর্তুগিজদের সহায়তায় বের দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। কিন্তু ওরা বের দেয়ার আগেই আমরা বেরিয়ে যাই। পরে আরো জানতে পেরেছি যে, জলপথগুলো ঘিরে ফেলেই ওরা অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে যদি ম্রোহং থেকে কেউ পালিয়ে গিয়েও থাকে তবে তারা অবশ্যই ওদের ঘেরের ভেতরে আটকা পড়েছে। কিন্তু আমরা যে আগেই জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে গেছি এটা ওরা বুঝে পারেনি।'

'তাহলে আপনারা জাহাজ নিয়ে সরাসরি চট্টগ্রামে চলে আসেননি কেন?' পট্টবর্ধন জানতে চাইল। সে হাতে তামাক বের করে রেখেছে। কিন্তু কবির সামনে সেটা ধরাবে কিনা বুঝতে পারছে না।

'এখানে আমাদের কপাল খারাপ ছিল। আমরা জাহাজ নিয়ে বেশ অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে ঘুর পথে ওদের চোখ এড়িয়ে চট্টগ্রামে পৌঁছানোর চেষ্টা করি। কিন্তু এরই মাঝপথে আমাদের জাহাজে সমস্যা দেখা দেয়। সেটা ঠিক করতে একদিন লেগে যায়। কিন্তু সেটা ঠিক করার পরও খুব একটা কাজে দেয়নি। জাহাজ চট্টগ্রামে পৌঁছানোর অবস্থায় আনতে পারিনি তো আমরা। তখন তৈমূর সিদ্ধান্ত নেয় চট্টগ্রামে না গিয়ে ওখান থেকে তুলনামূলক কাছে সন্দ্বীপে যাবে। কারণ একমাত্র সন্দ্বীপে গেলেই জাহাজও মেরামত করা সম্ভব হবে,সেই সঙ্গে তার পরিচিত এবং নিজের মানুষদের কাছে সে খবর পাঠাতে পারবে।'

'কিন্তু সন্দ্বীপে পৌঁছানোর একটা বড়ো ঝুঁকি ছিল নিজেদের লুকিয়ে রাখা। কারণ সন্দ্বীপ এতটাই ব্যস্ত এলাকা যে চাইলেই ওখানে লুকিয়ে থাকাটা খুব সহজ নয়। কিন্তু আমরা সেটা পেরেছিলাম। কারণ সন্দ্বীপে তৈমূরের অনেক অনেক বন্ধু ছিল। তারা সবাই আমাদের সহায়তা করে। আমাদের জাহাজ মেরামতির জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন ছিল। সেই সময়ে আমরা সন্দ্বীপেই অবস্থান করি। এই সময়েই সে চট্টগ্রামে আকরাম বেগকে খবর পাঠায় নির্দেশনা জানিয়ে। সে-ই ওখান থেকে বলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা দল নিয়ে ওদের সাহায্য করার জন্য পৌঁছাতে। কিন্তু ওখানে সরাসরি আমরা কোথায় আছি বলা হয়নি। কারণ এতে সরাসরি শত্রুর হাতে খবর চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অন্যদিকে সে দস্যু পদ্মের দলকে খবর দেয় নিজেদের নিরাপত্তা সেই সঙ্গে পালানোর পথ করার জন্য। সবকিছু ঠিকঠাক করার জন্য এবং তোমাদের সন্দ্বীপ পৌঁছানোর জন্য আরেকটু

সময় দরকার ছিল আমাদের। কিন্তু গতকাল দুপুরেই আমরা খবর পাই সিলভেরা তার দল নিয়ে সন্দ্বীপ পৌঁছে যাবে যেকোনো সময়ে। এই সময়ে তৈমূর আর দ্বীপে থাকার সাহস পায়নি। সে দ্রুত নিজের লোকজনকে নিয়ে জাহাজ প্রস্তুত করে সরে পড়ে। আমাকে রেখে যায় যাতে করে তোমরা পৌঁছালে আমি তোমাদের জানাতে পারি সে কোন দিকে গেছে। কারণ অন্য কারো ওপরে সে ভরসা করতে পারছিল না। কিন্তু সেটা হওয়ার আগেই আমি ওদের হাতে বন্দি হই।'

'তারমানে আপনি জানেন বাবা কোন দিকে গেছেন...' কিরান চূড়ান্ত কৌতূহলের সঙ্গে জানতে চাইল। এতদিনে সে বাবার সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছানোর মতো অবস্থায় এসেছে। একটা নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে জানতে পারছে ওর বাবা কোথায় যাবে। এবার হয়তো সময় এসেছে। বাবার কাছাকাছি পৌঁছে সরাসরি তাকে সাহায্য করতে পারবে সে। সেই সঙ্গে সিলভেরার মুখোমুখি হওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু সেটা গৌণ মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে তার কাছে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে বাবাকে সাহায্য করা।

'হ্যাঁ আমি জানি। তবে সেটা পরে বলছি,' মহাকবি আলাওল পট্টবর্ধনের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কিরানের দিকে ফিরে বলে উঠল। 'আমি আগে বলে নিই কীভাবে ধরা পড়লাম আমি এবং কেন আমাকে ফাঁসি দেয়ার চেষ্টা করছিল তারা। ব্যাপারটা জানা তোমাদের জন্যও জরুরি। তো সিলভেরার আগমনের খবর পেয়ে তৈমূর নিজের লোকদেরকে নিয়ে দ্রুত জাহাজ সাজানো শুরু করে। স্বল্পতম সময়ের ভেতরে সে যা পারে, যেভাবে পারে সাজিয়ে নিয়ে বিকেলের জোয়ার ধরার জন্য জাহাজ নামিয়ে দেয়। কিন্তু এটা করতে গিয়ে নিজের দুজন লোককে সে ভুল করে ফেলে দিয়ে সন্দ্বীপেই রেখে চলে যায়। ফলে যাদের রেখে চলে যায় সে ওরা দীর্ঘক্ষণ বন্ধুর অপেক্ষা করে ফিরতি পথ ধরে। কিন্তু ততক্ষণে বন্দরে জাহাজ চলে এসেছে, সিলভেরা, তার সঙ্গে সমন্বিত মগ দস্যুদের একটা দল। যারা সরাসরি আরাকান থেকে এসেছে। তৈমূরের লোকটা যখন বন্দরে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে ফিরতি পথ ধরে আরাকান থেকে মগদলের একজন পিছু নেয় তার। লোকটা কোন দিকে যাবে ঠিক বুঝতে না পেরে সে হাম্মামখানার দিকে রওনা দেয় যেখানে তৈমূর আমাকে রেখে গেছে। তার পিছু নিয়ে সেখানে চলে আসে মগদের একটা দল। তারাই লোকটাকে হত্যা করে, সেই সঙ্গে হাম্মামখানার মালিককেও হত্যা করে। হত্যার আগে লোকটাকে নির্যাতন করে জেনে নেয় কোথায় আছে, কোন দিকে গেছে তৈমূরের জাহাজ। সেখান থেকে আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় দ্বীপের শাসনকর্তার দপ্তরে।'

'আপনাকে ওরা মারতে চাইছিল কেন?' পট্টবর্ধন জানতে চাইল। এতক্ষণে সে ধোঁয়ার শলাকাটা ধরিয়ে টান দিতে শুরু করেছে ওটাতে। 'ওদের যা জানার তা তো জেনেই গেছিল।'

'ওই লোকটাকে হত্যার পর একমাত্র আমিই জানতাম কোন দিকে গেছে তৈমূর আর সিলভেরা। তাই আমাকে সরানো প্রয়োজন ছিল। তাই দ্বীপের শাসনকর্তা কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি। তবে আমাকে ওভাবে আয়োজন করে ফাঁসি দেয়ার পেছনে আরেকটা কারণ ছিল,' বলে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। 'অনেকদিন যাবৎ দ্বীপের লোকজন মানসিকভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল শাসনকর্তার ওপরে। তার ওপরে শাহ সুজার মৃত্যু, মগদের অতিরিক্ত আসা যাওয়া এমনকি ব্যবসাতেও প্রভাব সৃষ্টি করছিল। তাই শাসনকর্তা এই সুযোগে আমাকে ফাঁসি দিয়ে একদিকে লোকজনকে একটা উত্তেজনার স্বাদ পাইয়ে দিতে চাইছিলসেই সঙ্গে সে এটার মাধ্যমে লোকজনকে খানিকটা সবকও শেখাতে চাইছিল যে তার সঙ্গে শত্রুতার পরিণতি কী হতে পারে।'

'বাবা কোন দিকে গেছে?' কিরান অনেকটা আপনমনে বলে উঠল। অন্য কোনো দিকে তার মনোযাগ নেই। 'সিলভেরা কখন সেই পথে রওনা দিয়েছে?'

কিন্তু মহকবি কিরানের প্রশ্নের জবাব দিল না। বরং পট্টবর্ধনের থেকে সে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল কিরানের ওপরে। তার চোখের গভীরে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। 'তুমি কী তোমার সব লোকদের বিশ্বাস করো বালক?' তার গলায় কোনো ভাব নেই।

'এমনকি নিজের চেয়েও বেশি,' কিরানের জবাবে কোনো দ্বিধা নেই।

'তুমি কী প্রস্তুত বালক?'

'এই মুহূর্তে সেই বিলাসিতার কী সুযোগ আছে আর?' মৃদু হেসে বলে উঠল কিরান। 'তবে এটা বলতে পারি এই দক্ষিণের সমুদ্রে এই মুহূর্তে সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবহর আমার হাতে। আপনাতেই ডান হাতে সে বুকের লকেটটা চেপে ধরে মনে মনে বলে উঠল, বুকের বলই সবচেয়ে বড়ো বল।

'বালক, তুমি যা করতে চাইছো সেটা করতে হলে শুধু শক্তি আর সামর্থের চেয়ে অনেক বেশি কিছু লাগবে...' বলে সে একটু থেমে আনমনেই মাথা নাড়ল। 'আমি হয়তো অনেক বেশি চিন্তা করছি,' বলেই সে খানিকটা এগিয়ে এসে কিরানের হাত ধরে ফেলল। 'তোমার বাবা তোমার ওপরে অসম্ভব বিশ্বাস করত। তোমার বাবা সন্দ্বীপ থেকে সপ্তগ্রামের দিকে রওনা দিয়েছে। কিন্তু ওখানে সে নিয়মিত সমুদ্রে পথে যাবে না। বরং সন্দ্বীপ থেকে খানিকটা উত্তর পশ্চিম দিকে জংলাটিলার দিকে রওনা দিয়েছে। সেখানেই তার পরবর্তী অবস্থান। এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

কিরান দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইল মানুষটার আকুতিভরা চোখের দিকে। তারপর মুঠোয় ধরা মানুষটার হাতে আশ্বাসের মৃদু চাপ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর পট্টবর্ধনের দিকে ফিরে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল,

'সবাইরে একসঙ্গে ডাকো, যুদ্ধের ঘোষণা চইলা আসছে।'

অধ্যায় পয়ত্রিশ

বর্তমান সময়

ডকইয়ার্ড এলাকা, চট্টগ্রাম

অফিসরুমের দরজায় যে লোকটাকে দেখা গেল সে সম্ভবত একেবারে প্রস্তুত হয়েই ঢুকেছে। সম্ভবত সে বাইরে তার সঙ্গীদের অজ্ঞান শরীর দেখেছে। লোকটাকে দেখে ঠিক তার বাকি সঙ্গীদের মতো মনে হলো না। বরং সে ওদের ঊর্ধ্বতন কিংবা বস হতে পারে। লোকটা অস্ত্র বাগিয়ে ধরে কানে লাগানো হেডফোনে কথা বলতে বলতে চট করে ঢুকে পড়ল রুমের ভেতরে।

মুহূর্তের জন্য দুই পক্ষ একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। শারিয়ার আর ভুবন যেমন বুঝতে পারল তাদের প্রতিপক্ষ দক্ষ এবং প্রস্তুত। অন্যদিকে অস্ত্রহাতে লোকটাও দুজনার শরীরিক ভঙ্গি আর ঢাকা মুখ দেখেই বুঝে ফেলল এরা সাধারণ গুণ্ডা-মাস্তান নয়। তার বুঝতে পারার পেছনে আরেকটা কারণ হলো, বাইরেই সে দেখে এসেছে তার এতগুলো লোককে কাবু করে রেখে এসেছে এরা। কাজেই সে ভেতরে ঢুকে সেকেন্ডের জন্য দ্বিধা করেই গুলি চালাল হাতে থাকা হ্যান্ডগান থেকে।

লোকটার একেবারে বরাবর ছিল ভুবন। আর শারিয়ার খানিকটা ভেতরের দিকে। সে সোজা গুলি করল ভুবনকে। কিন্তু ভুবন লোকটার দ্বিধার এক সেকেন্ডের ভেতরেই বুঝতে পেরেছে সে গুলি করতে যাচ্ছে, তাই সে আগেই লাফ দিয়েছে একটা কেবিনেটের দিকে। লোকটাও গুলি করল আর মাটিতে পড়েই এক গড়ান দিয়ে ক্যাবিনেটের আড়ালে সরে গেল ভুবন। প্রথম টার্গেট মিস হয়ে যেতেই যেকোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকের মতোই খানিকটা ঘুরে গিয়ে গুলি করতে উদ্যত হলো শারিয়ারের দিকে।

শারিয়ার দাঁড়িয়ে ছিল একটা রিভলভিং চেয়ারের পেছনে। লোকটা ভুবনকে গুলি করতেই চেয়ারটাতে লাথি মারল শারিয়ার। ভুবনকে গুলি করে সোজা হওয়ার আগের চেয়ার তীব্র বেগে এগিয়ে গিয়ে বাড়ি মারল লোকটার বুক বরাবর। খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে চেয়ারটাকে হাতের ঝাঁপটায় সরিয়ে দিল সে। চেয়ারটাকে ঠেলে দিয়েই শারিয়ার লাফ দিয়েছে সামনের দিকে। লোকটা চেয়ার সরিয়ে সোজা

হওয়ার আগেই শারিয়ার এগিয়ে এসে দক্ষ কমব্যাট যোদ্ধার মতো লাথি মারল লোকটার হাঁটুতে। একজন সক্ষম মানুষের হাঁটুতে ষাট কেজি ওজনের লাথি লাগলেই হাঁটুর বাটি ডিজলোকেট হয়ে যায়, আর শারিয়ারের বুট পরা পায়ের লাথির ওজন কমপক্ষে এক শ কেজি। কিন্তু লাথিটা ঠিকমতো লাগল না। তবে এতেই লোকটা হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল মাটিতে। তবে দমে যাওয়ার মতো লোক সেও নয়। মাটিতে বসে পড়লেও সে আবারও অস্ত্র তুলল। এবার আর হেলিকপ্টার শট নয় বরং ক্রিস গেইল যেভাবে ছক্কা মারে সেভাবে হাতের পাইপটা চালাল অস্ত্রটার মাঝ বরাবর। শূন্যে উঠে ছিটকে পড়ে গেল ওটা অন্যদিকে। কিন্তু সেই সঙ্গে লোকটাও ঝাঁপিয়ে পড়ল শারিয়ারের ওপরে। বসা থেকেই লাফ দিয়ে ওকে নিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। দুজনেই জড়াজড়ি করে পড়েছে। শারিয়ারকে নিচে পেয়ে তার ওপরে চেপে বসল সে। মুখে ঘুষি মারতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই পেছন থেকে নিজের পা বাঁকিয়ে লোকটার গলায় ঠেকিয়ে উল্টোদিকে টান মারল শারিয়ার। মাটিতে পড়ে গেল লোকটা।

দুজনেই মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। লোকটা এক পা এগিয়ে এসে আবার পিছিয়ে সোজা ঘুসি মারল শারিয়ারের মুখে। কিন্তু শারিয়ার তার ফাঁদে পায় দেয়নি। বরং লোকটা ঘুষি মারতেই তার শূন্যে পাক খাওয়া হাতটা ধরে ফেলল শারিয়ার। শরীরটাকে বাঁকিয়ে লোকটার হাতে নিয়ে এলো নিজের কাঁধের ওপরে। কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারে লোকটা। সতর্ক হয়ে উঠল। নিজের শরীরটাকে ঘুরিয়ে ছুটিয়ে নিতে চাইল হাতটা কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। কাঁধের ওপরে থাকা হাতটাকে লিভারের মতো উল্টো করে ধরে নিচের দিকে চাপ দিতেই কট করে হাত আর কাঁধের জয়েন্ট ছুটে গিয়ে ডিজলোকেট হয়ে গেল কাঁধের হাড়। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটা বুকে হাত রেখে জোরে একটা ধাক্কা মারল শারিয়ার। ধপ করে লোকটা ছিটকে গিয়ে বসে পড়ল সেই রিভলভিং চেয়ারে। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল শারিয়ার।

পিস্তল হাতে চেয়ারটার পাশে দাঁড়ানো ভুবন জানতে চাইল, 'ওকে, বস?' শুধু মাথা নাড়ল শারিয়ার। লোকটা চেয়ারে বসেই কাতরাচ্ছে। শারিয়ারের দিকে এক ধাপ এগিয়ে গেল ভুবন। 'বস, এখন কী করবে?' বলে সে কামরাটা দেখিয়ে বলে উঠল, 'এখানে তো কেউই নেই?' আমাদের অনুমান তো...'

'আমাদের অনুমান ঠিকই আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল শারিয়ার। 'কিছু একটা তো গণ্ডগোল হচ্ছে এখানে,' বলে সে রুমটা দেখাল। 'তুই হয়তো খেয়াল করিসনি। কিন্তু কেউ একজন ছিল এখানে বা কিছু একটা হচ্ছিল এখানে,' বলে রুমের এক কোনায় জড়ো করে রাখা খাবারের প্যাকেট দেখাল। 'হতে পারে কোনো অফিসিয়াল প্রোগ্রামের খাবার এগুলো কিন্তু ওটা,' বলে সে রুমের কোনার দিকে প্লাইউডের দরজার সামনে দেখাল। 'সম্ভবত বাথরুম ওটা। ওটার সামনে

দেখ প্লাস্টিকের পাপোসের সামনে একজোড়া মেয়েদের স্যান্ডেল,' বলে সে রুমটা দেখাল। 'কেউ একজন ছিল এখানে এবং তাকে সরানো হয়েছে এখান থেকে খুব বেশি সময় হয়নি,' বলে সে নিজের পিস্তলটা বের করে এনে ভুবনকে ইশারা করল, 'বাথরুমে দেখতো। আর কিছু আছে নাকি,' ভুবন চট করে বাথরুমে চলে গেল। খানিক পরেই সে বেরিয়ে এলো বেশ কিছু মেয়েলি জিনিস নিয়ে।

'দেখ তো অবস্থা?' বলেই সে ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'এখন কী করবে? টমিকেও লাইনে পাওয়া যাচ্ছে না। এই এলাকার কিছুই আমরা চিনি না। আর যে ঝামেলা পাকিয়ে এখানে এসে ঢুকেছি মনে হয় তো কিছুটা হলেও...'

হঠাৎ চেয়ারে বসে কাতরাতে থাকা লোকটা হেসে উঠল। দুজনে তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে চট্টগ্রামে স্থানীয় ভাষায় বলে উঠল, 'তোরা কারা আমি জানি না, কেন এখানে আইছোস সেও জানি না। খালি জানি এইহান থাইক্কা জিন্দা বাইর অইতে পারবি না। তোরা জানোস না কার লগে টক্কর দিতাছোস...'

শারিয়ার ভুবনের দিকে তাকিয়ে নিজের কানের সঙ্গে লাগানো ইয়ার পিসটা ধরে বলে উঠল, 'এই হারামজাদা টমি গেল কই? কাজের সময়ে ব্যাটা...' বলেই সে চট করে পা এগিয়ে চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে এলো নিজের সামনে। 'একটা বুদ্ধি আসছে। পিস্তল সাবধানে ধরিস,' বলেই সে চেয়ার টেনে লোকটাকে কোমরে হাত দিয়ে একটানে লোকটার বেল্ট খুলে নিয়ে এলো। তারপর সেটা দিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল লোকটার হাত।

ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'এই কী করস?'

শারিয়ার কারো কথা শোনার মুডে নেই। লোকটার হাত দুটো বেঁধেই সে এক পা পিছিয়ে এলো। 'ভুবন, চেয়ারটাকে ধর শক্ত করে।'

ভুবন খানিকটা এগিয়ে এসে দ্বিধার সঙ্গে চেয়ারটাধরল।কিন্তু ততোধিক দ্বিধার সঙ্গে জানতে চাইল, 'বস, করবেটা কী?'

কিন্তু তার প্রশ্নের জবাব দিল না শারিয়ার। বরং লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল। 'তুই কে আমি জানি না,' ঠিক লোকটার একটু আগের বলার ভঙ্গি নকল করে বলে উঠল, 'তুই কী করস আমি জানি না,' বলেই সে চট করে নিজের পিস্তলটা বের করে লোকটার দিকে তাক করল। 'খালি জানি আমার হাতে একটা পিস্তল আছে। আর তোর কাছে আছে তথ্য তুই আমারে তথ্য দিবি। হয় তোর মাথার ভেতরে যা আছে সেইটা আমি জানবো আর না হয় আমার পিস্তলের ভেতরে যা আছে এইটা তোর মাথার ভেতরে থাকব।'

শারিয়ারের কথা শুনে লোকটা কাতরাতে কাতরাতে জোরে হেসে উঠল। 'আর কিছুক্ষণের ভেতরে এইহানে অন্তত এক শ লোক আসব। তহন তোরা কী করবি?'

'আগে বল, এখানে কী কেউ বন্দি ছিল? একজন মহিলাকে ধরে এনে এখানে বন্দি করে রেখেছিলি তোরা?' শারিয়ার পিস্তলটা সামনে এগোল। লোকটার ফাটা ঠোঁটের কোণে হাসি।

'তুই জিগাইবি আর আমি বইলা দিব...'

শারিয়ার খুব সাবধানে গুলি করল। সাইলেন্সার লাগানো কিং কোবরার গুলি লোকটার কানের পাশ দিয়ে হুঁশশ করে বেরিয়ে গিয়ে পেছনের দেয়ালে লাগল। মুহূর্তের জন্য লোকটার মুখের হাসি সামান্য ম্লান হয়ে গিয়ে আবারও সে জোরে জোরে হেসে উঠল। 'তুই ভুল মানুষরে ভয় দেখানোর...' শারিয়ার আবারও গুলি করল, এবার লোকটার কাঁধের পাশের রিভলভিং চেয়ারটার রেক্সিনে মোড়ানো একটা অংশ উড়ে গেল। গুলির ধাক্কায় চেয়ারটা খানিকটা পিছিয়ে গেল সেই সঙ্গে ভুবনও সরে গেল একপাশে। 'বস, কী করছো তুমি?' ভুবন চেয়ারটা একপাশ থেকে ধরে রেখে শান্ত গলায় প্রশ্ন করল। শারিয়ারকে শান্ত থাকতে বলছে সে।

শারিয়ার তার দিকে তাকালও না। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চেয়ারে বসা লোকটার দুই চোখের দিকে। 'শেষবারের মতো জানতে চাচ্ছি। এখানে কী তোরা কাউকে ধরে এনছিলি কিনা?'

'মারা খা শালার...'

লোকটা কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই শারিয়ার পাথরের মতো স্থির হাতে ধরে রাখা পিস্তলটা দিয়ে গুলি করল লোকটার মাথার পাশে। ধুপ করে শব্দের সঙ্গেসঙ্গে লোকটার একটা কানের লতি উড়ে গেল। আবারও প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল লোকটা। 'বস!' জোরে ধমকে উঠল ভুবন, আর দুই পা এগিয়ে এসে চিৎকাররত লোকটার মুখ শক্ত হাতে চেপে ধরে নিজের পিস্তলটা লোকটা কপালে ঠেকাল শারিয়ার। তিন-তিনটে গুলি করার পর আগুনের মতো উত্তপ্ত সাইলেন্সারটা দুই চোখের মাঝখানে ঠেকাতেই চড়-চড় করে চামড়া পুড়তে শুরু করল। মুখের ওপরে চেপে ধরা শারিয়ারের হাতটা প্রায় কামড়ে ধরছে লোকটা।

কপালে সাইলেন্সার ঠেকিয়ে শারিয়ার মুখটাকে লোকটার একেবারে কাছাকাছি নিয়ে বলে উঠল, 'বুঝতেই পারছিস, সময় নেই আমাদের হাতে। সেই সঙ্গে তথ্যটাও জানা দরকার। কাজেই,' বলেই সে লোকটার মুখ ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল। পিস্তলটাকে সোজা লোকটার কপাল বরাবর তাক করে বলে উঠল, 'আমি তিন গুনব। এরমধ্যে সত্য না বললে তোর কপালের ওই পোড়া জায়গাটাতে একটা লাল টিপ বসিয়ে দেব। এক।'

লোকটার মুখ খুলে যেতেই সে চিৎকার করতে উদ্যোগী হয়েছিল শারিয়ারের ভাবভঙ্গি দেখে সেই হা হওয়া মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না। সে শারিয়ারকে দেখে নিয়ে একবার ভুবনকে দেখল। ভুবন সাবধানে বলে উঠল, 'বস, আস্তে।'

'দুই,' শারিয়ারের কোনো বিকার নেই।

'এই ভাই,' লোকটা দুহাত তুলে ভুবনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ভাই, আপনার বন্ধুরে থামান। ভাই।'

'বস!'

'আমি তিন গুনবো আর বুলেট ছুটবে,' বলে শারিয়ার পিস্তলটাকে আরেকটু এগিয়ে আনতেই লোকটা চেঁচামেচি শুরু করে দিল।'

'ভাই ভাই...'

'তিন,' বলে শারিয়ারের আঙুল টিগারে চেপে বসলো।

***

ছোটো বাচ্চাদেরকে স্কুলে পিটি করানোর সময় যেভাবে হাত-পা তুলে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, টমি আর সুমনকে অনেকটা সেভাবেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। দুজনেই আধো অন্ধকারের ভেতরে হাত তুলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে ওদেরকে বন্দি করা লোকগুলোকে দেখছে মনোযোগের সঙ্গে।

ওদের সঙ্গে কথা বলেছে চায়নিজ চেহারার যে লোকটা সে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে ওদের গাড়িটার ঠিক সামনেই। আর গাড়ির বনেটের ওপরে রাখা টমির ল্যাপটপটার সামনে কাজ করতে থাকা অন্য লোকটার ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে সে বোঝার চেষ্টা করছে কী হচ্ছে স্ক্রিনে। লোকটা ল্যাপটপে তার কাজ শেষ করে বিচিত্র ভাষায় সেই লোকটাকে কিছু একটা বলল। কথা শেষ হতেই সন্তুষ্টির সঙ্গে লোকটা গাড়ির সামনে ড্রোনের রিমোট হাতে দাঁড়িয়ে থাকা অপর লোকটার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলে উঠল। ওদের দেখতে দেখতে টমি আরেকবার ফিরে তাকাল ওদের দিকে অস্ত্র তাক করে রাখা অপর চারজনের দিকে।

লোকগুলোকে দেখে এদের ভাবভঙ্গি দেখে টমি অনুমান করল এরা বেশিরভাগই এ-দেশের মানুষ নয়। বাইরে থেকে এসেছে, তবে সবাই এই দেশের সঙ্গে পরিচিত। এছাড়া আরেকটা জিনিস যেটা টমির মনে হচ্ছে সেটা হলো এরা সবাই যার যার কাজে একদম প্রফেশনাল। অস্ত্র ধরা, দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি থেকে শুরু করে প্রতিটি ব্যাপারেই প্রফেশনালিজমের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

নিজের লোকদের নির্দেশনা দেওয়া শেষ হতেই টমিদের সঙ্গে দাঁড়ানো একজনকে ইশারা করল লিডার। সঙ্গেসঙ্গে লোকটা টমিকে তার হুডি ধরে টেনে নিয়ে সামনে ঠেলে দিল।

'আরে আস্তে,' কেমন জানি খসখসে বাংলা লোকটার। 'আমরা বন্দি করতে পারি ওদের কিন্তু এক অর্থে তো তারা আমাদের মেহমান,' বলে সে নিজের অন্য সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। 'মিস্টার টমি। সব ঠিক আছে। আমার

লোকেরা পরীক্ষা করে দেখেছে। এখন তুমি আবার তোমার বসের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগাযোগ রক্ষা করবে। সেই সঙ্গে ঠিক আগে যেভাবে নির্দেশনা দিচ্ছিল সেভাবেই নির্দেশনা দিতে থাকবে। আমার লোক তোমার নিদের্শনা অনুযায়ী ড্রোনটা অপারেট করবে যাতে তোমার সুবিধে হয়। কিন্তু,' বলে সে টমিকে নিজের দিকে টেনে এনে হুডির কলারটা দুই হাতে মুচড়ে ধরল।

লোকটা মুখের একেবারে কাছাকাছি মুখটাকে টেনে নিতেই টমি কড়া আফটার শেভের গন্ধ টের পেল নাকে। গন্ধটা এতই কড়া যে টমির নাক জ্বালা করে উঠল। 'যদি তুমি তাদের কোনোভাবে সতর্ক করার চেষ্টা করো তবে তোমার ওই সঙ্গী...,' বলে সে সুমনকে দেখাল। সুমনের মাথার পাশেই পিস্তল ধরে আছে একজন। 'তার খুলির ভেতরে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। বোঝা গেছে?' টমি কিছু না বলে মাথা লাগল।

লোকটা তাকে এক ঠেলা দিয়ে ফেলে দিল গাড়ির বনেটের ওপরে। 'নাউ ডু অপারেট,' বলে সে টমিকে কাজ শুরু করতে বলল।

***

শারিয়ারের আঙুল ট্রিগারে চেপে বসতে শুরু করেছে। লোকটা হাউমাউ করে বলে উঠল, 'ভাই বলতেসি,' শারিয়ার ভুবনের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির সঙ্গে পিস্তলটা নামিয়ে নিল। তার চেয়ারটাকে টেনে খানিকটা সামনে এনে বসে পড়লে ওটার সামনে। পিস্তলটাকে তুলে ধরে একেবারে লোকটার মুখের কাছে নিয়ে বলে উঠল, 'এবার বল, কী ব্যাপার? ঠিকঠাক বলবি। কারণ একটা মিথ্যে বা ভুল বললে তোর খবর আছে।'

'জি,' বলে লোকটা একবার ভুবনকে দেখে নিল। শারিয়ারকে তার বেশি ভয়ংকর মনে হচ্ছে। সেই তুলনায় ভুবনকে তার তুলনামূলক ভালো মনে হয়েছে। তাই বারবার ভুবনের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু এবার সে-আশা গুড়েবালি হয়ে গেল। ভুবনের দিকে তাকাতেই সে নিজের পিস্তল নেড়ে সামনের দিকে তাকিয়ে জবাব দিতে বলল।

'ভাই, আমরা কিছুই জানি না। আমরা ভাড়ার লোক। আমরা চাঁটগাওয়ের বাইরে থেকে আসি। কাম করি টাকা নিয়ে সইরা পড়ি আবার চাটগাঁয়ের বাইরে। কয়েকদিন আগে আমরা যার মাধ্যমে কাম পাই হে জানায় বিরাট একটা কাজ আছে। পুরা দল লাগব। তো আমরা আসি। আমগোরে মোবাইল থেকে শুরু কইরা অস্ত্র সব দেওয়া অয়। কওয়া অয় অমুক জায়গা থেকে একজনরে তুলতে হবে। আমরা হেই বেডিরে হোটেল থেকে অনুসরণ কইরা এইখানে আসি। এরপরে দেহি

হে বাড়ির ভেতরে যায়, একটু পরে দেহি বেডি দৌড়াইতাসে। আমরা আর ঝুঁকি না নিয়া হেরে তুইলা ফালাই। তুইল্লা এইহানে লইয়া আহি।'

'আনার সময় ওই পুকুর পাড়ে কেয়ারটেকারকে কে খুন করে?' ভুবন জানতে চাইল। লোকটা জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। শারিয়ার বুঝল কাজটা ওদেরই কারো। 'এখানে কেন?'

'এইটা কী তোদের এলাকা?'

'না ভাই,' লোকটার কান থেকে গড়ানো রক্ত মুখের দিকে চলে আসছে। শারিয়ার একবার আশেপাশে দেখ নিল। একে আর বেশিক্ষণ এখানে রাখা যাবে না। সময় কমে আসছে। 'যারা আমগো কাম দিছে হেরাই এহানে আইন্না রাখতে কইছে, পাহারাও দিতে কইছে। এইহানে এইসব কাম অয়। জাহাজ ভাঙ্গুনের ইউনিয়নে লিডারগো হাত কইরা। হিরুইন-ইয়াবার চালান পাচার, মানুষ পাচার। মাইনষেরে এইনে আইন্না আটাকায়া রাখা, মারা এইগুলান এইনে অয়। এইজন্যই বেডিরে এইনে আইনা আটকাইয়া রাখা অইছিল।'

'এখন কোথায় গেল সে?' ভুবনের প্রশ্নে লোকটা দ্বিধা করতে লাগল। শারিয়ার পিস্তলটা হাতে নিয়ে আবারও চেয়ারটাকে টেনে নিল নিজের দিকে। লোকটা আবার হাউমাউ করে উঠল। 'ভাই, হেই বেডিরে আইজ সন্ধ্যার দিকে সরানি অইছে এইহান থেইকা। আইজ বিকালে ফোন আইলো কে নাকি আইবো দেহা করতে। আমরা হেই বেডিরে আনার পর থেইক্কা হেয় আমগোর দায়িত্বে ছিল। কেউ কিছু কয়ও নই, যোগাযোগও করে নাই। আইজ ফোন কইরা কইলো, কে নাকি দেখা করতে আইবে। প্রথমে কইছিল এহানেই আইবো পরে কইলো সরাইয়া ফালাইতে।'

'কোথায়?' শারিয়ার পিস্তলটা আবারে কপালে ঠেকিয়ে জোরে প্রশ্ন করে উঠল।

'ভাই এইনেই,' বলে লোকটা এমনভাবে হাত তুলে দেখাল যেন জায়গাটা দেখা যাচ্ছে।

'এখানে বলতে?'

'ভাই এইনতে দুই বলক পরে জাহাজ মেরামতির যে ডকইয়ার্ড আছে হেনে একটা পুরান জাহাজের ভেতরে হেরে নেয়া অইছে। যার আসার কথা ছিল সে এহনো আসে নাই।'

'ওখানে কী তাকে তোদের পাহারাতেই রাখা হয়েছে নাকি বাইরের কাউকে...? কয়জন আছে ওখানে?'

'না, ভাই আমগো লোকেরাই রাখছে। আছে চাইরজন অইবো,' দ্বিধার সঙ্গে বলে উঠল সে।

'ঠিক করে বল,' ধমকে উঠল ভুবন।

'বলার দরকার নেই,' বলে শারিয়ার একটান দিয়ে তুলে ফেলল লোকটাকে,' তারপর লোকটার জ্যাকেটের হুডিটা তুলে দিল তার মাথার ওপরে। 'ও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে,' বলে সে লোকটাকে ঠেসে সরিয়ে দিল একপাশে। 'তুই আমাদের সঙ্গে যাবি। আমাদের দেখাবি মেয়েটাকে কোথায় রাখা হয়েছে। এরপরে নিজের লোকদেরে ডেকে বাইরে আনবি। এরপর যা করার আমি করব। বুঝেছিস?'

'ভাই আমার লোকেরা আমার কথা শুনব। কিন্তু ইউনিয়নের লোকেরা?'

'মানে?'

'ভাই এহানে তো আমরা ইউনিয়নের শেল্টারে কাম করি। হেরা খুব খারাপ। হেরা যদি...'

'এত কথা বুঝি না। আগে মেয়েটাকে বের করি। পরে অন্য কথা হবে,' বলে সে লোকটাকে টেনে একেবারে নিজের পাশে নিয়ে এলো। তারপর লোকটার শোল্ডার ব্লেডের ওপরে পিস্তলটা চেপে ধরে ভুবনের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল, 'খুব সাবধানে ভুবন। তুই আমার থেকে কিছুটা পেছনে থাকবি।'

ভুবন ইশারায় জানাল, সে বুঝতে পেরেছে।

লোকটাকে টেনে ধরে প্রায় গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো। 'হ্যাঁলো বস।' এয়ার পিসের ভেতর থেকে টমির গলা ভেসে এলো। 'কি রে টমি? কই গায়েব হয়ে গেছিলি তুই?'

'বস, টেকনিক্যাল প্রবলেম হইছিল। আর হবে না। তোমরা কই? কী হলো? পেয়েছো ডক্টর শশীকে?'

'আরে না,' লোকটাকে শরীরের সঙ্গে এমনভাবে চেপে ধরে হাঁটছে শারিয়ার যেন দুই বন্ধু গল্প করতে করতে এগোচ্ছে। ওদের দুজনার থেকে খানিকটা পেছনেই ভুবন। 'আমরা এখন সেই অফিস ঘরে। ডক্টর শশীকে পাইনি। কিন্তু এটা জানতে পেরেছি, সে এখানে বন্দি ছিল। এখন এই ইয়ার্ডেরই অন্যদিকে রাখা আছে তাকে। আমরা সেখানেই যাচ্ছি। তুই কী দেখতে পাচ্ছিস আমাদের?'

'হুমম, পাচ্ছি এখন। তোমার সঙ্গে ওটা কে?'

'পরে বলব। আপাতত খেয়াল রাখ আমরা কোনোদিকে যাচ্ছি। সাবধানে থাকবি যেন যোগাযোগ বন্ধ না হয়। আর ব্যাকআপ দিবি আমাদের। 'স্বাভাবিকভাবে কথা বল,' শেষ কথাটা সে বলেছে লোকটার উদ্দেশ্যে। বলেই সে সাইলেন্সারের ডগা দিয়ে লোকটার পিঠে খোঁচা দিল। কারণ ওদের সামনে কয়েকজন এগিয়ে আসছে কথা বলার জন্য।

কয়েকজন এগিয়ে এসে জানতে চাইল, ব্যাপার কী? ওদিকে এত হাঙ্গামা কিসের। লোকটা হেসে উঠে জানাল কোনো সমস্যা নেই। বলেই ওরা এগিয়ে যেতে লাগল সামনের দিকে। খানিকটা এগিয়ে বামে মোড় নিতেই ওরা কন্টেইনার রাখার

এলাকা ছাড়িয়ে ঢুকে পড়ল জাহাজ ভাঙা আর মেরামতির ডক এলাকায়। 'টমি সামনে দেখত, ক্লিয়ার আছে কিনা?'

'একদম ক্লিয়ার বস কিন্তু তোমরা যে গলি দিয়ে ঢুকছ সেটার শেষ মাথায় একটা আধা ভাঙা জাহাজের ওখানে লোক দেখা যাচ্ছে।'

'এই ব্যাটা এই গলির শেষ মাথায় সেই জাহাজ?' লোকটা জবাবে জানাল, ওটাই। 'জলদি চল,' বলেই লোকটাকে আরেক খোঁচা দিয়ে এগোতে লাগল। পেছন ফিরে ইশারায় ভুবনকে সাবধান করে দিয়ে লোকটার পিঠের ওপরে আরো শক্ত করে চেপে ধরল সাইলেন্সারের নলটা। 'সাবধান, কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করবি না। উল্টোপাল্টা করলেই মরবি।'

লোকটা মাথা নেড়ে জানাল সে উল্টোপাল্টা কিছু করবে না।

আরেকটু এগোতেই দেখতে পেল ডকের গলির শেষ মাথায় একটা আধভাঙা জাহাজের ওখানে আলো জ্বলছে। ঘোলাটে বাল্বের হালকা আলোয় দেখতে পেল দুজন লোক দাঁড়িয়ে গল্প করছে ভাঙা অংশটার মুখের দিকে। ভুবনের দিকে ইশারা করতেই ভুবন আরো খানিকটা পিছিয়ে অন্ধকারের ভেতরে হারিয়ে গেল।

'একদম সাবধান। একদম উল্টাপাল্টা করবি না,' বলে লোকটাকে সাবধান করে দিয়ে সে শেষ করল। 'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এখানে বাইরের কেউই আসেনি। লোকগুলোকে বলবি আমরা সেই লোক যাদের মেয়েটাকে নিতে আসার কথা ছিল। বুঝেছিস?'

শারিয়ারের প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই ওরা পৌঁছে গেল ভাঙা জায়গাটার সামনের দিকে। লোকটাকে দেখে তার সঙ্গীরা কৌতূহলের সঙ্গে জানতে চাইল কী হয়েছে ওখানে। এত হট্টগোল কিসের ছিল। লোকটা হেসে উঠে জবাব দিল তেমন কিছু না। একটু ঝামেলা হয়েছিল বাইরে থেকে যাদের আসার কথা ছিল তাদের নিয়ে। তাই সে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে ওদের।

লোকদুজনার ভেতরে একজন শারিয়ারকে দেখে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চাইল, একজনই এসেছে কেন। লোকটা জবাব দেবার আগেই শারিয়ার আর সে এগোতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে থাকা টুকরো টুকরো কাচের সঙ্গে। পাহারাদার দেখল শারিয়ারের হাতে পিস্তল আর সেই সঙ্গে লোকটাও ছুটে গেল তার পাঞ্জা থেকে। শারিয়ারকে পড়ে যেতে দেখেই লোকটা লাফিয়ে নিজের লোক দুজনার মাঝখানে গিয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠে সাবধান করে দিল নিজের সঙ্গীকে।

শারিয়ার পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিলেও দেখতে পেল একজন অস্ত্র তুলতে শুরু করেছে ওর দিকে। শরীরটাকে উঁচু না করে সে বরং গড়িয়ে পড়ল

মাটিতে। মাটিতে এক গড়ান দেয়ার সঙ্গেসঙ্গে বের করে নিল নিজের পিস্তল। মাটিতে উল্টো হয়ে শুয়েই গুলি করল লোকটার হাঁটু বরাবর। কুকুরকে লাথি মারলে যে রকম শব্দ করে ওঠে অনেকটা তেমনই কেউ করে উঠে লোকটা পড়ে গেল। তার অপর সঙ্গী সোজা গুলি করল শারিয়ারকে।

মাটিতে শুয়ে থাকলেও গুলিটা শরিয়ারের বুকে এসে লাগল। ভেস্টের কারণে গুলি গায়ে না লাগলেও ব্যথার চোটে দম বন্ধ হয়ে এলো ওর। ব্যথার চোটে অস্থির হয়ে উঠলেও শারিয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল পিস্তল তোলার কিন্তু অনুধাবন করতে পারল সে পিস্তল তোলার আগেই লোকটার গুলি তাকে বিদ্ধ করবে। কিন্তু গুলি করার আগেই কট করে একটা শব্দ হলো, আর লোকটার মাথা গিয়ে জাহাজের খোলের সঙ্গে বাড়ি লেগে ধাম করে পড়ে গেল সে মাটিতে। বুকে ভীষণ ব্যথা লাগলেও শারিয়ার চেষ্টা করল উঠে দাঁড়াতে কিন্তু উঠতে গিয়ে আবারও বসে পড়ল মাটিতে। এক জোড়া পা এগিয়ে আসতে দেখল তার দিকে।

একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ভুবন জানতে চাইল, 'ঠিক আছ?' শারিয়ার হাতটা ধরতেই তাকে টেনে সোজা করিয়ে দিল সে। 'তুমি একটা অমানুষ, এত ঝুঁকি নিতে পারো,' বলে সে আনমনে মাথা নাড়ল।

ভুবনের কথার কোনো জবাব না দিয়ে শারিয়ার জাহাজের খোলের ফাঁকা অংশের দিকে দেখিয়ে জানতে চাইল, 'এই দুটো তো ঠাণ্ডা হয়েছে বুঝলাম।কিন্তু যেটাকে ধরে আনলাম সেটা গেল কই?'

'ভেতরের দিকে গেছে আর কই?' সে কথা শেষ করার আগেই জাহজের ভাঙা খোলের ভেতর থেকে ভেসে এলো নারীকণ্ঠের চিৎকার। ভুবন তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়েছো?' বলে সে গুলতিটাকে কোমরে রেখে পিস্তল বের করে আনল। শারিয়ারের দিকে তাকাতেই সে হেসে উঠল।

'প্রশ্নের জবাব পেয়ে যতটা না খুশি হয়েছি তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছি চিৎকারটা শুনে। অন্তত এটা বুঝতে পেরেছি যে, ডক্টর শশী ভেতরে থাকার একটা সম্ভাবনা আছে,' বলে সে নিজের পিস্তলটা চেক করে নতুন সিলিন্ডার ভরে নিল। 'শোন, এতক্ষণ বাইরে লুকোচুরি খেলেছি অনেক। এবার কিন্তু আর সে সুযোগ নেই। অন্য কারো প্রাণ বাঁচানোর চেয়ে আমাদের বেশি প্রায়োরিটি দিতে হবে ডক্টর শশীকে উদ্ধার করার ব্যাপারটা,' এইটুকু বলে সে ভুবনের দিকে তাকিয়ে মুচকি একটা হাসি দিয়ে বলে উঠল, 'কাজেই শুট টু হিট,' বলে সে ভেতরের দিকে পা বাড়াল। তাকে কভার করে ঠিক তার পেছনেই ভুবন।

ঠিক বাইরের মতোই ভেতরেও একটা হলুদ বাল্ব থেকে ঘোলাটে আলো ছড়াচ্ছে। বাল্বের ঘোলাটে আলোতে যা দেখল তাতে শারিয়ার অনুমান করল যে

জাহাজটার খোলের ভেতরে ওরা প্রবেশ করেছে সেটার ভেতরের সবকিছুই প্রায় ভেঙে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এককথায় বলতে গেলে শুধু খোলটা বাদে জাহাজের আর তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই। আর সেই খোলের ভেতরেই একদিকে সম্ভবত এনে রাখা হয়েছিল মেয়েটাকে। কিন্তু এখন সেখানে নেই সে। কারণ তাকে দাঁড় করিয়ে ফেলা হয়েছে, আর ঠিক তার পেছনেই মেয়েটার মাথার পাশে হ্যান্ড গান চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটা যাকে ওরা সেই অফিস থেকে ধরে এনে এই পর্যন্ত পৌঁছেছে। তার ঠিক দুদিক থেকে দুজন অস্ত্র তাক করে আছে শারিয়ার আর ভুবনের দিকে।

'একদম লড়বি না কইতাছি,' মেয়েটাকে সাপটে ধমকে উঠে শারিয়ার আর ভুবনকে উদ্দেশ্য করে লোকটা বলে উঠল। 'একটা কিছু করবি তাইলে মাগিটারে শেষ কইরা দিমু।'

শারিয়ার সাবধানে অস্ত্র বাগিয়ে ভেতরের দিকে এগোল। বলতে গেলে প্রায় ফিসফিস করে ভুবনকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'ভুবন, আমি এর সঙ্গে কথা বলছি। তুই চেক কর এই তিনজন বাদে চিপায় চাপায়-অন্ধকারে আর কেউ আছে কিনা,' বলেই সে আরো দুই ধাপ এগিয়ে গেল। এক হাতের পিস্তলটা শূন্যে একপাশে তুলে অন্য হাতটা নিয়ে গেল নিজের প্যান্টের পকেটের ভেতরে। হাতে খুঁজে পেতেই জিনিসটা চেপে ধরল বাম হাতে। তারপর হাসিমুখে সেই মেয়েটাকে পিস্তল ধরে রাখা হাতটা অন্যদিকে সরিয়ে বলে উঠল, 'আস্তে আস্তে, একদম সাবধানে। কারো কোনো ক্ষতি হওয়ার দরকার নেই। আমি পিস্তল সরিয়ে নিয়েছি।'

'পিস্তল ফালা বান্দির পুত, মজা এইবার তুই বুঝবি। কিছু করলেই এই বান্দিটারে মাইরা ফালামু। আর না মারতে পারলেও আর এট্টু দেখলেই আমগো ভাইয়েরা সব আইয়া পড়ব। তারপরে তোরে কাবাব বানামু আইজ রাইতে,' বলে সে হেসে উঠল। সঙ্গে তার দুই সঙ্গীও। 'বান্দির পুতে আমারে গুলি করছে। গুলি করছে মাঙ্গিলালে।'

'ঠিক আছে, কোনো দরকার নেই ঝামেলা করার,' পিস্তলের নলটা আরেকটু সরিয়ে দিয়ে গলার স্বর নিচে নামিয়ে জানতে চাইল, 'ভুবন?'

'এক মিনিট,' বলে সে একটু সময় নিয়েই বলে উঠল, 'নেই বস। এরা তিনজনই।'

ভুবনের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শারিয়ার প্যান্টের পকেটে থাকা জিনিসটা মুঠোয় চেপে হাতটা বের করে আনল। সেই সঙ্গে লোকগুলোকে আরেকবার শান্ত থাকতে বলে মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে একবার ইশারা

করেই হাতের বলটার নির্দিষ্ট জায়গাটায় চাপ দিয়েই ওটা ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। ছোট্ট বলটা কীভাবে কাজ করে ঠিক জানেনা শারিয়ার। তাই এক মুহূর্তে সে বুঝতেই পারল না ওটা আদৌ কাজ করছে কিনা। কিন্তু দম বন্ধ করে জিনিসটাকে অবলোকন করতেই দেখল জিনিসটা মাটিতে একটা ড্রপ খেতেই ওটা থেকে হিসহিস করে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে ধোঁয়া। বুঝল কাজ করছে ওটা।

'ভুবন ডানেরটা তোর,' বলেই সে হাঁটু গেড়ে বসে গুলি চালাল বামের লোকটার দিকে। বলটা ছুটে যেতেই কড়া ধোঁয়ায় প্রভাবে খক-খক করে কাশতে শুরু করেছে সামনের লোকগুলো। তাই লোকটাকে কাবু করতে কোনো বেগই পেতে হলো না। শারিয়ারের গুলি লোকটার রানের ওপরে লাগতেই অনেকটা ডিগবাজি দেয়ার মতো করে পড়ে গেল সে। শারিয়ার চোখের কোনে দেখতে পেল ডানের লোকটাও ভুবনের গুলির আঘাতে পড়ে গেল। দুইপাশের দুজনকে কাবু হয়ে যেতেই শারিয়ার মাটিতে এক গড়ান দিয়ে সোজা হলো পিস্তল হাতে। অনেকটাই এগিয়ে গেছে মেয়েটা আর তার মাথার পাশে পিস্তল ধরা লোকটার দিকে।

বন্দিকারী আর বন্দিনী দুজনেই কাশির দমকে বাঁকা হয়ে গেছে তবুও এর ভেতরেই লোকটা চেষ্টা করছে মেয়েটাকে ধরে রাখার। কিন্তু কঠিন হয়ে গেছে ব্যাপারটা তার জন্য। আর সেই সুযোগেই শারিয়ার এগিয়ে গেল দুজনার দিকে। মাটিতে আরেক গড়ান দিয়ে সে সোজা হলো মেয়েটার কাছাকাছি। তারপর মেয়েটার গায়ের কাপড় ধরে তাকে সর্বশক্তিতে টান দিয়ে সরিয়ে দিল একদিকে। মেয়েটা সরে যেতেই লোকটার পিস্তল ধরা হাতটা ধরে ফেলল শারিয়ার। এক হাতে আধবসা থেকে হাতটাকে কনুই বরাবর চাপ দিয়ে সোজা হলো। তারপর সেটাকে বল ড্যান্সের মতো করে ঘুরিয়ে নিয়ে এলো নিজের কাঁধের একপাশে। ফলে লোকটার শরীরটা ঝুঁকে পড়ল ওর ওপরে। লোকটাকে কাঁধের ওপরে তুলে নিয়ে সোজা হলো। তারপর দেহটাকে কুস্তির ভঙ্গিতে আছড়ে ফেলল জাহাজের খোলের উল্টো দিকে যেখান থেকে একটা প্লাটফর্মের মতো নেমে গেছে নিচের দিকে।

লোকটাকে কাঁধের ওপর থেকে সেখানে আছড়ে ফেলতেই আবারও তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সে। হাত থেকে ছুটে গেছে হ্যান্ডগান। লোকটা মাটিতে পড়ে কোনোমতে সোজা হয়ে দাঁড়াল হাঁচড়ে পাঁচড়ে। শারিয়ার নিজের পিস্তলটা খাপে ভরে দুই পা পিছিয়ে এলো তারপর সর্বোচ্চ গতিতে লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল। লোকটার কাছ থেকে দুই পা দূরে থাকতেই শূন্যে উঠে গেল ওর দেহটা। তারপর উড়ন্ত দেহটা ফ্লাইং কিকের ভঙ্গিতে নেমে এলো লোকটার কোমর বরাবর। তীব্র ফ্লাইং কিকের চোটে এক মরণ চিৎকার করে লোকটা হারিয়ে গেল জাহাজের খোলের অন্যপাশে। একটু পরেই ঝপাত করে পানিতে পড়ার শব্দ ভেসে এলো।

শারিয়ার সোজা হয়ে এসে দাঁড়াল খোলের খোলা অংশটার ওখানে। জাহাজের এই অংশটা সমুদ্রের ওপরে। এইদিক দিয়ে খুব সহজেই প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাওয়া যায়। পানির ওপরে খোলা জায়গাটায় এসে বুক ভরে দম নিল সে। গ্যাস বলের প্রভাব থেকে বাঁচতে এতক্ষণ দমবন্ধ করে রাখাতে বুক ফেটে আসছিল। বুক ভরে দম নিয়ে সে ফিরে তাকাল খোলের ভেতরের দিকে। কাকে উদ্ধার করল বুঝতে হবে। মেয়েটা কাশতে কাশতে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল, ভুবন তাকে ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। পকেট থেকে বের করে শারিয়ার রুমাল এগিয়ে দিল তার দিকে।

'আপনি কী ডক্টর শশী?' প্রশ্নটা করে সে ভুবনের দিকে ফিরে মৃদু হাসি দিল। 'আপনাকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের ধন্যবাদ দিতে পারেন আপনি।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা হাত ঘুরিয়ে সপাটে একটা চড় মারল শারিয়ারকে।

অধ্যায় ছত্রিশ

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

দক্ষিণ উপকূলের সমুদ্র

রাতের আকাশ চিরে ভোরের আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে সমুদ্রের পাখিদের আনাগোনা। নিজের ছোটো কামরাটার সামনে থেকে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মেলানো সূর্যের আলোর ঝলকানি বেশ ভালোভাবেই অনুভব করতে পারছে কিরান। সিরাজির বোতলে আরেকবার চুমুক দিয়ে একটানে অনেকখানি ধোঁয়া টেনে নিল সে নিজের ভেতরে। রাতজাগা ক্লান্ত শরীর বিদ্রোহের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু সে খুব ভালোভাবেই জানে বিশ্রামের পথ বেশ সঙ্কুল এখন।

হঠাৎ প্রায় কোনো কারণ ছাড়াই বাবার কথা মনে পড়ল কিরানের। ছোটোবেলায় বাবা মাঝেমধ্যে তাকে কাঁধে নিয়ে হাটে চলে যেত। কখনোকখনো আবার মাছ ধরতে যেত ওকে কাঁধে বসিয়ে নিয়ে। নিজের পালক সন্তানের প্রতি তৈমূর তালেবের এই অতিরিক্ত ভালোবাসা তেমন কেউই ভালোভাবে নিত না। এমনকি ওর বাবার অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে ওর ভাইদের হাতে নিগৃহীতও হতে হতো ওকে এই কারণে। তবে মা সবসময়ই ওকে ভালোবাসতো। বাবা যেমন ওকে বাড়িতে নিয়ে এলো সেদিন থেকে শুরু করে সবসময় মা ওকে ভালোবেসেছে। বাবা আর মায়ের ভালোবাসাই ওর জন্য যথেষ্ট ছিল। যতদিন না ও বড় হয়ে ঘর ছাড়ে।

কিরান যখনই ভাবে, ও যখন বাপের আদেশ অমান্য করে ঘর ছাড়ল কেমন ছিল বাবার অনুভূতি। তার বাপুর মুখের ওপরে কথা বলার মতো সাহস কারো ছিল না। কিন্তু নিশ্চয়ই আড়ালে টিপ্পনি ঠিকই সইতে হয়েছে বাবাকে। কেমন করে সহ্য করত সে নিজের সবচেয়ে আদরের সন্তানের এই বিগ্রহ। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ বন্ধ করে নিজের বাপের চেহারাটা কল্পনা করার চেষ্টা করল কিরান।

পেছনে পায়ের শব্দে চোখ খুলল কিরান। কামরার মাঝামাঝি বিছানাটার শিয়রের কাছে একটা তস্তরি হাতে দাঁড়িয়ে আছে সেই কালো পোশাক পরা পতিত লোকটা। কিরানকে তার দিকে তাকানোর আগেই মুখ নামিয়ে দ্রুত খাবার আর জলের তস্তরিটা নামিয়ে রাখল সে শিয়রের পাশে। ওটাকে নামিয়ে রেখে সোজা না হয়ে বরং মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নামিয়ে রাখল নিচের দিকে। লোকটার

দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল কিরান। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। পতিতদের কথা শুনলেও কখনো সামনাসামনি কাউকে দেখেনি কিরান। ওরা নাকি এমনই করে। কারো দিকে তাকায় না, কারো সামনে খায়না। বলতে গেলে লোকসমাজে বসবাস করেও সবার অন্তরালে জীবন কাটায় ওরা। লোকটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কিরানের মনে হলো, লোকটাকে বলে, এভাবে থাকার দরকার নেই ওর জাহাজে। এখানে সবাই এক একজন পতিত। ও নিজেও একজন পতিত। কিন্তু লোকটাকে কিছু বলার আগেই দরজার কাছ থেকে রহমত চাচার গলা ভেসে এলো।

'কিরান, সবাই জড়ো হয়া গেছে জাহাজের সামনের দিকে,' রহমত চাচার গলা ভেসে এলো কিরানের পেছন থেকে। সঙ্গেসঙ্গে পতিত লোকটা মাথা নিচু করেই অনেকটা ছায়ার মতো বেরিয়ে গেল কামরা থেকে.। ঘুরে দাঁড়িয়ে বোতলটা রহমত চাচার হাতে ধরিয়ে দিয়ে কিরান বিছানার পাশে রাখা চৌপায়ার ওপর থেকে নিজের তরবারিটা তুলে নিল। 'জাহাজ ভিড়ছে? সবাই আসছে, না কারো আসা বাকি?'

'পরায় সবাই আইসা পড়ছে, আয়োজন সাজতাছে,' কিরান তরবারিটা নিয়ে সোজা পাটাতনের দিকে এগোচ্ছে দেখে রহমত চাচা বলে উঠল, 'কিছু খাইয়া যাও।'

খানিকটা এগিয়ে রহমত চাচার কাঁধে একটা হাত রাখল কিরান, 'পরে খাবো চাচা,' বলে সে এগিয়ে যেতে নিয়েও আবার থেমে গেল। রহমত চাচার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল, 'চাচা আইজ বিকালেই মনে অয় কিছু একটা অইয়া যাইবো। তুমি কিন্তুপেছনের জাহাজে চইলা যাইয়ো, এই জাহজটাতে থাইকো না। কারণ এইটাই সবার সামনে থাকব। এই জাহজেই ঝুঁকি সবচায়া বেশি। কাজেই...' বলে সে এগোতে লাগল। পেছন থেকে রহমত চাচা বলে উঠল, 'আমি তুমার সঙ্গেই থাকব। তুমার বাপু অইলে কী অন্য জাহাজে চইলা যাইত?'

দরজা দিয়ে বেরুতে বেরতে কিরান ভাবল পেছন ফিরে কিছু একটা বলবে কিন্তু আনমনে একবার মাথা নেড়ে আর বলল না। কারণ জানে বলে খুব একটা লাভ হবে না। দরজা দিয়ে বের হতেই কাপ্তানের জাহাজ নিয়ন্ত্রণের জায়গাটা ছাড়িয়ে সামনের পাটাতনের ওপরের জমায়েতটা চোখে পড়ল। একটা গোল চৌপায়াকে মাঝখানে রেখে গোল হয়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। কিরানকে কাপ্তানের কামরার বাইরে দেখে সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল। আপনাতেই একবার সবার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল কিরান। পাটাতনের ওপরে নেমে একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে পেল শুধু মাল্লা আর লস্করেরা বাদে তিন জাহাজের প্রায় সবাই জড়ো হয়েছে পাটাতনের ওপরে।

কিরান সামনে এগোতেই সবাই সরে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিল কিরানকে। কিরান সামনে এগিয়ে দেখল, সবার মধ্যিখানে একটা চৌপায়া রাখা হয়েছে। সেটার ওপরে রাখা হয়েছে একাধিক মানচিত্র। দুটো কাপড়ের ওপরে আঁকা আর

একটা মোটা কাগজের ওপরে। কিরান তাকিয়ে দেখল গোমেজ একপাশে দুই হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের দু-চারটা কাটাকুটি বাদ দিলে তার চেহারায় কোনো ব্যথা বেদনার চিহ্নমাত্র নেই। কিরান তার দিকে তাকাতেই একহাতে আরকের বোতল আর অন্যহাতে নিজের গদাটাকে তুলে ওটা নেড়ে বুঝিয়ে দিল সে ভালো আছে। আর সেই সঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দিল, যুদ্ধের ঘোষণায় সে বেশ খুশি। গোমেজ থেকে খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে আছে বিল্লাল শেঠ, বৈঠা আর বেদু।

'তোমরা ঠিক আছ?' গতকাল রাতের সন্দ্বীপের খণ্ডযুদ্ধের পরে কারো খোঁজ নেওয়া হয়নি। তাই এই জিজ্ঞাসা। কিরানের কথার জবাবে তিনজনেই জানাল তারা একদম ভালো আছে।

ওদের থেকে খানিকটা দূরে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুলারামের লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধানরা। তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল কিরান। খানিকটা বিধ্বস্ত দেখালেও সবাই বেশ হাসিমুখেই হাত নেড়ে জানান দিল ওরাও ঠিক আছে। কিরান চৌপায়াটার কাছে এগিয়ে এসে দেখল গোলন্দাজ আর পট্টবর্ধন মানচিত্র নিয়ে আলোচনা করছিল, ওকে দেখে থেমে গেল দুজনেই।

গোলন্দাজ ওর মুখের পাশের পট্টিটা দেখিয়ে জানতে চাইল, 'ওটার কী অবস্থা?' জবাবে কিরান মৃদু হেসে জানল। 'ক্ষতটা আমারে মাইরা ফেলার একটা চেষ্টা করছিল কিন্তু কাজটা সিলভেরা করব জানাইতেই ভয়ে পলাইল,' কিরানের কথা শুনে হেসে উঠল দুজনেই।

কিরান একেবারে কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে একে একে নিজের লোকদের সবাইকে দেখে নিয়ে বলতে শুরু করল, 'আজকে এখানে যারাই উপস্থিত আছ তুমরা সবাই জানো কী কারণে এখানে জড়ো অইছি আমরা। এর আগে আমরা সবাই নানাভাবে হয়রানি আর কষ্টের শিকার অইছি যাগো হাতে আইজ সময় আসছে তাগোরে মোকাবেলা করে ধ্বংস করার। আমি জানি গত কয়েকদিনে আমগো সবার জীবন বদলাইয়া গেছে, সামনে আরো বদলাব। গত কয়দিন ধইরা আমরা সবাই যে কারণে কষ্ট করছি সেইটার মোকাবেলা করার সময় চইলা আসছে। আমগো কাছে পাক্কা খবর আছে তালেব তৈমূর কোনো দিকে গেছে,' ইচ্ছে করেই কিরান বাবা শব্দটা ব্যবহার করল না।

'এখন আমরা জানি সিলভেরা আর তার বাহিনীরে কোনো জায়গাতে পাওয়া যাবে। কাজেই যুদ্ধের সময় চইলা আসছে। আজকে আমরা যেই কারণে লড়াই করব সেইটার প্রভাব পুরা বাংলার মানুষ আর দক্ষিণের উপকূলের মানুষ ভোগ করব। কাজেই আমি চাই সবাই আমরা আমগো সর্বোচ্চ দিয়া যুদ্ধ লড়ব। শত্রু আমগোর চেয়ে অনেক শক্তিশালী, শত্রু আমগো চেয়ে সংখ্যায় বেশি। এমনও সম্ভাবনা আছে আমরা যা অনুমান করতে পারি তার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু

আমগো অস্ত্র আছে, আমগো পরিকল্পনা আছে। আর আমরা পরিকল্পনাটা যদি কামে লাগাইতে পারি তাইলেই চলব। আর সব চেয়ে বড়ো কথা আমগো মনে বল আছে,' কিরান এই পর্যন্ত বলতেই সবাই চিৎকার করে উঠল সমস্বরে।

'আর এই কারণেই আমরা সামনে কীভাবে কী করতে যাইতেছি সেইটা সবার জন্য বোঝাটা খুব জরুরি। আমি পট্টবর্ধনরে অনুরোধ করব সব বলার জন্য। কিরান এই পর্যন্ত বলে পট্টবর্ধনের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নেড়ে তাকে বলার জন্য অনুরোধ জানাল।

'আমি সব বলতেছি। তোমরা মনোযোগ দিয়া শুনবা,' বলে সে চৌপায়ার ওপরে গোল করে রাখা একটা মানচিত্র মেলে ধরল। ইশারা করতেই তার হাতে চিকন একটা লাঠি ধরিয়ে দিল একজন। সেটা দিয়ে মানচিত্রের একজায়গাতে নির্দেশ করে সে বলে উঠল, 'আমরা এখন আছি এইখানে। আর আমরা যা জানতে পারছি তাতে তালেব তৈমূরের জাহাজ আগের দিন রওনা দিছে জংলাটিলার দিকে। ওইটা হইলো এইখানে,' বলে সে মানচিত্রের একটা জায়গা নির্দেশ করল। 'তার জাহাজ ওইদিকে রওনা দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে তার পিছে রওনা দেয় সিলভেরার জাহাজ। আর সিরভেরার জাহাজের থেইকা আমরা অন্তত আট কী দশ ঘণ্টা পিছায়া আছি। কিন্তু এইখানে একটা ব্যাপার আছে,' বলে সে বাকিদের দিকে দেখিয়ে নিজের একটা আঙুল তুলল।

'এই যাত্রপথের মাঝখানে এইখানে একটা মোহনা আছে, যেইখানে তিনদিকের পানি আইসা মিশে। এই জায়গার পানি কিছুতেই ভাটার সময় ছাড়া পার হওয়া যাবে না। আমি যদি যাত্রার সময় আর পরিক্রমা হিসাব করি তবে মোটামুটি অনুমান করা যায় তালেব তৈমূরের জাহাজ ওই সময়ে রওনা দেয় তাতে তারা পূর্ণ জোয়ারের আগেই ওই জায়গাটা পার হইয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু সিলভেরার জাহাজ যেই সময়ে রওনা দিছে তাতে এইটা পরিষ্কার যে, তারা যতই দক্ষ নাবিক হোক, এই জায়গা তারা ভাটা নামার আগে পার হইতে পারে নাই। তারমানে আমরা তাগো থেইকা বড়োজোর কয়েক ঘণ্টা পিছায়া আছি। যদি আমরা এইখান থেইকা পূর্ণবেগে জাহাজ চালাইতে পারি বাতাসের গতি আর দাড়িগর লগে তাল মিলায়া তবে তারা জংলাটিলা পৌছানোর কিছুটা সময়ে পরে কিংবা কাছাকাছি সময়েই আমরা পৌছাইতে পারব।'

'কিন্তু ওই মোহনা আমরা পার হবো কেমনে?' গোলন্দাজ জানতে চাইল।

'এখন ভোরের সময়, যদি আমরা তড়িৎ গতিতে জাহাজ ছাড়ি তয় জোয়ারের অনেক আগেই ওই জায়গা পর হয়া যাইতে পারব,' পট্টবর্ধন কথাটা বলেই সবার দিকে একবার দেখে নিয়ে আবারও বলে উঠল, 'মোট কথা আমার হিসাবে সিলভেরার বাহিনী আর আমরা আগে পরে কাছাকাছি সময়ে ওইখানে পৌঁছাইতে

পারব। এখন ওইখানে পৌঁছানোর পরে কী করতে অইবে ওইটা কিরান বোঝাবে,' বলে সে কিরানের দিকে নিজের হাতের লাঠিটা এগিয়ে দিল।

পট্টবর্ধনকে ধন্যবাদ জানিয়ে কিরান হাতের লাঠিটাকে মানচিত্রের একদিকে ঠেকাল। 'সবাই মনোযোগ দিয়া শুনবা আমার কথা। আজকে যেই অভিযান আমি চালাইতে যাইতেছি তাতে সবার প্রথমে আমগো উদ্দেশ্য তালেব তৈমূররে সহায়তা করা। মানে তারে বাঁচানো এবং তার সঙ্গের সম্পদ উদ্ধার করা,' সম্পদের কথা সবার সামনে এই প্রথম উচ্চারণ করল কিরান। 'আর সেইটা করতে অইলে আমগো প্রধান শত্রু সিলভেরা আর তার বাহিনীরে শেষ করতে হবে। দ্বিতীয় কোনো পথ নাই। সিলভেরার কথা সবাই জানো। তার বাহিনীর কথাও জানো। খুব জোর সম্ভাবনা আছে তার লগে আরাকানের মগরাও থাকতে পারে। না পারলেও যোগ দিতে পারে। কাজেই এই বাহিনী আরো সাংঘাতিক হবে। কিন্তু এইটা আমগো অস্তিত্বের লড়াই আর আমরা যা বুঝতে পারি তাইলো জংলাটিলায় যাইতে যাইতে প্রথমেই আমগো সিলভেরার বাহিনীর লগেই লড়তে হবে। কাজেই আমি যা বলি সবাই সেইটা বোঝার চেষ্টা করবা,' বলে সে একবার গোলন্দাজ আর পট্টবর্ধনের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। গত কয়েক ঘণ্টায় তারা তিনজন আর তুলারাম মিলে এই পরিকল্পনা ঠিক করেছে।

'এইটা হইলো জংলাটিলা,' বলে সে সামনে বসানো ম্যাপটা দেখাল। 'সবার দেখার দরকার নাই, স্রেফ বুঝো। জংলাটিলা জায়গাটাতে আগে যারা যাও নাই তাদের বলতেসি জংলাটিলা অইলো পানির ওপরে ছোটো ছোটো দ্বীপ আর টিলার সমন্বয়। বেশিরভাগ জায়গাতেই পানি থাইক্কা সরাসরি টিলা উইঠা গেছে ওপরের দিকে। এরই মধ্যে ছোটো ছোটো গ্রাম আছে কিছু আর পুরান একটা পরিত্যক্ত দুর্গ আছে পাহাড়ের ওপরে। একসময় ওইখানে একটা বন্দর থাকলেও এখন সেইটা পরিত্যক্ত। এর পেছনে কারণ অইলো জায়গাটা অতি দুর্গম আর ওই এলাকাতে জলদস্যুগর উৎপাতের সীমা নাই,' কিরান এই পর্যন্ত বলতেই আবারও কথা বলে উঠল পট্টবর্ধন।

'তালেব তৈমূর সন্দ্বীপ থেইক্কা ওইখানে যাওয়ার কারণ কী এইটাও বোঝাটা খুব একটা অসুবিধার না। কারণ ঘোলা পানি, টিলাটক্কর আর জঙ্গলে ঘেরা জায়গাটা পলানির লাইগা একেবারে ঠিক। তার মতো মানুষের জন্য সিলভেরার হাত থেইকা বাঁচতে অইলে ওই এলাকা একটা ভালো সুযোগ।'

'আর এই সুযোগ আমগো যেমন আছে তেমনি আছে সিলভেরার লাইগাও। এইটা মনে রাখো সবাই,' বলে সে আবারও সবার দিকে দেখে নিল। 'আমগো হিসাব মতে আমরা যখনই অইখানে পৌঁছাবো আমগো লগে প্রথমেই মোলাকাত হবে সিলভেরার বাহিনীর। কাজেই সেই অনুযায়ীই আমরা পরিকল্পনা ঠিক করছি।

এই দেখো,' বলে সে মানচিত্রে নির্দেশ করল। 'জংলাটিলায় ছোটো-বড়ো মিলায়া মোট ষোলটা টিলা আছে। এর মধ্যে সব চেয়ে বড়ো অইলো চাইরটা। এইটা অইলো জংলাটিলা এলাকার মূল প্রবেশপথ। যে কাউরে জাহাজ নিয়া ঢুকতে অইলে এইখান দিয়াই ঢুকতে হবে অই এলাকায়। কাজেই সিলাভেরাও তাই করব। আমরা যখন জংলাটিলার কাছে পৌঁছাব তখন ওরা মাত্র ভেতরে ঢুকব, কী ঢুকব এইরকম অবস্থায় থাকবে।'

কিরান একটু থেমে আবারও বলতে শুরু করল। 'আমগো কাছে জাহাজ আছে তিনটা। আমরা মূল প্রবেশপথে একসঙ্গে তিনটা জাহাজ নিয়াই ঢুকব। এরপরে কিছুটা ঢুইকা এই জাহাজটা, মানে সবচেয়ে বড়ো জাহাজাটা সরাসরি পিছু নেবে সিলভেরার জাহাজের আর আমগো বাকি দুইটা তুলনামূলক ছোটো জাহাজ মূল প্রবেশপথ দিয় ঢুইকা দুইদিকে ছড়ায়া পড়ব। যদি আমরা সিলভেরার জাহাজরে পরিত্যক্ত বন্দরের কাছে ধরতে পারি তবে আমগো দুইদিকে ছড়ানি দুইটা জাহাজ দুই দিক থেইকা আক্রমণ চালাব। আর এইটা দিয়া আমরা তিনমুখী আক্রমণ চালাব ওগো জাহাজের ওপরে। যদি বন্দর এলাকার কাছে ওগো জাহাজগুলারে আমরা আটকাইতে পারি প্রথম আক্রমণ চলব কামানের। তারপর কামানের আয়ত্তের চেয়ে ভেতরে চইলা আসলে দ্বিতীয়ভাগে চলব বন্দুক বাহিনীর আক্রমণ এরপর ওরা একেবারে কাছে চইলা আসলে সরাসরি লড়াই। এইখান পর্যন্ত এই অইলো আমগো পরিকল্পনা,' এইটুক বলে কিরান দম নিয়ে সবাইকে দেখল একে একে। তিন জাহাজ মিলিয়ে মাল্লারা বাদেই প্রায় ষাটজনে মতো লোক আছে ওর অধীনে।

'ওই সমুদ্রে,' বলে সে একটা হাত তুলে দেখাল খোলা সমুদ্রের দিকে। 'আমগো পরিবার, সমাজ, মাটি আর পানির কিসমত লিখবে কিছু ফিরিঙ্গি দস্যু এইটা আর অইবে না। আমগো মানুষ মারা পড়ব দস্যুগর হাতে এই মাটির সম্পদ সব লুইটা নিব ওরা আর সেইটা অইবে না। আইজ কিসমত লিখবে আমরা,' কিরান এটুকু বলতেই সবাই চিৎকার করে উঠল। 'আইজ আমরা নিজেগর কিসমত নিজেরা লিখব,' চিৎকার করে বলে উঠল কিরান। 'বিদেশি দস্যুগর রক্ত দিয়া লিখব আমরা আমগো কিসমত।'

সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল। বুকের কাছটায় নিজের বাবার দেওয়া লটেকটটা চেপে ধরে ধরে কিরান বিড়বিড় করে বলে উঠল, বুকের বলই সবচেয়ে বড়ো বল। সে জানে একবার তীব্র স্রোতের সেই মোহনা পার হয়ে জংলাটিলা এলাকায় প্রবেশ করা মাত্রই শুরু হয়ে যাবে আসল যুদ্ধ।

***

মাথার ওপরে উত্তপ্ত সূর্য দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে চলেছে। আর সেই আলোতে পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের মতোই মানুষটার দিকে অত্যন্ত ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। বেশ অনেকদিনই হলো সে মানুষটার ফুট-ফরমায়েশ খাটে। স্থানীয় ভাষায় যাকে বলা হয় লস্কর। সে লোকমুখে শুনেছে এই মানুষটার ফুট-ফরমায়েশ যারা খেটেছে তাদের ভেতরে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে টিকে আছে সেই। আরো অনেক ছোটো থাকতে নাকি খোদ কাপ্তেন নিজে তাকে হুগলীর বাজার থেকে কিনে এনেছিল। প্রথমে বাবুর্চির সঙ্গে কাজ করলেও পরে কাপ্তেনের নিজের কামরার পাশেই স্থান হয় তার। সেখানেই থেকে সর্বক্ষণ, কাপ্তেনকে মদের বোতল দিয়ে আসা, তার তামুক সজিয়ে দেয়া, তামুকে আগুন দেওয়া থেকে কামরা পরিষ্কার পর্যন্ত সবই করে সে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো মানুষটা জাহাজের সবার ওপরে চূড়ান্ত খবরদারি করলেও কখনোই তাকে, এমনকি ধমক পর্যন্ত দেয় না। এমনকি তার সঙ্গে খুব বেশি কথাও বলে না। কিন্তু কেন জানি মানুষটাকে যমের চেয়েও বেশি ভয় করে সে।

পাহাড়ি টিলার একেবারে চূড়ায় দাঁড়িয়ে একটা বাবলা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে মানুষটা এই মুহূর্তে তাকিয়ে আছে দূর সমুদ্রে। তার থেকে বেশ খানিকটা পেছনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। সামান্য চোখ তুলে সে দেখল মানুষটার পেছনের অবয়বটা। মানুষটাকে নিয়ে অনেক অনেক কথা প্রচলিত সমগ্র দক্ষিণ উপকূল থেকে শুরু করে একেবারে বোম্বে-গোয়া পর্যন্ত। তার মাথার চারপাশে নাকি সর্বক্ষণ আগুন জ্বলে আর ধোঁয়া ওড়ে, জাহাজ লুট করার সময়ে তার ওপরে নাকি খোদ শয়তান ভর করে, এক কোপে নাকি সে দশজনের মাথা নামিয়ে দিতে পারে, ছোটো শিশুদের গলা কেটে সে নাকি রক্ত পান করে, মাঝেমধ্যে নাকি পূর্ণিমার রাতে সে দানোতে পরিণত হয়। এমনকি তার একটা বাঁকানো বিরাট তরবারি আছে। সেটা থেকেও নাকি অগ্নিবর্ষণ করতে পারে সে। ওটা নাকি সময়ে সময়ে তিনমুখী সাপের মতো ছোবল মারতে পারে শত্রুর ওপরে।

এসব নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি সে। কারণ জানে এই মানুষটার সঙ্গে বাঁচতে হলে মুখ বন্ধ রাখতে হবে। তবে এই মুহূর্তে মানুষটার পেছনের দিকে তাকিয়ে সে অনুধাবন করতে পারল কেন এই লোকটাকে নিয়ে এত এত কথা প্রচলিত। মানুষটা আক্ষরিক অর্থেই পাহাড়ের মতো, দেড় মানুষ সমান উঁচু আর কমপক্ষে তিন মানুষ সমান চওড়া। এমনকি তার সাদা চামড়ার সাথিরাও কেউই তার মতো নয়। সত্যিকার অর্থেই তার মুখের চারপাশে উড়ছে ধোঁয়া, একহাতে আরকের বোতল আর অন্য হাতে দূরবীক্ষণ নিয়ে সে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মুখে ফুটে উঠল সামান্য হাসি।

নিজের বিশাল বপু নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দূরবীক্ষণটা ধরিয়ে দিল সে ছেলেটার হাতে। তারপর তার সঙ্গীদের ভেতরে আরাকান থেকে আসা মগ জলদস্যুদের নেতা পঞ্চনামার দিকে ফিরে পর্তুগিজ ভাষায় যা বলে উঠল সেটার বাংলা করলে অনেকটা এমন দাঁড়ায়, ইঁদুরকে তার ফাঁদের ভেতর নিয়ে আসার সময় হয়ে গেছে।

অ্যালবার্তো দ্য সিলভেরা গল গল করে বেরুতে থাকা ধোঁয়ায় ভরপুর বাঁকানো তামাকের পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে ফেলতেই আরকের প্রভাবে গনগনে আগুনের মতো জ্বলতে থাকা তার টকটকে লাল চোখজোড়া আর লম্বা দাড়ি ভর্তি চেহারার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল মগদের নেতা। দুজনেই সমস্বরে হেসে উঠল একে অপরের দিকে তাকিয়ে।

ছেলেটা মাথা তুলে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল তিনটে জাহাজ সারি দিয়ে এগিয়ে আসছে জংলাটিলার দিকে।

অধ্যায় সাঁইত্রিশ
বর্তমান সময়
ডকইয়ার্ড এলাকা, চট্টগ্রাম

টমি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। একদিকে সে পুরো ডকইয়ার্ড এলাকাটার সারভেইলেন্স চেক করছে, অন্যদিকে আবার নির্দেশনা দিচ্ছে সেই লোকটাকে-যে ড্রোনটাকে রিমোটের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর ঠিক তার পেছন থেকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে চায়নিজ চেহারার সেই লোকটা। মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে সে বেশ আগ্রহের সঙ্গে কথা বলে উঠল, 'বাহ জিনিসটা তো ভালো,' বলে সে পেছন থেকে টমির পিঠ চাপড়ে দিল। 'আমি বহু অপারেশনে বহু ধরনের টেক ব্যবহার করেছি কিন্তু এরকম জিনিস কখনো ব্যবহার করিনি,' বলে সে নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে হেসে উঠল। 'কী করছে ওরা?' বলে সে ল্যাপটপের স্ক্রিনের ভেতর দিয়ে দেতে পেল শারিয়ার আর ভুবন জাহাজে খোলের খোলা অংশ দিয়ে ভেতরের দিকে ঢুকে গেল।

'এরা এখন ডক্টরকে ঠিকঠাক উদ্ধার করতে পারলেই হয়,' বলে সে নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'গেট রেডি বয়েজ,' বলেই সে সুমনকে দেখিয়ে বলে উঠল গাড়ি রেডি করো,' নির্দেশনা দেওয়া শেষ করে সে আবারও স্ক্রিনের দিকে ফিরে তাকাতেই টমিকে স্ক্রিনের একটা নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে বলে উঠল, 'এগুলো কী?' বলেই সে নিজের মাথাটাকে এগিয়ে এনে ভালোভাবে দেখে বলে উঠল, 'সর্বনাশ। এত মানুষ কোত্থেকে এলো,' বলেই সে একহাতে নিজের মাথার চুল টেনে ধরে আফসোসের সঙ্গে বলে উঠল, 'এরা এখন বেরোলেই তো ধরা খাবে। তার চেয়ে বড়ো প্রশ্ন এরা ভেতর থেকে বের হলেও এতটা দূরত্ব পার হবে কীভাবে?' জাহাজের খোল থেকে শুরু করে ডকইয়ার্ডের গেট পর্যন্ত মাইলখানেকের মতো দূরত্ব দেখিয়ে সে তার কথার শেষ অংশটুকু উচ্চারণ করেছে টমিকে উদ্দেশ্য করে।

টমি কিছু না বলে স্ক্রিন থেকে মাথা তুলে ডানে-বামে নাড়ল। এই ভঙ্গির একটাই অর্থ, এই প্রশ্নের জবাব জানা নেই তার।

***

নিজের গালটাকে এক হাতে চেপে ধরে হতভম্ব ভঙ্গিতে একবার ভুবনকে দেখল শারিয়ার। আনমনেই একবার কাঁধ ঝাঁকাল ভুবন, তারপর সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'এভাবে ধন্যবাদ জানানোর রীতি কোনো দেশে আছে বলে আমার জানা নেই।'

'ধন্যবাদ জানাইনি, চড়ই মেরেছি,' বলে রীতিমতো ঝামটে উঠল মেয়েটা শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে। এখনো সে শারিয়ারের দেওয়া রুমালটা দিয়ে মুখ মুছছে। এই প্রথমবারের মতো মেয়েটাকে ভালোভাবে খেয়াল করল শারিয়ার। লম্বা-পাতলা একজন মানুষ, পায়ে কেডস জুতো, জিন্স প্যান্ট আর গায়ে একটা ঢিলা সোয়েটার। চুল থেকে শুরু করে মুখ সোয়েটার থেকে শুরু করে জুতো কোনো কিছুই আর দেখার যোগ্য নেই। গত কয়েকদিন মানুষটার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়-ঝাপটা টের পাওয়া যায় পোশাক দেখলে। কিন্তু সব ছাপিয়ে চোখে পড়ে মানুষটার বড়ো বড়ো বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জোড়া।

'এই মিস্টার, আপনি কী পুলিশ?' মেয়েটা আবারও ঝামটে উঠেই শারিয়ারের দিক থেকে মুখ সরিয়ে ভুবনের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল। 'আপনারা কী পুলিশ? পুলিশ এভাবে ঝুঁকি নেয়! আপনার বন্ধু আরেকটু হলেই তো আমার প্রাণটা খোয়াচ্ছিলো। পাগল শালা!'

'আপনি ডক্টর শশী?' এবার ভুবন জানতে চাইল। আগে থেকেই সে নিজের ডান হাত গালে দিয়ে রেখেছে সতর্কতাস্বরূপ।

'আবশ্যই আমি শশী। আপনারা?' কথাটা চোখ সরু করে বলেই বলে সে তাকিয়ে রইল ভুবনের দিকে। কিন্তু ভুবন উত্তর দেওয়ার আগেই ইয়ার ফোনের ভেতর থেকে ভেসে এলো টমির কণ্ঠস্বর। 'বস ভেতরের কী অবস্থা? ডক্টর শশীকে পেয়েছো?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি আমরা বেরুবো...'

'বস, ভয়াবহ বিপদ। বাইরে রীতিমতো রায়ট শুরু হয়ে গেছে। একদল লোক জড়ো হয়েছে জাহাজের খোলের কাছে। অন্তত বিশ-পঁচিশজন তো হবেই। বস বস...'

'এই মেয়ে,' বলে চট করে ডক্টর শশীর এক হাতের কনুই ধরে ফেলল সে। ডক্টর শশী চট করে শারিয়ারের দিকে ফিরে তাকাল রাগত ভঙ্গিতে কিন্তু শারিয়ারের মুখের ভঙ্গি দেখেই সে বুঝতে পারল সিরিয়াস কোনো ব্যাপার ঘটতে চলেছে।

মাথা ওপর নিচ করে সে বলে উঠল, 'পারব।'

'ভুবন তুই তো শুনেছিস,' বলেই সে মেয়েটার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'একদল লোক জড়ো হয়েছে বাইরে। এদেরকে মেরে কেটে বেরুতে হবে আমাদের। এরপরে আরো মাইলখানেক দৌড়াতে হবে। তাহলে এখান থেকে মুক্তি পেতেও পারি, নাও পারি। বোঝা গেছে?'

'আপনারা কী পুলিশের লোক না?' বলে সে সন্দেহের দৃষ্টিতে ওদের দুজনকে দেখল। 'আপনাদের ফোর্স কোথায়?'

শারিয়ার নিজের পিস্তল থেকে সাইলেন্সারটা খুলে সেটাকে রেখে দিল পকেটে। তারপর পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রেখে প্যান্টের পকেট থেকে বের করে আনল দুটো স্মোক বল, আর মাটি থেকে সে তুলে নিল বড়ো একটা লোহার পাইপ। 'ভুবন, ভালো করে শোন, আমি কী বলি,' বলেই সে নিজের পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলল ওদেরকে। পরিকল্পনা শেষ করে সে যোগ করলো, 'যে পর্যন্ত আমরা ফাঁকা না পাব সামনে থাকব আমি তুই পেছনে থাকবি আর ডক্টর শশীকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব তোর। বুঝেছিস?' বলেই সে ডক্টর শশীর দিকে ফিরে বলে উঠল, 'ডক্টর সাহেবা, আমরা পুলিশের লোক কিন্তু এই অপারেশন আন-অথরাইজড। অথরাইজড অপারেশন চালাতে গেলে আপনাকে আজ রাতে আর উদ্ধার করতে হতো না। কাজেই বাঁচতে হলে এখন আমি যা বলি মন দিয়ে শুনুন,' সে নিজের পরিকল্পনায় শশীর করণীয় জানিয়ে দিল।

শারিয়ারের পরিকল্পনা শুনে আবারও ঝামটে উঠল মেয়েটা। 'আমি এরকম বস্তার মতো থাকব না আপনাদের সঙ্গে,' বলে সেও আশেপাশে দেখে নিয়ে একটা লম্বা লাটির মতো কাঠের টুকরো তুলে নিল। 'যদিও আমি দুর্বল কিন্তু আমিও হেল্প করতে পারব,' বলে সে কাঠের টুকরোটা সামনে বাগিয়ে ধরে সামনের দিকে দেখাল। শারিয়ার ভুবনের দিকে একবার দেখে নিয়ে ইশারা করল সামনে এগোনোর।

জাহাজের খোলের বাইরে অন্তত পনেরো থেকে বিশজন জড়ো হয়েছে তাদের সামনে আছে একজন নেতা। যারা জড়ো হয়েছে তারা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে যাদেরকে ধরে আনার জন্য তাদের এই গভীর রাতের বেলা ডেকে আনা হয়েছে তারা বেরুলেই হয় একবার। উত্তেজিত লোকগুলো হট্টগোল করছে। হঠাৎ চারটে গোল বলের মতো জিনিস উড়ে এসে পড়ল মাটিতে। সঙ্গেসঙ্গে সেগুলো থেকে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করল। জিনিসগুলো কী বুঝতে না পারলেও ওগুলো থেকে বেরিয়ে আসা গলগলে ধোঁয়ায় কেশে উঠল প্রায় সবাই। অনেকের মুখের ভেতরেও ঢুকে গেছে ধোঁয়া।

লোকগুলো কাশতে কাশতে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে শারিয়ার আর ভুবন দৌড়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। বেরিয়েই প্রথমে লোকগুলোর মাথার ওপর দিয়ে ফাঁকা গুলি করল অন্তত তিন-চার রাউন্ড। একদিকে ঝাঁঝালো ধোঁয়া, এরপরে আবার প্রকম্পিত গুলির শব্দে লোকগুলো তো বটেই পুরো ইয়ার্ডের একাংশ কেঁপে উঠল। অনেকে ভয়ের চোটে বসেই পড়ল মাটিতে।

লোকগুলোকে প্রথম ধাক্কায় প্রকম্পিত করে দিয়ে একেবারে অন্ধের মতো সামনে লোহার পাইপ আর লাঠি চালাল শারিয়ার আর ভুবন। আতঙ্কিত লোকগুলোর ভেতরে যাদের মোটামুটি সাহস বা ইচ্ছা অবিশিষ্ট ছিল তারা রনে ভঙ্গ দিয়েছে দেখেই শারিয়ার চিৎকার করে দৌড়ানোর নির্দেশনা দিল। তিনজনেই জান ছেড়ে দৌড়াতে শুরু করল সামনের দিকে।

ওদেরকে ধরতে আসা লোকগুলো ঝাঁঝালো ধোঁয়ার প্রভাবে আর গুলির শব্দ শুনে এতটাই হতবাক হয়েছে আর চমকে উঠেছে যে, ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই শারিয়াররা এগিয়ে গেল অনেকটা সামনে। আর এটাই ছিল ওর পরিকল্পনা। লোকগুলোকে চমকে দিয়ে সরে পড়া। কারণ এছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না তাদের সামনে ঠিক একারণেই লোকগুলোকে প্রথম ধাক্কাটা দিয়ে তিনজনে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল। কারণ শারিয়ার এটাও জানে এদেরকে খুব বেশি সময় বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না। যেই মুহূর্তে ওরা অনুধাবন করবে মাত্র তিনজন মানুষ ওদেরকে বোকা বানিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করছে সেই মুহূর্তে মানুষগুলো হিংস্র হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে একদিকে লোকগুলোর হাত ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন বেড়ে যাবে অন্যদিকে অযথা রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। আর শারিয়ার এটা ভালো করেই জানে যে, এই লোকগুলোর সঙ্গে ওদের কোনো শত্রুতা নেই। এরা হয় ভাড়াটে গুণ্ডা, আর না হয় খেটে খাওয়া সাধারণ শ্রমিক, হয়তো দুটো টাকার লোভে ইউনিয়ন লিডারদের সাহায্য করছে। কাজেই এদের কাউকে মারতে গেলে একদিকে ওর হাত কাঁপবে তার ওপরে আবার ওরা এখানে এসেছে একটা আনঅথরাইজড অপারেশন চালাতে। কাজেই লোকগুলোকে চমকে দিয়ে যতটা সম্ভব এখান থেকে এগিয়ে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

'জলদি জলদি,' বলে চিৎকার করেই শারিয়ার নিজের দৌড়ের গতি আরো বাড়িয়ে দিল। সামনে বাগিয়ে ধরল লোহার পাইপটা। সামনে এক দুজন পড়তেই হয় পাইপ চালাল আর না হয় কাঁধের ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিয়ে অনেকটা রাগবি খেলোয়াররা বল নিয়ে যেভাবে সামনে এগোয় সেভাবে এগোতে লাগল। আর তার ঠিক পেছনেই ডক্টর শশী, আর শশীর পেছনে ভুবন। পাইপের আঘাতে আর কাঁধের ধাক্কায় লোকগুলোকে ঠেলেঠুলে সরিয়ে পথ করে ওরা বেরিয়ে এলো খোলা জায়গাতে। মূর্হূতের জন্য কোনদিকে এগোবে বুঝতে না পেরে থেমে গেল

শারিয়ার। কারণ আধো অন্ধকারের গলি ঘুপচিকে ওর কাছে সবই একই রকম মনে হচ্ছে। কোনোদিক দিয়ে ঢুকেছিল বুঝতে পারছে না। ওর ঠিক পেছনেই এসে বাড়ি খেল শশী। হাপড়ের মতে হাপাচ্ছে মেয়েটা।

'বস, তুমি আরেকটু এগিয়ে বামে মোড় নিয়ে শখানেক গজ এগিয়ে ডানে ঘুরলেই রাস্তা দেখতে পাবে। সেখান থেকে বাম দিয়ে মেইন গেট সাত শ গজের মতো দূরত্বে, জলদি দৌড়াও,' কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল টমি। সঙ্গেসঙ্গে তার নির্দেশিত দিকে হাত তুলে দেখিয়ে দৌড়াতে শুরু করল শারিয়ার। 'ওদিকে।'

শারিয়ার দৌড়াতে শুরু করেছে। তার পেছনে পেছনে হাঁপাতে হাঁপাতে এগোতে লাগল শশী, শশীর পেছনে ভুবন। আরেকটু এগিয়ে শারিয়ার বামে মোড় নিয়ে শখানেক গজ এগিয়ে ডানে মোড় নিল। ভুবন দেখল শারিয়ার এগিয়ে যাচ্ছে আর শশীর গতি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, সে শশীর একটা হাত ধরে তাকে রীতিমতো টেনে নিয়ে চলল সামনের দিকে। 'আমার সঙ্গেসঙ্গে আসুন,' বলে সে যতটা জোরে পারে দৌড়তে লাগল হাত থেকে ফেলে দিল কাঠের লাঠিটা।

শারিয়ার ডানে মোড় নিয়ে সামনে এগোতেই প্রায় হোঁচট খেতে খেতে পাকা রাস্তার ওপরে এসে উঠল। হাঁটুতে ভর দিয়ে পেছন ফিরে দেখল শশীকে টেনে নিয়ে আসছে ভুবন কিন্তু দুজনারই গতি কম। 'জলদি জলদি আয়।' বলে সে সোজা হলো, আর সঙ্গেসঙ্গে পুরো কম্পাউন্ডের এক অংশ আলোকিত হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ স্বরে বেজে উঠল সাইরেন। শারিয়ার ডানে-বামে তাকিয়ে ভুবন আর শশীকে মেইন গেটের দিকে দৌড়াতে নির্দেশ করে এবার সে নিজেও হাত থেকে ফেলে দিল পাইপটা। এখন প্রাণ নিয়ে দৌড়াতে হবে। পুরো কম্পাউন্ডে খবর পৌছে গেছে। অন্যদিকে পেছন থেকে ভেসে আসছে লোকজনের হইচই।

'বস তোমাদের পেছনে লোক লেগেছে আর পুরো কম্পাউন্ডে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। জলদি দৌড়াও আর না হলে বেরুতে পারবে না।'

'টমি টমি, সুমনকে বল এই মুহূর্তে মাইক্রোটাকে নিয়ে গেটের কাছে চলে আসতে। আমরা যেভাবে পারি ওদেরকে নিয়ে একবার গেটের বাইরে এলেই যাতে গাড়িতে উঠতে পারি,' বলেই সে ফিরে তাকালভুবন আর শশীর দিকে। টমি কী বলে শোনার সময় নেই। ভুবন প্রায় স্বাভাবিক আছে, শশী বসে পড়েছে মটিতে। সে সামনে ঘরঘর শব্দ শুনে দেখতে পেল মেইন গেটটা খুলতে শুরু করেছে। ওটার সামনে একটা লড়ি দাঁড়িয়ে আছে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। এই শেষ সুযোগ।

'ভুবন, গেটটা দেখিয়ে সে চিৎকার করে উঠল দৌড়ানোর জন্য কিন্তু শশী হাত নেড়ে দৌড়াতে অস্বীকৃতি জানাল, আর পারছে না সে। অসহায়ভাবে একবার ভুবনের দিকে তাকাতেই হাতের পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ভুবন এগিয়ে গেল শশীর

দিকে। একটানে শশীর হালকা পাতলা শরীরটা কাঁধে তুলে নিয়ে শারিয়ারকে বলল সামনের দিকে এগোতে। শারিয়ার প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করল গেটের দিকে। যদিও কাঁধে আস্ত একটা মানুষের ভারী বোঝা কিন্তু ভুবনও ওর সঙ্গে তাল রেখে প্রায় একই গতিতে দৌড়াচ্ছে। গেট আর কয়েকশ গজ দূরে। লরিটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে গেট দিয়ে। একবার ওটা বেরিয়ে গেলেই গেটটা বন্ধ হয়ে যাবে আর বেরুতে হবে না তাহলে। চারপাশ থেকে লোকজনের হট্টগোল ভেসে আসছে, সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ স্বরে বাজছে সাইরেন। সেই সঙ্গে গেটের চেকপোস্ট থেকে গার্ডরা চিৎকার করে থামতে বলছে ওদের। কোনো দিকে মনোযোগ না দিয়ে স্রেফ দৌড়াতে লাগল শারিয়ার। তার ঠিক পেছনেই ভূবন। গেটের কাছাকাছি পৌঁছাতেই দেখল লরিটা অদৃশ্য হয়েছে গেটের অন্যপাশে। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গেটটা।

গেটের গার্ডরা হাতের ইশারায় থামতে বলছে ওদের। এখনো অস্ত্র হাত দেয়নি কেউ। 'টমি গাড়ি এসেছে?' দৌড়াতে দৌড়োতেই সে বের করে এনেছে নিজের কিং কোবরা।

'জি বস আমি গেটের একেবারে কাছেই,' এবার জবাব দিল সুমন।

কারো কথার কোনো জবাব না দিয়ে গেটের গার্ডদের মাথার ওপর কিং কোবরা দিয়ে কয়েক রাউন্ড ফায়ার করল শারিয়ার। গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠল পুরো ডক। অস্ত্রে হাত না দিয়ে বরং মাটিতে শুয়ে পড়ল এক গার্ড, অন্য গার্ড অস্ত্র তুললেও গুলি করবে না করবে না সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া গেটের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো ওরা।

গেট থেকে বেরিয়েই মাইক্রোটা দেখতে পেল শখানেক গজ দূরেই। শশীকে নামাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ে গেল ভুবন। সঙ্গে শশীও। আর ওদের পাশে বসে পড়ল শারিয়ার। গেট থেকে কিছুটা এগিয়ে এসেছে ওরা। এখানো লোকজনের হই হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। ওদের মাটিতে পড়ে যেতে দেখে সুমন একটানে ওদের কাছে নিয়ে এলো মাইক্রোটা। ওটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে হাতের ইশারায় চিৎকার করে একটানে খুলে ফেলল গাড়ির দরজা। শারিয়ার নিজে উঠে বসেই টেনে নিল শশীকে। তারপর ওটার দরজায় পা রাখতেই গাড়ি ফুল গিয়ারে দিয়ে টান দিল সুমন।

ওটাকে একটানে ঘুরিয়ে নিয়ে এগোতে লাগল সামনের দিকে।

তিনজনই মরার মতো সিটে হেলান দিয়ে দম নিচ্ছে। ভুবন শুধু দুবার হাত নাড়লেও কথা বলতে পারল না। নিজেও হাত নেড়ে প্রায় অট্টহাসি হেসে উঠল শারিয়ার। কিন্তু কোনো কথা বলল না।

সামনের সিট থেকে সুমন জানতে চাইল, 'বস, ঠিক আছেন আপনারা? স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশি গতিতেই গাড়ি চালাচ্ছে সে।

শারিয়ার হাত নেড়ে বোঝাল সে ঠিক আছে। কিন্তু কথা বলতে পারল না। বাকি দুজনকে অবাক করে দিয়ে কথা বলে উঠল ডক্টর শশী। ভুবনের কাঁধে হালকা একটা চাপড় দিয়ে সে বলে উঠল, 'তুমি কে হে বালক?' এখনো সমানে হাঁপাচ্ছে সে। কিন্তু গলায় সেই আগের মতোই ঝাঁঝ। 'মানুষ না অন্য কিছু?' বলে শারিয়ারের দিকে দেখাল। 'তোমার এই বন্ধু মানুষ না আর কিছু। আমার মতো আস্ত একটা মানুষ কাঁধে নিয়ে কী দৌড়টাই না দিল। তুমি না থাকলে বাপু আজ আর ছুটতে হতো না আমার,' বলে আবারও ভুবনের কাঁধে জোরে একটা চাপড় মেরে সে হেলান দিল সিটে। ভুবন ইশারায় শারিয়ারকে দেখাল, তার নিজের মাথার পাশে একটা তর্জনী রেখে ঘুরিয়ে বোঝাল এই মেয়ের মাথায় সমস্যা আছে। আর তার কথাটাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য চোখ বন্ধ অবস্থাতেই মেয়েটা বলে উঠল। 'ব্যাপক ক্ষুধা লাগছে আমার।' ভুবন আবারও একই ইশারা করে উঠল।

'টমি কোথায় সুমন?' খানিকটা ধাতস্থ হয়ে প্রশ্ন করল শারিয়ার। এই প্রথম সে খেয়াল করল টমি নেই গাড়িতে। কিন্তু কোনো জবাব দিল না সুমন। ইয়ার পিসের ভেতর থেকেও কোনো শব্দ নেই আবারও জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবছে শারিয়ার পৌনে এক মাইলের মতো রাস্তা পেরিয়ে সে মোড়ের ঠিক আগেই একটা জংলা মতো জায়গায় ডানে মোড় নিয়ে ঢুকে পড়ল সুমন। গাড়ি থামিয়ে দিল সে।

শারিয়ারের কাছে একটু অবাক লাগছে। সে আবারও জানতে চাইল, 'টমি কী এখানে নাকি?' হাতের ইশারায় ভুবনকে থামতে বলবে তার আগেই সে একটানে খুলে ফেলল মাইক্রোর দরজা। সঙ্গেসঙ্গে সামনে দেখতে পেল ওদের দিকে অস্ত্র তাক করে আছে তিনজন অস্ত্রধারী। ওদের ঠিক পাশেই একজন বিশালাকায় লোক এক হাতে টমিকে বাচ্চার মতো ধরে তার কপালের পাশে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে। আর ওদের সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে আছে সেই নকল ভুবন, যার সঙ্গে প্রথম টক্কর লেগেছিল শারিয়ারের। ওর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল লোকটা। আর শারিয়ার ফিরে তাকাল সুমনের দিকে।

সামনের সিট থেকে ভিউ মিররে ওর দিকে তাকিয়ে সুমন বলে উঠল, 'সরি বস, ওরা টমিকে আটকে রেখেছিল। আমার কিছুই করার ছিল না।'

সুমন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে লোকটার দিকে তাকাল শারিয়ার। রাগ আর হতাশার একটা হলকা বয়ে গেল ওর শরীরে।

***

ডকইয়ার্ডের যেখান দিয়ে সেই লোকটাকে ফ্লাইং কিকের মাধ্যমে সমুদ্রে ফেলে দিল শারিয়ার সেখান থেকে মাইল খানেকের মতো দূরত্বে সমুদ্রের ভেতরে হালকা

ঢেউয়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্পিডবোট। সেটার ওপরে তিনজন মানুষ। স্পিডবোটটা এসেছে আরেকটু ভেতরের সমুদ্রে থাকা একটা ইয়ট থেকে। বাহনটাকে আসলে স্পিডবোট বলা হলেও ওটা সাধারণ যেকোনো স্পিডবোটের চেয়ে অনেকগুণ শক্তিশালী। ঠিক তেমনি অনেক বেশি ইকুইপমেন্ট সমৃদ্ধও।

স্পিডবোটের তিনজন মানুষের ভেতরে একজন মানুষ বোটের ছোট্ট কন্ট্রোলিং হুইলটা ধরে আছে। সে-ই বোটটাকে এই উত্তাল সমুদ্রের ভেতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছে এই পর্যন্ত। তিনজনের ভেতরে দ্বিতীয় লোকটা একটা বিরাট আকারের স্লাইপিং রাইফেল তাক করে রেখে সেটার ইনফ্রারেড স্কোপের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে ডক এলাকার দিকে। আধশোয়া রাইফেলধারী তার রাইফেলটা স্পিডবোটের একপাশের কিনারার ওপর একটা ভাঁজ করা তোয়ালে রেখে সেটার ওপর রেখেছে। ঢেউয়ের তালে তালে বোটটা সামান্য নড়ছে, সেই সঙ্গে অন্ধকার আর কুয়াশা তো আছেই। কিন্তু এগুলো কোনো কিছুই তার জন্য কিছু নয়। এই অবস্থাতেও প্রায় পৌনে এক মাইল দূরের ডকে যেকোনো মানুষের দু চোখের মাঝখানে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে সে। আধ শোয়া অবস্থায় সে ইনফ্রারেড স্কোপে চোখ রেখে অসন্তুষ্টির সঙ্গে মাথা নাড়ল আরেকবার। তারপর বোটে উপস্থিত তৃতীয় মানুষটার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আপনি নিশ্চিত আমি কিছুই করব না?'

লোকটা সঙ্গেসঙ্গে কোনো জবাব দিল না। ছোটোখাটো মানুষটা সাবধানে তাকিয়ে আছে একটা ইনফ্রারেড বায়নোকুলারের ভেতর দিয়ে। মনোযোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করছে ডকইয়ার্ডে ঘটতে থাকা ঘটনাবলি। ওখানকার লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি দেখে সে একটু আগে হেসেছিল কিন্তু এখন বেশ গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। তার বায়নোকুলার থেকে চেখে নামিয়ে সে অন্ধকার আকাশের দিকে কী জানি দেখল একটু। তারপর রাইফেল হাতের মানুষটার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে চীনা ভাষায় বলে উঠল, 'বলেছি না একবার। কিছু করতে হবে না।' লোকটার গলার স্বর একেবারে স্বাভাবিক, কোনো ধমক নয়, রাগ তো নয়ই বরং কেমন জানি সগোতোক্তি করার মতো করে বলে উঠল সে। কিন্তু তাতেই জোঁকের মুখে লবণ পড়ার মতো মিইয়ে গেল রাইফেলধারী।

অনেকটা মিনমিন করার মতো করে সে বলে উঠল, 'তাহলে এত ঝামেলা করে মেয়েটাকে ধরে আনালেন কেন, আবার আজ রাতে ওখানে যাওয়ার কথা ছিল সেটাও গেলেন না। এখন আবার মেয়েটাকে নিয়ে ওরা যখন কেটে পড়ছে তখন...'

'দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে তার পেছনে কোনো না কোনো কারণ থাকে। অকারণে কিছুই ঘটে না,' বলে মানুষটা চোখ থেকে বায়নোকুলার নামিয়ে ফেলল। এবার সে কথা বলেছে মাতৃভাষায়। তার কথায় পরিষ্কার চট্টগ্রাম এলাকার টান। 'যা ঘটতে যাচ্ছিল সেটা না ঘটে ওই রাতের অ্যাক্সিডেন্টে যা ঘটেছে সেটাও খারাপ

হয়নি। কিন্তু এখন যা ঘটাতে যাচ্ছিলাম সেটা মনে হয় একটা ভুল হয়ে যাচ্ছিল। তারচেয়ে এখন যা ঘটতে যাচ্ছে সেটাই মনে হয় ভালো হবে,' বলে সে আবারও আগের মতো হেসে উঠল। যদিও তার সঙ্গী পরিষ্কার কিছু বোঝেনি, তবু সেও তার বসের সঙ্গেসঙ্গে খানিকটা হেসে উঠল।

'বোট ছাড়ো, জাহাজে ফিরে যেতে হবে। আর শোন চোখের আড়াল হলেই আয়ত্তের বাইরে, সেই যুগ চলে গেছে,' শেষ কথাগুলো অনেকটা বিড় বিড় করে বলেই সে আরেকবার ডকের দিকে তাকাল। ওখানে যা ঘটার ঘটে গেছে এখন বাইরে আবার কিছু না ঘটলেই হয়। এখানে তার ভূমিকা অনেকটা ঈশ্বরের মতো। সবকিছু দেখতে হবে, ওপর থেকে কলকাঠি নাড়তে হবে। তার চেয়ে বড়ো কথা কোনো কিছুকেই চোখের আড়াল হতে দেওয়া যাবে না। ভাবনাগুলো মনের ভেতরে বয়ে যেতে শক্তিশালী বোটের ইঞ্জিন মৃদু গুঞ্জন করে চালু হয়ে গেল। মনে ভাবনার মতো স্রোতের সঙ্গেসঙ্গে ভেসে ভেসে চলতে শুরু করল স্পিডবোট।

***

'পৃথিবীটা অনেক ছোটো তাই না মিস্টার শোরিয়ার, নাকি শহরিয়ার?' বলে লোকটা একবার টমির দিকে দেখল তারপর আবারও শারিয়ারের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বলে উঠল, 'আমাদের সেদিনের মোলাকাতটা ঠিক মনমতো হয়নি তাই ভাবলাম আরেকবার আপনার সঙ্গে দেখা করি,' খসখসে বাংলায় কথা বলতে বলতে লোকটা এগিয়ে এলো ওদের মাইক্রোর খোলা দরজার দিকে। আরেকটু এগিয়েই ভুবনকে টেনে নামিয়ে দিল সে মাটিতে।

'আহ, আমার টুইন ব্রাদার,' বলে সে ভুবনকে একপাশে সরিয়ে মাইক্রোর দরজা দিয়ে ভেতরে দেখে ডক্টর শশীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে উঠল, 'হ্যালো ম্যাডাম, দেখেন তো আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা পুরো দল চলে এসেছি,' বলে সে নিজের লোকদেরদেখাল। 'দেখেন তো আপনাকে কেমন একটা গাড়িতে করে এনেছে ওরা। আমি আপনার জন্য আরো ভালো গাড়ি এনেছি,' বলে বড়ো সাদা গাড়িটা দেখাল।

'কী চান আপনি?' শারিয়ার গম্ভীর মুখে বলে উঠল। যেহেতু সে সবার থেকে পেছনের সিটে আছে কাজেই লোকটার কথার সুযোগে নিজের ডান হাতটা ঢুকিয়ে ফেলল পকেটের ভেতরে।

লোকটা শারিয়ারের হাতের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। 'অফিসার সাহেব, আপাতত আমি চাই আপনি খুব সাবধানে পকেটের ভেতর থেকে হাতটা বের করে আনুন। আমি হয়তো অস্ত্র ধরে নেই। কিন্তু আপনাদের দিকে অন্তত দুই জোড়া অস্ত্র

তাক করা রয়েছে। কাজেই সাবধান,' বলে সে আরেকটু এগিয়ে এলো। 'কারণ এই মুহূর্তে আপনারা আমার জন্য স্রেফ বোঝা ছাড়া আর কিছুই নন। আমাদের দরকার স্রেফ উনাকে,' বলে সে হাসিমুখে ডক্টর শশীকে দেখাল। সঙ্গেসঙ্গে শশী প্রায় চিৎকার করে উঠে আরেকটু চেপে এলো শারিয়ারের দিকে। এই সুযোগে হাতটা আবারও পকেটে ঢুকিয়ে অবশিষ্ট স্মোক বলটা চেপে ধরল শারিয়ার। সমস্যা একটাই, টমির মাথার পাশে পিস্তল ধরে থাকা লোকটা।

'এক মিনিট, এক মিনিট,' লোকটা প্রায় ধমকে উঠল সবাইকে। 'আমরা কারো কোনো ক্ষতি করার জন্য আসিনি,' বলে সে একটা নিজের আঙুল তুলল। 'মিস্টার শারিয়ার, আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। কাজেই বোঝার চেষ্টা করুন। আপনি কিংবা আপনার লোকদেরকে আমার দরকার নেই। আমাদের দরকার শুধু ডক্টর শশীকে। উনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন, আপনারা নিরাপদ।'

'আমি যাবো না, যাবো না,' বলে সে আবারও চেঁচিয়ে উঠল। এই সুযোগে পা দিয়ে ভুবনের পায়ে হালকা একটা লাথি মেরে তাকে সাবধান করে দিল শারিয়ার।

'চুপ, ডক্টর শশী আপনি নেমে আসুন...' বলে সে শশীর দিকে এগিয়ে আসছিল কিন্তু তার আগেই তীব্র একটা আলো এসে পড়ল ওদের ওপরে। সেই সঙ্গে ভীষণ বেগে একটা গাড়ি ঢুকে পড়ল লোকগুলো আর ওদের একেবারে মাঝখানে। দুয়েকজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল গাড়িটা সেই সঙ্গে যে যেদিক পারল ছিটকে পড়ল এদিকে সেদিকে। গাড়িটা একটানে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একেবারে মাঝ বরাবর ধাক্কা মারল লোকগুলোর নিয়ে আসা সাদা গাড়িটার বডিটায়। তীব্র ধাক্কার চোটে গাড়িটা সামনে এগিয়ে রাস্তার পাশের ঢাল থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে।

মুহূর্তের জন্য স্থবির হয়ে গেলেও চট করে সচকিত হয়ে উঠল শারিয়ার। প্রথমেই চিৎকার করে সুমনকে বলল গাড়ি স্টার্ট দিতে। তারপর এক ধাক্কায় শশীকে গায়ের ওপর থেকে সরিয়ে লাফিয়ে নেমে এলো গাড়ি থেকে। ভুবনকে শশীর সঙ্গে থাকতে বলে নিজের পিস্তল বের করে সন্তর্পনে এগোল সামনে। আগে টমিকে উদ্ধার করতে হবে। কাদের গাড়ি, কে এসেছে এসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে। খানিকটা এগিয়েই দেখতে পেল লোকগুলো ছিটকে পড়েছে এদিকে সেদিকে। সেই লোকটাকে দেখল মাটিতে পড়ে আছে। আর গাড়িটা সাদা গাড়িটাকে আঘাত করে এখন ফিরে আসছে পেছন দিকে। শারিয়ার বাম দিকে তাকিয়ে দেখল টমি আর তাকে ধরে থাকা লোকটা দুজনেই মাটিতে পড়ে আছে। শারিয়ার এগোতেই লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে টমিকে ধরার চেষ্টা করল। তার পিস্তলটা সম্ভবত পড়ে গেছে মাটিতে। শারিয়ার এগিয়ে গিয়ে সোজা গুলি করল লোকটার কাঁধে। দুনিয়া কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠে পড়ে গেল সে মাটিতে। শারিয়ার এগিয়ে টমির

হুডি ধরে টেনে তুলে ফেলল তারপর তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল গাড়িটার দিকে। সেই গাড়িটা ফিরে আসছে দেখে শারিয়ার পিস্তল তুলল কিন্তু সেটার ভেতর থেকে চিৎকার করে ওদেরকে দ্রুত সরে পড়ার নির্দেশনা দিল অফিসার রুম্পা। রুম্পাকে দেখেই শারিয়ার পিস্তল সরিয়ে ফেলল, তারপর টমিকে মাইক্রোর ভেতরে ঠেলে দিয়ে নিজে ঘুরে তাকাল জায়গাটার দিকে। রুম্পার গাড়ি ব্যাকগিয়ারে গিয়ে মেইন রোডে উঠে পড়েছে প্রায়। আর হুয়ানের লোকগুলো এখনো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। শারিয়ার পকেট থেকে হাত বের করে স্মোক বলটাতে একটা চাপ দিয়ে ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। তারপর লাফিয়ে উঠে বসল গাড়িতে।

গাড়ি স্টার্ট দেওয়াই ছিল, ও উঠে আসতেই সেটাকে প্রথমে ব্যাক গিয়ারে দিয়ে টেনে তুলে ফেলল মেইন রোডে তারপর বনবন করে হুইল ঘুরিয়ে রুম্পাদের গাড়ির পেছনে পূর্ণ বেগে ধাবিত করল সুমন।

'তুই ঠিক আছিস টমি?' পিস্তলটাকে হোলস্টারে রাখতে রাখতে জানতে চাইল শারিয়ার। টমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই সবাইকে ঠিকঠাক হতে বলে শারিয়ার একবার পেছন ফিরে দেখে নিল। জংলা জায়গাটা থেকে কাউকেই পিছু নিতে দেখা গেল না।

'উফফ শান্তি,' বলেই চোখ বন্ধ করে সিটে হেলান দিল শারিয়ার। কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিল বলতে পারবে না ও। হঠাৎ গাড়ির গতি কমে আসতেই চোখ খুলে সে জানতে চাইল। 'কী ব্যাপার?'

কিছু না বলে সে সামনে দেখাল পুলিশের গাড়িটার গতি কমতে কমতে সেটা একেবারে থেমে গেছে। সেটা থেকে নেমে হন হন করে ওদের গাড়ির দিকে হেঁটে আসছে রুম্পা। তার সঙ্গে আরো একজন সিভিল ড্রেসের পুলিশ অফিসার, আর একজন পুলিশ।

সুমন সামনের গাড়িটাকে গতি কমিয়ে আনতে দেখে সেও গতি কমিয়ে প্রায় থামিয়ে ফেলছিল কিন্তু শারিয়ার পেছন থেকে তার কাঁধে হাত রেখে বলে উঠল, 'গাড়ি থামিয়ো না সুমন। গতিও কমিয়ো না।'

'মানে কী?' পেছন থেকে ভুবন বলে উঠল। 'কী করতে চাচ্ছো তুমি?' শারিয়ার দেখল ভুবন তো বটেই শশী আর টমিও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কিন্তু শারিয়ার সামনে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল, 'সুমন গাড়ি ছোটাও।'

কিন্তু সুমন গাড়ির গতি বাড়ানোর আগেই রুম্পা আর তা লোকেরা একেবারে গাড়ির সামনে চলে এলো। একটু ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ওদের মাইক্রো। রুম্পা এগিয়ে এসে ইশারা করতেই একটানে গাড়ির দরজা খুলে ফেলল তার সঙ্গের একজন অফিসার।

'মিস্টার শারিয়ার, আপনারা করছিলেন কী জানতে পারি?' বলে সে ঝামটে উঠে একবার চোখ বুলিয়ে নিল মাইক্রোর ভেতরে। 'সুমন, টমি, মিস্টার ভুবন আপনাদের সাহস হলো কী করে...' রাগের চোটে সে কথাই বলতে পারছে না। চোখ বুলাতে গিয়ে একবার ডক্টর শশীকে দেখে নিয়ে সে আবারও দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল শারিয়ারের ওপরে। তারপর আবারও রাগের সঙ্গে ঝামটে উঠে বলে উঠল, 'মিস্টার শারিয়ার, আপনি এবং আপনার সঙ্গে যারা আজ রাতে ব্যুরোকে ইনফর্ম না করে আনঅথরাইজড অপারেশন চালিয়েছেন আপনাদের সিরিয়াস কিছু ব্যাখ্যা দিতে হবে। তার আগে এই মুহূর্তে আপনাদেরকে ডিউটি থেকে ডিসমিস করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে অথরিটির সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত আপনাকে ব্যুরোর মনিটরিং সেলে বন্দি রাখা হবে। বুঝতে পেরেছেন?' বলে সে জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ডক্টর শশীর দিকে ফিরে বলে উঠল।

'আমার এই অফিসার একজন পুলিশসহ আপনাদের সঙ্গে থাকবে ব্যুরোতে না পৌঁছানো পর্যন্ত। আপনি নিশ্চয়ই ডক্টর শশী? আপনি আমার সঙ্গে আসবেন প্লিজ...' বলে সে একটা হাত বাড়িয়ে দিল শশীর দিকে।

'এক মিনিট,' বলে শারিয়ার সোজা হয়ে বসলো। 'উনি কোথাও যাচ্ছেন না। কিংবা আমরাও কোথায় যাচ্ছি না,' বলে সে হাসিমুখে সোজা তাকাল রুম্পার দিকে।

রাগে রুম্পার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল এবার তাকে যেন খানিকটা হতবাক দেখাল। 'মানে, কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?'

'আমি বলতে চাচ্ছি এটা,' বলে সে নিজের হাতে থাকা কিং কোবরাটা সামান্য নাড়ল। সবাই আঁতকে উঠে দেখল শারিয়ার ইতোমধ্যে তার হাতের পিস্তল বের করে এনেছে কেউই খেয়াল করেনি। এবার সে ওটাকে ওপরে তুলে রুম্পার মুখ বরাবর ধরল। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি না,' খুব সবধানে যেন গল্প করছে এমন ভঙ্গিতে বলে উঠল শারিয়ার। 'আমরা সেখানেই যাবো যেখানে আমাদের যাওয়া প্রয়োজন। আপনি বা আপনার কেউ বাঁধা দিলে আমি গুলি করব,' বাক্যের শেষটুকু বলার সময়ে তার চেহারা ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠল। 'গাড়ি স্টার্ট করো সুমন।'

'বস, তুমি কী করছো?'

'মিস্টার শারিয়ার...' ডক্টর শশী বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু শারিয়ার ওদের দিকে ফিরে প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল, 'ট্রাস্ট মি,' বলেই সে ফিরে তাকাল রুম্পার দিকে।

রুম্পা থমথমে অবিশ্বাস্য চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। দেখে মনে হচ্ছে সুযোগ পেলে যেন কামড়ে দেবে শারিয়ারকে। যখন কথা বলল গলা থেকে যেন আগুন বেরুল তার। 'অফিসার, আপনি জানেন না আপনি কী করছেন।'

'ট্রাস্ট মি, আমি খুব ভালো করেই জানি,' বলেই সে সুমনকে বলল গাড়ি নিয়ে আগে বাড়তে। সুমন একবার পেছন ফিরে গাড়ি স্টার্ট দিল। গাড়িটা রুম্পাদেও পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। ওদের সাদা গাড়িটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খুবই সতর্ক ভঙ্গিতে দুবার গুলি করল শারিয়ার। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে ধুপধুপ করে দুটো গুলি বেরিয়ে গেল প্রায় নিঃশব্দে। কিন্তু রুম্পাদের গাড়িটার টায়ার ফুটো হয়ে ভসস করে একটা টায়ার ফেটে বসে গেল। সেই সঙ্গে ধাম করে মাইক্রোর দরজা লাগিয়ে দিল শারিয়ার। দরজা লাগিয়েই সিটে হেলান দিল সে।

মাইক্রোর গতি বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে পেছন দিকে তকিয়ে রুম্পা আর ওর দলের লোকজনকে অবলোকন করছিল ভুবন সে শারিয়ারের দিকে ফিরে কঠিন গলায় বলে উঠল, 'বস তুমি যা করেছ আশা করি বুঝে করেছ। তা না হলে,'

'ট্রাস্ট মি...' চোখ বন্ধ করে শুধু এটুকুই বলল শারিয়ার।

সামনের সিট থেকে মাথা নাড়তে নাড়তে সুমন আফসোসের গলায় বলে উঠল, 'একদিকে ওই চাইনিজ ব্যাটা হুয়াং খুঁজবে আমাদের। একদিকে পুলিশ খুঁজবে। তার ওপরে আরো কে কে খুঁজবে কে জানে,' বলে আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল। 'রাইতের প্রথম দিকে চাকরির কথা জিগাইছিলাম। চাকরি তো গেলোই জানটাও থাকবে কিনা কে জানে।' তার বলার ভঙ্গিটা হাস্যকর হলেও কেউ হাসল না।

ডক্টর শশীর বিধ্বস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে শারিয়ার বলে উঠল, 'ডক্টর শশী, আপনার সঙ্গে সিরিয়াস আলাপ আছে আমাদের।' শশী কিছু না বলে মাথা নাড়ল। ক্লান্তির কারণে নাকি একের পর এক ঘটনা প্রবাহে সেই তেজোদীপ্ত ভাবটা একেবারেই অনুপস্থিত তার মাঝে।

শারিয়ার সিটে হেলান দিল। অনেক ঝুঁকি নিয়েছে। উদ্ধার করা ডক্টর শশীর কাছ থেকে জানতে হবে অনেক কিছু। এত হাঙ্গামা করে কাকে উদ্ধার করে আনল বুঝতে হবে সেটা।

অধ্যায় আটত্রিশ

বর্তমান সময়

পতেঙ্গা রোড, চট্টগ্রাম

'আমি জানি আমার অনেক ব্যাখ্যা দেয়ার আছে,' কথাগুলো শারিয়ারের মুখ দিয়ে যখন উচ্চারিত হলো তখনো নিজের দুই হাত শরীরের দুইপাশে সারেন্ডারের ভঙ্গিতে ওঠানো। 'আমি একে একে বলছি, সবাইকে খানিকটা ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। বলে সে টেবিলের চারপাশে বসে থাকা ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারাগুলো একে একে দেখে নিল।

কেউ কিছু বলার আগে ডক্টর শশী ঝমঝমে গলায় কথা বলে উঠল সবার আগে, 'আপনি যেই হোন আর যাই বলতে চান সেটা শোনার চেয়ে আমি মুহূর্তে আগে পরিচ্ছন্ন হওয়ার তাগিদ অনুভব করছি। বাথরুম খালি আছে?' সে পেছনের দিকে দেখিয়ে জানতে চাইল।

'আর আমি তোমার বক্তব্য শোনার আগে আমার পাকস্থলির ডাক শুনতে বেশি আগ্রহী এই মুহূর্তে,' ভুবন নিজের মোবাইল থেমে মুখ তুলে বলে উঠল।

'আমিও,' ভুবনকে সাপোর্ট জানাল টমি।

শারিয়ার সবার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। একটা চেয়ার টেনে নিতে নিতে সে ডক্টর শশীকে টয়লেটের রাস্তা দেখিয়ে সেদিকে যেতে আহ্বান জানাল।

সেই ডকইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে প্রথমে চায়নিজ লোকটার খপ্পর থেকে তারপর রুম্পাদেরকে কলা দেখিয়ে পালিয়ে আসার পর ওরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে ওখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে শহরের পাশের হাইওয়ের সঙ্গের একটা রেস্টুরেন্টে। যদিও ওখান থেকে সরে এখানে আসার সিদ্ধান্তটা শারিয়ারের। তবে এই সিদ্ধান্তের পেছনে কয়েকটা কারণ ছিল। প্রথমত, ওরা যেখান থেকে সরে এসেছে সেখান থেকে সরে ওরা প্রথমেই শহরে ঢুকবে সবাই এটাই ধরে নেবে আর পুলিশ বা অন্যরা খোঁজও চালাবে সেভাবেই। কিন্তু ওরা এদিকটাতে আসবে এটা ভাবার সম্ভাবনা পুলিশ অথরিটি কিংবা শত্রুপক্ষ সবারই কম। দ্বিতীয়ত, ওরা সেখান থেকে সরে এসেই শারিয়ার ঢাকাতে ওদের ম্যানেজার হামিদ চাচার সঙ্গে যোগাযোগ করে যেটার সন্ধান কেউই জানবে না। আপাতত চট্টগ্রামে ওদের মাথা

গোঁজার একটা ঠাঁইয়ের ব্যবস্থা করার জন্য শারিয়ার কল করার আধা ঘণ্টার ভেতরেই ওকে একটা বাড়ির ঠিকানা পাঠায় ওর হামিদ চাচা। আসলে ওদেরই একটা বাড়ি আছে এখানে। কিন্তু স্থায়ীভাবে কেউই থাকে না ওখানে। শারিয়ারের চাচা কিংবা পরিবারের কেউ কোনো কাজে চট্টগ্রাম এলে ওটাতে ওঠে। বাড়িটার অবস্থানও ওদের থেকে কাছাকাছি। তার ওপরে ওখান থেকে সরে এসেই প্রথমেই শারিয়ার জানায় অথরিটি প্রথমেই ওদের পরিবারে সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ওদের ভেতরে শারিয়ারের এই নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, টমির কেউ নেই। ভুবন জানায় তা স্ত্রী আর সন্তান এই মুহূর্তে পাহাড়ে তার গোত্রের সঙ্গে আছে। কাজেই তারও কোনো সমস্যা নেই। বাকি থাকে একমাত্র সুমন। তার স্ত্রী বাড়িতে একা। শারিয়ারের পরামর্শেই সে স্ত্রীকে আপাতত ঢাকায় পাঠিয়ে দিতে বলে। সে-জন্যই এই রেস্টুরেন্টে আসার পথে সুমন নেমে গেছে। স্ত্রীকে ঢাকার গাড়িতে উঠিয়ে তারপর এখানে আসবে সে।

ওরা সবাই অত্যন্ত ক্ষুধার্থ এবং ক্লান্ত। কাজেই ওদের বর্তমান ঠিকানায় সরে পড়ার আগে কিছু খাবার জন্য হলেও কোথাও থামাটা জরুরি ছিল, একারণেই ওরা এখানে থামে। একেবারে কাকভোর আর হাইওয়ের পাশে হওয়াতে হোটেলে জনসমাগম প্রায় নেই বলতে গেলে। হোটেলে এসে শারিয়ার ফ্রেশ হয়ে নিজের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য এই কথা বলেছে।

সবার উত্তর শুনে শারিয়ার একবার কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে জান বাঁচানোর চেয়ে খাওয়াটাই যদি তোমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে আমার আর কী বলার আছে। ক্ষুধা তো আমারও লাগে,' বলে সে ওয়েটারকে ডেকে সবার জন্য খাবারের অর্ডার দিল। অর্ডার দেওয়া শেষ করে ভুবন আর টমির দিকে ফিরে বলে উঠল, 'শোনো, খাবার আসতে আসতে কয়েকটা জরুরি কথা সেরে ফেলি। ভুবন,' এইটুকু বলে সে ভুবনের দিকে তাকাল। 'তুই কী নিশ্চিত যে তোর পরিবারের কোনো সমস্যা হবে না?'

'না বস,' দুইপাশে মাথা নাড়লভুবন। 'আমার ছেলের স্কুল বন্ধ এই মাসে। সে-কারণেই বউ আর ছেলে এখন গ্রামে, মানে পাহাড়ে। ওখানে কেউ ওদেরকে রিচ করতে পারবে না। তবুও আমি কথা বলেছি। কোনো সমস্যা নেই।'

'আচ্ছা কথা বলা থেকে আগে বলে নেই,' শারিয়ার বলে উঠল। 'তোমরা দুজনেই এই মুহূর্তে নিজেদের মোবাইল অফ করে আমার কাছে জমা দাও। ডক্টর শশীর কাছে তো মোবাইলই নেই। কাজেই সে-ঝামেলাও নেই। আর সুমন আসামাত্রই ওর ফোনও নিয়ে নিতে হবে। কারণ আমাদের ট্রেস করার প্রধান উপায় হবে মোবাইল ফোন। এটা বন্ধ করতে হবে সবার আগে। তবে মোবাইল অফ

করার আগে প্রত্যেকেই যার যার ফেসবুক ইমেইল ইত্যাদি যা আছে সেগুলো থেকে আগে লগ আউট করে নাও। সম্ভব হলে আপাতত অ্যাকাউন্ট ডি-অ্যাকটিভেট করে ফেলো।'

টমি আর ভুবন নিঃশব্দে নিজেদের কাজ সেরে মোবাইলগুলো জমা দিয়ে দিল। শারিয়ার ফোনগুলো রাখতে রাখতে নিজের মোবাইলটা বের করে নাড়ল। 'আমারটা আর কিছুক্ষণ ওপেন রাখতে হবে, হামিদ চাচার ফোন আসবে। ওটা আসামাত্রই উনার নির্দেশনা শুনেই অফ করে দেব। আর যেখানে যাব ওখানে ভিন্ন ফোন থাকবে। সেটার রেকর্ড ডাটাবেজে নেই। ওটা দিয়ে কাজ চালাতে পারব আপাতত,' এইটুকু বলে শারিয়ার একবার টয়লেটের দিকে দেখে নিল, তারপর নিজের মুখটাকে খানিকটা সামনে নিয়ে এসে ভুবন আর টমির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'ডক্টর শশীকে কেমন মনে হলো তোমাদের কাছে?'

'তার কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু জানার আছে,' ভুবন আনমনেই মাথা নাড়ল। 'বস, একটা ব্যাপার মনে রেখো, তার আমাদেরকে খুব বেশি দরকার নেই। কিন্তু তাকে আমাদের দরকার। তার কাছে কী তথ্য আছে সেটার ওপরে অনেক কিছুই নির্ভর করছে এখন।'

'এবং তার কাছে অনেক মূল্যবান তথ্যই আছে,' শারিয়ার আনমনেই বলে উঠল। 'তা-না হলে তার পেছনে এত এত লোক লাগতো না। তার কাছ থেকে সেগুলো আদায় করতে হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, যা ঘটছে আমাদের সঙ্গে সেগুলো এখনো টুকরো টুকরো হয়ে আছে। বিশেষ করে ডক্টর আবদেলের ব্যাপারটা এখনো অনেকটাই ধোঁয়াশা। আমার বিশ্বাস সেসব ব্যাপারে ডক্টর শশীর কাছে তথ্য আছে। কেসটা সমাধান করতে হলে সেগুলো জানতে হবে আমাদের। ওই যে সুমন চলে এসেছে।'

সুমন হোটেলের প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই তার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল টমি। 'সুমন ভাই, এখানে।'

সুমনের হাতে একটা শপিং ব্যাগ। সেটাকে পাশে রেখে একটা চেয়ার টেনে সেটাতে ধপ করে বসে পড়ল সুমন। চূড়ান্ত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না এই অবস্থার ভেতরে আছি,' বলে সে নিজের মুখ তুলল। 'কাল বিকেলেও সব ঠিক ছিল।'

'আগামীকাল বিকেলেও যে আবার সব ঠিক হবে না সেটা তোমাকে কে বলতে পারে?' ভুবন বিজ্ঞের মতো বলে উঠল। 'হয়তো আরো ভালোও হতে পারে।'

'বস, একটা সিগারেট খাওয়াও,' সুমনকে এখনো অস্থির মনে হচ্ছে। শারিয়ার একটু আগে ওয়েটার ছেলেকে দিয়ে আনানো বেনসনের নতুন প্যাকেট খুলে একটা নিজের ঠোঁটে লাগিয়ে আরো দুটো এগিয়ে দিল ভুবন আর সুমনের দিকে। ওর ডানহিলের স্টক শেষ হয়ে গেছে গতকাল।

'দেখি আমাকেও একটা দিন,' ওদের পেছন থেকে বলে উঠল শশী। যদিও কাপড়চোপড় আর চেহারার অবস্থা এখনো বিধ্বস্ত কিন্তু হাত-মুখ ধুয়ে আসাতে খানিকটা হলেও পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে তাকে। চেয়ার টেনে বসতে বসতে একটা সিগারেট চাইল সে শারিয়ারের কাছে। শারিয়ার সিগারেট এগিয়ে দিতেই সে ওটাকে ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। 'আহ, কতক্ষণ পরে। শালারা আটকে রেখে খাবার ভালো দিলেও সিগারেট দিত না। আচ্ছা নাশতার অর্ডার করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, অর্ডার করা হয়েছে,' বলে শারিয়ার সুমনের দিকে শপিং ব্যাগটা দেখিয়ে ইশারা করল। শপিং ব্যাগটা তুলে এগিয়ে দিল ডক্টর শশীর দিকে। 'ম্যাডাম এখানে আমার স্ত্রীর কিছু কাপড় আছে।'

শশী খুব অবাক হয়ে ব্যাগটা নিল।

'এটা আমার আইডিয়া ছিল,' একটা হাত তুলে বলে উঠল শারিয়ার। 'কারণ আমরা যেখানে যাব সেখানে সব থাকলেও মেয়েদের কাপড় থাকার সম্ভাবনা কম। আর একবার আমরা সেখানে ঢুকে গেলে কী অবস্থায় পড়ব জানি না। তাই আমিই সুমনকে বলেছিলাম ওর স্ত্রীর কিছু কাপড় নিয়ে আসতে। আশা করি আপনার কাজ চলবে।'

ডক্টর শশী। ব্যাগটা হাতে নিয়ে একপলক দেখে নিয়ে আনমনেই মাথা নাড়ল। 'আমার কী আপনাকে ধন্যবাদ জনানো উচিত নাকি আমাকে অপহরণ করার চেষ্টা করছেন বলে এখনই উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে লোক জড়ো করা উচিত?' ডক্টর শশীর চোখেমুখে রহস্যময়তা।

শারিয়ার একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ তার দিকে। তারপর নিজের একটা হাত মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'আমাদের এখনো ফরমালি পরিচয় হয়নি। আমি শারিয়ার, পিবিআইএসের স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডিং অফিসার,' বলে সে ভুবনের দিকে দেখাল। 'ভুবন, এক্স স্পেশাল অপস কমান্ডো। এই কেসের সাপোর্টিং স্টাফ। টমি, আমাদের আইটি ও টেকনিক্যাল ফরেনসিক সাপোর্ট স্টাফ। সুমন, পিবিআই চট্টগ্রাম ব্যুরোর অফিসার,' সে পরিচয় দেওয়া শেষ করে তাকিয়ে রইল ডক্টর শশীর দিকে।

'সবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালো লাগল,' ডক্টর শশী তার বাদামি চোখের মণিতে হাসি ফুটিয়ে বলে উঠল, 'যদিও পরিবেশ পরিস্থিতি কোনোটাই আসলে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। তবুও সবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালো লাগল। যদিও আমি এখনো অনেক কিছুই জানি না এবং বুঝতেও পারছি না তবুও আশা করছি আমরা পারস্পরিক সহায়তায় এই ক্রিটিক্যাল অবস্থা থেকে উদ্ধার হতে পারব। আমি শশী, কায়রোতে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কাজ করি,' সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাঁড়তে সে বলে উঠল।

'আপনি বাংলাদেশে এসেছিলেন কেন?' প্রশ্নটা করে শারিয়ার টমির দিকে ফিরে নোট নিতে বলল। কিন্তু খাবার এসে পড়াতে আবার হাত নেড়ে মানা করে দিল।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে সেটাকে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দুই ঠোঁটের ফাঁকে আটকে পরোটা আর ডিম ভাজির প্লেটটা সামনে টেনে নিল শশী। 'আমাকে ডক্টর সুলতান হঠাৎই যোগাযোগ করে আসতে বলেছিলেন। আচ্ছা আমার একটা ব্যাপারে জানার ছিল। আমি যখন মানে ওই গুণ্ডাদের হাতে ধরা পড়ি তার আগে ডক্টর সুলতানকে একটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যেতে দেখি। উনার অবস্থা কী? মানে কেমন আছেন উনি এখন?'

শারিয়ার জবাব দেয়ার আগে একবার ভুবনের দিকে দেখে নিল। তারপর ডক্টর শশীর দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আপনি তো বন্দি ছিলেন তাই জানেন না। ডক্টর সুলতান ওখানেই গাড়ির সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান।'

ডক্টর শশী খাবার টেনে নিয়ে সেগুলোকে সাজিয়ে খেতে শুরু করতে যাচ্ছিল, শারিয়ারের কথাটা শুনে টপ করে তার দুই ঠোঁটের ফাঁক থেকে সিগারেট টেবিলের ওপরে পড়ে গেল। 'ডক্টর সুলতান মারা গেছেন!' যেন স্বগোতোক্তি করছে অনেকটা তেমন ভঙ্গিতে বলে উঠল সে। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই তার বড়োবড়ো বাদামি চোখ জোড়া পানিতে ভরে উঠল।

'আমি সরি,' শারিয়ার বলে উঠল। 'আমরা যতটুকু জানি আপনি ডক্টর সুলাতানের অনেক ক্লোজ ছিলেন। কাজেই উনার ছাত্রী হিসেবে...'

'ডক্টর সুলতান আমার বাবা ছিলেন,' মুখের ভেতরে পানি নিয়ে কথা বললে যেমন শোনায় অনেকটা তেমন ভঙ্গিতে বলে উঠল মেয়েটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টেবিলের সবাই খাওয়া থামিয়ে ফিরে তাকাল তার দিকে।

'ডক্টর সুলতান আপনার বাবা ছিলেন?' শারিয়ারের গলায় বিস্ময়ের মাত্রা শশীর চেয়েও বেশি। সে টমি আর ভুবনের দিকে তাকিয়ে আনমনেই কাঁধ ঝাঁকালো একবার। দুজনের কেউই জানে না এই ব্যাপারে। 'আমরা তো জানতাম উনি নিঃসন্তান ছিলেন। বহু বছর আগেই তার স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে...'

'উনি নিঃসন্তান ছিলেন এটা যেমন ঠিক, তেমনি আমি তার সন্তান ছিলাম এটাও তেমন ঠিক,' শশীর গলায় আবেগ যেন বাঁধ মানছে না। 'আমি তার পালককন্যা ছিলাম,' বলে সে খানিকটা ফুঁপিয়ে উঠল।

শারিয়ার বাকিদের দিকে তাকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল। এমন অবস্থায় আসলে কী করা উচিত বা কী বলা উচিত বুঝতে পারছে না সে। 'ডক্টর শশী, আপনি শান্ত হোন। আসলে পরিস্থিতি এমন যে আপনাকে আমি কী বলব ঠিক বুঝতেও পারছি না। আসলে ডক্টর সুলতানের ব্যাপারে খুব কমই জানতে পেরেছি আমরা। তার ব্যাপারেও আপনার কাছ থেকেই জানতে হবে আমাদের।'

'ইটস ওকে,' বলে শশী মুখ তুলে তাকাল। 'আমি সরি, আসলে হাজার হলেও নিজের বাবা। আমি বুঝতে পারছি পরিস্থিতি। এখন আবেগ সামলে কাজে নামার সময়,' বলে সে টিস্যু দিয়ে নিজের মুখ-চোখ মুছে নিয়ে খাবারের প্লেটটা টেনে নিল। 'আপনারা খাচ্ছেন না কেন? শুরু করুন,' বলে সে খেতে শুরু করল। বাকিরা এমন অবস্থায় খাবে কী খাবে না বুঝতে পারছিল না। কিন্তু শশীকে খনিকটা ধাতস্থ হতে দেখে সবাই যার যার খাওয়া শুরু করল। 'মিস্টার শারিয়ার। ঘটনা ঠিক কী আমাকে খুলে বলুন তো।'

শারিয়ার খেতে খেতেই এই কেসের সমস্ত কিছু শুরু থেকে সেই ডক ইয়ার্ডে ওদের অভিযান পর্যন্ত খুলে বলল। এই পর্যন্ত বলে সে যোগ করল, 'এই হলো আমাদের গল্প। এখন আমাদের সঙ্গে আপনার গল্প জেড়া লাগিয়ে আমাদের একটা পুরো চিত্র দাঁড় করাতে হবে। তবে তার আগে আমার একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার আছে সবার কাছে। আমরা কেন সেই ডকইয়ার্ডে আন-অথরাইজড অপারেশন চালিয়েছিলাম সেটা আমরা সবাই জানি। কারণ আমাদের হাতে সময় ছিল না। কিন্তু সেখান থেকে বেরুবার পর অফিসার রুম্পা এবং পুলিশের সঙ্গে কেন আমি অমনটা করলাম, এটা সবাই জানার জন্য আকুপাকু করছে। আমার মনে হয়। এটা একান্তই আমার সিদ্ধান্ত ছিল। কেন আমি এমন একা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিলাম সেটা জানার অধিকার সবার আছে।'

এই পর্যন্ত বলে শারিয়ার খাবার পুরে দিল মুখের ভেতরে। সেটাকে সামলে নিয়ে আবার বলতে লাগাল। 'গতকাল সন্ধের সময়ে যখন আমরা ডকইয়ার্ডে অভিযান চালাতে যাই তখনই আমি জানতাম ডক্টর শশীকে আমরা উদ্ধার করতে পারি আর না পারি অথরিটির সঙ্গে একটা ক্ল্যাশ আমাদের লাগতে যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা নির্জনে সরে কাজ সেরে অথরিটিকে ইনভলভড করব পরে যাতে সরাসরি ক্ল্যাশ না হয়। কিন্তু ইয়ার্ড থেকে বের হওয়ার পরেই ওখানে ওই চায়নিজ হুয়াং আক্রমণ চালাবে, এরপরে আবার অকুস্থলে উপস্থিত হবে রুম্পা। এটা আমি আশা করিনি।'

'এই দুটো গ্রুপই ওখানে একেবারে সময়মতো পৌঁছলো কীভাবে?' ভুবনের প্রশ্ন। 'ওরা জানতে পারল কীভাবে আমরা ওখানে অভিযান চালাতে যাচ্ছি?'

'আমার ধারণা,' শারিয়ার খেতে খেতে একটা হাত তুলে বলে উঠল। 'যদিও এটা স্রেফ অনুমানমাত্র। গতকাল আমরা গেস্টহাউস থেকে বেরিয়ে পিবিআই অফিসে গিয়েই বোকামিটা করেছি। সম্ভবত হুয়ানের কোনো এজেন্ট ওখান থেকেই আমাদের অনুসরণ করেছে। অথবা ওখান থেকেই পিবিআইয়ের কেউ না কেউ অমাদের একসঙ্গে বেরুতে দেখে তাকে জানায়। জোরদার সম্ভাবনা রুম্পাকেও ওখানকারই কেউ জানিয়েছে। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, আরো একটা কারণে ডক্টর শশীকে আমি অথরিটির হাতে তুলে দিতে চাচ্ছিলাম না। কারণ অথরিটির

ভেতরে আমাদের শত্রুপক্ষের লোক আছে। অথিরিটির সঙ্গে কাজ করতে গেলে ডক্টর শশী তো বটেই আমাদেরও প্রাণের ওপরে ঝুঁকি চলে আসত। কারণ আমরা এখনো একেবারেই জানি না আমাদের শত্রু কারা এবং কাকে বিশ্বাস করা যাবে আর কাকে বিশ্বাস করা যাবে না। কাজেই ওখানেই ইন্সট্যান্ট আমি সিদ্ধান্ত নিই। একটা ঝুঁকি নেব। আমরা অথরিটির হাতে বন্দি না থেকেই কাজ করব। এখন তোমরা বলো আমার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল নাকি ভুল। আমার ধারণা অথরিটির সঙ্গেকাজ করতে গেলে আমরা যা করতাম সেটার ফল ভোগ করার আগেই শত্রুপক্ষের হাতে চলে যেত।'

সবাই চুপ। টমিই প্রথম কথা বলে উঠল, 'আমি শারিয়ার স্যারের সঙ্গে একমত। এভাবে ব্যাপারটা হয়তো আমাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে হতে পারে তবে অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে বিষয়টা আরো ভালো হতে পারে যদি আমরা কেসটা সমাধান করতে পারি।'

'বাহ টমি,' খেতে খেতে ভুবন বলে উঠল, 'এক রাতের অভিযান তোকে বেশ ম্যাচিউর করে ফেলেছে দেখছি।'

'টমি যা বলেছে ঠিকই তো বলেছে,' শারিয়ার আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ওয়েটার ছেলেটা এসে বিল দিয়ে গেল। শারিয়ার বিল দিয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'এখন এই কেসের একটা বড়ো অংশের রহস্যের চাবিকাঠি আছে ডক্টর শশীর হাতে। একমাত্র সেই বলতে পারে আসলে পরের ব্যাপারটা কী নিয়ে। ডক্টর সুলতান আসলে কী নিয়ে গবেষণা করছিল আর কেনই বা তার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হলো। কেন তাকে ঘিরে এত রহস্য, আর শশীকেই বা কেন অপহৃত হতে হলো। সবকিছু না হলেও আমি যা যা বলতাম তার একটা বড়ো অংশের জবাব আছে আমার বিশ্বাস ডক্টর শশীর কাছে। কাজেই তার বক্তব্য আমাদের শুনতে হবে। তবে এখন না,' শারিয়ার উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে উঠল।

'আমার ধারণা ইতিমধ্যেই আমাদের নামে রিপোর্ট চলে গেছে। সম্ভবত আমাদের খোঁজার জন্য অভিযানও শুরু হয়ে যাবে কিছুক্ষণের ভেতরেই। এখানেও আসবে লোকজন। তবে সময় লাগবে। কাজেই যত দ্রুত সম্ভব আমাদের নিরাপদ জায়গায় সরে পড়া উচিত। তাই আমরা গাড়িতে বসে কথা বলব,' বলে সে নিজের মোবাইল বের করে একটা এসএমএস দেখাল সুমনকে। 'সুমন এই ঠিকানাটা ভালোভাবে দেখে নাও। এখানেই আপাতত উঠব আমরা।

সুমন ঠিকানাটা দেখে নিয়ে মাথা নাড়ল। 'চিনতে পেরেছি বস।'

'তুমি গাড়ি চালাবে,' বল সে নিজের মোবাইল বন্ধ করে দিল। 'আর তোমার মোবাইলটাও দাও সুমন,' ওটাও নিয়ে বন্ধ করে দিল সে। 'আমরা এখন গাড়িতে উঠব। বাকি কথোপকথন গাড়িতে বসে চলবে। ডক্টর শশীর বক্তব্য শুনব আমরা।'

ওর সবাই রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। সবাই উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল সুমন।

'ডক্টর শশী, এবার বলুন আপনি হঠাৎ কেন বাংলাদেশে এলেন। ডক্টর সুলতান আসলে কে ছিলেন এবং কী নিয়ে গবেষণা করতেন? আপনি কীভাবে অপহৃত হলেন? সে-রাতে কী ঘটেছিল? আর আপনাকে অপহরণ করে নেয়ার পর সেখানে আসলে কী হয়েছিল?' বলে শারিয়ার আপনাতেই একটা হাত তুলল। 'আমি জানি, আমি অনেক কিছু জানতে চাইছি। কিন্তু আমাদের এসব ব্যাপারে জানতে হবে। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। আপনি ধীরে ধীরে একেবারে শুরু থেকে বলতে থাকুন।'

'ডক্টর সুলতান আবদেল একজন খেয়ালি ধরনের মানুষ ছিলেন,' শশী বলতে শুরু করেও থেমে গিয়ে শারিয়ারের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'একটা সিগারেট দেওয়া যাবে?'

'অবশ্যই,' বলে শারিয়ার বেনসনের প্যাকেট আর লাইটার তার দিকে এগিয়ে দিল। শশী সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেট ফেরত দিতে যাচ্ছিল শারিয়ার ইশারায় সামনের সিটে বসা ভুবনের দিকে দিতে ইশারা করল। শশী প্যাকেটটা ভুবনের হাতে দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল।

'আমার পালক পিতা ডক্টর আবদেল একদিকে ছিলেন অসম্ভব রকমের জিনিয়াস মানুষ। আবার অন্যদিকে চূড়ান্ত খেয়ালি মানুষ। নিজের কাজ, গবেষণা আর অধ্যাপনা ছাড়া অন্য কিছুতেই তার কোনো সিরিয়াসনেস ছিল না। পরিবারের ব্যাপারটাও তাই ছিল,' শারিয়ার দেখল শশীর গলায় অদ্ভুত একটা লকেট ঝুলছে সাদা রুপো বা প্লাটিনামের চেইনের সঙ্গে। সেটাকে চেপে ধরে সে বলে চলেছে নিজের বাবার কথা। 'এ-কারণেই কোনোদিনে সে পারিবারিকভাবে সুখী হতে পারেনি। বাবা একেবারে ছাত্রজীবনে থাকতেই ভালোবেসে বিয়ে করেছিল আমার মাকে। আমার মা ছিল একেবারেই ভিন্ন ধরনের মানুষ। পুরোদস্তুর গৃহিনী। তাই বাবার সঙ্গে কোনোদিনই তার পুরোপুরি বনেনি। তার ওপরে উনি ছিলেন নিঃসন্তান। তাই সেটা আরো এককাঠি অশান্তির মাত্রা যোগ করছিল তাদের সংসারে। আমার বাবা আর মা মিলে আমাকে দত্তক নেন। কিন্তু দত্তক নেয়ার তিন বছরে মাথায় উনাদের ভেতরে ডিভোর্স হয়ে যায়। আমি কেন জানি বাবার সঙ্গেই রয়ে যাই। বাবা বেশিরভাগ সময়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমি থাকতাম বোর্ডিং স্কুলে। তবে বছর শেষের ছুটিগুলো একসঙ্গে কাটাতাম আমরা। আর তখনই বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম পৃথিবীর নানা প্রান্তের সব প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটগুলো। সেখান থেকে আর্কিওলজির প্রতি একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমার। কলেজ পাস করার পর ইংল্যান্ডের যেখানে বাবা পড়াত সেই ডিপার্টমেন্টেই পড়তে যাই আমি।'

এই পর্যন্ত বলে শশী একটু থামল। 'আমি জানি, হয়তো খানিকটা পারিবারিক প্যাঁচাল পাড়ছি। কিন্তু এর সঙ্গেও এই সব ঘটনার যোগসাজশ থাকতে পারে। তাই এগুলো বলাটাও খানিকটা জরুরি মনে হচ্ছে আমার কাছে। তো যাই হোক, বাবার সঙ্গে থাকতে শুরু করি আমি। আর্কিওলজি পড়ার পেছনে একদিকে আমার নিজের আগ্রহ তো ছিলই অন্যদিকে আমি আসলে বাবার কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিলাম। বাবার সঙ্গে থাকতে থাকতে আমারও সেই জগতে প্রবেশ এবং ভালোবাসা গড়ে ওঠে। এখানে আমার বাবার গবেষণার এরিয়া নিয়ে খানিকটা বলি। বাবা প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে করতে একটা সময় ওই ফিল্ডের প্রতি খানিকটা বিরক্ত হয়েই ভিন্ন একটা এরিয়া নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। এই বিশেষ এরিয়াটায় ইতিহাসের বিভিন্ন হারিয়ে যাওয়া অংশ খুঁজে বের করা হয়। যেমন ধরেন ইতিহাসের কোনো এক জায়গায় হয়তো কোনো বিশেষ নগরীর কথা উল্লেখ আছে কিন্তু বাস্তবে সেটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাবার এরিয়াগুলোর একটা হলো ইতিহাসের বিভিন্ন ক্লু পর্যালোচনা করে সেগুলো খুঁজে বার করা।'

'অনেকটা ইতিহাসের অলিগলিতে চালানো ইনভেস্টিগেশনের মতো,' শারিয়ার আনমনেই বলে উঠল।

'এগজেক্টলি,' শশী তালি দিয়ে উঠল। সে নিজের কাজের ক্ষেত্র নিয়ে কথা বলাতে মজা পেতে শুরু করেছে। 'আগে বাবা কাজ করত মিডল ইস্ট নিয়ে, তো নতুন এই এরিয়াতে গিয়ে বাবা কাজ করতে শুরু করে ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে। এই এরিয়াতে কাজ করতে গিয়ে বাবা খুব মজা পায়। সেই সঙ্গে বার্লিনে একটা কনফারেন্সে পরিচয় হয় তার আরেক পাগলের সঙ্গে প্রফেসর ইফতেখার আবদুল্লার সঙ্গে। সেও একই ফিল্ডের মানুষ। দুজনে মিলে নিজের কাজের এরিয়াগুলো গুছিয়ে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে শুরু করে। এই জায়গায় এসে বাবার সঙ্গে আমার একটা অ্যাকাডেমিক যুদ্ধ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আমি দূরে সরে যাই বাবার কাছ থেকে। কিছুটা রাগ ছিল কিছুটা অভিমানও ছিল বাবার প্রতি। আমি তখন সবেমাত্র অনার্স শেষ করে নিজের ইন্টার্নশিপের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। যেকোনো আর্কিওলজিস্টের জন্য মিডলইস্টে কাজ করাটা হলো স্বর্গ হাতে পাওয়ার মতো একটা ব্যাপার। তার ওপরে যদি সেটা হয় মিশর তবে তো কথাই নেই। আমারও ইচ্ছে ছিল মিশরেই ইন্টার্নশিপ করব। সুযোগও এসে যায়।'

শশীর কথার এই পর্যায়ে শারিয়ার তাকে হাতের ইশারায় থামতে বলে সুমনের কাছে জানতে চাইল, 'আমরা যেখানে যাবে সেখানে যেতে আর কতক্ষণ লাগবে?'

'আরো আধাঘণ্টা সর্বোচ্চ,' গাড়ি চালাতে চালাতেই সুমন একবার হাত ঘড়ি দেখে নিয়ে বলে উঠল।

'ঠিক আছে, আপনি বলুন প্লিজ।'

শারিয়ারের উদ্দেশে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে শশী আবারও বলতে শুরু করল। 'আমি মিশরেই কাজ করে যেতে চাইছিলাম কিন্তু বাবা আমাকে যেতে মানা করে। বরং বলেন আমাকেও ভারতবর্ষের ওপরে কাজ করতে। বাবার কথায় আমি প্রচণ্ড আশাহত তো হই, সেই সঙ্গে খানিকটা বিরক্তও। বাবার সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে আমি মুখ ফসকে বলে বসি আমি যদি তার নিজের সন্তান হতাম তবে উনি এমনটা কোনোদিনই আমার সঙ্গে করতে পারতেন না। সেটা যে কত বড়ো ভুল ছিল আমি কল্পনাও করতে পারিনি। সেটা আজ থেকে পাঁচ বছর আগের ঘটনা। ওখানেই বাবার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমি চলে যাই মিশরে, বাবা চলে আসেন এশিয়াতে।'

'আপনার বাবা কী বাংলাদেশের কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন নাকি ভারতের?' ভুবন জানতে চাইল।

'বাবা কী নিয়ে কাজ করেছে আমার বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা ছিল না। আমি কখনো জানতেও চাইনি। তবে এখানে আরো একটা ব্যাপার আছে। আপনার প্রশ্নটা ঠিক আছে কিন্তু একটা বিষয় আপনাদের বুঝতে হবে। আমরা যারা প্রত্নতত্ত্ব কিংবা ইতিহাস নিয়ে কাজ করি তারা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী কিংবা সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করি। দেশ, বর্ডার, কাঁটাতার এসব ব্যাপার কিন্তু অনেক পরে এসেছে কাজেই এসব ব্যাপারে প্রায়ই দেখা যায় এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বিভিন্ন ধরনের সংযোগ থেকেই যায়। তো বাবা চলে এলেন এখানে। আমি মিশরে চলে গেলাম। মিশরে যাওয়ার পর ওখানে আমি ইন্টার্ন করি। ওখান থেকে মাস্টার্স করার আগেই এক প্রফেসরের অধীনে সরাসরি পিএইচডি করার সুযোগ পেয়ে কাজ শুরু করি। বাবার সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার বছর দুয়েক পরে হঠাৎ তার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যায় সিঙ্গাপুরে একটা কনফারেন্সে। বাবাও ওখানে পেপার প্রেজেন্ট করতে গিয়েছিলেন, আমিও,' বলে শশী একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ক্লান্তির বোঝা তার ওপরে চাপতে চাপতে আর নিতে পাচ্ছে না সে।

'আমাকে দেখেই বাবা ছুটে আসেন। কিন্তু আমি অনেকটা রাগ আর অভিমান নিয়ে তার প্রতি খুব একটা সহায় ছিলাম না। বাবা আমাকে দেখে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে এটা-ওটা অনেক কিছু জানতে চান। আমি হু-হা করে কাজ চালানোর মতো জবাব দিতে থাকি। এর ভেতরে এক পর্যায়ে বাবা আমাকে বলেন তারা যা খুঁজছিলেন সেটা খুঁজে পাবার প্রায় দ্বারপ্রান্তে আছে। কিছুদিনের ভেতরেই বাংলাদেশ আর ভারত সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলবেন। আমি মোটেই তেমন আগ্রহ নিয়ে কথা শুনিনি। আর তখন আমার প্রেজেন্টেশেনর সময় ঘনিয়ে আসছিল, আমি কোনোমতে বিদেয় নিয়ে চলে যাই। সেটাই ছিল বাবার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।'

'সেটা নিশ্চয়ই আজ থেকে বছর তিনেক আগে, তাইনা?' হাতের কড়ে হিসেব করতে করতে শারিয়ার জানতে চাইল।

শশী একটু অবাক হয়েই তার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কীভাবে?'

'কারণ এরপরেই উনি সম্ভবত ওই কনফারেন্স থেকে এসেই আমাদের অথরিটিকে একটা প্রস্তাব দেন। কী প্রস্তাব ছিল সেটা আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু ওই প্রস্তাবের পরেই তার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয় এবং এর কিছুদিন পরেই উনি লোকচক্ষুর অন্তরালে ডুব দেন,' শারিয়ার আনমনেই বলতে লাগল। কিছু একটা হিসেব করার চেষ্টা করছে সে। এই পর্যন্ত বলে সে আনমনেই একবার মাথা নাড়ল। 'আমার বিশ্বাস এই সময়টাতেই সবকিছু বদলে যেতে শুরু করে।'

'নাহ তারও খানিকটা আগে,' বলে শশী কাঁধ ঝাঁকালো। 'আমি এসবের কিছুই জানতাম না আসলে। তবে বাবার লাইসেন্স কেড়ে নেয়ার ব্যাপারটা শুনে বেশ কষ্ট পেয়েছিলাম। অনেকবার ভেবেও বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি সংকোচ আর দ্বিধার কারণে। কিন্তু সব দ্বিধা আর সংকোচ কাটিয়ে যখন বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করি ততক্ষণে উনি সম্ভবত লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেছেন। এরপরে আমি বহুবার বহুভাবে চেষ্টা করেছি বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করার কিন্তু কোনোভাবেই আর তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি,' শশীর চোখে পানি। 'একজন মানুষ ঠিক যত ভালো আর নিরীহ হতে পারেন ঠিক ততটাই গোয়ার হতে পারেন সেটা বাবাকে না দেখতে কোনোদিনই বুঝতে পারতাম না আমি। যাই হোক, বাবার সঙ্গে এতবার এতভাবে যোগাযোগ করেও আমি কিছুতেই তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি। আমার বিশ্বাস বাবা ইচ্ছে করেই এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে করে তাকে কেউ খুঁজে বের করতে না পারে। এরপরে বাবার কাছ থেকে আমি খবর পাই গত সপ্তাহে যখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাবার একটা পার্সেল এসে পৌঁছায়।'

'কী ছিল সেটাতে?' চাইলেও নিজের গলার চূড়ান্ত কৌতূহল দমাতে পারছে না শারিয়ার।

'একটা চিঠি যেটতে বিস্তারিত লেখা ছিল বাবার সবকিছু, শশী তাকিয়ে আছে শারিয়ারের দিকে। 'তার গবেষণা, তার প্রাপ্তি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু। সে গত কয়েক বছরে কী করেছে, কীভাবে করেছে, কী পেয়েছে সব,' বলে শশী নিজের গলার সঙ্গে আটকানো সেই বিচিত্র লকেটটা চেপে ধরে বলে উঠল। 'আর ছিল এই লকেটটা। আমি অনুমান করতে পারি বাবা আমাকে এটা পাঠিয়েছিল তার স্নেহ প্রকাশ করার জন্য। সে যে আমার ওপরে আর রাগ করে নেই সেটা বোঝানোর জন্য।'

'তার মানে আপনার বাবার গবেষণার বিস্তারিত সব সেই চিঠিতে ছিল। সেটা কী আছে আপনার কাছে?' শারিয়ার জানতে চাইল।

'নাহ, চিঠিটা আর নেই আমার কাছে। অপহরণের সময়ে ওটা আমার ব্যাগে ছিল। আর-'

'শারিয়ার ভাই, আমরা চলে এসেছি প্রায়,' সামনে থেকে সুমন বলে উঠল। 'ঠিকানাটা বলবে আরেকবার?'

'আমাকে বলো, এই এলাকা আমি খুব ভালো চিনি,' ভুবন কথাটা বলতেই শারিয়ার তাকে ঠিকানাটা বলল। ঠিকানা শুনতে শুনতে ভুবন জানালা দিয়ে বাইরে দেখছিল। সে ইশারায় সুমনকে বলে দিল কোনদিকে যেতে হবে। সুমন সেই নির্দেশনা অনুযায়ী একটা দোতলা ডুপ্লেক্স টাইপের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাতেই শারিয়ার নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ও গেটের কাছে এগোতেই দারোয়ান কিসিমের একজন মানুষ দৌড়ে এসে গেট খুলে দিল।

'আপনে শারিয়ার স্যার?' হাসিমুখে জানতে চাইল লোকটা। 'হামিদ স্যারে আমারে ফুন কইরা কইছে আপনে আসতাছেন।'

শারিয়ার তার সঙ্গে কথোপকথন বিনিময় করে গেটটা খুলে দিতে বলল। গাড়িটা গেটের ভেতরে ঢোকাতেই নেমে এলো সবাই।

'বাহ বাড়িটা তো সেইরকম,' ভুবন শিস দিতে দিতে বলে উঠল।

'শোন, কেয়ারটেকারকে বলা আছে। ও তোমাদের সবাইকে যার যার কামরা দেখিয়ে দেবে। সবাই ফ্রেশ হয়ে ঘুম দাও। ঘুম দিয়ে উঠে দুপুরে খেয়ে ডক্টর শশীর কাছ থেকে সব শুনে আমরা আমাদের আগামী পরিকল্পনা ঠিক করব। বোঝা গেছে?'

সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই শারিয়ার ফিরে তাকাল শশীর দিকে। 'ডক্টর শশী, আপনার ও ডক্টর আবদেলের অতীতটা আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি। এরপর সেই চিঠিতে কী ছিল আর সেদিন রাতে কী ঘটেছিল এই দিয়ে আমরা দুপুরের আলোচনা শুরু করব।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সায় জানাল শশী।

অধ্যায় ঊনচল্লিশ

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

জংলাটিলা, দক্ষিণ উপকূলের সাগর

'কই আমি তো কিছুই দেখতে পাই না,' চোখে দূরবীক্ষণটাকে ভালোভাবে চেপে ধরতে গিয়ে আরেকটু হলে শরীরের ভারসাম্য হারাতে বসেছিল কিরান। তীব্র বাতাসের শো শো শব্দের ভেতরেও কোনোমতে শরীরটাকে ঠিক করে আবারও সাবধানে চোখ রাখল দূরবীক্ষণের গোল অংশটাতে। সমগ্র মনোযোগের সঙ্গে সে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করছে জংলাটিলা আর তদসংলগ্ন সমুদ্র।

তীব্র স্রোতের ভেতরে জংলাটিলা যাওয়ার মোহনা পার হওয়ার পর খুব বেশি সময় যায়নি। জাহাজগুলো একে একে স্রোতধারা পার হয়ে আসার পর সেগুলোকে স্থির করে কিছুক্ষণের বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছে কিরান। কারণ একে তো সবার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে তার ওপরে আবার সামনে যেই মুহূর্তে শত্রুজাহাজ চোখে পড়বে সেই মুহূর্ত থেকে আবারও শুরু হয়ে যাবে যুদ্ধের তাণ্ডব। তাই ওর নাবিক থেকে শুরু করে যোদ্ধা সবার জন্য এটাই শেষ সুযোগ সামান্য খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম নেয়ার। কিরান জানে শত্রু সামনেই আছে। বাতাসে সে যুদ্ধ আর বিপদের গন্ধ টের পাচ্ছে পরিষ্কার।

সবাই যখন বিশ্রামরত সে উঠে এলো মাস্তুলের সঙ্গে আটকানো কাকের বাসাতে। মাস্তুলের ওপরে একটা ছোট খাঁচার মতো আটকানো থাকে, কেউ একজন সেটাতে বসে দূরে নজর রাখে, এটাকেই বলে কাকের বাসা। সেখানে বেদু আগে থেকেই ছিল, কিরান উঠে আসতেই সে কাকের বাসাতে কিরানের দাঁড়ানোর জন্য খানিকটা জায়গা খালি করে দিল। কিন্তু যতই চেপে দাঁড়াক, যেখানে একজনের জন্য দাঁড়ানো কঠিন সেখানে দুজন দাঁড়ানো কষ্টকর তো বটেই। তবুও কিরান চেপেচুপে দাঁড়াল।

কিরান দাঁড়াতেই বেদু দূরবীক্ষণটা ধরিয়ে দিল ওর হাতে। জানাল, সামনে সে পুরো জাহাজ দেখতে না পেলেও একটা জাহাজের মাস্তুলের খানিকটা অংশ একটু আগেই টিলাগুলোর ফাঁক দিয়ে ভেতরের দিকে এগোতে দেখেছে। কিন্তু তারপর থেকে চোখে দূরবীক্ষণ লাগিয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কিরান। 'তুই কী ঠিক দেখছিস?'

'আরে ঠিক মানে, এক শ বার ঠিক,' কিরানের পাশ থেকে কথা বলে ওঠা বেদুর গলার স্বর শুনে কিরান অনুমান করল কিছু একটা তো অবশ্যই দেখেছে সে। কিন্তু সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এই ব্যাপারটা তাকে খানিকটা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। দূরবীক্ষণ থেকে চোখ নামিয়ে কিরান ফিরে তাকাল নিজের জাহাজের দিকে। সেখানে কামাঞ্চি থেকে শুরু করে তীরন্দাজ, লাঠিয়াল আর বন্দুকবাজেরা সবাই গোল হয়ে বসে খাওয়া সেরে তামাক টানছে। জাহাজের পাটাতনের ওপরে স্তূপ করে রাখা আছে নানাবিধ যুদ্ধের উপকরণ। নিচের জাহাজের নিয়ন্ত্রণ চাকার কাছেই সে দেখতে পেল গোমেজ আর গোলন্দাজকে। দুজনেই ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। কিরান পেছন ফিরে দেখল পেছনের জাহাজগুলো বিকেলের পুকুরে ভাসতে থাকা হাঁসের মতো স্থির ভঙ্গিতে ভেসে অছে। কিরান জানে একরকম বলতে গেলে সবাই এই মুহূর্তে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। একবার যুদ্ধের নির্দেশনা আসামাত্রই ঠিক যেভাবে নিদের্শনা দেওয়া আছে ওরা সেভাবে কাজ শুরু করে দেবে। কিরানদের জাহাজে আছে কিরান, গোলন্দাজ, গোমেজ আর বেদু। সেই সঙ্গে যোদ্ধা আর মাল্লারা। কবি আলাওল, রহমত চাচা আর তার সঙ্গে থাকা পতিত লোকটাকে রাখা হয়েছে একেবারে পেছনের জাহাজে। কারণ ওখানেই তারা তূলনামূলকভাবে নিরাপদ থাকবে।

কিরানদের জাহাজের ঠিক পেছনের জাহাজের নেতৃত্বে আছে পট্টবর্ধন আর তার সঙ্গে বিল্লাল শেঠ আর বৈঠা। আর সবশেষ জাহাজে তুলারামের নেতৃত্বে আছে লাঠিয়াল আর বল্লমবাহিনী। ওদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণে দূরপাল্লার ভাগটা প্রথম জাহাজ থেকে দেখবে কিরান আর গোলন্দাজ। দ্বিতীয় জাহাজে রাখা হয়েছে সবচেয়ে দক্ষ জাহাজি পট্টবর্ধনকে, যাতে সে এই জাহাজটা দিয়ে শত্রু জাহাজের পথ আটকাতে পারে। আর তৃতীয় জাহাজে তুলারামের নেতৃত্বের বাহিনীর প্রায় পুরোটাই ব্যবহৃত হবে হাতাহাতি লড়াইয়ের জন্য।

কিরান পেছনের জাহাজগুলোকে দেখে নিয়ে একবার দিগন্তের সূর্যটা দেখে নিল। সন্ধ্যে হতে এখনো দেরি আছে কিন্তু খুব বেশি দেরি নেই। যা করার অন্ধকার নামার আগেই করতে হবে। দিনের আক্রমণ ভাগে ওরা সুবিধে পাবে। তাই যদি শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে ভালো অবস্থানে থাকতে চায় তবে আগে ওদের দিনের আলোতে আক্রমণ চালানোটাই সুবিধে হবে। আর সেটা করতে হলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিরান দিগন্তের সূর্যটাকে পরখ করে কোমরে ঝোলানো কম্পাসটাকে আরেকবার পরখ করে নিয়ে ভালোভাবে আবারও চোখ রাখল দূরবীক্ষণে। বীক্ষণটাকে সে ঠিক করল একেবারে টিলার অগ্রভাগে। তারপর সেখান থেকে একে একে জলপথ থেকে শুরু করে প্রতিটি টিলা পর্যন্ত পরখ করল তারপর নিজের দৃষ্টি এনে স্থির করল জংলাটিলা এলাকার মূল প্রবেশ পথে। সেখান থেকে যতদূর দৃষ্টি

চলে সে পরখ করল সেই সঙ্গে যতটা সম্ভব ভেতরের দিকে দেখার চেষ্টা চালাল। তারপর জলপথসংলগ্ন টিলার উপরিভাগ পরীক্ষা করতে লাগল মনোযোগের সঙ্গে। কোনো জাহাজের চিহ্নও নেই। কিন্তু যেখানে পুরনো বন্দর থাকার কথা সেখান থেকে সরু চিলতের মতে এক ফালি ধোঁয়া উঠে যেতে দেখল ওপরের দিকে।

মনে মনে খুশি হয়ে উঠল কিরান। বন্দরটাকে দেখতে না পেলেও ওখানে যে কিছু একটা আছে এবং তার প্রত্যাশা অনুযায়ী সম্ভবত সিলভেরার জাহাজ সেখানেই নোঙর ফেলেছে ব্যাপারটা অনুধাবন করে সে খুশি হয়ে উঠল। সম্ভবত বন্দরে থেমে ওরা নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আজ রাতের ভেতরেই তারা ওখানে ঘাঁটি গেড়ে সম্ভাব্য শত্রুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলবে। এরকমই সিদ্ধান্ত। কিরান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সে মাস্তুলের ফাঁকে আটকানো একটা পতাকা তুলে নিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে নাড়তে শুরু করল।

প্রথমেই কিরানের নাড়ানো পতাকাটা চোখে পড়ল নিচের পাটাতনে দাঁড়িয়ে থাকা গোলন্দাজের। মুহূর্তের জন্য বোকার মতো তাকিয়ে রইল গোলন্দাজ, তারপর হুঁশ হতেই সে নিজের হাতে ধরে থাকা পতাকাটা নাড়তে শুরু করল। পতাকা নাড়ার সঙ্গেসঙ্গে পাটাতনে উপবিষ্ট সকলেই হর্ষধ্বনি করে উঠল। জাহাজের নিচের অংশের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা চিৎকার করে যুদ্ধের ঘোষণার জানান দিয়ে দিল নিচের খোলের ভেতরে থাকা দাড়ি আর মাল্লাদেরকে। অন্যদিকে পাটাতনে উপবিষ্ট লোকগুলো যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিরান নিচের পাটাতনের উদ্দেশ্যে হাতের পতাকাটা নেড়ে নির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া শেষ করেই সে হাতের পতাকাটা তুলে পেছনের জাহাজের মাস্তুলের ওপরে উপবিষ্ট কাকের বাসায় বসা মানুষটার উদ্দেশে নাড়তে লাগল। নিজের হাতের পতাকাটা নাড়া শেষ হতেই কিরান অন্যহাতে ধরা দূরবীক্ষণটা তুলে দেখতে লাগল পেছনের জাহাজের কাকের বাসায় থাকা মনুষটাও একইভাবে ঠিক ওর মতো করেই পতাকাটা নিচের পাটাতনের উদ্দেশে নাড়ল। সঙ্গেসঙ্গে ওই জাহাজের পাটাতনে থাকা পট্টবর্ধন নিজের লোকদেরকে নির্দেশনা দেওয়া শুরু করতেই তার জাহাজের পাটাতেনরও একই তৎপরতা শুরু হয়ে গেল।

বেদুকে বাকি নির্দেশনা দেওয়ার পতাকাগুলো বুঝিয়ে দিয়ে জংলাটিলার দিকে নজর রাখতে বলে সে কাকের বাসা থেকে লাফ দিয়ে ধরে ফেলল পাশের একটা দড়ি। তারপর সেটা বেয়ে তড়তড়িয়ে নেমে এলো পাটাতনের ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটু হলেই সে পড়েই যেত। কোনোমতে একটা পিপে ধরে সামলে নিল নিজের ভারসাম্য। কারণ জাহাজের গতি বেড়ে গেছে আগের চেয়ে।

কিরান দেখল জাহাজের পাটাতনের ওপরে ওর নির্দেশ এবং জাহাজে যুদ্ধের স্বাভাবিক নিয়ম আনুযায়ীই কাজ চলছে পুরোদমে। এই জাহাজ থেকে যেহেতু

আক্রমণটা পরিচালিত হবে সামনের দিকে কাজেই, জাহাজের সামনের দিকের চোখা মাথাটার দুপাশে সারি দিয়ে চারটে করে আটটা কামান সাজানো হয়েছে। সেখানে গোলন্দাজ ব্যস্তভঙ্গিতে নির্দেশনা দিচ্ছে যোদ্ধাদের। যোদ্ধারাও তার নির্দেশনা অনুযায়ী কামানে গোলা ভরছে। কেউ আবার প্রতিটি কামানের পাশে সাজিয়ে রাখছে যথেষ্ট পরিমাণ গোলাবারুদ। আবার প্রতিটি কামানের পাশে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটা করে বারুদের পিপে। সেটার পাশে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে মশলা মাখানো ছোটোছোটো মশাল। আর মশালের পাশেই জ্বলন্ত কয়লার ঝাঁঝড়ি। কামাঞ্চিদের সারির পরেই কাজ করছে বন্দুকবাজদের দলটা। বন্ধুকবাজদের দলটাতে আছে কমপক্ষে দশ থেকে বারো জন। প্রথম আক্রমণ কামাঞ্চিরা সামলে নিলেও শত্রুজাহাজ কাছাকাছি হতেই শুরু হবে বন্দুকবাজদের কাজ। শুত্রুকে আওতার ভেতরে পাওয়ামাত্রই গুলি চালাবে এরা। আর বন্দুকবাজরা একবার গুলি করতেই বন্দুকে আবার টোটা ভরতে শুরু করতেই তাদের পেছন থেকে সামনে এগিয়ে যাবে তীরন্দাজদের দল। বন্দুকবাজরা যেমন নিজেদের বন্দুক ঠিক ঠাক করে টোটা ভরে বারুদ ঠেসে রাখবে। তীরন্দাজরা ঠিক তেমনি শেষ মুহূর্তে নিজেদের ধনুকে ছিলা পরিয়ে তীরের তূণীতে সজিয়ে রাখছে। আর এদের সবার পরে শত্রুজাহাজ যখন একেবারেই চলে আসবে সীমানার ভেতরে লড়াই শুরু হয়ে যাবে হাতে হাতে। এদের পেছন থেকে কোচ বল্লম আর তলোয়ার হাতে এগিয়ে যাবে লাঠিয়াল বাহিনী। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। তাদের মাঝে নির্দেশনা দিতে ব্যস্ত রঙ্গন মল্লিক। কিরানও গিয়ে হাত লাগাল সবার সঙ্গে।

কাজ খানিকটা গোছানো হয়ে যেতেই গোলন্দাজকে নিয়ে কিরান চলে এলো জাহাজের একেবারে সামনের অংশে। চোখে দূরবীক্ষণ লাগিয়ে জাহাজ দেখতে না পেলেও পরিষ্কার দেখতে পেল জাহাজ থেকে উঠতে থাকা ধোঁয়ার সারিটা আরো মোটা হয়েছে। সামনেই জংলাটিলা এলাকায় প্রবেশের পথ।

'কি মনে হয়, ওইটা দিয়া জাহাজ ঢুকতে কোনো সমস্যা হবে?' গোলন্দাজ জানতে চাইল। পরিশ্রমের চোটে তার মুখ লাল দেখাচ্ছে। নিজের কোমরের সঙ্গে ঝুলতে থাকা চামড়ার আরকের থলিটা তার দিকে এগিয়ে দিল কিরান। সঙ্গেসঙ্গে সেটা থেকে দু ঢোক খেয়ে নিয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছে সেটা আবার কিরানের দিকে এগিয়ে দিল গোলন্দাজ। আরকের শেষ বিন্দুটাও গলায় ঢেলে আবারও দূরবীক্ষণ তুলে নিল চোখে।

'কুনো সমস্যা হইবে না। এরকম জাহাজ দুইটা ঢুকতে পারব ওই রাস্তা দিয়া,' বলে কিরান চোখ নামিয়ে পাটাতনের তৎপরতা দেখে নিয়ে চিৎকার করে সবাইকে জলদি কাজ করার নির্দেশনা দিল। 'সমস্যা হবে অন্য জায়গায়,' সে গভীরভাবে তাকিয়ে আছে গোলন্দাজের চোখে। 'পুরনো বন্ধু, মনে আছে তো কী করতে হবে?'

গোলন্দাজও একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'অবশ্যই মনে আছে হে বন্ধু,' বলে সে নিজের হাতটাকে এগিয়ে দিল কিরানের দিকে। কিরান সেটাকে শক্ত করে ধরে একটা ঝাঁকি দিল। 'অনেক কিছুই তোমার ওপরে নির্ভর করছে। পুরনো দিন, পুরনো মানুষ, পুরনো প্রতিশোধ। এবার আর হারলে চলব না।'

'কোনোভাবেই হারলে চলবে না,' বলে সে হাতটা টেনে নিয়ে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরল কিরানকে। 'বুকের বলই আসল বল,' অস্ফুটে বলে উঠল সে।

'বুকের বলই আসল বল,' বলে কিরানও তাকে জড়িয়ে ধরে রইল কয়েক মুহূর্ত তারপর তাকে ছেড়েই ত্রস্ত পায়ে জাহাজের পাটাতনের ভেতর দিয়ে এগোল সামনের দিকে। 'জলদি জলদি,' যদিও কাজ প্রায় অনেকটাই সারা হয়ে গেছে তবুও সবাইকে আরেক দফা তাড়া লাগাল সে। তারপর গোলন্দাজকে নিয়ে জলদি এগোল জাহাজের সামনের অংশের দিকে। সে আর গোলন্দাজ মিলে ওখান থেকে পরিচালনা করবে একেবারে সম্মুখযুদ্ধটা। কাপ্তান সবসময়ই এভাবেই পরিচালনা করে যুদ্ধ। জাহাজের পাতাটন থেকে সিঁড়ি বেয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল কিরান আর গোলন্দাজ। জাহাজের পাটাতনের দিকে তাকিয়ে দেখল কাজ অনেকটাই শেষ হয়ে এসেছে। নিজের কামরার সামনে সাজানো জিনিসগুলো দেখে নিল সে এক পলক। নিজের কোমরে গুঁজে রাখা জোড়া পিস্তল। রেলিংয়ের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা বন্দুকসহ সবকিছু শেষবারের মতো পরীক্ষা করে নিল। তারপর অন্যপাশ থেকে অনেক লম্বা নলের একটা বন্দুক তুলে নিয়ে যত্নের সঙ্গে টোটা ভরল সেটাতে। তারপর সেটা এগিয়ে দিল গোলন্দাজের দিকে।

'তোমার জন্য বন্ধু, তোমার গ্রামের জন্য।'

জিনিসটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল গোলন্দাজ। তারপর মৃদু হেসে বলে উঠল, 'পুরনো দিনের জন্য, পুরনো দিনের মতোই।' বলে বন্দুকটাকে পরীক্ষা করে সেটাকে পিঠের ওপরে ঝুলিয়ে নিল। তারপর এক লাফে নেমে পড়ল পাটাতনে। চিৎকার করে নির্দেশনা দিতে লাগল নিজের লোকদের। কিরান আবারও তুলে নিল দূরবীক্ষণটা। জংলাটিলায় প্রবেশের পথটা প্রায় চলে এসেছে। আর কিছুক্ষণের ভেতরেই ওরা প্রবেশ করবে দুই সারি টিলার মাঝখানের প্রবেশপথের ভেতর দিয়ে। সেই সঙ্গে কিরান অনুমান করল, ওরা দৃশ্যমান হয়ে যাবে শত্রুর চোখে। আর তাই পরিকল্পনাও সেভাবেই মোকাবেলা করার।

ওরা প্রায় জংলাটিলার প্রবেশপথের কাছে চলে এসেছে। কিরান রেলিংয়ের পাশ থেকে একটা পতাকা তুলে বেদুর উদ্দেশ্যে শিস বাজাল। বেদু তাকাতেই সেটা নাড়তে শুরু করল সে। সেই সঙ্গে বেদু ওর উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে নিজের সামনে থেকে তুলে নিল একটা পতাকা। তারপর সেটাকে নাড়তে শুরু করল পেছনের জাহাজের উদ্দেশ্যে। এটা একটা সংকেত। বেদু ইশারা দেবার একটু পরেই সেই

সংকেত পৌঁছে গেল পেছনের দুই জাহাজে। সঙ্গেসঙ্গে কমে আসতে লাগল পেছনের দুই জাহাজের কোলাহল। পেছনে দুই জাহাজের উদ্দেশ্যে সংকেত পাঠিয়ে দিয়ে কিরান এবার নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে সবাইকে শান্ত হয়ে যেতে বলল। ওর নির্দেশ পাওয়ামাত্রই যে যার যার হাতের কাজ শেষ করে শুয়ে পড়ল জাহাজের পাটাতনের ওপরে। সেই সঙ্গে জাহাজের রেলিংয়ের একপাশ থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো কামানের মুখগুলো। বন্দুক তীর থেকে শুরু করে সমস্ত অস্ত্র নামিয়ে রাখা হলো পাটাতনের ওপরে।

কিরান মনোযোগ দিয়ে দেখছে সামনে। সবাই শুয়ে পড়ামাত্রই ওদের জাহাজটা ঢুকে পড়ল দুই সারি টিলার ভেতর দিয়ে। পুরো জাহাজটাকে যেন আধো অন্ধকার টিলার ভেতরের পথটা গহ্বরের মতো গিলে নিল। কিরান যদিও পাটাতনের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু জাহাজের পাটাতনের সবাই দূর থেকে দৃশ্যমান নয়। দূর থেকে যদি কেউ জাহাজের ওপরে নজর রেখেও থাকে তবুও চট করে কিছু ধরে ফেলতে পারবে না। যদিও এরকম জায়গায় শত্রুজাহাজ ছাড়া অন্য কারো থাকার কোনোই কারণ নেই তবুও দূর থেকে যদি কেউ দেখে তবু মহূর্তের জন্য দ্বিধা করবে। কারণ দূর থেকে দেখে জাহাজের অস্ত্র কিংবা প্রস্তুতি কিছুই সঠিকভাবে চোখে পড়বে না। আর এই সুযোগটাই নিতে চাইছে কিরান। কিন্তু শত্রুজাহাজ কোথায়? চোখে দূরবীক্ষণ লাগাল কিরান।

ওদের দুইপাশে পানি থেকে বরাবর সোজা ওপরে উঠে গেছে ঘাস আর লতাপাতায় ছাওয়া টিলা। সেগুলোকে ঢেকে রেখেছে মোটা ঘাসের জঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে স্বচ্ছ পানির ধারা। অনেকটা নদীর মতোই বলা চলে। কিরানদের জাহাজের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ওদের ঠিক পেছন পেছন বরাবর এগোচ্ছে আরো দুটো জাহাজ। কিরান নির্দেশনা দেয়ামাত্রই সেগুলো ছড়িয়ে দুইপাশে চলে যাবে পরিকল্পনামাফিক। কিন্তু কোনো জাহাজই তো চোখে পড়ছে না।

ওর সামনে একটা টিলা অনেকটাই নদীর ওপরে বাঁকা হয়ে ঝুলে থাকার মতো ঝুলে রয়েছে। কিরান দেখল গোমেজ টিলাটা দেখামাত্রই ত্রস্ত এবং অভ্যস্ত হাতে জাহাজের হালের চাকাটা ঘোরাতে শুরু করেছে। শেষ মুহূর্তে জাহাজটা বাঁক নিয়ে আবারও সোজা হয়ে গেল। পেছনের জাহাজগুলোও একই কাজ করল। তিনটা জাহাজই একেবারে নিঃশব্দে এক এক করে পেরিয়ে এলো বাঁকা টিলাটা।

আর বাঁকটা পার হতেই ওরা দেখতে পেল বাঁকের ওপাশে নদীটা আরো চওড়া হয়ে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। সেখানে গিয়ে মিলেছে আরো দুটো সমান্তরাল নদীর সঙ্গে। আর তিন দিকের সংযোগস্থলে দানবীয় বিভীষিকার মতোই দাঁড়িয়ে আছে পাল নামানো বিরাটাকায় একটা জাহাজ।

জাহাজটাকে দেখামাত্রই কিরানের অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো। মুহূর্তের জন্য মনে হলো সে বর্তমানে নেই, বরং সে ফিরে গেছে অতীতের কোনো এক সময়ে। সেই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সময়ে, চারপাশে শো শো করে ছুটছে তীর, বৃষ্টির মতো বর্ষিত হচ্ছে তীর। আর আগুনের উত্তাপে মনে হচ্ছে যেন চারপাশের পৃথিবী নিখাদ নরকে পরিণত হয়েছে। মুহূর্তের জন্য অতীতে হারিয়ে গেলেও পরমুহূর্তে সব হাওয়া হয়ে গেল চারপাশ থেকে। বরং একেবারে শান্ত পানিতে তরতর করে এগিয়ে যেতে থাকা নিঃশব্দ জাহাজ আর ঝির ঝির করে বইতে থাকা মৃদু হাওয়ায় কিরানের বুকের গহিন কোনে বেজে উঠল এক আনন্দ ঝংকার। না, এখনো সে বেঁচে আছে আর সময় এসেছে সেই পঙ্কিল অতীতকে মুছে ফেলে নতুন জীবনের সূচনা করার। কারণ সেই দুঃসহ অতীতের পাপের ছায়া মুছে ফেলার এটাই সুযোগ।

সামনের জাহাজটা বাঁক পেরুতেই কিরান পায়ের কাছ থেকে তুলে নিল একটা বিশেষ পতাকা, সেটা নেড়ে সংকেত দিল সে কাকের বাসায় বসা বেদুকে। সঙ্গেসঙ্গে বেদুও সেই পতাকাই নাড়তে শুরু করল। এই সংকেত পেছনের দুই জাহাজের জন্য। ওদের জাহাজটা সামনে এগোতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বাঁকের পুরোভাগটাকে আড়াল করে রাখবে। আর এই সুযোগে ওদের পেছনে থাকা জাহাজ দুটো সংকেত পাওয়া মাত্রই বাঁকের দুপাশের সেই জলধারাদুটো দিয়ে রওনা দিল দুদিকে। পেছনের জাহাজ দুটো দুদিকে চলে যেতেই কিরান ইশারা করল জাহাজের চাকায় হালের কাছে থাকা গোমেজকে উদ্দেশ্য করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গোমেজ জাহাজের নিয়ন্ত্রণ চাকাটাকে আরেকজনের হাতে ছেড়ে দিল। সংকেত পাঠানো খোলের ভেতরে থাকা মাল্লাদের উদ্দেশ্যে। সেই সঙ্গে একে একে নামিয়ে দেওয়া হলো পালগুলো। জাহাজ এখন প্রায় নিঃশব্দে এগোচ্ছে শত্রু জাহাজের দিকে। পাটাতনের নিচে হয়ে শুয়ে আছে সবাই। এগোতে এগোতে জাহাজের গতি কমে আসতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে।

শত্রুপক্ষের জাহাজটা ঠিক যেই মুহূর্তে ওরা দেখতে পেল কিরান দেখল প্রায় সঙ্গেসঙ্গে। জাহাজটাতে মৃদু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে জাহাজের পাটাতনের দিক থেকে বিশেষ একটা পতাকা হাতে নিয়ে নাড়তে শুরু করল ওদের উদ্দেশ্যে। সঙ্গেসঙ্গে গোলন্দাজ আর গোমেজ একসঙ্গে ফিরে তাকাল কিরানের দিকে। ক্ষুধার্ত শার্দুলের দৃষ্টি নিয়ে কিরান তাকিয়ে আছে সামনের জাহাজের দিকে। একটা হাত তুলে সে ওদেরকে শান্ত থাকতে বলল। কিরান মনে মনে গুনতে শুরু করল, এক..দুই..তিন..

জাহাজের গতি কমতে কমতে প্রায় স্থির হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। পায়ের কাছ থেকে সুপারিগাছের কাণ্ড চেঁছে বানানো একটা বেইদ তুলে নিল কিরান। সেটাকে দুইপাক ঘুরিয়ে ছুরে মারল গোমেজের দিকে। মুখে এক সূর্য পরিমাণ হাসি

নিয়ে গোমেজ দুই হাতে ধরে ফেলল সাদাটে বাদামি রঙের প্রায় সাত ফিট লম্বা চোখা লাঠির মতো জিনিসটা। কিরান হাতের ইশারা করতেই জাহাজের পাটাতনের ওপর দিয়ে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো ছুটল গোমেজ পাটাতনের শেষ প্রান্তের দিকে।

পাটাতনের ওপরে থাকা যোদ্ধাদের অনেকেই গড়িয়ে সরে গেল অথবা লাফিয়ে সরে পড়ল গোমেজকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। বেইদটাকে বর্শার মতো করে ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে গোমেজের গতি বাড়তে লাগল। দৌড়াতে দৌড়াতে সে শরীরটাকে বিশেষ একটা ভঙ্গিতে নিয়ে এলো। তারপর পাটাতনের একেবারে কিনারায় গিয়ে সর্বশক্তিতে ছুটন্ত ঈগলের মতো তার হাত থেকে ছুটে গেল বেইদটা। সময় যেন মুহূর্তের জন্য থমকে গেল।

জলের ওপরে ছায়া কেটে বাতাস ভেদ করে সময়কে তাক লাগিয়ে যেন ছুটে চলল জিনিসটা। তারপর অবিশ্বাস্য দূরত্ব পার করে সেটা গিয়ে সোজা বিঁধে গেল শত্রুজাহাজে পতাকা নাড়তে থাকা লোকটার বুকে। তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে শত্রুজাহাজের পাটাতনের ওপরে গেঁথে ফেলল মানুষটাকে। জাহাজে জাহাজে যুদ্ধের ঘোষণার বহু পুরনো রীতি এটা...

বেইদটা লোকটাকে বিদ্ধ করার সঙ্গেসঙ্গে কিরান চিৎকার করে উঠল, 'এক্ষণ...' ওদের জাহাজের পাটাতনের ওপর অবস্থান নেওয়া যোদ্ধারা রণহুংকার দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। মাটিয়ে শুইয়ে রাখা কামানের মুখগুলো তুলে ফেলা হলো পাটাতনের রেলিংয়ের ওপরে। গোলা আগে থেকে ভরাই ছিল স্রেফ আগুন দেওয়া হলো কামানগুলোতে। প্রায় কাছাকাছি সময়ে একইসঙ্গে দুই হালি কামান থেকে বর্ষিত অগ্নিকুণ্ড ছুটে গেল শত্রুজাহাজের দিকে। কিরান অনুভব করতে পারল, শত্রুজাহাজের দস্যুরা তাদের পতাকাওয়ালা সঙ্গীর মৃত্যুর ধামাকা পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠার আগেই দেখতে পেল এক ঝাঁক গোলা ছুটে আসছে তাদের দিকে। পড়িমরি করে ছুটল তারা। সবগুলো না হলেও বেশিরভাগ গোলা আছড়ে পড়ল জাহাজের ওপরে আর না জাহাজসংলগ্ন পানিতে। চিৎকার চেঁচামেচি আর আহাজারির ভেতরেই কিরান দেখল ছুটোছুটি করতে শুরু করেছে দস্যুরা।

তবে সে জানে ওরাও দক্ষ যোদ্ধা, এরকম পরিস্থিতিতে আগেও পড়েছে ওরা। কাজেই খুব দ্রুতই ধাক্কা কাটিয়ে উঠে প্রতিরোধ করে উঠবে লোকগুলো। তবে তার আগেই মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে হবে এদের। প্রথম দফা কামানের গোলা বর্ষিত হতেই কামাঞ্চিরা আবার গোলা ভরতে শুরু করেছে গোলন্দাজের নির্দেশে। কামাঞ্চিদের পেছন থেকে সামনে এগিয়ে গেল বন্দুকধারীরা। প্রায় একসঙ্গে এক ডজনের বেশ লোক গুলি চালাল শত্রুজাহাজের ওপরে। কিরান আবারও চিৎকার করে আক্রমণ করার নির্দেশ দিল। এবার বন্দুকবাজদের পেছনে গোলা ভরতে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল তীরন্দাজরা। কামানের গোলা আর বন্দুকের গুলির বর্ষণে মৌমাছির ঝাঁকের মতো ছুটে গেল এক ঝাঁক তীর।

ততক্ষণে গোমেজ ফিরে এসে হাল ধরেছে আবার। সেই সঙ্গে কিরান দেখল রঙ্গনের নির্দেশে গোলা ভরা শেষ হতেই আবারও কামান চালানো শুরু করেছে কামাঞ্চিরা। কিন্তু এর ভেতরেও অপর দিককার জাহাজ থেকে ছুটে এলো কামানের গোলা। তিনচারটে কামানের গোলা ছুটে এসে উড়িয়ে দিল পাটাতনের একাংশ আর আশেপাশের পানির ওপরে পড়ল বাকিগুলো। কিরান লাফিয়ে নেমে এলো পাটাতনের ওপরে গোমেজকে পূর্ণ বেগে জাহাজ ছোটাতে বলে, সে চলে এলো গোলন্দাজের পাশে। কামাঞ্চিদের হুংকার, রণচিৎকার গুলির শব্দ আর ওপর দিক থেকে ছুটে আসা গোলার শব্দে নরকে পরিণত হয়েছে একটু আগের শান্ত জল উপত্যকা।

'আবার আবার,' চিৎকার করে উঠল কিরান। তার চিৎকার চাপা পড়ে গেল তৃতীয় দফা গোলা আর বন্দুকের গুলির শব্দে। কিরান পাটাতনের কিনারায় এসে হন্যে হয়ে চোখ বুলাতে শুরু করল সামনের জাহাজে। ওখানে পাটাতনের ওপর থেকে কামান দাগা শুরু হচ্ছে। বন্দুকের গুলিও করছে অনেকেই। কিন্তু ওই জাহাজের সমন্বয়হীনতার কারণে অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। কিরান হন্যে হয়ে চোখ বুলাচ্ছে সিলভেরাকে চোখে পড়ে কিনা দেখার জন্য। কিন্তু তার ছায়াও দেখতে পেল না সে। এমন সময় সামনের জাহাজটা নড়ে উঠল। ভেতরে ভেতরে তীব্র আর শক্তিশালী এক বিজয়োল্লাসের সঙ্গে কিরান অনুভব করল, ওটা পিছু হটতে শুরু করেছে।

আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে কিরানের জাহাজের লোকেরা আক্রমণের জোর বাড়িয়ে দিল আরও। চিৎকার করে আবারও অগ্নিবর্ষণ করার নির্দেশ দিল গোলন্দাজ। তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ভূতে পেয়েছে। কিন্তু কিরান জানে এই বিজয়ের কোনো দাম থাকবে না যদি সাপের মাথাটা কাটতে না পারে। অর্থাৎ সিলভেরাকে হত্যা করতে না পারে।

কিরান চিৎকার করে গোমেজকে বলল জাহাজের গতি আরো বাড়িয়ে দিতে। অপর জাহাজটা এখন বন্দর ছেড়ে পেছনের মোহনার দিকে যেতে শুরু করেছে। কিরান দেখল ওটা থেকে এখন কামানের গোলা আসাও বন্ধ হয়ে গেছে। তারমানে সিলভেরা জাহাজটাকে নিয়ে হয় পালাতে চাইছে, আর না হয় সে পিছু হটে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে আক্রমণ করার তালে আছে। সিলভেরার জাহাজটা আরেকটু পিছিয়ে যেতেই কাঠের সঙ্গে কাঠের মর্মর ধ্বনিতে ভারী হয়ে উঠল বিকেলের বাতাস। উল্লাসের সঙ্গে কিরান দেখতে পেল অপর দিকের মোহনায় পৌছবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে সিলভেলার জাহাজের। কারণ ওদের অন্য দুটো জাহাজ ভিন্ন দিক থেকে এসে পলায়নরত জাহাজটার পথটা রুদ্ধ করে ফেলেছে। কিরান জাহাজের গতি আরো বাড়িয়ে দিতে বলল। পেছন থেকে পট্টবর্ধনের জাহাজ

তো পালাবার পথ আটকে দিয়েছিলই, অপর পাশ থেকে তৃতীয় জাহাজটাও বাড় মারল ওটার একপাশে। আবারও কাঠের সঙ্গে কাঠের সংঘর্ষের শব্দে ভারি হয়ে উঠল বাতাস। আর তিন জাহাজ থেকেই আনন্দধ্বনি ভেসে এলো।

কিরান আরো জোরে জাহাজ ছোটাতে বলে গোলন্দাজকে ডাকতে যাবে তার আগেই শত্রুজাহাজের পাটাতনের ওপরে হালের কছেই একটা বিরাটকায় মূর্তিকে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। উল্টোদিক থেকে আসা অস্তমিত সূর্যের আবছা আলোতে সে দেখতে পেল, মানুষটার মাথার চারপাশে উড়ছে ধোঁয়া, আর একটা হাত কোমরে রেখে সে দাঁড়িয়ে আছে।

'সিলভেরা,' অস্ফুটে বলে উঠল কিরান। 'গোলন্দাজ, সময় এসে গেছে।'

উন্মাদের মতো নিজের লোকদের একের পর এক আক্রমণের নির্দেশ দিচ্ছিল গোলন্দাজ। কিরানের ডাক শুনেই সে পাটাতনের ওপরে শুইয়ে রাখা নিজের বন্দুকটা তুলে নিয়ে দৌড়ে চলে এলো কিরানের পাশে। 'সিলভেরা,' অস্ফুটে অপর জাহাজে থাকা ছায়াটা দেখিয়ে বলে উঠল কিরান। গোলন্দাজ বন্দুকটাকে জাহাজের রেলিংয়ের ওপরে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, আর একটা হাত তলোয়ারের বাটে রেখে পেছন ফিরে গোমেজদের দিকে একবার ইশারা করে কিরান প্রস্তুত হয়ে গেল। ওদের জাহাজ প্রায় শত্রু জাহাজের কাছাকাছি চলে এসেছে। কিরানের পেছনে অন্তত বিশ জন যোদ্ধা তলোয়ার, বর্শা, কোচ আর অন্যান্য দেশি অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত।

'গোলন্দাজ, এক্ষণ।'

বন্দুকটা কাঁধে চেপে গোলন্দাজ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। পাশেই তলোয়ারের বাটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে কিরান। গোলন্দাজের গুলি ছুটে যেতে না দেখলেও শব্দের চোটে কানে তালা লেগে এলো ওর। সেই সঙ্গে ওদের জাহজাটা গিয়ে ধাক্কা মারল শুত্রুজাহাজে। কিরান আবছাভাবে দেখতে পেল পাটাতনের ওপরে সিলভেরার বিরাট মূর্তিটা পড়ে গেল। উল্লাস ধ্বনির সঙ্গে তলোয়ারের বাটে হাত রেখে সে পালের একটা দড়ি ধরে সরাসরি আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে দড়িতে ঝুলে রওনা দিল শত্রুজাহাজের দিকে। দড়িটাতে ঝুলে শূন্যে উড়াল দিয়ে নেমে এলো জাহাজের পাটাতনের ওপরে।

পাটাতনের ওপরে এক গড়ান দিয়েই খোলা তলোয়ার হাতে সোজা হলো সে। ওর পেছনে পেছনে শত্রুজাহাজে নেমে এসেছে আরো অন্তত বিশজন যোদ্ধা। পাটাতনের ওপরে থাকা সবাইকে একে একে কচুকাটা করতে লাগল ওরা। উল্টোদিকে তাকিয়ে দেখল ওদের বাকি দুটো জাহাজ থেকেও গুলি ছোঁড়া হচ্ছে এদিকে। কিন্তু নির্দেশনা অনুযায়ী সরাসরি কেউ আক্রমণ চালায়নি।

কিরান টুকরো কয়েকটা আক্রমণ ফিরিয়েই দৌড় দিল হালের দিকে। পাশ থেকে আবছা অন্ধকারে হালকাভাবে দেখতে পেল হালের ঘুরন্ত চাকার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সিলভেরা। পাটাতনের ওপরে দাঁড়িয়েই দৌড় দিল সে। একটা

রেলিং টপকে শূন্যে লাফিয়ে পড়ে খোলা তলোয়ারটাকে দুই হাতে ধরে সেটাকে নিয়ে সোজা বসিয়ে দিল হাঁটু গেড়ে বসে থাকা মানুষটার বুকে। ভেবেছিল ছুটন্ত অবস্থাতেই দুয়েকটা গুলি ছুটে আসবে। কিংবা ও তলোয়ার চালানোর আগেই হাঁটু গেড়ে বসে থাকা সিলভেরা সেটা আটকে দেবে।কিন্তু সেটা তো হলোই না, বরং ওর তলোয়ারটা বুকে নিয়ে গড়িয়ে পাটাতনের ওপরে গেল মানুষটা। স্বস্তির সঙ্গে নিজের পায়ের ওপরে সোজা হলো কিরান। তারপর পায়ের ডগা দিয়ে সোজা করল অমানুষটাকে।

সঙ্গেসঙ্গে চমকে উঠল সে। যে মানুষটা পাটাতনের ওপরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সে বিশালাকায় কিন্তু অবশ্যই সে সিলভেরা নয়। কারণ যে পড়ে পাটাতনের ওপরে রক্তে ভেসে যাওয়া বুক নিয়ে সে এদেশীয় মানুষ, বাদামি চামড়ার মানুষ। মানুষটার দিকে তাকিয়ে চূড়ান্ত হতাশ হয়ে কিরান কী করবে মুহূর্তের জন্য বুঝতে পারল না। সে অবাক হয়ে ফিরে তাকাল নিজের জাহাজের দিকে। বুঝতে পারছে না, আসলে হলো টা কী।

এমন সময় বন্দরের কাছের ছোটো টিলার ওপর থেকে একসঙ্গে এক ঝাঁক কামানের গোলা ছুটে এলো ওদের জাহাজের দিকে। সেই সঙ্গে বন্দরের পেছনের দেখা গেল একটা জাহাজের কোনা। আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা জাহাজটা সোজা এসে বাড়ি মারল কিরানদের জাহাজে। সেই সঙ্গে ওপর দিক থেকে ভেসে আসা রণহুংকার শুনে কিরানরা ফিরে তাকাল ওপরের দিকে। টিলার ওপর থেকে দড়ি বেয়ে নেমে এসে ঝাঁকে ঝাঁকে দস্যুরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওদের দুটো জাহাজের ওপরেই। কিরান চিৎকার করে আক্রমণের নির্দেশ দিতে যাবে তার আগেই বুকের বর্মের ওপরে গুলি খেয়ে পড়ে গেল সে পাটাতনের ওপরে।

যদিও বুকের সঙ্গে বর্ম আটকানো আছে। কিন্তু গুলির তীব্র ধাক্কায় বুকের বাতাস সব বেরিয়ে গেছে। কোনোমতে পাটাতনের ওপর সোজা হলো সে। সেইসঙ্গে সিঁড়ির ওপরে পায়ের আওয়াজ শুনে সে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল। কাপ্তানের যেখানে থাকার কথা সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে বিরাটাকায় একজন মানুষ। মানুষটার এক হাতে বিরাট একটা তলোয়ার আর অন্যহাতে একটা লম্বা নলের পিস্তল।

'সিলভেরা,' লোকটার বুদ্ধির কাছে কীভাবে বোকা বনেছে সেটা ভেবে মুহূর্তেই রাগের হলকা বয়ে গেল কিরানের শরীরে। তলোয়ারটা ছুটে গেছে হাত থেকে। কোমর থেকে ড্যাগারটা বের করার জন্য হাতলটা ধরতেই যমদূতের মতোই তার সামনে উদয় হলো সিলভেরা। একটা পা দিয়ে সে চেপে ধরল কিরানের হাত। অন্যহাতে কিরান বের করে আনল নিজের পিস্তলটা। কিন্তু ছোটো বাচ্চাদের হাত থেকে খেলনা কেড়ে নেওয়ার জন্য বড়োরা যেভাবে তাদের হাত চেপে ধরে সেভাবে কিরানের হাত চেপে ধরে শিশুর মতোই তাকে টেনে শূন্যে তুলে ফেলল সিলভেরা।

কিরন দেখল যুদ্ধেও ভেতরেও সিলভেরার মুখে পাইপ। সেটা থেকে ধোঁয়া উড়ছে। মুখভর্তি চুল-দাঁড়ির জঙ্গলের ভেতর থেকে টকটকে লাল শান্ত এক জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কিরান অবাক হয়ে দেখল লোকটার চোখে কোনো ভাষা নেই। একেবারেই নির্লিপ্ত তার দৃষ্টি। এমনকি তাতে শত্রুকে বুদ্ধিতে হারিয়ে দেওয়ার আনন্দও নেই। কিরানকে শূন্যে তুলে সে বাচ্চাদের মতোই ছুঁড়ে ফেলে দিল পাটাতনের ওপরে।

কিরানের মনে হলো ওর ঘাড় ভেঙে গেছে। কোনোমতে উল্টো থেকে সোজা হলো সে। তার মনে এমনকি হেরে যাবার গ্লানিও কাজ করছে না। সে একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখল তার জাহাজ আর সিলভেরার জাহাজের ওপর চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। অন্য জাহাজ দুটোর অবস্থা কী হলো কে জানে। তবে কিরান এসব কিছুই ভাবছে না। তার মনে একটাই ভাবনা, তাকে সোজা হতে হবে। কোনোমতে সোজা হয়ে হেলান দিয়ে বসল সে রেলিংয়ে। পাশেই একটা পিস্তল পড়ে থাকতে দেখে সেটা তুলে নিয়ে গুলি করল এগোতে থাকা সিলভেরার দিকে। কিন্তু খালি পিস্তলটা থেকে গুলি বেরুল না।

কিরান দেখল সিলভেরা আগের মতো নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কিরান খালি পিস্তলটা ছুড়ে মারল সিলভেরার দিকে। মাছি তাড়ানোর মতো করে সেটা সরিয়ে দিল সে। বদলে একহাতে চেপে ধরল কিরানের মাথার চুল। অন্যহাতে নিজের বিরাট তলোয়ারটা তুলে ধরল।

কিরান বুঝল সময় ফুরিয়ে এসেছে, সব খেলা সাঙ্গ হতে চলেছে। একবার ডানে তাকাল সে। কেন নিজেও জানেনা। কিন্তু সেদিকে তাকাতেই সে দেখতে পেল ওদের দিকে ছুটে আসছে একটা ক্ষিপ্ত ষাঁড়। সিলভেরাও শেষ মুহূর্তে কিছু একটা টের পেয়ে সেদিকে তাকাল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে দুজনকেই একসঙ্গে ধাক্কা মারল গোমেজ।

তীব্র ধাক্কার চোটে সিলভেরা একদিকে আর কিরান আরেকদিকে পড়ে গেল। পাটতনে পড়ে থাকা কিরানকে জড়িয়ে ধরে তুলে ফেলল গোমেজ। সিলভেরা পাটাতনে পড়ে থাকা অবস্থাতেই পিস্তল তাক করল ওদের দিকে। প্রায় একই সময়ে একটা গোলার আঘাতে জাহাজের রেলিংয়ের একটা অংশ উড়ে গেল। কিরান আর তাকে ধরে থাকা গোমেজ দুজনেই পড়ে গেল পানিতে।

কিরান অনুভব করল কালো চাদরের চেয়ে ততোধিক অন্ধকার নোনা পানি ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিতে লাগল তাকে।

অধ্যায় চল্লিশ

বর্তমান সময়

শুক্রাবাদ, চট্টগ্রাম

'হ্যাঁলো হামিদ চাচা, শুনতে পাচ্ছো আমার 'কথা?' শারিয়ার বিছানা থেকে মোবাইলটা তুলে নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। কিন্তু কথা পরিষ্কার বোঝা না যাওয়াতে গায়ের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে শুধু পাজামা পরা অবস্থাতেই মোবাইলটা হাতে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো ও। 'হ্যাঁ চাচা, এখন সব ঠিক আছে... কী আর করা বলেন, আমি কী চেয়েছিলাম... না না কোনো অবস্থাতেই আমার চাচাকে জানাবেন না। আমরা সবাই আছি এখানে, আজ বিকেল থেকে কাজ শুরু করব। সবাই এখন বিশ্রামে আছে। ঠিক আছে, এই নম্বরটাই তাহলে থাক। তুমি যোগাযোগ করোনা। কোনো প্রয়োজন হলে আমিই যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে। ঠিক আছে, আর হ্যাঁ হামিদ চ
াচা তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে তুমি সাপোর্ট না দিলে আসলে... আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে,' বলে হাসতে হাসতে শারিয়ার ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল লম্বা ঝুল বারান্দাটার একেবারে উল্টোদিকের একটা দোলনাতে চায়ের কাপ হাতে বসে আছে ডক্টর শশী ।

খালি গায়ে থাকার কারণে শারিয়ার খানিকটা অস্বস্তি বোধ করল। তবুও একটা হাত তুলে সে বলে উঠল, 'আপনি ঘুমাননি?'

শশী চায়ের কাপে মৃদু চুমুক দিয়ে শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ঘুমিয়েছিলাম কিন্তু অতি ক্ষুধায় যেমন বেশি খাওয়া যায় না ঠিক তেমনি অতি ক্লান্তিতেও অনেক সময় বেশি ঘুমানো যায় না,' বলে সে শারিয়ারে দিকে হাতের চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিল। 'আপনাদের কেয়ারটেকারের স্ত্রী চা-টা অসাধারণ বানায়।'

শারিয়ার খানিকটা দ্বিধা করছে দেখে সে হাত নেড়ে বলে উঠল, 'এত লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। খালি গায়ের মানুষ আমি জীবনে বহু দেখেছি। তবে আপনার শরীরের পুরনো সব কাটাকুটি দেখে অনুমান করতে পারছি কাল রাতে আমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আপনি যে পাগলামি করেছেন এরকম পাগলামি আগেও বহুবার করেছেন।'

শারিয়ার হেসে উঠে একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়ল শশীর সামনে। তারপর বাড়িয়ে ধরা চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে তাতে চুমুক দিয়ে আনমনে মাথা নাড়ল। 'আমি ঠিক চা-কফি এসবের ভক্ত নই। তবুও ভালো লাগল খেতে। আমি আসলে চা-কফি খাই সিগারেট খাবার জন্য ওগুলো খেলে পরে বিড়ি খেতে ভালো লাগে সেকারণেই খাওয়া।'

'এই বাড়িটা কী আপনার?' শশী বাড়িটা ইশারায় দেখিয়ে জানতে চাইল। 'এমন এলাকায় এরকম একটা বাড়ি থাকাটা দারুণ একটা ব্যাপার, তাইনা?'

শারিয়ার চায়ের কাপে আরেকটা চুমুক দিয়ে আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল। 'বাড়িটা ঠিক আমার না। দারুণ ব্যাপার বলছেন! আমি তো আজকের আগে জানতামই না যে এরকম একটা বাড়ি আছে আমাদের?' বলে সে চায়ের কাপটা ফেরত দিল শশীকে।

'নিজেদের এরকম একটা বাড়ি আছে জানেনই না। আপনারা কী অনেক বড়োলোক নাকি?'

শারিয়ার হেসে উঠল শশীর প্রশ্ন শুনে। 'অনেক বড়োলোক কি না, কিংবা কত সম্পদ আছে আমাদের সেসব আমি জানি না। জানার প্রয়োজনও বোধ করিনি কোনদিন। তবে হ্যাঁ, আমাদের পরিবার দেশের সেরা সম্পদশালী পরিবারগুলোর ভেতরে একটা হবে মনে হয়।'

শশীর চোখের দৃষ্টি অবাক থেকে অবাকতর হচ্ছে। 'তাহলে আপনি পুলিশের চাকরি করেন কোনো দুঃখে?'

'পরিবারের সম্পদ তো পরিবারের। আমার নিজের অর্জন হলো একান্তই আমার। আমার কী আছে কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে আমি কী পেয়েছি সেটার চেয়ে বড়ো কথা হলো আমি নিজে কী অর্জন করতে পেরেছি নিজের যোগ্যতা দিয়ে। আসলে,' শারিয়ার ফিরে তাকাল সামনের খোলা দিগন্তের দিকে। 'এগুলোও ব্যাপার না। আমি আসলে এতকিছু ভাবিওনি। আমি হলাম অনেকটা পাগলা ঘোড়ার মতো। ছুটে চলেছি আর ছুটে চলেছি সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে। কিন্তু কীসের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছি ঠিক নিজেও জানিনা। আর তাই কীসের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছি সেটা বোঝারও চেষ্টা করি না এখন। বরং ছুটে চলাটাই জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে গেছে।'

'মনের গহিন কোনে আমরা সবাই খানিকটা ওরকমই। কেউ কেউ আপনার মতো ছুটে চলতে পারে, আর কেউ কেউ পরিবার সমাজ দায়িত্ব আর দায়বদ্ধতার বন্ধনে বাঁধা পড়ে। এই যা পার্থক্য,' শশীর গলায় অনেকটা স্বগোতোক্তির সুর। 'মূল কথা হলো তাড়না, কিসের এক তাড়নায় যেন ছুটে চলেছি আমরা পুরো মনুষ্য সমাজ। সময় থেকে সময়, যৌবন থেকে বার্ধক্যে সবাই ছুটেই চলেছে। হয়তো আপনার মতো আসলে আমরা কেউই জানি না, কেন ছুটে চলেছি সবাই।'

'তবে আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছি। এই কাজটা আমি উপভোগ করি। এই পেশায় উত্তেজনা আছে, ঝুঁকি আছে। সব চেয়ে বড়ো কথা কখনো কখনো তদন্তে নেমে কোনো একটা জটিল কেস এনালিসিস শুরু করি তখন সেটার কোনো তুলনা নেই। বলতে পারেন এটাই আমার তাড়না,' বলে শারিয়ার শশীর বাদামি চোখের গভীরে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'আপনার তাড়নাটা কী?'

শশী ওর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই বারান্দার দরজার কাছ থেকে কেয়ারটেকার বলে উঠল, 'স্যার, বেলা তো অনেক অইলো, খাবার দিয়া দিমুনি?'

শারিয়ার তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মোবাইলে সময় দেখল। বেলা প্রায় তিনটে বাজতে চলেছে। 'এক কাজ করো, আগে সবাইকে ডাকো। একেবারে ফ্রেশ হয়ে ডায়নিং রুমে আসতে বলো। তারপর খাবার দাও,' বলে শশীর দিকে ফিরে বলে উঠল, 'দেখা হচ্ছে তাহলে খাবার টেবিলে,' বলে নিজের জন্য বরাদ্দ কামরায় চলে এলো শারিয়ার। সময় নিয়ে গোসল সেরে কাপড় পাল্টে ডায়নিং রুমে এসে দেখল প্রায় সবাই পৌঁছে গেছে। ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল সবাই।

'সুমন কোথায়?' সুমনকে কোথাও না দেখে জানতে চাইলে শারিয়ার। 'খেতে খেতেই আমরা আলোচনা সেরে নেব। টমি, তুই সুমনকে ডেকে নিয়ে আয়।'

কিছুক্ষণের ভেতরেই সবাই খাবার টেবিল জড়ো হতেই খেতে খেতে অলোচনা চালিয়ে গেল ওরা। সবার আগে কথা বলে উঠল শারিয়ারই। 'সবাইকে এখন মোটামুটি মানুষ দেখাচ্ছে আগের চেয়ে,' শারিয়ার দেখল অন্তত কিছুটা বিশ্রাম পাওয়াতে সবার চেহারা খানিকটা হলেও ফ্রেশ দেখাচ্ছে এখন। তবে সবার পরনে বাড়িতে যেসব ছিল সেসব উল্টোপাল্টা পোশাক পরাতে সবাইকে বেঢপ দেখাচ্ছে।

সবচেয়ে অদ্ভুত লাগছে টমিকে। বিশাল সাইজের একটা ফতুয়ার মতো কিছু একটা পরেছে সে। সেটাতে তাকে লাগছে ম্যাক্সিপরা মধ্যবয়স্ক কোনো মহিলার মতো। 'বাহ, টমি তোকে তো ম্যাক্সিটায় মানিয়েছে বেশ,' কথাটা বলতেই সবাই হেসে উঠল।

'সবাই মন দিয়ে শোন যা বলি। আমরা আমাদের আলোচনা ডক্টর শশীর বাবা মানে ডক্টর আবদেলের পাঠানো চিঠি থেকে শুরু করব। কিন্তু সেটার আগে আমি দুয়েকটা কথা বলে নেই। এই বাড়িতে এই মুহূর্তে আমরা একদম নিরাপদ আছি। কিন্তু কতক্ষণ থাকতে পারব সেটার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ এই বাড়ির সন্ধান পুলিশ কিংবা অন্য কারো জন্য জানাটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আমাদের সেই নীল মাইক্রো লুকিয়ে ফেলা হয়েছে গ্যারেজে। এর বদলে এখন থেকে আমরা সাদা একটা এসইউভি ব্যবহার করব। সেই সঙ্গে আমার কাছে একটা মোবাইল আছে, আমি চাচ্ছিনা এটা বাদে অন্য কারো কাছে কোনো যোগাযোগের ব্যবস্থা থাক। আর

হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম। এই বাড়ি যেহেতু অথরিটি কিংবা শত্রুপক্ষের জন্য বের করাটা অত কঠিন নয় কাজেই এখানে আমরা খুব বেশি সময় অপেক্ষা করব না। বড়োজোড় আজকের রাতটা এখানে কাটাব। এরপরে আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে,' খাবার প্লেটে তুলে নিতে নিতে শারিয়ার বলে উঠল। 'আমার মনে হয় এখন আমরা ডক্টর শশীর বক্তব্য শুনতে পারি। শশী আপনি বলুন আপনার বাবার চিঠিতে কী ছিল এবং এরপরে আপনি দেশে আসার পর কী হলো?'

শশী খেতে খেতেই কথা চালিয়ে যেতে লাগল। 'আগেই বলেছি আমার বাবাকে আমি গত বেশ কিছু দিন যোগাযোগের চেষ্টা করে বাদ দিয়েছিলাম এরপরে প্রায় তিনবছর বাবার সঙ্গে যোগোযোগ নেই। তাই তিন বছর পর হঠাৎ যখন বাবার পার্সেল আমার অফিসে পৌঁছাল স্বাভাবিকভাবেই আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। তো বাবার চিঠি খুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে বিস্তারিত জানতে পারল, বাবা আসলে কী নিয়ে গবেষণা করছিল,' এইটুকু বলে সে একটু থেমে একেবারেই আচমকা জানতে চাইল, আপনারা জলদস্যুদের ব্যাপারে কী জানেন?'

'অবশ্যই জানি,' অন্য কেউ জবাব দেয়ার আগে টমিই বলে উঠল টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে। 'পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান আমার ফেভারেট সিনেমা ফ্র্যাঞ্চাইজগুলোর একটা। উফফ জনি ডেপ যা...'

'আমি ক্যারিবিয়ানের পাইরেটস নয় বরং আমাদের এই বাঙ্গাল মুল্লুকের পাইরেটস বা জলদস্যুদের ব্যাপারে জানতে চাইছিলাম। আপনাদের কারো আইডিয়া আছে বাঙাল মুল্লুকের ঐতিহাসিক জলদস্যুদের ব্যাপারে?'

'বাঙাল মুল্লুকে আবার জলদস্যু আছে নাকি?' ভুবন মুখভর্তি খাবার নিয়ে বলে উঠল। 'ভূমিদস্যু আছে জানতাম। কিন্তু জলদস্যু আছে, সে তো জানতাম না।'

শশী হেসে উঠল তার কথা শুনে। 'কেন মগ জলদস্যুদের কথা শোনেননি? ঢাকার মগবাজার তো মগ জলদস্যুদের নামেই।'

'তাই নাকি এটা তো জানতাম না। মগবাজার কে না চেনে, কিন্তু এটা যে মগ জলদস্যুদের নামে সেটা তো জানতাম না,' এবার শারিয়ার কথা বলে উঠল। 'তো ওরা কী ওখানে জলদস্যুগিরি করত নাকি?' তার গলায় খানিকটা টিটকিরির সুর।

'আপনাদের সবার জ্ঞাতার্থে বসতে চাই, মগবাজার জায়গাটা মগ জলদস্যুদের নামেই নামকরণ করা হয়েছে,' বলে সে শারিয়ারের দিকে একটা চামচ তাক করে বলে উঠল, 'মগরা ওখানে জলদস্যুগিরি করত না। কিন্তু ওদের একটা অংশকে জলদস্যুগিরি থেকে মাফ করে ঢাকার ওই বিশেষ এলাকায় পুনর্বাসন করা হয়েছিল। যেকারণে ওরা ওখানে বাস করত। আর বর্তমানে যেখানে মগবাজার সেখানে ওদের বিরাট একটা বাজার ছিল ওদের বাজারের নামেই এলাকাটার নামকরণ হয়েছে মগবাজার।'

'তা এই মগদের সঙ্গে তোমার বাবার কী সম্পর্ক?' শারিয়ার প্রশ্ন করল। 'উনি কী মগদের পিছু নিয়েছিলেন নাকি?'

'ব্যাপারটা খানিকটা হাস্যকর শোনাতে পারে কিন্তু সত্যি কথা হলো, অনেকটা তাই। উনি আসলে ভারতবর্ষের জলদস্যুদের নিয়েই কাজ করছিলেন। উনি এবং উনার পার্টনার প্রফেসর ইফতেখার আবদুল্লাহ,' বলে সে টমির দিকে তাকিয়ে একটা আঙুল তুলল। 'মিস্টার টমি আপনি যে ক্যারিবিয়ানের পাইরেটস নিয়ে কথা বলছিলেন না, একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো পৃথিবীব্যাপী মডার্ন পপ কালচারে সিনেমা থেকে শুরু করে গেইম, মিউজিক থেকে শুরু করে বই, সবখানে পাইরেটস বলতেই বলা হয়ে থাকে ক্যারিবিয়ানের পাইরেটদের কথা। কত শত সিনেমা নির্মাণ হয়েছে এদেরকে নিয়ে। কত শত গল্প উপন্যাস আর ফিকশন লেখা হয়েছে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক, মরগান থেকে শুরু করে ব্ল্যাকবিয়ার্ডসহ বিভিন্ন জলদস্যুদের নিয়ে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, আমাদের এই ভারত উপমহাদেশে যখন থেকে ইউরোপীয়রা আসতে শুরু করে এর পরের একটা লম্বা সময় ধরে চলেছে জলদস্যুদের উৎপাত। আমাদের এখানেও ইউরোপীয় জলদস্যু থেকে শুরু করে স্থানীয় মগ আরাকানী জলদস্যুদের বিস্তারিত ইতিহাস রয়েছে কিন্তু এর তেমন কোনোটাই সেভাবে উঠে আসেনি গল্প, কবিতা, উপন্যাস কিংবা সিনেমাতে। মোদ্দা কথা একরকম বলতে গেলে এরা প্রায় বিস্তৃতির আড়ালেই হারিয়ে গেছে।'

'এর পেছনে কারণ কী?' শারিয়ার খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে সবাইকে লিভিংরুমে যেতে বলল, সেই সঙ্গে কেয়ারটেকারকে বলল চা-কফি সার্ভ করতে। সবাই খাওয়া শেষ করে লিভিংরুমে চলে এলে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে শশী আবারও বলতে শুরু করল তার বয়ান।

'তুমি যে প্রশ্নটা করলে শারিয়ার সেটার জবাব খুঁজে বার করাই ছিল আবার বাবার গবেষণার প্রাথমিক একটা অংশ। এখন একটা ব্যাপার তো পরিষ্কার যে পাঁচ বছরের গবেষণার প্রক্রিয়ার ফলাফল তো আর পাঁচ মিনিটে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়। বাবা চিঠিতে আমাকে যেটা লিখেছিল সেখানে সে বলেছিল সে আর তার পার্টনার প্রথমে একটা সময় ধরে এটাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করে এবং তারা এর উত্তর বের করতেও সমর্থ হয়,' শশী এই পর্যন্ত বলে শারিয়ারের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'তোমাদের কাছে সিগারেট আছে?'

শারিয়ার নিজে একটা ধরিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিল শশীর দিকে। 'যেটা বলছিলাম, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের দস্যুদের জনপ্রিয়তা আর ভারতীয় অঞ্চলের দস্যুদের বিস্তৃতির পেছনে একটা কারণ তারা খুঁজে বের করতে পেরেছিলেন। স্প্যানিশ মেইনে মানে তোমরা যেটাকে বলো ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে জলদস্যুতা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল প্রচুর পরিমাণে গোল্ড বা স্বর্ণের ব্যাপার। এর পেছনে একটা

কারণও ছিল। স্প্যানিশ অধ্যুষিত ক্যারিবিয়ান অঞ্চল সেটাতে মূলত জলদস্যু ছিল তিন ধরনের। আর ওখানে যেসব ব্যাবসা বা অন্যান্য কার্যক্রম চলত সেগুলোর মূল্যস্বরূপ প্রচুর পরিমাণে সোনা বা স্বর্ণের কয়েন, মানে মোহর ব্যবহার হতো। এসব সোনা আবার আসত দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানিশ অধ্যুষিত এলাকার বিভিন্ন খনি থেকে। এর ফলে যেটা হতো, ওখানে ব্যবসা বা লাভ যাই হোক না কেন সেটার প্রাপ্তিস্বরূপ পাওয়া লাভের অংশ হয় সোনায় লেনদেন হতো আর না হয় লেনদেনের পর কনভার্ট করা হতো সোনায়। এইসব সোনা আবার জাহাজভর্তি করে পাচার করা হতো ইউরোপে। জলদস্যুদের আক্রমণের টার্গেট থাকত এইসব জাহাজগুলো। জাহাজ লুট হোক, আর যাই হোক, এসব সোনার আবার একটা বড়ো অংশ লুকিয়ে রাখত জলদস্যুরা বিভিন্ন জায়গায়। এর ফলে ক্যারিবিয়ানের জলদস্যুদের মিথ লেজেন্ডগুলোর একটা বড়ো অংশ গড়ে উঠেছে এসব লুকানো সোনা, অভিশাপ, ডুবন্ত সোনা ভর্তি জাহাজ এসব নিয়ে। যা অনেক বেশি আকর্ষণীয় মানুষের কাছে। অন্যদিকে ভারত উপমহাদেশের দস্যুতা এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল অনেকটাই ভিন্ন। এখানকার জাহাজ বাণিজ্য এবং জলদস্যুতা অনেকটাই ছিল বিভিন্ন পণ দ্রব্যাদি নিয়ে। যেমন ধরো, মসলা।'

'মসলা?' শশী থামতেই ভুবন বলে উঠল। 'মসলার জন্য জলদস্যুতা?' অবাক কণ্ঠে বলে উঠল সে। বাকি সবাই কিছু না বললেও সবাই উৎসুক এবং খানিকটা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'সবাইকে একটা কথা জানাই, এই উপমহাদেশের সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধগুলোর বেশ কয়েকটাই হয়েছিল এই মসলার বাজার দখল করার জন্য। মসলার জন্য। ইউরোপীয়রা এই উপমহাদেশে এসেছিল এই মসলার জন্যই। এক অর্থে বলতে গেলে আমাদের এই উপমহাদেশের দীর্ঘ শাসন এবং শোষণের ইতিহাস শুরু হয়েছিল এই মসলা থেকেই। আর জলদস্যুতা তো অনেক ছোটো ব্যাপার,' শশী ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে উঠল। 'যাই হোক, এরকম এলোমেলোভাবে না বলে আমি বরং আরেকটু গুছিয়ে এবং সংক্ষেপে বলি। আমি যখনকার কথা বলছি সেই চোদ্দ শ শতকে তখন ইউরোপ অনেকদিক থেকেই পিছিয়ে ছিল মধ্যপ্রাচ্য, ভারতবর্ষ কিংবা দূরপ্রাচ্য অর্থাৎ চায়না থেকে। তখন একরকম বলতে গেলে বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল মধ্যপ্রাচ্য। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের লোকজনই সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ, চায়না থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়ার জাভাসহ আরো অনেক জায়গার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে তারাই স্থলপথে বা জলপথে জিনিসপত্র ইউরোপে সাপ্লাই করত। যে কারণে ইউরোপের লোকজনের অনেক চড়া মূল্যে সেগুলো কিনতে হতো। তোমরা তো শেক্সপিয়রের নাটক পড়েছো, মার্চেন্ট অব ভেনিস। ভেনিসের মার্চেন্ট নিয়েই কেন গল্পটা? কারণ ভেনিস ছিল মধ্যপ্রাচ্য থেকে

যাওয়া পণ্যের সবচেয়ে বড়ো বাজারগুলোর একটি, তাই বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে ওটা বেশ বড়ো ছিল, আর তাই ভেনিস নিয়ে অনেক গল্পও প্রচলিত ছিল। ইটালির ভেনিসে যেসব জিনিসের লেনদেন হতো তার ভেতরে অন্যতম একটি পণ্য ছিল মসলা। যেটা সবচেয়ে ভালো উৎপন্ন হতো ভারতে। আর মসলার অপরিসীম চাহিদা ছিল ইউরোপে। কারণ লম্বা শীতের সময়ের জন্য তারা মাংস মজুদ করে রাখত এবং সেটাকে স্বস্বাদু করার জন্য দরকার হতো গোলমরিচের মতো মসল্লার। এই মসল্লার মার্কেট পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করত মধ্যপ্রাচ্য। আর সেটা করতও খুব চড়া দামে। ইউরোপীয়রা একসময় অনুধাবন করতে পারে তাদেও যেকোনো উপায়ে ভারতের জলপথ আবিষ্কার করতে হবে। এই আবিষ্কারের পেছনে অনেক লম্বা ইতিহাস আছে। তবে এক বাক্যে বলতে গেলে, এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভাস্কো দা গামা ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হয়।'

'এখানে একটা কথা বলি। এই ভাস্কো দা গামা সাহেবকে ইতিহাসে যেভাবেই চিত্রিত করা হোক না কেন ইনি কিন্তু খুব ভালো মানুষ ছিল না। বলতে গেলে এই লোক ছিল জলদস্যু। এই লোক একসময় এই উপমহাদেশের মানুষদের ওপরে অপরিসীম অত্যাচার চালিয়েছে। সেই ইতিহাসে আমি যাব না। তবে এই লোক ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কারের পর ঝাঁকে ঝাঁকে ইউরোপীয়রা আসতে শুরু করে এবং বাণিজ্য বিস্তার করে। ধীরে ধীরে মধ্যপ্রাচ্যের বাজার পরিবর্তিত হয়ে ইউরোপের দিকে ধাবিত হতে থাকে। এরপর আরো বেশি পরিমাণে মানুষ ভারতবর্ষে আসা শুরু করে। পর্তুগিজরা প্রথমে এলেও পরে আসে ওলন্দাজ মানে ডাচরা, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশরা এবং সবশেষে আসে ইংরেজরা। ইংরেজদের আগে একটা লম্বা সময় ভারতে আধিপত্য বজায় রেখেছিল পর্তুগিজরাই। অসাধারণ নাবিক পর্তুগিজরা একরকম বলতে গেলে ভারতের গোয়া থেকে ওদিকে হুগলী হয়ে আমাদের চট্টগ্রাম-আরাকান মানে বর্তমান মায়ানমার হয়ে ইন্দোনেশীয়ার জাভা পর্যন্ত সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ করত। এই সময়ে পর্তুগিজদের ভেতরে যারা ভারতবর্ষে এসেছিল এদের অনেকেই ছিল ভয়ংকর দস্যু। এরাই উপকূলজুড়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সমুদ্রপথে এদের আধিপত্যের সামনে এমনকি মোঘলরাও ছিল অসহায়।'

'বাঙ্গাল মুলুকে পর্তুগিজদের আগমনের অফিসিয়াল তারিখ সম্ভবত ১৫১৮। সেই হিসেবে ২০১৮ সালকে বলা হয়ে থাকে বাংলায় পর্তুগিজ আগমনের পাঁচ শ বছর পূর্তির বছর। সম্ভবত ১৫১৭ সালে পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়াল একজন ব্যবসায়ীকে বাঙ্গাল মুলুকে পাঠানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু পিরেস নামে সেই লোক নিজে না এসে পরের বছর মানে ১৫১৮ সালে জোয়াও কোয়েলো নামে আরেকজনকে চারটে জাহাজ দিয়ে বাংলায় পাঠান। কারণ ততো দিনে

ইউরোপীয়দের নজর মসলা ছাপিয়ে বাংলার মসলিন থেকে শুরু করে অন্যান্য জিনিসের ওপর পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু ওই সময়ে জোয়াও বাংলায় এলেও সে চট্টগ্রামে নেমে খুব বেশি সুবিধে করতে পারেনি। কারণ বাংলার শাসকরা তখন অনেক সবল ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অবশেষে পর্তুগিজরা গ্যাট হয়ে বসে এখানে। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসনের সময়ে গিয়াসউদ্দিন যখন শেরশাহের আক্রমণে বিপর্যস্ত তখন পর্তুগিজরা তাকে সহায়তার নামে শুল্ক আদায়ের অনুমতি নিয়ে নেয়। এরপরে একসময় এমনকি চট্টগ্রাম দখল করে বসে এবং শুরু হয় তাদের লুটপাট।'

'পর্তুগিজরা ছিল নৌবিদ্যায় পারদর্শী। তাই খুব সহজেই চট্টগ্রাম, আরাকান হুগলী থেকে শুরু করে সপ্তগ্রাম তো বটেই এমনকি মক্কাগামী জাহাজও তারা লুট করতে শুরু করে। তাদের সঙ্গে আবার যোগ দেয় আরেক ডাকাতদল আরাকানের মগরা। সবমিলিয়ে এরা কায়েম করে মগের রাজত্ব। যেখান থেকেই এসেছে মগের মুল্লুক কথাটা। আর আমাদের গল্পও এই মগরাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমাদের গল্পও শুরু হয় এই মগরাজ থেকেই।'

'মগরাজ?' শারিয়ার একটা ভ্রু তুলে জানতে চাইল। 'তোমার বাবার গবেষণার সঙ্গে মগরাজের সংশ্লিষ্টতা কোথায়?'

'বলছি। পর্তুগিজরা মগদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিরাট বিরাট বাহিনী বানিয়ে শুধু জাহাজ লুটতরাজেই সন্তুষ্ট ছিল না। একটা সময় সবচেয়ে বাজে একটা কাজ তারা শুরু করে। সেটা হলো মানুষ লুট করা। বাংলার মানুষ সবসময়েই তুলনামূলক শান্তিপ্রিয় আর অরক্ষিত। আর তাই নদীবিধৌত এলাকা হওয়ার কারণে উপকূলীয় অঞ্চল থেকে শুরু করে নদীর আশেপাশের এলাকা পর্যন্ত এইসব লুটেরারা নিজেদের জালিয়া জাহাজ আর নৌকা নিয়ে হানা দিত আর গ্রাম থেকে শুরু করে স্থানীয় বাজার পর্যন্ত লুট করত মানুষ। এরা ছিল অসম্ভব নিষ্ঠুর। এদের মানবতা বলে কিছু ছিল না। এরা যেখানেই হানা দিতো গ্রামকে গ্রাম, বাজারকে বাজার জ্বালিয়ে দিত। আর মানুষদের ধরে নিয়ে গরু-ছাগলের মতো বিক্রি করত আরাকান, হুগলীসহ নানা বাজারে। এসব চলছিল, এমন সময় বাংলার সুবাদার হয়ে অসে সম্রাট শাহজাহানের ছেলে শাহ সুজা। তার সময়েই বাংলা সবচেয়ে সুখে ছিল। কিন্তু শাহজাহানের অসুস্থতার সুযোগে তার ছেলেদের ভেতরে শুরু হয় ক্ষমতার লড়াই।'

'মগরাজ থেকে সোজা মোঘল দরবারে?' ভুবন টিপ্পনী কাটল।

'একদম। শাহজাহানের ছিল তিন ছেলে। শাহসুজা ছিল বাংলার সুবাদার, দারাশিকো ছিল তার বাবার সঙ্গে। অন্যদিকে ভারতের দক্ষিণে ছিল আওরঙ্গজেব। শাহজাহানের অসুস্থতার খবর শুনে শাহ সুজা দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করে এবং তার ভাই দারাশিকোর কাছে বাহদুরপুরের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পিছু হটে। কিন্তু

অন্যদিকে দারাশিকোকে পরাজিত করে আওরঙ্গজেব ক্ষমতায় আরোহণ করলে সুজা আবারও অভিযান চালিয়ে এবার আওরঙ্গজেবকে পরাজিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিফল হয়ে বাংলায় ফিরে আসে। তার পেছনে তখন বিরাট মোঘল ফৌজ। বাংলায় তার অসংখ্য মিত্র থাকলেও সে জানত এরা তাকে রক্ষা করতে পারবে না। তাই সে চট্টগ্রাম দখল করে রাখা মগদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা তাকে অর্থের বিনিময়ে পরিবার-পরিজন আর বাহিনীসহ আরাকানে দিয়ে আসে। আরাকানের রাজা সুজাকে বেশ ভালোভাবে গ্রহণ করে নেয়। কথা ছিল সে তাকে সুবিধেমতো মক্কায় যাওয়ার জাহাজে তুলে দেবে।কিন্তু সেটা না করে আরাকানের 'দষ্টু' রাজা শাহ সুজাকে পরিবারসহ হত্যা করে।'

'কেন?' অনেকক্ষণ পরে টমি জানতে চাইল। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল শশীর বলা কাহিনি। শারিয়ার তাকিয়ে দেখলা সুমন একদম চুপ এবং তাকে খানিকটা অন্যমনস্কও দেখাচ্ছে।

'অত্যন্ত ভালো প্রশ্ন, কেন তাকে হত্যা করতে যাবে। এর পেছনে অনেক ঐতিহাসিকের অনেক যুক্তি আছে। অনেকেই বলে রাজা আসলে শাহ সুজার সুন্দরী কন্যার প্রেমে পড়ে গেছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সত্য কথা হলো, সে কাজটা করেছিল শাহ সুজার সঙ্গে থাকা বিপুল পরিমাণ মোঘল সম্পদ দখল করার জন্য।'

'সাংঘাতিক তো। কী ছিল সুজার সঙ্গে?' ভুবন জানতে চাইল। বোরিং ইতিহাস শুনতে শুনতে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। এবার সে কিছুটা আগ্রহবোধ করতে শুরু করেছে।

শশী হেসে উঠল তার দিকে ইশারা করে সে বাকিদের দিকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'এখন সবাই পার্থক্যটা দেখতে পাচ্ছো তো? ভুবন আমার কথা শুনতে শুনতে হাইম ছাড়ছিল কিন্তু যেইমাত্র আমি স্বর্ণ আর সম্পদের কথা বললাম সেও আগ্রহ বোধ করতে শুরু করল।'

শারিয়ারও হেসে উঠল শশীর কথায়। 'এ-কারণেই ক্যারিবিয়ানের পাইরেটসরা এত বিখ্যাত। কিন্তু আমাদের বেচারা জলদস্যুরা মসলা আর মানুষ বেচে আর কত বিখ্যাত হবে?'

'ইতিহাসের এই অংশটুকুই বের করতে যাচ্ছিল ডক্টর সুলতান মানে আমার বাবার গবেষণা। সে দেখাতে যাচ্ছিল যে মোঘলদের হারিয়ে যাওয়া সম্পদের একটা বিরাট অংশের যোগ আছে মগ আর পর্তুগিজ দস্যুদের ইতিহাসের সঙ্গে। এখন প্রশ্ন হলো, কী ছিল শাহ সুজার সঙ্গে। সেটা আসলে পুরোপুরি বলা সম্ভব নয় কিন্তু সত্যিকার অর্থে সাত রাজার সম্পদ যেটাকে বলে সেটাই ছিল তার সঙ্গে। এমনকি এরকমও কথিত আছে যে শুধু মোঘল নয় এমনকি বারো ভূইয়াদের সম্পদেরও একটা বিরাট অংশ ছিল শাহ সুজার সঙ্গে। এগুলো টুকরো টুকরো ইতিহাসের

বিভিন্ন মিথ। কিন্তু এগুলোর সঙ্গে বাস্তবের তেমন কোনো সংযোগ পাওয়া যায়নি। বছরের পর বছর সময় নিয়ে এইসব হারানো টুকরোগুলোকে একসঙ্গে করে ডক্টর আবদেল আর তার পার্টনার ইফতেখার আবদুল্লা মিলে যে চিত্রটা দাঁড় করিয়েছিল সেটা অনেকটা এমন; অরাকানের রোসাঙ্গে বর্মী রাজার বাহিনী শাহ সুজার পরিবারকে মেরে ফেললেও শাহ সুজার বাহিনীর একটা অংশ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরপরের অংশটা একেবারেই ঘোলাটে। কেউ বলে শাহ সুজার খুব কাছের একজন নাকি পুরো সম্পদ নিয়ে রোসাঙ্গের ওই জঙ্গল থেকে পালিয়েছিল। আবার কেউ বলে রোসাঙ্গের রাজা আসলে শাহ সুজাকে মারতেই পারেনি। আবার কেউ কেউ বলে শাহ সুজা রোসাঙ্গে যাওয়ার অনেক আগেই বাংলার বুকেই তার নিজের লোক এবং বারোভূঁইয়াদের সহায়তায় সম্পদটা বাংলাদেশেরই কোথাও লুকিয়ে ফেলেছিল। আসলে সে নাকি সম্পদগুলো রোসাঙ্গে নিয়েই যায়নি। ইত্যাদি। এগুলো সবই মিথ, সবই প্রচলিত কিন্তু কোনটাই প্রমাণিত নয়। তবে এসব থেকে যেটা ধরে নেয়া যায় সেটা অনেকটা এ রকম; রোসাঙ্গের রাজা সম্ভবত শাহ সুজার সঙ্গের সবাইকে মারতে পারেনি। সম্ভবত শাহ সুজার খুব কাছের খুব কাছের কেউ একজন সেখান থেকে সেই বিপুল পরিমাণ ধনরাশি নিয়ে পালিয়ে চলে আসে,' বলে সে একটু থামল। সবার দিকে একে একে দেখে নিয়ে বলে উঠল, 'ডক্টর আবদেল ইতিহাসের সেই হারানো অংশ খুঁজতে গিয়ে সম্ভবত সেই বিপুল ধনরাশির সন্ধান বের করেছিল,' বলে সে একটু থেমে যোগ করল। 'আর সেই বিপুল ধনরাশি সম্ভবত এই বাংলার বুকেই কোথাও লুকানো আছে।'

শারিয়ার চমকে উঠে তাকাল তার দিকে। সবাই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'মোঘলদের হারানো সম্পদ!' আনমনেই বলে উঠল শারিয়ার।

' শুধু মোঘল নয়, এমনকি বারোভূঁইয়াদেরও। হ্যাঁ এই ব্যাপারটারই প্রাথমিক প্রমাণ লোকজনকে যখন আবদেল দিতে যায় তখন তারা হেসেই উড়িয়ে দেয়। সে সিরিয়াসলি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করতে গেলে এক পর্যায়ে তাকে পাগল অভিহিত করে তার লাইসেন্স কেড়ে নেয়া হয়। মনে হয় কেউই আবদেলের ওপরে ভরসা করেনি, তাকে বিশ্বাস করেনি। এমনকি আমিও না,' বলে শশী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। শারিয়ার মনোযোগ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে নিজের চোখা গোঁফের কিনারায় হাত বুলাচ্ছে।

'এরপরে সম্ভবত আবদেল মানে বাবা,' বলে শশী আরেকবার বড়ো করে দম নিল। 'এরপরে উনি যা করেন সেটা আনইথিক্যাল ছিল কিন্তু উনি অথরিটির ওপরে এতটাই রেগে গেছিলেন এবং ব্যাপারটার সমাধান করার জন্য এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন যে, এটাই তার কাছে ঠিক মনে হয়।'

'ডক্টর আবদেল রেলিক নামে বিদেশি একটা চক্রের সহায়তা কামনা করেন,' শারিয়ার আনমনেই বলে উঠল।

'ঠিক। সম্ভবত তাদের সহায়তাতেই সে ব্যাপারটার একটা সুরাহা করার চেষ্টা করে। কিন্তু কী ঘটেছিল সেটা আবদেল চিঠিতে বলেনি। সম্ভত তাদের সঙ্গে কোনো একটা পর্যায়ে মতের মিল না হওয়াতে কোনো ঝামেলা করে। এই সময়ে আবদেল তাদের নজর এড়ানোর জন্য ডুব দেয় একেবারে গহিনে।'

'আপনাকে চিঠিটা লেখার আগ পর্যন্ত,' শারিয়ার ভাবতে ভাবতে বলে উঠল। 'তিন বছর সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল সবার থেকে। ওইদিন রাতে কী হয়েছিল?'

'আমি তার চিঠি পেয়ে চলে আসি দেশে। আবদেল আমাকে নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা দেয়নি। সে আমাকে চিঠিতে বলেছিল অমুক সময়ে হাইওয়ের অমুক জায়গায় থাকতে। আমি ঠিক সে সময়েই সেই জায়গাতে গিয়ে হাজির হই। তীব্র বৃষ্টির ভেতরে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি এমন সময় রাস্তার ওপারে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাই। আমি ওদিকে রওনা দিব হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই একদল লোক রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপরে। আবদেল আমাকে ওই অবস্থায় দেখে দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে একটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়।'

শশী এই পর্যন্ত বলতেই ভুবন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। শারিয়ার তাকে হাতের ইশারায় চুপ থাকতে বলল। 'তারপর কী হলো? ওই দিঘির ওখানে পাহারাদার আর নৌকাতে আইডিকার্ড কীভাবে এলো?'

'যারা আমাকে ধরেছিল ওরা আমাকে ওখান থেকে ধরে নিয়ে প্রথমে গাড়িতে তোলার পরিকল্পনা করেছিল মনে হয়। কিন্তু বাবাকে ধাক্কা মারা গাড়িটা থেমে গেলে ওটা থেকে কিছু ছেলেপেলে বেরিয়ে আসে আর হঠাৎ এটা পুলিশের গাড়ি ওখানে উপস্থিত হয় । তাই মনে হয় আমাকে আর গাড়িতে না তুলে আমাকে নিয়ে চলে যায় সেই দিঘির পারে। সেখান থেকে নৌকোতে তুলবে এমন সময় পাহারাদার লোকটা বাইরে চলে আসে নিজের ঘর থেকে। সঙ্গেসঙ্গে তাক গুলি করে ওরা। তারপর নৌকাটাকে নিয়ে যায় দেয়ালের কাছে। সেখানে অন্যদিক থেকে একটা ক্রেনের মতো নামিয়ে দেওয়া হয় এপাড়ে।'

এই পর্যায়ে শারিয়ার ভুবনের দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে উঠল। 'আমি বলেছিলাম না, ওরা ওপার থেকে কোনো হেল্প পেয়েছে। না হলে ওভাবে ওঠানোটা খুবই কঠিন হওয়ার কথা। ওই সময়েই কোনো এক সুযোগে আপনি মনে হয় ব্যাগ থেকে জিনিসগুলো নৌকায় ফেলে দিয়েছিলেন। ওখানে নেয়ার পর আপনাকে কী ওরা কিছু জিজ্ঞেস করেছে?

'নাহ, ওরা যখন আমাকে নৌকা থেকে ট্রলির সঙ্গে বাঁধে আমি ব্যাগটা উল্টে ফেলে দিই। ব্যাগটা তুলে নিয়ে ওটার ভেতরের জিনিসগুলো রয়ে যায় মনে হয়। এরপরে ওরা আমাকে নিয়ে একটা অফিস রুমে আটকে রাখে। ওখানেই ছিলাম লম্বা সময়। তারপর তোমরা,' বলে সে জিভ কাটল।

'তুমি বললে সমস্যা নেই,' শারিয়ার গোঁফের কোণে হাত বোলাতে বোলাতে বলে উঠল। 'আমিও তাই করব।'

'ঠিক আছে,' শশী হাত নেড়ে বলে উঠল। 'তোমরা যখন আমাকে উদ্ধার করতে এলে, সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে অফিস রুম থেকে সরিয়ে সেই জাহাজে নেয় ওরা। ওখানে কে নাকি আসবে দেখা করতে। সেই রাতে আমাকে ওদিক দিয়ে স্পিডবোটে করে লোকটার সঙ্গে জাহাজে তুলে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই তোমরা এলে। এরপর তো তোমরা জানো।'

'তাহলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল,' শারিয়ার কেয়ারটেকারকে আরেক রাউন্ড চা-কফি দিতে বলে নিজে একটা সিগারেট লাগাল ঠোঁটে। 'তোমার বাবা ছিল একজন আর্কিওলজিস্ট। ইতিহাসের হারানো এক অধ্যায় খুঁজতে গিয়ে সে বিরাট এক সম্ভাব্য সম্পদের খোঁজ পায়। কিন্তু ব্যাপারটা সে অথরিটিকে বোঝাতে পারেনি। বরং তারা তাকে ভুল বোঝে, ফলে সে সম্ভবত উল্টা-পাল্টা কারো সঙ্গে হাত মেলায়। একটা সময় তার পিছু লাগে এমন কিছু মানুষ যাদের কারণে সে গা-ঢাকা দিয়ে নিজের গবেষণা চালিয়ে যায়। অবশেষে সে যখন সাফল্যের শেষ ধাপে তখন নিজের মেয়ে, মানে তোমাকে চিঠি দিয়ে জানায় সে কী করেছে কী পেয়েছে। কিন্তু মেয়ের সঙ্গেসঙ্গে সম্ভবত তাকে অনুসরণ করে সেখানে পৌঁছে যায় এক বা একাধিক গ্রুপ। যারা এতদিন ধরে তাকে খুঁজছিল। তারা তার মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় এবং অ্যাক্সিডেন্টে মারা পড়ে প্রফেসর। এখন সেই সমস্ত কিছুর জবাব আছে তোমার কাছে। একমাত্র তুমিই জানো তোমার বাবা যা নিয়ে গবেষণা করছিল সেটা কোথায় আছে?'

'কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তেমন না। কারণ বাবা কী পেয়েছে সেটা বললেও কোথায় পেয়েছে সেই ব্যাপারে সে চিঠিতে লেখেনি। তার মতো পোড় খাওয়া মানুষ খোলা চিঠিতে সেটা লেখার কথাও নয়। আমার সঙ্গে দেখা করে সেটা বলার কথা ছিল। কিন্তু সেটা তো হয়নি।'

'সর্বনাশ, এ তো সবই শেষ হয়ে গেছে দেখছি,' ভুবন আর্তনাদের মতো করে বলে উঠল। 'এত কাহিনি করে শেষে এসে রাবণ জিতে গেল?' সবাই তাকিয়ে আছে শশীর দিকে।

'মোটেই তা নয়,' শশী বলে উঠল,' সে বেশ জোর গলায় বলে উঠল। 'তোমরা ভুলে যাচ্ছো আমিও একজন আর্কিওলজিস্ট। বাবার গবেষণা কেউ যদি বুঝতে

পারে বা বের করতে পারে তো সেটা আমিই পারব। বাবা আমাকে বলেছিল তার পুরো পাঁচ-ছয় বছরের গবেষণা তার স্টাডিতে আছে। সেখানে নাকি একটা ডিটেইল ম্যাপিং করেছে সে। আমার বিশ্বাস তোমরা যদি আমাকে সেই স্টাডিতে নিয়ে যেতে পার কিংবা সেই ম্যাপটা দেখাতে পারো আমি সেটা এনালিসিস করে বের করতে পারব বাবা যা পেয়েছিল সেগুলো কোথায় আছে।'

'সেগুলো তো সব পুড়ে ছাই,' টমি আনমনেই বলে উঠল।

শশী চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল টমির কথা শুনে সে এক সেকেন্ড টমির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'কী? পুড়ে গেছে!' সে এত জোরে লাফিয়ে সোজা হয়েছে যে তার হাতের কাপটা তো পড়ে গেছেই, সেই সঙ্গে তার হাতে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন করে উঠেছে সামনের টেবিলের ওপরে থাকা চায়ের পট ইত্যাদি। 'সর্বনাশ,' বলে সে নিজের মাথার চুল মুঠি করে ধরল। 'এই সর্বনাশ হলো কীভাবে? হায় হায়!' শশীকে দেখে মনে হচ্ছে বাপের মৃত্যুতে সে যতটা কষ্ট পেয়েছিল তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে এই খবর শুনে।

শারিয়ার খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছিল মেয়েটাকে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'শান্ত হও শশী। ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল।'

'মাই ফুট অ্যাক্সিডেন্ট,' বলে সে নিজের মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। 'কত বড়ো সর্বনাশ হয়ে গেল এটা তোমরা কেউ বুঝতেও পারছো না। অহহো,' তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার পুরো জীবনটাই বৃথা হয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থেকে সে মাথা তুলল। 'ঘটল কীভাবে ব্যাপারটা?'

'আগেই বলেছিলাম যে ওই চায়নিজ লোকটা,' শারিয়ার বলতেই টমি পাস থেকে তার নাম বলে উঠল।

'ব্যাটার নাম হুয়ান জিং।'

'হ্যাঁ, সেই জিং ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের একবার মোলাকাত হয়েছিল ওই বেইজমেন্টে,' বলে সে ওই দিন বেইজমেন্টে কী হয়েছিল জানাল।

'উফফ, কত বড়ো একটা ক্ষতি যে হয়েছে। যাই হোক, বাবার মৃত্যুর পর ওখানে পুলিশ যায়নি?' শশী জানতে চাইল।

'গিয়েছিল তো...' শারিয়ার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই পাশ থেকে টমি কথা বলে উঠল।

'এক মিনিট এক মিনিট,' সে শশীর দিকে তাকিয়ে আছে। 'আমরা সবাই একটা পয়েন্ট মিস করছি। ডক্টর আবদেলের রুম মানে গবেষণাগারের দেয়ালে যা ছিল বা ওই রুমে যা ছিল সবই পুড়ে গেছে বুঝলাম। কিন্তু জিনিসগুলো তো আর বাদ হয়ে যায়নি?'

'মানে?' শারিয়ার প্রশ্ন করল। তার কথার মাঝখানে কথা বলে ওঠাতে খানিকটা বিরক্ত সে।

'মানে হলো ওই দেয়ালে যা ছিল সেগুলো পুড়ে যেতে পারে কিন্তু সেগুলোর ছবি তো আছে,' বলে সে শশীর দিকে তাকাল সাপোর্টের আশায়।

শশী তালি দিয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, ছবিতেও কাজ চলতে পারে। অবশ্যই সরাসরি দেখতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো। কিন্তু ছবি দেখতে পারলেও কিছুটা কাজ হতে পারে।'

'কিন্তু ছবি তো পুলিশের কাছে,' ভুবন ফোড়ন কেটে বলে উঠল। 'যে কাজ করেছি আমরা তাতে তো।'

'নাহ, ছবি এখানেও আছে,' টমি আবারও কথা বলে উঠল। তার গলায় পুরনো সেই সুর ফিরে ফিরে আসছে। কাল রাতের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে সে আবারও পুরোদমে পুরনো মুডে ফিরে যেতে শুরু করেছে। 'আসলে আমি তো অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাই...' বলে সে খুব ভাব নিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই শারিয়ার ধমকে উঠল।

'টমি, কাজের কথা বল। ছবিগুলো কোথায় আছে?'

আবারও সেই জোঁকের মুখে লবণ পড়ার মতো মিইয়ে গেল সে। 'আমার ল্যাপটপে আছে। আমি নিয়ে আসছি,' বলে সে খুশি মুখে চলে গেল ল্যাপটপটা নিয়ে আসতে।

'তোমার কী মনে হয় ছবিগুলো দেখে কিছু বের করা সম্ভব হতে পারে?' শারিয়ার প্রশ্ন করল শশীকে।

'হতে পারে, আবার নাও পারে। কারণ এটা অনেক কিছুর ওপরে নির্ভর করছে। যেমন ছবিটার কোয়ালিটি কেমন, বাবা তার কাজের কতটা সেখানে রেখেছিল। আবার ছবিতে...' বলে শশী কাঁধ ঝাঁকাল। 'ছবিটা না দেখে বা এনালিসিস না করে আসলে কিছুই বলা সম্ভব নয়। অন্যদিকে আবার একটা সুবিধাও আছে। বাবার সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি। কাজেই তার কাজের প্যাটার্ন সম্পর্কে আমি ভালোভাবে জানি। কাজেই সে ব্যাপারগুলোকে কীভাবে সাজাতে পারে এটা নিয়ে একটা সম্যক ধারণা আছে আমার। দেখি... ওই যে টমি এসে গেছে ল্যাপটপ নিয়ে।'

টমি ল্যাপটপটাকে এনে টি-টেবিলটার ওপরে রেখে চার্জের কানেকশন দিয়ে ডালা তুলল ওটার। সবাই টি-টেবিলের সামনে মেঝের কার্পেটের ওপরে এসে জড়ো হলো ল্যাপটপটার সামনে। শুধু সুমন সোফাতে বসে রইল। একটু পর পর চা খাচ্ছে সে, আর সিগারেট ধরাচ্ছে। তাকে খানিকটা চিন্তিত মনে হলো শারিয়ারের কাছে।

'সুমন, আর ইউ ওকে?' শারিয়ার প্রশ্ন করল।

ওর প্রশ্নের জবাবে মৃদু হেসে উঠল সুমন। 'আমি ঠিক আছি বস, একটু ক্লান্তি লাগছে। আর এসবে আমার কোনো আগ্রহ নেই, তোমরা কাজ করো।'

শারিয়ার হাত নেড়ে ল্যাপটপের দিকে ফিরে তাকাল। ডক্টর আবদেলের দেয়ালে লাগানো সেই বিশদ দেয়ালচিত্রের মতো জিনিসটার ছবিটা ওপেন করেছে টমি। ছবিটা দেখতে দেখতে শিস দিয়ে উঠল শশী।

'এটা একটা অসম্ভব কাজ,' সে ছবিটাতে রীতিমতো বুঁদ হওয়ার মতো ডুব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করছে। 'একজন অ্যাকাডেমিশিয়ান ও স্কলারের তিন বছরের গবেষণা। দেয়ালে ককশিট লাগিয়েছিল ডক্টর অবদেল। তার ওপরে আর্ট পেপার পেস্ট করা হয়েছে। এরপরে সে কাগজপত্রে যা পেয়েছে সেটাকে ধাপে ধাপে পুরোটা উঠিয়ে এনেছে এখানে। এই টেকনিকটাকে আমরা অ্যাকাডেমিকসের ভাষায় বলি মিররিং দ্য ব্রেইন। ব্যাপারটা অনেকটা এমন, নিজের মাথার ভেতরে যা আছে চিত্রের মাধ্যমে সেটার একটা প্রতিফলন বা মিরর ইমেজ দাঁড় করানো। এই জিনিসটা এতটাই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে দিন দিন যে অ্যাকাডেমিক জগৎ থেকে শুরু করে কর্পোরেট বা মিলিটারিতে পর্যন্ত সবাই এটা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এমনকি আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্টুডেন্টদের পরীক্ষা না নিয়ে তাদের পোস্টার প্রেজেন্টেশন দেয়া হয়, যাতে তারা ভিজ্যুয়াল ম্যাটেরিয়াল ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারে,' বলে পা ভাঁজ করে আরাম করে বসল। টমি আর শারিয়ারের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আমার নেট কানেকশনসহ আরেকটা ল্যাপটপ বা কম্পিউটার দরকার। এটাতে দেখা জিনিস ওটাতে আমরা খোঁজ করে দেখতে পারব।'

'আমি যে রুমে ছিলাম সেটাতে একটা ডেস্কটপ আছে, এখানে থাকতে এলে হামিদ চাচা বা ছোটো আঙ্কেল মনে হয় ওটাতে কাজ করেন। কিন্তু ওটা দিয়ে তো আমাদের কাজ হবে না,' বলে সে একটু ভাবল। 'এক কাজ কর টমি,' বলে সে টমিকে বলল। 'আমি যে রুমে ছিলাম ওটাতে একটা ট্যাব আছে অ্যাপলের, ওটা নিয়ে আয়। আর আসার সময় বাসার ওয়াইফাইয়ের আইডি আর পাসওয়ার্ড জেনে নিবি কেয়ারটেকারের কাছ থেকে।'

'জি, বস,' টমি উঠে যেতেই আবার শশী বলতে শুরু করল।

'এই দেখো বাবার কাজটা একবারে বিশদ না জানলেও মোটামুটি একটা আউটলাইন আমি জানি। সে থেকে যদি ধরে নিই এই চিত্রটার শুরু হয়েছে এখান থেকে,' বলে সে ল্যাপটপের স্ক্রিনের এক জায়গাতে আঙুল রাখল। এই দেখো, এখানে প্রথম এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে নাম, তারিখসহ। প্রথম তারিখটা ভাস্কো ডা গামার ভারতে আগমনের। এরপরের ঘটনাগুলো নামের সঙ্গে সাজানো হয়েছে তারিখ বসিয়ে বসিয়ে,' বলে সে ছবিটার আরেকদিকে আঙুল নিয়ে এলো। এখানে বসানো হয়েছে মোঘলদের ঘটনাপঞ্জি। এখানেও দেখো নাম, তারিখসহ দেওয়া

হয়েছে দিল্লির দরবারে ঘটে যাওয়া বড়ো বড়ো ঘটনাগুলো। এখান থেকে সোজা নেমে এসেছে বাংলাতে,' বলে সে আঙুলটাকে নিয়ে এলো ছবির মাঝামাঝি একটা জায়গাতে।

'আর এই ঘটনাগুলোকে বাঙ্গাল প্রদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে জোড়া লাগানো হয়েছে বিদেশি আগমনকারীদের সঙ্গে, সেই সঙ্গে আবার দিল্লির ঘটনার সঙ্গে। সেইসঙ্গে আবার নিচ থেকে টেনে এনে লাইন করা হয়েছে আরাকান ত্রিপুরা আর চট্টগ্রামে সঙ্গে। অদ্ভুত সুন্দর একটা কাজ করা হয়েছে এখানে। এটা একটা মাস্টারপিস ওয়ার্ক,' বলে সে সবার দিকে দেখল। 'নিজের বাবা বলে বলছি না, এরকম কাজ করাটা কতটা দুরূহ ব্যাপার বলে বোঝানো সম্ভব নয়। এটা আসলে হাতে বানানো একটা অ্যাকাডেমিক থ্রিডি মডেল। পুরো জিনিসটাই একটা এলাইনড ফ্রেমওয়ার্কের মতো কাজ করবে তুমি যদি প্যাটার্নটার বেসিক ব্যাপারগুলো ধরতে পারো। যেমন দেখো, এখানে যদি আমি হাত রাখি তবে দেখতে পাই দিল্লিতে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হলেন। এখান থেকে বরাবর ডানে তাকিয়ে ওই সময়ে পর্তুগিজ আর আরাকানরা কী করছে সেটা দেখতে পাবে। আবার ডান পাশে এইসময়ে বাঙাল প্রদেশে কী ঘটছে সেটাও দেখতে পারবে তুমি। ব্রিলিয়ান্ট। এখানে এমনকি বারোভূঁইয়াদের সঙ্গে শাহ সুজার সংযোগ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সুন্দরভাবে।'

'আসলেই অদ্ভুত, এখন বুঝতে পারলাম জিনিসটা এতটা জটিল আর অদ্ভুত লাগছিল কেন দেখতে,' পুরো জিনিসটা কীভাবে কাজ করে সেটা ধরতে পেরে ভুবন শিস দিয়ে উঠল। 'একেই মনে হয় বলে জিনিয়াস। এটা যদি একজন মানুষের মাথা থেকে বের হওয়া এবং বানানো হয়ে থাকে কী আর বলব,' ভুবন এতক্ষণ নীরব ছিল কিন্তু জিনিসটা ধরতে পেরে সেও মজা পেতে শুরু করেছে।

'ওই যে টমি এসেছে,' শারিয়ার মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল। 'পেয়েছিস?'

'হ্যাঁ বস। আর বলো না...'

টমিকে কথা শেষ করতে দিল না শশী। 'টমি, আপনি ট্যাবটার ওয়াইফাই অন করে গুগলটা বের করে রাখবেন। আমি কিছু জানতে বা দেখতে চাইলে জানাবেন,' বলে শশী ফিরে তাকাল ল্যাপটপের দিকে। 'আচ্ছা, ছবিটার এই অংশটুকু আমরা বুঝতে পারছি। যা বুঝতে পারছিনা তা হলো এখানে এই ছোটো ছোটো লেখা আর নানা ঘটনাবলি কেন যোগ করা হয়েছে। যেমন, এখানে হুগলীর কথা লেখা হয়েছে, আবার সেটা থেকে সাতটা রেখা টেনে কিছু একটা বোঝানো হয়েছে। এটা কী, আমি ধরতে পারছি না। আবার এখানে বারোটা বৃত্তের একটা মডেল বসানো হয়েছে এটা বারোভূঁইয়াদের কিছু একটা হতে পারে। আবার হুগলীর সঙ্গে কানেকটেড এখানে সাতটা সরলরেখার একটা চতুর্বৃত্ত বানানো হয়েছে। এটাও আমি ধরতে পারছি না। তবে এই মুহূর্তে আমাদের জন্য এটার গুরুত্ব অতটা

বেশি বলে মনে হয় না। কারণ সম্ভবত এটাতে আরো অসংখ্য লেয়ার আছে,' বলে সে মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে আবার সোজা হয়ে বসলো।

'একমিনিট, আবারও এখান থেকে শুরু করি। বলে সে পর্তুগিজদের থেকে শুরু করল। 'শারিয়ার আর ভুবন তোমরা দুজনে একটু হেল্প করো। বলে সে নিজে আঙুল রাখল চিত্রটার এক জায়গাতে। 'এখান থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে নিচে নামছি। শারিয়ার তুমি মোঘলদেরটাতে আঙুল রাখো, শারিয়ার তুমি বাঙাল মুল্লুকের অংশে। টমি তুমি আরাকানে মগদেরটাতে। আমি যখন যখন একটা একটা ধাপে নামব সেটার সঙ্গে মিলিয়ে তোমরাও এগোবে। বোঝা গেছে?' সবাই মাথা নাড়ল, সবার একটা করে আঙুল স্ক্রিনের ওপরে। যদিও এভাবে ল্যাপটপের স্ক্রিনে সবাই একসঙ্গেআঙুল রেখে জিনিসটা ধরতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আবার সবাই মজাও পেতে শুরু করেছে এখন।

'এই, আমি নামলাম এক ধাপ। পর্তুগিজরা গোয়া থেকে রওনা দিয়ে বাংলার দিকে এগোল। এরপরে চট্টগ্রাম আরাকানের দখলে গেল। দিল্লিতে কী হলো শারিয়ার দেখো। একই সময়ে ভুবন আর টমি,' সবাই একই সঙ্গে শমীর নির্দেশনা অনুযায়ী নামতে নামতে একটা পয়েন্টে চলে এলো।

'এবার আমাদের উদ্দেশ্য যেখানে সেই জায়গাতে চলে এসেছি আমরা, সবাই সাবধানে,' বলে সে যোগ করল। 'দিল্লিতে আওরঙ্গজেব ক্ষমতায় এলো,' শমী বলল।

শারিয়ারতার সঙ্গে যোগ করল। 'সুজা পালাল আরাকানে। শাহ সুজাকে আরাকানে হত্যা করা হলো।'

'এখানে লেখা আরাকানের রাজা মগ আর পর্তুগিজদের নিয়ে বাহিনী বানাল,' ভুবন বলল।

'এখানে আছে চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা সুজার লোককে উদ্ধার করতে বাহিনী বানাল। টমি কোনোমতে তার আঙুল জায়গামতো রেখে বলতে লাগল।

'শাবাশ, আমরা প্রায় এক পয়েন্টে চলে এসেছি। এখান থেকে একটা লাইন চলে গেছে,' এক মিনিট, একটা না তিনটা লাইন চলে গেছে ছবির অন্যপ্রান্তে। 'সবাই আমরা একসঙ্গে এগোব।'

সবাই যার যার আঙুল সরিয়ে নিতে লাগল, সেইসঙ্গে সবার আঙুল একটা বিন্দুতে এসে থেমে গেল।

'সাব্বাস, আমরা মনে হয় এখান থেকেই মূল যে জিনিসটা বের করতে পেরেছি সেটার নির্দেশনা শুরু।

'ঠিক, এখন পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি সেটা ইতিহাসেরই অংশ। স্রেফ টুকরো টুকরো অংশকে বাবা একসঙ্গে এনে জোড়া লাগিয়েছে। কিন্তু যে পয়েন্টটা আমরা এই মুহূর্তে পৌঁছেছি এখান থেকেই মূল নির্দেশনা শুরু হবে। আর সেটা করতে

হলে এই ছবির এই অংশটা অ্যানালিসিস করতে হবে,' বলে শশী খানিকটা ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেলান দিল সোফাতে। হাত বাড়াল সিগারেটের প্যাকেটের দিকে।

'কিন্তু ওখানে তো কিছুই নেই দুটো ছবি বাদে,' ভুবন বলে উঠল।

'ঠিক এখান থেকেই অমাদেরকে প্রাকটিক্যালি ব্যাপারটা উদ্ধার করতে হবে,' বলে শশী সিগারেট ধরিয়ে আবার চলে এলো ল্যাপটপের সামনে। 'টমি হেল্প লাগবে আমার। আমাদের ঠিক করা পয়েন্ট থেকে তিনটা লাইন বেরিয়েছে। তিনটের ভেতরে আমার বিশ্বাস মূল যে রেখাটা বেরিয়েছে সেটাই আমাদের ক্লু।'

'তুমি নিশ্চিত হলে কীভাবে?'

'আইডিয়া চুরি ব্যাপারটা জানো তো? কিন্তু অ্যাকাডেমিক জগতেও যে আইডিয়া চুরি হয়, সেটা কী জানো?' শশী হেসে উঠল বলে। তার কথার সঙ্গেসঙ্গে সিগরেটের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। 'সব অ্যাকাডেমিশিয়ানরা তাই আইডিয়া যাতে চুরি না হয় সেজন্য কিছু ছলনার আশ্রয় নেয় অনেক সময়। বাবা সবসময় তার আইডিয়াগুলোকে একাধিক প্যাটার্নে সাজাত, যাতে চট করে কেউ বুঝতে না পারে। এখানে দেখো, যে তিনটা রো বেরিয়েছে, একেবারে ওপরেরটা দেখো। এখানে একটা নাম লেখা 'দেয়াঙ', টমি গুগলে বাংলায় ওয়াং লিখে সার্চ দাও দেখবে দোয়াঙ হলো চট্টগামের হারিয়ে যাওয়া পর্তুগিজদের পুরনো এক শহর। ঠিক?'

টমি সার্চ দিয়ে পড়তে পড়তে বলে উঠল, 'ঠিক।'

'দ্বিতীয় নামটা, আংগারকেল,' এটা কী আমি জানি ন। কিন্তু আগেরটার মতোই কিছু একটা হবে। টমি?'

'আংগারকেল সমুদ্রের উপকূলে হারিয়ে যাওয়া পর্তুগিজদের আরেক শহর।'

তালি দিয়ে উঠল শশী। 'দেখেছ, যা ভাবছিলাম।'

'কিছু বুঝলাম না,' শারিয়ার আনমনে মাথা নেড়ে একবার ভুবনকে দেখে নিল। ভুবনও ঠোঁট উল্টে বোঝাল সেও কিছু বোঝেনি।

'শোনো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। বাবা খুব ভালো করেই জানত, সে যাই করুক আর যতই লুকিয়ে রাখুক কোনোনা কোনোদিন তার এই চিত্র কারো না কারো হাতে পড়বেই। আর সেরকম কারো হাতে পড়লে তার যদি ঘটে বুদ্ধি থাকে তবে আমরা যেভাবে বিন্দু মিলিয়ে ব্যাপারটা বের করেছি অন্য কেউও সেটা বের করতে পারে। কিন্তু মজা শুরু হবে এরপরে। এখন তুমি যে দুটো শহরের নাম বললে, এটা আসলে পুরোটাই ধোঁকা। যে কেউ এরকম পুরেনো হারানো শহরের নাম দেখবে আবার দেখবে পর্তুগিজদের নাম আছে, সঙ্গেসঙ্গে ভাববে ওখানেই আছে শাহ সুজার সেই সম্পদ। কিন্তু আসলে এর পুরাটাই ধোঁকা আর ফাঁকিবাজি। সত্যিকার অর্থে সেই সম্পদের ক্লু যদি কোথায় থেকে থাকে তবে সেটা আছে, এই তৃতীয় আর সবচেয়ে লম্বা বিন্দুটাতে,' বলে সে তৃতীয় লাইনটাতে আঙুল রাখল।

'এখানে তো আগের দুটোর মতো কিছু লেখা নেই। আছে শুধু দুটো গম্বুজের মতো ছবি। তার নিচে লেখা,' শারিয়ার চোখ কুঁচকে দেখতে দেখতে বলে উঠল, 'চট্টগ্রামের প্রথম আদালত ভবন।'

'টমি সার্চ দাও তো। এটার ব্যাপারে আমার আসলে খুব একটা আইডিয়া নেই,' শশী বলে উঠল।

'আমার তো জানার প্রশ্নই ওঠে না,' শারিয়ার ভুবনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'ভুবন?'

কিন্তু ভুবন জবাব দেওয়ার আগেই ওদের পেছন থেকে সুমন কথা বলে উঠল অনেকক্ষণ পর। 'আমি জানি, কারণ ওখানে আমি অনেকদিন ডিউটি করেছি। এইটা চট্টগাম কোর্ট হাউস। অনেক পুরনো বিল্ডিং। পরীর পাহাড়ে।'

'সুমন ভাই ঠিকই বলেছেন,' বলে টমি তার হাতে ধরা ট্যাবটা এগিয়ে দিল শশীর দিকে। 'এই যে দেখেন, এটা হলো চট্টগ্রামের কোর্ট হাউস। আঠারোশ শতকের শেষ দিকে ইন্দো-ব্রিটিশ স্টাইলে বানানো একটা ভবন। ওখানে লেখা আছে না চট্টগ্রামের পুরনো কোর্ট হাউস। এমনকি ডক্টর আবদেলের ওখানে থাকা মিনার দুটোর ছবিও মিলে গেছে দেখেন,' বলে সে ট্যাবটা এগিয়ে দিল শশীর দিকে।

শশী ট্যাবটা হাতে নিয়ে সেটাকে ল্যাপটপের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখল। তার কাঁধের ওপর দিকে উঁকি দিচ্ছে বাকিরা। 'এটাই, এটার কথাই বলা আছে এখানে,' ঘোষণা দেয়ার সুরে বলে উঠল শশী।

'মানে কী? ওখানে গেলে শাহ সুজার সেই সম্পদ পাওয়া যাবে?' ভুবনের মুখের এক্সপ্রেশন দেখে মনে হলো, এরকম বেকুবের মতো কথা সে জীবনে শোনেনি।

'সেই আশা করোনা,' শশী জোর গলায় বলে উঠল। 'তবে এটা বলা যেতেই পারে যে ওখানে গেলে ডক্টর আবদেলের সাজানো কোনো না কোনো ক্লু আমরা পাব, যেটা আমাদের এই সার্চের পরের ধাপে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আর সেটা পেতে হলে আমাদের ওখানে যেতে হবে,' বলে সে ল্যাপটপের ওই ছবি দেখিয়ে বলে উঠল, 'ওই কোর্ট হাউসে কিছু না কিছু একটা অবশ্যই আছে।'

'কাল সকালে যেতে হবে আমাদের ওখানে,' বলে দেয়ালের ঘড়ি দেখাল শারিয়ার। 'রাত যথেষ্ট হতে যাচ্ছে। আমরাও সবাই ক্লান্ত। একটু পর রাতের খাওয়া সেরে সবাই ঘুমাও। কাল বহুত কাজ। আর শুরুটা করব আমরা কোর্ট হাউস থেকে। ব্যাপারটা আমাদের বর্তমান অবস্থায় যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ হতে যাচ্ছে।'

'খুব ভালো,' ফোড়ন কাটার মতো বলে উঠল সুমন। 'পুলিশ থেকে পালিয়ে এমন জায়গায় যেতে হবে যেটা হলো সব আইনের মানুষের আখড়া।'

অধ্যায় একচল্লিশ

সময়: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

মগদোষীদের গ্রাম, জংলাটিলা, দক্ষিণের সমুদ্র

পানি কী কখনো মানুষকে আগুনের অনুভূতি দিতে পারে? প্রশ্নটা শুনতে অদ্ভুত শোনালেও যদি কখনো আপনার শ্বাসনালি দিয়ে পানি ঢুকে যায় তাহলেই বুঝতে পারবেন পানি কী আদৌ জ্বলন্ত অনুভূতি দিতে পারে কী পারে না। ফুসফুসের ভেতরে একবার ভুল পথে পানি ঢুকে গেলেই মনে হবে ভেতরে আগুন ধরে গেছে।

কিরানও ঠিক সেই একই আগুনের অনুভূতি নিয়ে কাশতে কাশতে সোজা হয়ে বসল। প্রথমেই মুখ থেকে উগলে দিল একরাশ নোনা পানি। সেটা উগড়ে দিয়েও শান্ত হলো না। কাশতেই থাকল। কেউ একজন তার ওপরে ঝুঁকে ছিল কিন্তু তাকে সোজা হয়ে বসতে দেখে সরে গেছিল মানুষটা। এবার কাশতে দেখে আবার কাছে এসে পিঠের ওপরে দুটো থাপ্পড় মারল জোরে জোরে। কিরান আরো খানিকটা নোনা পানি উগড়ে দিতেই কাশির বেগ খানিকটা কমে এলো।

জ্ঞান ফেরার পর প্রথমবারের মতো অনুভব করল কোথায় আছে সে। স্রোতের মতো ভেসে এলো একটু আগের স্মৃতি। সেইসঙ্গে মনে পড়ে গেল কী ঘটেছিল তার সঙ্গে। মুখ তুলে ঝট করে আশেপাশে তাকাল সে, কারা আছে চারপাশে অন্ধকারের ভেতরে বুঝতে না পেরে অন্ধের মতো হাত পা চালাল চারপাশে।

কেউ একজন পেছন থেকে টেনে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল তাকে। কিরান আধবসা অবস্থাতেই চিৎকার করে উঠল। করতেই থাকল।

'জাহাজি, তুমি ঠিক আছ,' কেউ একজন জোর জানতে চাইল কিরানের পাশ থেকে। 'তুমি ঠিক আছ জাহাজি, এখানে তোমার কোনো শত্রু নেই।'

কিরান আবারও মাটিতে বসে পড়েছে হাঁটু গেড়ে নিজের জাহাজ নিজের সঙ্গীদেরকে হারানোর স্মৃতি মনে পড়তেই সে আবারও চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তার চারপাশে দাঁড়ানো নারী যোদ্ধারা কিরানের অবস্থা দেখে একে অপরের দিকে ইশারা বিনিময় করল। পদ্ম এগিয়ে গেল কিরানের দিকে। 'তুমি ঠিকই আছ জাহাজি। আহত হইলেও তেমন কোনো ক্ষতি হয় নাই।'

'আমার জাহাজ, আমার লোকেরা, সবাই,' কিরান কিছুতেই স্থির হতে পারছে না। নিজের দুই হাত ঘসছে সে বুকের সঙ্গে। ছোটো বাচ্চারা ভয় পেলে কিংবা

ব্যথা পেলে যেভাবে ঘসে অনেকটা তেমনভাবে। 'আবারও হাইরা গেলাম আমি। আবার বোকার মতো আমার আবেগ, আমার বোকামির মাশুল দিতে হইল আমার মানুষগরে। সবাইকে মরতে হইল আবারও আমার কারণে,' কিরানের গলায় হাহাকার।

'এটা নাও,' বলে পদ্ম একা আরকের বোতল এগিয়ে দিল কিরানের দিকে। সে একবার নিজের সঙ্গীদের দিকে দেখে নিল। সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। পদ্ম একবার সামনের সমুদ্রের দিকেও দেখে নিল। সেখানে তেমন কোনো নড়াচড়া নেই এই মুহূর্তে কিন্তু যেকোনো কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। তার দলের একজন ইশারা বিনিময় করল। ওদের যত দ্রুত সম্ভব সরে পড়তে হবে এখান থেকে।

'জাহাজি এইটা গলায় ঢাইলা দাও, ভালো লাগব,' পদ্ম বোতলটা কিরানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কিরানের পাশে। 'জাহাজি, তুমি হয়তো বিশ্বাস করবা না, কিন্তু আমি জানি তোমার এহন কেমন লাগতাছে। সব হারানোর যন্ত্রণা আমার চায়া ভালো কেউই জানে না,' শেষ কথাটা বলতেই কেন জানি পদ্মের চোখে ভেসে উঠল নিজের ছেলের চেহারাটা। বহুবছর ছেলের কথা মনে পড়েনি তার। এখন কেন মনে পড়ল কে জানে। এত বছরে তার ছেলেটা হয়তো অনেক বড়ো হয়ে গেছে, কিন্তু মনের চোখে সে তার ছেলেকে এখনো আগের মতো ছোটোই দেখতে পায়।

কিরান বোবার মতো বোতলটা নিয়ে গলায় ঢেলে দিল আগুনে তরল। খানিকটা কেশে উঠে বোতল মুখে লাগিয়ে ঢোক গিলল।

পদ্ম দেখল কিরানের ভেজা শরীর আর মুখের এখান-ওখান থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। মানুষটাকে এখান থেকে সরানো দরকার। কিন্তু তার আগে দরকার তার মনোবল ফিরিয়ে আনা। পদ্ম বোতলটা কিরানের হাত থেকে নিয়ে নিজেও গলায় ঢেলে দিল দু ঢোক। 'জাহাজি তুমি হাইরা গেছো ঠিকই। কিন্তু এখনো সব শেষ হয় নাই। এখনো তোমার জন্য সুযোগ আছে আবারও সব ঠিক করার।'

কিরান কোনো কথা না বলে তাকিয়ে আছে পদ্মের দিকে। 'আমি যা বলছি ঠিকই বলছি,' পদ্ম আবারও কথা বলে উঠল। সে সামনের সমুদ্রের দিকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'শত্রু এহনো সামনের সমুদ্রে বিদ্যমান। ওগোর সঙ্গে আমাগো লড়াই আসন্ন। তুমি চাইলেই আমগো সঙ্গে যোগ দিতে পারো।'

'মানে?' এই প্রথমবারের মতো কিরানের মনে হলো সে কোথায় আছে জানা দরকার। এই নারী দস্যু কী বলছে বোঝা দরকার। এক হাতেই নিজের মুখের কাটা জায়গাটা চেপে ধরল সে। ওখান থেকে আবারও রক্ত বেরুচ্ছে। বুকের পাশে যেখানে সিলভেরা আঘাত করেছিল সেখানটায় চিনচিন করছে। পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে কিনা কে জানে এই প্রথমবারের মতো কিরানের মনে হলো, তার জানা দরকার সে কোথায় আছে, তার সঙ্গীরা কোথায় আছে, আদৌ যদি তারা বেঁচে

থাকে। 'আমরা আছি কোথায়? তোমরা আমারে খুঁইজা পাইলা কই? আমার সঙ্গী আর জাহাজ...?' কিরানের একের পর এক প্রশ্ন শুনে হেসে উঠল পদ্ম। সে আড়চোখে একবার নিজের বাকি সঙ্গীদেরকে দেখল।

'বুঝতে পারছি জাহাজি, তোমার অনেক প্রশ্ন, আমি একে একে উত্তর দিই। তবে তার আগে আমগো এহান থেকে সরে পড়া দরকার। তুমি কী হাঁটতে পারবা?' কিরান বসা থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। পড়তে নিয়েও সে আবার সোজা হয়ে গেল। শরীরের নানা জায়গাতে অসহ্য ব্যথা থাকলেও হাত-পা নেড়ে বুঝতে পারল কোথাও হাড় ভাঙেনি।

'চলো এগোতে এগোতে কথা বলি,' পদ্ম কিরানের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছে। বাকিরা দুইপাশে সারি দিয়ে এগোচ্ছে ওদের সঙ্গে। কিরান দেখল এরা নারী যোদ্ধা হলেও এদের ভেতরে শৃঙ্খলা সাংঘাতিক। অন্ধকারের ভেতরে খানিকটা এগিয়ে ওরা পাথুরে ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল। কিরান অবাক হয়ে দেখল ওরা পাহাড়ি ঢালে হাতে কেটে বসানো পাথরে ধাপ বেয়ে পাহাড়ের ওপরে দিকে উঠতে শুরু করেছে। ওপরের দিকে উঠতে গিয়ে কিরানের পা টানতে লাগল।

'তুমি ঠিক আছ জাহাজি?' কিরানের টানতে থাকা পায়ের দিকে তাকিয়ে পদ্ম প্রশ্ন করল। কিরান মাথা নেড়ে জানাল, সে ঠিক আছে।

'ঠিক থাকলে তো ভালোই। কারণ আমি যা বলতে যাইতাছি সেইটা বুঝতে হইলে তোমার ঠিক থাকাটা অত্যন্ত জরুরি।'

'আমার লোকেরা, মানে আমার সঙ্গে যারা ছিল তারা...'

'সব জানতে পারবা, তার আগে শোনো আমি কী বলি। মনোযোগ দিয়া শুনবা। কারণ পরে আবার বলতে পারব না। বলার মতো সময়ও পাব না। কাজেই মন দিয়ে শোনো। এখানে কী হইতাছে তুমি কিছুই জানো না। পুরো খেলা বুঝতে হইলে তোমারে আমার কথা শুনতে হইবে ভালোভাবে। তুমি তো সন্দ্বীপ থেকে এখানে আসছো তোমার বাপুর জাহাজ উদ্ধার করার জন্য, তাইনা?'

কিরান কিছু না বলে তকিয়ে রইল মেয়েটার দিকে। সামান্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল শুধু।

'তাহলে তোমারে জানাইতে বাধ্য হইতাছি যে, তোমার বাপু এই জংলাটিলা এলাকায় নাই। মানে যে জাহাজ সন্দ্বীপ থেকে রওনা দিছিল, যেটারে অনুসরণ কইরা সিলভেরা এহানে আসছে, আর সিলভেরাকে অনুসরণ কইরা তুমি এহানে আসছো তারে উদ্ধার করতে, সেই জাহাজে তোমার বাপু ছিলই না। সবাই যা ধারণা করছিল তা আসলে ভুল। রোসাঙ্গে যখন সম্রাট সুজাকে হত্যা করা হয় তহন সেইখান থেইকা সে একটা জাহাজ নিয়ে সরে পড়েছিল ঠিকই। কিন্তু সবাই যেমন জানে সেই জাহাজ রোসাঙ্গের রাজা মগ আর পর্তুগিজদের ঘেরের ভেতরে আটকা পড়ছিল, এই তথ্য ভুল। ওরা ঘের তৈরি করার আগেই তোমার বাপুর জাহাজ

চইলা আসছিল এই জংলাটিলাতে। এইখানে সে আমাগো কাছে সম্রাট সুজার ওইখান থেইকা নিয়ে আসা জাহাজের সব জিনিস গচ্ছিত রাইখা যায় এবং আমারে কিছু নির্দেশনাও দিয়া যায়। যেটা অনুসরণ করেই আমি তোমাকে সন্দ্বীপে কবিকে উদ্ধার করার জন্যই রওনা দিয়েছিলম।'

'এর মানে কী?' কিরান ওপরে উঠতে উঠতে থেমে গেল। 'বাপু আগেই এখানে আসছিল। এইখান থেইকা সে কই গেছে?'

'সরাসরি সেইটা জানতে না পারলেও এইটা পরিষ্কার যে, সে এইখান থেকে চাঁটগায়ে যায়। সেখানে আকরাম বেগসহ বাকিদের সে কিছু নির্দেশন দেয় যাতে তারা তোমাকে নিয়োগ দিতে পারে। আর তুমি সিলভেরারে শেষ কইরা জিনিসগুলোর উদ্ধার করে বাঙাল মুল্লুকে সরায়ে নিতে পারো। কিন্তু এরপরে সে কই গেছে কেউই জানে না।'

'কারণ কী এইসব করার পেছনে? আর সেই জাহাজটাই-বা কই? তার চেয়ে বড়ো কথা তোমার সঙ্গে বাপুর সম্পর্ক কী? যে সে তোমাকে এই বিপুল ধনরাশি দিয়ে গেল আর তুমিই বা সেগুলোকে রক্ষা করলা কেন?'

'শোনো জাহাজি,' পদ্মের গলায় কোনো ভাব নেই। সে একটানা বলে চলেছে। 'তুমি হয়তো জানো না আমরা কারা। হয়তো দস্যু হিসেবে আমাদের নাম শুনেছো আমরা সবাই মগদোষী। মগদোষী চিন তো?' বলে সে কিরানের দিকে তাকিয়ে রইল, কিরানও তাকিয়ে আছে। 'তোমার বাপরে আমিও বাপু ডাকি কারণ সে নিজে আমারে নিজের মেয়ে মনে করত। তোমার বাপু আমার মতো অনেক মেয়েরে পথের ধার থেইকা তুইলা আইনা বাঁচার আশ্রয় দিছে। যে কারণে তোমার বাপু আমগো কাছে অনন্য। সে মরতে বললে আমরা সেইটাও করতে রাজি। আর সম্পদ তো অনেক হালকা বিষয়।'

'তুমি আমাকে খুঁইজা পাইলা কই?'

'তোমরা সন্দ্বীপ থেইকা রওনা দেয়ার খানিক পরেই আমরা রওনা দিই কিন্তু তোমগোর অনেক আগেই জংলাটিলায় পৌঁছাই কারণ আমরা সংক্ষিপ্ত একটা পথ দিয়া চলাচল করি। যাই হোক, আমরা জানতাম সিলভেরা আর তোমগো বাহিনী এখানেই এক হইবে। সেই অপেক্ষাতেই ছিলাম। অনেকটা কইতে পারো। তোমগো বাহিনী আর সিলভেরার বাহিনীরে এই জায়গাতে এক করার পরিকল্পনাটা তোমার বাপুরই ছিল। আমরাও সেইটা জানতাম। কিন্তু তোমরা যে এইভাবে ধরা খাইয়া যাবা আমরা কেউই ভাবিনি। পরিকল্পনা ছিল এই জায়গাতে সিলভেরারে শেষ করতে পারলে তুমগো কাছে তোমার বাপুর রাইখা যাওয়া সম্পদ তুইলা দিলে আমাগো মুক্তি। কিন্তু তুমরা এইভাবে সিলভেরার ফাঁদের ভেতরে আইসা পড়বা কে ভাবছিল। যাই হোক; তোমগো জাহাজগুলা একে একে সিলভেরার লোকেরা ধ্বংস কইরা যখন খানিকটা দূরে সইরা পড়তে শুরু করে আমরা অন্ধকারের সুযোগ নিয়া

নৌকায় কইরা যতজনরে পারছি উদ্ধার করছি। তোমগো অনেকেই আছে ওপরে আমাগো গ্রাম মানে দুর্গে। তোমার সঙ্গীগোর ভেতরে অনেকেই বাঁইচা গেছে, অনেকেই মরছে। যারা বাঁইচা গেছে, মনে যাগো আমরা উদ্ধার করতে পরছি তারা ওপরে আছে। তবে তোমগো তিনটা জাহাজের ভেতরে দুইটা জাহাজই গেছে। অন্য একটা জাহাজ পলাইতে পারছে। তবে তার চেয়েও খারাপ খবর আছে জাহাজি।'

ওরা প্রায় পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ থেমে গেল পদ্ম। 'আমরা এখন যেখানে আছি সেখানে ঢোকার রাস্তা তো তুমি চিনোই। এইহানে পেছন দিয়া পলাবার রাস্তা আছে। সামনের রাস্তাতে সিলভেরার লোকেরা জাহাজ নিয়ে পাহারা দিতাছে আর পেছনে যেখানে আমগো জাহাজটা ছিল সেইখানটাও দখল করছে সিলভেরার লোকেরা। ওরা এইটাও খুব ভালা কইরাই জানে যে তালেব তৈমূরের সব সম্পদ আমগো এইখানেই আছে। কিন্তু আমরা জংলাটিলাতেই আছি এইটা ওরা জানে। কিন্তু ঠিক কোন জায়গাতে আছি সেইটা ওরা মনে হয় জানেনা। কিন্তু বাইর করতে বেশি সময় লাগব না। আর বাইর করা মাত্রই যেকোনো সময় আমগো ওপরে আক্রমণ চালাবে।'

কিরানসহ বাকিদেরকে নিয়ে পদ্মরা চলে এলো পাহাড়ি সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে। কিরান অবাক হয়ে দেখল ওপরে পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে মিলিয়ে একটা ছোটো দুর্গ। সেটার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। পাহাড়ের ওপর থেকে পুরো জংলাটিলা এলাকা আর সামনের সমুদ্র পুরোটাই দেখা যায়। সেদিকে মুখ করে দেয়ালের সঙ্গের প্রাঙ্গণে অনেকগুলো কামান। আর সেগুলোর সঙ্গে পাহারা দিচ্ছে নারী প্রহরীরা। 'দস্যু পদ্মরাণীর মগদোষীদের গ্রামে তোমারে স্বাগতম জাহাজি,' বলে পদ্ম নিজেও হেসে উঠল। আর তার সঙ্গে হেসে উঠল বাকিরাও। কিন্তু কিরান হাসার অবস্থায় নেই। সে ছুটে গেল প্রাঙ্গণের খোলা অংশের দিকে। সেখানে এপাশে বসে আছে পানি থেকে উদ্ধার হওয়া ওর লোকেরা। কিরান ছুটে গিয়ে প্রথমেই দেখতে পেল বেদু আর গোমেজকে। শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরল সে দুজনকেই। কিরানকে দেখে গোমেজের হাসি আর বাঁধ মানছে না।

'ওস্তাদ, তুমি বাঁইচা আছ?'

'বাকিরা কই?' কিরান জানতে চাইল। প্রাঙ্গণের ওখানে যারা আছে সবার দিকে চোখ বুলিয়ে নিল সে। 'গোলন্দাজ কই?'

'গোলন্দাজ রঙ্গন মল্লিক একেবারে জাহাজের সামনেই আছিল। সিলভেরার লুকানো বাহিনী যখন আমগোর ওপরে আক্রমণ চালায় সবার অবস্থা তখন খুব কাহিল একের পর এক আক্রমণে বিপর্যস্ত। যে যেদিক পারছে ছিটকা পড়ছে কিন্তু গোলন্দাজ তার জায়গা থেইকা এক চুলও নড়ে নাই। এমনকি সিলভেরার বাহিনীর

গোলার আঘাতে উইড়া যাবার সময় সে মুখে হাসি নিয়া কামানে গোলা ভরতেছিলো। এরপর জাহাজের সামনের অংশসহ উইড়া যায় সে। জাহাজও ডুইবা যায় একটু পরে। আমগো জাহাজের প্রায় তেমন কেউই বাঁচে নাই। যারা গোলার আঘাতে মরছে হেরা তো গেছেই, আর যারা পানিতে পড়ছিল হেগোরে-' কথা শেষ করল না সে। 'গোমেজ তোমারে নিয়া লাফ দিতেই আমিও পানিতে পাইড়া যাই। আমি প্রথম ডাঙ্গাত উঠলে পদ্মরা নিয়া আসে আমারে। পরে গোমেজ আসে। সবশেষে আসলা তুমি।'

'কোনো জাহাজটা পলাইতে পারছে?' কিরান গম্ভীর মুখে জানতে চাইল।

'পট্টবর্ধনেরটা,' শুনে কিরান মাথা নাড়ল। মনে মনে ও জানত। এই সরু পানিতে কেউ পালাতে পারলে একমাত্র সে ই পারবে। তারমানে তার জাহাজে যারা ছিল মানে বিল্লাল শেঠ, বৈঠা ওরা হয়তো নিরাপদ আছে।

'আর তুলারামের জাহাজ?'

'ওরা সবাই মরছে,' আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠল বেদু। কিরান আবারও হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে। কষ্টে বুকটা ফেটে যাচ্ছে ওর। কোনোমতে মাথা তুলে ভেজা চোখে তাকিয়ে সে জানতে চাইল। 'রহমত চাচা, সেই পতিত লোকটা আর কবি?'

'কবি আলাওল হেগো হাতে ধরা পড়ছে। রহমত চাচা অর পতিত লোকটা পট্টবর্ধনের জাহাজে আছিল। ওরা মনে অয় বাইচা গেছে।'

কিরান দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। কতক্ষণ বসে ছিল নিজেও জানে না। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল। পদ্মসহ বাকিদের কাছে এগিয়ে এসে সে জানতে চাইল, 'সিলভেরার কয়টা জাহাজ আছে এইখানে? ওর লগে কারা কারা আছে, সব জানতে চাই। সেইসঙ্গে আমার এই জায়গার একটা নকশা লাগব। আর লাগব তুমগো সব মানুষের হিসেব থেইকা শুরু কইরা অস্ত্রের হিসাব।'

পদ্ম কিছু না বলে তাকিয়ে রইল তার দিকে। 'কী করতে চাও জাহাজি?'

'তুমিই না বলছিলা ওরা যেকোনো সময় আক্রমণ চালাইতে পারে।'

'তারা আক্রমণ চালাবই, যেইমাত্র ওরা বুঝতে পারব আমরা ঠিক কোনো জায়গাতে আছি, সঙ্গেসঙ্গে আক্রমণ করব। তবে সকালের আগে পারব বইলা মনে হয় না। একবার আগগোর অবস্থান খুইজা পাইলে স্রেফ সকালের অপেক্ষা,' পদ্ম তার নিজের বাহিনীর দিকে ইশার করল সমর্থনের আশায়। সবাই মাথা নেড়ে সায় জানাল।

'আমিও তাই মনে করি, সকালের আগে ওরা আক্রমণ করব না। চাইলেও পারব না আসলে,' অনেকটা আনমনেই বলে উঠল কিরান। 'আমার একটা

পরিকল্পনা আছে। আমি জানি না কতটুক কী করা সম্ভব হবে কিন্তু এইরকম যুদ্ধে আমি আগেও অংশগ্রহণ করছি, কাজেই জানি কী করতে হবে। আমি চাই আমরা সেই পরিকল্পা অনুযায়ী প্রতিরোধ করি। বাঁচা-মরা পরে। যদি সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারি তবে একটা উপায় বাইর হইবোই।'

'তুমি জাহাজি। এত পরিকল্পনা আর লোক লস্কর লয়া নিজের জাহাজ বাঁচাইতে পারলা না। আমগো লাইগা কী করবা?' পদ্মের পাশ থেকে বিশালদেহী সেই মহিলা বলে উঠল।

কিরান আনমনেই মাথা নাড়ল। 'তুমগো লাইগ্গা না যতটা, তারচায়া বেশি নিজের লাইগ্গা। নিজের লুক যারা আছে তাগো লাইগা। এই ঠিক যতই তুমগো লড়াই বলি এইটা আসলে আমার লড়াই,' বলে সে পদ্মের দিকে এগিয়ে গেল দুই পা। 'বাপু সবসময়ই বলত, বুকের বলই সবচেয়ে বড়ো বল,' বলে সে বুকের সঙ্গে ঝুলতে থাকা লকেটটা চেপে ধরল দুই হাতে। 'এই জংলাটিলায় আরেকবার আমি সেটাই প্রমাণ করতে চাই।'

পদ্ম কিছু না বলে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর ফিরে তাকাল নিজের লোকেদের দিকে। 'ঠিক আছে জাহাজি, জীবন দিয়াই যদি জীবনের মূল্য চুকাইতে হয় এই জংলাটিলাতেই আরেকবার আমরা প্রমাণ করব সেইটা।'

অধ্যায় বিয়াল্লিশ

বর্তমান সময়

কোর্ট হাউস, পরীর পাহাড়, চট্টগ্রাম

'আল্লাই জানে কোনো বিপদে যে পড়ব এইখানে ঢুকলে,' আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠল সুমন। সুমন যখন নিচু হয়ে কথাটা বলল নিজের পায়ের খাপের ভেতরে ছুরিটাকে ভালোভাবে আটকে নিচ্ছিল শারিয়ার। কথাটা কানে যেতেই ফিতে বাঁধা শেষ করে রাগের সঙ্গে ঝটকা দিয়ে সোজা হলো সে। ইচ্ছে সুমনকে কড়া ভাষায় কিছু একটা শুনিয়ে দেবে।কিন্তু উঠে বসে সুমনের দিকে তাকিয়ে তার চেহারার করুণ অবস্থা দেখে হেসে ফেলল সে।

নিজেকে উত্তেজিত হতে না দিয়ে শান্ত ভাষায় বলে উঠল, 'সুমন, এত চিন্তা করার দরকার নেই। আমরা তোমাকে নিয়ে ভেতরে যাব না,' বলে শারিয়ার আদালত প্রাঙ্গনের দিকে। ফিরে তাকাল তারপর নিজের হাতের ঘড়ি দেখল। দশটা বেজে সামান্য বেশি। আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে ওদেরকে। আদালত প্রাঙ্গণটা আরেকটু জমজমাট হলে মানুষজনের ভিড় আরেকটু বাড়লে যেতে হবে ভেতরে। না হলে লোকজনের চোখে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আসলে লোকজন না বলে বলা উচিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনের চোখে। কাজেই ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। রাতের আলোচনা শেষ হওয়ার পর সকালে উঠে ওরা সবাই বেশ দ্রুত গোসল সেরে নাশতা করে নেয়। তারপর শারিয়ারের বাড়িতে থাকা সাদা এসইউভিটা নিয়ে বেরিয়ে আসে আদালত প্রাঙ্গণের উদ্দেশ্যে। গাড়ি নিয়ে ওরা পৌছে যায় বেশ সকাল সকালই। কিন্তু পৌছে গিয়ে দেখে লোকজনের ভিড় তেমন নেই বলতে গেলে। সেজন্যই শারিয়ারের নির্দেশে ওরা অপেক্ষা করছে ভিড় আরেকটু বাড়ার জন্য। কারণ সুমনের তথ্য মতে এগারোটার ভেতরেই আদালত প্রাঙ্গণে মানুষের জ্বালায় পা ফেলার জায়গা থাকবে না।

শারিয়ার আজ বসেছে সামনের সিটে। একেবারে পেছনে বসেছে ভুবন। আর মাঝখানের সিটে বসে টমি আর শশী কাজ করছে। টমির হাতে তার সেই ল্যাপটপ। আর শশী সেই অ্যাপলের ট্যাবটা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখছে ওটার ভেতরে। 'নতুন কিছু পেলে?' জানতে চাইল শারিয়ার।

'চেষ্টা করছি,' শশী জবাব দিল। 'ভবনটার একটা নকশা পেয়েছি, টমি ওটাকে অটোক্যাডে দিয়ে অনেকটা থ্রিডি মডেলের মতো একটা মডেল বানানোর চেষ্টা করেছে। সেটা নিয়েই কাজ করছি,' বলে সে একটু থেমে যোগ করল। 'ভবনটা বানানো হয়েছে আঠারো শতকের একেবারে শেষ দিকে। এই কারণেই এটাতে ব্রিটিশ আর মোঘল স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। বিশেষ করে এটা অনেকটাই মোঘলদের নির্মাণের মতো। ভবনটার আকৃতি পাহাড়ের সঙ্গে সাজুয্যতা রেখে এমনভাবে বানানো হয়েছে যেন দ্বিতল ভবনটা পাহাড়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিন তলা ভবনের মতো দেখায়। আর সেটার ওপরে যোগ করা হয়েছে ওপরের দুটো মিনার আর মিনারের ওপরে গম্বুজ। প্রশ্ন হলো, এরকম একটা জায়গার, মানে এত বিরাট একটা ভবনের কোনো জায়গাতে সম্ভাব্য থাকতে পারে সেই ক্লু যেটা আমাদেরকে ভিন্ন কিছুর লোকেশন বর্ণনা করবে।'

'এইখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে,' একেবারে পেছনের সিট থেকে ভুবন বলে উঠল, 'যে সম্ভাব্য ক্লু আপনি খুঁজছেন সেটা কী সেই পুরনো আমলের কিছু? নাকি পরে প্লান্ট করা হয়ে থাকতে পারে?'

'দুটোই হতে পারে, তবে প্রথমটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ যে সময়ের ঘটনা আমরা এনালিসিস করছি এই ভবনটা বানানো হয়েছে তার অনেক পরে। কাজেই সম্ভবত এমন কিছু একটা খুঁজছি আমরা যেটাকে হয়তো পরে প্লান্ট করা হয়েছে।'

'সেই ক্ষেত্রে আমার ধারণা ভবনটার সঙ্গে পুরো একটা নতুন অংশ লাগানো হয়েছে সেখানেই কিছু একটা থাকতে পারে। কিন্তু,' ভুবন আগ্রহের সঙ্গে নিজে মাথা দুই সিটের মাঝখান দিয়ে শশী আর টমির মাঝখানে এসে ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে আছে। 'সেই ক্ষেত্রে আরেকটা পয়েন্ট হলো এই জিনিসটা কী আপনার বাবা প্লান্ট করেছে নাকি অন্য কেউ?'

'খুব জোর সম্ভাবনা বাবাই করেছে,' ভুবন কী বলতে চাচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছে শশী। 'কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কোথায় খুঁজব, কোথা থেকে শুরু করব, এত বড়ো বাড়িটাতে। এরকম একটা বাড়ি বিস্তারিত তল্লাসি চালাতে গেলে একদল লোকের একমাসের ওপরে লেগে যাবে,' শশীকে বেশ খানিকটা হতাশ দেখাচ্ছে।

'সেক্ষেত্রে আমার একটা অ্যানালিসিস আছে,' ভুবন বেশ আগ্রহে মুখ সামনে নিয়ে এলো। 'স্রেফ আমার একটা অ্যানালিসিস, আমি কাল রাত্রে এমনিতেই ভাবছিলাম বিষয়টা নিয়ে। ধরুন এই যে বিরাট কোর্ট হাউসটা,' বলে সে ওদের থেকে বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত কোর্ট হাউসটা দেখাল হাতের ইশারায়। 'এরকম বিরাট একটা বাড়িতে যেখানে সর্বক্ষণ লোকজন আসা-যাওয়া করছে, মানুষজনে

গমগম করে এরকম একটা বাড়িতে আপনি যদি কিছু একটা লুকিয়ে রাখতে চান ভবিষ্যতে কেউ যাতে খুঁজে পায় সে-উদ্দেশ্যে তবে আপনি কোথায় লুকাবেন সেটা'।

'এমন একটা জায়গাতে যেখানে লোক সমাগম কম,' সামনের সিট থেকে মাথা ঘুরিয়ে বলে উঠল শারিয়ার।

'ভেরি গুড, বস। আই লাভ ইউ,' বলে সে হেসে উঠে আবারও বলতে শুরু করল ভুবন। 'অমন জায়গা এরকম একটা কোর্ট হাউসে কোথায় পাওয়া যেতে পারে?' বলে সে সবার দিকে তাকিয়ে রইল। 'হয় কোনো তালাবন্ধ রুমে, অথবা কোনোবড়ো কর্মকর্তার কামরায় বা এরকম কোথাও। ঠিক?'

কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিল না দেখে সে নিজেই বলতে শুরু করল। 'কিন্তু এমন কোথাও জিনিসটা লুকানোও তো রিস্ক। আবার ওটাকে কেউ না কেউ কোনোনা কোনো সময়ে খুঁজে পেয়ে যেতে পারে। আমাদের প্রফেসর সাহেব নিশ্চয়ই এরকম কোনো জায়গাতে কিছু রাখবে না, যেখানে এরকম কিছু ঘটতে পারে। কাজেই সে চেষ্টা করবে এমন কোথাও জিনিসটা রাখতে যেখানে লোক সমাগম নেই, আবার ওখানে কেউ ওটাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই,' বলে সে একটা আঙুল তুলল নিজের। আবার জায়গাটার একটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। এমন জায়গা কোর্ট হাউজের ভেতরে কোথায় থাকতে পারে?'

'ছাদে,' শশী আনমনেই বলে উঠল।

'আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে,' ভুবন হেসে উঠে বলে উঠল। 'কোর্ট হাউসের ওই মিনার দুটোতে কিংবা ওই দুটোর একটাতে। ট্রাস্ট মি, আমি আগেও এই অফিসে এসেছি। ওই মিনার দুটোতে ওঠার জন্য ভেতরে প্যাঁচানো সিঁড়ি আছে। তবে ছাদে ওঠার দরজায় তালা লাগানো থাকে।'

'দারুণ, দারুণ অ্যানালিসিস,' শশী প্রায় হাততালি দেওয়ার মতো খুশি হয়ে বলে উঠল। 'সুমন আর ভুবন, আপনারা যেহেতু এখানে আগে এসেছেন কাজেই আপনাদের কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।'

শশী ওদেরকে প্রশ্ন করতে লাগল, শারিয়ার বেরিয়ে এলো গাড়িটার ভেতর থেকে। ভেতরে ওর দম বন্ধ লাগছিল, সেইসঙ্গে ওর জরুরি কিছু ফোন কল করতে হবে। একটু আগে কেনা বেনসনের প্যাকেট খুলে ওটা থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগাল সেই সঙ্গে নম্বর ডায়াল করতে লাগল সে।

শারিয়ারের মোবাইলে কল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় দেখল গাড়ি থেকে নেমে আসছে শশী টমি আর ভুবন। শারিয়ার কল কেটে ফোন রেখে দিল পকেটে। শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে শশী বলে উঠল, 'আমরা মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছি। এখন ওই মিনার দুটোতে উঠতে হবে। ওখানে কিছু একটা যদি পেয়ে যাই তবে ঝামেলা অনেক কমে যাবে।'

'সুমন কই?' শারিয়ার সিগারেটাকে পিষে দিয়ে জানতে চাইল।

'সুমন ভাই গাড়িতেই থাকবে,' টমি বলে উঠল। 'তার জন্য ওখানে যাওয়াটা অনেক বেশি রিস্কি হয়ে যাবে।'

গাড়িতে বসা সুমনের দিকে এক পলক দেখে নিয়ে একবার হাত নেড়ে ইশারায় তাকে সাবধান থাকতে বলে বাকিদের নিয়ে সামনের দিকে এগোল ওরা।

'আমার সঙ্গেসঙ্গে এসো,' ভুবন কথাটা বলে নিজের হুডিটা তুলে দিল ওপরের দিকে। বাকিরা তাকে অনুসরণ করে বিরাট কোর্ট হাউসটার সামনের দিকে চলে এলো। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে বরাবর বাম দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে ওপরে লেখা কমিশনারের কার্যালয়। আর ভবনরটার একেবারে সামনের অংশে লেখা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় লেখা অংশটার নিচ দিয়ে ঢুকে পড়ল ওরা।

'কি দারুণ একটা স্থাপত্য,' লোকজনের ভিড় ঠেলে ভেতরে যেতে যেতে শশী মুগ্ধতার সুরে বলে উঠল। 'আমি বিশ্বের সেরা সেরা সব স্থাপনা দেখেছি। দিল্লির লাল কেল্লা আমার অন্যতম প্রিয় স্থাপনা, এই ভবনটা দেখে সেই স্থাপনাটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এরকম একটা স্থাপনা অন্য কোনো দেশে থাকলে...' আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগল সে।

'শোন, জীবনের মূল্য যে জাতির কাছে অর্থের মূল্যের চেয়ে কম সেদেশে তুমি আশা করতে পারো না যে প্রাচীন স্থাপত্যকে মূল্যায়ন করা হবে।'

'এইটাই হয়। যার কাছে যেটা অনেক বেশি আছে সেটা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে মানুষ বেশি তো তাই মানুষের কোনো দাম নেই।'

ভুবন বাকিদের নিয়ে ভেতরে ঢুকে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে চলে এলো দুই তলা ওপরে। তারপর ভিড় ঠেলে একপাশে সরে গিয়ে ওদেরকে ইশারা করল ওদিকে যাওয়ার জন্য। ওরা মূল করিডরের সঙ্গেই লাগোয়া একটা দরজা দেখতে পেল। কিন্তু ওটার সামনে গিয়ে অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে শারিয়ারের দিকে ইশারা করল ভুবন। দরজাটায় পুরনো আমলের বিরাট একটা তালা ঝুলছে। শারিয়ার একবার আশেপাশে দেখে নিল। চারপাশে এত মানুষ, এর ভেতরে কোনোভাবে তালা ভাঙার চেষ্টা করাটা অসম্ভব মনে হচ্ছে। হাতাশার সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকাল শারিয়ার।

'অন্য কোনোদিক দিয়ে ঢোকার উপায় নেই?' শশী জানতে চাইল বিরক্ত মুখে। খানিকটা অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

'আছে মনে হয়। কিন্তু আমি আসলে ভুলে গেছি,' বলে সে হুডি নামিয়ে মাথা চুলকাল। 'চলো দেখি নতুন ভবনের সঙ্গে এই পুরনো ভবনটার সংযোগ আছে বেশ কয়েকদিক থেকে। আমার মনে হয় পেছনের নতুন ভবনটা দিয়ে চাইলে এটার ছাদে পৌঁছানো সম্ভব হবে। চলো ট্রাই করে দেখি।'

ভুবন আগে চলতে লাগল, বাকিদের নিয়ে ভিড় ঠেলে এগোতে লাগল ওরা। পুরনো ভবন থেকে হেঁটে ওরা চলে এলো নতুন ভবনে। সেখানে সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উঠে তিনতলার একটা ফুট ব্রিজের সাহায্যে ভুবন আবার ওদের নিয়ে এলো অন্য একটা ভবনে। সেখান থেকে বেয়ে বেয়ে ওরা চলে এলো পেছনের ভবনে। পেছনের ভবনে এসে ভুবন খানিকটা তাল হারিয়ে ফেলল। 'টমি, আমাকে ভবনের নকশাটা দেখাতে পরবে?'

টমি ইশারা করল শশীর দিকে। শশীর নিজের ব্যাগ থেকে ট্যাবটা বের করে ভুবনের হাতে ধরিয়ে দিল। ভবনের নকশাটা একবার দেখ নিয়ে সে আনমনে মাথা নাড়াল, তারপর আবার হাঁটতে লাগল আরো দুটো পুল পার হয়ে ওরা চলে এলো সিঁড়িকোঠার মতো একটা জায়গাতে।

'হ্যাঁ, এটাই,' বলে সে সিঁড়িকোঠার দরজাটা দেখাল। 'এটা খুলতে হবে। এখান থেকে লাফিয়ে পুরনো ভবনের ছাদে নামা যাবে।'

শারিয়ার দেখল মোটা টিনের দরজাটায় সেই একই ধাঁচের পুরনো একটা তালা লাগানো। একবার চারপাশে দেখে নিল কেউ আছে কিনা। নিজের পিস্তল বের করে সাইলেন্সার লাগাল ওটাতে। তারপর তালার দিকে তাক করে গুলি করে দিল। ফচ করে একটা শব্দের সঙ্গে চৌচির হয়ে গেল পুরনো তালা। টিনের দরজাটায় একটা লাথি মারতেই কড়া সূর্যালোক ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপরে। দরজার ওপাশে একটা সাদা রং করা ছাদ আর সেই লাল মিনার দুটো দেখা যাচ্ছে। 'বলেছিলাম না!' মিনার দুটো দেখা যাওয়াতে খানিকটা স্বস্তি মনে হলো ভুবনের গলায়। সবাই একে একে সামনের দরজা দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল ওপাশের ছাদে। ওর পেছনে একে একে নেমে এলো বাকিরা সবাই।

ছাদে নেমেই ভুবন দেখল শশী সেই মিনার দুটোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। সে একবার আশেপাশে চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর নিজে ত্রস্ত পায়ে এগোল ওদিকে।

'আপনি আসলে খুঁজছেনটা কী একটু ভালোভাবে বলবেন?' শশীর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ভুবন জানতে চাইল।

'আসলে আমি যে কী খুঁজছি নিজেও ঠিক জানি না। তবে আমি বাবার স্বভাব কিছুটা হলেও জানতাম, কাজেই এমন কিছু একটা খুঁজছি, দাঁড়ান এক মিনিট,' বলে সে তালি দিয়ে সবাইকে কাছে ডাকল। 'সবাই একটু শুনবেন প্লিজ,' সবাই মোটামুটি কাছাকাছি আসতেই শশী বলতে শুরু করল। 'সবাই একটু ভালোভাবে চারপাশে নজর বোলাবেন। যেকোনো জিনিস যেটা একটু অন্যরকম মনে হবে, হয়তো একুট ব্যতিক্রম মনে হবে বা যদি খানিকটা চোখেও লাগে বা নজরে পড়ে

সঙ্গেসঙ্গে ডাকবেন আমাকে। যেকোনো কিছু। কারণ আমরা সঠিকভাবে জানিনা আসলে কী খুঁজছি,' বলে সে নিজেও দেখতে শুরু করল তার আগেই শারিয়ার কথা বলে উঠল।

'জলদি করতে হবে আমাদের। যতটা দ্রুত সম্ভব,' সবাই খোঁজার জন্য ফিরে তাকিয়েছিল কিন্তু শারিয়ারের কথা শুনে ফিরে তাকাতেই সে নতুন ভবনের জানালাগুলো দেখল, যেদিক দিয়ে ওরা ঢুকছে সেদিককার সবগুলো বড়ো বড়ো জানালা এই ছাদের দিকেই মুখ করে আছে। 'আমি নিশ্চিত লোকজন দেখছে আমাদের। কেউ না কেউ সন্দেহ করলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। কাজেই জলদি।'

সবাই চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল। শারিয়ার নিজে ব্যস্ত হয় পড়ল মোবাইল নিয়ে।

শশী এগিয়ে চলে এলো মিনারগুলোর কাছে। তার থেকে খানিকটা তফাতে ভুবন। 'যদি কিছু থাকে তবে এখানেই আছে।'

'হতে পারে,' শশী মিনারগুলোর দেয়ালে বসানো ছোটো ছোটো গোল ঘুলঘুলি দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। পুরোপুরি পরিষ্কারভাবে দেখা না গেলেও একদিকে দেখতে পেল প্যাঁচানো সিঁড়ি নেমে গেছে ভেতরের দিকে। 'বাবাকে তো আমি চিনতাম, সে এমন কিছু করবে না যাতে এরকম প্রাচীন স্থাপত্যের কোনো ক্ষতি হয়। আবার এমনভাবেও কোনো ক্লু ছেড়ে যাবে না যাতে জিনিসটা খুব সহজে নষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে যায় বা কেউ সরিয়ে ফেলতে পারে। তারমানে আমরা এমন কিছু খুঁজছি যেটা...' কথা বলতে বলতে ভুবন আর শশী প্রথম মিনারটা পরখ করা শেষ করে দ্বিতীয় মিনারটার কাছে চলে এলো। দুটো মিনার দেখতে প্রায় একইরকম। অনেকটা মিরর ইমেজের মতো বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় মিনারটার ঘুলঘুলির কয়টা কাঁচ ভাঙা। ওটা দিয়ে একবার ভালোভাবে ভেতরে দেখল শশী। ভেতরে দেখা শেষ করে মিনারের ইটের দেয়ালে হাত বুলাতে বুলাতে সে ভুবনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'যদি আমরা এখানে কিছু একটা না পাই তবে আমাদের মিনারের ভেতরে দেখতে হবে।'

'ব্যাপারটা কঠিন হবে,' বলে ভুবন আনমনে মাথা নাড়ল।

'দেয়ালের এই রংটা অবশ্যই অনেক পরে করা হয়েছে,' দেয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে শশী মন্তব্য করে উঠল। সে বুলানো হাতটা চোখের সামনে তুলে দেখল তাতে লাল লাল গুঁড়ো লেগে আছে। দেয়ালের অন্যপাশটাতে দেখতে যাবে হঠাৎই দেয়ালের এটা জায়গাতে হাত বুলাতে গিয়ে খানিকটা মসৃণ মনে হলো তার কাছে। চোখ ফিরিয়ে দেখল লাল দেয়ালের গায়ে এক জায়গাতে একটা পিতলের প্লেট বসানো। ভালোভাবে দেখার জন্য হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল সে। জিনিসটা এমনভাবে এমন জায়গায় লাগানো যে চট করে চোখে না পড়ে। শশী

দেয়ালে হাত বুলাতে না থাকলে হয়তো খেয়ালই করত না। কিন্তু এখানে এই পিতলের প্লেট বসানোর কারণ কী। এরকম প্লেট সাধারণত বসানো হয় নাম বা নির্দেশনা লিখে দেয়ালে লাগানোর জন্য। কিন্তু এটাতে সেরকমও কিছু নেই। প্লেটটা দেখে নিয়েই দৌড়ে অন্যপাশের মিনারটাতে চলে এলো সে। ওটার চারিপাশে দেখে নিয়ে সে এরকম কোনো প্লেট দেখতে পেল না।

'সবাই একটু শুনবেন প্লিজ,' সবাই তাকিয়েআছে শশীর দিকে, কিছু একটা সে পেয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। মিনারটার কাছে এসে সে ইশারায় দেখাল প্লেটটা। 'এখানে এই প্লেটটা দেখেন, এটা এখানে লাগানোর মানে কী?'

পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো সবাই। শারিয়ার প্লেটটার কাছে এসে বসে পড়ল। 'এ রকম প্লেট তো নাম বা ঠিকানা লেখার জন্য লাগায়।'

'কিন্তু এটা তো খালি।'

'হতে পারে এরকম প্লেট অনেক সময় দেয়ালের কোনো কিছু আড়াল করার জন্যও লাগানো হয়। এই যেমন ধরেন ইলেকট্রিক ওয়্যার বা অনেক সময় দেয়ালে গর্তটর্ত থাকলেও লাগানো হয়।'

'আমার মনে হয় এরকম কিছু একটা অবশ্যই আছে এখানে,' শশী বলে উঠে যোগ করল। 'এটা মোটেই স্বভাবিক মনে হচ্ছে না আমার কাছে।'

'খুলে দেখি,' বলে শারিয়ার গোড়ালি থেকে নিজের কার্বন মেটালের ছুরিটা বের করে এনে ওটার মাথা দিয়ে প্লেটের কোনোায় লাগানো বল্টুগুলো খুলতে শুরু করল। একে একে চারটা বল্টু খুলে সে প্লেটটা ধরিয়ে দিল পেছনে দাঁড়ানো শশীর হাতে। কিন্তু প্লেটটার ওপাশের দেয়ালে হাত দিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। কিছুই নেই সেখানে। একেবারে পরিষ্কার নিরেট দেয়াল। ধরে, টোকা দিয়ে, ঘুষি দিয়ে পরখ করল। এমনকি মাথা নামিয়ে কান পেতেও শোনার চেষ্টা করল। কিছুই শোনা যাচ্ছে না। সবভাবে পরীক্ষা করে সে সোজা হয়ে হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শশীর দিকে ফিরে তাকাল। 'কিছুই তো নেই ওটার পেছনে।'

কিন্তু শশী তার দিকে তাকিয়ে সে তার হাতে ধরো প্লেটটা দেখছে। ওটাকে ভালোভাবে দেখে নিয়ে বাকিদের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর বেশ খানিকটা রাগত ভঙ্গিতে বলে উঠল। 'ওটর ওপাশে কিছু পাবেও না কারণ যা থাকার এটাতেই আছে,' বলে সে হাতের প্লেটটা নেড়ে চেড়ে দেখাল।

উত্তেজনার সঙ্গে শশীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বেশ হতাশার সঙ্গে বোর্ডটা দেখে নিয়ে বলে উঠল। 'এটাতে তো লেখা...'

' 'বোকার দল',' শারিয়ারের অসমাপ্ত কথাটা ভুবন সমাপ্ত করল। পিতলের প্লেটটার অন্যপাশে ইংরেজিতে যা লেখা সেটার বাংলা করলে এটাই দাঁড়ায়। 'এ কেমন কথা, এতে কষ্ট করে শেষে... এটা কী ডক্টর আবদেল-'

‘পুরোটাই ছিল একটা ধোঁকা,’ বলে শশী মাথা নাড়ল। আমি বলেছিলাম বাবা এত সহজে’

‘এই এইখানে কী?’ পেছন থেকে হঠাৎ ধমক শুনে সবাই চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকাল। নিজেদের কাজে ওরা এতটাই মগ্ন হয়ে গেছিল যে, পেছনে ছাদে কেউ যে এসেছে খেয়ালই করেনি। ধমক শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখল দুজন পুলিশ উঠে এসেছে ছাদে।

‘এই, কথা শোনা যায় না? জিগাইলাম না এইখানে কী করস?’ দুই পুলিশের কড়া সন্দেহের দৃষ্টি ওদের ওপরে। দুজনারই একটা করে হাত পিঠে ঝোলানো শটগানের ওপরে।

পুলিশ দুজনকে দেখামাত্রই সবার প্রথমে সচেতন হয়ে উঠল ভুবন। শশীর একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সে। চট করে শশীর হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে নিজের শরীরের পেছনে নিয়ে গেল সে। আলতো করে সোয়েটারের পেছনে ঢুকিয়ে কোমরের কাছে গুঁজে রাখল ওটা। শারিয়ার নিজের একটা হাত নিয়ে গিয়েছিল পিস্তলের বাটের ওপরে ভুবন হাতের ইশারায় তাকে শান্ত থাকতে বলল তারপর পুলিশ দুজনার দিকে হাত নেড়ে কথা বলে উঠল।

‘কোনো সমস্যা নেই,’ বলে সে এগিয়ে গেল দুই ধাপ সামনের দিকে। ‘আপনারা এখানে মানে...?’

সে প্রশ্ন শেষ করার আগেই খেঁকিয়ে উঠল দুই পুলিশের একজন। ‘আমরা মানে? তোমরা কারা?’ তার গলায় সন্দেহের পারদ আরো এক ডিগ্রি ওপরে চড়ে গেছে।

‘এই সাবধানে কথা বলো,’ ভুবনকে চুপ হয়ে যেতে দেখে তার পেছন থেকে শারিয়ার এগিয়ে এলো সামনের দিকে। ‘কথা সাবধানে বলবে, আর গলা নিচে নামাও। তোমাদের কারণেই আমাদের এখানে আসতে হয়েছে আবার উঁচু গলায় কথা বলো,’ শারিয়ারের গলার পারদ উঁচু থেকে উচ্চতর হচ্ছে ধীরে ধীরে। ভুবন দেখল বাম হাত কোমরের কাছে। অন্য হাতটায় কিছু একটা ধরে আছে সে। কিন্তু সেটা দেখানোর আগেই একজন পুলিশ কথা বলে উঠল।

‘আমাদের জন্য মানে?’ শারিয়ারের ধমক মারার ধরন দেখে থমকে গেছে সে একটু। গলা খানিকটা নরম করে বলে উঠল। ‘আপনারা কারা?’

শারিয়ার নিজের আইডি কার্ডটা সামনে এগিয়ে দিল। ‘স্পেশাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন,’ লোকটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে শারিয়ারের কার্ড। সেটা শারিয়ার তার সামনে থেকে সরিয়ে নিল। ‘আপনাদের কারণে এখানে আসতে হয়েছে। কারণ আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে আদালত প্রাঙ্গণের ছাদে ছেলেপেলেরা নেশা করে,’ বলে সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পুলিশটার দিকে।

পুলিশ লোকটাকে খানিকটা বোকা বোকা দেখাল। সে একবার তার সঙ্গীর দিকে ফিরে তাকিয়ে তাকে একবার দেখে নিয়ে বলে উঠল। 'তাই নাকি? কই এরকম কিছু তো...?'

'আপনারা শোনেন নাই দেখেই তো আমাদের আসতে হলো। আমাদের কাছে ডিটেইল রিপোর্ট আছে এই আদালত প্রাঙ্গণের কিছু বখাটে ছেলেপেলে সন্ধ্যার পর তো বটেই এমনকি দিনের বেলাতেও এখানে ইয়াবা খায়। ওই যে,' বলে সে ওরা যেদিক দিয়ে ঢুকেছিল সেদিককার দরজাটা দেখাল। 'আমরা সরেজমিনের এসে ওই দরজার তালা ভাঙা পেলাম। তারমানে কি, হ্যাঁ,' বলে সে দুই পা এগিয়ে গেল পুলিশ দুজনার দিকে?

'আপনারা করেনটা কী? আমাদের কাছে আরো রিপোর্ট আছে। এই ছেলেপেলেরাই সন্ধ্যের পর নানা রাস্তায় অন্ধকারের ভেতরে ছিনতাই করে। গত পরশু দিনই তো সন্ধ্যে সাতটার দিকে এক উকিলের টাকা-পয়সা মোবাইল সব নিয়ে গেল। সন্ধে সাতটার সময়! ভাবতে পারো?' শেষ কথাটা বলে সে তাকিয়ে আছে ভুবনের দিকে।

'সেইটাই! ভাবাই যায় না,' ভুবন তার চেয়ে বেশি সিরিয়াস ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

দুই পুলিশের দুজনেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে অবস্থা দেখে। 'স্যার, আমরা তো এতকিছু জানি না। আমরা আসছিলাম ওই পাশের বিল্ডিং থেকে রিপোর্ট পেয়ে। ছাদে নাকি কারা ঘুর ঘুর করছে। তাই দেখতে এলাম এইগুলা তো আমরা বলতে পারি না,' দ্বিতীয় পুলিশ বলে উঠল। 'আমরা তো ডিউটি করি বিভিন্নজনে,' সেও সমর্থনের আশায় তার সঙ্গীর দিকে দেখল। সে তাকাতেই লোকটা জোরে জোরে মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল।

'সেইজন্যই এই অবস্থা,' বলে শারিয়ার ফিরে তাকাল তার সঙ্গীদের দিকে। পুলিশ দুজনেকেই আড়াল করে হাতের ইশারায় এগোতে বলল। 'এই এলাকায় একটা ক্রাইম হচ্ছে দিনে দুপুরে আদালত প্রাঙ্গণের মতো এমন জায়গাতে আর এইখানকার ডিউটি পুলিশদের কোনো খবরই নেই। এই হলো অবস্থা,' বলে সে পুলিশদের দিকে একটা আঙুল তুলে শাসানোর ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'আমি এটা আজই রিপোর্ট করব,' বলে সে বাকিদের সঙ্গে পা বাড়াল বাইরের দিকে। সেই সিঁড়ি ঘরটাতে এসেই তাড়া লাগাল সবাইকে, 'চলো চলো, জলদি চলো। একবার ধরে ফেলতে পারলে খবরই আছে,' বলে সবাই প্রায় দৌড়ানোর ভঙ্গিতে পা চালাল বাইরের দিকে।

একেবারে গাড়ির কাছে এসে দরজা খুলে সবাইকে ভেতরে ঢুকতে বলে শারিয়ার আশেপাশে দেখে নিয়ে গাড়ি ছাড়ল। 'হুফফ, বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছি। সুমন গাড়ি ছাড়ো।'

'কিছু পাওয়া গেল বস?' সুমন উদগ্রীব সুরে জানতে চাইল।

'আরে আগে গাড়ি ছাড়ো,' সুমন গাড়িটা ঘোরাতে শুরু করেছে সঙ্গেসঙ্গে পুলিশের কোনো তৎপড়তা চোখে পড়ে কিনা দেখার জন্য শারিয়ার জানালার কাঁচের ভেতর থেকে আশেপাশে নজর বোলাচ্ছে হঠাৎ সে একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠল। সুমন ততক্ষণে গাড়ি ঘুরিয়ে পাহাড়ের নিচে নামতে শুরু করেছে।

'আমার মনে হলো সেই চায়নিজ হুয়ানকে দেখলাম,' শারিয়ার এখনো মাথা বাড়িয়ে পেছনে ফিরে বোঝার চেষ্টা করছে ঠিক দেখল কিনা লোকটাকে।

'কী বলছো, এই ব্যাটা পিছু নিল কীভাবে আমাদের?' ভুবনও ওর সঙ্গেসঙ্গে দ্রুত দেখার চেষ্টা করছে পেছনে। 'এত দ্রুত খুঁজে পেল কিভাবে আমাদের?'

'বস, চায়নিজ দেখতে একটা লোক, নীল শার্ট পরা তাইনা?' সামনে থেকে সুমন জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' শারিয়ার বলে উঠল। 'নীল শার্টই তো মনে হলো। একটা গাড়ির জানালা দিয়ে লোকটাকে দেখলাম মনে হলো।'

শারিয়ারের উদগ্রীব গলায় শুনে সুমন হেসে উঠল, 'বস ওইটা হুয়ান না। আমিও ওরে প্রথমে দেখে খুব চমকে গেছিলাম। পরে ভালোভাবে দেখে বুঝলাম এইটা ওই ব্যাটা না।'

'আচ্ছা,' স্বস্তির নিঃশ্বাস শারিয়ারের গলায়। চোখ বন্ধ করে হেলান দিল সে এসইউভির সিটে। 'এখন কী?'

'এখন আর কী,' হতাশ গলায় বলে উঠল শশী। 'কী করব কিছুই তো বুঝতে পারছি না। এভাবে বোকা বনে গেলাম। সে হাতে ধরে রাখা পিতলের প্লেটটা দেখছে।

'ডক্টর শশী, আমার একটা কথা আছে,' হঠাৎ ভুবন বলে উঠলো। যদিও জানি না, কথাটা কতটা যৌক্তিক। বিশেষ করে আমি যখন একেবারেই আপনাদের লাইনের লোক নই। তবুও যেহেতু চট্টগ্রাম শহরটাকে আমি ভালোভাবে জানি, যেটা আপনি বা শারিয়ার স্যার জানেন না সেই হিসেবে একটা ব্যাপার আমার মাথায় খচখচ করছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। আমি সেটাই পরখ করে দেখছিলাম। সেই ধারণা থেকেই একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম।'

'এত ভদ্রতা করে কথা না পেঁচিয়ে বলে ফেলো সোনা,' শারিয়ার বলে উঠল। সবাই আগ্রহ নিয়ে ভুবনের দিকে তাকিয়ে আছে।

খানিকটা ভেবে নিয়ে বলতে শুরু করল ভুবন। 'আমি নিজে যেহেতু ডক্টর আবদেলকে চিনতাম না কাজেই তার ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই। তবে গত দুয়েকদিন ধরে তার ব্যাকগ্রাউন্ড শোনার পর থেকে এবং তার কাজ দেখার পর থেকে একটা ব্যাপার আমি বেশ বুঝতে পারছি, অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন

তিনি। এই কারণেই উনি যে মডেলটা তৈরি করেছেন উনি খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, উনি যতই লুকিয়ে কাজ করুন না কেন, একটা না একটা সময় জিনিসটা কারো না কারো হাতে পড়বেই। তাই পুরো ব্যাপারটাতেই উনি সাজিয়ে রেখেছেন একের পর এক ধোঁকার প্রলেপ।'

'একদম ঠিক,' শশী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'ডক্টর আবদেল পুরো জিনিসটাকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যেকেউ চাইলেই এর সমাধান করতে পারবে না। আমরা যখন প্রথম এনালিসিস করছিলাম সেখানে আদালত ভবনের গম্বুজ দুটোর ছবির সঙ্গে লেখা ছিল চট্টগ্রামের প্রথম আদালত। আমরা গুগলে সার্চ দিয়ে চট্টগ্রামের পুরনো ঐতিহ্যবাহী আদালত ভবন দেখে আর ওটার ছবির সঙ্গে ছবি মিলিয়ে লাফিয়ে পড়েছি। কিন্তু তখন ব্যাপারটা মাথায় ঘুরলেও একটা ব্যাপার খচ-খচ করছিল মাথার ভেতরে,' বলে সে সবাইকে দেখে নিয়ে দৃষ্টি স্থির করল শশীর ওপরে। 'জিনিসটা সমাধান করার উত্তেজনায় এখানে খুব সূক্ষ্ম একটা ব্যাপার আমাদের সবার নজর এড়িয়ে গেছে। '

'ব্যাপারটা কী?' শশী চিন্তিত ভঙ্গিতে জানতে চাইল।

'আমি বলি?' ভুবন জবাব দেয়ার আগেই শারিয়ার বলে উঠল, 'প্রথম আর প্রধান। ঠিক?' শারিয়ার ভুবনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'ব্যাপারটা আমার কাছেও মনে হয়েছিল। এখানে লেখা ছিল চট্টগ্রামের প্রথম আদালত। আর আমরা খুঁজছিলাম প্রধান আদালত।'

'একদম ঠিক বলেছো বস। একটু আগে শশী যখন বলছিল ডক্টর অবদেল ভাষার ধোঁয়াশা তৈরি করতে পছন্দ করত তখন ভালোভাবে জেঁকে বসল বিষয়টা মাথায়, তুমি ঠিক বলেছো, প্রথম আর প্রধান,' ভুবন মৃদু হেসে বলে উঠল। 'ডক্টর আবদেলের সাজানো ব্যাপারটা দেখলে যে কেউ তাই ভাববে। আর ওটাই ছিল ফাঁদ। আর তাই আমি একটুখানি গুগলে সার্চ দিয়ে দেখছিলাম এবং একটা ক্লুও পেয়েছি। জানি না কতটা কাজে লাগবে। টমি ট্যাবটা আবার বের করো।'

'হ্যাঁ বস, বলো,' ট্যাব বের করে প্রস্তুতি নিয়ে বলে উঠল টমি।

'চট্টগ্রামের পর্তুগিজ স্থাপনা লিখে সার্চ দাও,' ভুবন বলতে লাগল। 'প্রথমদিকে যেগুলো আসবে সব বাদ দেবে। ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখবে অনেক সোর্সের পরে একটা সোর্স আছে যেটার কথা প্রায় সবাই ভুলতে বসেছে। কাগজপত্র তো বটেই এমনকি বাস্তবেও জায়গাটা প্রায় ধ্বংস হওয়ার যোগার। কিন্তু ওইটাই চট্টগ্রামের প্রথম আদালত ভবন।'

টমি ট্যাব ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা লিংক ওপেন করে দেখতে দেখতে বলে উঠল, 'এটা? তুমি এটার কথা বলছো?' সে ছবিতে পুরনো একটা ভাঙা স্থাপনা দেখিয়ে বলে উঠল।

'এটাই,' ভুবন ছবিটা দেখে নিয়ে জবাব দিল। 'আমার বিশ্বাস ডক্টর আবদেল এটার কথাই বলেছেন তার পাজলে। আর পরীর পাহাড়ের আদালত ভবনের ছবিটা ছিল একটা হোক্স, মানে ধোঁকা। কিন্তু উনি আসলে বোঝাতে চেয়েছেন এটাই। আমি এটার কথা জানতাম, কারণ আমি ওই কলেজেই পড়াশুনা করেছি। তা না হলে আমার পক্ষেও জানা সম্ভব হতো না।'

'দেখি দেখি,' শশী ট্যাবটা প্রায় ছিনিয়ে নিল টমির হাত থেকে। 'দারুল আদালত নামে পরিচিত জায়গাটা, এটার স্থাপনা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ধরে নেওয়া যায় চট্টগ্রামে পর্তুগিজদের নির্মাণ করা প্রথম দুর্গ এটা। এমনকি এটার স্থানীয় নামও পর্তুগিজ ভবন,' বলে সে মুখ তুলে বাকিদের দিকে দেখল তারপর কী যেন ভেবে একটা চাটি মারল। 'এটাই, যা বুঝতে পারছি এটা হওয়ার সম্ভবনা অনেক অনেক বেশি। একদিকে পর্তুগিজদের স্থাপনা। আর আমরাও পর্তুগিজদের নিয়েই কাজ করছি। অন্তত একবার হলেও জায়গাটাতে খোঁজ নিয়ে দেখা উচিত। চলো চলো, সবাই চলো।'

'আরে আস্তে, আগে লাঞ্চ করতে হবে। তারপর আমরা ওখানে যাব,' শশী যাবার জন্যে অস্থির হলেও শারিয়ার তাকে শান্ত করল। 'ভুবন আমাদেরকে এমন কোথাও নিয়ে চল যেখানে নিভৃতে খাওয়াও যাবে, কথাও বলা যাবে। খেয়ে পরিস্থিতি বুঝে তারপর আমরা ওখানে যাব।'

'আমি সেরকম জায়গা চিনি, চলো পাহাড়ি খাবার খাওয়াব তোমাদের।'

***

লাঞ্চ সেরে গাড়িতে উঠে কোথায় যেতে হবে সেটা সুমনকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিল ভুবন। প্রায় ঘণ্টাখানেক গাড়ি চালিয়ে ওরা যখন মহসিন কলেজের গেটের কাছে পৌঁছাল তখন কলেজের গেট দিয়ে দলে দলে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে স্টুডেন্টরা। 'মনে হয় কলেজ ছুটি হয়েছে মাত্র,' ভুবন মন্তব্য করার মতো বলে উঠল। 'অপেক্ষা করি কিছুক্ষণ।'

'কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না,' শারিয়ার ঘড়ি দেখতে দেখতে বলে উঠল। 'ছেলেপেলেদের ভিড়টা একটু হালকা হলেই ফাঁকতালে আমরা ঢুকে পড়ব। কারণ বেশি পাতলা হয়ে গেলে আবার কলেজের গার্ড বা অন্যদের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

'ঠিক আছে বস, তাহলে আর দেরি না করে এগোতে থাকি একটু পরেই।'

ভুবনই আগে গাড়ি থেকে নামল। বাকিরা অনুসরণ করল তাকে। গেটের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। তারপর এক ফাঁকে ভিড় খানিকটা পাতলা

হতেই একে একে ঢুকে পড়ল ভেতরে। 'সবাই আমার সঙ্গেসঙ্গে আসেন। যদিও এই ঠাণ্ডার সময়ে সাপখোপ থাকবে না। কিন্তু যেখানটায় যাচ্ছি জায়গাটা খুব একটা ভালো না। কাজেই সাবধান। কলেজের মূল ভবনটা পার হয়ে ওরা চলে এলো নির্দিষ্ট দিকে। তারপর একদিকে বাঁক নিয়ে পুরনো আমলের সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠতেই দেখতে পেলে ঘাস, জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ে ছাওয়া পুরনো দুর্গের মতো একটা আকৃতি।

'সর্বনাশ,' শশী আনমনেই বলে উঠল। 'এ তো রীতিমতো ভয়াবহ অবস্থা,' কাছে এগোতে এগোতে সে পুরনো আকৃতিটা দেখে বলে উঠল। 'এত সুন্দর একটা পুরাকীর্তির এই হাল।'

'আমরা যখন কলেজে ছিলাম তখন থেকেই শুনে আসছি এটা সংস্কার করার জন্য কথা চলছে কলেজ কর্তৃপক্ষের,' ভুবন আনমনেই মাথা নাড়ল। 'আজো সেই কথা মনে হয় চলতেই আছে,' বলে মৃদু হেসে উঠল সে।

বাকিরাও হেসে উঠল তার সঙ্গেসঙ্গে।

'আরে এতটা নেগেটিভ ভাবেও বলো না প্লিজ,' বলে শারিয়ার মৃদু হেসে সামনের দিকে দেখাল। 'দেখো নিচের এই টাইলসগুলো অন্যগুলোর তুলনায় খানিকটা হলেও ভিন্ন আর পরিষ্কার দেখাচ্ছে।'

সেগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে হাতে তালি দিল শশী। 'সবাই আগের মতো ছড়িয়ে পড়ো। যেকোনো ব্যতিক্রম বা অদ্ভুত কিছু চোখে পড়লে সঙ্গেসঙ্গে ডাক দেবে বাকিদেরকে। আর ভুবন, আপনি আমার সঙ্গে থাকুন। কারণ এই জায়গাটা আপনিই বাকিদের চেয়ে ভালোভাবে চেনেন।'

'উই বেটার হারি,' ঘড়ি দেখতে দেখতে শারিয়ার বলে উঠল। সে আশেপাশের জায়গাটা জরিপ করছিল। সবাইকে সাবধান করে দিয়ে সে নিচের দিকে দেখাল। কম্পাউন্ডে খেলতে থাকা বেশ কিছু ছোটো ছেলেপেলে এসে দাঁড়িয়েছে ওদেরকে দেখতে। 'এখন এরা এসেছে আরেকটু পরে অথরিটির কেউ চলে এলে কিন্তু আমাদের কাছে কোনো জবাব নেই। কাজেই জলদি করো।'

'জলদি করতে হবে আরেকটা কারণে,' শারিয়ারের কথার সঙ্গে ভুবন যোগ করল। 'আরেকটু পরেই আজান দেবে, আর মসজিদে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটা এদিক দিয়েই যায়। কাজেই তখন লোকজন আসবেই, দেখবেই। সবাই জলদি জলদি,' বলে সে সবাইকে তাড়া লাগাতেই একে একে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল সবাই।

কিন্তু জলদি বললেই তো আর হয়না। প্রায় দেড় একর জায়গায় পাহাড়ের ওপরে বিরাট দুর্গের মতো বাড়িটা। তবে ওরা পুরো দেড় একর না খুঁজে মূলত বাড়িটার ওপরেই ফোকাস রাখল। প্রাচীন পর্তুগিজ স্থাপনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী

ভবনটা অনেকটা গোলাকৃতির। চারিপাশেই ঝোপঝাড় আর লতানো গুল্মতে ছাওয়া। তবে শীতের সময় বলে ওরা ভেতরে প্রবেশ করল অনেকটা নিশ্চিন্তেই। শারিয়ার শুধু সবাইকে সাবধান করে দিল, যাতে ভাঙা কোনোকিছুতে পা দিয়ে হোঁচট খেয়ে না পড়ে।

ওরা সাবধানেই ভবনের ভেতরে প্রবেশ করল প্রায় বিশ কামরার বিরাট ভবনের নিচের অংশটা যা-ও অনেকটা বাড়ির মতো কিন্তু দোতলাটা আক্ষরিক অর্থেই দুর্গের মতো। এমনকি এক জায়গাতে ওরা কামান বসানোর খোপও দেখতে পেল। সেটা যেদিকে মুখ করে বসানো সেদিকে এখন স্থলভাগ থাকলেও কেন জানি ওদের কাছে মনে হলো ওদিকে একসময় হয়তো কর্ণফুলির সঙ্গে সংযুক্ত কোনো শাখা নদী বা খাল ছিল। এমনকি ওদিকে একটা ঘাটের মতো পুরনো চিহ্নও দেখতে পেল ওরা। পুরো ভবনটার দুপাশে দুটো বিরাট স্তম্ভের মতো আছে। আর ভেতরে প্যাঁচানো সিঁড়ি আছে তিনটে। ওরা একে একে দুটো স্তম্ভ আর প্যাঁচানো সিঁড়িগুলো পরীক্ষা করে ছাদসহ যেসব কামরায় প্রবেশ করার মতো অবস্থা আছে, সেগুলোও পরীক্ষা করে দেখল কিন্তু চোখে পড়ার মতো কিছুই পেল না। পুরো ভবনটা পরীক্ষা করা শেষ করে ওরা আবারও ওটার বাইরের চত্বরে এসে দাঁড়াল।

যদিও শীতের সময় তবুও সবাই পুরনো ভবনটা ঘুরে দেখতে দেখতে ঘেমে উঠেছে। ‘কিছুই তো পেলাম না,’ টমি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল।

‘তোমার ভুরিটা একটু কমল, সেটাই-বা কম কী,’ শারিয়ার হেসে বলে উঠল।

‘নাহ, এখানে কিছু পাওয়া তো অসম্ভব মনে হচ্ছে,’ এমনকি পাহাড়ি ছাগলের মতো স্ট্যামিনাওয়ালা ভুবনও মৃদু হাঁপাচ্ছে। কথাটা বলে সে চত্বরের পুরনো একটা পাথরে বসে পড়ল। তার দেখাদেখি বাকিরাও জায়গা করে নিল একাধিক পাথরে।

‘এখন করণীয় কী?’ শারিয়ার প্রশ্নটা করেছে শশীকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু শশীকে দেখে মনে হলো না, সে জবাব দেওয়ার মতো অবস্থায় আছে। একদিকে তাকে দেখাচ্ছে ক্লান্ত অন্যদিকে আবার কিছু না পাওয়ার হতাশাও জেঁকে বসতে শুরু করেছে তার চেহারায়। টমির দিকে হাত বাড়িয়ে সে বোতলটা নিয়ে নিল। ‘বুঝতে পারছি না। বিকেল হয়ে আসছে, আবার আসরের আজানও দিয়ে দেবে যেকোনো সময়,’ বলে সে বোতল থেকে পানি ঢেলে দিল গলায়। দুই ঢোক পানি খেয়ে বলতে শুরু করল। ‘কিন্তু চোখে পড়ার মতো কিছু পেলাম না। এখন এই ভবনের পুরোটা তো দেখা সম্ভবই না। অবার অনেক কামরা আছে যেগুলোতে ঢোকাই সম্ভব নয়। আবার নেটে পড়লাম এখানে নাকি একটা সুড়ঙ্গও আছে। সেটা তো খুঁজে পাবার কোনো সম্ভাবনাই আছে বলে মনে হয় না,’ বলে সে হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।

'এখনই হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আজ যদি বাই এনি চান্স আমরা কিছু বের করতে না পারি, প্রয়োজনে কাল আসব। প্রয়োজনে অফিসিয়াল কারো কাছ থেকে কথা বলে নথিপত্র বের করে দেখতে হবে। তবে আমার একটা বক্তব্য আছে এখানে,' বলে শারিয়ার একটা হাত তুলল। 'তুমি যে ভেতরের কামরা কিংবা সুড়ঙ্গের কথা বললে সেগুলো কিন্তু অনেক পুরনো,' বলে সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'অনেক বেশি পুরনো। এমন কিছু আমরা খুঁজছি যেটা তুলনামূলক নতুন। কারণ ডক্টর আবদেল যাই করুক বা যেভাবেই ক্লু সেট করে রাখুক সেটা খুব বেশি পুরনো হওয়ার কথা নয়।'

'কিন্তু এখানে তো খুব নতুন কিছু দেখলাম না,' শশী চিন্তিত ভঙ্গিতে মন্তব্য করে উঠল। শশী আরেক ঢোক পানি গলায় ঢেলে কুলকুচি করে পানিটা ফেলে দিল সামনে। যেখানে পানিটা ফেলল সেদিকে কিছুক্ষণ স্থির ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, 'যদি নতুন কিছুর কথা বলো তবে এখানে আসার পর একটাই তুলনামূলক নতুন জিনিস চোখে পড়েছে আমার,' বলে সে ওদের সামনে এলোমেলো লাগানো টাইলসগুলো দেখাল।

সবাই অবাক হয়ে মাটির দিকে তাকাল। শশী টাইলস বললেও সেগুলো আসলে টাইলস নয়। অনেকটা ভাঙা মাটিতে পোড়ানো টালির মতো। এরকম টালি রঙের টাইলস সাধারনত গ্যারাজে লাগানো হয়ে থাকে। শশী সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল মাটিতে। টাইলসগুলো বসানো হলেও সেগুলোর ভেতর কোনোসামঞ্জস্যতা নেই। 'সবাই ছড়িয়ে পড়ে জিনিসগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করো তো।'

'এক মিনিট,' টমি বসা থেকে দাঁড়িয়ে বলে উঠল। 'আমি ছাদেও এরকম একটা টাইলস দেখেছি।'

'আমি একটা নতুন টাইলস দেখেছি দুটা বড়ো স্তম্ভের একটার রেলিংয়ে লাগানো,' সুমন বলে উঠল।

'তাহলে অবশ্যই এগুলোর কোনো না কোনো উদ্দেশ্য আছে। আমরা যেটা ভেবেছিলাম এগুলো রেনোভেশনের কাজের জন্য লাগানো হয়েছে আসলে তা-না। এগুলো লাগানো হয়েছে অন্য উদ্দেশ্যে এবং এগুলো লাগিয়েছে ডক্টর আবদেল।'

'কিন্তু এগুলোর ভেতরে তো কোনো সামঞ্জস্যতা নেই,' শারিয়ার পাথুরে মাটির সঙ্গে আটকোনো টুকরো টুকরো টাইলস দেখতে দেখতে বলে উঠল।

'আছে, অবশ্যই আছে। আমাদের সঠিকভাবে দেখতে হবে,' শশী ছোটো বাচ্চা মেয়েদের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে টাইলগুলো দেখছে। 'আমাদের স্রেফ সঠিকভাবে দেখতে হবে।'

‘এবং আমরা সবাই ভুলভাবে দেখছি জিনিসগুলো,’ ভুবন এতক্ষণ বাকিদের সঙ্গে যোগ দেয়নি। সে কথা বলে উঠতেই সবাই সেদিকে ফিরে দেখতে পেল সে একটা কাটা নারকেল গাছের গুঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। ‘ডক্টর অবদেল লোকটার বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে আমি যতই চিন্তা করছি লোকটার ওপরে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসছে। ডক্টর আবদেল যদি এখানে কিছু একটা ক্লু রেখেই যেতে চান সেটা হতে হবে স্থায়ী কিছু, হতে হবে এমন কিছু যাতে সহজে কারো চোখে না পড়ে। আবার যে খুঁজতে আসবে সে যেন খুঁজে পায়। আর একারণেই সে এমনভাবে কিছু একটা সেট করেছে যাতে কেউ বুঝতেও না পারে আবার সবার চোখেও পড়ে।’

‘ভুবন তুই এত নাটক করতে শিখেছিস,’ শারিয়ার রাগের সঙ্গে বলে উঠল। ‘থ্রিলার লেখকদের মতো কাহিনি না প্যাঁচিয়ে মূল কথাটা বল, তুই কী ভাবছিস?’

শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে ভুবন লাফিয়ে নিচে নামল। ‘দেখো জিনিসগুলো এমনভাবে সেট করা যে আমরা খালি চোখে দেখে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা নিজেরা যদি কিছু নিজেদের চোখে দেখতে না পাই তবে কী করি?’ বলে সে সবার দিকে তাকিয়ে রইল। শারিয়ার আবারও রাগের সঙ্গে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ভুবন হাত নেড়ে দ্রুত বলতে শুরু করল।

‘বলছি বলছি, ধরো তোমার দৃষ্টি যদি কম হয় তুমি চোখে চশমা পড়বে, যদি তুমি দূরের কোনো জিনিস দেখতে চাও তবে তুমি দূরবীণ ব্যবহার করবে...’

‘আমাদের ঈগলের চোখ থেকে দেখতে হবে,’ ভুবনের কথা শেষ হওয়ার আগেই শশী বলে উঠল।

‘একজনের হেঁয়ালির ঠেলায় বাঁচছিলাম না, এখন আরেকজন শুরু করেছে,’ শারিয়ার রাগের সঙ্গে টমির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। টমিও আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল।

‘আরে বোঝেননি? এখানে যাই সেট করা হয়ে থাকুক সেটা ওপর থেকে একসঙ্গে দেখতে হবে। তাহলেই কিছু একটা বুঝতে পারার সম্ভাবনা আছে।’

শারিয়ার দু পা সামনে এগিয়ে এলো। ‘আসলেই তো। এই টমি তোর ড্রোনটা আছে না? বের কর।’

‘জি বস,’ বলে টমি কাঁধ থেকে তার ব্যাগটা নামিয়ে জিনিসটা বের করে আনল। ‘আমি জানতাম এরকম একটা পরিস্থিতি দাঁড়াবে, আর তাই তো জিনিসটা ব্যাগে করে নিয়ে এসেছিলাম,’ সুযোগ পেয়ে টমি বাহাদুরি ভঙ্গিতে বলতে শুরু করেছে, শারিয়ার ভুবনের দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপ দিল। কিছুক্ষণের ভেতরেই টমি তার ড্রোন সেট করে সেটাকে ফ্লাই করাল। সবাই ভিড় করে এলো তার পেছনে। ড্রোনটা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছে আর মনিটরে ওটার নিচের

ভিউ দেখা যাচ্ছে। শশী আর টমি বসে আছে পাশাপাশি দুটো পাথরে। আর বাকিরা ওদের কাঁধের পেছন থেকে ভিড় করে দেখার চেষ্টা করছে, কী দেখা যায়। ড্রোনের কন্ট্রোলিং ল্যাপটপের স্ক্রিনে। ড্রোনটা উঠে যাচ্ছে, পুরো চত্বরটা দেখা গেল প্রথমে, তারপর ভবনটার একাংশ। ধীরে ধীরে পুরো ভবন আর ভবন সংলগ্ন এলাকা একসঙ্গে ধরা পড়ল ওদের চোখে।

'কই কিছুই তো...'

'এক মিনিট,' টমি আরেকটু ওপরে তোলো। কিন্তু খুব বেশি না,' শশীকে দেখে মনে হচ্ছে সে পারলে ঢুকে যায় স্ক্রিনের ভেতরে। 'ব্যস ব্যস।'

'সর্বনাশ,' অস্ফুটে বলে উঠলশারিয়ার। কারণ ড্রোনটা আরো ওঠাতে মনোযোগ দিয়ে দেখতেই ভবনটার চত্বর, ভবনের ছাদ আর উল্টোদিকে বসানো টুকরো টুকরো টাইলসগুলোর ভেতরে একটা সাজুয্যতা ধরা পড়তে শুরু করল। আলাদা আলাদাভাবে বসানো টাইলসগুলো ওপর থেকে একসঙ্গে দেখতেই সেগুলোর একটা নির্দিষ্ট আকৃতি ধরা পড়তে শুরু করল। ড্রোন আরেকটু ওপরে ওঠাতেই ধীরে ধীরে সেগুলোর আকৃতিটা পরিষ্কার হয়ে এলো।

'এগুলো তো নম্বর মনে হচ্ছে—'

'কেউ একজন লেখো তো,' বলে শশী টাইলসের আকৃতিতে স্ক্রিনে ফুটে ওঠা নম্বরগুলো একে একে বলে গেল। 'টমি ড্রোন নামিয়ে ফেলো,' বলে শশী লেখাটা শারিয়ারের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল। মোবাইলে লেখা নম্বরগুলো ট্যাবে ওপেন না করে গুগলে বসিয়ে কিছু একটা হিসেব করা শুরু করল সে।

'কিসের নম্বর এগুলো?'

কিন্তু শশী কারো কোনো কথার জবাব দেয়ার অবস্থায় নেই। সে মনোযোগের সঙ্গে হিসেব করতে ব্যস্ত। 'আরেকটু কাগজ হবে?' টমি তার দিকে কাগজ এগিয়ে দিতেই সে সেটাতে কিছু একটা লিখল। তারপর আবারও গুগুলে কিছু একটা ওপেন করে সেই নম্বরটা আবারও এন্ট্রি দিল ল্যাপটপে। কাজ সেরে সে ফিরে তাকাল কয়েক জোড়া কৌতূহলী চোখের দিকে।

'কীসের নম্বর..?'

'এলোমেলোভাবে বসানো টাইলগুলো আসলে মোটেও এলোমেলো কিছু না। বরং এই টাইলগুলো যেভাবে বসানো সেগুলোকে ওপর থেকে একসঙ্গে দেখলে কয়েকটা নম্বর পাওয়া যায়,' বল সে টাইলগুলো দেখাল তার গলা স্থির পানির মতো শান্ত শোনাচ্ছে। 'এই নম্বরগুলো আর্কিলজিস্ট থেকে শুরু করে নাবিকসহ আরো অনেকেই ব্যবহার করত এবং এখনো করে।'

'কিসের জন্য?'

'সেটা পরে বলছি। এই নম্বরগুরোকে এটা ফরম্যাটে বসিয়ে সেগুলোকে দুই ভাগ করে এন্ট্রি দিলে দুটো জিনিস পাওয়া যায়। লঙ্গিচিউট আর ল্যাটিচিউড।'

' সেটা আবার কী?' টমির প্রশ্ন।

'অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ। গ্লোবাল পজিশনিং সিষ্টেমে কোনো জায়গার অবস্থান বোঝাতে ব্যবহার করা হয় এগুলো।

'একদম ঠিক,' শারিয়ারের কথা শুনে শশী খুশি হয়ে বলে উঠল। 'ডক্টর আবদেলের বসানো নম্বরগুলো থেকে হিসেব করে যা পাওয়া গেছে সেটাকে গুগলম্যাপে এন্ট্রি দিলে একটা জায়গারই অবস্থান পাই আমি। সেটা হলো এই অবস্থান,' বল সে ট্যাবটা উঁচু করে দেখাল সবাইকে। তার গলায় বিরাট কিছু অর্জনের চাপা আনন্দ।

'কিন্তু যে অবস্থান দেখাচ্ছে সেখানে তো খালি পানি ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না...' টমি বলে উঠল।

'আছে,' ভুবন ট্যাবটা দেখতে দেখতে জানাল। 'ওটা দক্ষিণের সমুদ্রে। সন্দ্বীপ পার হয়ে যেতে হয় জায়গাটাতে। ওখানে প্রাচীন একটা বন্দর ছিল এক সময়। ভীষণ দুর্গম বলে তেমন কেউ যায় না এখন আর সেদিকে। ছোটোবেলায় আমার একবার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল,' বলে সে সবার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'জায়গাটার একটা পুরনো নাম আছে। জংলাটিলা বলে ডাকা হতো ওটাকে এক সময়।'

'ডক্টর আবদেলের নির্দেশনা অনুযায়ী মোঘলদের সেই হারানো সম্পদের মিথ খুঁজে পেতে হলে আমাদের যেতে হবে সেখানে।'

সবাই চুপ করে আছে। হঠাৎ প্রাপ্তির আনন্দে নাকি আসন্ন অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনায় সেটা বুঝতে পারল না শারিয়ার। 'আমরা আর সেই বাড়িতে ফিরব না,' ঘোষণা দেয়ার মতো করে বলে উঠল সে। 'ওই বাংলো আর নিরাপদ নয়। পুলিশ হয়তো ইতোমধ্যেই সেটার সন্ধান বের করে ফেলতেও পারে, শত্রুরাও পারে,' শেষ কথাটা সে সবার উদ্দেশ্যে বললেও তাকিয়ে আছে একজনের দিকেই। 'কাজেই আমরা এখান থেকে যাব টেকনাফ। সেখানে আজ রাতে থেকে কাল সকালে যাত্রা শুরু করব গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।'

'এটার নাম কী দেওয়া যায়?' হাসি হাসি মুখ করে বলে উঠল টমি। 'অপারেশন জংলাটিলা?'

তার দেওয়া নাম শুনে সবাই হতাশার শব্দ করে উঠলেও শশী সিরিয়াস ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। 'ফলো ইউর হার্ট, হৃদয়ের কাছাকাছি,' বিড়বিড় করে বলে উঠল সে। ডক্টর আবদেল কী আবিষ্কার করেছিল সেটা জানার সময় চলে এসেছে। একমাত্র জংলাটিলাতেই পাওয়া যাবে সব জবাব।'

অধ্যায় তেতাল্লিশ

বর্তমান সময়

দক্ষিণ উপকূলের সমুদ্র, বঙ্গোপসাগর

তীব্র শীতের ভেতরে আধভেজা শরীরে যখন ভোরের নোনা বাতাস ঝাপটা মারে তখন পৃথিবীর সব রোমান্টিসিজম ভুয়া মনে হয়। উপন্যাস আর কবিতার বর্ণনা পড়া কুয়াশার বিবরণ মনে পড়লে লেখক কিংবা কবিদের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে ইচ্ছে হয়। এরকম বাতাসের ভেতর দিয়ে তীব্র গতিতে ভোরের কুয়াশা ভেদ করে ছুটে চলছে ছোট্ট একটা ইঞ্জিনচালিত ট্রলার কাম স্পিডবোট আর সেটায় উপবিষ্ট সাতটি প্রাণ।

ফেলে আসা তীব্র স্রোতের দিকে একবার ফিরে তাকাল শারিয়ার। যদিও ওরা নিজেরা প্রায় সবাই আধা নৌকা আর আধা স্পিডবোটটার ছইয়ের ভেতরেই অবস্থান করছিল তবুও মাঝি আর তার অ্যাসিসট্যান্টের স্রোত কাটানোর তীব্র কসরত ঠিকই বুঝতে পারছিল ওরা। গতকাল সেই কলেজের প্রাঙ্গণে প্রফেসর আবদেলের রেখে যাওয়া ক্লু অনুসরণ করে বিশেষ জায়গাটার লোকেশন বের করার পর কেটে গেছে বেশ অনেকটা সময়।

ওরা সেই কলেজ থেকে শারিয়ারের পরামর্শ মতোই আর সেই বাড়িটায় ফিরে যায়নি। কলেজ থেকে গাড়ি চালিয়ে সোজা চলে গেছে টেকনাফ। সেখানে গিয়ে একটা সাধারণ মানের হোটেলে তিনটে রুম বুক করে রাতে সেখানেই থেকেছে। ভুবনের মাধ্যমে সন্দ্বীপ হয়ে জংলাটিলা নামক সেই লোকেশনে যাওয়ার জন্য বহু কষ্টে একটা নৌকা ভাড়া করা হয়েছে। আসলে এগুলোকে নৌকা না বলে বলা উচিত আধানৌকা আর আধা স্পিডবোট। শারিয়ার চেয়েছিল ভালো একটা স্পিডবোট নিতে। কিন্তু ওরা খবর নিয়ে জানতে পারে যেখানে যেতে চাইছে সেখানে যেতে হলে শুধু স্পিডবোট অত্যন্ত রিস্কি হয়ে যায়। কারণ ওখানে যাওয়ার পথে এক জায়গায় নদী আর সমুদ্রের মোহনা আছে। যে কারণে ওখানে যেতে হবে বহু কষ্টে আর বহু ঝামেলার পথ পাড়ি দিয়ে। আর এই ঝামেলার পথের কারণে ওখানে কেউ যেতে চায় না। ওরা বহু কষ্টে ইঞ্জিনচালিত বেশ শক্তিশালী একটা নৌকা ভাড়া করে। একজন মাঝি আর তার অ্যাসিসট্যান্ট যাবে ওদের সঙ্গে।

টেকনাফের ঘাট থেকে ওরা রওনা দেয় খুব ভোরে। আসলে ভোর না বলে বলা উচিত মাঝরাতে। এই ব্যাপারটা ওরা করে দুটো কারণে, একদিকে নিরাপত্তার কারণে। অন্যদিকে মাঝি বলেই দিয়েছিল ওই নির্দিষ্ট সময়ে রওনা না দিলে ওরা মোহনার জটিল অংশটা পার হতে পারবে না। যে কারণে তীব্র শীত আর কুয়াশার ভেতরে ওরা রওনা দেয় সেই ভোররাতের দিকে।

টেকনাফ থেকে বেশ লম্বা সময় পার হওয়ার পরে কুয়াশার কারণে চারপাশে কিছু দেখতে না পেলেও ওরা নিচের পানিতে আন্দোলন অনুভব করেই বুঝতে পারে ভয়ংকর স্রোতময় কোনো একটা জায়গা পার হচ্ছে ওরা। আর সে-কারণেই সবাই মিলে নৌকায় ছইয়ের ভেতরে প্রবেশ করলেও পানির ঝাপটায় প্রায় আধভেজা হয়ে যায় ওরা অনেক আগেই।

শারিয়ার ছইয়ের ভেতরে বসে নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে একটা ফ্লাস্ক বের করে সেটা থেকে গরম কফি বের করে সবাইকে প্লাস্টিকের কাপে ঢেলে দিল। তারপর নিজে ফ্লাস্কের মুখের ভেতরে কফি নিয়ে চলে এলো ছইয়ের বাইরে। নৌকার পেছন দিকের কোনায় বসে আছে মাঝি আর তার হেল্পার। অন্যদিকে নৌকার একেবারে সামনের দিকে বসে আসে শশী মেয়েটা। শারিয়ার সেদিকে এগিয়ে সাবধানে পা ফেলে তার পাশে বসে পড়ল। তারপর মৃদু কাশি দিয়ে বলে উঠল, 'কফি চলবে ম্যাডাম?'

'অবশ্যই,' শশী মৃদু হেসে উঠল ওকে দেখে। 'চলবে মানে! দৌড়াবে।'

শারিয়ার তার দিকে কফির কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বলে উঠল, 'আমি এই পেশা পছন্দ করি কেন জানো এই যে প্রায় ভোর রাতে প্রায় অচেনা একদল মানুষের সঙ্গে অচেনা জায়গায় অনিশ্চিত এক যাত্রায় চলেছি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। এটাই হলো এই পেশার মজা। এটা প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয়, জীবনটা আসলে কতটা মূল্যবান,' শারিয়ার একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগিয়ে ধরাতে ধরাতে বলে উঠল।

শশী কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। কিন্তু সে প্রথমে কিছুক্ষণ কোনো জবাব দিল না। তারপর শারিয়ারের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'শারিয়ার, তোমার জীবনের সবচয়ে বড়ো ভয় কী?'

শারিয়ার একদৃষ্টিতে আধো অন্ধকারের ভেতরে তাকিয়ে আছে। মেয়েটার বড়ো বড়ো বাদামি চোখের দিকে। সামান্য মাথা নেড়ে সে বলে উঠল। 'তুমি কী জন স্টেইনবেকের 'অফ মাইস এন্ড মেন' উপন্যাসটা পড়েছো?' শশী সামান্য মাথা নেড়ে জানাল সে পড়েছে। 'ওখানে একটা দৃশ্য আছে; লেনি মানে, উপন্যাসের মূল চরিত্র মানে তার একমাত্র কাছের মানুষ জনিকে মেরে ফেলে,' বলে সে একটা দীর্ঘ

নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'আমার বাবাকে আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখছি সে অচল অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে। বাবাকে আমি মাঝে মাঝে বই পড়ে শোনাই। বাবা কেন জানি বারবার ওই উপন্যাসের ওই দৃশ্যটা শুনতে চায়। কেন বলতে পারো?' শারিয়ার তাকিয়ে আছে শশীর দিকে। শশী অনুভব করার চেষ্টা করছে শারিয়ারের মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সে কী আসলে তার কাছে কিছু জানতে চাইছে। দুজনেই দুজনার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ শারিয়ারই সামান্য হেসে উঠল।

'সরি, তুমি বলো। তোমার সবচেয়ে বড়ো ভয়টা কী?'

শশী এখনো তাকিয়ে আছে শারিয়ারের দিকে। শারিয়ারের কাছে মনে হলো মেয়েটা ওকে দেখছে না। শুধুই তাকিয়ে আছে। তারপর মৃদু হেসে অনেকটা ফিসফিসে স্বরে কথা বলতে শুরু করল। 'আমার সবচেয়ে বড়ো ভয়টা আমি এই মুহূর্তে পার করছি। আমার সারা জীবনের ভয়-বিশ্বাস সব ভেঙে পড়েছে। আমার পরিবারের শেষ অংশটাও চিরতরে হারিয়ে গেছে। সে যার জন্য সারাটা জীবন লড়াই করেছে সেটাও হয়ে গেছে অনিশ্চিত। আমি আমি,' শশী কিছু না বলে চুপ হয়ে গেল। শারিয়ার তাকে কিছু বলার জন্য মুখ খুলল কিন্তু নৌকার পেছনের দিক থেকে মাঝি চেঁচিয়ে উঠে জানাল ওরা প্রায় পৌঁছে গেছে।

মাঝির কথা শুনে শারিয়ার আর শশী দুজনেই ফিরে তাকাল সামনের দিকে। ভোরের আবছা ঘন কুয়াশার দঙ্গল ভেদ করে ফুটে উঠতে শুরু করেছে আলো। আর সেই আলোতে সামনে বেশ কিছু পাহাড়ি আকৃতি দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে।

দেখতে দেখতেই ওরা পাহাড়ি টিলাগুলোর কাছাকাছি চলে এলো। মাঝি নৌকার গতি অনেকটাই কমিয়ে এনেছে। সব পরিষ্কার দেখতে না পেলেও ওরা দেখতে পেল অদ্ভুত এক পাহাড়ের সারির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। দেখতে দেখতেই সেই পাহাড়ি টিলার ভেতর দিয়ে ঢুকে গেল ওদের নৌকা। দুইপাশের জঙ্গুলে টিলার ভেতরে চওড়া নদীর মতো সরু জলপথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে এগোতে লাগল ওরা।

'সর্বনাশ,' পেছন থেকে টমির গলা শোনা গেল। সুমন, টমি আর ভুবনও নৌকার ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। 'বাংলাদেশে এরকম জায়গা আছে আমি জানতামই না।'

'আমার কাছে অনেকটা হা লং বের মতো লাগছে দেখতে,' ভুবন মন্তব্য করল।

'টমি, ট্যাবটা বের করে দাও তো,' শশীর কথা শুনে টমি অভ্যস্ত হাতে ব্যাকপ্যাক খুলে ট্যাবটা ধরিয়ে দিল শশীর হাতে। সবাই দু পাশের দৃশ্য দেখতে

দেখতে চলেছে। যদিও ভোরের কুয়াশার কারণে কিছুই পরিষ্কার নয়। তবুও ওরা বেশ খানিকটা সামনে এগিয়ে একটা বাঁক পেরুতেই দেখতে পেল একপাশে একটা মনুষ্য নির্মিত আকৃতির দেখা যাচ্ছে। কালের আবরণে ভেঙেচুড়ে সেটাতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। পুরনো কোনো ভুতুড়ে খনি মুখের মতো দেখাচ্ছে ওটাকে। 'কী এটা?' ভুবনের মতো সাহসী ছেলেও কেমন জানি ফিস ফিস করে কথা বলছে। যেন জোরে কথা বললে কেউ শুনে ফেলবে।

'মনে হচ্ছে পুরনো কোনো বন্দর, ' শারিয়ার বলে উঠল। কোনো কারণ ছাড়াই গা শিরশির করে উঠল ওর। শশীর দিকে তাকিয়ে সে জানতে চাইল। 'এটাই কী সেই জায়গা?' ইশারায় পুরনো ভাঙা বন্দর কাম ঘাটটা দেখাল।

শশী মনোযোগের সঙ্গে ট্যাবে লোকেশন সেট করতে ব্যস্ত... তাকে সাহায্য করছে টমি। 'না এটা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের আরেকটু এগিয়ে সামনে বাম দিকে যেতে হবে। নৌকার মাঝিকে নির্দেশনা দিতেই আবারও খানিকটা গতি বাড়িয়ে নৌকাটাকে সামনে এগিয়ে বামে মোড় নিল। তারপর শশীর দেখানো নির্দেশনা অনুসারে একটা বেশ বড়ো টিলার সামনে চলে এলো।

'এখানেই, এখানেই,' শশী প্রায় চিৎকার করে উঠল।

'এই নৌকা ভেড়াও এখানে,' শারিয়ার টিলার একপাশে ঘাটের পাথুরে ভাঙা ঘাটের মতো কিছু একটা দেখে সেখানে নৌকা ভেড়াতে বলল। মাঝি নৌকা ভেড়াতেই একে একে নেমে এলো সবাই ক্ষয় হয়ে যাওয়া পুরনো পাথুরে ঘাটে। মাঝিকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে সবার শেষে নামল শারিয়ার।

'অদ্ভুত তো জায়গাটা, কিন্তু এখানে কোথায় কী আছে?' বলে সে তাকিয়ে রইল শশীর দিকে। চারপাশে পাথরের টুকরো-টাকরা ছড়ানো। আর জঙ্গুলে টিলা ছাড়া কিছুই নেই। তার ভেতরেও সব কুয়াশায় ঘোলাটে দেখাচ্ছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কোনো হরর সিনেমার সেটে ঢুকে পড়েছে ওরা ভুল করে।

'কোন দিকে যাবো এখন?' প্রশ্নটা শারিয়ার শশীর কাছে জানতে চাইল না নিজের কাছে ঠিক বোঝা গেল না।

'ওই যে দেখো,' শশী সামনের দিকে দেখছিল হঠাৎ সে বেশ জোরেই বলে উঠল। তার নির্দেশিত দিকে সবাই এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল এতক্ষণ যেগুলোকে মাটিতে পড়ে থাকা উল্টোপাল্টা পাথর মনে হচ্ছিল সেগুলোকে এখন পাহাড়ের পাথুরে ধাপের মতো মনে হচ্ছে। সবাইকে ওপরে ওঠার জন্য সেদিকে এগোনোর জন্য ইশারা করল শারিয়ার। 'আমি সবার সামনে থাকছি। শশী আর টমি আমার পেছনেই থাকবে, কোনো নির্দেশনা থাকলে বলবে। সুমন আর ভুবন পেছন দিকটা লক্ষ রাখবে। সবাই সাবধানে উঠবে। কতদূর উঠতে হবে আমরা জানিনা। সামনে

কী আছে সেটাও জানি না। কাজেই সবাই সাবধান,' বলে সে সামনে উঠতে ইশারা করল। সবার পেছন পেছনে উঠতে লাগল ভুবন। প্রায় দেড়শ ধাপের মতো পার হয়ে উঠে আসার পর ওরা দেখতে পেল পাহাড়ের ওপরে একটা পাথুরে উঠানোর মতো জায়গায় উপস্থিত হয়েছে।

'বাহ দারুণ তো,' ভুবন বলে উঠল। 'কিন্তু জায়গাটা আসলে কী, এখনো সেটাই তো বুঝতে পারলাম না।'

'জায়গাটা কী সেটা আর গুরুত্বপূর্ণ নয়,' ভুবনের পাশ থেকে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে শারিয়ার বলে উঠল। 'ডক্টর আবদেল আর অতীতের ইতিহাসকে ঘিরে রচিত হওয়া সুবিশাল উপন্যাসের সমস্ত জবাব আছে এই জায়গাতে। অতীত খুঁড়ে সেইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করতে হবে আমাদের এখান থেকে,' নাক-মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া আবছা কুয়াশার ভেতরে উড়িয়ে দিয়ে সে যোগ করল। 'এই জংলাটিলাতে।'

অধ্যায় চুয়াল্লিশ
অতীত

'এই জায়গাটা আসলে কী বলতে পারবা?' চামড়ার থলে থেকে আরেকটুখানি আরক গলায় ঢেলে দিয়ে পদ্মের দিকে ফিরে কিরান জানতে চাইল।

'কেন, নিচের জায়গা বাদে তুমি তো বাকি সবই ঘুইরা দেখছো,' কিরানের হাত থেকে আরকের থলিটা নিয়ে তাতে দু ঢোক দিয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছল পদ্ম। তারপর কিরানের দিকে ফিরে বলে উঠল। 'আর জানোই তো, এইটা মগদোষীগো গ্রাম।'

'না আমি সেইটা বলি নাই,' কিরান খানিকটা বিব্রত বোধ করতে লাগল। নিজের জীবনে সে খুব বেশি মেয়েমানুষের সঙ্গে মিশেছে এমন নয়। কিন্তু যাদের সঙ্গেই মেশার সুযোগ হয়েছে তাদের সবার থেকে এই মেয়ে একেবারেই আলাদা। এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কিরানের মাঝে মাঝে অস্বস্তি হচ্ছে। আবার অন্যদিকে বেশ মজাও পাচ্ছে সে। 'আমি বলতে চাইছি এই পাহাড়ের ওপরে দুর্গ আর আর এই উঠান নিশ্চয়ই তোমরা বানাও নাই। এর পিছের ইতিহাসটা কী?'

কিরানের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠল পদ্ম। 'তুমি জাহাজি আমারে খুবই আবাক করতাছো। মাঝেমধ্যে তুমারে দেইখা খুব সাহসী মনে অয় আবার মাঝেমধ্যে এমন ভ্যাবলা লাগে। যাই হোক। এই জায়গাটা আমরা কেউই বানাই নাই। আমগো পক্ষে বানানী সম্ভবও আছিল না। আমি শুনছি এইখানে আসার বহুত আগে থেইক্কা মগদোষীরা এই জায়গায় বাস করা শুরু করছে। কারণ এইখানে কইতে গেলে তেমন কেউই আসে না। আর এইখানে সামনে আর পেছনে দুইদিকেই যাতায়াতাতের পথ থাকাতে এইখান থেইকা সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ। বিশেষ কইরা এইখান থাইকা চাইলে সামনের দিক দিয়া চাঁটগা, সন্দ্বীপ, মহেশখালী এমনকি রোসাঙ্গেও যাওয়া যায়। আবার পেছন দিয়া কম সময় হুগলী কিংবা সপ্তগ্রামেও যাওয়া যায়।'

'তাইলে এই জায়গা সবাই এড়ায়া চলে ক্যান?' কিরান জানতে চাইল। হাত তুলে সে একবার পাহাড়ের ওপাশে দিগন্তের দিকে তাকাল। রাতের শেষ কালিমা মুছে গিয়ে ধীরে ধীরে দিগন্তে ফুটে উঠছে আলোর রেখা। যেকোনো সময় সূর্যটা সমুদ্রের ওপাশ থেকে টুপ করে মাথা তুলবে ভেজা শরীর নিয়ে।

‘এই জায়গা সবাই এড়ায়া চলে, এর পিছে অনেকগুলা কারণ আছে। এর মধ্যে অন্যতম একটা কারণ অইলো, এই জায়গারে সবাই ডাকে শয়তানের টিলা। এইখানে নাকি মানুষ বাস করতে পারে না। শয়তান বাস করে। এইখানে নাকি একবার কেউ ঢুকলে আর বাইর অইতে পারে না,’ এইটুকু বলে ফিক করে হেসে উঠল পদ্ম। ‘এইটা অবশ্য সত্যি। এইখানে ঢুকলেই আমগো খপ্পরে পড়তে অয়। আর একবার আমগো খপ্পরে পড়লে আর রক্ষা নাই।’

‘তুমগো কারণেই কী এই জায়গারে শয়তানের টিলা বইলা ডাকে?’

‘নাহ, এই জায়গারে শয়তানের টিলা বলার পেছনে মূল কারণ অইলো এই জায়গার আবহাওয়া,’ পদ্ম কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল। ‘প্রথমত যতই কম সময়ে যাতায়াত করা যাক, আর যাই হোক এইখানে আইতে অইলে ওই মোহনার বাঁক পার হইয়া আইতে অইবো। বেশিরভাগ মাল্লা, নৌকায় হোক আর জাহাজে হোক ওই পানির চক্র পারই অইতে পারব না। তার ওপরে এইখানে নোনা পানি আর পাহাড়ি টিলার এমন এক অবহাওয়া অইছে, যেকোনো সময় বৃষ্টি আসে, পানির ঘূর্ণি হয়, আবার জোয়ার-ভাটার হিসাবও এইখানে একেবারেই উল্টাপাল্টা। তার ওপরে গরম আর শীত নাই, যেকোনো সময়ে দেহা যায় কুয়াশা আইসা সব ঢাইক্কা ফালায়। যে কারণে এইখানে নৌকা কিংবা জাহাজ চালানি সবসময়ই ঝামেলার। তার ওপরে ডাকাইত, জলদস্যু এইগুলা তো আছেই। এইসব কারণেই এইদিকে তেমন কেউ আসে না।’

‘আর এই দুর্গ?’

‘এই দুর্গ আসলে কে বানাইছিল কবে বানাইছিল সেই ব্যাপারে সঠিক তথ্য কেউই বলতে পারেনা। তবে এই দুর্গটা বানানি নিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে; বহু বহুকাল আগে এক নাবিক নাকি সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়া এহানে আইসা উঠছিল। একে তো বিদেশ বিভূই, তার ওপরে আবার এরকম ভয়ংকর জায়গায় নাবিক যখন খাওন আর আশ্রয়ের অভাবে মরতে বসছে তখন নাকি এই এলাকার প্রাণীরা সেই নাবিকরে বাঁচানোর জন্য আগায়া আসে। এর পেছনে নাকি কারণ ছিল সেই নাবিক প্রতিদিন এই পাহাড়ের চূড়া মানে আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেইখানে বইসা বাঁশি বাজাইত। আর তার বাঁশির সুর নাকি এতই করুণ ছিল যে, সব প্রাণীর চইলা আসত। সেই নাবিক যখন ক্ষুধায় কাতর হয়া মরতে ধরে তখন এই এলকার পাখি, বাঘ, হরিণ থেকে শুরু করে এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত আগায়া আসে তারে সাহায্য করার জন্য। সেই প্রাণীদের দিয়েই নাকি এই নাবিক নির্মাণ করেছিল এই দুর্গ। সেই নাবিকের নাকি প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণ করার অস্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল । আর একারণেই এই জায়গারে বলা হয় শয়তানের টিলা।’

'হুমম যা প্রচলিত সেটাকে যদি বাস্তবতার নিরিখে বিচার করন যায় তয় এইটা বোঝা যায় যে, সম্ভবত অতীতের কোনো এক সময় জাহাজ ডুবি হয়া এইখানে এসেছিল অচেনা কোনো এলাকার এক নাবিক কিংবা একদল নাবিক। যেকোনো কারণে বা যেকোনোভাবেই হোক তারা এখানে বন্দি হয়ে পড়ে। সম্ভবত স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তারা এই দুর্গটা নির্মাণ করে। যেকোনো কারণেই হোক স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে তাদের একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়। সম্ভবত তারাই এই বন্দরটাও নির্মাণ করেছিল। এটাই প্রমাণ করে এই এলাকায় এক সময় আরো জমজমাট ছিল। তারপর যেমনেই হোক সেইটা আর টিকে নাই।'

'হয়তো তাই জাহাজি,' সামান্য হেসে উঠল পদ্ম। 'কে জানে আজ হয়তো আমরাও এহানেই শেষ হয়া যাব।'

'তুমি কী নিশ্চিত যে ওরা আসবই?' কিরান জানে প্রশ্নটা বোকার মতো। কিন্তু তবুও সে জানতে চাইল। এর পেছনে একটা কারণ আছে। ওরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজঘাটা থেকে সিঁড়িগুলো উঠে এসে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে। এখান থেকে নিচের দিকে তাকালে পরিষ্কার চোখে পড়ে সামনের সমুদ্র।

কিরান রাতে আগের প্রহরে পদ্মদের দুর্গে আশ্রয় নেবার পর যখন বুঝতে পারে সামনেই আক্রমণ আসন্ন এখন সে তার পরিকল্পনা খুলে বলে। সেই পরিকল্পনা অনুসারেই নিজের অবশিষ্ট লোকজন আর পদ্মর বাহিনীর সমর্থ মেয়েদেরকে এক কাতার করে। সবাইকে যার যার দক্ষতা অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দিয়ে সবাইকে এক করে কিরান নিজের পরিকল্পনা খুলে বলে। আর সে-অনুযায়ী সবাই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। নিজের লোকবল আল আর অস্ত্রের মজুদ অনুযায়ী প্রস্তুতি শেষ করতে করতে মাঝরাত পার হয়ে যায়। এরপরে সামান্য খেয়ে খানিক বিশ্রাম নিয়ে ভোরের আবহ তৈরি হতেই ওরা উঠে এসেছে যেখানে পাহারা বসানো হয়েছে।

'জাহাজি তুমি যে প্রশ্ন করছো সে প্রশ্নের উত্তর আমার দেয়ার প্রয়োজন নাই। সামনের দিকে দেখো,' বলে সে সামনের দিকে দেখাল। ভোরের নরম আলোয় ওরা দেখতে পেল শয়তানের টিলার সামনের পানি দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে কালো রঙের একটা জাহাজ।

'ওরা আসতাছে জাহাজি। মৃত্যু আর আতঙ্কের প্রতিনিধি হয়া দুইটা আসতাছে,' পদ্মের চোখে ভয়-ভীতি তো নেই বরং একরাশ অশান্ত আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। 'ওরা ধ্বংসের সমন নিয়া আসতাছে।'

কিরান একবার চারপাশে দেখে নিল। অবলোকন করে নিল সবকিছু সে যেভাবে ঠিক করেছিল সেভাবেই সাজানো আছে কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল সে। তরপর পদ্মের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আসতে দেও ওগোরে,' বাপুর দেওয়া লকেটটা এক হাতে চেপে ধরে বলে উঠল, 'বুকের বলই সবচেয়ে বড়ো বল। আসতে দেও ওগোরে।'

বর্তমান

'খুব অদ্ভুত, তাইনা?' শারিয়ার বলে উঠল। সে তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে। ওরা যখন উঠে আসে টিলার ওপরে তখনো আবহাওয়া কুয়াশায় একেবারে অন্ধকার দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আজকের দিনে আবহাওয়া আর সূর্যের মুখ দেখবে না। কিন্তু আধা ঘণ্টা ভেতরে ঠিকমতো ভোর না হতেই সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে টিলাটার চারপাশে। আর সূর্যের আলোতে বেশ ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে পুরো টিলার উপরিভাগ। আর এর ওপরে থাকা দুর্গের অংশবিশেষ।

'আমার মনে হয় এখানকার আবহাওয়া এখানকার পানির মতোই আনপ্রিডিক্টেবেল,' ভুবন বলে উঠল।

'তবে যাই হোক না কেন, রোদ ওঠাতে আমাদের জন্য ভালো হয়েছে,' শশী ফোড়ন কেটে বলল, 'আমরা যা খুঁজে বের করতে চাইছি সেটা খুঁজে বের করা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। কারণ এমনিতেই অচেনা জায়গা তার ওপরে আবার এরকম ঘোলাটে আবহাওয়া থাকলে কাজ করাটা অনেকটাই কঠিন হয়ে যেত।

'জায়গাটা খুবই অদ্ভুত, তাইনা?' শারিয়ার চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলে উঠল, 'এরকম রিমোট একটা জায়গায় এমন একটা দুর্গ কে বানালো। এখানে নিশ্চয়ই অনেক আগে যুদ্ধও হতো। দেখো,' বলে শারিয়ার দুর্গের ভগ্নাবশেষের সঙ্গে ছড়ানো-ছিটানো বিভিন্ন অংশ তো আছেই সেইসঙ্গে পুরনো আমলের মরচে পড়া একাধিক কামান দেখাল যেগুলো দুর্গের প্রাঙ্গণের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে।

'বাহ, পুরনো কামান?' অনেকক্ষণ পর সুমন কথা বলে উঠল। 'এই মরা দেশে এরকম একটা জায়গায় এরকম পুরনো জিনিস পইড়া থাকল আর কেউই নিল না, এইটা কেমনে সম্ভব?'

সুমনের কথা শুনে সামান্য হেসে উঠল শারিয়ার। 'হুমম, তোমার কথা ঠিক আছে সুমন। আলকাতরা ফ্রি পেলে লুঙ্গিতে নিয়ে নেয় যে জাতি তারা এরকম খোলা জায়গাতে এরকম কোনো জিনিস ফেলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু সমস্যা হলো এরকম জায়গা থেকে এত ভারী জিনিস নামাবে কীভাবে আর নামালেই বা নেবে কীভাবে। আর তাছাড়া কামানগুলো সব আটকানো। কাজেই...'

'আমার প্রশ্ন হলো আমরা যা খুঁজতে এসেছি সেটা এখান থেকে খুঁজে বের করব কীভাবে?' এত বড়ো দুর্গ তার ওপরে আবার এর বেশিরভাগ অংশই ভাঙা। এখানে তো ঠিকমতো কিছু খুঁজে বের করতে সেনাবাহিনী লাগবে মনে হচ্ছে।'

'নাহ, অসম্ভব হবে না,' শশী বলে উঠল সে হাতের ইশারায় টমিকে ডেকে প্রাঙ্গণের এক জায়গাতে ভাঙা পাথরের ওপরে বসে পড়ল সেইসঙ্গে টেনে নিল

নিজের ব্যাক প্যাকটা। ‘প্রথমত, এই জায়গা যেমনই হোক, যত পুরনোই হোক না কেন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ডক্টর আবদেল এখানে এসেছিল খুব বেশি সময় হয়নি। এই দুর্গে কিছু একটা থাক বা না থাক কিংবা ডক্টর আবদেল যদি কিছু রেখে গিয়েও থাকে, সে একা মানুষ হয়ে করতে পারলে অবশ্যই আমরাও পারব। স্রেফ খুঁজে বের করতে হবে।’

‘এখানে আমার একটা কথা আছে,’ টমি বলে উঠল। ‘আপনাদের মনে আছে কিনা, ডক্টর অবদেলের যে দেয়ালচিত্রটা তৈরি করা ছিল মানে যেটা এনালিসিস করে আমরা এখান পর্যন্ত এসেছি সেখানে আরো বেশ কিছু জ্যামিতিক প্যাটার্ন ছিল। আমার মনে হয়, স্রেফ আমার ধারণা আর কি।’

‘টমি কথা না পেঁচিয়ে বলে ফেলো কী বলতে চাচ্ছো?’ শারিয়ার মৃদু ধমকের সুরেই বলল। সে চোখ সরু করে সামনের সমুদ্রে চোখ বুলানোর চেষ্টা করছে।

‘মানে ওখানে যেসব জ্যামিতিক প্যাটার্নগুলো আছে সেগুলো দেখে কেন জানি আমার কাছে মনে হচ্ছে সেগুলো এই জায়গার হলে হতেও পারে। হয়তো সেখান থেকে আমরা কিছু না কিছু পেয়ে যেতে পারি।’

‘অবশ্যই,’ বলে তুড়ি বাজিয়ে উঠল শশী। ‘এই ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি। অবশ্যই আমাদের এই ব্যাপারটা চেক করে দেখা উচিত,’ বলে সে টান দিয়ে নিজের ব্যাকপ্যাকের ভেতর থেকে ট্যাবটা বের করে আনল। সেই সঙ্গে বলে উঠল, ‘টমি, তোমার সেই ড্রোনটাও কাজে লাগতে পারে আমাদের। ওটাও বের করে সেট করে ফেল।’

‘ওক্কে বস,’ এই প্রথম টমিকে দারুণ একটা আইডিয়া দেয়ার পরও কোনোরকম গাল না মেরে সরাসরি কাজে নামতে দেখে খানিকটা অবাকই হলো শারিয়ার। তবে সে এক হাত তুলে সবাইকে থামতে বলল।

‘এক মিনিট’ এক মিনিট। কাজে নামার আগে কথা আছে,’ সবাই তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে বলে উঠল। ‘অচেনা জায়গায় আছি আমরা। এখানে বিপদ আপদের কোনো শেষ নেই। আর তাছাড়া শত্রুপক্ষের লোকেরাও যে আমাদের অনুসরণ করে এখানে পৌঁছায়নি সেটাও বলা সম্ভব না। কাজেই উল্টোপাল্টা করে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে হবে আমাদের।’

‘এখানে কে আসবে...’

‘বলা যায় না,’ শারিয়ার একটা আঙুল তুলে বলে উঠল ‘কাজেই সাবধানের কোনো মার নেই। ‘সুমন তুমি সিঁড়ির দিকে যাও। কোনে গিয়ে পাহারা দেবে। কোনো ঝামেলা হলে শিস দিয়ে আওয়াজ দেবে। ভুবন তুই প্রাঙ্গণের উল্টোদিক থেকে সমুদ্রের ওপরে চোখ রাখ। শশী আর টমি কাজ শুরু করো। আমি যতটা পারি আশপাশটা আরেকটু অবলোকন করে নিচ্ছি। এতে করে তোমাদের হেল্প হতে পারে। সবাই লেগে পড়ো, সময় কম।’

অতীত

কালো রঙের জাহাজটাকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে দেখা যেতেই পদ্ম একেবারে শান্তভাব বজায় রাখলেও কিরান দুই পা এগিয়ে গেল প্রাঙ্গণের কিনারার দিকে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রাখার কোনোই প্রয়োজন নেই। কারণ দুই টিলার মাঝখানের শান্তভাবে প্রবাহিত পানির ধারা ভেদ করে ধীর গতিতে ছুটে আসা জাহাজটা না দেখতে পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনাতেই নিজের একটা হাত চলে গেছে কোমরে রাখা পিস্তলের বাটে। অন্য হাতটা দিয়ে চেপে ধরেছে বুকের ওপরে থাকা লকেটটা।

বুকের বলই আসল বল, সে মনে মনে কথাটা বলেই পদ্মের দিকে ফিরে একবার মাথা ঝাঁকাল যদিও দরকার ছিল না। কারণ পদ্ম ইতোমধ্যেই নিজের কোমর থেকে চিকন দেখতে একটা শঙ্খের মতো বের করে মুখে লাগিয়ে ফুঁ দিল। সঙ্গেসঙ্গে হালকা কিন্তু তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল দুর্গের প্রাঙ্গণজুড়ে। সঙ্গেসঙ্গেদুর্গের ওপরে উপবিষ্ট মানুষটা সামান্য উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের পতাকাটা নাড়তে লাগল। যুদ্ধের ঘোষণা হয়ে গেছে।

কিরান দেখল সবাই যার যার জায়গায়,যাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী নিজ নিজ জায়গায় কাজ শুরু করে দিয়েছে। সবাই যার যার জায়গায় মাথা নিচু করে আছে। এটাও কিরানেরই নির্দেশনা। প্রথমেই শত্রুর চোখে ধরা পড়তে চাচ্ছে না ওরা। যদিও শত্রুর না জানার কোনো কারণ নেই তবুও প্রথমেই এমন একটা ভাব দেখাতে চাচ্ছে যে ওদের যেন এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেই। যদিও কোনো সম্ভাবনা নেই তবুও শত্রুর চোখে পড়তে চাচ্ছে না কেউই।

কিরান দেখল বেদুকে নিয়ে গোমেজ আর তার সঙ্গীরা একবার ওর দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে দুর্গের প্রাঙ্গণ থেকে সামনের ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল।

মনে মনে খুশি হয়ে উঠল কিরান। কারণ ওদেরকে একটা বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া আছে, সেটা পালন করার জন্যই ওদিকে গেছে ওরা। এবার দুর্গের প্রাঙ্গণে সাজানো কামানের কামাঞ্চিদের দিকে ফিরে তাকাল সে। সবাই যার যায় জায়গায় উপবিষ্ট হয়ে কামানের নল ঘুরিয়ে জাহাজ বরাবর তাক করে রেখেছে। প্রত্যেকের কামানের পাশেই রাখা গরম কয়লার ঝামা। সেই সঙ্গে ছোটে ছোটো মশাল আর গোলা। ওদের উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে সে ফিরে তাকাল পদ্মের দিকে। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই পদ্ম কথা বলে উঠল। বন্দুকবাজ আর তীরন্দাজ বাহিনী প্রস্তুত আছে।

'সাব্বাস কিন্তু,' কিরান কথা শেষ করার আগেই ওর দিকে এগিয়ে এলো পদ্মের বাহিনীর সবচেয়ে বিশালাকায় সেই মহিলা। তার সঙ্গে আরেকজন। এদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দুর্গের পেছনের পানির দিকে নজর রাখতে।

'মাতারানি, পেছনে পাহারায় থাকা শত্রুজাহাজ নড়া শুরু করেছে। প্রথমে ভাবছিলাম যে, জাহাজটা বোধহয় সইরে পড়তে শুরু করেছে বা সামনের দিকে আসবে। কিন্তু ওইটা স্থির হয়া পেছন দিকে যাওয়ার রাস্তার নালার দিকের পথ বন্ধ কইরা দাঁড়াইছে এহন।'

'ওরা পেছনের রাস্তা বন্ধ কইরা দাঁড়াইছে যাতে এইখান থেইকা কেউ পলাইতে না পারে,' বলেই কিরান জাহাজের দিকে নিজের দূরবীক্ষণ তাক করল। 'কিন্তু জাহাজের পাটাতনে কেউই নাই ক্যান?'

কিরানের কথা শুনে পদ্ম হেসে উঠল। 'ঠিক যেই কারণে আমরা মাথা নিচু কইরা রাখছি, যাতে শত্রু আমগোরে দেখতে না পারে ঠিক সেই কারণেই ওগো জাহাজের পাটাতনেও কেউই নাই। ওরাও আমগো মতো প্রথমেই শুত্রুর চোখে পড়তে চাইতাছে না,' পদ্মের গলা শান্ত পানির মত স্থির। তাতে বিন্দুমাত্র কম্পন নেই। সেই বিশালাকায় মহিলার দিকে তাকিয়ে পদ্ম বলে উঠল, 'তুমি এহনো পেছন দিকেই পাহারা রাখো। ওই জাহাজ থাইকা আক্রমণ অইলে সঙ্গে সঙ্গে জানান দিবা। আর তোমার লোকেগো প্রস্তুত রাখো। আমরা যতই বাধা দিই, একটা সময় শত্রু এইখানে উইঠা আসবই। সেই সময়ে আমগোরেই লড়তে অইবে। আর শোনো, আঘাত করবা মারার মতো। আর নিজের উপায় না থাকলে আগে জান দিবা পরে শরীর, মনে থাকব?'

'মনে থাকব, মাতারানি। মাথ নিচু করেই পদ্মকে একবার কুর্নিশ করে চলে গেল,' পদ্মবাহিনীর প্রধান।

'জাহাজের পাটাতনের ওপরে একটা লোকও নাই,' কিরান এখনো সিলভেরাকে এক পলকের জন্য দেখা যায় কিনা সেটা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দূরবীক্ষণে দেখতে দেখতেই সচকিত হয়ে উঠল সে। 'পাটাতনের ওপরে থাকা একজন সামলাইতাছে। সর্বনাশ,' হঠাৎ কথাটা বলেই সে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। পদ্মের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'সবাইরে প্রস্তুত করো, যেকোনো সময় আক্রমণ হইবে। পাটাতনের ওপরে পুরা বাহিনী প্রস্তুত হয়া লাইনে আছে,' বলেই সে নিজের খাটো বাঁকা তলোয়ারটা বের করে আনল। সঙ্গেসঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল কামাঞ্চিরা।

'আমি আগেই জানতাম,' বলেই পদ্ম সাবধান করে দিল সবাইকে। 'কামাঞ্চিরা প্রস্তুত হও। জাহাজি ইশারা করতেই আক্রমণে যাবা। মনে রাখবা, ওরা নিচে আছে আর আমরা ওপরে । আমরা প্রথমে সুবিধা পাব, এই সুযোগেই ওগো দুর্বল করতে হইবে,' বলে সে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'এইটা অবশ্য সিলভেরাও জানে।'

দূরবীক্ষণে চোখ কিরানের মনে মনে দূরত্বের হিসাব করল। জাহাজটা কামানের আয়ত্তের ভেতরে আসতে এখনো কিছুটা বাকি। আরেকটু সময় লাগবে।

'একদম ঠিক,' ওদের পেছন থেকে ভুবন বলে উঠল। ওরা কী করছে দেখার জন্য ও এগিয়ে চলে এসেছে। 'খেয়াল করে দেখো কামানগুলোকে দূর থেকে দেখলে মনে হবে আলাদা আলাদাভাবে অ্যাঙ্গেল করা কিন্তু আমার মনে হয় এগুলো নির্দিষ্ট কোনো দিকে নির্দেশ করছে।'

'দাঁড়াও, আমি এক কামানের সামনে দাঁড়াচ্ছি। টমি, ভুবন আর শারিয়ার তোমরা তিনজন তিনটে কামানের সামনে দাঁড়াও,' শশী বলে উঠল। 'যদিও আরেকটা বাকি থাকে।'

'সুমন ভাইকে ডাকব নাকি?' টমি জানতে চাইল।

'কোনো দরকার নেই,' শারিয়ার বলে উঠল। 'এই চারটে দেখলেই হবে। কী করতে হবে বলো?' শেষ কথাটা সে শশীর দিকে ফিরে বলেছে।

'সবাই একসঙ্গে আমাদের পেছনে কামানটাকে একটা সরল রেখার মতো ধরে সামনে এগোতে থাকব দেখো কোনো পয়েন্টে মিলে একসঙ্গে। চলো শুরু করি। এক দুই তিন...' বলেই সে হাঁটতে শুরু করল। সেইসঙ্গে বাকিরাও। হাঁটতে হাঁটতে দুর্গের দেয়ালের প্রায় কাছাকাছি একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে এসে থেমে গেল চারজনই।

'ওমা, এখানে তো কিছুই নেই?' শারিয়ার অবাক হয়ে বলে উঠল। কামানের ক্লুটা প্রথমে তারই নজরে পড়েছিল, এতে কিছু না পেয়ে সে বেশ হতাশ এবং বিরক্ত বোধ করতে লাগল।

অতীত

কামানগুলো থেকে প্রায় কাছাকাছি সময়ে বোমা বর্ষণ হতেই শব্দের চোটে কানে প্রায় তালা লেগে গেল প্রাঙ্গণে উপস্থিত সবার। এমনিতেও জায়গাটা খোলা হওয়ার কারণে শব্দ আটকে পড়ার কথা না। কিন্তুদুর্গের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে শব্দ ফিরে আসাতে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড় হলো কিরানদের।

কামানের গোলাগুলো প্রায় কাছাকাছি সময়ে ছুটে গেল জাহাজটার দিকে। কিরান উদগ্রীব হয়ে লক্ষ করতে করতে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। আর নিজেদের লুকিয়ে লাভ নেই। প্রাঙ্গণের কিনারায় দাঁড়িয়ে আফসোসের সঙ্গে কিরান খেয়াল করল প্রথম গোলাটা জাহাজ টপকে চলে গেল অন্যদিকে। তৃতীয় আর চতুর্থ গোলাটাও জাহাজের ওপর দিয়ে পেছনের পানিতে গিয়ে পড়ল। শেষ গোলাটা গিয়ে আঘাত করল জাহাজের একেবারে পেছন দিকে। সঙ্গেসঙ্গে উল্লাসধ্বনি করে উঠল প্রাঙ্গণে উপস্থিত সবাই।

'আবার আবার গোলা ভরো,' কিরান চিৎকার করে নির্দেশ দিল। সবাইকে। 'এইটাই সুযোগ এই সময়েই আঘাত করতে হবে,' বলেই সে নিচ থেকে ভেসে

আসা চিৎকার শুনে ফিরে তাকাল জাহাজের দিকে। প্রথম দফা গোলাবর্ষণ শুরু হতেই দুই পক্ষেরই সব আড়াল ভেঙে পড়েছে। জাহাজের পাটাতনের ওপরে বেরিয়ে এসেছে সশস্ত্র যোদ্ধাদের দলটা। অনেকের হাতেই বন্দুক দেখা গেল। ক্রমাগত গুলি করছে। কিন্তু আয়ত্তের অনেক বাইরে হওয়াতে গুলি পৌঁছালো না। জাহাজের পাটাতন থেকে দস্যুদের এদিকে ফিরে গুলি করতে দেখেই কিরান চিৎকার করে পদ্মকে সাবধান করে দিল।

'আমাদের বন্দুকবাজদের প্রস্তুত হতে বলো,' বলেই সে সামান্য কেঁপে উঠল। ফিরে তাকিয়ে দেখল জাহাজের সামনের অংশ থেকে দুটো কামানে একসঙ্গে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু দূরত্ব অনেক বেশি হওয়াতে সেগুলো ঘাটের কাছের পানিতে পড়ছে।

'আবার আবার গোলা চালাও,' বলেই কিরান নিজের হাতে ধরা তলোয়ারটা উঁচু করেই আবারও নিচু করে আনল। আবারও একের পর এক গোলা ছুটে গেল জাহাজটার দিকে। পাগলা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠল একেকটা কামান। একসঙ্গে একের পর এক প্রায় আধডজন গোলা ছুটে গেল জাহাজটার দিকে। এবার প্রথম গোলাটাই জাহাজে গিয়ে সরাসরি আঘাত করল। দুই-তিনজন দস্যুকে উড়িয়ে দিয়ে পাটাতনে মস্ত এক ফুঁটো করে নিচে গেমে গেল গোলাটা। দ্বিতীয় গোলাটা জাহাজের উঁচু অংশের কামরার এক কোনা উড়িয়ে দিল। তৃতীয় আর চতুর্থটা জাহাজ ছুঁতেছুঁতেও বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে।

তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করল তৃতীয় গোলাটা। জাহাজের একপাশের বেশ খানিকটা অংশ উড়িয়ে জাহাজটাকে একপাশে কাত করে ফেলল ওটা। আনন্দ ধ্বনি করে উঠলপ্রাঙ্গণে থাকা যোদ্ধারা। কিন্তু কিরান চিৎকার করে আবারও গোলা ভরার নির্দেশ দিল।

কারণ ও জানে এগুলোর কোনোটাই কাজে দেবেনা। যদি না ওরা ঘাটে ভেড়ার আগেই জাহাজটাকে ডুবিয়ে দিতে পারে। একবার দস্যুসমেত জাহাজটা ঘাটে ভেড়াতে পারলে আর দেখতে হবে না। দস্যুরা স্রেফ হাতে পিষেই মেরে ফেলতে পারবে ওদের।

বর্তমান

খানিকটা হতাশ হয়েই বদ্ধ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে শারিয়ারসহ বাকিরা। শশী খানিকটা পিছিয়ে এসে দুইপাশে দেখে বলে উঠল, 'আচ্ছা আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। খালি চোখে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে, দুর্গের ভেতরের দিকে প্রবেশ করতে হলে দুদিকে দুটো প্রবেশপথ আছে আর প্রবেশপথ দুটো ওই দুদিকে।'

বাকিরাও শশীর দেখানো নির্দেশনা অনুযায়ী পাশাপাশি এসে ফিরে তাকাল দুর্গের দুপাশের দুই প্রবেশপথের দিকে। এর মধ্যে একদিকের পাথুরে দেয়াল ভেঙে পড়ে একেবারেই বন্ধ হয়ে গছে। অন্যপাশের আরেকটা প্রবেশপথের অবস্থাও খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছে না।

'আমার কাছে কী মনে হয় জানো, যদি সত্যি সত্যি ডক্টর আবদেল এই কামানগুলাকে এদিকে সেট করে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করে থাকেন তবে সেটা শুধু প্রবেশপথ না। এর সঙ্গে আরো বেশি কিছু বোঝাবার চেষ্টা করেছেন উনি।'

'আমারও তাই মনে হয়.' শারিয়ারের কথার সঙ্গেসঙ্গে ভুবন বলে উঠল। কারণ একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ কি। এই প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দুর্গের যতটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু খুবই কম। এই দুর্গ যারাই বানিয়েছে, এত ছোটো একটা দুর্গ এখানে বানানোর কথা নয়। কারণ খালি চোখে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি সেটাতে বিশজন মানুষও ঠিক মতো থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। আর গুদাম থেকে শুরু করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি তো বাদ গেল।'

'তারমানে এই দুর্গের যতটুকু দেখা যাচ্ছে দুর্গটা এর চেয়েও অনেক বড়ো। সেটা হতে পারে পাহাড় মানে টিলার পেছন দিকে এর একটা বিস্তৃত অংশ রয়েছে অথবা...'

'পাহাড়ের ভেতরে এর অনেকটা অংশ রয়েছে। আর পাহাড়ের ভেতরেই সম্ভবত দুর্গের মূল অংশটা রয়ে গেছে। যে কারণে,' বলে শশী তার হাতটা নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে কমানগুলোর দিকে নির্দেশ করে বলে উঠল, 'ডক্টর আবদেলের এই নির্দেশনা সম্ভবত দুর্গের ওপরের অংশ নয় বরং দুর্গের ভেতরের দিকে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।'

'কিন্তু এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে কী সেটা কীভাবে বের করব আমরা?'

'যখন খালি চোখে কোনো কিছু দেখা না যায় তখন সেটার জন্য চশমা লাগাতে হয়,' বলে টমির দিকে তাকিয়ে শশী হেসে উঠল। 'আর নিজের চোখে দেখতে না পেলে পাখির চোখ ধার নেব।'

'ড্রোন ক্যামেরা,' বলে টমি তালি দিয়ে উঠে নিজের ব্যাকপ্যাক খুলে বসে পড়লপ্রাঙ্গণের ওপরে। শশী আর টমি মিলে কয়েক মিনিটের ভেতরেই ড্রোনটাকে সেট করে উড়িয়ে দিল ওপরের দিকে। টমি রিমোটেরে সাহায্যে ড্রোনটাকে কন্ট্রোল করে উঠতে শুরু করল ওপরের দিকে। আর শশী চোখ রাখতে শুরু করল ল্যাপটপে। ওর পেছন থেকে শারিয়ার আর ভুবনও চোখ রাখছে ল্যাপটপে। ধীরে ধীরে ড্রোনটা উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে। শ তিনেক গজ ওপরে উঠতেই মোটামুটি পাহাড়ের ওপরে দুর্গটাকে পরিষ্কার দেখা গেল। পুরো টিলা আর আশেপাশের এলাকা চোখে পড়ছে এখন।

'টমি ড্রোনটাকে আরেকটু সরিয়ে দুর্গটা সরাসরি ওপরে নিয়ে আসো,' শশী নির্দেশনা দিল। ড্রোনটাকে সরিয়ে দুর্গের ওপরের অংশে স্থির করল টমি। বাকিরা চোখ বোলাতে শুরু করল ল্যাপটপের স্ক্রিনে। প্রথমে তেমন কিছুই দেখা গেল না। তারপর দুর্গের ওপরের অংশে ভাঙাচোরা জায়গাটায় ধীরে ধীরে চোখ বুলাতে শুরুকরল ওরা। 'কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'এক মিনিট, শারিয়ার বলে উঠল। 'আমরা ভুলভাবে দেখছি ব্যাপারটা। টমি ড্রোনটা আরেকটু ওপরে ওঠাও,' বলে সে পুরো প্রাঙ্গণটা কভার করতে করতে বলল, 'এবার দেখো। বলে সে স্ক্রিনের ওপরে হাত রাখল। এই দেখো কামানগুলো থেকে যদি একটা করে সরল রেখা টানি তবে দেয়ালের এই জায়গাতে নির্দেশ করে। এবার এই জায়গা বরাবর ওপরের অংশে সার্চ করো,' বলেই সে আবারও নির্দেশ দিল টমিকে। আরেকটু নিচে নামিয়ে আনো টমি।'

'এই যে এখানে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে,' শশী খুশিতে হাত তালি দিয়ে উঠল। দুর্গের ওপরের অংশের সরলরেখা বরাবর পরীক্ষা করতেই পরিষ্কার দেখা গেল, দুর্গের ওপর দিকে ওই সরলরেখা রবাবর রেলিংয়ের দিকে একটা ছোটো ফোকরের মতো আছে। 'নিশ্চিত ওটা দুর্গের ভেতরের দিকে প্রবেশ করার কোনো পথ হবে।'

'এক মিনিট, এটা কী?' দুর্গের দিকে চোখ রাখাতে আগে কেউই খেয়াল করেনি। এখন খানিকটা অন্যদিকে তাকাতেই ড্রোনের ভিউতে পরিষ্কার দেখতে পেল দুর্গের নিচের অংশে একটা স্পিডবোট। 'সর্বনাশ! এটা এলো কোথা থেকে। সুমনকে সাবধান করে দিতে হবে,' বলেই শারিয়ার বসা থেকে সোজা দাঁড়াল। হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। ভুবনও নিজের অস্ত্র বের করে এনেছে। টমি আর শশী ঘটনার আকস্মিকতায় বোকা বনে গেছে। 'হচ্ছেটা কী? এখানে লোক আসবে কোথা থেকে?'

শারিয়ার আর ভুবন সোজা হয়েও সরতে পারল না, তার আগেই প্রাঙ্গণের সিঁড়ির কাছ থেকে আধ ভাঙা বাংলায় কথা বলে উঠল একজন মানুষ।

'সুমনকে আপনাদের সাবধান করার কোনো প্রয়োজন নেই,' বলে সে হাসি মুখে নিজের অস্ত্র নেড়ে কথা বলে উঠল সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে আসতে। শারিয়ার আর ভুবন দুজনেই নিজেদের অস্ত্র তাক করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। এমনভাবে দাঁড়াল দুজনে যাতে করে টমি আর শশীকেও কভার করা হয়ে যায়। 'সাবধান, এক পাও এগোবে না,' শারিয়ার ধমকে উঠল।

'ব্যাপারটা আসলে উল্টো,' বলে চায়নিজ চেহারার মানুষটা হেসে উঠল। 'তোমরা বরং কিছুই না করে নিজেদের অস্ত্র নামিয়ে নেবে। কারণ সুমন আমাদের

হাতে বন্দি,' বলে সে পেছন ফিরে ইশারা করতেই দুই দিক থেকে দুজনে ধরে সুমনকে নিয়ে এলো প্রাঙ্গণের ওপরে। একজন তার মাথার পাশে চেপে ধরে রেখেছে নিজের অস্ত্র।

শারিয়ারের অস্ত্র ধরা হাত আপনাতেই নেমে গেল নিচের দিকে।

অতীত

বাতাসে ভাসতে থাকা বারুদের গন্ধ, উড়তে থাকা ধুলো আর ধোঁয়া, তীব্র চিৎকার, আর্তনাদ আর উত্তেজনা সব মিলিয়ে যেন নরক নেমে এসেছে দুর্গের প্রাঙ্গণের ওপরে।

তবে কিরান জানে প্রকৃত নরক এখনো নেমে আসেনি। নরক নেমে আসবে একবার সিলভেরার জাহাজ ঘাটে ভিড়তে পারলে। সে আরেকবার চিৎকার করে কামান চালাতে নির্দেশ দিল। সঙ্গেসঙ্গেই প্রায় ছোটোছোটো মশালে করে কামানে আগুন দিল কামাঞ্চিদের দল। পাগলা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠে অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল কামানগুলো।

এর আগের আক্রমণে শেষ গোলার আঘাতে জাহাজের একদিকে হেলে গেছিল তাতে জাহাজের গতি সামান্য কমে এলেও দক্ষ জাহাজি পর্তুগিজরা আবারও জাহাজটাকে সোজা করে ফেলেছে। ফলে আবারও তরতরিয়ে এগোতে শুরু করেছে জাহাজ। বরং জাহাজের পাটাতনের ওপর থেকে আবার ওদের দিকে কামান অগ্নিবর্ষণ করল। গোলাগুলো ছুটে আসতে দেখে সবাইকে মাথা নিচু করে সাবধান থাকার নিদের্শ দিল কিরান। যদিও গোলাগুলোর একটাও প্রাঙ্গণ পর্যন্ত উঠে এলো না, তবে ওগুলোর আঘাতে কেঁপে উঠল চারপাশ। গোলাগুলো আগেরবারের চেয়ে খানিকটা ওপরে আঘাত করেছে। কিরান অনুমান করল এরপরের গোলাগুলো হয়তো প্রাঙ্গণে চলে আসতেও পারে। কারণ এগিয়ে আসছে জাহাজ।

নিজের মাথা নিচু করেই আবারও সোজা হয়ে গেল কিরান। দেখতে পেল এবার ছোড়া গোলাগুলের ভেতরে তিনটেই জাহাজে লাগল। পাটাতনে বিশাল এক ফোঁকর দেখা দিল, এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ল কাঠের টুকরো। একটা কামান সহ উড়িয়ে দিয়েছে জাহাজের একাংশ। অন্যটা জাহাজের দুটো মাস্তুলের একটাকে আহত করেছে খানিকটা।কিন্তু জাহাজ এখনো তরতরিয়ে এগিয়েই আসছে।

উত্তেজনার চোটে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিরান। জাহাজ যেভাবে এগিয়ে আসছে আর দুবার বড়োজোর কামানের গোলা বর্ষণ করার সুযোগ পাবে ওরা। এরপরে জাহাজ চলে আসবে ঘাটের ভেতরেই।

কিরান চিৎকার করে কামানে গোলা ভরতে নির্দেশ দিল। সে দুর্গের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো পদ্মের দিকে ইশারা করতেই পায়ে হেঁটে সামনে এগিয়ে এলো ছয় সাতজনের মতো অস্ত্রধারী। সারি দিয়ে প্রাঙ্গণের কিনারায় দাঁড়িয়ে বন্দুক তাক করল জাহাজের দিকে।

'গুলি করো,' বলে চিৎকার করে উঠতেই প্রায় কাছাকাছি সময়ে গুলি করল সবাই। ধোঁয়া কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিরান তাকিয়ে দেখল জাহাজের অগ্রভাগে সাজানো কামানগুলোর কাছে দুয়েকজন পড়ে গেছে। এছাড়া আর গুলিগুলো তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। কিরান বুঝল গুলির জন্য আরো কাছাকাছি আসতে হবে জাহাজগুলোকে। তবে কামানের গোলা লাগানোর এখনই সুযোগ।

কিরান লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে আবার পেছনে সরে বন্দুকে গুলি ভরার নির্দেশ দিয়ে নিজে চলে এলো সারি দিয়ে সাজানো কামানগুলোর কাছে। আগের বারের গোলাবর্ষণের পর আবারও গোলা ভরা হচ্ছে কামানে। গোলা ভরার পর বারুদ সাজিয়ে সলতে বসানোর পর কামানের পাশেই রাখা কয়লার বাক্স থেকে মশালে আগুন দিয়ে সেটা লাগানো হয়। কিরান একটা কামানের পাশে গিয়ে কামাঞ্চির হাত থকে গোলা নিয়ে ঢুকিয়ে দিল কামানের নির্দিষ্ট স্থানে। তারপর কামানের মুখটাকে ঘুরে স্থির করে ফেলল জাহাজের দিকে। জাহাজ বেশ ভালো গতিতে এগিয়ে আসছে ঘাটের দিকে। জাহাজের পাটাতনে দস্যুরা ছোটাছুটি করছে। সেইসঙ্গে ওরাও কামান দাগতে শুরু করেছে। কিরান কামানের মুখটা নামাতে নামাতে একেবারে প্রাঙ্গণের শেষ প্রান্তে ঠেকিয়ে দিল। তারপর পাশে হাত বাড়াতেই তার হাতে জ্বলন্ত মশাল ধরিয়ে দিল কেউ একজন।

অস্ফুটে কিরান বলে উঠল, 'গোলন্দাজের জন্য,' বলেই সে মশালটা ঠেকিয়ে দিল সলতের সঙ্গে। সামান্য লাফিয়ে উঠে কামানটা পিছিয়ে এলো। আর গোলাটা ছুটে গেল জাহাজের দিকে। সঙ্গেসঙ্গে আরো পাঁচটা কামান থেকে গোলা বেরিয়ে গেল জাহাজগুলোর দিকে। ধোঁয়া কাটতে কিরান দেখল জাহাজের মূল মাস্তুলটা হেলে পড়েছে একদিকে। পাটাতনে সদ্য তৈরি হওয়া নতুন বিরাট গর্তটা দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কিন্তু হাল চালানোর লোকটা এখনো ধরে আছে হালটা। জাহাজের গতি কিছুটা কমলেও সেটা এখনো এগিয়েই আসছে।

কামানে আবার গোলা ভরতে নির্দেশ দিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'বন্দুক বাহিনী সামনে এগোও,' বলতেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বন্দুক বাহিনী। 'জাহাজের হালের দিকে গুলি করবে সবাই,' বলতেই একরাশ গুলি ছুটে গেল জাহাজের দিকে। কিরান দেখতে পেল হালের কাছের লোকটা পাটাতনের ওপরে পড়ে গেছে। সেইসঙ্গে বন বন করে ঘুরতে শুরু করছে চাকাটা।

এটাই সুযোগ, মনে মনে বলে উঠল সে। উঠে দাঁড়িয়ে গলা চিড়ে চিৎকার করে উঠল গোমেজ আর বেদুর উদ্দেশ্যে। সেইসঙ্গে পাশের একজনের হাত থেকে গুলি ভরা একটা বন্দুক টেনে নিল নিজের হাতে। তারপর যাদের গুলি ভরা হয়ে গেছে তাদের নির্দেশ দিল নিশানা করতে।

সবাই মুখ চাওয়াচাউয়ি করছে, কিসের দিকে নিশানা করবে। এমন সময় প্রাঙ্গণের নিচের দিকেও টিলার প্রান্তে ঝোপঝাড় কেঁপে উঠতে শুরু করল। কিছু একটা গড়িয়ে চলেছে ঘাটের দিকে। কিরান হাঁটু গেড়ে বসে নিশানা করল ঘাটের দিকে।

প্রায় সঙ্গেসঙ্গে শূন্যে উড়াল দিল একটা পিপে। সেটাকে অনুসরণ করল ছোটো-বড়ো আরো অনেকগুলো পিপে। 'এইবার,' বলেই শূন্যে থেকে নিচের দিকে ধেয়ে চলেছে এরকম একটা পিপেতে গুলি করল কিরান। বারুদ ভরা পিপেটা বিস্ফোরিত হলো ঠিক জাহাজটার ওপর গিয়ে। সেই সঙ্গে বাকিগুলো অনুসরণ করলো ওটাকে। গুলি আর বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল পুরো পাহাড়ি টিলা।

বর্তমান

সুমনকে চায়নিজ হুয়ান জিঙের হাতে বন্দি দেখে নিজের পিস্তলটা সাবধানে নামিয়ে নিল শারিয়ার। সেইসঙ্গে হাত দিয়ে ভুবনকে ইশারা করল তার পিস্তলটা নামিয়ে নেয়ার জন্য।

'সুমনকে ওইদিকে পাহারায় পাঠানোই উচিত হয়নি,' বিড়বিড় করে বলে উঠলভুবন। 'আর আমারও এভাবে পাহারা ছেড়ে উঠে আসাটা একেবারেই ঠিক হয়নি।'

'যা হওয়ার হয়েছে,' শারিয়ার আস্তে করে বলে উঠল। তারপর হুয়ান জিঙের কাছে জানতে চাইল, 'তুমি আমাদের এখানে খুঁজে বের করলে কীভাবে?'

'তুমি ভুল প্রশ্ন করলে অফিসার,' হুয়ানকে দেখে মনে হচ্ছে মনে মনে বেশ খুশি সে। তার সঙ্গে ছয়-সাতজন লোক। তাদের ভেতরে কয়েকজন এগিয়ে এসে শারিয়ার আর ভুবনের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে নিল। তারপর দুজনকেই পরীক্ষা করে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করাল। টমিকেও ওই একই কাজ করা হলো। ওদের ভেতরে একজন শশীর গায়ে হাত দিয়ে যাচ্ছিল চেক করার জন্য ঠাস করে তাকে চড় মারল শশী। সঙ্গেসঙ্গে তার দিকে অস্ত্র তুলল হুয়ানের লোকেরা।

'কুল কুল,' বলে তার দিকে খানিকটা হুয়ান। 'ম্যাডামকে আমাদের দরকার,' বলে সে আশপাশটা দেখাল। 'উনি না থাকলে তো কোনোকিছুই হতো না,' বলে

সে শশীর একেবারে মুখের কাছে চলে এলো। 'কি ম্যাডাম, ঠিক বলেছি না?' বলে সে নিজের হাতের পিস্তলটা চেপে ধরল শশীর থুতনির নিচে। 'কি ম্যাডাম ঠিক বলেছি?' বলে সে ছেড়ে দিল শশীকে। সঙ্গেসঙ্গে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল শশী।

'এই সাবধানে,' বলে প্রায় চিৎকার করে উঠল ভুবন। 'শালা হারামি মেয়েদের গায়ে হাত তুলিস!'

শারিয়ার একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হুয়ানের দিকে। তারপর ফিরে তাকাল শশীর দিকে। 'মাদারটোস্ট...' শারিয়ার চিবিয়ে চিবিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল তার আগেই হুয়ান তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল।

'আচ্ছা, বহুত হয়েছে আবার কাজে নামো,' বলে সে শশী আর টমির দিকে ফিরে ইশারা করল। 'তোমরা যা বের করেছ, আমি সবই শুনেছি। কাজেই কোনো উল্টাপাল্টা চলবে না। এখান থেকে আমরা ওপরে উঠে দুর্গের ভেতরে নামার রাস্তাটা বের করব।'

'সে তো যাবকিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে,' শারিয়ার বলে উঠল।

'কোনো কথা নাই, আগে কাজে নামো,' হুয়ান ধমকে উঠল। কিন্তু শারিয়ারের ভেতরে কোনো বিকার দেখা গেল না। সে বলেই চলেছে। 'তুমি আমাদের এখানে অনুসরণ করলে কীভাবে?' শারিয়ার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হুয়ানের দিকে। 'লোকাল পুলিশে তোমার ইনফরমার আছে, সেটা আমি জানতাম। আর তাই এমনকি আমরা পুলিশ থেকে শুরু করে সবার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলাম, যাতে কেউই আমাদেরকে অনুসরণ করতে না পারে। কিন্তু তুমি ঠিকই আমাদের অনুসরণ করে একেবারে জায়গামতো চলে এলে। কীভাবে সম্ভব?'

'বলছি না, কথা কম,' বলে হুয়ান এগিয়ে এসে তার পিস্তল চেপে ধরল শারিয়ারের কপালের ওপরে। সে পিস্তল ঠেকাতেই শারিয়ার হেসে উঠল। তারপর সে ফিরে তাকাল সুমনের দিকে। 'নাকি এই প্রশ্নটা আমার করা উচিত সুমনকে?' শারিয়ারের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে সবাই অবাক হয়ে ফিরে তাকাল সুমনের দিকে। সুমন একেবারে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। 'উত্তর দাও সুমন?' শারিয়ার ধমকে উঠল।

'বস, প্লিজ,' বলে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। 'এরা যা বলে শুনেন প্লিজ না হলে...'

'এই! কী সব নাটক শুরু হলো,'

'আমি বলছি দেখো মেলে কিনা,' শারিয়ার মৃদু হেসে বলে উঠল। 'ওইদিন রাতে সেই রোডের ওখানে আমাদেরকে হারিয়ে ফেলার সঙ্গেসঙ্গে অ্যাকটিভ হয়ে ওঠে হুয়ান। যেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারে আমাদেরকে ধরতে পারছে না সেই মুহূর্তে তুমি সুমনের বাড়ি চলে যাও। সুমন যখন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে

ওর বাড়িতে যায় ওর ওয়াইফকে ঢাকার গাড়িতে তুলে দেয়ার জন্য, সে বাড়িতে পৌঁছে দেখে তোমরা ইতিমধ্যেই ওখানে পৌঁছে গেছ। সম্ভবত সুমনের ওয়াইফকে জিম্মি করেই তুমি ওকে...'

'বস প্লিজ,' সুমন হাত জোর করে অনুনয় করছে।

'এই সবাই ওপরে ওঠো...'

'হুয়ান তুমি অনেক চালাক। কিন্তু একটা ব্যাপার ভুলে গেছিলা যে শত্রুরও শত্রু থাকে বন্ধুরও শত্রু থাকে। তুমি ভুলে গেছিলে যে, কেউ একজন ডক্টর শশীকে অপহরণ করেছিল। আর সেটা তুমি নও, কাজেই...'

শারিয়ারের কথা শুনতে শুনতে সামনে এগিয়ে আসছিল হুয়ান। হঠাৎ থেমে গেল সে। 'মানে, তুমি কী বলতে চাচ্ছো?'

হুয়ান আর শারিয়ার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। শারিয়ারের মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। সঙ্গেসঙ্গে গুলি খেয়ে পড়ে গেল হুয়ান।

অতীত

কিরানের পরিকল্পনা অনুযায়ী গোমেজ আর বেদু মিলে অনেক বারুদের পিপে পাহাড়ি টিলার প্রাঙ্গণের অন্যপাশে স্তূপ করে রেখেছিল। সিলভেরার জাহাজের হাল ধরে থাকা লোকটা গুলি খেয়ে পড়ে যেতেই জাহাজের মাথাটা ধীরে ধীরে একদিকে ঘুরতে শুরু করে। আর সঙ্গেসঙ্গে কিরান চিৎকার করে নির্দেশ দিতেই দুজনে মিলে পিপাগুলোকে গড়িয়ে দেয় পাহাড়ের ওপর থেকে। পিপাগুলো ওপর থেকে পড়তে পড়তে যখন জাহাজের ওপরে শূন্যে এমন সময় কিরানসহ বাকিদের গুলিতে একটা পিপা বিধ্বস্ত হতেই বাকিগুলোও একসঙ্গে বিধ্বস্ত হতে শুরু করে। একসঙ্গে কেঁপে ওঠে পাহাড়ি টিলা। ধোঁয়া সরতে প্রাঙ্গণে থাকা সবাই দেখতে পেল জাহাজের পাটাতনের একাংশ আর জাহাজের একটা পাশ ভেঙে বসে গেছে। আর সেটার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে আগুন আর ধোঁয়া। জাহাজটাও আরো কাত হয়ে গেছে একপাশে। একসঙ্গে উল্লাস করে ওঠে সবাই মিলে।

কিন্তু কিরানদের মুখের হাসি মলিন করে দিয়ে জাহাজটার পাটাতনের অন্যপাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল দস্যুদের দল। সবার অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে সিলভেরা। দস্যুরা বেরিয়ে এসেই তাদের সামনের সারি থেকে একদল দস্যু বন্দুক হাতে হাঁটু গেড়ে বসে বন্দুক তাক করল ওদের দিকে। সঙ্গেসঙ্গে একপাশে লাফিয়ে পড়ে আড়াল তো নিলোই চিৎকার করে বাকিদেরকে সাবধান করে দিল কিরান। এক ঝাঁক গুলি ছুটে এলো ওদরে দিকে। এক গড়ান দিয়ে উঠে এসেই কিরান দেখতে পেল ওদের ভেতরে কয়েকজন গুলি খেয়ে পড়ে গেছে এদিকে-সেদিকে।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল জাহাজটার মাঝামাঝি পাটাতনের একটা অংশ ভেঙে পড়লেও তাতে ভেতরে অবস্থানরত দস্যুদের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। অন্যদিকে জাহাজটা প্রায় ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থায় চলে গেলেও ওটা প্রায় চলে এসেছে ঘাটের কাছাকাছি। বেঁচে থাকা দস্যুরা এখন পিলপিল করে বেরিয়ে এসে গুলি চালাতে শুরু করেছে।

'সবাই যার যার অস্ত্র তুলে নাও, এবার শুরু হবে আসল লড়াই,' বলেই কিরান এক হাতে টান দিয়ে বের করে আনল নিজের তরবারি, অন্যদিকে মাটিতে পড়ে থাকা একটা বন্দুক তুলে নিল।

'কামাঞ্চিরা গোলা ভরে আবার চালাও। পদ্ম বন্দুকবাজদের সারি দিয়ে গুলি করতে বলো,' বলেই কিরান হাঁটু গেড়ে বসে বন্দুক তাক করল নিচের ঘাটের দিকে। দুপাশে সারি দিয়ে বসে গেছে আরো একাধিক সৈন্যরা।

নিচে সিলভেরাদের জাহাজ প্রায় ডুবতে বসেছে। ডুবতে ডুবতে জাহাজটা এসে বাড়ি মারল ঘাটে ভেড়ানো একটা নৌকাতে। সেটাকে চেপ্টা করে দিয়ে ঘাটের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থেমে যেতে শুরু করল ওটা। জাহাজ ভাঙার মরমর ধ্বনিতে ভরে উঠল জায়গাটা। ঘাটের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে একদিকে কাত হয়ে মাটির সঙ্গে বাড়ি খেতে খেতে থেমে গেল বিরাট জাহাজটা। সেটা থেকে পিলপিল করে লাফিয়ে নামতে শুরু করল দস্যুরা। সংখ্যায় একেবারে কম বলা যাবে না।

ঘাটের সিঁড়িতে পা রাখা প্রথম দস্যুটা কিরানের গুলি খেয়ে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে আরো কয়েকজন পড়ে গেল গুলি খেয়ে। কিন্তু বন্দুকবাজদের গুলি শেষ হতেই আবারও স্রোতের মতো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল দস্যুরা। সবার অগ্রভাগে কিরান দেখতে পাচ্ছে সিলভেরাকে। মুখে গালির তুবড়ি ছুটিয়ে উঠে আসছে সে।

প্রথম দফা গুলি করেই বন্দুকবাজদের নিয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল কিরান। এক রাউন্ড গুলি করেই বন্দুকে গুলি ভরতে শুরু করেছে সবাই। বন্দুকে গুলি ভরতে ভরতেই আরো বেশ খানিকটা উঠে আসতে শুরু করেছে দস্যুরা। কিরানরা বন্দুকে গুলি ভরতে ভরতে আরেক দফা কামানে গুলি চালাল কামাঞ্চিরা। কিন্তু প্রায় সব গোলাই দস্যুদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে পানিতে গিয়ে পড়ল। কামানে আর কোনো কাজ হবে না। নাহ, শেষবারের মতো কাজে লাগানোর মতো একটা উপায় আছে। হাতের বন্দুক আরেকজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে গুলি ভরতে বলল কিরান।

তারপর দৌড় দিল প্রথম কামানটা যেখানে আছে সেদিকে। কাছে গিয়ে দেখতে পেল কালিঝুলি মাখা কামাঞ্চি ওটাতে গোলা ভরে ফেলেছে। গোলা ভরা শেষ হতেই কিরান তাকে নিয়ে কামানের মুখটা ঘুরিয়ে দিল। দুর্গের একপাশের দেয়ালের দিকে, যেখানটা সিঁড়ির সবচেয়ে কাছে। কামাঞ্চি বোঝার চেষ্টা করছে কিরান আসলে কী করছে। কামানের মুখটা ঘুরিয়ে দিতেই বুঝে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

কিরান চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দিল, 'সরে যাও,' বলেই সে বাড়িয়ে দেওয়া মাশলটা হাতে নিয়ে সেটাতে ঠেকিয়ে দিল সলতের মুখে। সঙ্গেসঙ্গে পাগলা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠে কামানের গোলাটা ছুটে গেল দুর্গের একপাশের দেয়ালের ওপরে।

আগুনের হলকার মতো গোলাটা সবার মাঝখান দিয়ে ছুটে গিয়ে আঘাত করল পাথুরে দেয়ালে। ভারী পাথুরে দেয়ালটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল সিঁড়ির ওপরে। দেয়ালটা ধসে পড়ার একটু পরেই নিচ থেকে ভেসে এলো একাধিক মানুষের আর্তনাদ। নিশ্চিত ভাঙা দেয়ালের টুকরোয় চাপ পড়ে মরছে দস্যুরা। কিরানের পরিকল্পনা কাজে দিয়েছে।

কিন্তু কিরান তাতেও খুশি হলো না। ওদের হাত থেকে বাঁচতে হলে আরো ক্ষতি করতে হবে। কোমর থেকে একটানে সে বের করে আনল পিস্তলটা। ওটা দিয়ে গুলি করল কামান আটকে রাখা শিকলটাতে। গুলির আঘাতে সেটা টুকরো টুকরো হয়ে ছুটে যেতেই কামানটাকে ঠেলতে শুরু করল কিরান। তার সঙ্গে হাত লাগাল আরো দুজনে।

'সরে যাও, সরে যাও,' কামানটাকে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে সিঁড়ির গোড়ার কাছে নিয়ে এলো কিরানরা, তারপর ওটাকে ঠেলে ফেলে দিল নিচে।

তিন মণিভারী লোহার তালটা মুহূর্তের জন্য যেন বাতাসে ঝুলে রইল শূন্যের ওপরে তারপর কানে তালা লেগে যাওয়ার মতো শব্দ করে সেটা গড়িয়ে পড়তে শুরু করল নিচের দিকে। পাথর আর লোহার সংঘর্ষে একদিকে আগুনের ফুলকি ছুটল, সেই সঙ্গে হাড়-মাংস থেঁতলানোর আওয়াজের সঙ্গে তীব্র আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল জায়গাটার বাতাস।

কিরান উঁকি দিল সিঁড়ির দিকে। পাথুরে সিঁড়ি নরকে পরিণত হয়েছে। একদিকে গোলা, তারপর পাথুরে দেয়াল আর সবশেষে ভারী কামানের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে সিলভেরার বাহিনীর একাংশ। টুকরো টুকরো মানবদেহ আর রক্তের ধারায় ভেসে যাচ্ছে সিঁড়ি। কিন্তু সিলভেরা আর তার দলের লোকেরা যেন অদম্য-অপ্রতিরোধ্য। এত মৃত্যু আর ক্ষয়ক্ষতির পরও সিলভেরা ঠিকই একদল লোক নিয়ে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো উঠে আসছে ওপরের দিকে।

কোমরে রেখে দেওয়া তলোয়ারটাকে আবারও বের করে এনে অন্যহাতে পিস্তলটা ধরে নিজের লোকদেরকে সারি দিয়ে প্রস্তুত করে ফেলল কিরান। নিজে সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে অস্ত্রহাতে প্রস্তুত দলটাকে সামনে এগোনোর নির্দেশ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল কিরান। এবার হবে জীবনমরণের আসল লড়াই।

'সবাই প্রস্তুত...' কথা শেষ করার আগেই ধুলো আর ধোঁয়ার ভেতরে আচমকাই সিঁড়ির প্রথম ধাপে উদয় হলো দানব সিলভেরা।

কিরান সারি দিয়ে দাঁড়ানো নিজের লোকদেরকে একবার দেখে নিয়েই চিৎকার করে উঠল, 'শেষ লড়াই,' বলতেই দুই বাহিনী একে অপরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বর্তমান

হুয়ান গুলি খেয়ে পড়ে যেতেই মুহূর্তেও জন্য সময় যেন থমকে দাঁড়াল। কিন্তু সবার আগে সচকিত হয়ে উঠল শারিয়ার। কারণ সে জানত এরকম কিছু একটা হতে যাচ্ছে।

হুয়ান পড়ে যেতেই সে ছোটো একটা লাফ দিয়ে আগে বাড়ল। হুয়ানকে পড়ে যেতে দেখে তার সঙ্গীরা প্রায় সবাই চমকে উঠেছে। তাদের দেখে শারিয়ারের কাছে মনে হলো হুয়ান দলের ওপরে এমনভাবে কর্তৃত্ব করে যে এরা নির্দেশ নিতে নিতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখন চাইলেও নিজে থেকে চট করে কিছু করতে পারে না। আর হুয়ান পড়ে যেতেই সেটাই প্রমাণিত হলো।

হুয়ানের সঙ্গীরা এমনভাবে হতচকিত হয়ে গেছে যে, তারা সিদ্ধান্ত নেবার আগেই ঘটে গেল যা ঘটার। শারিয়ার ছোটো একলাফে সামান্য এগিয়ে হুয়ানের এক সঙ্গীর পিস্তল ধরা হাতটা ধরে ফেলল। হুয়ানকে পড়ে যেতে দেখে লোকটা তার দিকে তাকিয়েছিল। শারিয়ার তার পিস্তলটা ধরে ফেলতেই সে দক্ষতার সঙ্গে নিজেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। লোকটার পিস্তল ধরা হাতটা ধরেই মোচড় দিতেই ক্যাক করে একটা শব্দ হয়ে পিস্তলটা খসে গেল তার হাত থেকে। পড়ন্ত পিস্তলটা লুফে নিয়ে শারিয়ার সেটা ছুড়ে দিল ভুবনের দিকে। 'ভুবন,' বলেই সে পিস্তলটা ছুড়ে দিয়েই ফিরে তাকাল। হাতে ব্যথা পেলেও দক্ষ লোক সে। মোচড় খাওয়া কবজিটা অন্যহাতে ধরে শারিয়ারকে লাথি মারতে যাচ্ছিল সে। তার আগেই শারিয়ার পা টা ধরে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতেই লোকটা ছিটকে গিয়ে বাড়ি খেল তার অপর সঙ্গীর সঙ্গে।

লোকটার অপর সঙ্গী ধরে ছিল টমিকে। বাড়ি খেয়ে সে টমিকে ছেড়ে ফিরে তাকাল শারিয়ারের দিকে। হাতের অস্ত্র শারিয়ারের দিকে তাক করতে যাচ্ছিল তার আগেই শারিয়ারের লাথি খেয়ে অস্ত্র হারাল সে। সেই সঙ্গে সোলার প্লেক্সাসে জোরদার লাথি খেয়ে সরে গেল একপাশে। শারিয়ার মাটিতে লাফ দিল। মাটিতে এক গড়ান দিয়েই লোকটার পড়ে যাওয়া পিস্তলটা তুলে নিয়ে উল্টো অবস্থাতেই

গুলি করল একজনের পায়ে। অপরজন দুহাত তুলে অত্মসমর্পণ করার জন্য হাত তুলতেই শারিয়ার নিজের অস্ত্র নামিয়ে নিতে শুরু করল কিন্তু এই লোকটাও পড়ে গেল গুলি খেয়ে।

সঙ্গেসঙ্গে পিস্তল হাতে ঘুরে দাঁড়িয়ে শারিয়ার দেখল দুজনে মাটিতে পড়ে আছে। আর বাকি দুজনের দিকে অস্ত্র তাক করে আছে ভুবন। কিন্তু শারিয়ারের দৃষ্টি সেদিকে নয়। সে তাকিয়ে আছে মাথার ওপরে বন বন করে ঘুরতে থাকা এক জোড়া রোটরের দিকে। শব্দটা অনেকক্ষণ ধরেই পাচ্ছিলো সে। কিন্তু এখন হেলিকপ্টারটা মাথার একেবারে ওপরে এসে থেমেছে। শারিয়ার ভুবনের দিকে তাকিয়ে একবার ইশারা করল। কিন্তু দুজনের কেউই নড়ে ওঠার আগেই বনবন করে ঘুরতে থাকা চপারটা থেকে নেমে এলো তিন চারজন অস্ত্রধারী। তিনজনই কমান্ডোদের সাজে সজ্জিত। একজনের হাতে দূর পাল্লার রাইফেল।

তিনজনেই নেমে এসে শারিয়ার আর ভুবনকে নিরস্ত্র করে ফেলল। সেইসঙ্গে অজ্ঞান চারজন লোককে টেনে সরিয়ে ফেলল একপাশে। সেই সঙ্গে হাত কড়া পরিয়ে দিল হুয়ান বাকি দুজন মানুষকে।

'ব্যাপার কী বস? ঘটছেটা কী?' ভুবন খুব অবাক হয়ে জানতে চাইল। কিন্তু শারিয়ার জবাব দেয়ার আগেই ধমকে উঠল কমান্ডোর মতো পোশাক পরা তিনজনের একজন।

'শান্ত, থাকো, অপেক্ষা করো,' কথাটা শুধু ভুবন নয় বাকিদেরকেও উদ্দেশ্য করে বলে উঠল শারিয়ার। কথাটা শেষ করতেই সে ভুবনের দিকে ফিরে বিশেষ একটা ইশারা করল। জবাবে ভুবনও মাথা নেড়ে সায় জানাল।

'এই চুপ থাকতে বললাম না,' আধাভাঙা বাংলায় কমান্ডোদের একজন ধমকে উঠল। হুয়াঙের দলের অজ্ঞান লোকগুলোকে সরিয়ে বাকিদের হাতকড়া পরিয়ে ওরা শারিয়ারদেও এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর চারপাশটার দিকে ফিরে হাতের বুড়ো আঙুল তুলে ওকে সাইন দেখাতেই চপারটা নেমে এলো প্রাঙ্গণের একপাশে। সেটা থেকে নেমে এলো হালকা পাতলা একজন মানুষ। তার পেছনে আরেকজন কমান্ডোর মতো পোশাক পরা অস্ত্রধারী।

লোকটা কাছে আসতেই শারিয়ার দেখল হালকা-পাতলা মানুষটা চারপাশে চোখ বুলাতে বুলাতে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা ওদের একেবারে সামনে চলে এলো। শারিয়ারের সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিল সে। তারপর চট্টগ্রামের স্থানীয় টানের বাংলায় বলে উঠল, 'মিস্টার শারিয়ার আপনার সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে ছিল। অবশেষে হয়েই গেল,' বলে সে হেসে উঠল।

শারিয়ার এখনো মানুষটার দিকে হাত বাড়ায়নি। সে মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখছে। মানুষটা বাঙালি কোনো সন্দেহ নেই, সম্ভবত বৃহত্তর চট্টগ্রামেরই কোথাও তার আদিনিবাস। কিন্তু তার গায়ের রং দেখলে চট করে মনে হয় মানুষটা বিদেশি। শারিয়ার একটা হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। সেটাকে সামান্য নাড়া দিয়ে মানুষটা হেসে উঠল, 'আমি জানতাম আপনি ম্যান অব ম্যানারস,' লোকটার বাংলার চেয়ে ইংরেজি অনেক বেশি পরিশীলিত। বলে সে শশীর দিকে ফিরে বলে উঠল, 'এর আগেরবার আপনার সঙ্গে দেখা হতে হতে হয়নি ডক্টর। অবশ্য তাতে ভালোই হয়েছে,' বলে সে চারপাশটা দেখাল। 'আপনি যা করলেন সেটার তো কোনো তুলনা নেই। এই জায়গাটা অনেক কম সময়ে খুঁজে বের করাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছেন আপনি। অবশ্য এতে আপনাদের পুরো টিমকে ক্রেডিট দিতে চাই আমি।'

'আপনি কে, বলেন তো?' বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল শশী।

'আর এভাবে আমাদেরকে বন্দি করে রাখার মানে কী?' নিজের সামনে দাঁড়ানো কমান্ডোর হাতে ধরা অস্ত্রটাতে ঝাপটা মারলভুবন।

'আস্তে আস্তে, মিস্টার ভুবন, আপনার জায়গায় আমি হলে আরেকটু সাবধানে বিহেইভ করতাম। কারণ যদিও এরা ভাড়াটে লোক,' বলে সে নিজের পাশের কমান্ডোদেরকে দেখাল। 'কিন্তু এরা সবাই প্রফেশনাল মার্সেনারি। কাজেই একটু সাবধান,' বলে সে জোরে হেসে উঠল। 'ওহ মাই গড! আমি কাকে কী বলছি আপনি তো ওদেরই একজন। তাইনা?' বলে সে হাসতে হাসতেই ফিরে তাকাল শশীর দিকে। 'মাই ডিয়ার লেডি, আমার পরিচয় তাই না?'

'আমি বলছি,' হঠাৎ শারিয়ার কথা বলে উঠল। 'আমি হয়তো উনার নাম জানি না, তবে পরিচয়টা অনুমান করতে পারি। যখন থেকে এই কেসে ইনভলভড হলাম তখন থেকেই অনুধাবন করতে পারছিলাম সাদা চোখে যা দেখছি, আসলে ঘটনা যা ঘটছে পুরোপুরি তা নয় বরং ঘটনার ভেতরে আরো অনেক ঘটনা আছে। বাপের ওপরেও আরো অনেক বাপ আছে,' বলে শারিয়ার হেসে উঠে মাটিতে পড়ে থাকা হুয়ানকে দেখাল। 'ও যদি বাপ হয় তবে ইনি হলেন দাদা। ডক্টর আবদেলের পেছনে দুনিয়ার বড়ো-বড়ো যেসব প্রতিষ্ঠান লেগেছিল, ইনি তাদেরই একজন। ঠিক কিনা?'

'একদম ঠিক মিস্টার শারিয়ার। আমি এমন এক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছি যার নাম মুখে নিতে এমনকি আমি নিজেও ভয় পাই। তবে আমাকে সবাই আলট্রা মাস্টার বা ইউ নামে জানে। এই জন্যই আমি বুদ্ধিমান মানুষদেরকে শ্রদ্ধা করি,' বলেই সে হঠাৎ দ্রুত দুই পা পিছিয়ে গেল। 'অনেক কথা হয়েছে। এবার কাজে নামতে হবে,' বলে সে হুয়ানকে দেখাল। 'যেহেতু বাইরের আবর্জনা পরিষ্কার

হয়েছে কাজেই এবার আমরা ভেতরে যাবো,' বলে সে শশীর দিকে ফিরে বলে উঠল, 'ডক্টর আপনি পথ দেখান আমাদের,' বলে সে দুজন সৈনিককে সামনে পাঠল। তার পেছনে বাকিরা সবাই আর সবার পেছনে আরো একজন। আর বাইরে পাহারায় রইলআরও একজন। সবাই সারি দিয়ে উঠে এলো দুর্গের চাতালের মতো অংশটার ওপরে।

টমিকে নিয়ে শশী চলে এলো সেই নিচে নামার পথটার কাছে। এখান থেকে দুর্গের পেছনের টিলা জঙ্গল আর পেছনের সমুদ্র পরিষ্কার দেখা যায়। 'এই পথটা আসলে দুর্গের পেছনের দিকে নেমে ভেতরে দিকে প্রবেশ করেছে,' অস্ফুটে বলে উঠল শশী। যতই ভাবছে সে দুর্গের নির্মাণশৈলী মুগ্ধ করছে তাকে।

'আফটার ইউ ডক্টর,' বলে আলট্রা মাস্টার মাঁনে ইউ শশীকে ইশারা করল নিচে নামার জন্য।

অতীত

চারপাশে তলোয়ারের ঝলকানি আর ছুটন্ত সিসার উদগীরণ করা বারুদের গন্ধ। প্রথম আক্রমণটা হিসেবের মধ্যে থাকলেও একবার দুই পক্ষ মুখোমুখি হতেই পুরো মোকাবেলাটা উন্মত্ত যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। পাগলের মতো চারপাশে নিজের অস্ত্র চালাচ্ছে কিরান। কিন্তু তার দৃষ্টি পড়ে আছে সিলভেরার দিকে। সিলভেরার অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী আর পদ্মের বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতেই চারপাশ থেকে একে অপরের ওপর স্রেফ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা।

কিরানদের প্রাথমিক আক্রমণে সিলভেরার বাহিনীর দস্যু কমে যাওয়ার পরেও সংখ্যায় তারা অনেক। অন্যদিকে পদ্মর বাহিনীর জন্য এটা স্রেফ হারজিতের লড়াই নয়, বরং জীবনমরণের লড়াই। তাই জান দিয়ে লড়ছে ওরা। যে যেভাবে পারছে প্রাণপণ চেষ্টা করছে লড়াই করার। কিরান পাগলের মতো লড়াই করে চালালেও তার দৃষ্টি আসলে সিলভেরার দিকে। কারণ সিলভেরার বাহিনীর বিরুদ্ধে মূল লড়াইটা পরিচালনা করছে পদ্ম আর তার সহযোগীরা।

কিরানের নজর সিলভেরার দিকে। কারণ সে এটা পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারছে, যে যতই চেষ্টা করুক লড়াইতে ওরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছে। এই লড়াই আর কিছুক্ষণ চললেই ওদেরকে কোণঠাসা করে ফেলবে সিলভেরার বাহিনী। সাপের দেহ থামাতে হলে এর মাথা কাটতে হবে। খতম করতে হবে সিলভেরাকে।

সামনে আসা এক দস্যুর বুকে তলোয়ার চালিয়ে দিয়ে সেটাকে একটানে বের করে নিল কিরান। তারপর অপর হাতে নিজের কোমর থেকে বের আনল ওর বাবার দেওয়া পিস্তলটা। 'পদ্ম,' ওর থেকে বেশ খানিকটা তফাতে লড়তে থাকা পদ্মকে

চিৎকার করে ডেকেই সামনের দিকে ইশারা করল কিরান। লড়াইরত সৈন্যদলের ভেতরে সবার মাথা ছাড়িয়ে এক হাত উঁচু হয়ে থাকা সিলভেরার মাথাটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

পদ্মকে ইশারা করেই সেদিকে পা বাড়াল কিরান। কয়েক পা এগোনোর আগেই লোকটার টের পাওয়ার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেল কিরান। কোনো কারণ ছাড়াই সে বুঝতে পেরেছে কিছু একটা হতে যাচ্ছে। চট করে এদিকে ফিরে তাকাল সে। আর সঙ্গেসঙ্গে দৃষ্টি পড়ে গেল কিরানের ওপরে। কিরান তার দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল লোকটার দুই চোখে খুশির ঝিলিক। সিলভেরার সামনে চলে আসা এক দস্যুকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল সে। তারপর এগোতে শুরু করল কিরানের দিকে। রাগের হলকা বয়ে গেল কিরানের শরীরে। পা বাড়াতে গিয়েও হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই থেমে গেল সে। আকরাম বেগ একবার তাকে বলেছিল তুমি কী তোমার 'শত্রুকে বুঝতে পেরেছো? ধরতে পেরেছে তার দুর্বলতা আর তার শক্তি? তুমি কি বুঝতে পেরেছো তাকে?' কথাটা হঠাৎই বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তার মাথায় আসতেই কিরান থেমে গেল।

এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো সে সিলভেরার মুখোমুখি হতে চলেছে। এর আগের দুইবারই সে হেরেছে এই লোকটর কাছে, কারণ কী?

সিলভেরা এগিয়ে আসছে তার দিকে। কিরানের মনে হলো কোনো মানুষ নয় বরং যেন উন্মত্ত এক ঝড় এগিয়ে আসছে তার দিকে। কিরান পেছাতে শুরু করল পেছন দিকে। সিলভেরা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। কিরান পিছিয়ে যাচ্ছে। লোকটা এবার দৌড়াতে শুরু করল ওর দিকে। সামনে যাকে পাচ্ছে ভেঙেচুরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে এগোতে শুরু করেছে।

পেছাতে পেছাতে চট করে থেমে গেল কিরান। ছুটে আসা উন্মত্ত ঝড়টাকে এড়ানোর জন্য লাফিয়ে পড়ল একপাশে। সিলভেরা ভেবেছিল সে ধরে ফেলেছে কিরানকে। কিন্তু হঠাৎ পিছিয়ে সরে পড়াতে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে। কিরান থেমে গিয়ে এক গড়ান দিয়েই লোকটার দিকে পিস্তল তুলল। এবার ওর মুখে ফুটে উঠেছে হাসি। কিন্তু গুলি ছোড়ার জন্য ঘোড়ায় চাপ দিয়েই গলা শুকিয়ে এলো ওর। গুলি বেরুল না। আর্তনাদ করে উঠল কিরান। ওর মনে পড়ে গেল এর আগে একবার গুলি করেছিল সে এটা দিয়ে। এরপরে আর গুলি ভরার সময় পায়নি।

কিরানকে গুলি করতে দেখে মুহূর্তের জন্য থেমে গেছিল সিলভেরা। কিন্তু গুলি বেরুতে না দেখে এক লাফে এগিয়ে এলো। কিরান পেছাতে পেছাতে চলে এসেছে একেবারে কিনারায়। সিলভেরা তলোয়ার তুলতেই কিরানের পেছন থেকে ভেসে এলো আরেক চিৎকার। পেছন থেকে ছুটে আসছে আরেক উন্মত্ত ষাঁড়, গোমেজ।

গোমেজ আর বেদু বারুদের পিপেগুলোকে ঠেলে ফেলে দিয়েই টিলার নিচ থেকে উঠে আসছিল। প্রাঙ্গণের কাছাকাছি আসতেই কিরানকে সিলভেরার মুখোমুখি দেখে গোমেজ দৌড়ে সোজা গিয়ে পড়ল তার গায়ের ওপরে। সিলভেরা যত শক্তিশালীই হোকনা কেন, প্রায় তার সমান সাইজের এত বড়ো একজন মানুষের ধাক্কা সামলাতে পারল না সে। পড়ে গেল সে।

সঙ্গেসঙ্গে নিজের তলোয়ার তুলে নিয়ে সামনে এগুল কিরান। প্রথম আঘাত করল সিলভেরার পায়ে। তীব্র আঘাতে তার শরীরটা বাঁকা হয়ে যেতেই লোকটার গলাটা কেটে দিত পরবর্তী আঘাতে। কিন্তু ওর তলোয়ারটা খালি হাতেই ধরে ফেলল সিলভেরা। পেছন থেকে সিরভেরার ঘাড় চেপে ধরল গোমেজ। আর এক পাশ থেকে তার এক হাত মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরল বেদু। নিজের তলোয়ারটাকে সিলভেরার হাত থেকে টেনে বের করে নিল কিরান।

মুহূর্তের জন্য সিলভেরার রক্তলাল চোখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। আবারও অবাক হয়ে অনুভব করল লোকটার চোখে না আছে মৃত্যুভয়, না আছে ব্যথা বা অন্য কোনো অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। নিজের তলোয়াটাকে সর্বশক্তি দিয়ে সে বসিয়ে দিল সিলভেরার বুকে। কিন্তু সিলভেরার বুকের সঙ্গে আটকানো বর্মের লেগে একপাশে পিছলে গেল ওর তলোয়ার। আবারও আরেক টানে বের করে এনে ওটাকে সিলভেরার গলায় ঢুকিয়ে দিতে যাবে পেছন থেকে মেয়েলি গলায় আর্তনাদ শুনে ফিরে তাকাল কিরান। সঙ্গেসঙ্গে জমে গেল সে।

পদ্মর দলটাকে কোনোঠাসা করে ফেলেছে সিলভেরার বাহিনী। বিশালদেহী এক দস্যু পদ্মকে একহাতে ধরে রেখেছে পুতুলের মতো। অন্যহাতে বিরাট একটা ড্যাগার। চিৎকার করে সিলভেরাকে ছেড়ে দিতে বলল লোকটা, না হলে পদ্মকে মেরে ফেলবে এটাও জানাল। কিরানের তলোয়ার সিলভেরার গলার চামড়ার সঙ্গে প্রায় সেঁটে গেছিল। সঙ্গেসঙ্গে মাথা নিচু হয়ে এলো কিরানের। জিততে জিততে হেরে গেছে ও। হাত থেকে তলোয়ারটাকে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বেদু আর গোমেজের হাত থেকে ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সিলভেরা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই কিরানের চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো পদ্মের পাশে। তাকে দেয়ালে দিকে ঠেলে ফেলে দিয়েই পদ্মকে ধরে রাখা সেই লোকটার কানে কানে কিছু একটা বলল সিলভেরা।

'তালেব তৈমুরের রেখে যাওয়া জিনিসগুলোর কাছে নিয়া চলো আমাদের। না হলে এখানে সবাই মরবা,' নিরুত্তাপ গলায় বলে উঠল লোকটা। সামনে তাকিয়ে কিরান দেখল ওর নিজের লোক থেকে শুরু করে পদ্মর বাহিনীর বেশির ভাগ যোদ্ধাই হয় মৃত নয় আহত কিংবা সিলভেরার লোকদের হাতে বন্দি।

আহত রক্তাক্ত পদ্ম মাটিতে পড়ে যেতেই হাতের ইশারার দেখাল কোন দিকে যেতে হবে ওদেরকে। সেদিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইশারা করল সিলভেরার লোকেরা। সবার আগে আগে চলল পদ্ম, আর সবার পেছনে আসছে সিলভেরা। ওরা দুর্গের ওপর দিকে উঠে এসে পেছনের পথ দিয়ে নামতে শুরু করল।

বর্তমান

দুর্গের পেছনের দিকের সেই বিশেষ জায়গার প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে নামছে শশী, ওর ঠিক পেছনেই টমি, তার পেছনে বাকিরা। নামতে নামতে দুর্গের গঠনশৈলীটা অনুভব করে আরেকবার অবাক হলো শশী। ওরা যেখানে আছে সেদিকটা দুর্গের ভেতরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে। কিন্তু সেই হিসেবে জায়গাটা একেবারেই আঠালো আর স্যাঁতসেতে নয় বরং বলা চলে বেশ পরিষ্কার আর কোনো ধরনের ভ্যাপসা ভাবও নেই।

'এখানে কেউ একজন এসেছিল,' ওরা নামতে নামতে পেছন থেকে সেই লোকটা বলে উঠল যে একটু আগে নিজেকে মিস্টার ইউ নামে পরিচয় দিয়েছে। 'আর যে মানুষটা নেমেছে এখানে সেটা ডক্টর আবদেল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আমি এখনো অবাক হই এই লোকটা আসলে কী দিয়ে তৈরি ছিল। আমাদের মতো ঘাঁগু লোকদের সে যেভাবে ঘোল খাইয়ে দিয়েছে সেটা অদ্ভুতই বটে। আর সে যা আবিষ্কার করেছে সেটার কথা আর নাইবা বলি,' বলে সে হাসতে লাগল।

ওরা প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে একেবারে খোলা ময়দানের মতো একটা জায়গায় চলে এলো। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে জায়গাটার দিকে। এটা সম্ভবত পাহাড়ের ওপরে দুর্গের মূল অংশের একেবারে নিচে। কিন্তু সেটা বিষয় নয়, বিষয় যেটা-সেটা হলো জায়গাটা বিশাল এবং একপাশে একেবারেই খোলা জানালার মতো ফোকর দিয়ে আরো আসছে। সেদিক দিয়ে এমনকি সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

'বাহ, অদ্ভুত সুন্দর তো জায়গাটা,' মিস্টার ইউ কথাটা একেবারে ভুল নয়। জায়গাটা বিস্ময়করই বটে। একদিকে প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর অসাধারণ নিদর্শন তার ওপরে আবার গোল কামরাটাকে ঘিরে আছে নানা ধরনের প্রাচীন মূর্তি। লাল পাথর দিয়ে তৈরি মেঝে থেকে শুরু করে একেবারে ছাদ পর্যন্ত জায়গাটাতে বাইরে থেকে আলো আসছে। সেই আলোর প্রভাবে চারপাশ তো বটেই, এমনকি ভেতরেও অনেকটা জায়গাতেই সুন্দর আলোকিত হয়ে উঠেছে। 'অদ্ভুত,' লোকটা কথা বললেও সবাই হা করে তাকিয়ে আছে। চারপাশের অতিপ্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে।

সবাই যখন হা করে চারপাশে তাকিয়ে আছে, ভুবন এগিয়ে এসে চট করে শারিয়ারের হাতে কিছু একটা গুঁজে দিতেই শারিয়ার সেটা রেখে দিল পকেটে। প্রায় চোখে পড়েনা এমনভাবে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে।

'অদ্ভুত সুন্দরই বটে,' এবার বলে উঠল শশী। সেও বাকিদের মতোই মুগ্ধ হয়ে দেখছে। 'এমন জায়গায় এরকম কিছু থাকতে পারে ভাবাই যায় না। আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে ওপরের দুর্গটাতে যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটার বেশিরভাগই পুরনো কোনো যুদ্ধের ফলে। ভেতরটা আরো অনেক বেশ সুরক্ষিত রয়ে গেছে।'

'ইয়েস ডক্টর, আমরা যা খুঁজতে এসেছি সেটা খুঁজে বের করুন এখন। আপনার ম্যাপ বা অন্য কিছু, কী বলে?' মিস্টার ইউ ভ্রু নাচিয়ে জানতে চেয়ে আবারও বলে উঠল।

'এবার আর ম্যাপে খুঁজতে হবে না,' শশী কিছু বলার আগেই পেছন থেকে শারিয়ার বলে উঠল। ওই যে ওদিকে মনে হয় কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি আমরা,' বলে সে গোলমতো গুহার বিরাট কামরাটার একদিকে দেখাল। সঙ্গেসঙ্গে সবাই ফিরে তাকাল সেদিকে।

সবাইঅবাক হয়ে এবার খেয়াল করল ওরা এতক্ষণ যা দেখেছে সেটার তুলনায় শারিয়ার যেদিকে দেখিয়েছে সেদিকে যা দেখা যাচ্ছে সেটার কোনো তুলনা নেই।

বিরাট একট নারী মূর্তি। আসলে মূর্তি না বলে বলা উচিত বিরাট একটা দেবি মূর্তি। বক্রদেহের নারী মূর্তিটা সর্পিল আকৃতি নিয়ে মেঝে থেকে উঠে গেছে ওপরের দিকে। নারী মূর্তিটার দেহের প্রতিটি বাঁক নির্মাণ করা হয়েছে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে। জিনিসটা কবে বানানো হয়েছে সেটার কোনো ঠিক নেই। খালি চোখে দেখে দেখে মনে হচ্ছে, অন্তত চার-পাঁচশ বছর আগে যে বানানো হয়েছে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনো ওটার সৌন্দর্য অপরিসীম।

'এটা কোনো ধর্মের দেবী?' কেউ একজন ফিসফিস করে বলে উঠল।

'এটা কোনো ধর্মের দেবী নয়,' শশী অনেকটা আনমনেই বলে উঠল। 'এটা লিলিথের মূর্তি। লিলিথ হলো সৃষ্টির আদি থেকে চলে আসা সবচেয়ে শক্তিশালী অপদেবীদের একজন। খুব সম্ভবত এই দুর্গ যারা নির্মাণ করেছিল তারা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের নয় বরং এই অপদেবীর পুজো করত। আর তাতেই—'

'আমি কাজের কথা বলতে চাই ডক্টর আবদেলের আবিষ্কার কোথায়?' মিস্টার ইউকে প্রশ্নটা করার সময়ে খানিকটা অসহিষ্ণু মনে হলো।

'ডক্টর আবদেল যদি কিছু এখান রেখে থাকে বা আবিষ্কার করে থাকে,' শশী পায়ের কাছে থাকা বিরাট আকারের পাথরের বেদির দিকে নির্দেশ করল সঙ্গেসঙ্গে লোকেটা এগিয়ে গেল ওটার দিকে। 'এটা একটা পাথরের সিন্দুক,' একজন মন্তব্য করার মতো করে বলে উঠল। কিন্তু এটা কী?' লোকটার কথা শেষ হওয়ার আগেই

সেদিকে দৌড়ে গেল শশী। পাথরের বেদি আকৃতির সিন্দুকটার ওপরের অংশটা দেখলেই বোঝা যায় এটা একটা সিন্দুকের উপরিভাগ। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল সিন্দুকটার দুটো ডালাতে লোহার রিং বসানো হয়েছে, সেইসঙ্গে ওটাতে লাগানো হয়েছে স্টিলের আধুনিক তালা। 'ডক্টর আবদেল,' ফিসফিস করে বলে উঠল শশী। 'অবশেষে তার আবিষ্কার খুঁজে পেয়েছি আমরা।'

অতীত

সিলভেরার লোকের অত্যন্ত নির্মমভাবে টানতে টানতে প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে ওদেরকে নামাল। বিশেষ করে পদ্মকে টানতে টানতে নামানো হলেও কিরানকে রীতিমতো লাথি মারতে মারতে স্রেফ নিচে ঠেলে ফেলে দেওয়া হলো।

সিঁড়ি বেয়ে কোনোমতে নেমে এসে কিরান পাথুরে মেঝেতে শুয়ে হাঁপাতে লাগল। কিন্তু সে চোখ তুলে অবাক হয়ে দেখল ওরা একটা বিরাট আকারের পাথুরে গুহার মতো জায়গায় চলে এসেছে। এটা নিশ্চয়ই দুর্গের একেবারে ভেতরের দিকের নিচের অংশে হবে। দুর্গের বাইরের অংশের সঙ্গে এখানকার কোনো মিলই নেই।

এখানকার ভেতরটা একেবারে অন্যরকম। কিরান ভালোভাবে দেখার সুযোগ পেল না। কিছু করার আগেই তাকে টেনে আবার দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। কিরান পেছন ফিরে দেখল, ওর পেছন পেছন গোমেজ আর বেদুকেও নামানো হয়েছে একইভাবে। কিরান সোজা হয়ে দাঁড়াতেই ওকে ঠেলা দেওয়া হলো সামনের দিকে এগুনোর জন্য। কিরান আবছাভাবে দেখল দুর্গের দেয়ালের সঙ্গে বসানো সারি সারি মূর্তির ভেতর দিয়ে ঠেলে নেওয়া হলো ওদেরকে সামনের দিকে।

ওরা বিরাট গোলাকার কামরাটার একপ্রান্তের দিকে এগিয়ে যেতেই কিরান দেখতে পেল কামরাটার একদিকে বিরাট একটা মূর্তি। সেই মূর্তির পায়ের কাছে একটা বিরাট বেদির মতো। সেটার সামনে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেওয়া হলো ওদের দুজনকে। কিরান দেখল ওদের দুজনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সিলভেরা। এক হাতে মদের বোতল আর অন্যহাতে একটা ধূম্রশলাকা।

ইশারায় সামনের বেদির কাছে বিরাট সিন্দুকের মতো পাথরের পায়াটা দেখিয়ে দিতেই সিলভেরার লোকেদের ভেতরে দুজনে মিলে ওটার ওপরের অংশ সরিয়ে ফেলল। কিরান আবছাভাবে দেখতে পেল ওটার ভেতরে সারি দিয়ে রাখা বেশ কিছু পিপে। একে একে পিপেগুলো বাইরে বের করে আনা হলো। কিরান অনুমান করল ওগুলোর ভেতরেই ওর বাপুর নিয়ে আসা শাহ সুজার সব সম্পদ গচ্ছিত আছে। পিপেগুলো একে একে বের করে আনা হচ্ছে কিরান দেখল ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পদ্ম। বেঁধে রাখা একটা হাত সে আলগা করে ফেলেছে লোকগুলোর

ব্যস্ততার সুযোগে। কিরান ওর দিকে তাকাতেই চোখের ইশারায় সে সামনের দিকে দেখাল। সেইসঙ্গে ছোটো ছুরির মতো কিছু একটা ছুঁড়ে দিল ওর পায়ের কাছে। জিনিসটা তুলে নিয়েই পেছনে লুকিয়ে ফেলল কিরান।

সে ইশারায় বেদু আর গোমেজকেও বুঝিয়ে দিল কিছু একটা করতে যাচ্ছে সে। ছোটো ছুরিটা দিয়ে হাতের বাঁধন কেটে ফেলে বেদুর দিকে ছুঁড়ে মারল ওটা। সিলভেরার লোকেরা পিপেগুলো নামানো শুরু করতেই কিরান দেখল হাতের বোতলটা একপাশে ছুড়ে ফেলে সিলভেরা এগিয়ে গেল পিপেটার দিকে।

আহত ঘোলাটে চোখ আর রক্তাক্ত মুখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে পদ্ম। কিরান বুঝে গেল সময় উপস্থিত। সে একবার পদ্মের দিকে তাকিয়ে শেষবারের মতো ইশারা করে পেছন ফিরবে তার আগেই সামনে থেকে সিলভেরার চিৎকার শুনে অবাক হয়ে ফিরে তাকাল সামনের দিকে।

সিলভেরার সামনে থাকা পিপেটা ভেঙে পড়েছে। সেটার ভেতরে মাটি আর পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই। সিলভেরা কুঠার হাতে উন্মাদের মতো একের পর এক পিপেতে কোপ মারতে লাগল আর একটার পর এটা পিপে ভেঙে পড়তে লাগল। সবগুলোতেই পাথর আর মাটি ছাড়া কিছুই নেই।

পদ্ম পাথর আর মাটিতে ভরা পিপেগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল কিন্তু হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে সে ফিরে তাকাল কিরানের দিকে। 'এক্ষণ জাহাজি,' শান্ত সুরে বলে উঠল সে।

কথাটা বলতেই কিরান খোলা হাত দুটো দিয়ে সামনে থাকা লোকটার হাতের অস্ত্রটার একপ্রান্ত ধরে ফেলে টান দিয়ে সেটাকে ছুটিয়ে নিয়ে বসা অবস্থাতেই ঢুকিয়ে দিল লোকটার পেটের ভেতরে। লোকটা জানপ্রাণ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই টান দিয়ে বের করে এনেই আরেকজনের দিকে তাক করল কিরান।কিন্তু তাকে আঘাত করার আগেই পাশ থেকে অপর দস্যুর আঘাতে সে বসে পড়ল মাটিতে। লোকটা আবারও ওকে আঘাত করার আগেই সে তীব্র আঘাতে পড়ে গেল মাটিতে। কিছু একটা ছুটে এসে বিঁধেছে লোকটার বুকে। সঙ্গেসঙ্গে পড়ে গেল লোকটা। আর ফিরে তাকাল কিরান। বেদু, গোমেজ আর পদ্ম তিনজনই উঠে দাঁড়িয়ে যার যার পাশের জনকে আঘাত করেছে।

কিরান টান দিয়ে একটা বর্শা তুলে নিল মাটি থেকে। পিপেগুলোতে কিছু না পেয়ে পাগলের মতো একটার পর একটা পিপে ভেঙে চলেছে সিলভেরা। সেদিকে ফিরে কিরান বর্শাটা সিলভেরার বুকে তাক করে ছুঁড়ে মারবে এমন সময় সিঁড়ির দিকে থেকে ভেসে আসা হই-হট্টগোলে ফিরে তাকাল সবাই। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই সেদিক থেকে হট্টগোল ভেসে আসছিল কিন্তু কিরান ফিরে তাকাবার সময় পায়নি। এবার ফিরে তাকিয়ে দেখল একদল লোক ছুটে আসছে সেদিক থেকে। ওদিকটা পরে সামলানো যাবে আগে সিলভেরাকে শেষ করতে হবে।

বর্শাটাকে হাতে নিয়ে আবারও ফিরে তাকাবে, কিন্তু তার আগেই তীব্র আঘাতের চোটে বেশ অনেকটা পিছিয়ে গেল কিরান। দেখল সিলভেরার লাথি খেয়ে বেদু ছিটকে এসে পড়েছে ওর ওপরে। বর্শাটা হাতে নিয়ে সোজা হলো কিরান। এবার আর পেছানোর উপায় নেই। উন্মাদের মতো চিৎকার করতে করতে সিলভেরা ছুটে আসছে ওর দিকে। বর্শাটাকে ঠিকমতো তাক করে সেটাকে ছুটন্ত সিলভেরার দিকে ছুড়ে মারল কিরান। কিন্তু লোকটার ক্ষিপ্রতা অপরিসীম। দৌড়াতে দৌড়াতেই স্রেফ একপাশে সরে গিয়ে ওটাকে পাশ কাটাল সে। সিলভেরার পেছনে তার একজনের গায়ে লাগল সেটা। কিরান লাফিয়ে পিছিয়ে এলো খানিকটা। সিলভেরা প্রায় চলে এসেছে। আগে বাগিয়ে ধরে রেখেছে নিজের বিরাট তরবারিটা। সেটা দিয়ে আঘাত করা মাত্রই নিজের দেহটা একপাশে ছেড়ে দিল কিরান। তরবারিটা মাথার ওপরে সাঁই সাই করে পার হয়ে গেল।

মাটিতে পড়েই গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিরান। হাতে তুলে এনেছে একটা পিস্তল। আবারও সিলভেরার দিকে তাক করে গুলি করে দিল। কিন্তু চিতার ক্ষিপ্রতায় লোকটা সরে গেল একপাশে আরেক দস্যু আহত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। পিস্তলটাকে সিলভেরার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে খালি হাতেই উঠে দাঁড়াল কিরান। সিলভেরা সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করল তরবারি দিয়ে। সেটাকে পাশ কাটিয়ে লোকটার গাছের গুঁড়ির মতো মোটা কবজিটা ধরে ফেলল কিরান। সঙ্গেসঙ্গে চওড়া কপাল দিয়ে কিরানের নাকের ওপরে আঘাত করল সে। কোনোমতে মুখটাকে পাশ কাটালেও আঘাতটা এড়াতে পারল না কিরান। পড়ে গেল মাটিতে।

মাটিতে পড়েই সে পেছাতে শুরু করল। একহাতে নিজের বিরাট তরবারিটা আর অন্যহাতে একটা বর্শা নিয়ে এগোতে লাগল সে মাটিতে পড়ে থাকা কিরানের দিকে। কিরানের মনে হলো শেষ সময় সম্ভবত উপস্থিত। কিন্তু বিনা যুদ্ধে সে প্রাণ দেবে না। আড়চোখে একবার সে ফিরে তাকাল সিলভেরার লোকদের সঙ্গে লড়তে থাকা বেদু, গোমেজ আর পদ্মের দিকে।

আনমনেই দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে নেমে এলো ওর চোখ থেকে। সব শেষ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। খুব বেশি হলে আর অল্প কিছুক্ষণ টিকতে পারবে ওরা। দৃষ্টি ফিরিয়ে সিলভেরার দিকে ফিরে তাকাল সে। পানির ভেতরে হাত পা নাড়লে যেমন গতি ধীর হয়ে যায় অনেকটা সেরকম গতিতে যেন সিলভেরার তলোয়ার আর বর্ষা ধরা হাতটা নেমে আসবে ওর দিকে। মাটি থেকে দু মুঠো ধুলো তুলে নিল সে।

নিজের প্রতিরোধ দেখে নিজেই হেসে ফেলত কিরান। সিলভেরার ভয়ংকর আঘাত ফেরোনোর জন্য হাত উঠিয়ে দুমুঠো ধুলো তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। বাঁজ পড়ার মতো শব্দের সঙ্গে সে অনুভব করল সম্ভবত সে মারা গেছে। কিন্তু ধুলো কাটতেই চোখ খুলে সে অবাক হয়ে গেল।

সিলভেরার বর্ম লাগানো বুকের কাছের পোশাক পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে গেছে। অত্যন্ত অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে। কিরান শোয়া অবস্থাতেই পেছাতে শুরু করল। পিছিয়ে একজন মানুষের পায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেলো। ঘুরে তাকিয়ে দেখল আপাদমস্তক কালো পোশাক পরা ওর নিজের জাহাজের সেই পতিত লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে বিরাট একটা পিস্তল, সেটা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সিলভেরাকে এই লোকটাই গুলি করেছে। মুহূর্তের জন্য বাস্তব আর কল্পনাকে সে আলাদা করতে পারল না। তার মনে হলো বাস্তবে নয় বরং লোকটাকে কল্পনাতে দেখতে পাচ্ছে সে। কিন্তু লোকটার পেছনে পট্টবর্ধনসহ পরিচিত আরো অনেককেই দেখতে পেল। এরা ওর পালিয়ে যাওয়া সেই দ্বিতীয় জাহাজের লোকজন। সঙ্গে পদ্মের দলেরও অনেকেই আছে, যারা একটু আগে দুর্গের ওপরের দিকে সিলভেরার লোকদের হাতে বন্দি ছিল।

কিরান যে মুহূর্তে বুঝতে পারল এরা তার কল্পনা নয় বরং সত্য। সঙ্গেসঙ্গে সে দৃষ্টি সরিয়ে পতিত লোকটার দিকে তাকাল। লোকটা গুলি করেই নিজের শক্তিশালী দুই হাতে ধরে তাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। কিরান এই প্রথমবারে মতো লোকটার চোখের দিকে তাকাল। অত্যন্ত পরিচিতি চোখ জোড়ার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে। কিরানকে সোজা করে তুলে ধরেই মানুষটা মুখের ওপর থেকে আবরণ সরিয়ে ফেলল। মানুষটার চেহারার দিকে তাকিয়ে অবাক হওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলল সে।

'বাপু,' কথাটা সে বলল নাকি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঠিক বুঝতে পারল না কিরান। তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠল তালেব তৈমূর।

বর্তমান

পাথরের ডালার ওপরে আংটায় বসানো স্টিলের তালাটা দেখে সামান্য হেসে উঠল মিস্টার ইউ নামের লোকটা। নিজের একজন কমান্ডোর দিকে তাকিয়ে সে ইশারা করল তালাটাকে গুলি করে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। সেইসঙ্গে সাবধান করে দিল যেন ভেতরের জিনিসের কোনো ক্ষতি না হয়।

কমান্ডো লোকটা তালাটার দিকে নিজের সাবমেশিনগান তুলতেই শারিয়ার তাকে থামতে বলল। 'এক মিনিট আমার একটা কথা আছে,' শারিয়ার এক হাত তুলে বলে উঠল। 'প্লিজ।'

'বলুন মিস্টার শারিয়ার,' ইউ নামের লোকটা শারিয়ারের দিকে ফিরে বলে উঠল। 'কি এমন জরুরি বিষয় আপনার বলার আছে?'

সবাই তাকিয়ে আছে শারিয়ারের দিকে। সবার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে শারিয়ার মৃদু হেসে উঠল। 'ইয়ে, মানে একটা ব্যাপার জানার ছিল আমার। আপনি আমাদেরকে এখানে খুঁজে বের করলেন কীভাবে?'

'এই মুহূর্তে এটা জানাটা এতটা জরুরি হয়ে পড়ল কেন?' লোকটা বেশ অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়েছে শারিয়ারের দিকে। 'দেখুন মিস্টার শারিয়ার, আপনি উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে আমাদের নজর অন্যদিকে সরানোর...'

'ব্যাপারটা মেটেই তা না। বরং আমি এখানে যা ঘটছে সেদিকেই নজর দিতে বলছি,' শারিয়ার হাঁটু গেড়ে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। 'আমরা এখানে এসেছি একেবারে ক্লিন অবস্থায়। তারপরও হুয়ান আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে কারণ সে সুমনের স্ত্রীকে জিম্মি করেছিল,' শারিয়ার পলকের জন্য সুমনের দিকে দেখিয়ে আবার ফিরে তাকাল। সুমনকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেকোনো সময় ভেঙে পড়বে আবারও। 'হুয়ান আপনার কাছে ধরা খেয়ে গেছে সেটা তার বোকামি ছিল কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম হুয়ান ছাড়া কেউ একজন আমাদের ট্র্যাক করছে, যদিও টেরটা পেয়েছি এমন সময় যখন আর কিছু করার ছিল না আমার। যাই হোক। তার মানে আমাদের ধরার জন্য হুয়ানের যেমন ডেফিনিট সোর্স ছিল আপনাদেরও ছিল। কী সেটা?' শারিয়ার এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। একেবারে চোখে চোখ রেখে কথা বলছে সে।

'তাতে কী হয়েছে?' লোকটা নিজের কোমর থেকে ছোটো একটা পিস্তল বের করে শারিয়ারের কপালে চেপে ধরল। 'আমরা যেভাবেই আসি বর্তমানে সব আমাদের নিয়ন্ত্রণে। আপনারা আমার বন্দি। আর কিছুক্ষণের ভেতরেই ডক্টর আবদেলের পাওয়া জিনিস উদ্ধার করে সরে পড়ব আমরা। কীভাবে কী হয়েছে সেটা জেনে লাভটা কী হবে?'

'যে ডেফিনিট সোর্সের কথা বলছি সেটা সম্ভবত ডক্টর শশী নিজে তাইনা?' বলে সে ফিরে তাকাল শশীর দিকে। খুবই অবাক হয়ে শশী তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

'মানে কী বলছো তুমি?' অবাক হয়েই সে প্রশ্ন করল।

'মনেটা হলো তুমি বন্দি ছিলে এদের হাতে আর এরা সম্ভবত তোমার শরীরে কোনোধরনের ন্যানো ট্র্যাকার পুশ করেছিল। আর তাতে তোমার পুরো শরীরটাই একটা জীবন্ত ট্র্যাকারে পরিণত হয়েছে। মানে সেই ডক ইয়ার্ড থেকে তোমাকে আসলে আমরা উদ্ধার করিনি। তুমি ওদের আয়ত্তের ভেতরেই ছিলে।'

সবাই তাকিয়ে আছে শশীর দিকে।

'আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, মিস্টার শারিয়ার,' বলে লোকটা হেসে উঠল।

'আপনি যতটা ভাবছেন আমি তার চেয়ে সম্ভবত একটু বেশিই বুদ্ধিমান,' বলে শারিয়ার হেসে উঠল। নিজের একটা হাত তুলে সে হুডির হাতাটা টেনে নামিয়ে ফেলল নিচের দিকে। 'হাতের যে জায়গাটাতে একটা ছোট্ট দাগ দেখিয়ে বলে উঠল। 'এটা কী জানেন?' সে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। 'মিশনে নামার

আগেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান একজন টেকনো এক্সপার্ট ঠিক ওরকমই ন্যানো ট্র্যাকার সেট করেছিল আমার শরীরেও। মানে মিশনে থাকা অবস্থায় আমি কোথায় যাচ্ছি কী করছি চাইলেই সব জানতে পারবে আমার অফিস,' বলে সে থেমে গেছে। তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'সেক্ষেত্রে প্রশ্ন চলে আসে। যদি আমার শরীরে ট্যাকারই বসানো থেকে থাকে তবে আমি অফিসের সঙ্গে যে বেইমানি করলাম সেটার মানে কী। কারণ তারা তো চাইলে দু মিনিটেই বের করে ফেলতে পারত আমি কোথায়। তবে আমি এমনটা করলাম কেন?' বলে সে হেসে উঠল।

মিস্টার ইউ তো বটেই শারিয়ারের নিজের লোকেরাও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শারিয়ারের দিকে। তার দৃষ্টি এসে স্থির হলো ভুঁবনের ওপরে। 'কী ভুবন, কেন করলাম?'

শারিয়ারে কথা শুনে মৃদু হেসে উঠল ভুবন, 'কারণ সবাই যতটুকু ভাবে তুমি তার চেয়ে বুদ্ধিমান,' কথাটা বলেই সে বসা থেকেই চট করে পাথুরে মেঝেতে দুটো স্মোক বল ছুড়ে মারল।

একই সময়ে একই কাজ করল শারিয়ার। সঙ্গেসঙ্গে ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে এলো চারপাশ। উপস্থিত প্রায় সবাই একসঙ্গে কাশতে শুরু করল।

অতীত

কালো পোশাক পরা মানুষটা শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরল তাকে। তারপর দুজনে মিলে ঘুরে তাকাল সিলভেরার দিকে। সেও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ওদের পেছনে থাকা বাহিনীর দিকে।

কিরান ব্যাপার দেখে সে ঠিকই চিনতে পারল। মুখ দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল, 'তালেব তৈমূর,' বলে সে হা হা করে হেসে উঠল। চিবিয়ে চিবিয়ে পর্তুগিজ ভাষায় কিছু বলে উঠে সে একাই এগিয়ে এলো ওদের দুজনার দিকে।

নিজের লোকদেরকে সিরভেলার বাকি দস্যুদের প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিয়েই কিরানকে একপাশে সরিয়ে ওর বাবা এগিয়ে গেল সিলভেরার দিকে। হাতের খালি হওয়া পিস্তলটা ছুড়ে মারল তার বুকে। মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেও পরমুহূর্তে আবারও পূর্ণ বেগে এগিয়ে এলো সিলভেরা। খানিকটা এগিয়েই হাতের তলোয়ারটা চালাল তালেব তৈমূরের দিকে। কিরানকে সরিয়ে একহাতে নিজের তলোয়ারটা বের করেই সে আঘাতটা ঠেকিয়ে পাল্টা আঘাত হানল তৈমূর।

কিরান পাশে সরে এলেও প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুটন্ত এক যোদ্ধার হাত থেকে নিয়ে নিল একটা লাঠি। সেটাকে দুপাক ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল

ওর বাপুর পাশে। ওদের পেছনে সিলভেরার লোকেরা আর তার দলের বাকিদের ভেতরে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। আর এদিকে কিরান আর তৈমূর দুজনে মিলে আক্রমণ চালাল সিলভেরাকে।

দুজনে মিলে আক্রমণ চালাতেই যেকোনো দক্ষ যোদ্ধার মতোই সিলভেরা একপাশে সরে গেল। তারপর একদিক থেকে আক্রমণ চালাল। তৈমূরের আঘাতটা ঠেকিয়েই সে তলোয়ারের কিনারা দিয়ে বাড়ি মারল কিরানকে। কিরান সেই আঘাতটা ঠেকিয়ে দিয়েই লাঠি চালাল সিলভেরার মাথা লক্ষ্য করে। সিলভেরা আঘাত ঠেকানোর জন্য একপাশে জানালাগুলোর দিকে সরে গেল।

কিরান আর তৈমূর দুজনে এবার একসঙ্গে দুদিক থেকে আবারও আক্রমণ চালাল। দুজনেই এবার একসঙ্গে একদিকে। কিরান লাঠি দিয়ে বাড়ি মারল লোকটাকে। সেইসঙ্গে তার বুকে বর্শা দিয়ে আঘাত করল তৈমূর। শক্ত আঘাতে তার বুকের বর্মটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে গেল, ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সিলভেরা।

'কিরান,' বলে সে নিজের দুই হাত নিচু করে পেতে ধরল। কিরান নিজের হাতের ভাঙা লাঠিটা বর্শার মতো তাক করে লাফিয়ে বাপুর হাতে উঠে এলো। তারপর কোনোাকুনি আঘাতে লাঠিটা নামিয়ে আনল সিলভেরার কাঁধের ওপরে। শক্ত লাঠির চোখা অংশটা বসে গেল সিলভেরারকাঁধের একপাশে। গগনবিদারী চিৎকার করে উঠল দস্যু সর্দার। তার শরীর একপাশে হেলে গেল। সঙ্গেসঙ্গে তার বুকের একদিকে নিজে হাতের তলোয়ারটাকে ঢুকিয়ে দিল তালেব তৈমূর। এত আঘাতেও পড়ে গেল না লোকটা।

খোলা জানালার সঙ্গে হেলান দিয়ে উন্মাদের মতো হাসতে লাগল। তার দিকে এগিয়ে কিরান লাথি মারল। কিন্তু কিরানের পা ধরে ফেলল লোকটা। তারপর কিরানকে টেনে ধরল নিজের দিকে। সঙ্গেসঙ্গে কিরানকে নিজের সামনে নিয়ে এলো এক হাতে ধরেই। এক হাতে কিরানকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকের একপাশ থেকে টেনে বের করে আনল বিঁধে থাকা তলোয়ারটা। সেটা কিরানের বুকে বসিয়ে দিতে যাবে ওদের দিকে ঝড়ের মতো ছুটে এলো তালেব তৈমূর। কিরানকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে সিলভেরাকে জড়িয়ে ধরল সে। সিলভেরার হাতে ধরা তলোয়ারটা আবারও তার বুকের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে ঠেলে দিল জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। কিন্তু সিলভেরাকে ঠেলে দেয়ার আগেই সে একহাতে ধরে ফেলল তালেব তৈমূরকে। তাকে জড়িয়ে ধরে দুজনেই অদৃশ্য হয়ে গেল খোলা জানালার অন্যপাশে।

'বাপু,' বলে চিৎকর করে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল কিরান। ততক্ষণে নিচে হারিয়ে গেছে সিলভেরা আর তালেব তৈমূর দুজনেই।

বর্তমান

ভুবন আর শারিয়ার ঝাঁঝাল বলগুলা এমনভাবে ছুড়ে দিয়েছে যে ওগুলো পাথুরে মাটিতে পড়ে ফাটার সঙ্গেসঙ্গে কাশতে শুরু করল উপস্থিত সবাই। রীতিমতো কমান্ডোর পোশাকে সজ্জিত লোকগুলো থেকে শুরু করেভুবন আর শারিয়ার, যারা ওগুলো ছুড়েছে তারা পর্যন্ত কাশতে কাশতে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। তবে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখাতে খানিকটা হলেও নিরাপদ থাকতে পারল শারিয়ার আর ভুবন।

দুজনের ভেতরে শারিয়ারই আগে সচেতন হয়ে উঠল। সে ঠিক তার পাশেই কাশতে থাকা লোকটার হাতের উজিটা চেপে ধরেই লোকটার হাঁটুর পাশে লাথি মারল। এমনিতেই কাশতে কাশতে তার অবস্থা কাহিল হয়ে ছিল। হাঁটুর পাশে বাড়ি খেয়ে লোকটা উল্টে পড়ে গেল মেঝেতে। লোকটার কবজিটা চলে এলো শরিয়ারের হাতে। জিনিসটা হাতে নিয়েই মিস্টার ইউ-এর দিকে তাক করবে তার আগেই শক্ত একটা বাড়ি খেয়ে তার হাত থেকে ছুটে গেল জিনিসটা। সোজা হওয়ার আগেই দেখল মিস্টার ইউয়ের অপর লোকটা তার দিকে নিজর হাতের অস্ত্র তাক করছে। শারিয়ার মুহূর্তের ভেতরে নিজেকে বাঁচাতে সে লাফ দিল। যে অস্ত্র ধরে আছে তার দিকে নয় বরং সে সোজা লাফ দিল মিস্টার ইউয়ের দিকে।

কাশতে কাশতে বাঁকা হয়ে আসা লোকটাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল সে। ফলে ভাড়াটে কমান্ডোরাও গুলি করতে গিয়ে থেমে গেল। লোকটাকে জাপটে ধরে তার কোমরে হাত দিয়ে পিস্তলটা বের করে ইউকে নিজের সামনে চেপে ধরে সোজা হলো। লোকটার মাথার পাশে চেপে ধরে রেখেছে মিস্টার ইউয়ের পিস্তলটা। 'সবাই যার যার অস্ত্র ফেলে দাও।'

যার যার বলতে আর তেমন কেউই নেই। একজনকে শারিয়ার সামলেছে। অন্যজনকে ভুবন, বাকি লোকটা গুলি করেই সে টেনে ধরেছে টমিকে। ফলে শারিয়ার যখন সোজা হলো মিস্টার ইউয়ের মাথার পাশে পিস্তল ঠেকিয়ে ও লোকটাও সোজা হলো টমির মাথার পাশে পিস্তল চেপে ধরে।

'একদম শান্ত, কোনো কারণ নেই কারো ক্ষতি করার.,' বলে শারিয়ার মিস্টার ইউয়ের মাথার পাশে পিস্তল চেপে ধরেই বলে উঠল, 'আপনার লোককে নির্দেশ দিন ওকে ছেড়ে দিতে, না হলে...'

শারিয়ারকে অবাক করে দিয়ে মিস্টার ইউ হা-হা করে হেসে উঠল। 'না হলে কী মিস্টার শারিয়ার? বলে সে জোরে হেসে উঠল। 'না আপনি আমাকে গুলি করতে পারবেন। না আমার লোকেরা আপনার মানুষটাকে ছেড়ে দেবে।'

শারিয়ার দ্বিধা করছে। ভুবনকেও মনে হচ্ছে দ্বিধাগ্রস্ত। শারিয়ার কিছু বলার জন্য মুখ খুলল কিন্তু তার আগেই টমিকে ধরে থাকা লোকটা গুলি খেয়ে পড়ে গেল। সবাই অবাক হয়ে ফিরে তাকাতেই পেছনে সিঁড়ির কাছে দেখা গেল একদল লোক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেউ একজন। গুলিটা সেই করেছে। মিস্টার ইউকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সেদিকে দুই পা এগিয়ে গেল শারিয়ার।

নিজের পুরো বাহিনী নিয়ে চলে এসেছে রুম্পা তালুকদার। ওদের দিকে এগিয়ে এসে সে জানতে চাইল, 'তোমরা সবাই ঠিক আছ?'

শারিয়ার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। 'আগের সবকিছুর জন্য আমি সরি,' বলে সে রুম্পার দিকে তকিয়ে বাকিদের দিকে ইশারা করে বলে উঠল, 'আর বিশ্বাস করার জন্য ধন্যবাদ।'

'তুমি যা করেছ সেই শাস্তি তোমার পরে হবে,' ভ্রু নাচিয়ে বলে উঠল রুম্পা। 'আসলে তোমার ধন্যবাদ জানানো উচিত তোমার বস মিস্টার হাবিব আনোয়ার পাশা স্যারকে, সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তোমার বন্ধু তানভীরের ওপরে। আপনার অবস্থা অনেক অনেক বেশি কাহিল হতো এখন, যদি মিস্টার তানভীর তোমার বস হাবিব আনোয়ার পাশাকে পুরো ব্যাপারটা না বোঝাত। আর হাবিব স্যার আমাদেরকে। যাকগে,' হাতের পিস্তলটা কোমরে রেখে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল সে। 'তা এত কিছু করে কী পেলাম আমরা?'

'মিস্টার আলট্রা ওরফে মিস্টার ইউ,' বলে শারিয়ার মাটিতে আধবসা অবস্থায় থাকা মিস্টার ইউকে পেয়েছি আমরা। যাকে ইন্টারপোল গত দশ বছর ধরে খুঁজছে। আমার বিশ্বাস নেক্রপলিস নামে যে সংগঠন বাংলাদেশে গোপনে ফাংশন করার চেষ্টা করছে তার সাউথ এশিয়ান জোনের প্রধান এই লোক। আর,' বলে সে শশীকে দেখিয়ে কিছু একটা বলতে চাইছিল। কিন্তু তার আগেই দৌড়ে গিয়ে সেই লিলিথের মূর্তির পায়ের কাছে পাথরের সিন্দুকটার কাছে বসে পড়েছে শশী।

'শারিয়ার এটা খোলার ব্যবস্থা করো প্লিজ,' শশীর গলায় আবেদন। তার গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে আর সহ্য করতে পারছে না সে। শারিয়ার ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ওটার দিকে। ওর সঙ্গে ভুবন। দুজনে মিলে বহু কষ্টে ঠেলেঠুলে সিন্দুকের ওপর থেকে ভারী পাথরের ডালাটা সরিয়ে একপাশে নামিয়ে রাখল।

ডালাটা সরে যেতেই প্রায় লাফিয়ে ওটার ভেতরে উঁকি দিল শশী। বাকিরাও সবাই এগিয়ে এলো এদিকে। ভেতরে কী আছে দেখার জন্য। কিন্তু রাশি রাশি সোনা-দানা আর ধন সম্পদের পরিবর্তে শশী অনেকটা ভূতে ধরার মতো ভঙ্গিতে বিরাট সিন্দুকটার ভেতর ভেতরে টেনে বের করে আরো পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া একতাড়া কাগজ।

'বই ভেতরে স্রেফ একটা বই,' রুম্পা বলে উঠল। শারিয়ার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল ভেতরে আর কিছুই নেই।

শশী পাগলের মতো পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছে। বইটাতেও কিছুই লেখা নেই। একেবারেই শূন্য পাতা ওটার। শারিয়ার শশীর কাছে এসে টান দিয়ে বইটা কেড়ে নিল। বইটার মলাটটাই অনেক পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া। আর ভেতরে একটা পৃষ্ঠা পুরনো। এছাড়া বাকি সব পাতা একেবারেই নতুন, আনকোড়া আধুনিক কাগজ। পুরনো পৃষ্ঠাটাতে একটাই শব্দ লেখা। শারিয়ার আনমনেই পড়ে উঠল শব্দটা, 'রাজদ্রোহী।'

'কিন্তু এর মানে কী?' প্রায় আর্তনাদ করার মতো করে বলে উঠল শশী। দিনের পর দিন এতকিছু করে এতকিছু করে পেঁচিয়ে এভাবে সবাইকে ধোঁকা দিল আবদেল?' সবাই হতাশ হয়ে তাকিয়ে আছে খালি সিন্দুক আর শারিয়ারের হাতে ধরা কাগজগুলোর দিকে। কিন্তু শশীকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেকোনো সময় ভেঙে পড়বে। কোনোমতে নিজেকে স্থির রেখেছে সে।

কিন্তু তার দিকে তাকানো শারিয়ারের মুখে হাসি। 'ধোঁকা ডক্টর আবদেল দিয়েছেন নাকি তুমি আমাদের দিয়েছো শশী?' ভারি গলায় বলে উঠল শারিয়ার। 'নাকি তোমাকে তোমার প্রকৃত নামে ডাকব?'

'মানে?' নিচু করে রাখা মাথাটা চট করে সোজা করল শশী।

'তুমি হয়তো জানো না। আমি অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছি তুমি ডক্টর শশী নও,' বলে সে নিজের হাতের অস্ত্রটা আলগোছে তুলে ধরল শশীর দিকে। 'ডক্টর আবদেলের মেয়ে তো ডেফিনিটলি নও। অনেক নাটক করেছ। এবার ঠিক করে বল তুমি আসলে কে?'

যাকে সবাই শশী নামে চেনে তার অবাক হয়ে থাকা মুখের দিকে ততোধিক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই।

অতীত

সিলভেরা আর তালেব তৈমূরকে শূন্যের মাঝে হারিয়ে যেতে দেখে চিৎকার করে উঠল কিরান। কিন্তু কিছু করার আগেই শেষ হয়ে গেল সব। প্রথমে দৌড়ে চলে গেল খোলা জানালার কাছে দুজনকেই নিচের অতলে হারিয়ে যেতে দেখে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল সে। এত চেষ্টা করেও সে বাঁচাতে পারেনি নিজের বাপকে। বরং ওকে বাঁচাতে গিয়ে হারাতে হলো মানুষটাকে। কিরানের কাঁধে হাত রাখল কেউ একজন। কিরান ফিরে তাকিয়ে দেখল পট্টবর্ধন ওর কাঁধে হাত রেখেছে। তার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ওর আর পদ্মের দলের বাকি যারা বেঁচে আছে তারা সবাই। প্রত্যেকের চেহারা বিধ্বস্ত-রক্তাক্ত। কিন্তু মুখে ফুটে আছে বিজয়ের হাসি। সিলভেরার সঙ্গে যুদ্ধে জয় হয়েছে ওদের। সিলভেরার দলের যারা বেঁচে আছে তাদের বন্দি করা হয়েছে।

কিরান হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত ফিরে গেল সেই পিপেগুলোর কাছে। এক লাথি দিয়ে ফেলে দিল একটা। ভেতর থেকে গড়িয়ে পড়ল মাটি আর পাথর। তারপর আরেকটা...আরেকটা। প্রত্যেকটার ভেতরে একই জিনিসে ভরা। কিরানকে পাগলের মতো এটার পর একটা পিপে ফেলে দিতে দেখে সবাই এসে দাঁড়াল ওর কাছে।

পিপেগুলো দেখা শেষ করে খানিক চিন্তা করে মাটি থেকে একটা পড়ে থাকা তলোয়ার তুলে নিল সে। তারপর সেটাকে তাক করল পদ্মের দিকে। 'শুরু থেকেই তুমি সবই জানতে তাইনা? বাপু আমার সঙ্গেই ছিল,' বলেই সে তলোয়ারটা উদভ্রান্তের মতো তাক করল পট্টবর্ধনের দিকে। 'তুমিও জানতে। তাহলে কেন এত নাটক? কীসের জন্য? যদি এখানে কিছু না থেকেই থাকে?' উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠল সে।

'কিরান শান্ত হও,' পট্টবর্ধন তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'আমি আগে উত্তর চাই,' কিরানও শান্ত হওয়ার অবস্থায় নেই।

পট্টবর্ধন তাকে শান্ত করার জন্য একটা হাত তুললেও কিরানের কথাকে কোনো পাত্তাই দিল না পদ্ম। সে একহাতে কিরানের তলোয়ারের ডগাটা ধরে সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল নিজের সামনে থেকে।

'জাহাজি, আমি কিছুই জানতাম না। আবার সবই জানতাম। কিন্তু আমি কিছুই বলবনা। কিন্তু তুমি যা ভাবতাছো ব্যাপারটা মোটেও তেমন কিছু না। এখন পর্যন্ত যা যা ঘটছে সবই ছিল পুরোপুরি সাজানো নাটক। আর এই নাটকে আমি ছিলাম স্রেফ একটা চরিত্র, ঠিক যেমন তুমিও ছিলা একটা চরিত্র,' বলে সে হাত তুলে পট্টবর্ধনসহ বাকিদের দেখাল। 'এখানকার সবাই ছিল তুমার বাপুর নাটকের এক একটা চরিত্র। তোমার বাপ আরাকান থেইকা পলানোর পরে একটা নাটক সাজাইছিল, আমরা সবাই সেইটাতে একে একে অভিনয় কইরা গেছি। আমারে সে যতটা বলছে আমি ঠিক কতটাই জিজ্ঞেস করছি, ততটাই জানছি আর তাতেই অভিনয় করছি। তোমার বাপুর কাছে এই মগদোষীদের গ্রামের প্রতিটি মানুষ রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল আর তার বিপদে রক্ত দিয়াই সেই ঋণ শোধ করছে তারা,' পদ্মের চোখে পানি। 'যুদ্ধে জয় হইছে আমাগো। কিন্তু আমরা মানুষটারে বাঁচাইতে পারি নাই। তুমি যেমন তোমার বাপুরে হারাইছো, ঠিক তেমনি আমিও হারাইছি আমার বাপুরে, আমার গ্রাম আমার মাইয়াগোরে। আর তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারব স্রেফ একজনই। এই নাটকের পরিচালক আর মূল পরিকল্পনাকারী; আকরাম বেগ। তালেব তৈমূর যদি এই নাটকের রচনাকারী হইয়া থাকে তবে আকরাম বেগ হইলো এই নাটকের বাস্তবায়নকারী। কাজেই সব জানতে হইলে তোমার তারে জিগাইতে হবে,' বলে সে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে সবার মাঝখান দিয়ে এগোতে লাগল দুর্গের ওপরের দিকে। তার গমন পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিরান।

বর্তমান

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে শারিয়ার,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল শশী। শারিয়ারের হাত থেকে নিয়ে সে এমনভাবে বুকের সঙ্গে বইটা চেপে ধরে রেখেছে যেন এটা তার জীবনমরণ।

'কিন্তু ব্যাপারটা তো এ রকম হওয়ার কথা, তাই না?' শারিয়ারও একইরকম সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথা বলে উঠল। এখনো সে অস্ত্রটা তাক করে আছে শশীর দিকে। শশী একবার সেটা দেখল আরেকবার রুম্পাসহ বাকিদের দেখে সে আবার ফিরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু শারিয়ারের পাথরের মতো চেহারা দেখে থেমে গেল সে। শারিয়ারই কথা বলে উঠল আগে।

'আমি তো আগেই বলেছি, আমার নিজের শরীরে ন্যানো ট্র্যাকার ছিল। তাহলে আমাকে বলো তো, আমি কেন আমার ক্যারিয়ার থেকে শুরু করে নিজের লোকদের ঝুঁকিতে ফেলে বোকার মতো অথরিটির সঙ্গে ধোঁকাবাজি করলাম। যে কাজটা অথরিটির সাহায্য নিয়ে, তাদের সাপোর্ট নিয়ে তুলনামূলক সহজভাবে করতে পারতাম সেটা কেন এত কষ্ট করে করলাম। ভেবে দেখো,' বলে শারিয়ার দুই পা এগিয়ে গেল শশীর দিকে। 'কারণটা খুবই পরিষ্কার। আমি বুঝতে পারছিলাম যে খেলা ওপরে চলছে সেটা ভেতরে অনেক অন্যরকম। তাই হুয়ান, মিস্টার ইউ বা নেক্রপলিস তো বটেই অদৃশ্য সকল শত্রু এমনকি নিজের ডিপার্টমেন্টের ভেতরেও ওদের চরদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই এমনটা করেছিলাম। এটা তো এখন সবাই জানে,' বলে শারিয়ার সবাইকে দেখে ফিরে তাকাল হাতকড়া পরানো মিস্টার ইউয়ের দিকে। 'মিস্টার ইউকের এটাই বলেছি আমি। কিন্তু যেটা বলিনি সেটা হলো আসলে তোমার কাছ থেকেও নিরাপদে থাকার জন্যও এই পলায়ন।'

'মানে?' শশীর মুখে বিস্ময়ের ছাপ।

'মানে হলো তোমাকে উদ্ধার করার দিন সকালেই আমরা জানতে পারি তুমি শশী নও। তোমার আইডি কার্ড যেটা নৌকায় পাওয়া যায় সেই মানুষটা তুমি নও। এমনকি তোমাকে উদ্ধার করার আগেই তোমার পরিচয় নিয়ে খানিকটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল আমাদের ভেতরে, এখানে খানিকটা ক্রেডিট টমিকেও দিতে হবে,' বলে সে টমির দিকে ফিরে হাত নাড়ল। 'এর পেছনে কারণও ছিল। তোমার যে পাসপোর্ট হোটেলে পেয়েছিলাম, সব পোর্ট অব এন্ট্রিতে খোঁজ নিয়ে জানা যায় এই নামে গত কয়েকদিনে কেউ ট্রাভেল করেনি। মানে তুমি মিশর থেকে এসেছিলে

নিজের নামেই। কিন্তু বাংলাদেশে নামার পর থেকে নিজেকে শশী নামে পরিচয় দিতে শুরু করো। এই নামে যে ফেসবুক আইডি, ইনসটাগ্রাম আইডি চালু আছে, যেগুলো দেখে আমরা ভেবেছিলাম তুমি দেশে এসেছো, সেগুলোও বেশ নতুন। খুব পুরনো না। এগুলো থেকে সন্দেহ তো ছিলই কিন্তু মূল ধরাটা খাও তুমি যখন আসল ডক্টর শশী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে।'

'আসল ডক্টর শশী!'

'হ্যাঁ, আসল ডক্টর শশী। সে তার এক্সকেভেশন সাইট থেকে ফিরে এসেছে। তোমার হিসেবে যেটা আরো কয়েকমাস পর হবার কথা ছিল, কিন্তু একটা বিশেষ কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই ফিরে এসেছে সে। আসল শশী নিজের কাজে এক্সকেভেশন সাইটে চলে যাওয়াতেই তুমি তার পরিচয়ের ভূয়া নাটক সাজিয়েছিলে। তাও সেটা পারতে না যদি না যে ইউনিভার্সিটিতে তোমরা কাজ কর ওদের ওয়েবসাইটে ডক্টর শশীর কোনো ছবি ছিল না, যে কারণে তুমি তার ভুয়া পরিচয়টা ক্যারি করতে পেরেছিলে। আসল ডক্টর শশী এমনকি ফেসবুক ইন্সটা এসবও ব্যবহার করে না, আর সেই সুযোগটাও তুমি নিয়েছো, ' বলে সে নকল শশীর দিকে এগিয়ে গেল দু পা।

'আসলে তুমি ডক্টর আবদেলের মেয়ে নও, তার অসম বয়সের প্রেমিকা। প্রকৃত ডক্টর শশীর কাছ থেকেই সেটা জানতে পেরেছি আমরা। তোমাকে উদ্ধারের আগেই খানিকটা সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু তোমাকে যেদিন আমরা উদ্ধার করতে ওই ডকইয়ার্ডে অভিযান চালাই, সেদিন রাতেই ডক্টর শশীর সঙ্গে আমার বস পাশা স্যারের কথা হয়। তাই সেদিন তোমাকে উদ্ধার করার পর পরদিন সকাল পাশা স্যারের সঙ্গে আমার যখন যোগাযোগ হয়, আমি তখনই সব জানতাম। আমি প্রথমে রুম্পাদের কাছ থেকে দূরে সরে পলাতক সেজে অভিযান চালাতে চাইছিলাম কারণ আমি ভেবেছিলাম রেলিক বা নেক্রপলিসের নিজেদের লোক আছে দপ্তরে, ওদের থেকে বেঁচে চলার জন্যে, তোমাকেও নিরাপদ রাখার জন্যে। কিন্তু তোমাকে উদ্ধার করার পর যখন পাশা স্যারের সঙ্গে কথা হলো তখন তো দেখি, ওমা যাকে বাঁচাতে চাইছি...' বলে শারিয়ার কাঁধ ঝাঁকালো।

তার চুল থেকে টপ করে এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল গালের ওপরে। সেটা মুছে নিয়ে বাকিদের দেখে নিয়ে সে বলে উঠল, 'ওইদিন সকালে হোটেলে বসে যখন তুমি বললে যে, তুমি ডক্টর আবদেলের মেয়ে, প্রথমে আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি এই নাটক জারি রাখতে হবে। আমি একদিকে অথরিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলাম আর ওপরে ওপরে তোমার সঙ্গেনাটকটা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কারণ আমি জানতাম তুমি হলে একটা টোপ। যে টোপ দিয়ে ডক্টর আবদেলের গবেষণার সমাধান সম্ভব, সেইসঙ্গে সম্ভব হুয়ানকে

খেলানো। শুধু হুয়ান নয়, নেক্রপলিস থেকে শুরু করে বাকি যারা আছে সবাইকে খেলিয়ে জল থেকে তুলে আনা, যাবে,' বলে সে দুই হাত প্রসারিত করে দেখাল। 'আসলেও তাই হয়েছে। যখন তোমাকে নিয়ে পালাচ্ছিলাম তখনই আমি প্ল্যান করে ফেলি। আর তাই রুম্পাদের নিয়ে ওই নাটকটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। ওখান থেকে পালানো, তোমাদের নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়া সবই আসলে আমি অথরিটির কাছ থেকে পালিয়ে নয় বরং মিলেই করছিলাম। ডক্টর আবদেলের সম্পদ খুঁজে না পেলেও তার মৃত্যুরহস্য থেকে শুরু করে বাকি সব কর্মকাণ্ডের সমাধান করা গেছে,' বলে সে আবারও এগিয়ে গেল নকল শশীর দিকে। 'আরেকটা ব্যাপার, ডক্টর আবদেল আসলে সরকার, নেক্রপলিস বা রেলিকের কাছ থেকে ঠিক যেভাবে পালাচ্ছিল, তার আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার পেছনে আরেকটা বড়ো কারণ ছিলে তুমি। ডক্টর আবদেল তোমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল ঠিকই। কিন্তু একটা সময় সে তোমাকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। আর তোমার কাজের চেয়ে বেশি লোভ দেখে সে ভয় পাচ্ছিল তাই সে লুকিয়ে পড়ে। দীর্ঘ সময় সে লুকিয়ে থাকতে পারলেও একটা সময় ঠিকই তুমি তাকে খুঁজে বের করে ফেল চট্টগ্রামে এসে। সম্ভবত তার মেয়েকে পাঠানো চিঠি আর লকেটটা কোনোভাবে পেয়ে যাও তুমি। কিন্তু তোমাকে অনুসরণ করে চলে আসে বাকিরাও। এই কেসটা যখন শুরু হয় একটা বড়ো প্রশ্ন ছিল ওইদিন রাতে ডক্টর আবদেল ওই রাস্তায় শীতের রাতে বৃষ্টির ভেতরে কী করছিল?'

শারিয়ার রুম্পাসহ বাকিদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আসলে ডক্টর আবদেলের ওখানে এই মেয়েটা চুরি করে ঢুকে পড়ে। ডক্টর আবদেলের কিছু একটা চুরি করে পালাতে শুরু করে, সম্ভবত সেই জিনিসটা উদ্ধার করার জন্যই ডক্টর আবদেল তার পিছু নেয় এবং গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মারা পড়ে। জিনিসটা কী ছিল?' বলে শারিয়ার এগিয়ে এলো শশীর দিকে। 'এটা?' বলে সে টান দিয়ে তার গলা থেকে লকেটটা নিয়ে ছুড়ে দিল রুম্পার দিকে। 'নিয়ে যাও একে,' বলে সে নিজের লোকদের দিকে ফিরে একটা চওড়া হাসি দিল।

অধ্যায় পঁয়তাল্লিশ

বর্তমান সময়

পিবিআই ব্যুরো, চট্টগ্রাম

'তাহলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?' টেবিলের অন্যপাশে উপবিষ্ট মানুষটা সরাসরি শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টিটাকে কঠোরও বলা যাবে না, আবার খুব বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ বলারও কোনো উপায় নেই। 'আপনি এবং আপনার টিমের কাছ থেকে আমরা পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা আশা করছি, এটা তো আপনি বুঝতে পারছেন,' বলেই সে একটা হাত তুলল। 'কারণ স্বল্প সময়ের ভেতরে অনেক কিছু ঘটে গেছে যেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা নেই। আরেকটা কথা, আপনি এখন যা বলবেন এর ওপরে নির্ভর করবে আপনার ও আপনার টিমের ক্যারিয়ার। মিস রুম্পা ও আপনার অফিস আমাদের কাছে একটা বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়েছে কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। আমরা টিম লিডার হিসেবে আপনার কাছ থেকে সরাসরি ব্যাখ্যা আশা করছি।'

শারিয়ার নিজের ব্লেজারটাকে টেনে ঠিক করে উঠে দাঁড়াল। টেবিলের চারপাশে বসা সবাইকে দেখে নিল একবার। এখানে তার টিমের সবাই তো আছেই। এমনকি সরকারি উচচপদস্থ কর্মকর্তারাও অনেকেই উপস্থিত আছে, উপস্থিত আছে ওদের ঢাকা অফিস থেকে আসা বেশ কয়েকজন অফিসার। জংলাটিলা থেকে আসার পর দুদিন পার হয়েছে। আজকে ফরমালি কেসের পুরো রিপোর্ট বয়ান করতে হবে ওকে।

'আমি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার একজন অফিসার হিসেবে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি গত কয়েকদিনে বারবার অথরিটি ও আইনের আওতার বাইরে গিয়ে কাজ করার জন্য,' কথার শেষ অংশটুকু বলার সময়ে ভুবনের দিকে চোখ পড়ল ওর। ভুবনের মুখে হাসি নেই কিন্তু শারিয়ারের ভদ্র কথা শুনে চোখ দুটো হাসছে তার। শারিয়ারও সামান্য চোখ মটকে কথা চালিয়ে যেতে লাগল।

'আমি জানি অনেক কিছুই এখনো ঘোলাটে হয়ে আছে জটিল এই কেসে। বিশেষ করে এই কেসের একেবারে শুরু থেকে আমার ও আমার টিমের অনেক অ্যাকশন হয়তো অথরিটির কাছে পরিষ্কার নয়,' বলে শারিয়ার নিজের টিমের সবাইকে দেখিয়ে বলে উঠল। 'আমার অলোচনা শুরু করার আগে আমি প্রথমেই একটা কথা পরিষ্কার বলে নেই, আমরা গত কয়েকদিনে যা বলেছি বা করেছি

একজন টিম লিডার হিসেবে সবকিছুর দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি। অথরিটির কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, আমার টিমের কারো যেন কোনো ধরনের সমস্যা না হয় ।'

'মিস্টার শারিয়ার আপনি কেসটা বয়ান করুন প্লিজ।'

'এই কেসের যেখান থেকে শুরু সেই ডক্টর আবদেলের থেকেই শুরু করতে হবে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝাতে গেলে। ডক্টর আবদেল তার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের এক পর্যায়ে ভারতবর্ষের অসমাপ্ত ইতিহাস নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট সময়ের ইতিহাসের একটা বিরাট ব্যাপার আবিষ্কার করেন। আজ থেকে প্রায় চারশ বছর আগে সম্রাট শাহ সুজার সঙ্গে জড়িত সেই রহস্য সমাধান করতে গিয়ে তিনি অনেক বড়ো কিছু আবিষ্কার করে বসেন। সেটা কী আমরা কেউই জানি না। জিনিসগুলো যেহেতু আর খুঁজে পাওয়া যায়নি তাই আমি সেটা নিয়ে আর মন্তব্য করব না। তবে এটুকু বলতে পারি আমাদের এক্সপার্টরা এটা নিয়ে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে।'

'তো যাই হোক, ডক্টর আবদেলের এই কাজের সহকারী ছিল দুজন। একজন তার পার্টনার ডক্টর ইফতেখার আবদুল্লা। যার ট্রেস আমরা এখনো পাইনি। আরেকজন তারই সেক্রেটারি ডক্টর গুলশান, যাকে আমরা এতদিন ডক্টর শশীর ভুয়া পরিচয়ে চিনে এসেছি। ডক্টর আবদেলের সঙ্গে এই মেয়েটাও তার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানত কিন্তু একটা সময় ডক্টর আবদেল সম্ভবত আবিষ্কার করেন এই মেয়েটার সঙ্গে উনি জড়িয়েছেন ঠিকই কিন্তু এই মেয়ের আসলে তার প্রতি কোনো টান নেই। এই মেয়ের সমস্ত টান তার আবিষ্কারের প্রতি। এই মেয়ের নিয়ত ভালো নয়। তাই তিনি এই মেয়ের পিছু ছাড়ানোর জন্য চলে আসেন বঙ্গদেশে। তাঁর ধারণা ছিল নিজের দেশ, নিজের মাটি, নিজের মানুষেরা তার আবিষ্কার লুফে নেবে।'

'বাংলাদেশের অথরিটিকে উনি প্রস্তাব দেন যেন গোপনে তাকে এই ব্যাপারে হেল্প করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের অথরিটি তাকে এই ব্যাপারে কোনো সাহায্য করেনি, উল্টো তার লাইসেন্স নিয়ে সমস্যা হয়। যে কারণে রেগে গিয়ে উনি নিজেই বিশ্বের বড়ো বড়ো বেশ কয়েকটা অ্যান্টিক চোরাচালানি সংগঠনের কাছ থেকে হেল্প নেন। এখানে উনি একটা বিরাট মাইন্ড গেম খেলেন। নেক্রপলিশ এবং রেলিক নামে দুটো বড়ো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আলাদা আলাদাভাবে রিসোর্স নিয়ে উনি নিজের গবেষণা চালিয়ে যান। আসলে উনি আগেই জানতেন, এদের কাউকেই উনি কিছু দিবেন না। ওরা ভাবছিল ডক্টর আবদেলকে তারা ব্যবহার করছে। আসলে তাদের নিয়ে খেলতে শুরু করেন ডক্টর আবদেল। একদিকে ওদের চাপ বাড়ছিল আবার ডক্টরেট শেষ করে তার অসম বয়সের প্রেমিকা গুলশানও তার

খোঁজ করতে লেগেছিল। এমন একটা সময় ডক্টর আবদেল স্রেফ পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যান। উনি সেই বাড়ির বেইজমেন্টে লুকিয়ে নিজের গবেষণা চালিয়ে যান এবং সফল হওয়ার পর সেগুলোকে নিয়ে নানা ট্রিক্স সাজাতে থাকেন। তার কাজ যখন প্রায় শেষ তখন এক পর্যায়ে উনি নিজের মেয়ে ডক্টর শশীকে চিঠি লিখেন। কিন্তু যখন তিনি এই চিঠি পাঠান তখন তার নিজের মেয়ে ডক্টর শশী মিশরে একটা এক্সকভেশনের কাজে সব নেটওয়ার্কের বাইরে। এই সময়ে সেটা গিয়ে পড়ে এই নকল শশী মানে গুলশানের কাছে। এই মেয়ে এতদিন ধরে এটাই খুঁজছিল। গুলশান আগে থেকেই জানত একটা সময় আসবে যখন তাকে ভুয়া পরিচয়ে ডক্টর আবদেরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। কাজেই সে আগে থেকেই ডক্টর আবদেলের মেয়ের নামেই নিজের ভুয়া আইডি, পাসপোর্ট, সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বানিয়ে রেখেছিল, যাতে প্রয়োজনে সেগুলো ব্যবহার করতে পারে। তো ডক্টর আবদেলের চিঠি হাতিয়ে সে নিজের নাম পরিচয় লুকিয়ে ভুয়া আইডি পাসপোর্ট নিয়ে ডক্টর শশী সেজে বাংলাদেশে আসে এবং সম্ভবত তখনই রেলিক এবং নেক্রপলিসের নজরে পড়ে যায়। যখন ডক্টর আবদেলের চিঠিতে তার বাড়ির সামনে উপস্থিত থাকার কথা ছিল তার মেয়ে শশীর, তার অনেক আগেই গুলশান সেখানে গিয়ে ডক্টর আবদেলের ডেরা খুঁজে বার করে সেখানে হানা দিয়ে তার লকেট চুরি করে পালাতে থাকে। তার পিছু নিতে গিয়ে ডক্টর আবদেল গাড়ি চাপায় মারা পড়ে। গুলশান যখন ডক্টর আবদেলের ওখানে যাচ্ছিল ওই সময় তাকে অনুসরণ করে হুয়ানের লোকেরা। গুলশান ওদের ছাড়িয়ে ফেলে। কিন্তু নেক্রপলিস অর্থাৎ মিস্টার ইউয়ের লোকেরা ঠিকই তাকে কবজা করে। কিন্তু ওই সময় পুলিশ চলে আসাতে তারা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে পেছনের পুকুর দিয়ে ডকইয়ার্ডে চলে যায়। নেক্রপলিশের পক্ষ থেকে ওখানকার ইউনিয়নের শ্রমিকদের ঘুষ দিয়ে গুলশানকে ওখানে আটকে রাখার ব্যবস্থা করে মিস্টার ইউ।'

'তার মানে গুলশান যখন সেদিন রাতে ডক্টর আবদেরের ওখানে যায় সেখানে দুটো গ্রুপই তাকে অনুসরণ করে ধরার চেষ্টা করছিল?' এক প্রতিনিধি জানতে চাইল।

'অনেকটা তাই স্যার। এই ব্যাপারে আমার রিপোর্টে বিস্তারিত লেখা আছে। তবে আমি সংক্ষেপে বলছি। একদিকে নেক্রপলিস তাকে বন্দি করে, কিন্তু ওরা ঠিক তাকে নিয়ে মুভও করতে পারছিল না। আবার বুঝতেও পারছিল না এই মেয়েকে তারা কীভাবে কাজে লাগাবে। অন্যদিকে হুয়ান সব হারিয়ে পাগল হয়ে ওঠে। আবার ডক্টর আবদেলের মৃত্যু সংবাদে সে উন্মাদে রূপ নেয়। কিছু করতে না পেরে সে একবার তার ডেরায় হানা দেয়ার প্লান করে, না পেরে তার লাশ চুরি করার চেষ্টা করে। সেখানেও না পেরে সে আমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করে।

সেখানেও আমার আর ভুবনের ভেতরে গণ্ডগোল লাগিয়ে ভেজাল লাগাতে সে চেয়েছিল সে ডক্টরের ডেরায় হানা দিতে চায়। ওখানে ব্যর্থ হয় এবং এরপরের কিছু ব্যাপার তো সবাই জানেন,' বলে সে টানা বলে গেল কীভাবে ক্লু বের করে ডক্টর শশীকে কোথায় বন্দি করে রাখা হয়েছে বের করল। শশী কীভাবে ওদের ধোঁকা দিতে চাইছিল এসব বলে গেল টানা। একটানা কথা বলে শারিয়ার থামল।

'আর সেই ডক্টর আবদেলের গবেষণার বিয়ষটা?'

'ডক্টর আবদেলের বিয়য়টা আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না। সে এতগুলো বছর ধরে যা করল সেগুলোকে এভাবে হারিয়ে যেতে দেবার কথা নয়। তবে এখান থেকে আমরা একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছি,'সে যা সাজিয়ে রেখেছিল সেগুলো সবই ছিল ধোঁকার প্রলেপ লাগানো। সম্ভাব্য অনুসন্ধানকারীদের ধোঁকা দেয়ার জন্য। তবে এসব সমাধান করতে চাইলে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে। প্রথমত, রাজদ্রোহী কী বের করতে হবে। এর সঙ্গে আমাদের এক্সপার্টদের দিয়ে ডক্টর আবদেলের সেই গবেষণার চিত্রটা আরো বিশদ নিরীক্ষা করাতে হবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা ডক্টর আবদেলের পার্টনার ইফতেখার আবদুল্লাকে খুঁজে বের করতে হবে। একমাত্র তবেই এই কেসের পুরো সমাধান সম্ভব,' বলেই সে যোগ করল, 'আমাদের এক্সপার্টরা এটা বুঝতে পেরেছে রাজদ্রোহীতেই আছে ডক্টর আবদেলের হেঁয়ালির সমাধান।'

এরপর একে একে আরো প্রশ্ন ও উত্তর চলার পর মিটিং শেষ করে বাইরে এসে শারিয়ার একটা সিগারেট ধরাল। করিডরে দাঁড়িয়ে টানতে টানতে সে হাঁটতে লাগল। রুম্পা পেছনে থেকে ডেকে উঠল। 'মিস্টার শারিয়ার, আপনার সঙ্গে আমার বোঝপড়া কিন্তু বাকি,' মৃদু হেসে বলে উঠল সে।

শারিয়ার সিগারেট জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে উঠল, 'ম্যাডাম, কেসের কাজও এখনো বাকি। কাজেই নো চিন্তা। আসলে আপনাকে আমার সরি বলা উচিত,' শরিয়ার হেসে উঠে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

রুম্পা হেসে উঠল। 'যদি কিছু মনে না করেন আমি এই কেসের পরবর্তী ধাপে আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই। আর ঢাকা থেকে পাশা স্যার রাজদ্রোহীর নামে যে জিনিসটা পাওয়া গেছে সেটা নিয়ে গবেষণা করতে ও ডক্টর আবদেলের পার্টনারকে খুঁজে বের করতে পরবর্তীতে কাজ করার জন্য ময়মনসিংহ থেকে একজন অফিসার আসছে এবং সবাইকে নিয়ে মিস্টার তানভীরের নেতৃত্বে 'টিম আলফা' নামে একটা দল বানানো হচ্ছে। পাশাপাশি এই টিম বাংলাদেশে নেক্রপলিস ও রেলিকের অ্যাক্টিভিটি প্রিভেন্ট করা নিয়েও কাজ করবে। আমি এই টিমের সঙ্গে থাকতে চাই।'

শারিয়ার মাথা নাড়ল। 'আমি চেষ্টা করব। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে, সম্ভব হলে আমি ডক্টর শশী,' বলেই সে জিভ কাটল। 'মানে ডক্টর গুলশানের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

'অবশ্যই,' বলে রুম্পা তার একজন অফিসারের সঙ্গে গাড়িতে করে ওকে পাঠিয়ে দিল সেই কাস্টডিতে যেখানে গুলশানকে বন্দি করে রাখা হয়েছে।

***

যেখানে গুলশানকে রাখা হয়েছে সেটা ঠিক নিয়মিত সেল বা জেলখানা নয়। থানার ভেতরে যেসব সেল বা কয়েদখানা থাকে সেগুলোতে বন্দিদের চব্বিশ ঘণ্টার বেশি রাখার নিয়ম নেই। এই সেলটা বিশেষ অপরাধীদের জন্য আলাদাভাবে বানানো এবং বিশেষ অপরাধীদের রাখার জন্যই ব্যবস্থা করে রাখা। সাধারণ সেল থেকে অনেক উন্নত এবং পরিচ্ছন্ন। কিন্তু বেলা শেষে জেলখানা জেলখানাই, আর কয়েদি কয়েদিই।

গুলশানকে দেখেও তাই মনে হলো শারিয়ারের। সেলটা পরিচ্ছন্ন হলেও সেটাতে থাকা গুলশানকে দেখে খুব বেশি খুশি মনে হলো না। এই কদিনে তার ওজন কমেছে বেশ অনেকটা, চোখের কোনে কালিও দেখা গেল। ওকে দেখতে পেয়ে যেন খুশিই হলো এমনভাবে খানিকটা হেসে উঠল সে। শারিয়ারও একগাল হেসে এগিয়ে গেল ওর দিকে। জেলখানার বিশেষ ধূসর রঙের পোশাকে তাকে দেখতে খুবই অদ্ভুত লাগছে।

সেলের গরাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে মৃদু হেসে শারিয়ার বলে উঠল, 'আমি সরি,' বলে সে পকেটে হাত ঢোকাল। সেলের ভেতরে একটা বিছানার মতো জায়গায় শুয়ে ছিল গুলশান। শারিয়ারকে আসতে দেখে উঠে বসেছিল সে ওটাতে। ওকে সরি বলতে দেখে এগিয়ে গেল গরাদের দিকে। দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে সে বলে উঠল, 'সরি, তো মনে হয় বলা উচিত আমার। তুমি কেন সরি বলছো?'

শারিয়ারের একটা হাত এখনো পকেটে ঢোকানো। অন্যহাতের একটা আঙুল তুলে সে বলে উঠল, 'সরি বললাম কারণ সেদিন আমি একটু বেশিই রুড ব্যবহার করে ফেলেছিলাম,' বলে সে আরেক দফা হেসে যোগ করল। 'সে-জন্য ঘুষও নিয়ে এসেছি,' এবার পকেট থেকে অন্য হাতটা বের করে আনল সে। তাকে এক প্যাকেট সিগারেট। 'জলদি নাও, যদিও কাজটা কোনোমতেই আইনসমৃদ্ধ হচ্ছে না কিন্তু তবুও বন্ধু বলে কথা,' বলে সে প্যাকেটটা গরাদের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে দিল গুলশানের দিকে। কিন্তু মেয়েটা প্যাকেটটা ওর হাত থেকে না নিয়ে তাকিয়ে রইল

ওর চোখের দিকে। 'এখন আমাকে বন্ধু ভাবার মতো ভাবালুতা দেখানোর কারণটা জানতে পারি?' বলে সে খপ করে টান দিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে নিল। সেটা থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচালো। শারিয়ার একটা ম্যাচ বক্স এগিয়ে দিল তার দিকে। সেটা থেকে একটা কাঠি বের করে সিগারেটে আগুন দিয়ে ম্যাচটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিল সে। 'আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি আমি। একজন ক্রিমিনালের জন্য এত ফেভারের কারণ জানতে হবে আমার।'

শারিয়ার গরাদে হেলান দিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলে উঠল, 'দেখো শশী,' বলেই সে নিজেকে শুধরে নিল। 'সরি, গুলশান। আসলে তুমি যা করেছ সেটাকে প্রতিরোধ করাটা আমার ডিউটি ছিল। আর আমি সেটা করেছিও কিন্তু তারপর আমি অনেক ভেবেছি, কেন জানি মনের গহিন কোণে তোমার কাজের জন্য আমি কোনো অপরাধবোধ খুঁজে পাইনি। আসলে, ব্যাপারটা বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব না,' বলে সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি ব্যাপারটাকে যেভাবে ভাবছি, তোমার কাজ তুমি করেছ, আর আমার কাজ আমি করেছি, এই জায়গাতে দুজনার কনফ্লিক্ট আমাদের একজনকে গারদের এপাশে অন্যজনকে অন্যপাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কেন জানি আমি তোমার কষ্টটা অনুভব করতে পারছি। তুমি একটা স্বপ্নের পেছনে ধাওয়া করেছ। আর সে-জন্য তুমি যা করার করেছ। কাজেই...'

শারিয়ার গুলশানের দিকে ফিরে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলকিন্তু সে দেখতে পেল মেয়েটার চোখে পানি। 'আবদেল...' বলে সে নিজেকে খানিকটা সামলে নেয়ার চেষ্টা করল। 'আবদেল আর আমার সম্পর্কটা আসলে, কী বলব। কখন কীভাবে গুরু-শিষ্য থেকে প্রেমিক-প্রেমিকা হয়ে গেলাম সেটা আমরা দুজনার কেউই ধরতে পারিনি। আমি তার কাছ থেকে শিখেছি, স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। কিন্তু একটা সময় এসে আমরা দুজনেই বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা যেন ঠিক মিলছে না আমাদের দুজনার মাঝে। যতই আমরা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম ততই আমি ডেসপারেট হয়ে উঠছিলাম তার কাছাকাছি যাওয়ার জন্য। বিশেষ করে আমি জানতাম সে এখানে কী নিয়ে কাজ করছে। আমি জানতাম তার এই আবিষ্কার অনেক কিছুই বদলে দেবে, আর তাই আমি আরো অনেক বেশি ডেসপারেট হয়ে উঠছিলাম। আর আবদেলও বুঝতে পারছিল আমি লোভী হয়ে উঠেছি। শুধু সম্পদের জন্য নয়, আবিষ্কারের নেশাও পেয়ে বসেছে আমাকে আর তাই,' বলে সে মৃদু স্বরে যোগ করল। 'আবদেল সবসময় বলত, 'ফলো ইয়োর হার্ট' আর আমি বলতাম হৃদয়ের কাছাকাছি,' বলে তার মুখ থেকে সিগারেটে ধোঁয়া আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস একসঙ্গে বেরিয়ে এলো। 'এখন তো সবই শেষ হলো।'

'সেদিন রাতে...'

'শশীর কাছে যে চিঠিটা পৌঁছেছিল সেটা আমার হাতে পড়ার পেছনে একটা কারণ ছিল,' গুলশান খানিকটা বিরতি দিয়ে বলে উঠল। 'শশী মানে আবদেলের মেয়ে গেছিল দীর্ঘ সময়ের জন্য সাইটে কাজ করতে। আমি জানতাম আবদেল যদি কখনো কারো সঙ্গে যোগাযোগ করে তবে সেটা হবে শশী। আর তাই শশীর ওপরে নজর রাখা ছিল আমার। চিঠিটা বেনামে গেলেও আমি ঠিকই বুঝতে পারি সেটা আবদেলই পাঠিয়েছে এবং সেটাকে হস্তগত করার পর খুলেই আমি খুশি হয়ে উঠি। পরিকল্পনা আগেই করা ছিল আমার। তুমি ঠিকই ধরেছিলে, এমনকি শশীর নামে সব ভুয়া ডকুমেন্টেশনও করা ছিল যাতে আমি যখন চাই, শশীর নাম নিয়ে আবদেলের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে পারি। কারণ আমি জানতাম একমাত্র এভাবেই আমি আবদেলের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছাতে পারব। আর একটা সময় সেটা সত্যিও প্রমাণিত হতে শুরু করে। আমি বাংলাদেশে পৌঁছে ভুয়া পরিচয়ে খোঁজখবর করতে শুরু করি। কারণ আবদেল চিঠিতে কোথায় দেখা করবে জানালেও তার পরিচয়টা পিন পয়েন্ট করেনি। এমনকি সেও এটা জানত যে, যতই সাবধানতা অবলম্বন করুক না কেন এই চিঠি অন্য কারও হাতে পড়ে যেতেই পারে। তাই আমি এসে খোঁজ-খবর করতে শুরু করি...'

'...এবং সম্ভবত তখুনই তুমি হুয়ান আর মিস্টার ইউয়ের লোকদের চোখে পড়ে যাও,' শারিয়ার বলে উঠল।

' ঠিক, আমি বুঝতে পারছিলাম বিভিন্ন গ্রুপের লোকদের চোখে পড়ে গেছি। তাই সতর্কতাও অবলম্বন করতে শুরু করি। কিন্তু হুয়ানের লোকদের পিছু ছাড়াতে পারলেও মিস্টার ইউয়ের প্রফেশনালদের পারিনি। ওরা ঠিকই আমাকে অনুসরণ করে পৌঁছে যায় আবদেলের বাসার সামনে,' গুলশনের গলায় আফসোসে সুর।

'তারপর ওইখানে কী হয় ওইদিন?'

'আমি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পৌঁছে যাই জায়গামতো। আমি জানতাম আবদেল যদিও তার ঠিকানা পিন পয়েন্ট করেনি কিন্তু সে ঠিকই ওই জায়গার আশেপাশেই আছে। তার সঙ্গে দীর্ঘদিন থাকার ও কাজ করার ফলে তার অনেককিছুই আমি বুঝতাম। জায়গামতো যেতেই শুরু হয় বৃষ্টি। তারপরও আমি ঠিকই চারপাশটা রেকি করে সেই বেইজমেন্টে গিয়ে পৌঁছাই। ওর কামরাতে ঢুকে লকেটটা সবে হাতে তুলেছি হঠাৎ আমাকে দেখে ফেলে। কেন জানি আমি পালাতে শুরু করি। আর সে আমার পিছু নেয়।'

'ব্যাপারটা তো উল্টা হওয়ার কথা ছিল,' শারিয়ার আরেকটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগিয়ে ওটা ধরিয়ে এগিয়ে দিল গুলশানের দিকে। 'তুমি না তার পিছু নিয়ে বেড়িয়েছো এতদিন।'

‘হ্যাঁ, তাই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মুহূর্তের ভেতরে কী জানি কী হয়ে গেল,” গুলশান সিগারেটটা হাতে নিয়ে তাতে টান দিয়ে আনমনেই একবার কাঁধ ঝাঁকাল। ‘যার জন্য এত অপেক্ষা, যাকে খুঁজে বের করার জন্য এত এত আয়োজন তাকে দেখার পরে কেন জানি নিজেকে সামলাতে পারলাম না। এভাবে চুরি করে আবদেলের সামনে পড়তেই কী যে হয়ে গেল। সোজা উল্টো ঘুরে দৌড়াতে শুরু করলাম...’ গুলশানের ফুসফুসের ভেতর থেকে আফসোসের দীর্ঘশ্বাস আর সিগারেটের ধোঁয়া দুটোই একসঙ্গে বেরিয়ে আসছে। ‘এরপরে বাকিটা তো তোমরা সবাই জানোই...’

‘কিন্তু আমার একটা কথা ছিল,’ শারিয়ার হেলান্ দেওয়া থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ‘যে জিনিসের জন্য, মানে যে আবিষ্কারের জন্য এত আয়োজন ডক্টর আবদেল কী সেটা আসলে খুঁজেই পাননি?’

‘অবশ্যই সে খুঁজে পেয়েছে...’

‘কিন্তু তাহলে এত গোল ঘুরিয়ে তবে...’

‘সে খুঁজে পেয়েছে দেখেই সবাইকে ধোঁকা দেয়ার জন্য এত আয়োজন করে রেখেছে। সে যা আবিষ্কার করেছে তা অবশ্যই আছে সবার চোখের সামনেই আছে। কিন্তু সেটা বের করাটা এখন অসম্ভব একটা ব্যাপার হবে।’

‘কোনো সাজেশন আছে?’ শারিয়ার আনমনেই জানতে চাইল।

গুলশান ওর দিকে চোখ তুলে তাকাল। তারপর হাতের সিগারেটটা নিচে ফেলে দিয়ে বেশ জোরেই হেসে উঠল। ‘স্রেফ সিগারেট খাইয়ে এত দামি ক্লু বের করতে চাও অফিসার? এই জন্যই তবে তোমার এখানে আগমন?’

‘হা-হা,’ গুলশানের কথা শুনে হেসে উঠল শারিয়ার। ‘না সে-জন্য নয়। বন্ধুত্বের জন্য এখানে আগমন,’ বলে সে সরাসরি তাকাল গুলশানের চোখের দিকে। ‘হতে পারে তুমি আইনের চোখে অপরাধী কিন্তু এরমানে এই না যে আমাদের ভেতরে বন্ধুত্ব হতে পারবে না,’ বলে সে গরাদের ফাঁক দিয়ে নিজের ডান হাতটা হ্যান্ড শেইকের ভঙ্গিতে এগিয়ে দিল গুলশানের দিকে। ‘ফ্রেন্ড?’

গুলশান মৃদু হেসে সেটা ধরে সামান্য ঝাঁকি দিল। ‘ফ্রেন্ড।’

‘তবে বিদায় এখন। আমি আবার আসব,’ বলে শারিয়ার পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করতেই পেছন থেকে গুলশান কথা বলে উঠল।

‘প্রথম কথা, আবদেলের এই রহস্যের সমাধান করতে হলে তোমাদের তার পার্টনার ডক্টর আবদুল্লাকে খুঁজে বার করতে হবে। এছাড়াও আরেকটা ব্যাপার আছে। আবদেল সবসময় বলত, ‘ফলো ইউর হার্ট’। সে যা আবিষ্কার করেছিল সেটা পেতে হলে শুধু ক্লু-ক্যালকুলেশন আর অ্যাকশনে কাজ হবে না, নিজের হৃদয় কী বলে সেটাও শুনতে হবে।”

ঘাড় ঘুরিয়ে না তাকালেও গুলশানের কথা শুনে মৃদু হেসে উঠল শারিয়ার।

'আগের কথাটা আমার বন্ধুকে বললাম। এবার অফিসার শারিয়ারকে বলছি; ডক্টর আবদেলের রহস্যের সমাধান করতে হবে তোমাদের। রাজদ্রোহীর রহস্যকে বুঝতে হবে। আবারও বলছি খুঁজে বের করতে হবে আবদেলের অ্যাকাডেমিক পার্টনারকে।'

পেছন ফেরা অবস্থাতেই মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাইরের দিকে রওনা দিল শারিয়ার।

***

কাস্টডির বাইরে বেরিয়ে সে দেখল বাইরে সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসছে। আর তার ভেতরে মুখে বত্রিশ ভোল্টের হাসি লটকে ভুবন দাঁড়িয়ে আছে। 'কী বস, তবে কী এখান থেকেই বিদায়?'

শারিয়ার এগিয়ে এসে তার পিঠে একটা হাত রাখল। 'শোন বিদায় তো দূরে, তোর সঙ্গে অনেক কাজ আছে,' বলে সে হাঁটতে হাঁটতে ঢাকায় গঠিত হতে যাওয়া স্পেশাল টিমের ব্যাপারটা বলল এবং সে যে তাকে ওটাকে ইনক্লুড করতে চায় সেটাও জানাল।

'আরে এটা তো বিরাট একটা ব্যাপার। ওই সিকিউরিটি কোম্পানির ফালতু কাজের বদলে তোমাদের স্পেশাল টিমে কাজ করব, আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া,' বলেই সে হেসে উঠে যোগ করল, 'আগে দুটো বিড়ি দাও বস।'

'কাজও দিলাম আমি। বিড়িও খাওয়াব আমি,' আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল শারিয়ার। দুজনে দুটো সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে ভুবন বলে উঠল। 'বস কাজ যে করবে শুরু করব, কোথা থেকে? রাজদ্রোহীর রহস্যের তো কোনো আগামাথা বোঝা যাচ্ছে না...' ইচ্ছে করেই বাক্যটা শেষ করল না সে।

শারিয়ার চিন্তিত মুখে তাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই সে একটু আগে গুলশানের বলা কথাটা বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'ফলো ইয়োর হার্ট,' বলেই বিড়িটা ফেলে দিয়ে সে বলে উঠল, 'ভুবন চল তো,' সে আবার অফিসের ভেতরে চলে এলো। ভেতরে এসে অফিস রুমে ঢুকে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, ভেতরে গুলশান নামে যে বন্দি আছে, তার জিনিসপত্র কোথায় রাখা আছে?' দায়িত্বে থাকা অফিসার ওদের দুজনকে দেখে নিয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু সেটার জন্য তো স্পেশাল পারমিশন লাগবে।'

এরপরের আধাঘণ্টায় অফিসারকে রুম্পার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার পর সে সেল নম্বর মিলিয়ে গুলশানের জিনিসপত্র বের করে দিল ওদেরকে।

শারিয়ার বাক্সটা ঘাঁটতে শুরু করল।

'বস, কী করছো বলো তো?'

'এক মিনিট,' ঘাঁটতে ঘাঁটতে সে ডক্টর আবদেলের ওখান থেকে শশীর আনা লকেটটা বের করে আনল। ওটাকে উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতেই ওটার এক জায়গায় চাপ দিতেই ওটার ছোট্ট একটা অংশ খুলে গিয়ে ভেতর থেকে বের হয়ে এলো মোড়ানো পুরনো এক টুকরো চামড়ার মতো কাগজ, সেটার ভেতর থেকে বের হলো ছোট্ট একটা মাইক্রোচিপ।

'ফলো ইয়োর হার্ট, হৃদয়ের কাছাকাছি,' বলে সে মাথা নাড়ল। 'পিওর জিনিয়াস,' বলেই সে হেসে উঠল ভুবনের দিকে তাকিয়ে।

ভুবন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। দুই পা এগিয়ে গিয়ে খুশির অতিশয্যে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল শারিয়ার। 'বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা?'

'হচ্ছেটা কী বলো তো বস?' ভুবন অবাক হয়ে জানতে চাইল।

চিপটাকে চোখের সামনে তুলে ধরতে ধরতে শারিয়ার বলে উঠল, 'ডক্টর আবদেলের রাজদ্রোহীর ক্লু,' বলে সে চিপটাকে পকেটে রেখে দিল। তারপর জিনিসগুলো আগের মতো গুছিয়ে রেখে বাক্সটা অফিসারের কাছে জমা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো দুজনে।

ভুবন অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই শারিয়ার তার পিঠের ওপরে একটা হাত রাখল। 'বুঝিয়ে বলছি। ডক্টর আবদেলকে আসলে আমরা যাতটা বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম উনি তার চেয়েও অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিলেন। উনি লোকচক্ষুর অন্তরালে যাওয়ার পর দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা করে যা আবিষ্কার করলেন উনি জানতেন চাইলেও বা না চাইলেও এটা ভুল লোকের হাতে পড়বেই। তাই সম্ভবত উনি উনার প্রকৃত আবিষ্কার এবং এর সমস্ত ক্লু ঢুকিয়ে ফেলেন এই চিপের ভেতরে। আর অন্যদিকে সে সম্ভাব্য শত্রুদের জন্য একে একে ফাঁদ পাততে শুরু করেন দেয়ালচিত্র থেকে শুরু করে সবখানে।'

'মানে আমরা গত কয়েকদিন ধরে যা অনুসরণ করেছি সবই বোকামি ছিল?' মাথা চুলকাতে চুলকাতে ভুবন বলে উঠল।

'হা-হা,' শারিয়ার মৃদু হেসে উঠল। 'সে আর বলতে। তো উনি একদিকে চিপটা সাজালেন, অন্যদিকে পুরো হোক্স সাজালেন সম্ভাব্য শত্রুদের ধোঁকা দেয়ার জন্য। উনি সেই অনুযায়ী ভুয়া চিঠিও পাঠালেন তার মেয়ের কাছে। উনি জানতেন এই চিঠি ভুল লোকের হাতে পড়বেই। আর সবাই তাই মনোযোগ দেবে চিঠির দিকে, লকেটের দিকে নয়। আর মূল জিনিসটা যেহেতু লকেটের ভেতরেই ছিল কাজেই সেটার ক্লু দিলেন উনি ভিন্নভাবে। উনার ইচ্ছে ছিল লকেটটা সরাসরি মেয়ের হাতে তুলে দিবেন, কিন্তু সেটা আর পারেননি...'

'ফলো ইয়োর হার্ট,' বলেই তালি দিয়ে উঠল ভুবন। নিজের ডান হাতটা মুঠো করে বুকে ধুপ ধুপ করল দুবার। 'ফলো ইয়োর হার্ট কথাটায় আসলেই আক্ষরিক অর্থের হৃদয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকা লকেটটাকেই বুঝিয়েছেন উনি, শালা কী সাংঘাতিক। আর আমরা কিনা...'

'আফসোস করিস না,' বলে শারিয়ার তার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিল। 'সিগারেট খা, আর কাজের প্রস্তুতি নিতে হবে অনেক।'

'এখন কী করবে?' সিগারেট ধরাতে ধরাতে ভুবন জানতে চাইল।

'ঢাকায় গিয়ে তানভীরকে টিম সাজাতে হেল্প করতে হবে,' বলে পকেটে টোকা মারল। 'এই চিপে কী আছে সেটা বের করতে হবে। আর রাজদ্রোহী আসলে কী? এই কেস বা এই চিপের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কী খুঁজে বের করতে হবে,' বলে সে নিজের হাতের সিগারেটটা তাক করলভুবনের দিকে। 'সবচেয়ে বড়ো কথা রেলিক আর নেক্রপলিশের দুজনকে ধরেছি আমরা।'

'হুয়ান আর মিস্টার ইউ।'

'এদের দুজনার উপস্থিতি এবং ধরা পড়া প্রমাণ করে এরা সরাসরি আমাদের দেশে অপারেট করতে শুরু করেছে। কাজেই এদের সঙ্গে এবার সরাসরি সংঘাত শুরু হয়ে যাবে আমাদের। বিশেষ করে এদের আগে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে মিস্টার আবদেলের পার্টনারকে।'

'ওরে বাবারে বাবারে। তোমার কাহিনি তো দেখি সিনেমা না টিভি সিরিজের মতো লম্বা হচ্ছে।'

'হা-হা, সিরিজই শুরু হতে যাচ্ছে সামনে,' বলে সে একটা হাত রাখলভুবনের কাঁধে। 'আমি জীবনে খুব বেশি বই পড়িনি ভুবন, কিন্তু কেন জানি আজ নাইন-টেনে থাকতে পড়া একটা বইয়ের কথা খুব মনে পড়ছে।

'কোনটা বস?'

'রাত নেমে আসছে, হাজার বছরের পুরনো রাত,' বলেই হেসে উঠল দুজনে একসঙ্গে। দুজনে হেঁটে এগোতে লাগল রাস্তা ধরে। হাজার বছরের পুরনো রাত নেমে আসছে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের বুকে।

অতীত

আকরাম বেগের কাছারিবাড়ি, চট্টগ্রাম

আকরাম বেগের চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিরান। 'আপনার কাছে আমার অনেককিছু জানবার আছে এটা কী আপনি বুঝতে পারতাছেন?'

আকরাম বেগ গড়গড়ায় টান দিতে দিতে একবার কিরানকে দেখল, তারপর ওর সঙ্গে থাকা গোমেজ, বেদু, পট্টবর্ধন এবং পদ্ম। সেই সঙ্গে ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা পদ্মর বাহিনীর কয়েকজনের দিকে ফিরে দেখল। তারপর মৃদু হেসে উঠল। 'তুমি কী জানতে চাও আমি জানি, কিন্তু তুমার জানতে চাইবার অধিকার যেমন আছে ঠিক একইভাবে কতোটুক বলব সেই অধিকারও আমার আছে।'

কিরান আপনাতেই একবার তার দুইপাশে থাকা নিজের লোকদের দিকে দেখে নিল। জংলাটিলাতে সিলভেরাকে নিয়ে তালেব তৈমূর লাফ দেবার পর বেশ কয়েকদিন পার হয়ে গেছে। এই কয়দিনে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। আরাকান বাহিনী অনেকটাই পিছিয়ে গেছে সিলভেরার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর। সেইসঙ্গে চট্টগ্রামে আরাকানিদের ভেতরে শুরু হয়েছে নানা ধরনের গুঞ্জন। চারপাশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত। এর ভেতরেই কিরান আর পদ্মর বাহিনী মিলে জংলাটিলার চারপাশের পানিতে অনেক খোঁজখুঁজি করে সিলভেরার লাশ পেলেও কোথাও পায়নি তালেব তৈমূরের লাশ। পেছন দিকে পাহারায় থাকা সিলভেরার জাহাজটাকেও ওরা আর খুঁজে বের করতে পারেনি। পরিস্থিতি খানিকটা শান্ত হওয়ার পর ওরা রাতের আঁধারে লুকিয়ে এসেছে আকরাম বেগের সঙ্গে দেখা করতে।

'আপনারে সবটাই বলতে হবে চাচাজান। আপনি শুরু থেইকা সবই জানতেন। কিন্তু আমার কাছে অনেক কিছুই লুকাইছেন, এমনকি তোমরাও,' শেষ কথাটা সে নিজের হাত তুলে পট্টবর্ধন আর পদ্মকে দেখাল।

আরও উত্তেজিত হয়ে সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই আকরাম বেগ উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এলো ওর দিকে। কিরানের হাতটা একহাতে নামিয়ে দিল সে। 'কিরান, তুমি চাঁটগাওয়ের ব্যবসায়ীগো লাইগা অনেক কিছু করছো, এমনকি দক্ষিণের মানুষগো লাইগাও। সিলভেরার মরণের পরে ওগো শক্তি কিছুটা হইলেও কমব। আর দক্ষিণের সাগর জলদস্যু মুক্ত করতে নতুন ব্যবস্থা হইতাছে, সেইটাও বলতাছি। কিন্তু তার আগে শোনো আসলে হইছিল কি,' এটুকু বলে সে আবার চেয়ারে বসে গড়গড়ার নলটা মুখে নিয়ে নিল। চিন্তিত ভঙ্গিতে গড়গড়ায় দুবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে উঠল, 'কিছু বিষয় তুমগো জানার অধিকার আছে। মোহঙে সম্রাট শাহ সুজার পরিবারে হামলার পর ম্রোহঙের কাছের জঙ্গল থেইকা তৈমূর যখন পলায় তখন ওইখানে জাহাজ ছিল আসলে দুইটা। একটা ছোটো আর একটা বড়ো। ছোটো জাহাজটা ছিল হালকা পালের দ্রুত গতির। ওই জাহাজটা নিয়া আরাকানিরা বেড়ে দেয়ার অনেক আগেই তৈমূর চট্টগ্রামে চইলা আসে। আর অন্য বড়ো জাহাজটা সন্দ্বীপ জংলাটিলা এলাকায় ঘুরতে থাকে, যেইটারে সবাই অনুসরণ করছে।'

'শাহ সুজার সম্পদ আসলে কোনোটাতে ছিল?' কিরান ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইল।

'তুমার এই প্রশ্নের জবাব আমি পরে দেব,' কিরানের দিকে একটা আঙুল তুলে কথাটা বলে আকরাম বেগ আবারও গড়গড়ায় দু বার টান দিল। 'তৈমূর চট্টগ্রামে আইসা আমার লগে দেখা কইরা জানায় তার কাছে একটা পরিকল্পনা আছে। শাহ

সুজারে সে বাঁচাইতে পারে নাই। কিন্তু দক্ষিণের সাগরে সিলভেরা আর আরাকানিদের এ্যাশ থেইকা মুক্ত করতে চাইলে এইটা একটা বিরাট সুযোগ। কারণ ওরা জানে তৈমূর জাহাজে কইরা শাহ সুজার সম্পদ লসুইয়া পলাইতাছে, কাজেই সিলাভেরা আর আরাকানিরা এর পিছে লাগবই। এই সুযোগে ওগোরে জংলাটিলা এলাকায় টাইনা নিয়া খতম করতে অইবে। কিন্তু তার জন্য দরকার হবে অনেক প্রস্তুতি আর একজন শক্ত লোক,' বলে সে চোখ তুলে তাকাল কিরানের দিকে। 'এই সময়েই তুমার আগমন কাহিনিতে। সমস্ত ঘটনা সাজানো অইছে তোমারে সামনে রাইখা, কিন্তু সবসময়ই তোমগো লগে ছিল তালেব তৈমূর। পেছনের কলকাঠি আসলে সবই হেয়ই নাড়ছে,' বলে সে একটু থামল। তারপর গড়গড়ার নলটা নমিয়ে রেখে উঠে এলো।

'আর সম্পদের কথা যদি কও, তবে একটা কথা কই,' বলে সে কিরান তো বটেই বাকি সবার দিকে দেখল একবার করে। 'শাহ সুজার লগে কখনোই কোনো সম্পদ ছিল না। শাহ সুজা খুব সামান্য চলার মতা সম্পদ নিয়া আরাকান গেছিল। কারণ মক্কা গিয়া সাধারণ মানুষের মতো জীবন-যাপন করবার ইচ্ছা আছিল তার। হের লগে কোনো সম্পদ কখনোই ছিল না।'

আকরাম বেগের শেষ কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠল। 'তারমানে মোঘলগো যে বিরাট সম্পদের কথা প্রচলিত আছে সেইটা...'

'সবই আছে। এই বাঙাল মুল্লুকেই আছে,' বলে আকরাম বেগ চোখ নামাল। 'শাহ সুজা দিল্লি যাওয়ার বহু আগেই সেই সম্পদ তোমার বাপের হাতে তুইলা দিয়া বলছিল এমনভাবে এইটারে লুকায়া রাখতে, এমনভাবে রক্ষা করতে, যাতে কোনোদিন এই সম্পদ বাঙলার মানুষের কাজে লাগে। সে আরেক রাজদ্রোহীর কাহিনি। একমাত্র তোমার বাপে জানত সেই সম্পদ কই আছে। সম্ভবত তোমার বাপের মৃত্যুর লগে ওই সম্পদের হদিসও হারায়া গেছে,' আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল আকরাম বেগ।

'আপনের কথা আমি পুরাপুরি বিশ্বাস করি না,' কিরান কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকরাম বেগের দিকে। 'এত প্রাণহানি এত মৃত্যু, এত আয়োজন কুনোদিনই স্রেফ সিলভেরারে মারা লাইগা হইতে পারি না। আমার বাপুরে আমি ভালো কইরা চিনি। সে কোনোদিনই...'

'শোন তালেব তৈমূরের পোলা তালেব কিরান, কিছু জিনিস না জানাই উত্তম,' বলে সে কিরানের দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে এলো। 'তৈমূর যা চাইছিল তা হইছে, দক্ষিণের সাগর থেইকা একটা ত্রাস কমছে, আরাকানিরা একটা শিক্ষা পাইছে, যদিও কবি আলাওল আবারও তাগে হাতে ধরা পাইড়া গেছে। তাও, তুমি ঋণ মুক্ত হইছো। হইছো না?'

কিরান চুপ।

'তার চেয়েও বড়ো কথা তুমি জীবনের নতুন উদ্যোম খুঁইজা পাইছো। কাজেই এইটারে কাজে লাগানোর চেষ্টা করো,' বলে সে সবার দিকে দেখল। 'দিল্লি থেইকা খবর আসছে বাঙাল মুলুকে পা রাখতাছে দিল্লির সুলতানের খাস লোক সুবাদার শায়েস্তা খাঁ। সে বাঙাল মুলুকরে পরিষ্কার করবার উদ্দেশ্য নিয়া রওনা দিতাছে। হের অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা হইলো দক্ষিণের জলদস্যুগোরে নিকেশ করা। আমি তুমগোরে বলতাছি, তুমরা এ অঞ্চলের পানি সবচেয়ে ভালো চিনো। আমরা বিরাট দল বানাইতাছি, আমগোর লগে যোগ দেও তুমরা,' বলে সে কিরানের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আরেকটা কথা মনে রাখবা, কিছু সত্যের খোঁজ না করাই উত্তম। কিছু সত্যের খোঁজ করার চেষ্টা করবা না। কিছু সত্য সবার আড়ালে থাকাই ভালো। যা বললাম বুঝো, আমারে তুমগো সিদ্ধান্ত জানাও।'

আকরাম বেগের থেকে বিদেয় নিয়ে ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো। 'কী মনে হয়, সবার মতামত কী?'

'আমি আছি জাহাজি, আমার দল তো আর নাই, আমার লগে যারা আছে হেগোরে নিয়া আমি শায়েস্তা খাঁর দলে যোগ দেব,' কিরানের চোখের দিকে তাকিয়ে পদ্ম বলে উঠল।

কিরান নিজের দলের লোকদের দিকে তাকাল। সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। কিরান হাসিমুখে ফিরে তাকাল পদ্মের দিকে। কিরান রাজি হওয়াতে তার চোখেও খুশির ঝিলিক। বুকের সঙ্গে ঝোলানো বাপুর দেওয়া লকেটটা চেপে ধরে কিরান বিড়বিড় করে উঠল, 'বুকের বলই সবচেয়ে বড়ো বল,' কথাটা বলার সঙ্গেসঙ্গেই ভ্রু কুঁচকে উঠল ওর। একটু আগে আকরাম বেগের কথাটা মনে পড়ে গেল। *তালেব তৈমূরের মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গে হারিয়ে গেছে তার লুকিয়ে রাখা সম্পদ*। কিরান আনমনেই মাথা নাড়ল। বাপু এইটা কোনোদিনই হইতে দিতে পারে না, বলেই সে টান দিয়ে লকেটটা খুলে আনল গলা থেকে। নিবিড়ভাবে দেখতে দেখতেই লকেটের একটা জায়গাতে চাপ দিতেই ওটা খুলে গেল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা মোড়ানো চামড়ার কাগজের মতো। জিনিসটা চোখের সামনে তুলে ধরলে সে।

ওর পাশ থেকে পদ্ম বিড়বিড় করে বলে উঠল। 'শাহ সুজার সম্পদের হদিস।'

'এইটা আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে,' বলে কিরান জিনিসটাকে মুঠোর ভেতরে নিয়ে নিল। নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'জীবনের বিনিময়ে হলেও এই সম্পদ আমাদের হয় রক্ষা করতে হবে, আর না হয় লুকায়াই রাখতে হবে, আর না হয় মানুষের কাছে লাগাইতে হবে।'

'সামনেই আমগো বিরাট যুদ্ধ অপক্ষো করতাছে। কাজেই তিনটার কোনোটাই যদি না পারি আমরা তবে,' ওদের ভেতর থেকে পট্টবর্ধন বলে উঠল। 'এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন আমরা না পারলেও আমগোর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এইটা খুঁইজা বাইর করতে পারে।'

'সেই ব্যবস্থা আমগোরেই করতে হবে,' বলে কিরান মৃদু থামল। 'সম্পদের হদিস তো পাইলাম কিন্তু একটা হিসাব কিছুতেই মিলল না। 'এত আয়োজন, এত খরচ, এত লোকবল ক্ষয় কীসের জন্য কী হইলো? স্রেফ সিলভেরারে মারার লাইগা? নাকি এই সম্পদ যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে হের লাইগ্গা? নাকি অন্য কিছু? আকরাম বেগ কোনো সত্যের কথা কইলে যেইটা লুকায়া থাকাই ভালো?'

'জাহাজি, আমরা হয়তো সেই সত্য কোনোদিনই জানতে পারব না,' বলে পদ্ম কাঁধ ঝাঁকাল। 'কিংবা কে জানে সেই সত্য হয়তো আমগো না জানাই শ্রেয়।'

পদ্মের গভীর কালো চোখের দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা নাড়ল কিরান।

শেষ কথা

তুলপাধলা গ্রামে রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

গল্পকারের গল্প বলা শেষ হতেই একে একে সরে পড়তে শুরু করল গ্রামবাসীরা। গল্পকার স্থানুর মতোই বসে রইল তার জায়গায়। একে একে সবাই চলে গেলেও তার খাস ভৃত্যরা রয়ে গেছে তার পাশেই। গল্পকারকে নীরবে বসে থাকতে দেখে একে একে পরস্পরের দিকে চোখাচোখি করল তারা। কিন্তু তারা তো আর জানে না গল্পকার আজ গল্প বলতে বলতে গল্পের অনেক গভীরে চলে গেছিল। এতটাই গভীরে যে তার স্মৃতির অতল গহ্বরে লুকিয়ে থাকা গোপন অন্তরালে এতটাই নাড়া পড়ে গেছে যে, সে ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতে শুরু করেছে ।

'হুজুর, ঘরে যাবেন না?' আরো অনেকক্ষণ পর আর থাকতে না পেরে গল্পকারের ভৃত্যদের একজন মৃদু স্বরে জানতে চাইল। ভৃত্যের বয়ানে যেন হুঁশ ফিরে এলো গল্পকারের। একহাতে নিজের ভেজা চোখ মুছে সে ফিরে তাকাল ওদের দিকে। তারপর যেন হঠাৎ করেই ঘুম থেকে উঠেছে এমনভাবে বলে উঠল, 'চলো, চলো। রাত গভীর হতে চলেছে।'

নিজের লোকদের নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে রাতের আহার সেরে গল্পকার বেরিয়ে এলো বাড়ির পেছনের আঙিনায়। এখান থেকে তুলপা নদী আর ধলার পাহাড়ের একাংশ চোখে পড়ে। সেই পাহাড় আর নদীর সঙ্গমস্থলে চাঁদের আলো পড়ে অপার্থিব সুন্দর এক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে অস্থির মনটা খানিকটা শান্ত হয়ে এলো গল্পকারের।

'জীবনের প্রকৃত অর্থ আসলে কী, প্রিয় বন্ধু?' পেছন থেকে ভেসে আসা গলাটা শুনে গল্পকারের চমকে ওঠা উচিত ছিল। উচিত ছিল আবেগে আক্রান্ত হওয়া। উচিত ছিল অতীত স্মৃতির এক সমুদ্রে অবগাহন করা, কিন্তু কোনোটাই হলো না তার ভেতরে। কারণ সে জানত একদিন না একদিন এই কণ্ঠটা সে শুনতে পাবে, তার বেঁচে থাকার পেছনে এটাও একটা বড়ো কারণ ছিল। খুব সাবধানে সে পেছন ফিরে তাকাল। অন্ধকারের ভেতর থেকে চাঁদের আলোতে বেরিয়ে এলো আদি ও অকৃত্রিম তালেব তৈমূর।

শ্লথ পদক্ষেপ আর অশ্রুসিক্ত চোখে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা নিজের শেষ বন্ধুটির দিকে এগিয়ে গেল গল্পকার। দুই আবেগ আক্রান্ত বন্ধুর ভেজা দৃষ্টি এক সঙ্গে হলো।

দুজনেই বহুকিছু হারিয়ে আজ একসঙ্গে হয়েছে এই তুলপাধলাতে, রাত্রির দ্বিপ্রহরের চাঁদের আলোতে। তালেব তৈমূরের কাছে যেতেই তার কাঁধ থেকে অবশ হয়ে ঝুলতে থাকা ডান হাতটা দেখতে পেল গল্পকার। সেদিন সিলভেরাকে নিয়ে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ার সময়ে আঘাতের চোটে স্থায়ীভাবে অকেজো হয়ে গেছে হাতটা। সেটাকে আলতো করে ধরল গল্পকার।

আর গল্পকারের চোখের দিকে তাকিয়ে ভেজা চোখেই মৃদু হেসে নিজের মাথাটাকে সামান্য ঝুঁকিয়ে অক্ষত বাম হাতে সালাম করার ভঙ্গিতে কপালে ঠেকিয়ে সে বলে উঠল, 'জাহাপনা শাহ সুজা, সালাম আপনাকে।'

তালেব তৈমূরের হাতটাকে এক ঝাপটায় সরিয়ে দিয়ে তাকে নিজের বুকের সঙ্গে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল প্রয়াত-পরাজিত-নির্বাসিত স্বঘোষিত সম্রাট, বাংলার প্রাক্তন সুবাদার ও বর্তমান গল্পকার শাহ সুজা। 'প্রিয় বন্ধু, আমি জানতাম একদিন তুমি আসবেই,' বলে বুকের সঙ্গে চেপে ধরেই রাখল ধরেই রাখল।

আবেগের স্রোতটা খানিকটা থিতু হতেই দুজনের আলাপচারিতা জমে উঠল। ম্রোহঙের জঙ্গল থেকে সেদিন শাহ সুজা শুধু নিজে পালায়নি। সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল সম্রাট শাহ সুজাকে। প্রথম যে ছোটো জাহাজটা চট্টগ্রামে পৌঁছায় সেটাতে তার সঙ্গেই ছিল শাহ সুজা। শাহ সুজাকে প্রথমে চট্টগ্রামে লুকিয়ে রাখা হয়। তারপর তাদের বন্ধুসম ত্রিপুরার রাজার সহায়তায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় ত্রিপুরার অখ্যাত গ্রাম তুলপা ধলাতে। যদিও ম্রোহঙের জঙ্গলে সম্রাটের আংটি তার ছেলের হাতে পরিয়ে দিয়ে এসেছিল ওরা। যেটার খণ্ড-বিখণ্ড লাশ দেখে সবাই ভেবেছে মারা গেছেন সম্রাট। কিন্তু তালেব তৈমূর জানত শাহ সুজাকে বেশিদিন এভাবে লুকিয়ে রাখা যাবে না। একটা সময় এই খবর ছড়াতে শুরু করবে, যদি না সবার দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানো যায়। এই সময়ে তার মাথায় আসে এমন এক পরিকল্পনা যাতে সবদিক সামলানো সম্ভব।

আকরাম বেগ আর চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিলে ওরা পরিকল্পনা সাজায় একটা দল গঠন করার যেটা প্রথম বড়ো জাহাজের পিছু নেওয়া আরাকান আর সিলভেরার বাহিনীকে বিনাশ করবে। পুরো পরিকল্পনাটাকে এমন একটা রূপ দেয়া হয় যাতে মনে হয় আরকান থেকে শাহ সুজার সম্পদ নিয়ে পালিয়েছে একটা জাহাজ, যেটার দায়িত্বে আছে তালেব তৈমূর। এই খবর রটিয়ে দেয়ার পর তার পিছু নেয় আরকানি আর সিলভেরার বাহিনী। আর তাদের নিকেশ করতে গঠন করা হয় কিরানের বাহিনী।

তালেব তৈমূর আর আকরাম বেগরা মিলে ভুয়া খবর ছড়িয়ে কিরানের এই বাহিনী গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিনের সমুদ্রে এমন এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা

যাতে, শাহ সুজার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে কেউ ভাবারও সুযোগ না পায়। সেই সঙ্গে চট্টগ্রামে লুকিয়ে রাখা সম্রাটকে সবার দৃষ্টির অন্তরালে সহজেই পাঠিয়ে ত্রিপুরার তুলপাধলাতে সরিয়ে যায়।

'শুধু আমাকে বাঁচানোর জন্য এগুলো প্রাণের বলিদান দেয়ার কী কোনো প্রয়োজন ছিল?' শাহ সুজা অনেকটা আবেগের বশেই জানতে চাইল।

তালেব তৈমূর উঠে দাঁড়িয়ে জলধারার দিকে এগিয়ে গেল খানিকটা। 'আমি বাঙাল মুল্লুকের মানুষ। ওখানেই জন্ম ওখানেই বেড়ে ওঠা। আমার সুজলা সুফলা সবুজে ঘেরা মাতৃভূমিকে কেউই কখনো ভালোবাসেনি, বেনিয়ার মতো শুধু ব্যবহার করেছে। সেই মাতৃভূমিকে কেউ যদি ভালোবেসে সত্যিকার অর্থে মানুষের জন্য কিছু করে থাকে সেটা একমাত্র তুমি, শাহ সুজা। তাই বন্ধু হিসেবে তোমাকে বাঁচানোটা আমার কর্তব্য ছিল। আর তাছাড়া আমাদের জন্য এটা একটা সুযোগ ছিল, দক্ষিণ সমুদ্রকে সিলভেরার কবল থেকে খানিকটা হলেও রক্ষা করার, সেই সঙ্গে আরাকানিদের একটা শিক্ষা দেয়ার। সব চেয়ে বড়ো কথা চট্টগ্রামকে আরাকানিদের হাত থেকে উদ্ধার করার পথে একধাপ এগিয়ে গেল সবাই। আমার পরিকল্পনায় কোনো খুঁত ছিল না বন্ধু। কিছু জায়গায় ভুল হয়েছে, উল্টোপাল্টা হয়েছে, জংলাটিলায় সিলভেরার ফাঁদটা আমি বুঝতে পারিনি। এরকম ছোটোখাটো আরো কিছু ভুল হয়েছে। কিন্তু বেলা শেষে যা করতে চেয়েছিলাম, তা হয়েছে।'

'এমনকি তোমার ছেলে কিরান...'

'এটা ওর জন্যই দরকার ছিল। যে পথে সে হাঁটছিল তাতে ধ্বংস তার অনিবার্য ছিল। এই ঘটনার ফলে সে ঋণমুক্ত হয়েছে, সেইসঙ্গে নিজেকে আবারো পুরনো রূপে ফিরে পেয়েছে। নিজেকে সে নিজে রক্ষা করতে পেরেছে, তারচেয়ে বড় কথা...' বলে সে ফিরে এলো শাহ সুজার কাছে। 'সবাই জানে মোঘলদের বিরাট সম্পদ ছিল তোমার কাছে। কিন্তু যে রাজদ্রোহীর রহস্য আমরা বাংলার মাটির গভীরে পুঁতে রেখেছি তাতে সম্পদের চেয়েও যে অনেক বড় শক্তি লুকিয়ে আছে সেটা তো কেউ জানে না। এ এমন এক শক্তি, এমন এক অস্ত্র...' বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল তালেব তৈমূর। 'আমি আশা করি কিরান আর ওর লোকেরা রাজদ্রোহীর এই রহস্য হয় লুকিয়ে রাখতে পারবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে আর না হয় সঠিক লোকের হাতে তুলে দিতে পারবে। আমি শুধু আশা করতে পারি।'

আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে যোগ করল, 'যাক গে, দিল্লি থেকে শায়েস্তা খাঁ আসছে, বড়ো শক্ত লোক। আমার বিশ্বাস, সেই একমাত্র ঢাকাকে ঠিক করতে পারবে, পারবে দক্ষিণের সমুদ্রকে দস্যুমুক্ত করতে,' এটুক বলে সে থেমে যোগ করল। 'তবে আমি আর এসবে নেই। বাকি জীবন আমি শান্তিতে কাটাতে চাই।'

সম্রাট সুজা এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। 'আমার আর কিছুতেই কোনো আগ্রহ নেই বন্ধু। আমার পরিবারকে আমি বাঁচাতে পারিনি। নিজের ছেলে আর মেয়েটাকে পর্যন্ত...' এটুকু বলতেই গলা বুজে এলো তার।

তালেব তৈমূর ফিরে এসে দুই হাত ধরে ফেলল তার বন্ধুর। 'একটু আগে আমি জানতে চাইছিলাম না, জীবনের মানে কী? জীবনের মানে কী জানো বন্ধু জীবনের মানে শুধুই বেঁচে থাকা নয়। জীবনের মানে রাজা-রানি-সাম্রাজ্যের মতো বড়ো বড়ো ব্যাপারগুলো সামলানো নয়। জীবনের মানে মানুষের মাঝে গল্প বলে সাধারণ মানুষকে বিনোদন দিতে পারা, জীবনের মানে এই তুলপাধলার রাতের দ্বিপ্রহরে দুই বন্ধু মিলে গল্পে মেতে ওঠা। এগুলোই জীবনের মানে বন্ধু। জীবনের ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলোই জীবনের প্রকৃত মানে বহন করে। জীবন মানেই সব হারিয়ে আবার নতুন করে বাঁচতে শেখা।'

তালেব তৈমূর এটুকু বলতেই সম্রাট সুজা ভেজা চোখেই হেসে উঠল। দুই বন্ধু একে অপরকে অশ্রুভেজা চোখে জড়িয়ে ধরে হাসতে থাকল। তাদের মাথার ওপরে চাঁদ উঠেছে মাঝ আকাশে।

রাত নেমে আসছে তুলপাধলা গ্রামের বুকে।

হাজার নয়, লক্ষ বছরের পুরনো রাত।



রবিন জামান খানের জন্ম ময়মনসিংহ শহরে, পৈতৃক নিবাস নেত্রকোনার কেন্দুয়া থানায়। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে পড়ালেখা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষাতত্ত্বে দ্বিতীয় মাস্টার্স সম্পন্ন করেন তিনি। পড়া-পড়ানো, শেখা-শেখানোর চর্চা থেকেই শিক্ষকতাকে পেশা ও লেখালেখিকে নেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এরইমধ্যে বিভিন্ন সংকলনে বেশকিছু মৌলিক ও অনুবাদ গল্প লেখার পাশাপাশি লিখেছেন একাধিক টিভি নাটক। তাঁর মৌলিক থ্রিলার উপন্যাস *শব্দজাল*, *২৫শে মার্চ*, *সপ্তরিপু*, *ব্ল্যাক বুদ্ধা*, *ফোরটি এইট আওয়ার্স*, *দিন শেষে*, *আরোহী* ও *অন্ধ প্রহর* এরইমধ্যে অর্জন করেছে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা। বাংলাদেশের পাশাপাশি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত তাঁর মৌলিক গ্রন্থ *২৫শে মার্চ*, *সপ্তরিপু* ও *শব্দজাল* পশ্চিম বঙ্গের পাঠক মহলে ভালোবাসা কুড়িয়েছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের রহস্যময় ঘটনাবলি, সেইসঙ্গে মানব মনের জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে আগ্রহ থেকে উনি বর্তমানে কাজ করে চলেছেন একাধিক ইতিহাসনির্ভর ও সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার উপন্যাস নিয়ে। এরই প্রেক্ষিতে খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাঁর মৌলিক থ্রিলার উপন্যাস *বিখণ্ডিত*, *রাজদ্রোহী*, *ধূম্রজাল*, *সিপাহী*। রবিন জামান খান ঢাকায় প্রথম সারির একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণা করছেন তিনি। 'মগরাজ' উপন্যাসটি তাঁর ইতিহাসআশ্রিত থ্রিলার সিরিজের তৃতীয় উপন্যাস।

e-mail: robinzamankhan@gmail.com